সীরাত বিশ্বকোষ

(তৃতীয় খণ্ড)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

موسوعة سير الانبياء

باللغة البنغالية

المجلد الثالث

সীরাত বিশ্বকোষ

(তৃতীয় খণ্ড)

হযরত দাউদ (আ)—হযরত যুলকারনায়ন

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ
(তৃতীয় খণ্ড)
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় রচিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
শাওয়াল ১৪২২
পৌষ ১৪০৮
জানুয়ারী ২০০২

ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৩৭
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১৯৯৫
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭.২৪
ISBN ঃ 984-06-0638-7

বিষয় ঃ জীবন চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররাম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান

প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

বাঁধাই
আল আমিন বুক বাইন্ডিং ওয়ার্কস
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH ঃ The Encyclopaedia of Sirah in Bengali, 3rd vol. edited by The Board of Editors and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project.
Price Tk. 350.00 January 2002
US$: 15·00

সম্পাদনা পরিষদ

•

লেখকবৃন্দ

- ❐ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা
- ❐ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহমান
- ❐ হাফেজ মাওলানা আবদুল জলিল
- ❐ মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল
- ❐ ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী
- ❐ আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

মহাপরিচালকের কথা

আলহামদু লিল্লাহ! যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। দুরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-র প্রতি, বিশ্বমানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধঃপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত। আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে।

হযরত রাসূল কারীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ প্রাপ্তির জন্য আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের জীবন ও কর্ম তথা সঠিক জীবন-চরিত জানা একান্ত প্রয়োজন। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত নবী-রাসূলদের জীবন ও শিক্ষা সম্বলিত কোন প্রামাণ্য ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই। কুরআন, হাদীছ, তাফসীর, সীরাত ও প্রাচীন ইতিহাসের পাতায় সেগুলি ছড়াইয়া-ছিটাইয়া রহিয়াছে আরবী, উর্দূ, ফারসী প্রভৃতি ভাষায়। সেগুলি সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার উপর আরো গবেষণা চালাইয়া বিশ্বকোষের আঙ্গিকে সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে নবী-রাসূল ও সাহাবীদের জীবন ও শিক্ষামালা সংরক্ষণ ও জাতির সম্মুখে তুলিয়া ধরার এক মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। সীরাত বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ড ইহারই ফসল। নবী-রাসূলদের জীবনীর উপর ইহা শেষ খণ্ড। এই খণ্ডে হযরত দাউদ (আ), হযরত সুলায়মান (আ), হযরত দানিয়াল (আ), হযরত যাকারিয়্যা (আ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ), হযরত মারয়াম (আ), হযরত ঈসা (আ), হযরত লুকমান (আ) ও হযরত যুলকারনায়ন-এর জীবনী স্থান পাইয়াছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবন ও কর্মের উপর ১০টি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরো ১০টি খণ্ড প্রকাশের পরিকল্পনা সম্মুখে লইয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের পাঠক সমীপে আন্তরিক দু'আ ও মুনাজাতের অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ৩য় খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও যেসব ইসলামী পণ্ডিত ব্যক্তি, নিবন্ধকার ও গবেষক কাজ করিয়াছেন তাঁহাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। বিশ্বকোষ বিভাগের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের

কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদের সকলকে আহসানুল-জাযা দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীদের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা উহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরো সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ্। পরিশেষে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

সৈয়দ আশরাফ আলী

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ্! বহু আকাংক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। সেই সঙ্গে সালাত ও সালাম প্রিয় নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি যাঁহার ওসীলায় আমরা হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ লাভে ধন্য হইয়াছি।

ইসলাম প্রচলিত অর্থে কেবল একটি ধর্মই নয়, ইহা একটি জীবন দর্শন, সেই সঙ্গে একটি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাও বটে। মানব সৃষ্টির সূচনা হইতেই ইসলাম মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিতে বিপুল অবদান রাখিয়াছে। শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য, দর্শন, অধ্যাত্ম ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ব্যাপক ও বহুমুখী। শতাব্দীর পরিক্রমায় সৃষ্ট এইসব অবদান মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া আছে মুদ্রিত পুঁথির পৃষ্ঠায়, পাণ্ডুলিপিতে, স্থাপত্য নিদর্শন, নানা সংগঠন ও অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে। এই ধরনের বিপুল বিষয়সমূহের মূল কথা ও তথ্যগুলি সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষে সংকলন করা হয়। ইসলামী বিশ্বকোষও তদ্রূপ ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানের একটি অত্যাবশ্যকীয় সংকলন।

বিশ্বের অগ্রসর সমাজ কর্তৃক ইংরেজী, আরবী, উর্দূ, ফারসী ও তুর্কীসহ কয়েকটি ভাষায় ইসলামী বিশ্বকোষ ইতোমধ্যেই সংকলিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় তেইশ কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষের, বিশেষ করিয়া ইহার সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী মুসলমানদের জন্য তাহাদের ধর্ম ও জীবনাদর্শ, তাহযীব-তমদ্দুন ও ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয় নাই। তাই তাহাদের ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত করিবার জন্য ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকাশনা কর্মসূচী গ্রহণ করে।

অতঃপর ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসে ইসলামী বিশ্বকোষের ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর হইতে পর্যায়ক্রমে ইহার পরবর্তী খণ্ডগুলি প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ১৯৯৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত সর্বমোট ২৮ টি খণ্ড প্রকাশিত হয়। ইসলামী বিশ্বকোষ সংকলন ও প্রকাশনার সমাপ্তি পর্যায়ে ৪র্থ পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা আমলে (১৯৯৫-২০০০) ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশনার নিমিত্ত একটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষের অন্তর্গত হিসাবে ধরা হয় সর্বপ্রথম আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালাম, অতঃপর আম্বিয়াকুলের সর্দার সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) এবং তদীয় সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর সামগ্রিক জীবন-চরিত। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামসহ লক্ষাধিক নবী-রসূলকে সমগ্র মানব সমাজের পথপ্রদর্শনের জন্যই পৃথিবী বক্ষে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রাসূলের আনীত সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন-চরিতকেই বিশেষভাবে উম্মাহ, অতঃপর সমগ্র মানবমণ্ডলীর সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করিয়াছিলেন যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহ্‌র জন্য সহজ হয়। আম্বিয়াকুল সর্দার হযরত মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাইতো "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (সূরা য়ূনুসঃ ১৬ আয়াত) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হেদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে উম্মতের সামনে পেশ করিতে দেখি। আর কেনইবা করিবেন না, যাঁহার জীবনকে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনুল কারীমে অনুসরণীয় দৃষ্টান্তমূলক জীবন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা)-র মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)। ঠিক তেমনি মুসলিম মিল্লাতের জনক অন্যতম শ্রেষ্ঠ পয়গাম্বর হযরত ইবরাহীম (আ)-এর জীবন-চরিতের মধ্যে, কেবল তাহাই নয় বরং তাঁহার অনুসারীদের মধ্যেও এই উম্মতের জন্য আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া কুরআনুল কারীম ঘোষণা দিয়াছে। বলা হইয়াছেঃ "তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তাহার অনুসারীদের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৬০ ঃ ৪)। কুরআনুল কারীমে প্রতিনিধি স্থানীয় দুইজন নবী ও তাঁহাদের অনুসারীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলা হইলেও মূলত আম্বিয়া আলায়হিমুস সালামের সকলের মধ্যেই গোটা মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ রহিয়াছে। তাঁহারা ছিলেন আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা।

অতএব আদর্শের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ও বাস্তব নমুনা আম্বিয়া আলায়হিমুস-সালামের সীরাত তথা জীবন-চরিতকে পরবর্তী বংশধরদের জন্য সংরক্ষণের স্বার্থেই উম্মাহ্র সচেতন আলিম-উলামা ইহার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের একটি বিরাট অংশ, এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। ইঁহাদের মধ্যে ইব্ন ইসহাক, ইব্ন হিশাম, ইব্ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্ন হায্ম, ইব্ন আবদি'ল বার্র, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্ন মূসা আল-আনদালুসী, ইব্ন সায়্যিদিন্নাস, ইব্ন কায়্যিম, ইব্ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাসতাল্লানী, আল-হালাবী, আয- যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ। আধুনিক সীরাতবিদদের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জাদ আল-মাওলা, ইউসুফ সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ আতিয়্যা আল- আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইয্যাত দারওয়াযা, আবদুর রহমান আশ- শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদদীন মাসরুর, কাযী সুলায়মান মানসূরপূরী, আবদুর রউফ দানাপুরী, মানাজির আহসান গীলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী, হিফযুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানধলবী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, মাওলানা আকরম খাঁ, আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা প্রমুখ বিখ্যাত। আলহামদু লিল্লাহ্! সীরাত রচয়িতাদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

উল্লেখ্য যে, সীরাত বিশ্বকোষ রচনার প্রধানতম উৎস আল-কুরআন, অতঃপর ইহার বিভিন্ন তাফসীর, হাদীছ গ্রন্থ ও ইহার বিবিধ ভাষ্য, সর্বশেষ বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিপুল সীরাত গ্রন্থ। এসব গ্রন্থের অধিকাংশই আরবী ভাষায় রচিত হওয়ায় এই সব গ্রন্থ সংগ্রহে আমাদের বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছে। এমনকি বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি সীরাত গ্রন্থ সংগ্রহে সক্ষম হই নাই। তদুপরি বিষয়টি গবেষণা-বহুল ও পরিশ্রমসাপেক্ষ বিধায় ইহার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক লেখক ও গবেষক পাইতেও আমাদেরকে সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। অধিকন্তু সীরাত

বিশ্বকোষ-এর একজন লেখক ও গবেষককে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিতে কমপক্ষে আরবী, উর্দূ, ইংরেজী ও বাংলা এই চারিটি ভাষায় অভিজ্ঞ হইতে হয়। ফলে প্রয়োজনীয় সকল চাহিদা পূরণ করিয়া কাজ করিতে হওয়ায় আমাদের পক্ষে প্রকল্প নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই। কিছুটা বিলম্ব হইলেও অবশেষে ২২ খণ্ডে সমাপ্য সীরাত বিশ্বকোষের ১ম ও ২য় খণ্ডের পর ইহার ৩য় খণ্ডটি যে আগ্রহী পাঠকের হাতে তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হইল সেজন্য আমরা পুনরায় করুণাময় আল্লাহ্র দরবারে আমাদের অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করিতেছি।

উল্লেখ করা দরকার যে, সীরাত বিশ্বকোষ-এর ১ম খণ্ডে হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ইয়া'কূব (আ) পর্যন্ত ১১ জন, ২য় খণ্ডে হযরত ইউসুফ (আ) হইতে হযরত শামূঈল (আ) পর্যন্ত ১৩ জন নবীর জীবন-চরিত স্থান পাইয়াছে এবং বর্তমান খণ্ডে হযরত দাউদ (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত ৬ জন নবী ও কুরআনে উল্লিখিত ৩ জন মহাপুরুষের (হযরত লুকমান, হযরত মারয়াম ও যুলকারনায়ন) সীরাত আলোচিত হইয়াছে। আর ইহার মাধ্যমে আম্বিয়ায়ে সাবেকীন-এর গুরুত্বপূর্ণ নবীদের জীবন-চরিত আলোচনার সমাপ্তি ঘটিয়াছে। পরবর্তী খণ্ড হইতে নবীকুল শিরোমণি সায়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলোচিত হইবে।

সীরাত বিশ্বকোষ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে আমরা অনেকের নিকট নানাভাবে ঋণী। তন্মধ্যে সর্বাগ্রে সম্পাদনা পরিষদের পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি ডঃ সিরাজুল হকসহ সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি, যাঁহারা নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও ইহার পেছনে নিরলস শ্রম দিয়া আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার নজীর রাখিয়াছেন। সীরাত বিশ্বকোষের সম্মানিত লেখক ও গবেষকবৃন্দকেও আমরা তাঁহাদের অমূল্য খেদমতের জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি।

এতদসঙ্গে আমরা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সম্মানিত মহাপরিচালক, সচিব, অর্থ, পরিকল্পনা ও প্রকাশনা পরিচালক, লাইব্রেরীয়ান ও প্রেস ব্যবস্থাপকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই সঙ্গে বিশ্বকোষ বিভাগের গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার মুদ্রণ ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাঁহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ্ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রয়াস বিধায় মেহেরবানী করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মূল্যবান পরামর্শ দান করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণগুলিকে অধিকতর উন্নত, তথ্য সমৃদ্ধ ও নির্ভুল করিতে আমাদেরকে সাহায্য করিবেন। পরবর্তী খণ্ডগুলির কাজ যাহাতে সফলভাবে অগ্রসর হইতে পারে তজ্জন্য সকলের নিকট আমরা দোআপ্রার্থী।

ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير.

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক

সূচীপত্র

সীরাত বিশ্বকোষ

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُولِى الاَلْبَابِ.

"তাঁহাদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য আছে শিক্ষা" (১২ ঃ ১১১)

২৫

হযরত দাঊদ (আ)

حضرت داؤد علیه السلام

হযরত দাউদ (আ)

জন্ম ও বংশপরিচয়

হযরত দাউদ (আ) ছিলেন বনূ ইসরাঈলের একজন মহান নবী ও রাসূল এবং পরাক্রমশালী শাসক। কুরআন মজীদে যে কয়জন নবী-রাসূলের নাম, সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার জন্মতারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য অজ্ঞাত। তবে অনুমান করা হয় যে, তাঁহার সময়কাল ছিল হযরত মূসা (আ)-এর দুই শত বৎসর পরে এবং হযরত ঈসা (আ)-এর এক হাজার বৎসর পূর্বে (তালূত-জালূতের মধ্যকার যুদ্ধ অধ্যায়ে সন-তারিখ সংক্রান্ত আলোচনা করা হইয়াছে)। বুতরুস আল-বুস্তানী তাঁহার জন্মসন ১০৮৬ খৃ. পূ., জন্মস্থান বেথেলহাম, মৃত্যু সন ১০১৫ খৃ. পূ. এবং মৃত্যুস্থান জেরুসালেম উল্লেখ করিয়াছেন (দাইরা, ৭খ, পৃ. ৫৭৪)। তাঁহার বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ দাউদ (আ) ইব্ন ঈশা (ঈশী) (যিশয়) ইব্ন আওবিদ ইব্ন আবির (আবিয) ইব্ন সালমূন ইব্ন নাহশূন ইব্ন আম্মিনাদিব ইব্ন ইরাম ইব্ন হাসরূন ইব্ন ফারিস ইব্ন ইয়াহূয়া ইব্নই য়াকূব (আ) ইব্ন ইসহাক (আ) ইব্ন ইবরাহীম (আ) (ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, ১খ., পৃ. ২৪৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৯)। অন্যান্য গ্রন্থে প্রদত্ত তালিকায় নামের উচ্চারণে কিছু বিভিন্নতা আছে (তু. আল-মুসতাদরাক, ২খ., পৃ. ৫৮৫; আল-কামিল ফি'ত-তারীখ, ১খ., পৃ. ১৬৯; তাহযীব তারীখ দিমাশ্ক আল-কাবীর, ৫খ, পৃ. ১৯০ ইত্যাদি)। বাইবেল প্রদত্ত বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ দাউদ ইব্ন যিশয় ইব্ন ওবেদ ইব্ন বোয়স ইব্ন সলমোন ইব্ন নহশোন ইব্ন আম্মিনাদব ইব্ন রাম ইব্ন হিষ্রোণ ইব্ন পেরেস ইব্ন যিহুদা (রূতের বিবরণ, ৪ঃ ১৭-২২; আরও তু. মথি, ১ ঃ ১-৬; লূক, ৩ ঃ ২৩)। তবে সবকয়টি উৎসই একমত যে, হযরত দাউদ (আ) হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বারজন পুত্র হইতে উদ্ভূত বারটি গোত্রের মধ্য হইতে ইয়াহূদার (যিহুদা) বংশভুক্ত ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনামতে ইশার (যিশয়) আট পুত্রের মধ্যে দাউদ (আ) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ; বয়োজ্যেষ্ঠ তিন পুত্রের নাম ইলীয়াব, অবীনাদব ও শম্ম (১ম শমূয়েল, ১৭ঃ ১২-১৩)। ইব্ন কাছীরের মতে তাঁহারা ছিলেন তের ভাই (২খ, পৃ. ৮)।

ইব্ন ইসহাক (র) ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ (র)-এর বরাতে হযরত দাউদ (আ)-এর দেহাবয়ব নিম্নরূপ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ তিনি ছিলেন খর্বকায়, ক্ষুদ্রদেহী ও নীল চক্ষুবিশিষ্ট। তাঁহার দেহে পশম ছিল যৎসামান্য এবং তাঁহার চেহারা হইতে তাঁহার আত্মার পবিত্রতা প্রস্ফুটিত হইত (বিদায়া, বাংলা ১, খ. ২, পৃ. ৯; আল-মুসতাদরাক, ২ খ, পৃ. ৫৮৫; তু. ১ম শমূয়েল, ১৬ ঃ ১৮; ১৭ ঃ ৪২)। তিনি ছিলেন পর্যাপ্ত দৈহিক শক্তির অধিকারী (তু. ৩৮ ঃ ১৭)। বাদশাহ তালূতের সহিত যুদ্ধে যোগদানের আগে ও পরে তিনি পিতার মেষ চরাইতেন (১ম শমূয়েল, ১৭ ঃ ১৫) এবং এই অবস্থায়ই তিনি

অদৃশ্য হইতে যুদ্ধে যোগদানের আহবান শুনিতে পান। তাঁহাকে ডাকিয়া বলা হইল, হে দাউদ! জালূত তোমার হস্তে নিহত হইবে। তুমি এখানে কি করিতেছ! তোমার মেষপাল তোমার প্রতিপালকের যিম্মায় রাখিয়া তোমার ভ্রাতাগণের সহিত মিলিত হও। কারণ তালূত জালূতের হত্যাকারীর জন্য তাঁহার সম্পত্তির অর্ধেক এবং তাহার সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দেওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন। অতএব তিনি মেষপাল তাঁহার প্রতিপালকের যিম্মায় ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যোগদানের জন্য রওয়ানা হন (তাহযীব তারীখ দিমাশ্ক, ৫খ., পৃ. ১৯০)। পথিমধ্যে পরপর তিনটি পাথর তাঁহাকে ডাকিয়া বলে, হে দাউদ! আমাকে তোমার সঙ্গে লও। আল্লাহর হুকুমে আমি তোমার পক্ষে জালূতকে হত্যা করিব। দ্বিতীয় পাথরটি হযরত ইসহাক (আ)-এর এবং তৃতীয় পাথরটি হযরত ইয়াকূব (আ)-এর বলিয়া কথিত। দাউদ (আ) তিনটি পাথরই তাঁহার থলের মধ্যে পুরিয়া লইলেন। পাথর জালূতকে কিভাবে হত্যা করিবে, দাউদ (আ) এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে উহা বলিল, আমি আল্লাহর হুকুমে বাতাসের সাহায্য নিব এবং বাতাস তাহার শিরস্ত্রাণ খুলিয়া ফেলিলে তাহার কপালে পতিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিব। উল্লেখ্য যে, থলের মধ্যে পাথর তিনটি একটি পাথরে রূপান্তরিত হইয়া যায় (পূ. গ্র., ৫খ, পৃ. ১৯১)।

কুরআন মজীদে হযরত দাউদ (আ)

কুরআন মজীদের নয়টি সূরার মোট ষোল স্থানে প্রসঙ্গক্রমে হযরত দাউদ (আ)-এর কিছু বর্ণনা আছে।

(ক) সর্বপ্রথম তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে জালূতের বিরুদ্ধে তালূতের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কিত বিবরণে। এই যুদ্ধে সৈনিক দাউদ বিপক্ষের সমরনায়ক জালূতকে হত্যা করিয়া আলোচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ.

"এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করিল, আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন" (২ ঃ ২৫১)।

(খ) সূরা আন-নিসার ১৬৩ আয়াতে তাঁহাকে ওহীপ্রাপ্ত নবীগণের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا.

"নিশ্চয় আমি আপনার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম। আমি ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আয়্যুব, ইউনুস, হারূন ও সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম" (৪ ঃ ১৬৩)।

(গ) দাউদ (আ)-এর যবানীতে বনী ইসরাঈলের অবাধ্য ব্যক্তিদের অভিসম্পাত প্রসঙ্গে ঃ

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ـ

"বনূ ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা দাউদ ও ঈসা ইব্ন মারয়াম কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। তাহা এই কারণে যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী" (৫ ঃ ৭৮)।

(ঘ) পূর্ববর্তী কতক নবীর বংশধরকে হেদায়াতদান প্রসঙ্গে ঃ

وَوَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوْحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهٖ دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ وَاَيُّوْبَ وَيُوْسُفَ وَمُوْسٰى وَهٰرُوْنَ وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ـ

"আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়াকূব, তাহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আয়্যুব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও। এভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি" (৬ ঃ ৮৪)।

(ঙ) যাবূর কিতাব প্রদান প্রসঙ্গে ঃ

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيّٖنَ عَلٰى بَعْضٍ وَّاٰتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا ـ

"নিশ্চয় আমি নবীগণের কতকের উপর কতককে মর্যাদা দান করিয়াছি এবং দাউদকে যাবূর দান করিয়াছি" (১৭ ঃ ৫৫)।

(ছ) তাঁহাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বস্তুর উপর অলৌকিক প্রভাব খাটাইবার ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে ঃ

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ـ فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فٰعِلِيْنَ ـ وَعَلَّمْنٰهُ صَنْعَةَ لَبُوْسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شٰكِرُوْنَ ـ

"এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করিতেছিল। উহাতে রাত্রিকালে কোন সম্প্রদায়ের মেষ প্রবেশ করিয়াছিল। আমি তাহাদের বিচার প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। আর আমি সুলায়মানকে এই বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম। আমি পর্বত ও পক্ষীকুলকে অধীন করিয়া দিয়াছিলাম, ইহারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত। আমিই ছিলাম এই সবের কর্তা। আর আমি তাহাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে উহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না" (২১ ঃ ৭৮-৮০)?

(জ) দাউদ ও সুলায়মান (আ)-কে জ্ঞানদান প্রসঙ্গে :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ ـ

"আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছি এবং তাহারা উভয়ে বলিল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁহার বহু মুমিন বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। সুলায়মান হইল দাউদের উত্তরাধিকারী" (২৭ : ১৫-১৬)।

(ঝ) দাউদ (আ)-কে অনুগ্রহধন্য করা প্রসঙ্গে :

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا يٰجِبَالُ اَوِّبِىْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِى السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ـ

"নিশ্চয় আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি। হে পর্বতমালা! দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষীকুলকেও। তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ, যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম তৈয়ার করিতে এবং বুননে পরিমাণ রক্ষা করিতে পার এবং তোমরা সৎকর্ম কর। তোমরা যাহা কিছু কর আমি উহার সম্যক দ্রষ্টা" (৩৪ : ১০-১১)।

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِىَ الشَّكُوْرُ ـ

"হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতা সহকারে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ" (৩৪ : ১৩)।

(ঞ) দাউদ (আ)-এর প্রশংসা, একটি বিবাদ মীমাংসার ঘটনা এবং তাঁহাকে রাজত্ব প্রদান প্রসঙ্গেঃ

اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ ذَا الْاَيْدِ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ـ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهٗ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِىِّ وَالْاِشْرَاقِ ـ وَالطَّيْرَ مَحْشُوْرَةً كُلٌّ لَّهٗ اَوَّابٌ ـ وَشَدَدْنَا مُلْكَهٗ وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ـ وَهَلْ اَتٰىكَ نَبَؤُا الْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ـ اِذْ دَخَلُوْا عَلٰى دَاوٗدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوْا لَا تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ـ اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهٗ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَّلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ـ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوٗدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ـ فَغَفَرْنَا لَهٗ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ـ يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ـ

"ইহারা যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং স্মরণ কর আমার শক্তিশালী বান্দা দাউদের কথা। সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করিয়াছিলাম যেন ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এবং সমবেত পক্ষীকুলকেও; সকলেই ছিল তাঁহার অভিমুখী। আমি তাহার রাজ্যকে সুদৃঢ় করিয়াছিলাম এবং তাহাকে প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা দান করিয়াছিলাম। তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌছিয়াছে কি? যখন তাহারা প্রাচীর টপকাইয়া ইবাদতখানায় আসিল এবং দাউদের নিকট পৌছিল, তখন তাহাদের কারণে সে ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বলিল, আপনি ভীত হইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ, আমাদের এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর জুলুম করিয়াছে। অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করিয়া দিন, অবিচার করিবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথনির্দেশ করুন। এই ব্যক্তি আমার ভাই, তাহার নিরানব্বইটি মেষ আছে এবং আমার কাছে একটি মেষ। তবুও সে বলে, ইহা আমার যিম্মায় দিয়া দাও, এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে। দাউদ বলিল, তোমার মেষটিকে তাহার মেষগুলির সহিত যুক্ত করিবার দাবি করিয়া সে তোমার প্রতি জুলুম করিয়াছে। অংশীদারগণের অনেকে একে অপরের উপর তো অবিচার করিয়া থাকে, কেবল মুমিনগণ ও সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ তাহা করে না এবং তাহারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝিতে পারিল যে, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, নত হইয়া লুটাইয়া পড়িল এবং তাঁহার অভিমুখী হইল। অতএব আমি তাহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম। আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম। হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করিয়াছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। কেননা ইহা তোমাকে আল্লাহর পথ হইতে বিচ্যুত করিবে। যাহারা আল্লাহর পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠিন শাস্তি। কারণ তাহারা বিচার দিবসকে বিস্মৃত হইয়া আছে" (৩৮ ঃ ১৭-২৬)।

হাদীছ শরীফে হযরত দাউদ (আ)

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَاَحَبُّ الصَّلٰوةِ اِلَى اللّٰهِ صَلَاةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ .

১. আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আমাকে বলিলেন ঃ "আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় (নফল) সাওম হইল দাউদ (আ)-এর সাওম (রোযা)। তিনি একদিন সাওম পালন করিতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় (নফল) সালাত হইল দাউদ (আ)-এর সালাত। তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাইতেন, রাত্রির এক-তৃতীয়াংশে সালাত আদায়

করিতেন এবং অবশিষ্ট ষষ্ঠাংশ (আবার) ঘুমাইতেন" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৩৮, নং ৩১৬৮; আরও দ্র. নং ৩১৬৬; ১৮৪১; মুসলিম, সাওম, বাব ২৮, নং ২৫৯৬; ২৬০৬; ২৬০৭, ২৬০৮, ২৬০৯, ২৬১০)।

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقَى.

২. নবী (স) আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রা)-কে বলেন ঃ তাহা হইলে তুমি দাউদ (আ)-এর সাওম পালন কর। তিনি একদিন সাওম পালন করিতেন এবং একদিন বিরতি দিতেন। তিনি শত্রুর সম্মুখীন হইলে পলায়ন করিতেন না" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৩৭, নং ৩১৬৭; সাওম, বাব ৬০, নং ১৮৪০; তিরমিযী, সাওম, বাব ৫৭, নং ৭১৮; মুসলিম, সাওম, বাব ২৮, নং ২৬০১ ও ২৬০৩; আবূ দাঊদ, নাসাঈ ও ইব্‌ন মাজাতেও হাদীসটি সংকলিত হইয়াছে)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفِّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقُرْاٰنُ فَكَانَ يَاْمُرُ بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجُ فَيَقْرَاُ الْقُرْاٰنَ قَبْلَ اَنْ تُسْرَجَ دَوَابُّهُ وَلاَ يَاْكُلُ اِلاَّ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ.

৩. আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "দাউদ (আ)-এর জন্য যাবূর কিতাবের তিলাওয়াত সহজসাধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তিনি তাঁহার বাহনের পিঠে জীন বাঁধিবার আদেশ করিতেন এবং উহার উপর জীন বাঁধা হইত। কিন্তু বাহনের পিঠে জীন বাঁধার পূর্বেই তিনি (যাবূর) তিলাওয়াত শেষ করিতে পারিতেন। তিনি স্বহস্তে উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৩৭, নং ৩১৬৫, আরও দ্র. নং ১৯২৮)।

عَنِ الْمِقْدَامِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ اَنْ يَّاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَاِنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَاْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

৪. মিকদাম (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "স্বহস্তে বা স্বশ্রমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেহ আহার করে নাই। আল্লাহর নবী দাউদ (আ) স্বহস্তে বা স্বশ্রমে উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন" (বুখারী, কিতাবুল বুয়ূ, বাব ১৫, নং ১৯২৭)।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَعُوْدُوْنَ دَاوُدَ وَيَظُنُّوْنَ اَنَّ بِهِ مَرَضًا وَمَا بِهِ اِلاَّ شِدَّةُ الْخَوْفِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْحَيَاءِ.

৫. ইব্‌ন উমার (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "লোকেরা দাউদ (আ)-কে দেখিতে আসিত এবং ধারণা করিত যে, তাঁহার ব্যাধি আছে। অথচ তাঁহার কোন ব্যাধি ছিল না, বরং আল্লাহ তা'আলার ভয় ও লজ্জাশীলতার আধিক্যে তাঁহার এইরূপ অবস্থা হইত" (ইব্‌ন আসাকির ও আবূ নুআয়ম-এর বরাতে কানযুল উম্মাল, ১১খ, নং ৩২৩২৩ ও ৩২৩২৪)।

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَّ دَاوُدَ سَئَلَ رَبَّهُ مَسْئَلَةً فَقَالَ اجْعَلْنِيْ مِثْلَ اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ فَاَوْحَى اللّٰهُ اِلَيْهِ اِنِّيْ ابْتَلَيْتُ اِبْرَاهِيْمَ بِالنَّارِ فَصَبَرَ وَاِسْحَاقَ بِالذَّبْحِ فَصَبَرَ وَيَعْقُوْبَ فَصَبَرَ.

৬. আবূ সা'ঈদ (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেনঃ দাউদ (আ) তাঁহার প্রভুর নিকট একটি আবেদন করিয়া বলিলেন, আমাকে ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আ)-এর সমকক্ষ করুন। আল্লাহ তাঁহার নিকট ওহী পাঠাইলেন, নিশ্চয় আমি ইবরাহীমকে আগুনের দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছি এবং সে ধৈর্য ধারণ করিয়াছে, ইসহাককেও কুরবানীর (দ্র. ইসমাইল) দ্বারা (পরীক্ষা করিয়াছি) এবং সেও ধৈর্য ধারণ করিয়াছে এবং ইয়াকূবকেও (ইউসুফের নিখোঁজ হওয়ার দ্বারা) এবং সেও ধৈর্য ধারণ করিয়াছে (আদ-দায়লামীর বরাতে কানযুল 'উম্মাল, ১১খ, নং ৩২৩২৫)।

عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ بَلَغَنَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثَ دَاوُدُ وَهُوَ رَاعِيْ غَنَمٍ وَبُعِثَ مُوْسَى وَهُوَ رَاعِيْ غَنَمٍ وَبُعِثْتُ اَنَا وَاَنَا اَرْعَى غَنَمًا لاَهْلِيْ بِجِيَادٍ.

৭. আবু ইসহাক (র) বলেন, আমরা অবহিত হইয়াছি যে, নবী (স) বলিয়াছেন ঃ "দাউদ (আ) মেষ চারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি নবী হইয়াছেন, মূসা (আ) মেষ চারণ করিয়াছিলেন এবং তিনি নবী হইয়াছেন এবং আমিও জিয়াদ নামক এলাকায় আমার বংশের মেষপাল চরাইয়াছি এবং আমিও নবী হইয়াছি" (তাবারানী, আবু নু'আয়ম, বাগাবী, ইব্ন মান্দা ও ইব্ন সা'দ-এর বরাতে কানযুল উম্মাল, ১১খ, নং ৩২৩২৬)।

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيْهِ غَيْرَةٌ شَدِيْدَةٌ وَكَانَ اِذَا خَرَجَ اُغْلِقَتِ الْاَبْوَابُ فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَى اَهْلِهِ اَحَدٌ حَتَّى يَرْجِعَ فَخَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ وَغُلِّقَتِ الْاَبْوَابُ فَاَقْبَلَتْ امْرَاَتُهُ تَطَّلِعُ اِلَى الدَّارِ فَاِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ وَسْطَ الدَّارِ فَقَالَتْ لِمَنْ فِي الْبَيْتِ مِنْ اَيْنَ دَخَلَ هٰذَا الرَّجُلُ وَالدَّارُ مُغْلَقَةٌ وَاللّٰهِ لَتُفْضَحُنَّ بِدَاوُدَ فَجَاءَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَاِذَا الرَّجُلُ قَائِمٌ وَسْطَ الدَّارِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ مَنْ اَنْتَ قَالَ اَنَا الَّذِيْ لَا اَهَابُ الْمُلُوْكَ وَلَا يَمْتَنِعُ مِنِّي الْحِجَابُ قَالَ دَاوُدُ اَنْتَ اِذًا وَاللّٰهِ مَلَكُ الْمَوْتِ مَرْحَبًا بِاَمْرِ اللّٰهِ فَرُمِلَ دَاوُدُ مَكَانَهُ حَيْثُ قُبِضَتْ نَفْسُهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ شَاْنِهِ فَطَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ فَقَالَ سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلطَّيْرِ اَظِلِّيْ عَلَى دَاوُدَ فَاَظَلَّتِ الطَّيْرُ عَلَيْهِ حَتَّى اَظْلَمَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ فَقَالَ لَهَا سُلَيْمَانُ اَقْبِضِيْ جَنَاحًا جَنَاحًا وَغَلَبَتْ عَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ الْمَضْرَحِيَّةُ.

৮. আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "দাউদ (আ)-এর ছিল প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ। তিনি বাহিরে গমন করিলে বাড়ির দ্বারসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইত এবং তিনি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাঁহার পরিবার-পরিজনের নিকট কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। একদিন

তিনি বাহিরে গমন করিলেন এবং যথারীতি বাড়ির দ্বারসমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহার স্ত্রী অগ্রসর হইয়া ঘরে উঁকি মারিয়া হঠাৎ একটি লোককে ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। স্ত্রী ঘরের লোকজনকে বলিলেন, এই লোকটি কোন দিক দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল, অথচ দরজাগুলি বন্ধ রহিয়াছে। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা তো দাউদ (আ)-এর দ্বারা অপমানিত হইবে। দাউদ (আ) আসিয়া দেখিলেন যে, লোকটি ঘরের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছে। দাউদ (আ) তাহাকে বলিলেন ঃ আপনি কে? আগন্তুক বলিলেন, আমি সেই ব্যক্তি যে রাজা-বাদশাহ্‌দিগকে ভয় করে না এবং কোন প্রতিবন্ধক আমার জন্য বাধা হইতে পারে না। দাউদ (আ) বলিলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! তাহা হইলে আপনি তো মৃত্যুর ফেরেশতা। আল্লাহ্‌র নির্দেশকে স্বাগতম। যেই স্থানে দাউদ (আ)-এর রূহ কবজ করা হইল সেই স্থানেই তাঁহাকে কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। অবশেষে তিনি ইনতিকাল করিলেন। তাঁহার উপর সূর্য উদিত হইলে অর্থাৎ রৌদ্র পতিত হইলে সুলায়মান (আ) পক্ষীকুলকে বলিলেন ঃ দাউদ (আ)-কে ছায়াদান কর। অতএব পক্ষীকুল তাহাদের ডানা দ্বারা তাঁহাকে ছায়াদান করিতে থাকে। উহাতে পৃথিবী অন্ধকার হইয়া যায়। সুলায়মান (আ) পক্ষীকুলকে বলেন ঃ এক এক করিয়া ডানা গুটাইয়া লও। সেই দিন বাজপাখিই উহার লম্বা ডানা দ্বারা অধিক স্থানে ছায়া বিস্তার করিয়া রাখে" (মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ৪১৯, কানযুল উম্মাল হইতে উদ্ধৃত, ১১খ, নং ৩২৩২৭)।

عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ قَبَضَ اللّٰهُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ بَيْنِ اَصْحَابِهِ فَمَا فُتِنُوْا وَمَا بَدَّلُوْا وَلَقَدْ مَكَثَ اَصْحَابُ الْمَسِيْحِ مِنْ بَعْدِهِ عَلي سُنَّتِهِ وَهَدْيِهِ مِائَتَىْ سَنَةٍ.

৯. আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "দাউদ (আ)-কে তাঁহার সাহাবীগণের উপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু দান করেন। ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হয় নাই এবং পরিবর্তিতও হয় নাই। অপরদিকে ঈসা মসীহ (আ)-এর সঙ্গীগণ তাঁহার পরে মাত্র দুই শত বৎসর তাঁহার রীতিনীতির উপর ও তাঁহার প্রদর্শিত পথের উপর অবস্থান করে" (মুসনাদ আবূ ইয়া'লা ও তাবারানীর মু'জামুল কাবীর-এর বরাতে কানযুল উম্মাল, ১১খ, নং ৩২৩২৮)।

عَنْ اَبِىْ الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مِنْ دُعَاءِ دَاوُدَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِىْ يُبَلِّغُنِىْ حُبَّكَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حُبَّكَ اَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ نَفْسِىْ وَاَهْلِىْ وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَكَرَ دَاوُدَ يُحَدِّثُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَعْبَدَ الْبَشَرِ.

১০. আবূ দারদা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ দাউদ (আ)-এর দু'আসমূহের একটি এই যে, তিনি বলিতেন, "হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার ভালোবাসা এবং যে তোমাকে ভালোবাসে তাহার ভালোবাসা প্রার্থনা করি এবং এমন কাজ করার তৌফিক চাই যাহা তোমার ভালোবাসা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। হে আল্লাহ! তোমার ভালোবাসাকে আমার জান-মাল, পরিবার-পরিজন ও শীতল পানির চাইতেও অধিক প্রিয় বানাইয়া দাও"। রাবী বলেন,

মহানবী (স) যখনই দাঊদ (আ)-এর আলোচনা করিতেন তখনই তাঁহার সম্পর্কে বলিতেন ঃ তিনি সকল লোকের তুলনায় অধিক ইবাদতগুযার ছিলেন" (তিরমিযী, আবওয়াবুদ দা'ওয়াত, বাব ৭৪, নং ৩৪২২; হাকেম নীশাপুরীর আল-মুসতাদরাক ও সহীহ মুসলিমেও হাদীছটি উদ্ধৃত হইয়াছে; তু. মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, বাব ২৮, নং ২৫৯৭, আবূ দারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত)।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ ادَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهِ كُلُّ نَسْمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيْصًا مِنْ نُوْرٍ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ادَمَ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰؤُلاَءِ قَالَ هٰؤُلاَءِ ذُرِّيَّتُكَ فَرَاَىْ رَجُلاً مِنْهُمْ فَاَعْجَبَهُ وَبِيْصُ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَقَالَ اَىْ رَبِّ مَنْ هٰذَا فَقَالَ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ اٰخِرِ الْاُمَمِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ يُقَالُ لَهُ دَاوُدُ فَقَالَ رَبِّ كَمْ جَعَلْتَ عُمْرَهُ قَالَ سِتِّيْنَ سَنَةً قَالَ اَىْ رَبِّ زِدْهُ مِنْ عُمْرِىْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

১১. আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশ মাস্‌হ করিলে তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে তাঁহার সকল সন্তান বাহির হইল, যাহাদেরকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করিবেন। তিনি তাহাদের প্রত্যেকের দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে নূরের ঔজ্জ্বল্য দান করিলেন, অতঃপর তাহাদেরকে আদম (আ)-এর সম্মুখে পেশ করিলেন। আদম (আ) বলিলেন, হে প্রভু! ইহারা কাহারা? আল্লাহ্ বলেন, ইহারা তোমার সন্তান। আদম (আ)-এর দৃষ্টি তাঁহার সন্তানদের এমন একজনের উপর পতিত হইল যাহার দুই চক্ষুর মধ্যখানের ঔজ্জ্বল্যে তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, হে আমার প্রভু! এই ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলিলেন, পরবর্তী কালের উম্মাতের অন্তর্গত তোমার সন্তানদের একজন। তাহার নাম দাঊদ (আ)। আদম (আ) বলিলেন, হে আমার প্রভু! তাহার আয়ু কত বৎসর নির্ধারণ করিয়াছেন? আল্লাহ বলেন, ষাট বৎসর। আদম (আ) বলিলেন, প্রভু! আমার আয়ু হইতে চল্লিশ বৎসর তাঁহাকে দান করুন" (তিরমিযী, তাফসীর সূরা আ'রাফ, নং ৩০১৫; মুসনাদ ইমাম আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ২৫২, ২৯৯, ৩৭১; আল-মুসতাদরাক গ্রন্থেও হাদীছটি সংকলিত হইয়াছে)।

اَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ دَعَا اللّٰهَ اَنْ لاَ يَزَالَ فِىْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِىٌّ.

১২. "দাঊদ (আ) আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে, তিনি যেন অনবরত তাঁহার বংশধরগণের মধ্য হইতে নবী পাঠান" (তিরমিযী, তাফসীর সূরা ১৭, নং ৩০৮২)।

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَا مُوْسَى لَقَدْ اُعْطِيْتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ اٰلِ دَاوُدَ.

১২. আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ "হে আবূ মূসা! তোমাকে দাঊদ (আ) পরিবারের সুমধুর সুরসমূহের মধ্য হইতে একটি সুর দান করা হইয়াছে" (তিরমিযী, মানাকিব, বাব ১২৯, নং ৩৭৯২; বুখারী, ফাদাইলুল কুরআন, বাব ৩০, নং ৪৬৭৫; মুসলিম, ফাদাইলুল কুরআন, বাবা ২, নং ১৭২১, ১৭২২)।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে দাউদ (আ)

একমাত্র বাইবেল ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যায় না। বাইবেলের পুরাতন নিয়ম-এর কয়েকটি গ্রন্থে তাঁহার সম্পর্কে তথ্য বিদ্যমান। কিন্তু নতুন নিয়ম-এ শুধু এতটুকু বিবরণ আছে যে, হযরত ঈসা (আ) হযরত দাউদ (আ)-এর বংশধর (তু. মথির সুসমাচার, ১ ঃ ১; লুকের সুসমাচার, ৩ ঃ ২৩)। পুরাতন নিয়ম-এ কোন কোন বিষয়ে তাঁহার প্রশংসা বিদ্যমান থাকিলেও তাঁহার সহিত এমন কতিপয় নিন্দনীয় অপবাদ যুক্ত করা হইয়াছে যাহা তাঁহার সমস্ত অবদানকে মলিন করিয়া দেয়। দাঊদ (আ) সংক্রান্ত তথ্যাবলীর জন্য দ্র. বাইবেলের বংশাবলী-১; শমূয়েল-১ ও রাজাবলী-১)। ইসরাঈল জাতিকে যে সকল মহান নবী-রাসূল লাঞ্ছনা ও অপমানের আস্তাকুঁড় হইতে তুলিয়া সম্মান ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করাইয়াছিলেন, আজ তাহারা যে ঐতিহাসিক কীর্তি লইয়া গর্ব করে, তাহা তাহারা যে মহান ব্যক্তিগণের কল্যাণে লাভ করিয়াছে, ইয়াহূদীরা তাঁহাদের পূত-পবিত্র জীবনে কালিমা লেপন করিতে মোটেই কুণ্ঠাবোধ করে নাই। হযরত নূহ, ইবরাহীম, লূত, ইসহাক, ইয়াকূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূন (আ), এক কথায় কোন নবীই তাহাদের জঘন্যতম কুৎসা রটনা হইতে রেহাই পান নাই (বিস্তারিত দ্র. নূহ ঃ আদিপুস্তক, ৯ ঃ ২০-২৫; ইবরাহীম, ঐ, ১২ ঃ ১২; ২০ ঃ ১-৩; লূত ঃ ঐ, ১৯ ঃ ৩০-৮; ইসহাক ঃ ঐ, ২৬ ঃ ৭-১২; ইয়াকূব ঃ ঐ, ২৭ ঃ ১-২৫; ১৯ ঃ ১৬-২৯; ৩৪ ঃ সম্পূর্ণ; ৩৬ ঃ ২২; হারূন ঃ যাত্রাপুস্তক, ৩২ ঃ ১-২৪ ইত্যাদি)। তাহারা সর্বাধিক কুৎসা রটনা করিয়াছে হযরত দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর। তাহাদেরকে তাহারা নবীগণের কাতার হইতে মামুলি রাজা-বাদশাদের কাতারে নামাইয়া আনিয়াছে। মিথ্যাচার, ধোঁকাবাজি, দুর্নীতি, নিপীড়ন, ব্যভিচার ও শেরেকীর অপরাদ পর্যন্ত তাহাদের উপর আরোপ করা হইয়াছে (দ্র. ১ম রাজাবলী, ১১ ঃ ১-১০)।

পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খৃষ্টান লেখকগণও বাইবেল ও বাইবেলীয় সাহিত্যের কল্যাণে নবী-রাসূলগণের চরিত্র কলংকিত করিতে মোটেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। তাহারা নবী-রাসূলগণকে প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব (Genius) হিসাবে মূল্যায়ন করিলেও তাহাদের লেখায় তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের লেশমাত্রও লক্ষ্য করা যায় না। পৃথিবীর তাবৎ প্রতিভাধর ব্যক্তিগণ যেখানে সীমিত কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হইয়া থাকেন, উহার বিপরীতে নবী-রাসূলগণ প্রতিটি বিষয়ে যোগ্যতার শীর্ষদেশে অবস্থান করেন। তাঁহারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী, পরিচ্ছন্ন চিন্তায় সঞ্জীবিত, হীনতা-নীচতা হইতে পবিত্র, যাবতীয় মানবীয় গুণে সুশোভিত, তাঁহাদের চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানের উৎস ঊর্ধ্ব জগতের সহিত সংযুক্ত। কোনও নবী সম্পর্কে এইরূপ ধারণা করা যায় না যে, তিনি ভদ্রতা, সভ্যতা, সৌজন্য ও মনুষ্যত্বের দাবিসমূহ উপেক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা এমন কোনও কাজও সংঘটিত হওয়া সম্ভব নহে যাহা তাঁহার সম্মান, মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে কলংকিত করিতে পারে। তাঁহারা আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধানের ধারক ও বাহক, তাঁহাদের জীবন অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁহাদের গোপন ও প্রকাশ্য জীবন সবই উজ্জ্বল। তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবন তাঁহাদের আনীত পয়গামের সহিত সম্পূর্ণ সংগতিপূর্ণ।

কিন্তু পাশ্চাত্য লেখকগণ বাইবেল ও বাইবেল ভিত্তিক ধর্মীয় সাহিত্যের ভিত্তিতে নবী-রাসূলগণের মূল্যায়ন করিতে গিয়া তাঁহাদেরকে সাধারণ মানুষের পর্যায়ে নামাইয়া আনিয়াছেন এবং কোন কোন স্থানে নিকৃষ্টভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। বর্তমান কালের পাশ্চাত্য লেখকদের রচিত বিশ্বকোষসমূহেও তাহাদের এইরূপ আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। একটি বিশ্বকোষে হযরত দাঊদ (আ)-এর একটি কল্পিত বিবস্ত্র মূর্তিও স্থান পাইয়াছে (তু. Encyclopaedia of World Biograpy, vol. 3, p. 284-5; Ency. Britannica, vol. 5, p. 517-19; Encyclopedia of Religion, vol. 4, p. 242-45; Encylopedia Americana, vol. 8, p. 526-27)।

একমাত্র কুরআন মজীদই নবী-রাসূলগণের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ ও কলুষমুক্ত রাখিয়াছে, তাঁহাদের প্রকৃত মাহাত্ম ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে পরিচিত করিয়াছে। কুরআন মজীদ নাযিল না হইলে তাঁহাদেরকে নবী-রাসূল মান্য করা তো দূরের কথা, সম্মানের সহিত তাঁহাদের নামও উচ্চারিত হইত না। কুরআন ইয়াহূদী খৃস্টানদের দাঊদ (আ) সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সংশোধন করিয়া বলে যে, তিনি ছিলেন একজন মহান নবী এবং আল্লাহ তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধরের বর্ণনা প্রসঙ্গে দাঊদ ও সুলায়মান (আ)-এর উল্লেখ করিয়া কুরআন মজীদ বলেন ঃ

وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ

"আমি এভাবেই সৎকর্মপরায়ণদেরকে পুরস্কৃত করি" (৬ ঃ ৮৪)।

كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ

"তাহাদের সকলেই সৎকর্মপরায়ণ" (৬ ঃ ৮৫)।

وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعٰلَمِيْنَ.

"এবং (তাহাদের) প্রত্যেককে আমি বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছি" (৬ ঃ ৮৬)।

وَاجْتَبَيْنٰهُمْ وَهَدَيْنٰهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

"আমি তাহাদেরকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (৬ ঃ ৮৭)। اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ "আমি তাহাদেরকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছি" (৬ ঃ ৮৯)। اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰىهُمُ اقْتَدِهْ "তাহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। অতএব তুমি তাহাদের পথের অনুসরণ কর" (৬ ঃ ৯০)।

স্বেচ্ছাচারী জালূতের বিরুদ্ধে দাঊদ (আ)-এর জিহাদ

আল্লাহর নবী হযরত শামূঈল (আ)-এর খৃ. পূ. ১১০০-১০২০ অব্দে) নির্দেশে তৎকালনী শাসক তালূত (শাসনকাল খৃ. পূ. ১০২৮-১০১২ সাল) কর্তৃক অত্যাচারী শাসক জালূতের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয়, যাহা ইতিহাসে তালূত-জালূতের যুদ্ধ নামে খ্যাত। মুসলিম ঐতিহাসিকগণের বর্ণনায় এই যুদ্ধের যে বিবরণ পাওয়া যায় উহার বেশিরভাগই ইসরাঈলী রিওয়ায়াত ভিত্তিক। শুধু

তাহাই নহে, কুরআন ও সুন্নাহ্র বাহিরে হযরত দাউদ (আ) সম্পর্কিত প্রাপ্ত সমস্ত বিবরণের উৎস উহাই।

হযরত দাঊদ (আ) ছিলেন সুঠাম দেহের অধিকারী একজন বলিষ্ঠ যুবক। তিনি তখনও নবুওয়াত প্রাপ্ত হন নাই। তিনি এই যুদ্ধে জালূতকে হত্যা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। আনু. ১০২৮-১০১২ খৃ. পূ. অব্দের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া থাকিবে। কুরআন মজীদে এক স্থানেই এই যুদ্ধ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ مِنْ بَعْدِ مُوْسٰى اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْا قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالظّٰلِمِيْنَ۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا قَالُوْا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اٰيَةَ مُلْكِهٖ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ التَّابُوْتُ فِيْهِ سَكِيْنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ اٰلُ مُوْسٰى وَاٰلُ هٰرُوْنَ تَحْمِلُهُ الْمَلٰئِكَةُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهٖ فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ۔ وَلَمَّا بَرَزُوْا لِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ قَالُوْا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ۔ فَهَزَمُوْهُمْ بِاِذْنِ اللّٰهِ وَقَتَلَ دَاوٗدُ جَالُوْتَ وَاٰتٰهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهٗ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ۔ تِلْكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۔

"তুমি কি মূসার পরবর্তী বনী ইসরাঈল প্রধানদেরকে দেখ নাই? তাহারা যখন তাহাদের নবীকে বলিয়াছিল, আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করুন যাহাতে আমরা আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করিতে পারি। সে বলিল, ইহা তো হইবে না যে, তোমাদের প্রতি যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইলে তখন তোমরা আর যুদ্ধ করিবে না? তাহারা বলিল, আমরা যখন নিজস্ব আবাসভূমি ও স্বীয় সন্তান-সন্তুতি হইতে উচ্ছেদ হইয়াছি, তখন আল্লাহ্র পথে কেন যুদ্ধ করিব না! অতঃপর যখন তাহাদের উপর যুদ্ধের বিধান দেওয়া হইল, তখন তাহাদের স্বল্প সংখ্যক ব্যতীত সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। তাহাদের নবী তাহাদিগকে বলিয়াছিল, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের রাজা করিয়াছেন। তাহারা বলিল, আমাদের উপর তাহার রাজত্ব কিভাবে

হইবে, যখন আমরা তাহার তুলনায় রাজত্বের অধিক যোগ্য এবং তাহাকে প্রচুর ঐশ্বর্যও দেওয়া হয় নাই! নবী বলিল, আল্লাহ অবশ্যই তাহাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করিয়াছেন এবং তিনি তাহাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়। তাহাদের নবী তাহাদেরকে আরও বলিয়াছিল, তাহার রাজত্বের নিদর্শন এই যে, তোমাদের নিকট সেই তাবূত আসিবে যাহাতে (তোমাদের জন্য) তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে চিত্তপ্রশান্তি এবং মূসা ও হারূন বংশীয়গণ যাহা ত্যাগ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে তাহার অবশিষ্টাংশ থাকিবে, ফেরেশতাগণ ইহা বহন করিয়া আনিবে। তোমরা যদি মুমিন হও তবে অবশ্যই ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে। অতঃপর তালূত সৈন্যবাহিনীসহ বাহির হইল। সে তখন বলিল, আল্লাহ এক নদী দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করিবেন। যে কেহ উহা হইতে পান করিবে সে আমার দলভুক্ত নহে, আর যে কেহ উহার স্বাদ গ্রহণ করিবে না সে আমার দলভুক্ত, ইহা ছাড়া যে কেহ তাহার হস্তে এক কোষ পানি গ্রহণ করিবে সেও। অতঃপর অল্প সংখ্যক ব্যতীত তাহারা উহা হইতে পান করিল। সে এবং তাহার সঙ্গী ঈমানদারগণ উহা অতিক্রম করিবার পর বলিল, জালূত ও তাহার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত শক্তি আজ আমাদের নাই। কিন্তু যাহারা বিশ্বাস করিত যে, আল্লাহ্‌র সহিত তাহাদের সাক্ষাত ঘটিবে তাহারা বলিল, আল্লাহ্‌র হুকুমে কত ক্ষুদ্র দল কত বৃহৎ দলকে পরাভূত করিয়াছে! আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সহিত রহিয়াছেন। তাহারা যুদ্ধার্থে জালূত ও তাহার বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ধৈর্য দান কর, আমাদের পা অবিচলিত রাখ এবং কাফের সম্প্রায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য দান কর। সুতরাং তাহারা আল্লাহ্‌র হুকুমে ইহাদেরকে পরাভূত করিল, দাঊদ জালূতকে হত্যা করিল, আল্লাহ তাহাকে রাজত্ব ও প্রজ্ঞা দান করিলেন এবং যাহা তিনি ইচ্ছা করিলেন তাহা তাহাকে শিক্ষা দিলেন। আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আল্লাহ জগতসমূহের প্রতি অনুগ্রহশীল। এই সকল অল্লাহ্‌র আয়াত, আমি তোমাদের নিকট তাহা যথাযথভাবে তিলাওয়াত করিতেছি। নিশ্চয় তুমি রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত" (২ ঃ ২৪৬-২৫২)।

কুরআন মজীদের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তালূত ও জালূতের মধ্যকার যুদ্ধ হযরত মূসা (আ)-এর পরবর্তী সময়কার ঘটনা। ইসরাঈলী ইতিহাসের বর্ণনামতে তিনি খৃ. পূ. ১২৭২ সালে ইনতিকাল করেন (তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফ, ১০৪ নং আয়াতের ৮৫ নং টীকা)। আর তালূতের রাজত্বকাল ছিল খৃ. পূ. ১০২৮-১০১২ সাল (তাফসীরে মাজেদী, সূরা বাকারা, ২৪৭ নং আয়াতের ৯৩৬ নং টীকা)। অন্যদিকে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের এক হাজার বৎসরের অধিক কাল পূর্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় (তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, ২৪৬ নং আয়াতের ২৬৮ নং টীকা)। অতএব আমাদের কাল হইতে প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্বের এই ঘটনা। আমাদের যুগ হইতে দাঊদ (আ)-এর যুগ তিন হাজার বৎসর পূর্বে এবং মূসা (আ)-এর যুগ বত্রিশ-তেত্রিশ শত বৎসর পূর্বে। ইবন ইসহাকের মতে মূসা (আ) ও দাঊদ (আ)-এর মধ্যে ৫৬৯ বৎসরের ব্যবধান (মুসতাদরাক হাকেম, ২খ, পৃ. ৫৮৬)।

তালূতের রাজত্বকালে নবী ছিলেন হযরত শামূঈল (আ) এবং তিনিই আল্লাহ্‌র নির্দেশে তালূতকে বানী ইসরাঈলের শাসক নিয়োগ করেন। তাঁহার সময়কাল ছিল খৃ. পূ. ১১০০-১০২০ সাল (তাফসীরে মাজেদী, সূরা বাকারার ২৪৬ নং আয়াতের ৯৩০ নং টীকা)। অবশ্য কুরআন মজীদে এবং মহানবী (স)-এর হাদীছে তালূত প্রসঙ্গে একজন নবীর উল্লেখ আছে কিন্তু তাঁহার নাম বলা হয় নাই। বাইবেলে তিনি নবী হিসাবে স্বীকৃত এবং উহাতে তাঁহার নামে দুইটি গ্রন্থও অন্তর্ভুক্ত আছে (শমূয়েল-১ ও শমূয়েল-২)। তাঁহার নির্দেশক্রমেই তালূত স্বৈরাচারী জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। বস্তুত বনী ইসরাঈলের ধর্মীয় বিষয়াদির সহিত তাহাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তিও ছিলেন তাহাদের নবীগণ। এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

كَانَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَاِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِيْ وَسَيَكُوْنُ بَعْدِيْ خُلَفَاءُ.

"বনী ইসরাঈলের রাজনৈতিক কার্যক্রমও তাহাদের নবীগণ পরিচালনা করিতেন। একজন নবীর ইনতিকালের পর আরেকজন নবী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতেন। কিন্তু আমার পরে কোন নবী নাই। আমার পরে হইবে খলীফাগণ" (বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৫০, নং ৩১৯৭; মুসলিম, ইমারা, বাব ১২৭, নং ৪৬২০; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ২খ., পৃ. ২৯৭)।

মানবজাতির পার্থিব জীবনের অধিকাংশ আচরণ রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত। তাওহীদবাদী ধর্মে পার্থিব ও পরকালীন জীবন একই সূত্রে গাঁথা। এই ধর্মে মানুষের কোন আচরণই ধর্মের বিধান বহির্ভূত নহে। তাই নবীগণ কর্তৃক তাওহীদবাদীদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডও পরিচালিত হইত।

তালূত

তালূত ছিলেন ইউসুফ (আ)-এর সহোদর বিন্‌য়ামীনের বংশধর। তাঁহার বংশলতিকা নিম্নরূপ ঃ তালূত ইব্‌ন কীশ ইব্‌ন আনমার ইব্‌ন দিরার ইব্‌ন ইয়াহরাফ ইব্‌ন ইয়াফতাহ ইব্‌ন ঈশ ইব্‌ন বিন্‌য়ামীন ইব্‌ন ইয়া'কূব ইব্‌ন ইসহাক (আ) (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৫)। অন্যান্য গ্রন্থে প্রদত্ত বংশলতিকার সহিত ইহার কিছু গরমিল আছে (তু. আরাইস, পৃ. ২৮৫-৬; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩০৪; বাইবেলের ১ম শমূয়েল, ৯ ঃ ১-২)।

ইয়াহূদী ইতিহাসে তিনি তাহাদের প্রথম রাজা। তিনি দৈহিক গঠনে, শারীরিক সৌন্দর্যে, জ্ঞান-গরিমায় ও আত্মপ্রত্যয়ে এক বলিষ্ঠ দীর্ঘদেহী যুবক ছিলেন। বাইবেলের বর্ণনামতে ইসরাঈল সন্তানদের মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা সুন্দর কোন পুরুষ ছিল না এবং তিনি অন্য সকল লোকের তুলনায় এক মস্তক দীর্ঘ ছিলেন (১ম শমূয়েল, ৯ ঃ ২ ও ১০ ঃ ২৩)।

ইসরাঈলীদের নিকট দীর্ঘদেহী হওয়া ছিল একটি বিশেষ গুণ এবং ইহা ছিল নেতৃপদে বরিত হওয়ার জন্যও অপরিহার্য। তাওরাতের পর ইয়াহূদীদের পবিত্রতম লিপি হচ্ছে তালমূদ। তাহাতে

আছে, আল্লাহ তাঁহার প্রশান্তি এমন ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ করেন, যে ধীমান, মজবুত তনু, বিত্তবান ও দীর্ঘদেহী (Everyman's Talmud, পৃ. ১২৮-এর বরাতে তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৪৭৮)। একদল গবেষকের মতে কুরআন মজীদের 'তালূত' শব্দটি طولوت ছিল, যাহা طول (দৈর্ঘ্য) হইতে নির্গত। হিব্রু ভাষায় তালূতের নাম শাওল (বাইবেলে শৌল), দীর্ঘদেহী হওয়ায় নাম হইল তালূত (মা'আলিমুত-তানযীল)। অপর মতে আরবী طول শব্দ হইতে নামটির উৎপত্তি এবং উহা আসলে ছিল طولوت (রূহুল মা'আনী)।

বাইবেলের 'শমূয়েল' গ্রন্থে তাঁহার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত বিস্তারিত বর্ণনা আছে। যেমন, শৌলের (তালূতের) উপস্থিত হইবার এক দিবস পূর্বে সদাপ্রভু শমূয়েলের কর্ণগোচরে প্রকাশ করিলেন যে, কল্য এমন সময়ে আমি বিন্যামিন প্রদেশ হইতে একজন লোককে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। তুমি তাহাকে আমার প্রজা ইসরাঈলের নায়ক করিবার জন্য অভিষেক করিবে। সে ফিলিস্তীনীদের কবল হইতে আমার প্রজাদিগকে নিস্তার করিবে....। পরে শমূয়েল শৌলকে দেখিলে সদাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন, দেখ এই সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয় আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম। সেই আমার প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব করিবে (১ম শমূয়েল, ৯ ঃ ১৫-১৬)।

যেখানে ইসরাঈলীরা শমূয়েল (আ)-এর নিকট তাহাদের একজন শাসক নিয়োগের আবেদন করিল এবং তৎপ্রেক্ষিতে তিনি তালূতকে আল্লাহ্র নির্দেশমত তাহাদের শাসক নিয়োগ করিলেন, সেখানে তাঁহার বিরুদ্ধে তাহাদের আপত্তি উত্থাপনের কারণ কি? বনূ ইসরাঈলের বারটি গোত্রের মধ্যে দুইটি বিশেষ গোত্র ছিল ঃ লাওয়া (লেবি) বংশীয়গণের ছিল নবুওয়াত প্রাপ্তির বিশেষ অধিকার এবং যিহূদা (ইয়াহূদা) বংশীয়গণের ছিল রাজত্ব ও সেনাপতিত্ব প্রাপ্তির বিশেষ অধিকার। তালূত এই দুই বংশ বহির্ভূত একটি ক্ষুদ্র গোত্রের লোক ছিলেন। বলা বাহুল্য বার গোত্রের মধ্যে বিন্য়ামীন গোত্র ছিল সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও অখ্যাত (ইব্ন জারীর তাবারীর বরাতে তাফসীরে মাজেদী, ১খ, পৃ. ৪৭৬-৪৭৭; ছা'লাবীর কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৮৬; বিদায়া, বালাম ১,. খ.২, পৃ. ৯; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৫; তু. বাইবেল, ১ম শমূয়েল, ৯ ঃ ২১)। কুরআন মজীদেও বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা তালূতকে তাহাদের শাসক নিয়োগ করিয়াছিলেন (তু. ২ ঃ ২৪৭)।

জালূত

এক ফিলিস্তীনী বীর যোদ্ধা। বাইবেলে তাহার নাম গলিয়াত, গাত-নিবাসী, সাড়ে ছয় হাত দীর্ঘ, মস্তকে পিতলের শিরস্ত্রাণ, সর্বদেহ পিতলের বর্মে সজ্জিত (তু. ১ম শমূয়েল, ১৭ ঃ ৪-৬)। দেখিতে মানুষ নহে যেন একটি দৈত্য, ইয়াহূদীদের প্রতিপক্ষ পথভ্রষ্ট ফিলিস্তীনী পৌত্তলিকদের নেতা। কুরআন মজীদে তিনবার তাহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে (তু. ২ ঃ ২৪৯, ২৫০, ১৫১)।

তাবূত

কুরআন মজীদের দুই স্থানে 'তাবূত' শব্দটি উল্লিখিত হইয়াছে (তু. ২ ঃ ২৪৮ এবং ২০ ঃ ৩৯), অর্থ সিন্দুক। ২ ঃ ২৪৮ আয়াতে উদ্ধৃত তাবূত বলিতে সেই "প্রশান্তির সিন্দুক" (Ark of the Covenant)-কে বুঝানো হইয়াছে যাহা বাইবেলে সদাপ্রভুর নিয়ম-সিন্দুক নামে উল্লেখিত হইয়াছে

(তু. ১ম শমূয়েল, ৪ ঃ ৩)। ইহা ছিল ইয়াহূদীদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, মহামূল্যবান ও অতি পবিত্র ধর্মীয় ও জাতীয় উত্তরাধিকারের স্মৃতিবাহী ঐতিহ্য। ইহার মধ্যে তাওরাতের মূল লিপি, মূসা ও হারূন (আ) ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মৃতিবাহী জিনিসপত্র, যেমন মু'জিযার লাঠি, মান্ন ইত্যাদি সংরক্ষিত ছিল। ইয়াহূদীরা ইহাকে তাহাদের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাই তাহারা স্বদেশে, প্রবাসে, যুদ্ধে সব সময় ইহাকে নিজেদের সঙ্গে রাখিত।

এক যুদ্ধে ফিলিস্তীনী পৌত্তলিকরা ইসরাঈলীদিগকে পরাভূত করিয়া সিন্দুকটি হস্তগত করে এবং ইহাকে তাহাদের দাজূন দেবতার মন্দিরে রাখিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রতি রাত্রে দেবমূর্তিটি উল্টাইয়া পড়িয়া থাকিত। তাহারা সিন্দুকটি যে জনপদেই রাখিত সেখানেই মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটিত। অবশেষে তাহারা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়িতে স্থাপন করিয়া উহাকে চালকহীনভাবে ইসরাঈলীদের বসতির দিকে হাঁকাইয়া দেয়। আল্লাহ্র হুকুমে ফেরেশতাগণ গাড়িটিকে হাঁকাইয়া ইয়াহূদীদের জনপদে লইয়া আসে। নবী সমূয়েল (আ) কর্তৃক তালূতকে শাসক নিয়োগকালে এই ঘটনা ঘটে।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর (মৃ. ৯৩৩ খৃ. পূ.) যুগ পর্যন্ত ইহা ইয়াহূদীদের অধিকারে থাকে। হায়কালে সুলায়মানী (সৌধ বা মিনার) নির্মাণের পর সিন্দুকটি সেখানে স্থাপন করা হইয়াছিল। অতঃপর ইহার আর কোনও ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইয়াহূদীদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাসমতে ইহা এখনো হায়কালে সুলায়মানীর ভিত্তিমূলের কোথাও সমাহিত আছে (মাআরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত সং, ২ ঃ ২৪৮ নং আয়াতের টীকা; তাফসীরে মাজেদী, ১খ, পৃ. ৪৭৯, টীকা ৯৪৩; তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারার ২৪৮ আয়াতের ২৭০ নং টীকা; তারীখুল কালিম, ১খ, পৃ. ১৬৫, টীকা ৫; বিদায়া, ২খ, পৃ.৭; তু. বাইবেল, ১ম শমূয়েল, ৪ ঃ ১-১১; ৫ ঃ...; Encyclopaedia Amerieana, vol. i. See Ark.)।

২০ ঃ ৩৯ আয়াতে তাবূত বলিতে মূসা (আ)-এর জন্মের পর তাঁহাকে যে বাক্সে ভর্তি করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই বাক্সকে বুঝানো হইয়াছে।

নদী অতিক্রমণ

তালূত বাহিনীকে যে নদী পার হইতে হইয়াছিল এবং যাহার পানি পান করিতে তাহাদেরকে নিষেধ করা হইয়াছিল, তাহা কোন্ নদী সেই বিষয়ে মতভেদ আছে। ইহা বর্তমানের জর্দান নদী অথবা ইহার কোন শাখা-নদী বা ফিলিস্তীন নদী (বিদায়া, ২ খ, পৃ. ৮; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৬; তাফহীমুল কুরআন, ২ ঃ ২৪৯ আয়াতের ২৭১ নং টীকা; তাফসীরে মাজেদী, ১খ, পৃ. ৪৮১, টীকা ৯৪৮)। নদীটি তত বড় নহে, সোজা মাপে পঁয়ষট্টি মাইল এবং বাঁকসহ দুই শত মাইল প্রায়। নদীটি উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত এবং পথিমধ্যে গালীল হ্রদ ও তাবারিয়া উপসাগর অতিক্রম করিয়া মৃত সাগরে পতিত হইয়াছে। উৎপত্তি স্থানের দিকে ইহার পানি স্বচ্ছ, পরিচ্ছন্ন ও মিষ্ট হইলেও মোহনার দিকের পানি ঘোলা, দুর্গন্ধময় ও ক্ষতিকর (তাফসীরে মাজেদী, ১খ, পৃ. ৪৮১)।

যুদ্ধের ঐতিহাসিক পটভূমি

হযরত মূসা (আ) ইসরাঈলীদেরকে ফিরআওনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া পবিত্র ভূমিতে (জেরুসালেম) লইয়া আসার পর স্বল্প কালের মধ্যে ইনতিকাল করেন। তাহারা তাওরাতের পথনির্দেশ ভুলিয়া যাইতে থাকে। তাহারা ফিলিস্তীনের সমগ্র এলাকা দখল করিবার পর উহাকে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিবর্তে বারোটি গোত্রের মধ্যে বণ্টন করিয়া লয়। ক্রমান্বয়ে তাহারা গোত্রীয় বিবাদে লিপ্ত হইতে থাকে। ফলে তাহারা ঐসব এলাকার পৌত্তলিকদিগকে সমূলে উৎখাত করিতে কখনও সক্ষম হয় নাই। তাহারা পৌত্তলিকদের সহিত একত্রে বসবাস করিতে থাকে এবং তাহাদের শিরকী রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হইতে থাকে। এই ক্ষেত্রে বাইবেলের নিম্নোক্ত বিবরণ লক্ষণীয় ঃ

"ইসরাঈল সন্তানগণ সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে যাহা মন্দ, তাহাই করিতে লাগিল এবং বাল দেবগণের সেবা করিতে লাগিল। আর যিনি তাহাদের পিতৃপুরুষগণের প্রভু, যিনি তাহাদেরকে মিস্র দেশ হইতে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন, সেই সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবগণের অর্থাৎ আপনাদের চতুর্দিকস্থিত লোকদের দেবগণের অনুগামী হইয়া তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিতে লাগিল, এইরূপে সদাপ্রভুকে অসন্তুষ্ট করিল। তাহারা সদাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া বাল দেবের ও অষ্টারোত দেবীদের সেবা করিত। তাহাতে ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সদাপ্রভুর ক্রোধ প্রজ্বলিত হইল। তিনি তাহাদেরকে লুণ্ঠনকারীদের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তাহারা তাহাদের দ্রব্য লুট করিল। আর তিনি তাহাদের চতুর্দিকস্থ শত্রুগণের হস্তে তাহাদেরকে বিক্রয় করিলেন, তাহাতে তাহারা আপন শত্রুদের সম্মুখে আর দাঁড়াইতে পারিল না" (বিচারকগণের বিবরণ, ২ ঃ ১১-১৪)।

একদিকে ইয়াহূদীরা পথভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, অপরদিকে ফিলিস্তীনী পৌত্তলিকরা ও তাহাদের মিত্ররা ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে পরিণত হইতে থাকে। তাহারা সম্মিলিত আক্রমণের মাধ্যমে একের পর এক ইয়াহূদীদের দখলভুক্ত এলাকা কুক্ষিগত করিতে থাকে। অবশেষে তাহারা ইয়াহূদীদের প্রশান্তির সিন্দুকটি পর্যন্ত তাহাদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া যায়। তাহারা চরম লাঞ্ছিত অবস্থায় পতিত হয়।

এই অবস্থায় তাহাদের বোধোদয় হইল যে, একজন শাসকের অধীনে তাহাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত জরুরী। সমসাময়িক নবী হযরত শামূঈল (আ)-এর নিকট তাহাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি তালূতকে তাহাদের শাসক নিয়োগ করেন (তাফহীমুল কুরআন, ১৭ ঃ ৫ আয়াত সংশ্লিষ্ট ৭ নং টীকা দ্র.)। কুরআন মজীদে এই কথাই বলা হইয়াছে ঃ "তাহারা যখন তাহাদের নবীকে বলিল, আমাদের জন্য একজন শাসক নিযুক্ত করুন.... তাহাদের নবী তাহাদেরকে বলিলেন, আল্লাহ অবশ্যই তালূতকে তোমাদের শাসক করিয়াছেন" (২ ঃ ২৪৬-৭)।

নবী (আ) কর্তৃক তালূত শাসক নিযুক্ত হওয়ার পরপরই তিনি জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের প্রস্তুতি শুরু করেন। ইত্যবসরে আল্লাহ্র অনুগ্রহে 'তাবূত' (শান্তির সিন্দুক)-ও তাঁহার ও সঙ্গীগণের

হস্তগত হইয়া যায়। ফলে তাহাদের মনোবলও বৃদ্ধি পায় এবং যুদ্ধে যোগদানের জন্য তাহারা উদগ্রীব হইয়া পড়ে (দ্র. ২ ঃ ২৪৬)। আল্লাহ্ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে নবীকে জানাইয়া দিলেন যে, বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, অন্ধ এবং যাহাদের বাস্তবিকই গ্রহণযোগ্য কোন ওজর আছে তাহারা যুদ্ধে গমন করিবে না। যুদ্ধে যোগদানের জন্য তালূত ও তাঁহার বাহিনী সমবেত হইল। তাহারা প্রখর রৌদ্রতাপ ও পানির স্বল্পতা সম্পর্কে অভিযোগ করিলে তালূত তাহাদের জানাইয়া দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাহাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। নদী অতিক্রমকালে কেহ উহার পানি পান করিতে পারিবে না, এক-দুই আঁজলা ব্যতীত (দ্র. ২ ঃ ২৪৯)। কিন্তু সেনাপতির নির্দেশ অমান্য করিয়া অধিকাংশ সৈন্য উদর পূর্তি করিয়া পানি পান করে এবং নদী অতিক্রম করার পর তাহারা যুদ্ধ করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। তাহারা তালূতকে জানাইয়া দিল যে, জালূত ও তাহার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সামর্থ্য তাহাদের নাই (দ্র . ২ ঃ ২৪৯)। কিন্তু যাহারা আল্লাহ্র সহিত সাক্ষাতে বিশ্বাসী ছিল তাহারা বলিল, কত ক্ষুদ্র বাহিনী কত বৃহৎ বাহিনীকে আল্লাহ্র হুকুমে পরাভূত করিয়াছে। তালূতের স্বল্প সংখ্যক সৈন্য জালূত ও তাহার বাহিনীর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইয়া আল্লাহ্র নিকট দো'আ করিল। আল্লাহ যেন তাহাদেরকে ধৈর্য দান করেন, তাহাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচল রাখেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেন (দ্র. ২ ঃ ২৪৯-২৫০)।

তাফসীরকার সুদ্দী (র) বলেন যে, তালূত আশি হাজার সৈন্যসহ যুদ্ধে রওয়ানা করেন, ইহাদের মধ্যে ছিয়াত্তর হাজার সেনাপতির আদেশ অমান্য করিয়া উদর পূর্তি করিয়া নদীর পানি পান করে এবং অবশিষ্ট থাকে মাত্র চার হাজার (বিদায়া, ২খ., পৃ.৮; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৬; আরাইস, পৃ. ২৯০)। এই পর্যায়ে হাদীছ গ্রন্থাবলীতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবী হযরত বারাআ ইব্ন আযিব (রা)-র একটি বক্তব্য পাওয়া যায় ঃ

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَتَحَدَّثُ اَنَّ عِدَّةَ اَصْحَابِ بَدْرٍ عَلٰى عِدَّةِ اَصْحَابِ طَالُوْتَ الَّذِيْنَ جَاوَزُوْا مَعَهُ النَّهْرَ وَلَمْ يُجَاوِزْ مَعَهُ اِلاَّ مُؤْمِنٌ بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلاَثَ مِائَةٍ .

"বারাআ (রা) বলেন, আমরা মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণ পরস্পর আলোচনা করিতাম যে, বদর যুদ্ধে যোগদানকারী সাহাবীগণের সংখ্যা ছিল তালূতের সহিত নদী অতিক্রমকারীগণের অনুরূপ তিন শত দশজনের অধিক। কেবল ঈমানদারগণই তাঁহার সহিত নদী পার হইয়াছিল" (বুখারী, ৪খ, মাগাযী, বাব ৪, নং ৩৬৬৭, ৩৬৬৮, আরো দ্র. নং ৩৬৬৬; তিরমিযী, ৩খ, সিয়ার, বাব ৩৭, নং ১৫৪৫; ইব্ন মাজা, জিহাদ, বাব ২৫, নং ২৮২৮)।

• কুরআন মজীদের বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তালূত বাহিনীর সকলেই ছিল মুমিন মুসলমান (দ্র. ২ ঃ ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯ ইত্যাদি)। ২৪৯ নং আয়াতে তো পরিষ্কারই বলা হইয়াছে ঃ "সে এবং তাহার সঙ্গী ঈমানদারগণ যখন উহা অতিক্রম করিল..."। মুফতী শফী (র) বলেন যে, 'রূহুল মা'আনী'তে উদ্ধৃত ইব্ন আব্বাস (রা)-র রিওয়ায়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তালূত বাহিনীতে তিন শ্রেণীর মুমিন ছিলেনঃ একদল দুর্বল মুমিন, যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন

নাই। দ্বিতীয় শ্রেণী পূর্ণ মুমিন যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন ঠিকই কিন্তু নিজেদের সংখ্যা-স্বল্পতার দুশ্চিন্তায় ভুগিয়াছিলেন এবং তৃতীয় শ্রেণী ছিলেন পূর্ণ মুমিন যাহারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন এবং নিজেদের সংখ্যাস্বল্পতার দুশ্চিন্তার শিকার হন নাই (মাআরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা সৌদী সংস্করণ, পৃ. ১৩৬)।

ঈমানদার সৈন্যবাহিনীকে সব যুগেই এইরূপ কাঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। কারণ সামরিক অভিযানের মত বিপদসংকুল ও জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ আর কোন তৎপরতা নাই। তাই এখানে ধৈর্য ও মনোবলের প্রয়োজন সর্বাধিক। বদরের যুদ্ধেও মুসলমানরা নিজেদের সৈন্য সংখ্যার স্বল্পতা ও কাফের সৈন্যদলের সংখ্যাধিক্যে সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন। তাহাদেরকে অভয় দান করিয়া মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَابِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ۔

"তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল থাকিলে তাহারা দুই শতজনের উপর বিজয়ী হইবে ....." (৮ ঃ ৬৫)।

বাইবেলেও নদী দ্বারা তালূত বাহিনীর সৈন্যদিগকে পরীক্ষা করার কথা আছে। যেমন, "তুমি তাহাদেরকে লইয়া ঐ পানির কাছে নামিয়া যাও। সেখানে আমি তোমার জন্য তাহাদের পরীক্ষা লইব ....। পরে তিনি লোকদেরকে পানির নিকট লইয়া গেলে সদাপ্রভু গিদিওনকে বলিলেন, যে কেহ কুকুরের ন্যায় জিহ্বা দ্বারা পানি চাটিয়া পান করে তাহাকে, যে কেহ পানি পান করিবার জন্য হাঁটুর উপরে উবুড় হয়, তাহাকে পৃথক করিয়া রাখ। তাহাতে সংখ্যায় তিন শত লোক মুখে অঞ্জলি তুলিয়া পানি চাটিয়া খাইল ... এই যে তিন শত লোক পানি চাটিয়া খাইল, ইহাদের দ্বারা আমি তোমাদেরকে নিস্তার করিব" (বিচারক, ৭ ঃ ৪-৭)।

পরিশেষে বাধ্য হইয়া তালূত সসৈন্যে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা নবী শামূঈল (আ)-কে জানাইয়া দেন যে, বনূ ইসরাঈলে দাউদ নামে যিশয়ের এক পুত্র আছে। তাহার হস্তেই জালূত নিহত হইবে। শামূঈল (আ) ওহীর মাধ্যমে ইহা অবগত হইয়া যুদ্ধযাত্রার পূর্বে দাউদ (আ) ও তাঁহার অপর ভ্রাতাগণকে তালূত বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করিলেন। এদিকে দাউদ (আ)-ও মাঠে তাঁহার পিতার মেষপাল চরাইবার কালে অদৃশ্য হইতে শব্দ শুনিতে পান, তুমি জালূতের হন্তা, এখানে কি করিতেছ! তুমি মেষপাল তোমার প্রতিপালকের যিম্মায় ত্যাগ করিয়া তালূত বাহিনীতে যোগদান কর। তালূত জালূতের হত্যাকারীর জন্য নিজ সম্পত্তির অর্ধেক এবং নিজ কন্যাকে তাহার সহিত বিবাহ দেওয়ার ঘোষণা দিয়াছে। তিনি এই অদৃশ্য বাণী শ্রবণ করিয়া তালূত বাহিনীতে যোগদান করিতে রওয়ানা হইয়া যান এবং পথিমধ্যে জালূতকে হত্যা করার তিন খণ্ড পাথর প্রাপ্ত হন (তাহ্যীব তা'রীখ দিমাশ্‌ক, ৫খ., পৃ. ১৯০-৯১)।

জালূতের সঙ্গে ছিল বিশাল বাহিনী, আর তালূতের সঙ্গে ছিল একটি নগণ্য ক্ষুদ্র বাহিনী। জালূত এই ক্ষুদ্র বাহিনী লক্ষ্য করিয়া তাচ্ছিল্য ও দাম্ভিকতার সহিত তালূতকে মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইতে

আহবান জানাইল। কিন্তু তালূত বাহিনীর কেহই তাহার মুকাবিলায় অবতীর্ণ হইতে সাহস করিল না। হযরত দাঊদ (আ) এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া জালূতের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে রণক্ষেত্রে ঝাপাইয়া পড়িলেন এবং সেই আশ্চর্য পাথর নিক্ষেপ করিয়া মুহূর্তের মধ্যে জালূতকে হত্যা করিয়া তাহার দম্ভ চূর্ণ করিয়া দিলেন। সেনাপতির মৃত্যুতে জালূত বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল এবং তালূত বাহিনী আল্লাহ্র হুকুমে বিজয়ীর বেশে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিল। এই ঘটনায় দাঊদ (আ) সমগ্র ইসরাঈলী জাতির নিকট মহাবীররূপে খ্যাতি লাভ করিলেন এবং তাহাদের প্রিয়পাত্র হইলেন। তালূত তাঁহার কন্যাকে দাঊদ (আ)-এর সহিত বিবাহ দিলেন, অবশেষে তিনিই গোটা ইসরাঈল জাতির শাসক হইলেন" (তু. তাহ্যীর তা'রীখ দিমাশ্ক, ৫খ., পৃ. ১৯১; আত-তা'রীখুল কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৬-৭; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৮-৯)।

কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, দাঊদ (আ) অপরিচিত ব্যক্তি হিসাবেই এই যুদ্ধে যোগদান করেন, এমনকি তালূতও তাঁহার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শনের মাধ্যমেই তিনি পরিচিত হইয়া উঠেন (তাফহীমুল কুরআন, ২ ঃ ২৫১ আয়াতের ২৭৩ নং টীকা)। পূর্বোক্ত বর্ণনার সহিতও বাইবেলের বর্ণনার মিল পরিলক্ষিত হয় (তু. ১ম শমূয়েল, ১৬ ঃ ১-২৩; ১৭ ঃ ১-৫৪)।

এই যুদ্ধের বর্ণনার সমাপ্তি পর্যায়ে কুরআন মজীদ একটি ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে তুলিয়া ধরিয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ "আল্লাহ্ যদি এইভাবে মানুষের এক দলকে অপর দল দ্বারা দমন না করিতেন তবে পৃথিবী বিপর্যস্ত হইয়া যাইত, কিন্তু আল্লাহ জগতবাসীর প্রতি বড়ই অনুগ্রহশীল" (২ ঃ ২৫১)। অর্থাৎ মানব সমাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা এই স্থায়ী নিয়ম করিয়া দিয়াছেন যে, তিনি বিভিন্ন মানব দলকে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত আধিপত্য ও শক্তি-সামর্থ্য লাভের সুযোগ দান করেন। কিন্তু কোন দল যখন সেই সীমা লংঘন করিতে থাকে তখন অপর এক মানবদল দ্বারা উহার শক্তি চূর্ণ করিয়া দেন। অতএব জালূত তাহার সীমা লংঘনের কারণে সদলে তালূত বাহিনী দ্বারা ধ্বংস হইয়াছে। একইভাবে মক্কার মুশরিকরা মহানবী (স) ও মুসলমান-গণকে অন্যায়ভাবে তাহাদের আবাসভূমি হইতে উচ্ছেদ করিলে আল্লাহ্ তা'আলা নির্যাতিত মুসলমানদেরকে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অনুমতি দান করিয়া একই ঐতিহাসিক সত্য তুলিয়া ধরেনঃ

وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوَاتٌ وَّمَسٰجِدُ ·

"আল্লাহ্ যদি মানবজাতির একদল দ্বারা অন্য দলকে প্রতিহত না করিতেন, তাহা হইলে বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হইত খৃস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনা স্থান, গির্জা, উপাসনালয় ও মসজিদসমূহ" (২২ ঃ ৪০)।

অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা কায়েম না থাকিলে সবলেরা দুর্বলদেরকে গ্রাস্ করিয়া ফেলিত।

যুদ্ধ-পরবর্তী যেসব ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনা, বিশেষত ছা'লাবীর কাসাসুল আম্বিয়ায়, বিধৃত হইয়াছে, সেই সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে কোন বর্ণনা বা ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। এইসব বিবরণ

সম্পূর্ণরূপে বাইবেল হইতে লওয়া হইয়াছে। কারণ যুদ্ধ-পরবর্তী তালূত-দাঊদ সম্পর্কের উত্থান-পতন ও অবনতির যে বিবরণ কাসাস গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা বাইবেলের বিবরণের অনুরূপ। দাঊদের নিকট তালূতের কন্যার বিবাহ, দাঊদকে তালূতের রাজ্যের অর্ধেক দান, দাঊদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় তালূতের ঈর্ষান্বিত হওয়া এবং ইহার পরিণতিতে দাঊদকে হত্যার ষড়যন্ত্র, তাহাতে অকৃতকার্য হওয়া, দাঊদের নিকট তালূতের ক্ষমা প্রার্থনা ইত্যাকার সকল ঘটনার বিবরণ বাইবেল ভিত্তিক (দ্র. ১ম শমূয়েল, অধ্যায় ১৮-২৮)।

নবুওয়াত ও রিসালাত লাভ

নবী-রাসূলগণের জীবনেতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, তাঁহারা ছোটবেলা হইতেই এক বিশেষ স্বভাবের অধিকারীরূপে বর্দ্ধিত হইতে থাকেন। তাহাদেরকে কেন্দ্র করিয়া নানারূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে থাকে। হযরত দাঊদ (আ)-এর শৈশব জীবনেও এইরূপ অলৌকিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। একদা তিনি তাঁহার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, হে পিতা! আমি অদ্য রজনীতে স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি, বাঘের পৃষ্ঠে চড়িয়া যাইতেছি। ইহা একটি অনুগত পশুর ন্যায় আমাকে লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। আমার মনেই হইল না যে, আমি বাঘের পিঠে আরোহী। আমি উহাকে আমার যে দিকে ইচ্ছা হাঁকাইতে থাকিলাম। তাঁহার পিতা স্বপ্নের বর্ণনা শুনিয়া বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা শত্রুদের পক্ষের কোন বীর যোদ্ধাকে তোমার করায়ত্ত করিবেন (আল-আরাইস, পৃ. ২৯১; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৬)। তিনি আরো একটি ঘটনা বিবৃত করিয়া বলিলেন, হে পিতা! অদ্য আমি একটি পাহাড়ের মধ্য দিয়া গমনকালে অস্পষ্ট আওয়াজে আল্লাহ্র যিকির করিতেছিলাম। হঠাৎ আমার কানে একটি লঘু আওয়াজ ভাসিয়া আসিল। আমি লক্ষ্য করিলাম যে, উক্ত এলাকার পাহাড়সমূহ আমার সহিত তাসবীহ পাঠ করিতেছে। তাঁহার পিতা বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা তোমার মর্যাদা বাড়াইয়া দিবেন (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৬; আরাইস, পৃ. ২৯১)।

যুদ্ধে যোগদানের জন্য হযরত দাঊদ (আ) শামূঈল (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহার জীবনের আশ্চর্যজনক ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্র নবী! একদা আমি পথ অতিক্রম করিতেছিলাম। একটি প্রস্তর আমাকে বলিল, হে দাঊদ! আমি এককালে কিছুক্ষণ হযরত মূসা (আ)-এর ভ্রাতা হারূন (আ)-এর হাতে ছিলাম। তিনি আমাকে তাঁহার শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া অহাকে বধ করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে তুলিয়া আপনার সঙ্গে রাখিয়া দিন, হয়ত আপনারও কোন কাজ সিদ্ধ হইতে পারে। আমি উহাকে তুলিয়া আমার থলির মধ্যে রাখিয়া দেই। অনুরূপভাবে আর একদিন পথ অতিক্রমকালে একটি পাথর আমাকে বলিল, হে দাঊদ! আমি এক সময় হযরত মূসা (আ)-এর হাতে ছিলাম। আমি তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার এক চরম শত্রুকে ধ্বংস করিয়াছি। হয়ত আমি আপনারও কোনও কাজে লাগিতে পারি। অতএব আমি পাথরটিকে তুলিয়া লইলাম। আর এক দিন এক খণ্ড পাথর আমাকে ডাকিয়া বলিল, হে দাঊদ! তোমাকে এক সময় স্বৈরাচারী জালূতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইবে। তুমি আমাকে তুলিয়া রাখিয়া দাও। আমার

তীব্র আঘাতে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তখন আমি উক্ত পাথরটিও তুলিয়া লইলাম। অতঃপর এই তিন টুকরা পাথর আল্লাহ্‌র কুদরতে একটি পাথরে পরিণত হইয়াছে (তাহ্‌যীব তা'রীখ দিমাশ্‌ক, ৫খ, পৃ. ১৯১; বিদায়া, ২খ, পৃ. ৯; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৬; আরাইস, পৃ. ২৯২)। আল্লাহ তা'আলা শামূঈল (আ)-কে জানাইয়া দেন যে, দাউদ (আ) তাঁহার পরে নবী হইবেন (আরাইস, পৃ. ২৯১)। মূসা (আ)-এর মত দাউদ (আ)-ও মেষপাল চরাইয়াছিলেন (প্রত্যেক নবীই মেষ চরাইয়াছেন, এই সংক্রান্ত হাদীছের জন্য দ্র. বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাব ২, নং ২১০২; তু. আম্বিয়া, বাব ২৯, নং ৩১৫৫; মুওয়াত্তা, কিতাবুল জামে, বাব মা জাআ ফী আমরিক গানাম)।

ইয়াহূদী-খৃস্টান সম্প্রদায় হযরত দাউদ (আ)-কে প্রত্যক্ষভাবে মর্যাদা না দিলেও বাইবেলের বর্ণনা হইতে তাঁহার নবুওয়াত প্রমাণিত হয়। বাইবেল বলে ঃ "তৎপর দাউদ সদাপ্রভুর কাছে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি যিহূদার কোন এক নগরে উঠিয়া যাইব? সভাপ্রভু কহিলেন, যাও। পরে দাউদ জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইব? তিনি কহিলেন, হেব্রোনে" (২য় শমূয়েল, ২ ঃ ১)। এইরূপ আরো উদ্ধৃতি শমূয়েল, গীতসংহিতা ও হিতোপদেশ গ্রন্থে বিদ্যমান আছে।

কুরআন মজীদে তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তি সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান। "আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেমন নূহ্ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম.... এবং দাউদকে যাবূর দান করিয়াছি" (৪ ঃ ১৬৩; আরও দ্র. ২নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আয়াতসমূহ)।

যাবূর কিতাবের বিবরণ

নবুওয়াতের নিদর্শনস্বরূপ হযরত দাউদ (আ)-কে প্রধান চারখানি আসমানী কিতাবের অন্তর্ভুক্ত যাবূর কিতাব দান করা হয়। হযরত জাবির (রা) হইতে বর্ণিত এক হাদীছে আছে, রমযান মাসের ১২ তারিখ যাবূর কিতাব অবতীর্ণ হয়।

ওয়াছিলা ইবনুল আসকা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, ইবরাহীম (আ)-এর সহীফাসমূহ রমযানের ১ম রাত্রিতে, তাওরাত ৬ষ্ঠ রাত্রিতে, ইন্‌জীল ১৩শ রাত্রিতে এবং কুরআন ২৪তম রাত্রিতে অবতীর্ণ হয় (ইবুন কাছীর, তাফসীর, ১খ, পৃ. ২১৬)।

যাবূর-এর শাব্দিক অর্থ পারা, খণ্ড, লিখিত কিতাব, পারিভাষিক অর্থে হযরত দাউদ (আ)-এর উপর নাযিলকৃত কিতাব। অভিধান গ্রন্থাবলীতে কেহ কেহ ইহাকে হিব্রু শব্দ বলিয়া দাবি করিলেও ইহা আরবী ভাষার একটি আদি শব্দ। কারণ হিব্রু ভাষায় 'যাবূর' নামে কোন শব্দ নাই। কুরআন মজীদে দাউদ (আ)-এর যাবূরসহ আসমানী কিতাব (সহীফা) বুঝাইতে শব্দটি (এক ও বহু বচনে) ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ৩ ঃ ১৮৪; ৪ঃ ১৬৩; ১৬ ঃ ৪৪; ১৭ ঃ ৫৫; ২১ ঃ ১০৫; ২৬ ঃ ১৯৬; ৩৫ ঃ ২৫, ৫৪ ঃ ৪৩); অবশ্য কয়েক স্থানে ভিন্নার্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে (দ্র. ১৮ ঃ ৯৬; ২৩ ঃ ৫৩; ৫৪ ঃ ৫২)।

ইমাম রাগিব (র) বলেন, কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, শরীআতের বিধানশূন্য বুদ্ধিবৃত্তিক তত্ত্বজ্ঞান সম্বলিত কিতাবকে যাবূর বলা হয়। দাউদ (আ)-এর কিতাবে কোন শরীআতী বিধান ছিল না বিধায় ইহাকে যাবূর বলা হইয়াছে (রাগিব, মুফরাদাত, শিরো. ز-ب-ر)।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাওরাত ও ইনজীলের মত যাবূরকেও তাঁহার পক্ষ হইতে নাযিলকৃত কিতাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "আমি দাউদকে যাবূর দান করিয়াছি" (৪ ঃ ১৬৩; ১৭ ঃ ৫৫)। কুরআন মজীদে যাবূর কিতাবের একটি বাণী উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى الزَّبُوْرِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الصّٰلِحُوْنَ.

"আমি যাবূর কিতাবে লিখিয়া দিয়াছি যে, আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাগণ পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হইবে" (২১ ঃ ১০৫)।

ইব্ন আব্বাস (রা), শা'বী, কাতাদা (র) প্রমুখের মতে অত্র আয়াতে 'যাবূর' দ্বারা হযরত দাউদ (আ)-এর উপর নাযিলকৃত যাবূর কিতাব বুঝানো হইয়াছে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ., পৃ. ৫২৪, সংশ্লিষ্ট আয়াতাধীন; শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদুল হাসান, মুফতী শফী, আবুল আলা মাওদূদী, সায়্যিদ কুতুব শাহীদ প্রমুখও 'যাবূর'-এর অনুরূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন)। বর্তমান বাইবেলেও অনুরূপ উক্তি বিদ্যমান আছে ঃ "ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হইবে, তাহারা নিয়ত তথায় বাস করিবে" (মাহমূদুল হাসান, তরজমা, পৃ. ৪৪১, টীকা ১; তাফহীমুল কুরআন, উক্ত আয়াতের ৯৯ নং টীকা; আরও তু. বাইবেলের গীতসংহিতা, ৩৭ ঃ ২৯)।

বনূ ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য হযরত মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাতই ছিল মূল কিতাব। যাবূর কিতাবের শিক্ষাও তাওরাতের উপর ভিত্তিশীল ছিল। এই কিতাবের আলোকে হযরত দাউদ (আ) মূসা (আ)-এর শরী'আতকে উজ্জীবিত করেন, ইসরাঈলীদেরকে পথভ্রষ্টতা হইতে মুক্ত করিয়া হিদায়াতের রাস্তায় তুলিয়া আনেন। এই কিতাবের বিষয়বস্তু ছিল আল্লাহ্র প্রশংসা ও তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা। ইবাদত-বন্দেগীতে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন, উপদেশসমূহ, সুসংবাদ ও দো'আ-কালাম। বাইবেলে "গীত সংহিতা" ও "হিতোপদেশ" শিরোনামে ইহা অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহা যে ভাষায় (প্রাচীন হিব্রু) নাযিল হইয়াছিল সে ভাষা যেমন বহু কাল পূর্বে বিলুপ্ত হইয়াছে, তদ্রূপ উহারও অনেক পূর্বে ঐ ভাষায় নাযিলকৃত আদি ও আসল গ্রন্থখানিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

মূল যাবূর পৃথিবীর কোথায়ও বিদ্যমান নাই। বর্তমান শতকে ইনজীলের প্রাচীন হিব্রু পাণ্ডুলিপি প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকালে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন এলাকায় পাওয়া গেলেও আজ পর্যন্ত তাওরাতের অন্তর্ভুক্ত কোন কিতাবের পাণ্ডুলিপি খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অতএব আল-কুরআন ব্যতীত অন্য কোন আসমানী কিতাব অবিকৃত অবস্থায় থাকার দাবি অবান্তর। বাইবেলের অন্তর্গত বর্তমান যাবূর পাঠ করিলেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্র বাণীর সহিত মানুষের মনগড়া কথার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। বর্তমান যাবূর পাঁচখানি দীওয়ানের সমষ্টি। উহার মধ্যে হযরত দাউদ (আ) ব্যতীত অপরাপর হিব্রু কবিগণের কবিতাও অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। এইভাবে ইলহামভুক্ত ও ইলহাম বহির্ভূত কালাম মিশ্রিত করা

হইয়াছে (ই. বি., ২২খ., পৃ. ৫০৯; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩১১)। কুরআন মজীদেও এই বিকৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মহান আল্লাহ ইয়াহূদীদেরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ ۔

"ইয়াহূদীদের মধ্যে কতক লোক কথাগুলি স্থানচ্যুত করিয়া বিকৃত করে" (৪ ঃ ৪৬; আরও দ্র. ৫ ঃ ১৩, ৪১)।

অতএব ইহাদের নাপাক হস্তক্ষেপ হইতে যাবূর কিতাবও রক্ষা পায় নাই। ইহার পরও এই কিতাবে ইলহামভুক্ত যেসব বাণী অক্ষত রহিয়াছে তাহা যে কোন আল্লাহভীরু মানুষের মনকে উদ্বেলিত করে। যেমন, "ধন্য সেই ব্যক্তি, যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না, পাপীদের পথে দাঁড়ায় না, নিন্দুকদের সভায় বসে না, কিন্তু সদাপ্রভুর ব্যবস্থায় আমোদ করে, তাঁহার ব্যবস্থা দিবারাত্র ধ্যান করে" (গীতসংহিতা, ১ ঃ ১-২)।

"হে সদাপ্রভু! আমাকে কৃপা কর, কেননা আমি ম্লান হইয়াছি; হে সদাপ্রভু! আমাকে সুস্থ কর, কেননা আমার অস্থিসকল বিহবল হইয়াছে" (গীত সংহিতা, ৬ ঃ ২)। এরূপ আবেগময়ী আরো বহু মুনাজাত এই কিতাবে বিধৃত হইয়াছে।

মূল যাবূর যে আল্লাহ্‌র কিতাব এই বিশ্বাস পোষণ করা মুসলমানদের ঈমানের অঙ্গ। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবসমূহে ঈমান আনার নির্দেশ দিয়াছেন (তু. ২ ঃ ১৩৬; ২৮৫; ৩ ঃ ৮৪; ৪ ঃ ১৩৬ ইত্যাদি)। তদ্রূপ হযরত দাউদ (আ)-কেও আল্লাহ্‌র নবীরূপে স্বীকার করা এবং তাঁহার প্রতি ঈমান আনাও বাধ্যতামূলক। কারণ আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী-রাসূলের উপর ঈমান আনারও নির্দেশ দিয়াছেন (উপরন্তু তু. ২ ঃ ১৭৭; ২৮৫; ৪ ঃ ১৫০-৫২)।

দাউদ (আ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম

নবী-রাসূলগণের মিশনের মূল উদ্দেশ্যই হইল আল্লাহ্‌র দীনের দাওয়াত মানবজাতির নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া। তাহাদিগকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করা হয় মানবজাতিকে সংশোধন ও পরিচ্ছন্ন করার জন্য, আল্লাহ্‌র বিধান তাহাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাহাদেরকে সত্য-ন্যায়ের পথে পরিচালনার জন্য। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۔

"আল্লাহ্‌র ইবাদত করিবার ও তাগূতকে বর্জন করিবার নির্দেশ দিবার জন্য আমি প্রতিটি জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠাইয়াছি" (১৬ ঃ ৩৬)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ نُوْحِىْ اِلَيْهِ اَنَّهُ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ.

"আমি তোমার পূর্বে যে রাসূলই প্রেরণ করিয়াছি তাহার প্রতি এই ওহীও প্রেরণ করিয়াছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। অতএব তোমরা আমারই ইবাদত কর" (২১ ঃ ২৫)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.

"আমি প্রত্যেক রাসূলকেই তাহার স্বজাতির ভাষাভাষী করিয়া পাঠাইয়াছি, তাহাদের নিকট পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করিবার জন্য" (১৪ ঃ ৪)।

নবীগণের মিশন সম্পর্কে জানার জন্য আরও দ্র. ৫ ঃ ৭২, ১১৭; ৭ ঃ ৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫; ১১ ঃ ৫০, ৬১, ৮৪ ইত্যাদি)।

অতএব হযরত দাউদ (আ) একজন নবী হিসাবে তাঁহার মিশনই ছিল আল্লাহ্র দীনের দাওয়াত প্রচার। তাঁহার দাওয়াতী কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ জানা না গেলেও একথা বলা যায় যে, তিনি মানবজাতিকে, বিশেষত বনূ ইসরাঈলকে মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিয়া এক আল্লাহ্র আনুগত্যে আনয়ন করিতে সদা তৎপর ছিলেন। ফোরাত হইতে নীল পর্যন্ত বিরাট ভূভাগ দখল করিয়া তিনি এইসব এলাকার মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র দীনের ব্যাপক প্রচার করেন। (Encyclopedia Americana, vol. viii, p. 527)। তাঁহার পুত্র নবী সুলায়মান (আ) সাবার সম্রাজ্ঞীকে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহার সূচনাই ছিল আল্লাহ্র নামে ঃ "দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে" (২৭ ঃ ৩০)। "সেই নারী (সম্রাজ্ঞী) বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি, আমি সুলায়মানের সহিত বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি" (২৭ ঃ ৪৪)। এই আয়াতদ্বয় প্রমাণ করে যে, দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর মূল লক্ষ্য রাজ্যজয় ছিল না, ছিল আল্লাহ্র দীনের প্রচার ও প্রসার। তাঁহারা রাষ্ট্রীয় শক্তি ও প্রশাসন যন্ত্রকে পূর্ণরূপে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন। আর মুমিনগণকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব দান করা হইলে তাহারা এই কর্তৃত্বকে দাওয়াতী কার্যক্রম প্রসারের জন্য নিয়োজিত করেন।

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

"আমি তাহাদেরকে (ঈমানদারগণকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করিলে তাহারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, সৎকাজের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করে" (২২ ঃ ৪১)। হযরত দাউদ (আ)-ও তাহাই করিয়াছিলেন।

দাউদ (আ)-এর ইবাদত-বন্দেগী

নবী-রাসূলগণ ছিলেন স্ব স্ব যুগের মানবজাতির জন্য অনুসরণীয় আদর্শ। যাবতীয় কার্যক্রমেই তাঁহারা অনুসরণীয় আদর্শ। তাঁহাদের আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াই মানুষ আল্লাহ্র দীনের প্রতি উদ্বুদ্ধ

হয়। তাঁহারা দৈনন্দিন জীবন যাপনে যেমন ছিলেন অনুসরণীয়, তদ্রূপ ইবাদত-বন্দেগীতেও ছিলেন অনুসরণীয়। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহার সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা)-এর রাতভর ইবাদত-বন্দেগী এবং দিনভর রোযা রাখার খবর অবহিত হইয়া তাঁহাকে এই ব্যাপারে দাউদ (আ)-এর অনুসরণ করার উপদেশ দেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "দাউদ (আ) ছিলেন সর্বাধিক ইবাদতপ্রিয় মানুষ" (হাদীছ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ১০ নং হাদীস দ্র.)। মহানবী (স) বলেন ঃ আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় (নফল) সাওম হইল দাউদ (আ)-এর সাওম (রোযা)। তিনি এক দিন পরপর সাওম পালন করিতেন। আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় (নফল) সালাত হইল দাউদ (আ)-এর সালাত (নামায)। তিনি অর্ধেক রাত্রি ঘুমাইতেন, এক-তৃতীয়াংশ রাত্রি সালাত আদায় করিতেন এবং এক-ষষ্ঠাংশ (আবার) নিদ্রা যাইতেন (হাদীছ সংক্রান্ত অনুচ্ছেদের ১ নং ও ২ নং হাদীস দ্র.)। তিনি ছিলেন অত্যধিক আল্লাহভীরু লাজনম্র স্বভাবের। ইহার ফলে তাঁহাকে রুগ্ন মনে হইত, অথচ তিনি রুগ্ন ছিলেন না (ঐ অনুচ্ছেদের ৫ নং হাদীস দ্র.)। তাঁহার সর্বাধিক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি এত বিরাট ভূভাগের মহাশক্তিধর শাসক হওয়া সত্ত্বেও নিজের কায়িক শ্রমের উপার্জন দ্বারা নিজের ও নিজ পরিজনের ভরণ-পোষণ করিতেন। রাসূলুল্লাহ (স) স্বশ্রমে উপার্জিত আহারকে সর্বাধিক উত্তম আহার আখ্যায়িত করিয়াছেন (উক্ত অনুচ্ছেদের ৪ নং হাদীস দ্র.)। তিনি স্বোপার্জিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করিতেন এবং দুই-তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনদেরকে দান করিতেন (তাহ্যীব তা'রীখ দিমাশ্ক, ৫খ, পৃ. ১৯৪)।

তিনি প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র নিকট এই বলিয়া দো'আ করিতেন ঃ "হে আল্লাহ! অদ্য রজনীতে আসমান হইতে যমীনে যত বিপদাপদ নামিয়া আসিয়াছে, তাহা হইতে আমাকে মুক্তি দান করুন। হে আল্লাহ! অদ্য নিশিথে আসমান হইতে যমীনে যত কল্যাণ অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রতিটির অংশ আমাকে দান করুন" (তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৫খ, পৃ. ১৯৬-৭)। অনুরূপ আরো মুনাজাত উক্ত গ্রন্থে বিধৃত হইয়াছে।

বাইবেলেও তাঁহার হৃদয়স্পর্শী বহু মুনাজাত আছে। "সদাপ্রভু! তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করিও না, তোমার রোষাগ্নিতে আমাকে শাস্তি দিও না" (গীতসংহিতা, ৩৮ ঃ ১)। "সদাপ্রভু! আমাকে পরিত্যাগ করিও না, আমার প্রভু! আমা হইতে দূরে থাকিও না। হে প্রভু! আমার পরিত্রাণ, তুমি আমার সাহায্য করিতে সত্বর হও" (ঐ, ২১-২২)। "হে প্রভু! আমার বিচার কর, অসাধু জাতির সহিত আমার বিবাদ নিষ্পন্ন কর, ছলপ্রিয় ও অন্যায়কারী মনুষ্য হইতে আমাকে উদ্ধার কর" (ঐ, ৪৩ ঃ ১)। "হে প্রভু! আমার ওষ্ঠাধর খুলিয়া দাও। আমার মুখ তোমার প্রশংসা প্রচার করিবে (ঐ, ৫১ ঃ ১৫)। "তোমার পিতৃগণের পরিবর্তে তোমার পুত্রেরা থাকিবে; তুমি তাহাদিগকে সমস্ত পৃথিবীতে অধ্যক্ষ করিবে" (গীতসংহিতা, ৪৫ ঃ ১৬)। অর্থাৎ মহানবী (স) তাঁহার পিতৃব্যগণের পক্ষ হইতে চরম বাধা ও নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন এবং ইহাদের পরবর্তী বংশধরগণই আবার ইসলাম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর সর্বত্র উহার প্রচার ও প্রসার করিয়াছিলেন। তাহারাই (কুরায়শগণ) দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার শাসক হইয়াছিলেন।

"আমি তোমার নাম সমস্ত পুরুষ পরম্পরায় স্মরণ করাইব, এইজন্য জাতিরা যুগে যুগে চিরকালে তোমার স্তব করিবে" (গীতসংহিতা, ৪৫ ঃ ১৭)।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

"এবং আমি তোমার খ্যাতিকে উচ্চ মর্যাদা দান করিয়াছি" (৯৪ ঃ ৪)।

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ "জিবরাঈল (আ) আমার নিকট আসিয়া আমাকে বলিলেন, আমার রব ও আপনার রব জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি (আল্লাহ) কিভাবে তোমার উল্লেখধ্বনি সুউচ্চ করিয়া দিয়াছি? আমি বলিলাম ঃ তাহা আল্লাহ্ই ভালো জানেন। জিবারাঈল (আ) বলিলেন, আল্লাহ তা'আলা বলিয়াছেন, যখন ও যেখানেই আমার উল্লেখ হইবে, তখম সেখানেই আমার সঙ্গে তোমারও উল্লেখ হইবে" (ইব্ন জারীর, ইব্ন আবী হাতিম, মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, ইবনুল মুনযির, ইব্ন হিব্বান, ইব্ন মারদাবিয়া, আবু নু'আয়ম প্রমুখের বরাতে তাফহীমুল কুরআন, ৬খ, পৃ. ৩৮১-২, টীকা ৩)।

দুনিয়াব্যাপী দৈনিক পাঁচবারের আযানধ্বনি ইহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খৃষ্টান পণ্ডিতগণও শত বিদ্বেষ পোষণ সত্ত্বেও তাঁহার গুণগানে পঞ্চমুখ। বহু ইয়াহূদী-খৃষ্টান পণ্ডিত আজও তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং মার্কিন ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যাকলেইন ১৯৭৪ খৃ. ১৫ জুলাইর টাইম ম্যাগাজিনের এক জরিপে বলেন, "সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হইলেন সম্ভবত মুহাম্মাদ (স)" (দি চয়েস, বাংলা অনু., পৃ. ৫১-৫২ ও ১৬৮)।

এই ক্ষেত্রে মাইকেল এইচ. হার্ট-এর বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

"My choice of mohammad to lead the list of the World's most influential persons may surprise some readers and may be questioned by other, but he was the only man in history who was supremely successful on both the religious and secular levels.... Today, thirteeth centuries after his death his influence is still powerfull and pervasive (The Hundred, P. 33)."

অর্থাৎ "সন্দেহ নাই যে, আন্তর্জাতিক বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে মুহাম্মদ (স)-কে শীর্ষস্থান প্রদান করার ব্যাপারে আমার এই সিদ্ধান্ত অনেক পাঠককে বিস্মিত করিবে, অনেকেই এই সম্পর্কে নানান প্রশ্ন উত্থাপন করিবেন, কিন্তু তিনিই হইলেন ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি যিনি ধর্মীয় ও জাগতিক উভয় পর্যায়ে সর্বাধিক সফলতার অধিকারী।.....তাঁহার ইনতিকালের তের শত বৎসর পর আজিও তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত শক্তিশালী ও সুদূরপ্রসারী।"

যাবূর কিতাবে মহানবী (স) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ তাওরাত ও ইনজীল কিতাবদ্বয়ে যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান, তদ্রূপ যাবূর কিতাবেও তাহা বিদ্যমান

আছে। সম্ভবত কুরআন মজীদের ২১ ঃ ১০৫ আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে ঃ "ধন্য তিনি যিনি সদাপ্রভুর নামে আসিতেছেন" (গীতসংহিতা, ১১৮ ঃ ২৬)।

"তোমরা সদাপ্রভুর উদ্দেশে গীত গাও, তাঁহার নামের গুণগান কর; যিনি মরুভূমি দিয়া বাহনে আসিতেছেন তাঁহার জন্য রাজপথ বাঁধ" (গীতসংহিতা, ৬৮ ঃ ৪)। "সদাপ্রভু আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারর্কর্তা" (ঐ, ৬৮ ঃ ৫)। "সদাপ্রভু সঙ্গিহীনদিগকে পরিবার মধ্যে বাস করান, তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন; কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধভূমিতে বাস করে" (ঐ, ৬৮ ঃ ৬)। "হে প্রভু! তুমি যখন নিজ প্রজাগণের অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলে, যখন শুষ্ক ভূমি দিয়া গমন করিতেছিলে, তখন পৃথিবী কম্পমান হইল, সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আকাশও জলবিন্দুময় হইল" (ঐ, ৬৮ ঃ ৭-৮)। এসব বাক্যে মহানবী (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

"যিনি মরুপথ দিয়া বাহনে আসিতেছেন তাঁহার জন্য রাজপথ বাঁধ" (গীত, ৬৮ ঃ ৪) বাক্যে মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নয়। কারণ ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান বেথেলহাম তৎকালেও এবং বর্তমান কালেও উহার সবুজ শ্যামলিমার জন্য প্রসিদ্ধ। পক্ষান্তরে মহানবী (স)-এর জন্মভূমি মক্কা একটি উষর মরু প্রান্তর। তৎকালেও, বর্তমান কালেও। "পিতৃহীনদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা" (গীত, ৬৮ ঃ ৫) বলিতেও মহানবী (স)-কে বুঝানো হইয়াছে। কারণ তিনি ছিলেন ইয়াতীম ও বিধবাদের মত আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল। "সঙ্গীহীনকে পরিবার মধ্যে বাস করান" (ঐ, ৬৮ ঃ ৬) অর্থাৎ মহানবী (স) পিতৃহীন অবস্থায় পৃথিবীতে আগমন করেন এবং তাঁহার ছয় বৎসর বয়সে তাঁহার মাতা ইনতিকাল করেন। উপরন্তু তাঁহার কোন সহোদর ভাই-বোনও ছিল না। যথার্থ অর্থে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ, আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে "পরিবার" দান করেন। নিম্নোক্ত আয়াতে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে ঃ

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ·

"তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম অবস্থায় পান নাই আর আশ্রয় দান করেন নাই" (৯৩ ঃ ৬)?

"তিনি বন্দিগণকে মুক্ত করিয়া কুশলে রাখেন" (গীত, ৬৮ ঃ ৬) অর্থাৎ মহানবী (স)-ই সর্বপ্রথম যুদ্ধবন্দীদের সহিত মানবিক ব্যবহার করেন। তাঁহার ও তাঁহার সাহাবীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে ঃ

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ·

"আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তাহারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে" (৭৬ ঃ ৮)।

"দগ্ধভূমি" (ঐ, ৬৮ ঃ ৬) বলিতে মক্কা উপত্যকাকে বুঝানো হইয়াছে। কুরআন মজীদেও মক্কাকে বিরানভূমি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ وَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ ('অনুর্বর উপত্যকা', ১৪ ঃ ৩৭)। গীত, ৬৮ ঃ ৭-এ মহানবী (স) কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ৮৩-৫)।

আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জারের মতে গীতসংহিতা, ৪৫ অধ্যায়েও মহানবী (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩১১, ৩য় সং, বৈরূত তা. বি.)। সেই অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে ঃ "তুমি মনুষ্য-সন্তানগণ অপেক্ষা পরম সুন্দর; তোমার ওষ্ঠাধরে অনুগ্রহ সেচিত হয়; এই নিমিত্ত সদাপ্রভু চিরকালের জন্য তোমাকে আশির্বাদ করিয়াছেন। হে বীর! তোমার খড়্গ কটিদেশে বন্ধন কর, তোমার প্রভা ও প্রতাপ (গ্রহণ কর)। আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়িয়া যাও, সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে, তাহাতে তোমার দক্ষিণ হস্ত তোমাকে ভয়াবহ কার্য শিখাইবে। তোমার বাণসকল তীক্ষ্ণ, জাতিরা তোমার নীচে পতিত হয়, রাজার শত্রুগণের হৃদয় বিদ্ধ হয়। .... তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড। তুমি ধার্মিকতাকে প্রেম করিয়া আসিতেছ, দুষ্টতাকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছ, এই কারণ সদাপ্রভু, তোমার সদাপ্রভু, তোমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন তোমার সখাগণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে আনন্দতৈলে" (গীতসংহিতা, ৪৫ ঃ ২-৭)।

বাইবেলের অন্যান্য গ্রন্থেও মহানবী (স)-এর আবির্ভাব সম্পর্কে গীতসংহিতার অনুরূপ ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান আছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ ঃ ১৮; যিশাইয়, ২৯ ঃ ১২, যেখানে সর্বপ্রথম ওহী নাযিল হওয়াকালীন অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান)। এসব ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া আসমানী কিতাবসমূহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর আগমন সম্পর্কে মানবজাতিকে অবহিত করিয়া আসিতেছিল।

কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ "স্মরণ কর, যখন আল্লাহ নবীদের অঙ্গীকার লইয়াছিলেন যে, তোমাদিগকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যাহা আছে তাহার সমর্থকরূপে যখন একজন রাসূল আসিবে তখন তোমরা অবশ্যই তাহার প্রতি ঈমান আনিবে এবং তাহাকে সাহায্য করিবে" (৩ ঃ ৮১)

যাবূর কিতাবে মক্কা মুআজ্জমার উল্লেখ ঃ যাবূর কিতাবে বহু স্থানে "সিয়োন" (Zion) পর্বতের উল্লেখ আছে। ইয়াহূদী ও খৃস্টান পণ্ডিতগণ ইহার অর্থ ও অবস্থান নির্ণয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছেন। যাবূর কিতাবের গভীর অধ্যয়নে প্রতিভাত হয় যে, 'সিয়োন' দ্বারা মক্কা মুআজ্জামাকে বুঝানো হইয়াছে। "... সিয়োন পর্বত, মহান রাজার পুরী। সদাপ্রভু, তাহার অট্টালিকাসমূহের মধ্যে, উচ্চ দুর্গ বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কেননা দেখ, রাজগণ সভাস্থ হইয়াছিলেন; তাহারা একসঙ্গে চলিয়া গেলেন; তাহারা দেখিলেন, অমনি স্তম্ভিত হইলেন, বিহ্বল হইলেন, পলায়ন করিলেন" (গীতসংহিতা, ৪৮ ঃ ২-৫)।

"তোমরা সিয়োনকে প্রদক্ষিণ কর, তাহার চারিদিকে ভ্রমণ কর, তাহার দুর্গসকল গণনা কর। তাহার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ কর, তাহার অট্টালিকা সকল সন্দর্শন কর, যেন ভাবী বংশের কাছে তাহার বর্ণনা করিতে পার" (ঐ, ৪৮ ঃ ১২-১৩)।

"ধন্য তাহারা, যাহারা তোমার গৃহে বাস করে, তাহারা সতত তোমার প্রশংসা করিবে। ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার বল তোমাতে, (সিয়োনগামী) রাজপথ যাহার হৃদয়ে রহিয়াছে। তাহারা ক্রন্দনের তলভূমি (ওয়াদী বাকা = Baca) দিয়া গমন করিয়া তাহা উৎসে পরিণত করে; প্রথম বৃষ্টি তাহা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে। তাহারা উত্তর উত্তর বলবান হইয়া অগ্রসর হয়, প্রত্যেকে সিয়োনে সদাপ্রভুর কাছে দেখা দেয়" (ঐ, ৮৪ ঃ ৪-৭)।

উপরিউক্ত বাক্যে 'ওয়াদী বাকা' (তলভূমি) বলিতে মক্কা মুআজ্জমাকে বুঝানো হইয়াছে। কারণ মক্কার অপর নাম বাক্কা, যাহা কুরআন মজীদেও উক্ত হইয়াছে ঃ

اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبٰرَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ.

"নিশ্চয়ই মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা তো বাক্কায়, উহা বরকতময় ও বিশ্বজগতের দিশারী" (৩ ঃ ৯৬)।

"প্রত্যেকে সিয়োনে সদাপ্রভুর কাছে দেখা দেয়" (গীত, ৮৪ ঃ ৭) বাক্যাংশ দ্বারা হজ্জের অনুষ্ঠান বুঝানো হইয়াছে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ৮৫-৮৭)।

এইভাবে বাইবেলের পুরাতন ও নূতন নিয়মের বহু স্থানে মহানবী (স) সম্পর্কে অগণিত ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান।

ইয়াওমু'স-সাব্ত-এর ঘটনা

'ইয়াওমু'স-সাব্ত' অর্থ শনিবার, সপ্তাহের শেষ দিবস, ইয়াহূদীদের বিশ্রাম দিবস। ইয়াহূদী-খৃস্টানদের বিশ্বাসমতে আল্লাহ তা'আলা ছয় দিবসে বিশ্বজাহান সৃষ্টি শেষ করার পর সপ্তম দিবসে অর্থাৎ শনিবার বিশ্রাম গ্রহণ করেন (নাউযুবিল্লাহ)। বাইবেলের সূচনাই হইয়াছে ইহার বিবরণ দ্বারা (দ্র. আদিপুস্তক, ২ ঃ ১-৩১)। এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল। পরে খোদাওয়ান্দ সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন, সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন। "আর সদাপ্রভু সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন, কেননা সেই দিনে সদাপ্রভু আপনার সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন" (ঐ, ২ ঃ ১-৩; আরও দ্র. যাত্রাপুস্তক, ১৬ ঃ ২৩-২৯; ২০ ঃ ৮-১০; মথি, ২৪ ঃ ২০; মার্ক, ৩ ঃ ৪ ইত্যাদি)। ইয়াহূদী-খৃস্টান বিশ্বাসমতে সৃষ্টিকর্ম সমাপ্ত করিয়া সদাপ্রভু ক্লান্ত হইয়া যান। তাই সপ্তম দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এইজন্য বিশেষত ইয়াহূদীরা পার্থিব সমস্ত কর্ম হইতে ঐ দিন বিরত থাকে এবং খৃস্টানদের মধ্যকার একটি দলও।

কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলার বিশ্রাম গ্রহণ সংক্রান্ত ইয়াহূদী-খৃস্টান বিশ্বাসের অত্যন্ত জোরালো প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কারণ ক্লান্তি-শ্রান্তি কখনও আল্লাহ্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি সমস্ত দুর্বলতার উর্ধ্বে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ وَّمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوْبٍ.

"আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও উহাদের মধ্যস্থিত সমস্ত কিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছি এবং কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করে নাই" (৫০ ঃ ৩৮; আরও দ্র. ৭ ঃ ৫৪; ১০ ঃ ৩; ১১ঃ ৭ ও ৫৭ ঃ ৪)।

আয়াতোক্ত "ছয় দিন"-এর ব্যাখ্যায় তাফসীরকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ছয় দিন অর্থ পৃথিবীর স্বাভাবিক নিয়মতান্ত্রিক ছয় দিনও হইতে পারে অথবা ছয়টি পর্যায়ও হইতে পারে অথবা ছয়টি কাল-পরম্পরাও হইতে পারে। অতএব আল্লাহ্‌র সহিত ক্লান্তির ক্রটি যুক্ত করা তাঁহার সিফাতের (গুণাবলীর) সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। মহান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

اَلَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ .

"যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সকলের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেন নাই" (৪৬ ঃ ৩৩)।

তাহা ছাড়া আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিকর্ম ছয় দিনে সমাপ্ত হইয়া থামিয়া থাকে নাই, বরং অনবরত নব নব সৃষ্টিকর্ম অস্তিত্ব লাভ করিতেছে, যাহা আমাদের বোধবুদ্ধি ও দৃষ্টির বাহিরে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ.

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহাসম্প্রসারণকারী" (৫১ ঃ ৪৭)।

যদিও রাসূলুল্লাহ (স) ইয়াহূদীদের শনিবার পালনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং সরকারী চাকুরীতে নিয়োজিত কোন ইয়াহূদী শনিবার সরকারী কর্ম হইতে ছুটি চাহিলে তাহা মঞ্জুর করিয়াছেন।

অতএব আল্লাহ্‌র সহিত সৃষ্টিগত কোন ক্রটি বা দুর্বলতা যুক্ত করা শিরক-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই মুসলমানদের নিকট শনিবারের বিশ্রাম সংক্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যাত।

শাবাছা (شَبَثْ) হিব্রু শব্দ, ইহা হইতে আরবীকৃত (মু'আররাবা) সাব্ত (سَبْتُ) শব্দটি গৃহীত হইয়াছে। ইসরাঈলীরা সমস্ত পার্থিব কর্ম হইতে বাধ্যতামূলকভাবে ঐ দিন বিশ্রাম গ্রহণ করিত, তবে ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগী নিষিদ্ধ ছিল না, বরং উপাসনায় লিপ্ত থাকার জন্যই বিশ্রামবারের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। এই দিনটির মেয়াদ শুক্রবার সন্ধ্যা হইতে শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত। শনিবার উদযাপনের ব্যবস্থা হযরত মূসা (আ)-এর আমলে প্রবর্তিত হইয়াছে, না তাঁহার আগে—এই বিষয়ে মতভেদ আছে (বুতরুস-এর দাইরা, ৯ খ, পৃ. ৪৪১-২)। তবে বর্তমান বাইবেলের বর্ণনা হইতে

জানা যায় যে, হযরত মূসা (আ) শনিবার উদযাপনের জন্য গুরুত্ব সহকারে ইয়াহূদীদেরকে নির্দেশ প্রদান করেন। "তুমি বিশ্রাম দিন স্মরণ করিয়া পবিত্র করিও। ছয় দিন শ্রম করিও। আপনার সমস্ত কার্য করিও, কিন্তু সপ্তম দিন তোমার রব সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রাম দিন। সেদিন তুমি কি তোমার পুত্র, কি কন্যা, কি তোমার দাস, কি দাসী, কি তোমার পশু, কি তোমার পুরদ্বারের মধ্যবর্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্য করিও না" (যাত্রাপুস্তক, ২০ ঃ ৮-১০; আরও তু. ১৬ ঃ ২৩-৩০; দ্বিতীয় বিবরণ, ৫ ঃ ১২-১৫; যিরমিয়, ১৭ ঃ ২১-২৭)। যিহিষ্কেলের গ্রন্থে শনিবারের ব্যবস্থা লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের প্রতি গযব নাযিলের হুমকি দেওয়া হইয়াছে (দ্র. যিহিষ্কেল, ২০ ঃ ১২-১৭)। মূসা (আ)-এর শরী'আতে শনিবারের বিধিনিষেধ লংঘন করার শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড (দ্র. গণনাপুস্তক, ১৫ ঃ ৩২-৬)।

বর্তমান কালের ইয়াহূদীরা এই দিনটি পালন করে এবং খৃস্টানরাও প্রথমদিকে এই দিনটি পালন করিত (Ency. Religion, 10/329; Faith of the World, 2/785)। কারণ তাহারা বাইবেলের নির্দেশ মান্য করিতে বাধ্য এবং হযরত 'ঈসা (আ)-ও এই দিনের বিধিনিষেধ বাতিল করেন নাই। তিনি এই দিনে অবশ্য যাবতীয় ছওয়াবের কাজ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন (দ্র. মথি, ১২ ঃ ১-১৩; মার্ক, ২ ঃ ২৩-২৮; ৩ ঃ ১-৫; লূক, ৬ ঃ ১-১০; ১৩ ঃ ১১-১৬; ১৪ ঃ ১-৫)। এই সম্পর্কে যোহনের উক্তি ঃ আমি প্রভুর দিনে আত্মবিষ্ট হইলাম এবং আমার পশ্চাৎ তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম (বাইবেলের প্রকাশিত বাক্য, ১ ঃ ১০)। খৃস্টান জাতি পথভ্রষ্ট হইয়া এক পর্যায়ে এই দিনের বিধিনিষেধ পালন ত্যাগ করে। মহানবী (স)-এর এক হাদীছ হইতেও ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

أَضَلَّ اللّٰهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُوْدِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارٰى يَوْمُ الْأَحَدِ.

"আল্লাহ তা'আলা জুমুআ'র দিনের ব্যাপারে আমাদের পূর্ববর্তীদেরকে পথভ্রষ্ট করিয়াছেন। অতএব ইয়াহূদীদের জন্য হইল শনিবার এবং খৃস্টানদের জন্য রবিবার" (মুসলিম, জুমু'আ, নং ১৮৫২)।

বিশেষত ইয়াহূদীদের জন্য শনিবারের বিধিনিষেধ মান্য করা যে বাধ্যতামূলক ছিল তাহা কুরআন মজীদ হইতেও জানা যায় এবং উক্ত বিধিনিষেধ লংঘন করার কারণে একটি এলাকার ইয়াহূদীরা আল্লাহ্র গযবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহাও উল্লেখ আছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِيْنَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِى السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

"তোমাদের মধ্যে যাহারা শনিবার সম্পর্কে সীমালংঘন করিয়াছিল তাহাদেরকে তোমরা নিশ্চিতভাবে জান। আমি তাহাদেরকে বলিয়াছিলাম, তোমরা ঘৃণিত বানর হও" (২ ঃ ৬৫; আরও তু. ৪ ঃ ৪৭, ১৫৪; ৭ ঃ ১৬৩; ১৬ ঃ ১২৪)।

একদল ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদেরকে বলেন ঃ

وَعَلَيْكُمْ يَامَعْشَرَ الْيَهُوْدِ خَاصَّةً لاَ تَعْدُوْا فِى السَّبْتِ.

"হে ইয়াহূদী সম্প্রদায়! বিশেষত তোমরা শনিবারের সীমা লংঘন করিও না" (তিরমিযী, ইসতীযান, বাব ৩৩, নং ২৬৭০; তাফসীর সূরা বনী ইসরাঈল, নং ৩০৮২; নাসাঈ, তাহ্‌রীম)।

যে সম্প্রদায় বানরে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহাদের সম্পর্কেই সূরা আ'রাফে একটু বিস্তৃত বর্ণনা আছে ঃ

وَاسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِىْ كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُوْنَ فِى السَّبْتِ اِذْ تَاْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَّيَوْمَ لاَ يَسْبِتُوْنَ. لاَ تَاْتِيْهِمْ كَذٰلِكَ نَبْلُوْهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. وَاِذْ قَالَتْ اُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُوْنَ قَوْمًا اللّٰهُ مُهْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا. قَالُوْا مَعْذِرَةً اِلٰى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ. فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوْا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُوْنُوْا قِرَدَةً خٰسِئِيْنَ.

"তাহাদেরকে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদবাসীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা শনিবারের সীমা লংঘন করিত, শনিবার উদযাপনের দিন মাছ পানিতে ভাসিয়া তাহাদের নিকট আসিত। কিন্তু যেদিন তাহারা শনিবার উদযাপন করিত না সেদিন উহারা তাহাদের নিকট আসিত না। এইভাবে আমি তাহাদেরকে পরীক্ষা করিয়াছিলাম, কারণ তাহারা সত্য ত্যাগ করিত। স্মরণ কর, তাহাদের একদল বলিয়াছিল, আল্লাহ যাহাদেরকে ধ্বংস করিবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দিবেন, তোমরা তাহাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন? তাহারা বলিয়াছিল, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দায়িত্ব মুক্তির জন্য এবং যাহাতে তাহারা সাবধান হয় এইজন্য। তাহাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল তাহারা যখন উহা বিস্মৃত হয়, তখন যাহারা অসৎ কার্য হইতে নিবৃত্ত করিত তাহাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যাহারা যুলুম করে তাহারা কুফরী করিত বলিয়া আমি তাহাদেরকে কঠোর শাস্তি দিলাম। তাহারা যখন নিষিদ্ধ কার্য ঔদ্ধত্য সহকারে করিতে লাগিল তখন তাহাদেরকে বলিলাম, ঘৃণিত বানর হও" (৭ ঃ ১৬৩-১৬৬)।

অধিকাংশ তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকের মতে, ইহার ঘটনাস্থল 'আইলা' বা আইলাত বা ঈলাত) তাফসীর ইব্‌ন আব্বাস, পৃ. ১৪০; তাফসীর ইব্‌ন কাছীর, বাংলা, দ্বিতীয় সং, ১খ, পৃ. ৩৫৫; কুরতুবী, ৭ খ, পৃ. ৩০৬; শায়খুল হিন্দ, পৃ. ২২৭, টীকা ৩; মা'আরেফুল কুরআন, ২ ঃ ৬৫ আয়াতাধীন তাফসীর; তাফহীমুল কুরআন, সূরা আ'রাফের টীকা নং ১২২; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৯ ইত্যাদি) এবং ইহা দাউদ (আ)-এর যুগের ঘটনা (কুরতুবী, ৭ খ, পৃ. ৩০৬; কামিল, ২ খ, পৃ. ১৬৯)। ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ধর্মীয় কিতাবে ও ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না।

স্থানটি লোহিত সাগরের তীরে অবস্থিত এবং হিজাযের শেষ সীমা ও সিরিয়ার শুরু (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৯, টীকা ১)। বর্তমান ইয়াহূদী সরকার এখানে উক্ত নামে একটি সামুদ্রিক

বন্দর নির্মাণ করিয়াছে, ইহার অদূরেই জর্দানের প্রসিদ্ধ আকাবা নৌ-বন্দর অবস্থিত। বনী ইসরাঈলের উত্থান যুগে ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্র ছিল। ইহা হযরত সুলায়মান (আ)-এর লোহিত সাগরীয় যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজের ঘাটি ছিল (তাফহীমুল কুরআন, পূর্বোক্ত স্থানে)।

ঐ এলাকার ইয়াহূদীরা প্রথম প্রথম অপকৌশলের অন্তরালে শনিবারের বিধিনিষেধ লংঘন করিয়া মৎস শিকার করিত। কুরআন মজীদের বর্ণনামতে, শনিবারই সমুদ্রতীরে ব্যাপক হারে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছ ভাসিয়া আসিত, অন্য দিন আসিত না। ইহা ছিল তথাকার ইয়াহূদীদের জন্য একটি ঈমানী পরীক্ষা। কথিত আছে যে, হযরত দাঊদ (আ) ঐ দিন সমুদ্র তীরে বসিয়া আল্লাহ্‌র কিতাব তিলাওয়াত করিতেন এবং তাহা শুনিবার জন্য সমস্ত পশুপাখি তীরে আসিয়া ভীড় জমাইত (গোলাম নবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২২৩)। তাহারা সমুদ্র হইতে খাল খনন করিয়া অভ্যন্তর ভাগে মাছ আসিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। খালে মাছ ঢুকিবার পরে তাহারা জাল বা অন্য কিছু দ্বারা মাছের বহির্গমন প্রতিরোধ করিয়া রাখিত। অতঃপর শনিবারের সীমা শেষ হইলে তাহারা মৎস্য শিকার করিত। এইভাবে তাহারা অপকৌশল অবলম্বন করিয়া আল্লাহ্‌র বিধান লঙ্ঘন করে।

ঐ এলাকার সৎকর্মপরায়ণ লোকের এই দুষ্কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশের মাধ্যমে মৎস্য শিকার হইতে বিরত রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে নাই। ইহাতে ঐ এলাকার লোক দুই জনপদে বিভক্ত হইয়া যায় এবং তাহারা পৃথক পৃথকভাবে বসবাস করিতে থাকে। আল্লাহ তাআলা দুষ্কৃতকারীদের অপরাধের শাস্তিস্বরূপ তাহাদিগকে বানরে রূপান্তরিত করিয়া দেন। একদিন সকাল বেলা সৎলোকেরা দুষ্কৃতকারীদের এলাকায় চরম নীরবতা লক্ষ্য করিয়া সেখানে গিয়া দেখিতে পান যে, উহারা বানরে পরিণত হইয়াছে। কাতাদা (র)-এর মতে যুবকেরা বানরে এবং বৃদ্ধরা শূকরে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ইহারা তিন দিন জীবিত থাকার পর নিঃশেষ হইয়া যায় (কুরতুবী, ১খ, ২ ঃ ৬৬-এর অধীন; মা'আরিফুল কুরআন, ১খ, ২ ঃ ৬৬ আয়াতাধীন; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৬৯; আরাইস, পৃ. ৩১০-১১)। তিন দিন পর প্রবল ঝড়বৃষ্টি ইহাদের লাশ সমুদ্রে নিক্ষেপ করে (আরাইস, পৃ. ৩১১)। আল্লাহ তাআলার করুণায় ঐ এলাকার নেক্কার লোকেরা এই গযব হইতে রেহাই পান।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলেন, কয়েকজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের যুগের বানর ও শূকর কি সেই দেহাবয়ব বিকৃত ইয়াহূদী সম্প্রদায়? তিনি বলিলেন ঃ আল্লাহ যখন কোন সম্প্রদায়ের উপর দেহাবয়ব বিকৃতির শাস্তি নাযিল করেন, তখন তাহারা ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। তিনি আরও বলেন ঃ বানর ও শূকর পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। ইহাদের সহিত দেহাবয়ব বিকৃত বানরের কোন সম্পর্ক নাই (সহীহ মুসলিমের বরাতে কুরতুবী ও মাআরিফুল কুরআন, ২ ঃ ৬৬ আয়াতের ব্যাখ্যাধীন)।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের এই মত যে, দেহাবয়ব বিকৃতির শাস্তিপ্রাপ্তরা বংশবৃদ্ধি করিতে পারে না। বানর, শূকর ইত্যাদি তৎপূর্বেও ছিল। আল্লাহ তা'আলা যাহাদের দেহবয়ব বিকৃতির দ্বারা শাস্তি দিয়াছেন তাহারা অচিরেই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের কোন বংশধর অবশিষ্ট থাকে

নাই। কেননা তাহারা আল্লাহ্র গযব ও অসন্তুষ্টি শিকার হইয়াছে। অতএব তিন দিনের অধিক পৃথিবীতে তাহাদের অস্তিত ছিল না। এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং তাহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্র গযবে দেহাবয়ব বিকৃতরা বংশবিস্তার করে নাই, পানাহার করে নাই এবং তিন দিনের অধিক জীবিত থাকে নাই। ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে (কুরতুবী, ১খ, পৃ. ৪৪০-৪১)। মহানবী (স) বলেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা যাহাদেরই দেহাবয়ব বিকৃত করিয়াছেন তাহাদের কোন বংশধর বা উত্তরপুরুষ অবশিষ্ট রাখেন নাই" (মুসনাদে আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ৩৯০)।

ইবনুল আরাবীর একটি দুর্বল মত পাওয়া যায় যে, ইহাদের বংশধর বানর, শূকর, গুইসাপ, ইঁদুররূপে অবশিষ্ট আছে (কুরতুবীর আহ্কামুল কুরআন, ১খ, পৃ. ৪৪০-১)। কোন কোন হাদীস হইতে ইহার সপক্ষে কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন আবূ হুয়ায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ বনূ ইসরাঈলের একটি গোত্র নিখোঁজ হইয়া যায়। তাহাদের কি পরিণতি হইয়াছিল তাহা অজ্ঞাত। আমার সন্দেহ হয় এই ইঁদুরই (বিকৃত অবয়বে) তাহারা কিনা! ইহাদের সামনে উটের দুধ রাখা হইলে ইহারা তাহা পান করে না, অথচ বকরীর দুধ রাখা হইলে তাহা পান করে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি কা'বের নিকট ইহা বর্ণনা করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কি নবী (স)-কে এই কথা বলিতে শুনিয়াছেন? আমি বলিলাম, হাঁ। কা'ব আমাকে বারবার একথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, আমি কি তাওরাত পড়ি (বুখারী, বাদউল খালক, বাব ১৫, নং ৩০৬১; মুসলিম, যুহ্দ)?

জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে গুইসাপের গোশত পেশ করা হইলে তিনি তাহা ভক্ষণ করেন নাই এবং বলেন ঃ আমি জানি না হয়ত ইহারা পূর্বকালের দেহাবয়ব বিকৃত সম্প্রদায়ভুক্ত কিনা (মুসলিম, কিতাবু'স-সায়দ, বাব ১৮০, নং ৪৮৮৩; আরও তু. নং ৪৮৮৫)!

উপরিউক্ত হাদীছ দ্বারা ইবনুল আরাবীর মত প্রমাণিত হয় না। কারণ এইসব হাদীছে কেবল একটা সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে, দৃঢ়তার সহিত কিছু বলা হয় নাই। আর পূর্বোক্ত হাদীছসমূহে দৃঢ়তার সহিত বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাহাদেরকে এবং তাহাদের কোন বংশধরকে অবশিষ্ট রাখেন নাই।

ইসলামী শরীআতে শনিবারের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই। রাসূলুল্লাহ (স) কেবল ইয়াহূদীদেরকেই গুরুত্ব সহকারে এই দিন পালনের নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন (দ্র. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬৭০)। তবে তিনি অন্যান্য দিবসের মত কখনও কখনও শনিবারও সাওম (রোযা) পালন করিতেন। যেমন বলা হইয়াছে যে, তিনি কোনও মাসের শনি, রবি ও সোমবার সাওম পালন করিলে পরবর্তী মাসের মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার সাওম পালন করিতেন (তিরমিযী, সাওম, বাব ৪৪, নং ৬৯৪)। কিন্তু অপর হাদীছে শনিবার সাওম পালন করিতে নিষেধ করা হইয়ছে। যেমন তিনি

বলেন ঃ তোমাদের উপর ফরযকৃত সাওম ব্যতীত শনিবারে তোমরা কোনও সাওম পালন করিও না। তোমাদের কেহ যদি (সেই দিনের আহারের জন্য) আঙ্গুর লতার বাকল অথবা গাছের ডাল ব্যতীত অন্য কিছু না পায়, তাহা হইলে সে যেন (রোযা ভাঙ্গার জন্য) উহাই চিবায় (তিরমিযী, সাওম, বাব ৪৩, নং ৬৯২; ইব্‌ন মাজা, সাওম, বাব ৩৮, নং ১৭২৬; সুনানুদ দারিমী, সাওম, বাব ৪০, নং ১৭৪৯; আবূ দাঊদ, সাওম, বাব ৫২ ; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ৬খ, নং ৩৬৮ ও ৩৮৬)। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, মাকরূহ হওয়ার কারণ কেবল শনিবারকে সাওম পালনের জন্য নির্দিষ্ট করা। কেননা ইয়াহূদীরা শনিবারের প্রতি বিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করিয়া থাকে (পূর্বোক্ত হাদীছের নিম্নে)।

একটি মূল্যায়ন

শনিবারের উক্ত ঘটনা হযরত দাঊদ (আ)-এর যুগে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কোনও কোনও তাফসীরকার ও ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অনেকে উহার কাল নির্দেশ করেন নাই। সংগত কারণে এই ঘটনা দাঊদ (আ)-এর সমকালীন বলিয়া মনে হয় না। কারণ দাঊদ (আ) ছিলেন একদিকে মহামর্যাদাবান নবী এবং অন্যদিকে তিনি ছিলেন সমকালীন একচ্ছত্র শাসক। তাঁহার রাজধানী বায়তুল মাকদিস হইতে ঘটনাস্থল আইলার দূরত্ব খুব বেশি নহে। কোন একটি সম্প্রদায় তাঁহার মত একজন মহান নবী ও দক্ষ শাসকের শাসনাধীন ও নিকটস্থ এলাকায় অবস্থান করিয়া দিনের পর দিন তাওরাতের একটি কঠোর বিধান (যাহা লংঘনের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড) অমান্য করিয়া দুষ্কর্মে লিপ্ত থাকিবে আর তিনি দেশের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হইয়া নীরব থাকিবেন, তাহাদের দমনের জন্য কোন সামরিক বাহিনী প্রেরণ করিবেন না তাহা যেমন প্রশাসনিক নীতিমালার পরিপন্থী তেমনি নবুওয়াতের শানেরও খেলাফ। ঘটনাটি তাঁহার আমলের পূর্বেও ঘটিতে পারে। কারণ তালূত-জালূতের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইসরাঈলীরা ছিল পথভ্রষ্ট ও পরাধীন, এমনকি তাহারা পৌত্তলিকতায়ও লিপ্ত ছিল। এইরূপ অধঃপতিত অবস্থায় তাহাদের যে কোনরূপ ধর্মবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া স্বাভাবিক।

ঘটনাটি দাঊদ ও সুলায়মান (আ) বংশের রাজত্বের পতনের পরেও ঘটিতে পারে। যেমন ইয়ারমিয়া (যিরমিয়) নবীর সময় জেরুসালেমের মূল শহরের সিংহদ্বার হইতে লোকেরা শনিবার মাল-সামান লইয়া চলিয়া যাইত এবং ঐ দিনের বিধিনিষেধের তোয়াক্কা করিত না। এই কারণে ইয়ারমিয়া নবী আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইয়াহূদীদের ধমক দিলেন যে, তাহারা এইভাবে শরীআতের প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিরোধিতা ত্যাগ না করিলে জেরুসালেমকে আগুনে পোড়াইয়া ফেলা হইবে (তু. যিরমিয়, ১৭ ঃ ২১-২৭)। হিযকিয়েল (যিহিষ্কেল) নবীর কিতাবেও শনিবারের অবমাননাকে ইয়াহূদীদের জাতীয় অপরাধসমূহের মধ্যে একটি মারাত্মক অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে (তু. যিহিষ্কেল, ২০ ঃ ১২-২৪)। অতএব সূরা আল-আ'রাফে শনিবার লংঘনের যে ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা এই সময়কার হওয়া অসম্ভব নহে (নিবন্ধকার)।

দাঊদ (আ)-এর প্রতি অপবাদ ও উহার অসারতা

ইয়াহূদীরা হযরত দাঊদ (আ)-এর মত নিষ্পাপ ও পূত চরিত্র নবীর উপর এমন একটি জঘন্য অপবাদ আরোপ করিয়াছে, যাহা বর্ণনার অযোগ্য এবং ইহাকে তাহাদের ধর্মগ্রন্থে প্রবিষ্ট করিতেও তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বাইবেলের ২য় শমূয়েল-এর ১১শ ও ১২শ অধ্যায়ে এই ঘটনা বিবৃত হইয়াছে। একদল মুফাসসির ও ঐতিহাসিক কুরআন মজীদে দাঊদ (আ) সম্পর্কে উক্ত কয়েকটি আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাইবেলের সেই উপাখ্যানও বর্ণনা করিয়াছেন এবং অপর দল ইহাকে একটি বানোয়াট ঘটনা বিবেচনায় সতর্কতার সহিত বর্জন করিয়াছেন। সূরা সাদ-এ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهَلْ اَتٰكَ نَبَؤُاالْخَصْمِ اِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۔ اِذْ دَخَلُواْ عَلٰى دَاؤُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لاَ تَخَفْ خَصْمٰنِ بَغٰى بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلاَ تُشْطِطْ وَاهْدِنَا اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۔ اِنَّ هٰذَا اَخِىْ لَهُ تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ نَعْجَةً وَلِىَ نَعْجَةٌ وَّاحِدَةٌ فَقَالَ اَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِىْ فِى الْخِطَابِ ۔ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلٰى نِعَاجِهٖ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِىْ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَقَلِيْلٌ مَّاهُمْ وَظَنَّ دَاؤُدُ اَنَّمَا فَتَنّٰهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّاَنَابَ ۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذٰلِكَ وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ ۔

"তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়াছে কি, যখন তাহারা প্রাচীর টপকাইয়া ইবাদতখানায় প্রবেশ করিয়াছিল? তাহারা যখন দাঊদের নিকট পৌঁছিল তখন সে ঘাবড়াইয়া গিয়াছিল তাহাদের কারণে। তাহারা বলিল, আপনি ঘাবড়াইবেন না, আমরা দুই বিবদমান পক্ষ, আমাদের একে অপরের উপর যুলুম করিয়াছে। অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন, অবিচার করিবেন না এবং আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। এই ব্যক্তি আমার ভাই, তাহার আছে নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার আছে মাত্র একটি দুম্বা। সে বলে, ইহাকে আমার যিম্মায় দিয়া দাও এবং কথায় সে আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করিয়াছে। দাঊদ বলিল, তোমার দুম্বাটিকে তাহার দুম্বাগুলির সহিত যুক্ত করিবার দাবি করিয়া সে তোমার প্রতি যুলুম করিয়াছে। শরীকদের অনেকে একে অপরের উপর অবিচারই করিয়া থাকে, করে না কেবল সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ এবং তাহারা সংখ্যায় অল্প। দাঊদ বুঝিতে পারিল যে, আমি তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছি। অতঃপর সে তাহার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, সিজদায় লুটাইয়া পড়িল এবং তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তন করিল। অতএব আমি তাহার ত্রুটি ক্ষমা করিলাম এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম" (৩৮ ঃ ২১-২৫)।

উপরিউক্ত আয়াত কয়টি কুরআন মজীদের 'মুতাশাবিহ' (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, পরীক্ষার বিষয় কি ছিল এবং হযরত দাঊদ (আ) কি ভুল করিয়াছিলেন, যে কারণে তিনি ক্ষমাপ্রার্থী হইলেন এবং আল্লাহ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। উক্ত আয়াতগুলির সহিত শরীয়াতের আদেশ-নিষেধ বা হালাল-হারাম কোন বিষয়েরও সম্পর্ক নাই। বস্তুত

এই জাতীয় বিষয়ে কুরআনের নির্দেশে অস্পষ্টতা থাকিলে রাসূলুল্লাহ্ (স) তাহা নিজের কথা বা কর্মের দ্বারা দূর করিয়া দিতেন। অতএব কুরআন মজীদে যেভাবে যতখানি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে তাহার উপর সেইভাবে ততখানি ঈমান আনা কর্তব্য এবং অস্পষ্ট বিষয়কে অস্পষ্ট হিসাবে রাখা বাঞ্ছনীয়। পূর্বকালের বিশেষজ্ঞ আলিমগণের একটি নীতি এই যে, "আবহিমূ মা আবহামাহুল্লাহ" (আল্লাহ্ যাহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন তোমরা তাহা অস্পষ্ট থাকিতে দাও)।

তবে কোনও কোনও তাফসীরকার দাউদ (আ)-এর পরীক্ষার বিষয়টি প্রচলিত প্রবচন (লোককাহিনী) ও পূর্ববর্তীদের মতামতের আলোকে নির্ধারণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। বাইবেলে বর্ণিত কাহিনী অনুযায়ী, একদা হযরত দাঊদ (আ)-এর দৃষ্টি তাঁহার প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য হিত্তীয় উরিয়ার স্ত্রী ও ইলয়াসের কন্যা বৎশেবার উপর পতিত হইল। তাঁহার মনে তাহাকে বিবাহ করার আকাঙ্খা জাগ্রত হইল। তিনি উরিয়াকে হত্যা করানোর উদ্দেশ্যে তাহাকে ভয়ানক বিপদজনক যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করেন। ফলে সে এক যুদ্ধে নিহত হয়। পরে এক সময় দাউদ (আ) তাহার পত্নীকে বিবাহ করেন (দ্র. ২-সমূয়েল, ১২ ঃ ১-৮৯)। কোন কোন মুফাসসির এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু পার্থক্য এই যে, বাইবেল তাঁহার প্রতি ব্যভিচারের যে ন্যাক্কারজনক অপবাদ আরোপ করিয়াছে, মুফাসসিরগণ তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। রাযী (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ)-এর ক্ষমা প্রার্থনা সংক্রান্ত বিষয় উল্লেখের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার এমন দশটি সদগুণের উল্লেখ করিয়াছেন যাহার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাহাঁর দ্বারা কোন প্রকার গর্হিত কর্ম প্রকাশ পাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। (১) আল্লাহ তা'আলা মহানবী (স)-কে দাউদ (আ)-এর ন্যায় ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিয়াছেন (৩৮ ঃ ১৭)। (২) আল্লাহ তা'আলা দাউদ (আ)-কে তাঁহার বান্দা বলিয়া বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়াছেন (৩৮ ঃ ১৭), যেমন মুহাম্মদ (স)-কে তাঁহার বান্দা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (তু. ১৭ ঃ ১)। (৩) আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারীরূপে অভিহিত করিয়াছেন, যাহারা সাহায্যে তিনি আল্লাহ্র আনুগত্যে অবিচল থাকিতেন (৩৮ ঃ ১৭)। (৪) তিনি ছিলেন আল্লাহ অভিমুখী (৩৮ ঃ ১৭)। (৫) আল্লাহ পর্বতমালাকে তাঁহার সহিত তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন (৩৮ ঃ ১৮) এবং (৬) দলবদ্ধ বিহঙ্গ কুলকেও (৩৮ ঃ ১৯)। (৭) সবকিছুই ছিল তাঁহার অনুগত (৩৮ ঃ ১৮) অর্থাৎ দাউদ (আ) যখনই আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণায় নিয়োজিত হইতেন তখনই পর্বতমালা ও বিহঙ্গকুলও তাহাতে সাড়া দিত। (৮) আল্লাহ তা'আলা তাঁহার কর্তৃত্ব ও রাজত্বকে সুসংহত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইব্ন আব্বাস (রা) একটি মোকদ্দমার ঘটনা বর্ণনা করেন। এক ব্যক্তি দাউদ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ দায়ের করে যে, অমুক ব্যক্তি তাহার একটি গরু অন্যায়ভাবে তাহার দখলভুক্ত করিয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দরবারে তলব করিয়া জিজ্ঞাসা করা হইলে সে উক্ত অভিযোগ অস্বীকার করে। তিনি বাদীকে সাক্ষ্য প্রমাণ পেশ করিতে বলিলে সে তাহাতে ব্যর্থ হয়। রাত্রে দাউদ (আ) স্বপ্নে দেখিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বিবাদীকে হত্যা করার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দিতেছেন। তিনি মনে করিলেন, ইহা একটি স্বপ্ন মাত্র। তাই তিনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ হইতে বিরত থাকেন। পরে তাঁহাকে ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বিবাদীকে হত্যার নির্দেশ দেন। অতএব তিনি

বিবাদীকে ডাকাইয়া তাহাকে অবহিত করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন। বিবাদী বলিল, আল্লাহ সঠিক নির্দেশ দিয়াছেন। আমি বাদীর পিতাকে ধোঁকা দিয়া হত্যা করিয়াছিলাম। অতঃপর দাঊদ (আ) তাহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এই জাতীয় ঘটনা তাঁহার রাজত্বকে সুসংহত করে (তাফসীর কবীর, ২৬খ, পৃ. ১৮৭; তাহযীব তা'রীখ দিমাশক, ৫খ, ১৯৬)।
(৯) আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে হিকমাত তথা নবুওয়াত-সঞ্জাত প্রজ্ঞা দান করিয়াছেন (৩৮ ঃ ২০)।
(১০) আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে ফয়সালাকর বাগ্মিতা দান করিয়াছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও বাকপটুতার উচ্চ পর্যায়ে উন্নীত হওয়া ছাড়া কাহারও পক্ষে এই গুণ অর্জন করা সম্ভব নহে। অতএব আল্লাহ্ তা'আলা যাহার মধ্যে এতগুলি উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটাইয়াছেন তাঁহার দ্বারা কোন অপকর্ম সংঘটিত হইতে পারে না (তাফসীরে কবীর, ২৬ খ, পৃ. ১৮৪-৮৮ ও ১৮৯-৯০)। এজন্যই হযরত আলী (রা) তাঁহার খিলাফতকালে একটি অধ্যাদেশ জারী করেন ঃ

مَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيْثِ دَاؤُدَ عَلٰى مَا يَرْوِيْهِ الْقَصَّاصُ جَلَّدْتُهُ مِائَةً وَسِتِّيْنَ.

"কোন ব্যক্তি কাহিনীকারগণের বর্ণিত দাঊদ (আ) সম্পর্কিত ঘটনা তোমাদের নিকট বর্ণনা করিলে আমি তাহাকে এক শত ষাট বেত্রাঘাত করিব" (তাফসীরে কবীর, ২৬ খ, পৃ. ১৯২; তাফসীরে কাশশাফ, ৩খ., পৃ. ৩৬৭; তাফসীরে বায়দাবী, ৩খ, পৃ. ২৩৩; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭১; নাজ্জারের কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩১২)।

উপরন্তু মোকদ্দমা সংক্রান্ত ঘটনা এবং দাঊদ (আ)-এর ক্ষমা প্রার্থনার কথা উল্লেখের পরও আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে আরও কয়টি গুণে গুণান্বিত করিয়াছেন এবং তাহাকে রাষ্ট্রনায়ক নিয়োগের ঘোষণা দিয়াছেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ. يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

"তাহার জন্য আমার নিকট রহিয়াছে নৈকট্যের মর্যাদা ও উত্তম পরিণাম। হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানাইয়াছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করিও না। কেননা ইহা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হইতে বিচ্যুত করিবে" (৩৮ ঃ ২৫-২৬)।

অতএব ঘটনার পূর্বাপর বর্ণনাই প্রমাণ করে যে, উরিয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তাহার স্ত্রীর সহিত অবৈধ সম্পর্কের ঘটনা সম্পূর্ণ বানোয়াট এবং দুশ্চরিত্র ইয়াহূদী ও কাহিনীকারদের অপপ্রচার মাত্র।

মোকদ্দমা ও ক্ষমা প্রার্থনার বিষয় হিসাবে বিভিন্ন তাফসীরকার ও ঐতিহাসিক ভিন্ন ঘটনাকে উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন, উরিয়ার সহিত বতসেবার বিবাহ হয় নাই, বরং সে তাহার পরিবারের নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠাইয়াছিল, অতঃপর হযরত দাঊদ (আ)-ও বিবাহের প্রস্তাব

পাঠান। ইহাতে তাহার পরিবার প্রভাবিত হয়। এখানে তাঁহার ত্রুটি এই ছিল যে, তিনি তাঁহার একজন মুসলিম ভ্রাতার প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব দিয়াছেন, অথচ তখনও তাঁহার একাধিক স্ত্রী ছিল (তাফসীরে কবীর, ২৬ খ., পৃ. ১৯২; জাসসাসের আহ্কামুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩৭৯)।

কোন কোন তাফসীরকার বলেন, হযরত দাঊদ (আ) তাঁহার কর্মসূচীকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়াছিলেন ঃ এক দিন আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য, এক দিন বিচারকার্য পরিচালনার জন্য, একদিন স্বীয় পরিবার-পরিজনের তদারকি করার জন্য এবং এক দিন ইসরাঈলীদেরকে ওয়াজ-নসীহত করার জন্য। আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তিনি নিজের সময়ের এইরূপ বণ্টন করিয়াছিলেন, যাহার দরুন তিনি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন (আহকামুল কুরআনের বরাতে মা'আরেফুল কোরআন, বাংলা অনু., ই. ফা., ১৪০১/১৯৯৪, ৭খ, পৃ. ৪৯০; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭১; হাকেম, মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৮৬; শেষোক্ত দুই গ্রন্থে তাঁহার সময় তিন ভাগে বিভক্ত করার কথা উল্লেখ আছে)।

পরিশেষে বলা যায়, ঘটনা যাহাই ঘটিয়া থাকুক, আল্লাহ তা'আলা তাহা স্পষ্ট করেন নাই, তাই আমাদেরকেও সেই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করাই উচিত। মহানবী (স) বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْداً فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا ·

"আল্লাহ তা'আলা কতগুলি বিষয় ফরযরূপে নির্ধারণ করিয়াছেন, সেগুলি বিনাশ করিও না, কতগুলি বিষয় হারাম করিয়াছেন, সেগুলির মর্যাদাহানি (লংঘন) করিও না, কতগুলি সীমা নির্ধারণ করিয়াছেন, সেগুলি অতিক্রম করিও না এবং কতগুলি বিষয়ে ভুলে নহে, ইচ্ছাকৃতভাবেই নীরব রহিয়াছেন, সেইগুলি নিয়া বিতর্কে বা আলোচনায় লিপ্ত হইও না" (দারু কুতনীর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাব আল-ই'তিসাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ, সর্বশেষ হাদীছ)।

وَاعْمَلُوْا بِالْمُحْكَمِ وَاٰمِنُوْا بِالْمُتَشَابِهِ وَاعْتَبِرُوْا بِالْاَمْثَالِ ·

"তোমরা মুহ্কাম আয়াত অনুযায়ী আমল কর, মুতাশাবিহ্ আয়াতের উপর ঈমান আনো এবং উপদেশ সম্বলিত আয়াত হইতে উপদেশ গ্রহণ কর" (মাসাবীহু'স-সুন্নাহ ও বায়হাকীর শু'আবুল ঈমান-এর বরাতে মিশকাতুল মাসাবীহ, পূর্বোক্ত অধ্যায় ও বাব, আল-ফাসলু'ছ-ছালিছ)।

সূরা সাদ-এর তিলাওয়াতের সিজদা

সূরা সাদ-এর ২৪ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করিলে সিজদা দিতে হয়। হানাফী মাযহাবমতে এখানে সিজদা করা ওয়াজিব, শাফিঈ মাযহাবমতে ঐচ্ছিক, কারণ ইহা একজন নবীর তওবা মাত্র। এই বিষয়ে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে তিনটি হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে।

(১) ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, সূরা সাদ-এর সিজদা অত্যাবশ্যকীয় সিজদাসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে। তবে নবী (স)-কে আমি ইহাতে সিজদা করিতে দেখিয়াছি (বুখারী, বাংলা সং, ই.ফা., পৃ. ২৭২, বাব ৬৮৬, নং ১০০৮; তিরমিযী, সাফার, বাব ১৫, নং ৫৩৮; আবূ দাউদ, ই.ফা., বাংলা সং, ২খ, পৃ. ২৯২, সালাত, বাব ৩৩৮, নং ১৪০৯; মুসনাদে আহ্‌মাদের বরাতে বিদায়া, ২খ, পৃ. ১২-১৩।

(২) সূরা সাদ-এ নবী (স) সিজদা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন ঃ দাঊদ (আ) তওবাস্বরূপ সিজদা করিয়াছিলেন, আর আমরা শুকরিয়াস্বরূপ সিজদা করিতেছি অর্থাৎ তাঁহার তওবা কবুল হইয়াছে বিধায় আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি (নাসাঈ, ইফতিতাহ, বাব সুজূদিল কুরআন)।

(৩) মুজাহিদ (র) ইব্‌ন আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, সূরা সাদ-এ কি সিজদা আছে? তিনি বলেন, হাঁ (বুখারী, তাফসীর সূরা আন'আম, নং ৪২৭১, আধুনিক প্রকাশনী সং, ৪খ, পৃ. ৩৮৮)।

আবূ সাঈদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মিম্বারে দাঁড়াইয়া সূরা সাদ তিলাওয়াত করেন। তিনি সিজদার আয়াত পড়ার পর নিচে নামিয়া সিজদা করেন এবং তাঁহার সঙ্গের লোকজনও সিজদা করে। তিনি অন্য এক দিনও এই সূরা পাঠ করেন এবং সিজদার আয়াতে পৌছিলে লোকজন সিজদা দিতে উদ্যত হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ ইহা তো একজন নবীর তওবার সিজদা। কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতেছি যে, তোমরা সিজদা করিতে উদ্যত হইয়াছ। অতএব তিনি নিচে নামিয়া সিজদা করেন এবং তাহারাও সিজদা করে (আবূ দাউদ, পূর্বোক্ত সং, সালাত, বাব ৩৩৮, নং ১৪১০)।

অতএব ইমামগণের সর্বসম্মতভাবে না হইলেও সূরা সাদ-এ তিলাওয়াতের সিজদা ওয়াজিব হওয়ার মতই অগ্রাধিকারযোগ্য (তু. তাফ্‌হীমুল কুরআন, উক্ত সূরার ২৬ নং টীকা)। কথিত আছে যে, হযরত দাঊদ (আ) সিজদারত অবস্থায় চল্লিশ দিন কাটাইয়া দেন, কেবল জরুরী প্রয়োজন ছাড়া সিজদা হইতে উঠিতেন না (তাফসীরে কাশশাফ, ৩খ, পৃ. ৩৭১; আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ১৩; সার্বিক আলোচনার জন্য দ্র. জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩৮০; ইবনুল আরাবী, আহ্‌কামুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৬৪০; কুরতুবী, আহ্‌কামুল কুরআন, ১৫ খ, পৃ. ১৮৩-৪; তাফসীর মাজহারী, ৮খ, পৃ. ১৬৯)।

দাঊদ (আ)-এর মু'জিযা ও মর্যাদা

কুরআন মজীদের তিন স্থানে দাঊদ (আ)-এর সহিত পাহাড়-পর্বত ও বিহঙ্গকুলের আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁহার মহিমা ঘোষণায় যোগ দেওয়ার কথা উদ্ধৃত হইয়াছে। যেমন, "আমি পর্বতমালা ও পক্ষীকুলকে অধীন করিয়া দিয়াছিলাম, ইহারা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিত। আমিই ছিলাম এইসবের কর্তা" (২১ ঃ ৭৯)।

"নিশ্চয় আমি দাউদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছি। হে পর্বতমালা! দাউদের সহিত আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং পক্ষীকুলকেও (একই নির্দেশ দিয়াছি)" (৩৪ ঃ ১০)।

"আমি পর্বতমালাকে নিয়োজিত করিয়াছিলাম যেন ইহারা সকাল-সন্ধ্যায় তাহার সহিত আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং সমবেত পক্ষীকুলকেও (নিয়োজিত করিয়াছিলাম), সকলেই ছিল তাঁহার অভিমুখী" (৩৮ ঃ ১৮-১৯)।

হযরত দাঊদ (আ)-এর সহিত তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া পাহাড়-পর্বত ও পক্ষীকুলের আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণায় শরীক হওয়া একটি সুপ্রসিদ্ধ বিষয়। আল্লাহ তা'আলা দাঊদ (আ)-কে প্রদত্ত গুণাবলীর সহিত তাঁহাকে সুমধুর কণ্ঠস্বরও দান করিয়াছিলেন। তিনি যখন যাবূর কিতাব পাঠ করিতেন তখন পক্ষীকুল শূন্যলোকে থামিয়া যাইত এবং তাঁহার সহিত আল্লাহ্‌র মহিমা ঘোষণায় শরীক হইত। একইভাবে পর্বতমালা, তরুলতা ইত্যাদি হইতেও তাসবীহ্‌র আওয়াজ শোনা যাইত। ইহা ছিল দাঊদ (আ)-কে আল্লাহ প্রদত্ত একটি মুজিযা। প্রতিটি অচেতন বস্তুর মধ্যেও মুজিযারূপে চেতনা সৃষ্টি হইতে পারে। প্রামাণ্য সত্য এই যে, পাহাড় ও পাথরসমূহের মধ্যেও ইহাদের উপযোগী জীবন ও চেতনা বিদ্যমান রহিয়াছে (মাআরেফুল কোরআন, পৃ. ৮৮৪, তাফহীম, সূরা আম্বিয়া, ৭১ নং টীকা; তাফসীরে কবীর, ২১খ, পৃ. ১৯৯; বিদায়া, বালাম ১, ২খ, পৃ. ১০-১১)। যেমন কুরআন মজীদে পাথর সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهٰرُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَاِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ .

"কতক পাথর এমন যে, উহা হইতে নদী-নালা প্রবাহিত হয় এবং কতক এইরূপ যে, বিদীর্ণ হওয়ার পর উহা হইতে পানি নির্গত হয়, আবার কতক এমন যে, তাহারা আল্লাহ্‌র ভয়ে ধ্বসিয়া পড়ে" (২ ঃ ৭৪)।

বস্তুত আল্লাহ্‌র প্রতিটি সৃষ্টিই নিজ নিজ ভাষায় তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرُ صٰفّٰتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ .

"তুমি কি দেখ না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহারা আছে তাহারা এবং দলবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুল আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইবাদতের ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জ্ঞাত আছে" (২৪ ঃ ৪১)।

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ .

"সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যের সমস্ত কিছু তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। এমন কিছু নাই যাহা তাঁহার সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না, কিন্তু উহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা বুঝিতে পার না" (১৭ ঃ ৪৪; আরও দ্র. ১৩ ঃ ১৩; ৫৯ ঃ ২৪; ৬২ ঃ ১; ৬৪ ঃ ১ ও ২১ঃ ২০)।

আল্লামা যামাখশারী (র) ও অপরাপর তাফসীরকার বলেন, ইহা অবাস্তব নহে যে, আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি বস্তুর মধ্যে এই পরিমাণ বোধশক্তি ও চেতনা নিহিত রাখিয়াছেন, যাহা দ্বারা সে তাহার স্রষ্টা প্রভুর পরিচয় জানিতে পারে। ইহাও অবাস্তব নহে যে, ইহাদেরকে বিশেষ প্রকারের ভাষাজ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং বিশেষ প্রকার তাসবীহ ও ইবাদত-বন্দেগীর নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে তাহারা মশগুল থাকে (মাআরেফুল কোরআন, পৃ. ৯৪৮)।

"কিন্তু তোমরা তাহাদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা বুঝিতে পার না" অর্থাৎ সকল মানুষ বুঝিতে না পারিলেও আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে তাহা বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছেন। "আমিই ছিলাম ইহার কর্তা" (২১:৭৯) অর্থাৎ এইসব স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ ঘটনা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশেই ঘটিয়াছিল।

উক্ত আয়াতসমূহ হইতে স্বতই প্রমাণিত হয় যে, দাউদ (আ) যখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করিতেন, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন এবং তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতেন, তখন তাঁহার সুমধুর সুরের ঝংকারে পাহাড়-পর্বত, পক্ষীকুল ইত্যাদি বিমোহিত হইয়া তাঁহার সুরে সুর মিলাইত। মহানবী (স)-এর পবিত্র বাণী হইতেও দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরের প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার অন্যতম সাহাবী আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-র কণ্ঠস্বর ছিল অসাধারণ সুমধুর। একদা তিনি কুরআন তিলাওয়াত করিতেছিলেন এবং মহানবী (স) এই দিক দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন এবং দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া তাঁহার তিলাওয়াত শুনিলেন। তিনি তিলাওয়াত শেষ করিলে মহানবী (স) বলেন ঃ

لَقَدْ أُوْتِىَ مِزْمَاراً مِنْ مَزَامِيْرِ الِ دَاوُدَ .

"এই ব্যক্তিকে দাউদ (আ)-এর সুমধুর কণ্ঠস্বরের এক অংশ দেওয়া হইয়াছে।"

এখানে 'মাযামীর' বলিতে দাউদ (আ)-এর সুললিত কণ্ঠে আল্লাহ তা'আলার মহিমা ও পবিত্রতা সম্পর্কিত আসমানী কিতাবের বাণীসমূহ তিলাওয়াত বুঝায় যাহা তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের পরিবেশেও প্রতিধ্বনিত হইত।

হযরত দাউদ (আ)-এর মু'জিযা ঃ লৌহবর্ম

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ)-কে যে প্রজ্ঞাপূর্ণ জ্ঞান দান করিয়াছিলেন, লৌহবর্ম নির্মাণ সংক্রান্ত প্রযুক্তিও তাহার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদের দুই স্থানে এই সংক্রান্ত বর্ণনা আসিয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "এবং আমি তাহাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণ শিক্ষা দিয়াছিলাম, যাহাতে তাহা তোমাদের যুদ্ধে তোমাদেরকে রক্ষা করে। অতএব তোমরা কি কৃতজ্ঞ হইবে না" (২১ ঃ ৮০)?

"আর আমি তাহার জন্য নমনীয় করিয়াছিলাম লৌহ, যাহাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম নির্মাণ করিতে এবং বুননে পরিমাপ রক্ষা করিতে পার" (৩৪ ঃ ১০)।

দাউদ (আ)-এর বর্ম নির্মাণ প্রযুক্তি আয়ত্ত করা সম্পর্কে ইব্ন আসাকির বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার জীবনকালের উল্লেখযোগ্য সময় আল্লাহ্র ইবাদতে ও অসহায়ের সেবায় ব্যয় করেন। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশে বাহিরে যাইতেন এবং আগন্তুকদের নিকট তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি তাহাদেরকে নিজের পরিচয় গোপন রাখিয়া নিজের সম্পর্কে তাহাদের মতামত অবহিত হইতেন। তাহারা বলিত, তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার উম্মতের জন্য আল্লাহ্র এক কল্যাণময় সৃষ্টি। একদা আল্লাহ তা'আলা একজন ফেরেশতাকে মানববেশে তাঁহার নিকট পাঠাইলে তিনি তাহাকেও একইভাবে জিজ্ঞাসা করেন। ফেরেশতাবেশে মানবও তাঁহার সম্পর্কে একই মন্তব্য করেন। দাউদ (আ) আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন যে, তিনি তাঁহাকে এমন একটি পেশা শিখাইয়া দিন যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার ও তাঁহার পরিবারবর্গের জীবিকার ব্যবস্থা করিতে পারেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার দু'আ কবুল করেন, তাঁহাকে লৌহবর্ম নির্মাণের কৌশল শিখাইয়া দেন। তিনি উহা নির্মাণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইতেন তাহার এক-তৃতীয়াংশ দান-খয়রাত করিতেন, এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা পরিজনবর্গের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করিতেন এবং যেদিন অন্যরূপ ব্যস্ততার কারণে কাজ করিতে পারিবেন না সেদিন দান-খয়রাত করার জন্য এক-তৃতীয়াংশ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন (তাহ্যীব তারীখ দিমাশক, ৫খ, পৃ. ১৯৩-৪)।

স্বশ্রমে উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহ একটি প্রশংসনীয় বিষয়। মহানবী (স) বলেন ঃ "স্বহস্তে বা স্বশ্রমে উপার্জিত খাদ্য অপেক্ষা উত্তম খাদ্য কেহ ভক্ষণ করে নাই। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আ) স্বশ্রমে উপার্জন করিয়া জীবিকা নির্বাহী করিতেন" (বুখারী, বুয়ূ, বাব ১৫, নং ১৯২৭)।

আধুনিক কালের ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও খননকার্যে প্রমাণিত হয় যে, মানব সমাজে লৌহ ব্যবহারের যুগ খৃ. পূ. ১২০০-১০০০ বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে শুরু হইয়াছিল। ইহাই ছিল হযরত দাউদ (আ)-এর সময়কাল। আকাবা ও আয়লা সন্নিহিত হযরত সুলায়মান (আ)-এর আমলের সামুদ্রিক বন্দর ইচুউন জাবির-এর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে যে কারখানার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করা হইয়াছে যে, তাহাতে এমন সব সূত্র প্রয়োগ করা হইত, যাহা বর্তমান কালের Blast Furnace-এ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। হযরত দাউদ (আ) সর্বপ্রথম সর্বাধিকভাবে এই নূতন পন্থাকে সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়াছেন (তাফহীম, সূরা আম্বিয়া, ৭১ নং টীকা)। "আমি দাউদের জন্য লৌহ নরম করিয়া দিয়াছিলাম" অর্থাৎ তাঁহার হাতের স্পর্শে লোহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নরম হইয়া যাইত। তিনি মোমের ন্যায় ইহাকে যেভাবে ইচ্ছা মোটা, সরু, লম্বা, চওড়া করিতে পারিতেন। ইহার জন্য কঠোর শ্রম ও লোহারের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিছুই দরকার হইত না (মা'আরিফুল কুরআন, সৌদী সং, পৃ. ৮৮৪; কাসাসুল কুরআন-হিফজুর রহমান, ২খ, পৃ. ২৮৪; কাসাসুল আম্বিয়া, নাজ্জার, পৃ. ৩১০)। ইমাম রাযী (র) বলেন, হযরত দাউদ (আ)-ই সর্বপ্রথম লৌহবর্ম নির্মাণ করেন, অতঃপর লোকেরা তাঁহার নিকট হইতে ইহার নির্মাণবিদ্যা শিক্ষা করে এবং এইভাবে তাহারা উহার উত্তরাধিকারী হয় (তাফসীরে কবীর, ২১খ, ২০১)।

যে শিল্প দ্বারা সমাজের মানুষ উপকৃত হয়, তাহাদের প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং পেশাগত বা অন্য কাজে লাগে সেই শিল্প উৎপাদন করা অত্যন্ত ছওয়াবের কাজ। মহানবী (স) বলেন ঃ

"যে শিল্পী তাহার শিল্পকর্মের সওয়াব লাভের নিয়ত রাখে সে মূসা (আ)-এর মাতার অনুরূপ। তিনি নিজ সন্তানকে দুধ পান করাইয়া অপরের নিকট হইতে পারিশ্রমিকও পাইয়াছিলেন" (মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ, ২১২)।

নবী-রাসূলগণও কায়িক শ্রমে নিয়োজিত হইয়াছেন। যেমন দাউদ (আ) শস্য বপন ও কর্তন করিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি জনসাধারণের উপকার সাধনের অভিপ্রায়ে শিল্পকর্ম করে, সে জনসেবার সওয়াব তো পাইবেই, উপরন্তু শিল্পকর্মের পার্থিব উপকারও প্রাপ্ত হইবে (মা'আরিফুল কুরআন, সৌদী সং, পৃ. ৮৮৪-৫; আরও দ্র. পৃ. ৮৫২)।

পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা

আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-কে মুজিয়াস্বরূপ পাখীর ভাষা বুঝিবার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। একই ভাষাভাষী মানুষ যেমন সহজেই পরস্পরের কথা বুঝিতে পারে, তদ্রূপ তাঁহারাও পাখির ডাক শুনিয়া তাহার অর্থ বুঝিতে পারিতেন। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۰

"সুলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হইল এবং সে বলিল, হে জনগণ! আমাদেরকে পক্ষীকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাদেরকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে" (২৭ ঃ ১৬)।

আল্লামা বায়দাবী (র) বলেন, 'উল্লিমনা' ও 'উতীনা' ক্রিয়াপদদ্বয়ের সর্বনাম (দামীর) দ্বারা পিতা-পুত্র উভয়কে বুঝানো হইয়াছে (নাজ্জার, কাসাস, পৃ. ৩১০; আরও তু. আনওয়ারে আম্বিয়ড়, পৃ. ১১০-১১; কাসাসুল কুরআন, বাংলা অনু., ২খ, পৃ. ২৮৫)। তবে অনেক তাফসীরকারের মতে কেবল সুলায়মান (আ)-কে এই ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছিল।

সুলায়মান (আ) দাউদ (আ)-এর উত্তরাধিকারী

আল্লাহ তা'আলা যোগ্য পিতাকে যোগ্য উত্তরাধিকারী পুত্র দান করিয়াছিলেন (দ্র. ২৭ ঃ ১৬)।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ ۰

"আমি দাউদকে দান করিয়াছিলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী" (৩৮ ঃ ৩০)।

পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সুলায়মান (আ) তাঁহার পিতার রাজত্বকে আরও সম্প্রসারিত করিয়া উহাকে দৃঢ়তা দান করেন, সাবা সাম্রাজ্যকে ইসলামী শাসনাধীনে আনয়ন করেন এবং সাবার রাণী বিলকীস পারিষদবর্গসহ শির্ক ত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন (বিস্তারিত দ্র. শিরো. সুলায়মান আ.)।

এখানে উত্তরাধিকার বলিতে ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বুঝানো হয় নাই, বরং নবুওয়াত ও খিলাফাতের উত্তরাধিকার বুঝানো হইয়াছে। কারণ তিনি একাধারে নবুওয়াত প্রাপ্ত হন এবং পিতার পরে তাঁহার রাজ্যের অধিপতি হন। অতএব উক্ত আয়াত মহানবী (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীর বিরোধী নহে ঃ

لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ٠

“আমাদের (নবী-রাসূলগণের) ওয়ারিছ হয় না, আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা সাদাকা” (বুখারী, জিহাদ, বাব ২০২, নং ২৮৬৩; ই'তিসাম, ৫খ, পৃ. ৪২৪, নং ৬৭৯৫; নাফাকাত, ৫খ, পৃ. ১৬৩-৪, নং ৪৯৫৮; মুসলিম, জিহাদ, ৬খ, নং ৪৪২৫, ৪৪২৭-৮, ৪৪৩০, ৪৪৩৩; তিরমিযী, সিয়ার, বাব ৪৩, নং ১৫৫৪, ১৫৫৬)।

اِنَّ النَّبِىَّ لاَ يُوْرَثُ اِنَّمَا مِيْرَاثُهُ فِىْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمَسَاكِيْنِ٠

“নবীর ওয়ারিছ হয় না। তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি মুসলমানদের ফকীর-মিসকীনদের জন্য” (মুসনাদে আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ১০, ১৩)।

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الاَنْبِيَاءِ وَاِنَّ الاَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرِثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَلٰكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ ٠

“আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ। নবীগণ দীনার কিংবা দিরহাম (ধন-সম্পদ) রাখিয়া যান নাই, বরং রাখিয়া গিয়াছেন জ্ঞান” (আবূ দাঊদ, ইলম, বাব ১; তিরমিযী, ইলম, বাব ১৯, নং ২৬১৯; ইবন মাজা, মুকাদ্দিমা, বাব ১৭, নং ২২৩)।

অতএব সুলায়মান (আ) তাঁহার পিতার নবুওয়াত ও রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যাদির ওয়ারিছ হইয়াছিলেন (বিস্তারিত দ্র. তাফসীরে কবীর, ২৪খ, পৃ. ১৮৬; তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৫৬১-২, টীকা ২০; মাআরেফুল কোরআন, ৬ খ, পৃ. ৬২৩; রূহুল মাআনী, ১৯ খ, পৃ. ১৭০-১)।

দাঊদ (আ)-এর কণ্ঠস্বর

আল্লাহ তাআলা দাঊদ (আ)-কে এমন এক হৃদয়স্পর্শী সুললিত কণ্ঠস্বর দান করিয়াছিলেন যে, তাঁহার আবেগময় সুরমূর্ছনায় প্রতিটি প্রাণী বিমোহিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইত। তিনি যখন আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হইতেন বা আল্লাহ্র কিতাব তিলাওয়াত করিতেন তখন তাঁহার সুর মাধুর্যে প্রাণীজগত বিমোহিত হইয়া তাঁহার সহিত যিকিরে লিপ্ত হইত, এমনকি পাহাড়-পর্বতও যিকিরে শরীক হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর প্রবাদবাক্যে (লাহন-ই দাঊদ) পরিণত হইয়াছে (বিদায়া, ২খ,

পৃ. ১০-১১; তাহ্যীব তারীখ দিমাশক, ৫ খ, পৃ. ১৯৪-৫; আরাইস, পৃ. ২৯৭; নাজ্জার, কাসাস, পৃ. ৩১১; তাফসীরে কবীর, ২৬ খ., পৃ. ১৮৫)।

আইশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) আবূ মূসা আশআরী (রা)-র কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়া বলেন, আবূ মূসাকে দাউদ (আ)-এর সুর দান করা হইয়াছে (মুসনাদে আহ্মাদের বরাতে বিদায়া, ২খ, পৃ. ১১; একই বরাতে আবূ হুরায়রা (রা) কর্তৃকও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে)।

বাদ্যযন্ত্র শয়তানের আবিষ্কার। শয়তান যখন লক্ষ্য করিল যে, দাউদ (আ)-এর সুরমাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া মানব, পশু-পাখি, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি তাঁহার সহিত আল্লাহর যিকিরে মশগুল হইতেছে, তখন সে তাহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে তাহার অনুচরদিগকে নির্দেশ দিল। ইহারা দাউদ (আ)-এর ৭০টি সুর বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্রে নকল করিয়া মানুষকে পথভ্রষ্ট করে (আরাইস, পৃ. ২৯৭; তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৫খ, পৃ. ১৯৫-৬)।

এইজন্যই মহানবী (স) বাদ্যযন্ত্রকে "মাযামীরুশ শায়তান" (শয়তানের বাদ্যযন্ত্র) আখ্যায়িত করিয়াছেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া দুইটি বালিকাকে সংগীত পরিবেশন করিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ

أَبِمَزْمُوْرِ الشَّيْطَانِ فِيْ بَيْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"শয়তানের বাদ্যযন্ত্র দ্বারা কি রাসূলুল্লাহ (স)-এর গৃহে গান গাওয়া হইতেছে"! (মুসলিম, ঈদায়ন, নং ১৯৩১, ৩খ, ২৪৬; আরও দ্র. নং ১৯৩৫, পৃ. ২৪৮; বুখারী, মানাকিব, ৩খ, পৃ. ৬৫৯, বাব ১০৪, নং ৩৬৪১; জিহাদ, বাবা ৮০, নং ২৬৯২, পৃ. ১৩০-১)।

আনাস (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

صَوْتَانِ مَلْعُوْنَانِ فَاجِرَانِ أَنْهَى عَنْهُمَا صَوْتُ مِزْمَارٍ وَرَنَّةُ شَيْطَانٍ.

"দুইটি শব্দ অভিশপ্ত ও পাপিষ্ঠ, আমি সেই দুইটি নিষিদ্ধ করিতেছি ঃ বাদ্যযন্ত্রের শব্দ ও শয়তানের আওয়াজ" (জামে তিরমিযীর বরাতে কুরতুবী, ১৪খ, পৃ. ১৫৩)।

উল্লেখ্য যে, দাউদ (আ)-এর কণ্ঠস্বরকেও মিযমার (বাদ্যযন্ত্র) বলা হইয়াছে। তাহা বাদ্যযন্ত্র অর্থে নহে, বরং সুমধুর সুর হিসাবে।

শাসক ও সংগঠক হিসাবে হযরত দাউদ (আ)

হযরত দাউদ, (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তি ও রাজত্বলাভ সম্পর্কে কুরআন মজীদে পরিষ্কার বক্তব্য বিদ্যমান থাকিলেও তিনি কোনটি আগে লাভ করিয়াছেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই।
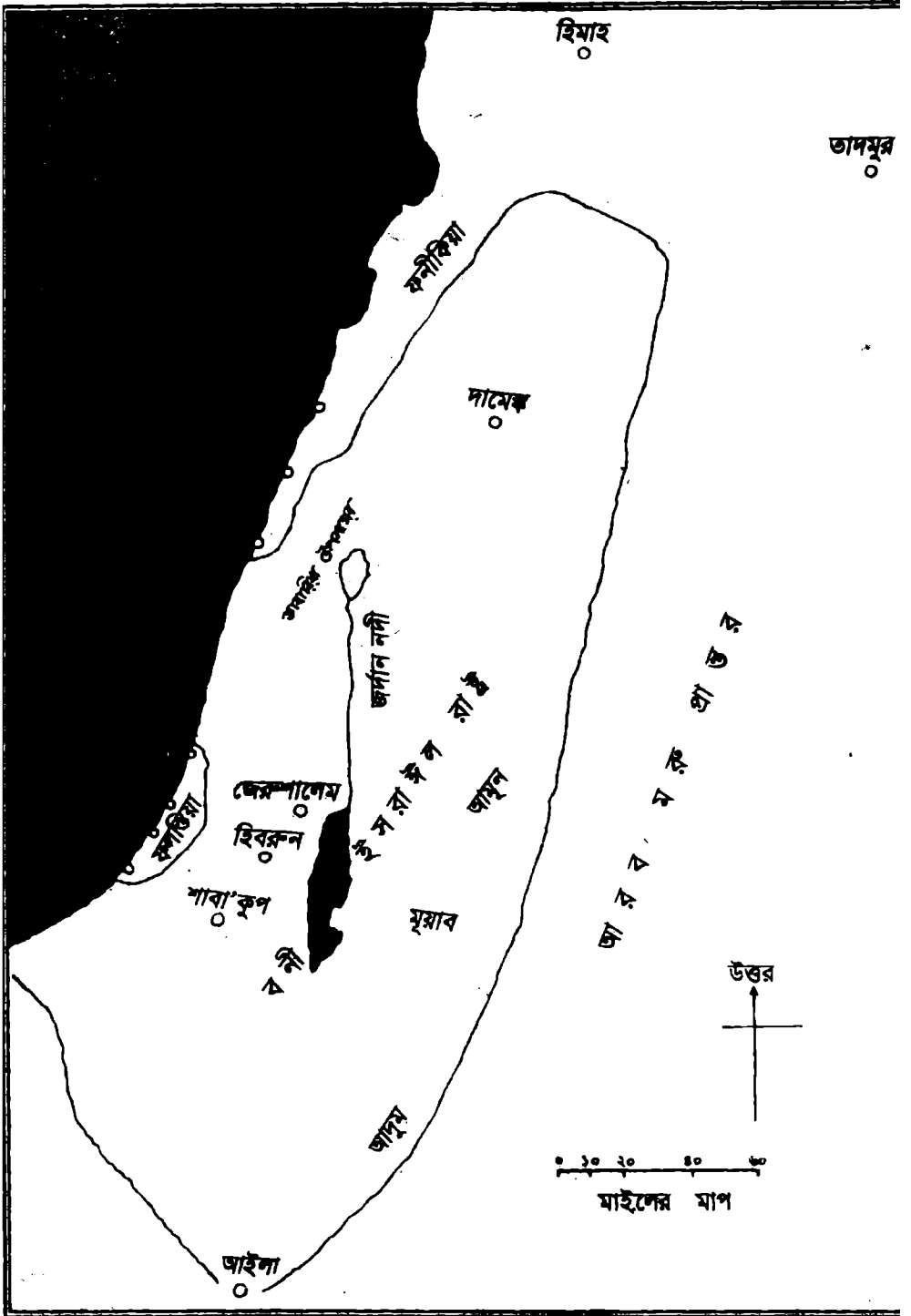
হযরত দাউদ ও সোলাইমানের (আ) সাম্রাজ্য (১০০০–৯৩০ খৃষ্টপূর্ব)

World Biography নামক বিশ্বকোষে বলা হইয়াছে যে, নবী শামুয়েল (আ) গোপনে দাঊদ (আ)-কে তালূতের পরবর্তী রাজা মনোনীত করেন (৩খ, পৃ. ২৮৪)। বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁহার রাজত্বকাল সম্পর্কে সামান্য ব্যবধান সহকারে নিম্নোক্ত তারিখসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ তালূতের রাজত্বকাল ১০২০-১০০৪ খৃ, পূ.; দাঊদ (আ)-এর রাজত্বকাল ১০০৪-৯৬৫ খৃ. পূ. এবং সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বকাল ৯৬৫-৯২৬ খৃ. পূ. (তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইসরার ৭নং টীকা দ্র.)। অন্যান্য গ্রন্থে দাঊদ (আ)-এর রাজত্বকাল ১০১০-৯৭০ খৃ. পূ. (World Biography, ৩খ., পৃ. ২৮৪); ১০০০-৯৬০ খৃ. পূ. (Ency. Religion, ৪খ., পৃ. ২৪২); ১০০০-৯৬২ খৃ. পূ. (Ency. Brit., ৫খ পৃ. ৫১৮); ১০০২-৯৬২ খৃ. পূ. (Ency. Americana, ৮খ, পৃ. ৫২৬)। দাঊদ (আ)-ই প্রথম ব্যক্তি যিনি একই সঙ্গে ইয়াহূদী জাতির নবী ও শাসক নিযুক্ত হন। তিনি জুদাহ ও ইসরাঈল এই দুই রাষ্ট্রকে একত্র করেন এবং ইয়াহূদী জাতির ত্রাণকর্তারূপে আবির্ভূত হন। তিনি ইয়াহূদীদেরকে ফিলিস্তিনী আমালিকাদের স্বৈরশাসন হইতে মুক্ত করেন এবং প্রতিবেশী ইদোম, মোয়াব ও আম্মুনের উপর এবং সিরিয়ার আরামিয়ান রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করেন। একই সময় তিনি টায়ার ও হামাহ-এর শাসকগণের সহিত চুক্তিবদ্ধ হন। তিনি সম্মিলিত জুদাহ ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের সীমা কতিপয় কানআনী শহর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন এবং জেরুসালেম অধিকার করিয়া তথায় স্বীয় রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজ্যসীমা ফোরাত নদী হইতে ভূমধ্য সাগর এবং দামিশ্ক হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনিই ছিলেন ইসরাঈলের প্রথম সফল শাসক। তিনিই সর্বপ্রথম ইয়াহূদীদের বারোটি গোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি সুসংহত জাতিতে পরিণত করিতে সক্ষম হন। তিনি সাফল্যের সহিত সাত বৎসর হেব্রোনে এবং তেত্রিশ বৎসর জেরুসালেমে রাজত্ব করেন।

শাসক হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। কারণ তিনি আল্লাহ্র পথনির্দেশনায় শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন। মহান আল্লাহ তাঁহাকে নির্দেশ দেন ঃ "হে দাঊদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা বানাইয়াছি। অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর" (৩৮ ঃ ২৬)। তাঁহার জীবনচারের মধ্য দিয়া তাঁহার ন্যায়পরায়ণতার প্রকাশ ঘটিয়াছে। এতবড় সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণ লোকের মত জীবনযাপন করিতেন, রাজকোষ হইতে ভাতা গ্রহণের পরিবর্তে স্বোপার্জিত আয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং আল্লাহ্র ইবাদতে মশগুল থাকিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক হযরত লুকমান হাকীম (দ্র.)-কে তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার রাষ্ট্রের নাগরিক ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে সাক্ষাতও হইয়াছে (তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৫খ, পৃ. ১৯২)। তিনি তাঁহার মত একজন প্রতিভাবান লোকের দ্বারা প্রশাসনিক কার্যে নিশ্চয়ই উপকৃত হইয়া থাকিবেন। তাঁহার সময়ই জেরুসালেম ইয়াহূদী রাষ্ট্রের রাজধানী হিসাবে গড়িয়া উঠে এবং তিনি এখানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনিই বায়তুল মাকদিস নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তৎপুত্র সুলায়মান (আ)-এর প্রচেষ্টায় উহার নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৪)। এক কথায় তিনিই ছিলেন ইয়াহূদী রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহার ভিত সুদৃঢ়কারী (আল-মুনজিদ, মু'জাম অংশ, দাঊদ শিরো.)।

দাউদ (আ) ও সুলায়মান (আ)-এর বিচারকর্ম

সূরা আম্বিয়ায় দাউদ-সুলায়মান (আ) তথা পিতা-পুত্র কর্তৃক একটি ঘটনার বিচারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "এবং (স্মরণ কর) দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে বিচার করিতেছিল। তাহাতে রাত্রিকালে কোন সম্প্রদায়ের মেষপাল প্রবেশ করিয়াছিল। আমি তাহাদের বিচার প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম। আর আমি সুলায়মানকে উহার মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম" (২১ ঃ ৭৮-৭৯)।

মুসলিম উম্মাহ্র তাফসীরবিদ ও ঐতিহাসিকগণ ঘটনাটি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ এক ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাত্রিবেলা অপর এক ব্যক্তির মেষপাল প্রবেশ করিয়া উহার ফসল বিনষ্ট করিয়া দিয়াছিল। অধিকাংশ তাফসীরকার ও ঐতিহাসিকের মতে ইহা ছিল কৃষিক্ষেত্র (তাফসীরে কবীর, ২১খ, ১৯৫; রূহুল মাআনী, ১৭ খ., পৃ. ৭৩) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ, শুরায়হ ও মুকাতিল (র)-এর মতে আঙ্গুর ক্ষেত্র (কবীর, ২১খ, ১৯৫; রূহ, ১৭খ, ৭৪; ইব্ন কাছীর, ২খ, ৫১৬)। উভয় পক্ষ হযরত দাউদ (আ)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিল।

উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া তিনি মেষপাল ক্ষেত্রের মালিককে দান করার রায় প্রদান করিলেন। পক্ষদ্বয় সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়া প্রত্যাবর্তন করাকালে তিনি তাহাদেরকে বিচারের রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি পক্ষদ্বয়কে থামাইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার রায় সম্পর্কে ভিন্নমত ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, মীমাংসা এইভাবে হইতে পারে যে, মেষপাল ক্ষেত্রের মালিকের নিকট সোপর্দ করা হইবে এবং সে ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে থাকিবে। আর ক্ষতিগ্রস্ত শস্যক্ষেত্র মেষপালের মালিকের নিকট সোপর্দ করা হইবে। সে ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যা করিতে থাকিবে। ইহা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিলে সে তাহা মালিকের দখলে সোপর্দ করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের মেষপাল ফিরাইয়া লইবে (কবীর, ২১ খ, পৃ. ১৯৫; মাআরিফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত সৌদী সং, পৃ. ৮৮৩-৪; তাফহীমুল কুরআন, সূরা আম্বিয়া, ৭০ নং টীকা; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ২৮৭)।

উক্ত রায় সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সুলায়মানকে উহার মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম" (২১ ঃ ৭৯)। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর মতে সুলায়মান (আ) তখন এগার বৎসরের বালক (কবীর, ২১ খ, পৃ. ১৯৫)। পিতা-পুত্রের এই রায় ছিল ইজতিহাদ ভিত্তিক। যথার্থ ইনসাফের নিকটতর ফয়সালা আল্লাহ তা'আলা ইলহামের মাধ্যমে সুলায়মান (আ)-কে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। উভয়ের রায়ই মূলত সঠিক ছিল। দাউদ (আ) কেবল কৃষকের ক্ষতির বিষয়টি বিবেচনা করেন এবং তাহার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করেন। তবে পুত্রের মীমাংসা অধিকতর যথার্থ ছিল (কাসাসুল কুরআন, ২ খ, পৃ. ২৮৭)। অতঃপর এই দুই মহান নবীর যে যোগ্যতার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা এই

কথা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ইহা সবই আল্লাহ্ প্রদত্ত যোগ্যতা (তাফহীম, সূরা আম্বিয়া, ৭০ নং টীকা)।

গবাদি পশুর অপরাধের ক্ষতিপূরণ

এই মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ যেমন কুরআন মজীদে উল্লিখিত হয় নাই, তদ্রূপ তাহা হাদীছ শরীফেও বর্ণিত হয় নাই। অতএব আমাদের শরীআতে উক্তরূপ ঘটনা ঘটিলে তাহার মীমাংসা কিরূপ হইবে এই বিষয়ে হানাফী, মালিকী, শাফিঈ ও হাম্বালী ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে। কাহারো ক্ষেত-খামার অপরের গৃহপালিত জন্তু বিনষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত করিলে তাহার কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে কিনা, দিতে হইলে কোন অবস্থায় দিতে হইবে, কোন অবস্থায় দিতে হইবে না এবং ক্ষতিপূরণের ধরনই বা কি হইবে ইত্যাদি বিষয়ে মতভেদ আছে। এই বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন, গবাদি পশু ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যাপারে মালিকের কোন অবহেলা না থাকিলে, উহা রাত্রে বা দিনে যখনই ক্ষতি করুক, তাহার কোন ক্ষতিপূরণ নাই। কারণ মহানবী (স) বলেন ঃ

جَرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ.

"পশুর আঘাতে দণ্ড নাই" (তিরমিযী, আবওয়াবুয যাকাত, বাব ১৬, নং ৫৯৬; আবওয়াবুল আহকাম, বাব ৩৭, নং ১৩১৬; বুখারী, দিয়াত, বাব ৩৮, নং ৬৪৩২; মুসলিম, হুদূদ, বাব ৫২, নং ৪৩১৬, ৪৩১৯; আবূ দাউদ, দিয়াত, বাব ফিদ-দাব্বাতি তানফাহু বিরিজলিহা; ইব্ন মাজা, দিয়াত, বাবুল জুবার, রূহুল মাআনী, ১৭ খ, পৃ. ৭৫; তু. তাফসীরে কবীর, ২১ খ., পৃ. ১৯৯)।

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, গবাদি পশু দিনের বেলা ক্ষতি সাধন করিলে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ নাই। কারণ দিনের বেলা ক্ষেত পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কৃষকের এবং রাত্রিবেলা গবাদি পশু পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব মালিকের। অতএব রাত্রিবেলা ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে (রূহুল মাআনী, ১৭ খ, পৃ. ৭৫)। এই সম্পর্কে তিনিও একটি হাদীছ পেশ করিয়াছেন ঃ

اِنَّ نَاقَةً لِلْبَرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً دَخَلَتْ فِيْ حَائِطِ قَوْمٍ فَاَفْسَدَتْ فِيْهِ فَكَلَّمَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا فَقَضٰى اَنَّ حِفْظَ الاَمْوَالِ عَلٰى اَهْلِهَا بِالنَّهَارِ وَعَلٰى اَهْلِ الْمَوَاشِيْ مَا اَصَابَتْ مَوَاشِيْهِمْ بِاللَّيْلِ.

"বারাআ ইব্ন আযিব (রা)-র একটি উষ্ট্রী এক গোষ্ঠীর বাগানে প্রবেশ করিয়া উহাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বাগান-মালিক এই প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহিত কথা বলিলে তিনি মীমাংসা করিয়া দেন যে, দিনের বেলা মালের হেফাজত করা মালিকের দায়িত্ব এবং রাত্রিবেলা গবাদি পশু কোন ক্ষতি সাধন করিলে উহার দায় গবাদির মালিকের উপর বর্তাইবে" (ইব্ন মাজা, আহ্কাম, বাব ১৩, নং ২৩৩২ ও ২৩৩৩; আবু দাউদ, বুয়ূ, বাবুল মাওয়াশী তুফসিদু যার'আ কাওম; মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, কিতাবুল আকদিয়া, বাবুল কাদা ফিদ দাওয়ারী)।

দুই নারীর সন্তান সংক্রান্ত বিবাদ

পিতা-পুত্রের রায়ে পার্থক্য সংক্রান্ত আরও একটি ঘটনা হাদীস শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ امْرَاَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى بِهٖ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهٖ لِلصُّغْرٰى.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ দুই মহিলার সহিত তাহাদের দুইটি (দুগ্ধপোষ্য) পুত্র সন্তানও ছিল। একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাদের একজনের সন্তানটিকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। সঙ্গের মহিলাটি বলিল, তোমার পুত্রকেই (নেকড়ে) লইয়া গিয়াছে। অপর মহিলা বলিল, নেকড়ে তোমার পুত্রকেই লইয়া গিয়াছে। অতঃপর উভয়ে হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট বিচার প্রার্থনা করিলে তিনি শিশুটির ব্যাপারে অধিক বয়স্কা মহিলার পক্ষে রায় দেন। তাহারা দুই মহিলা প্রস্থান করিয়া সুলায়মান (আ)-এর সামনে দিয়া যাইতেছিল। তাহারা তাঁহাকে মোকদ্দমার বিবরণ শুনাইলে তিনি (লোকদেরকে) বলিলেন, আমার জন্য একটি ছুরি আন, আমি ইহাকে দুই টুকরা করিয়া তাহাদের দুইজনকে দিব। অল্প বয়স্কা মহিলা বলিল, আপনি ইহা করিবেন না, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। (আমি মানিয়া নিয়াছি যে,) শিশুটি তাহারই। অতঃপর তিনি শিশুটির ব্যাপারে অল্প বয়স্কা মহিলার পক্ষে রায় দেন" (বুখারী, আম্বিয়া, বাব ৪০, নং ৩১৭৪; মুসলিম, আকদিয়া, বাব ৬০, নং ৪৩৪৬; মুসনাদে আহ্মাদ; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৫১৬)। কিছুটা তথ্যগত বিকৃতিসহ বাইবেলেও ঘটনাটি বর্ণিত আছে (দ্র. ১ম রাজাবলী, ৩ ঃ ১৬-২৮)।

প্রসঙ্গক্রমে হযরত দাঊদ ও সুলায়মান (আ)-এর বিচারকার্য হইতে বিচার বিভাগীয় কার্যক্রমের একটি মূলনীতিও অবহিত হওয়া যায়। কোনও বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্‌র সিদ্ধান্ত (বা নস) বিদ্যমান না থাকিলে ইসলামী আদালতের বিচারক তাহার ইজতিহাদের ভিত্তিতে রায় প্রদান করিতে পারেন। তবে শর্ত এই যে, বিচারক হওয়ার অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী সংশ্লিষ্ট বিচারকের মধ্যে বিদ্যমান থাকিতে হইবে। ইসলামী শরীআতের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, মূর্খ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি বিচারক হওয়ার যোগ্য নহে। এই পর্যায়ে মহানবী (স) বলেন ঃ

اِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَاَصَابَ فَلَهُ اَجْرَانِ وَاِذَا اجْتَهَدَ فَاَخْطَاَ فَلَهُ اَجْرٌ.

"বিচারক স্বীয় সাধ্যানুসারে পূর্ণ মাত্রায় চেষ্টা-সাধনা করিয়া সঠিক রায় প্রদান করিতে পারিলে সে দ্বিগুণ পুরস্কার পাইবে এবং ভুল রায় প্রদান করিলে একটি পুরস্কার পাইবে" (বুখারী, ই'তিসাম, ৬খ, পৃ. ৪৪৩, নং ৬৮৩৮; মুসলিম, আকদিয়া, বাব ৫৬ নং ৪৩৩৮; তিরমিযী, আহ্কাম, বাব ২, নং ১২৬৫; আবূ দাঊদ, কাদা, বাব ফিল কাদী ইউখতী; ইব্ন মাজা, আহকাম, (২)বাবুল হাকেম ইয়াজতাহিদু, নং ২৩১৪)।

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ فِى الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضٰى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ لاَ يَعْلَمُ فَاَهْلَكَ حُقُوْقَ النَّاسِ فَهُوَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَضٰى بِالْحَقِّ فَذٰلِكَ فِى الْجَنَّةِ٠

"বিচারক তিন শ্রেণীর, তাহাদের দুই শ্রেণী দোযখী এবং এক শ্রেণী জান্নাতী। যে ব্যক্তি (বিচারক) স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে অন্যায় রায় প্রদান করে সে দোযখী। যে ব্যক্তি সত্যকে উপলব্ধি না করিয়াই রায় প্রদান করে এবং মানুষের অধিকার নস্যাত করে, সেও দোযখী। যে ব্যক্তি প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে রায় প্রদান করে সে জান্নাতী (তিরমিযী, আহকাম, বাব ১, নং ১২৬১; আবূ দাঊদ, কাদা, বাব ফিল কাদী ইউখতি; ইব্ন মাজা, আহ্কাম, (১) বাবুল হাকেম ইয়াজতাহিদু, নং ২৩১৫)।

ন্যায়বিচারের শিকল

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, ইয়াহূদীদের মধ্যে দুষ্কৃতি ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের ব্যাপক প্রসার ঘটিলে দাঊদ (আ)-কে বিচার মীমাংসার জন্য একটি স্বর্ণের শিকল দান করা হয়। ইহা কুদরতীভাবে আসমান হইতে বায়তুল মাকদিসের পবিত্র প্রস্তর খণ্ডের দিকে ঝুলন্ত ছিল। বাদী ও বিবাদী কোন দাবি লইয়া উপস্থিত হইলে তাহাদের মধ্যে যে সত্যবাদী সে উক্ত কুদরতী শিকল স্পর্শ করিতে পারিত এবং যে মিথ্যাবাদী সে উহা স্পর্শ করিতে পারিত না। এইভাবে বিবাদ মীমাংসা হইতেছিল। একদা এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট তাহার মূল্যবান মণি-মুক্তা গচ্ছিত রাখে, পরে উহা ফেরত চাহিলে আমানতদার উহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। সে উহা একটি ফাঁপা কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যে লুকাইয়া রাখে। তাহারা বিবাদ মীমাংসার জন্য কুদরতী শিকলের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রথমে বাদী তাহা স্পর্শ করিল। বিবাদীকে তাহা স্পর্শ করিতে বলা হইলে সে উক্ত কাষ্ঠখণ্ড বাদীর হাতে দিয়া বলিল, হে আল্লাহ! আপনি অবগত আছেন যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে তাহার আমানত ফিরাইয়া দিয়াছি, অতঃপর সে অগ্রসর হইয়া কুদরতী শিকল স্পর্শ করিল। ইহাতে বিষয়টি ইয়াহূদীদের নিকট জটিল আকার ধারণ করিল এবং তাহাদের মধ্যে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। অতঃপর শিকলটি দ্রুত তাহাদের দৃষ্টি হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১২; তাহ্যীব তারীখ দিমাশক, ৫খ, পৃ. ১৯৬)।

হযরত দাঊদ (আ)-এর ইনতিকাল

মানব সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তা'আলা হযরত দাঊদ (আ)-কে ষাট বৎসর আয়ু দান করেন। হযরত আদম (আ) স্বীয় আয়ুষ্কাল হইতে চল্লিশ বৎসর তাঁহাকে দান করেন (দ্র. ৩ নং অনুচ্ছেদের ১১ নং হাদীছ; আরও দ্র. বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৫-৬; আল-মুসতাদরাক, ২খ, পৃ. ৫৮৬; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ, পৃ. ২৯)। এই হিসাবে তিনি এক শত বৎসর জীবিত ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে ইহাই সমর্থিত (আরাইস, পৃ. ৩১৫; বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৬; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৪)।

তবে হাদীছের কোন কোন বর্ণনায় আছে, আদম (আ)-এর প্রস্তাবের পর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, "ইযান ইউকতাবা ওয়া ইউখতামা ওয়ালা ইউবাদ্দাল" (যেহেতু লিপিবদ্ধ হইয়া মোহরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছে এবং পরিবর্তিত ইহবে না; তাবাকাত ইব্ন সা'দ, ১খ, পৃ. ২৮-৯)। এই বাক্য দ্বারা বুঝা যায় যে, আদম (আ)-এর প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তাহা হইলে তিনি ষাট বৎসরই জীবিত ছিলেন। আল্লামা ইব্ন জারীর তাবারী (র) বলেন, কতক আহ্লে কিতাবের মতে তিনি ৭৭ বৎসর জীবিত ছিলেন, কিন্তু এই মত ভ্রান্ত (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৬)। আনওয়ারে আম্বিয়ার লেখক 'রহমাতুল্লিল আলামীন' গ্রন্থের (৩খ, পৃ. ১২৭) বরাতে তাঁহার বয়স ৭৭ বৎসর লিখিয়াছেন (পৃ. ১১১)। বাইবেলে বলা হইয়াছে, পরে তিনি আয়ু, ধন ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া শুভ বৃদ্ধাবস্থায় মরিলেন (১ম বংশাবলী, ২৯ ঃ ২৮)। সুদ্দী তাঁহার সনদ-পরম্পরায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি শনিবার আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। ইসহাক ইব্ন বিশর তাঁহার সনদ-পরম্পরায় বর্ণনা করেন যে, তিনি এক শত বৎসর বয়সে বুধবার আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। আবুস সাকান আল-হাজারী বলেন, ইবরাহীম (আ) দাঊদ (আ) ও সুলায়মান (আ) তিনজনই আকস্মিকভাবে ইনতিকাল করেন। বর্ণিত আছে যে, দাঊদ (আ) তাঁহার মিহরাব হইতে অবতরণরত অবস্থায় মালাকুল মাওত আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি বলেন, আমাকে মিহরাব হইতে নামিতে অথবা উহাতে আরোহণ করিতে দিন। মালাকুল মাওত বলিলেন, হে আল্লাহ্র নবী! বৎসর, মাস, প্রতিপত্তি, রিযিক সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মিহরাবের সিড়ির উপর সিজদায় লুটাইয়া পড়িলেন এবং সিজদাবনত অবস্থায় ইনতিকাল করেন (উপরন্তু দ্র. ৩ নং অনুচ্ছেদ, ৮ ও ৯ নং হাদীছ; সম্পূর্ণ বর্ণনা বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৬ হইতে গৃহীত)।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন, গ্রীষ্মের রৌদ্রের মধ্যে তাঁহার জানাযায় অসংখ্য লোক উপস্থিত হয়, ইহাদের মধ্যে রাহিবই (ইয়াহূদী আলিম) ছিলেন চল্লিশ হাজার এবং পাখিরা গোটা এলাকায় উপস্থিত জনতার উপর ছায়া বিস্তার করিয়া রাখে। বনূ ইসরাঈল হযরত মূসা ও হারূন (আ)-এর পর তাঁহার ইনতিকালে অধিক শোকাভিভূত হয় (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৬-১৭)।

আনওয়ারে আম্বিয়ার গ্রন্থকার 'রহমাতুল্লিল আলামীন' গ্রন্থের (৩খ, পৃ. ১২৭) বরাতে বলেন যে, দাঊদ (আ) মহানবী (স)-এর জন্মের ১৫৮৬ বৎসর পূর্বে ইনতিকাল করেন (পৃ. ১১১)। বিভিন্ন উৎসে তাঁহার মৃত্যুসন নিম্নরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ ৯৬৫ খৃ. পূ.; ৯৭০ খৃ. পূ.; ৯৬০ খৃ. পূ.; ৯৬২ খৃ. পূ. ইত্যাদি (বরাতের জন্য দ্র. ১২ নং অনুচ্ছেদ)। তাঁহাকে তাঁহার লোকদের সহিত জেরুসালেমের গিরিতে (সায়হুন) দাফন করা হয়। তাঁহার কবরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান (আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ১১১)।

বাইবেলের বর্ণনামতে, মৃত্যু নিকটবর্তী হইলে দাউদ (আ) তাঁহার পুত্র সুলায়মান (আ)-কে যে শেষ উপদেশ দান করেন উহা এই যে, সমস্ত মর্তলোকের যে পথ, আমি সেই পথে গমন করিতেছি। তুমি বলবান হও এবং পুরুষত্ব প্রকাশ কর, আপন প্রতিপালক সদাপ্রভুর রক্ষণীয় বিধান রক্ষা করিয়া তাঁহার পথে চল, মূসা (আ)-এর ব্যবস্থায় লিখিত তাঁহার বিধি, তাঁহার আজ্ঞা, তাঁহার শাসন ও

তাঁহার সাক্ষ্য সকল পালন কর, যেন তুমি যে কোন কার্য কর ও যে দিকে ফির, বুদ্ধিপূর্বক চলিতে পার। আর যেন সদাপ্রভু আমার সম্বন্ধে যে বাক্য বলিয়াছেন, তাহা সংস্থাপন করেন। তিনি বলিয়াছেন, তোমার সন্তানেরা যদি সমস্ত অন্তঃকরণের ও সমস্ত প্রাণের সহিত আমার সম্মুখে সত্য আচরণ করিতে আপনাদের পথে সাবধানে চলে, তবে তিনি বলেন, ইসরাঈলের সিংহাসনে তোমার (বংশের) লোকের অভাব হইবে না" (১ম রাজাবলী, ২ ঃ ১-৪)।

দাউদ (আ)-এর সন্তান-সন্ততি

ইব্‌ন কাছীরের মতে দাউদ (আ) ছিলেন তাঁহার পিতার তেরজন পুত্র সন্তানের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ (বিদায়া, ২খ, পৃ. ৮), আর ইবনুল আছীরের মতে দাউদ (আ)-এর তেরজন পুত্রসন্তানের মধ্যে সুলায়মান (আ) ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৪)। কিন্তু বাইবেলে দাউদ (আ)-এর একাধিক স্ত্রীর গর্ভজাত তের-এর অধিক পুত্র সন্তানের নাম উল্লেখ আছে। হেব্রনে জন্মগ্রহণকারী পুত্রগণের নাম ঃ অম্নোন (আম্মোন), দানিয়াল, অবশালোম, আদোনিয়া, শফটিয় ও যিথ্রিয়ম (১ম বংশাবলী, ৩ঃ ১-৩; ২য় শমূয়েল, ৩ঃ ২-৫; শেষোক্ত গ্রন্থে দানিয়ালের পরিবর্তে কিলাব নাম উল্লিখিত আছে)। জেরুসালেমে জন্মগ্রহণকারী পুত্র সন্তানগণ ঃ শুম্ময়, শোবব, নাথন, সুলায়মান, যিভর, ইলীশূয়, ইপ্লেলট, নোগহ, নেফগ, যাফিয়, ইলীশামা বীলিয়াদা ও ইলীফেলট (১ম বংশাবলী, ১৪ ঃ ৪-৭; ২য় শমূয়েল, ৫ ঃ ১৪-১৬; শেষোক্ত গ্রন্থে এগারজনের নাম আছে বীলিয়াদা স্থলে ইলিয়াদা আছে)। ইহাদের সহিত তাঁহার কোন কন্যা সন্তানের নাম উল্লিখিত হয় নাই।

বাইবেলের বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা

অত্র নিবন্ধে বাইবেল এবং ইয়াহূদী-খৃস্টান জাতির রচিত বিশ্বকোষসমূহেরও বরাত প্রদান করা হইয়াছে। ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণ সম্পর্কে হাদীছ শরীফে নিষেধাজ্ঞা আছে, তবে ক্ষেত্রবিশেষে শর্ত সাপেক্ষে অনুমিতও আছে। নবী-রাসূলগণের জীবন কাহিনী সম্পর্কে বাইবেল ভিত্তিক গ্রন্থাবলী রচিত হইয়াছে, তদ্রূপ কুরআন ভিত্তিক প্রচুর গ্রন্থাবলীও রচিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইয়াহূদী-খৃস্টান লেখকগণ ইসলামী উৎসের মূল্যায়ন করা তো দূরে থাকুক, ইসলামের নামটি পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। বরং কোন কোন লেখক তো এই পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, দাউদ (আ) সম্পর্কে বাইবেলের বাহিরে কোনও তথ্য পাওয়া যায় না (দ্র. Ency. Religion, vol. 4, P. 242, col. 1)।

রাসূলুল্লাহ (স) প্রাথমিক পর্যায়ে ইসরাঈলী বর্ণনা গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন ঃ

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اَتَاهُ عُمَرُبْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اِنَّا نَسْمَعُ اَحَادِيْثَ مِنْ يَّهُوْدٍ تُعْجِبُنَا اَفَتَرٰى اَنْ نَّكْتُبَ بَعْضَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمُتَهَوِّكُوْنَ اَنْتُمْ كَمَا تَهَوَّكَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى لَقَدْ جِئْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَلَوْ كَانَ مُوْسٰى حَيًّا مَا وَسِعَهُ اِلاَّ اِتِّبَاعِيْ.

"জাবির (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নবী (স)-এর নিকট আসিয়া বলিলেন, আমরা ইয়াহূদীদের নিকট অনেক কথা শুনিয়া থাকি যাহা আমাদের নিকট অতি চমৎকার মনে হয়। আপনি কি আমাদেরকে উহা লিখিবার অনুমতি দিবেন? তিনি বলেন ঃ তোমরাও কি (তোমাদের দীন সম্পর্কে) দ্বিধাগ্রস্ত রহিয়াছ, যেরূপ ইয়াহূদী-খৃস্টানরা দ্বিধাগ্রস্ত রহিয়াছে। অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট সম্পূর্ণ উজ্জ্বল ও পরিষ্কার দীন আনিয়াছি। মূসা (আ)-ও যদি জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষেও আমার অনুসরণ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না" (আহ্মাদ ও বায়হাকীর বরাতে মিশকাত, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ১৮৫, নং ১৬৮)।

عَنْ جَابِرٍ اَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ اَتى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنُسْخَةٍ مِنَ التَّوْرَاةِ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ هذه نُسْخَةٌ مِنَ التَّوْرَاةِ فَسَكَتَ فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَوَجْهُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَيَّرُ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ مَا تَرى مَا بِوَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ عُمَرُ اِلى وَجْهِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَعُوْذُ بِاللهِ مَنْ غَضَبِ اللهِ وَغَضَبِ رَسُوْلِه رَضِيْنَا بِاللهِ رَبًّا وَّبِالاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَّبِيًّا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه لَوْ بَدَا لَكُمْ مُوْسى فَاتَّبَعْتُمُوْهُ وَتَرَكْتُمُوْنِىْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيْلِ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَاَدْرَكَ نُبُوَّتِىْ لاَتَّبَعَنِىْ.

"জাবির (রা) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) তাওরাতের একটি খণ্ডসহ রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহা এক কপি তাওরাত। তিনি নীরব রহিলেন। উমার (রা) উহা পড়িতে লাগিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইতে লাগিল। আবূ বাক্র (রা) বলেন, তোমার সর্বনাশ হউক! তুমি কি লক্ষ্য করিতেছ না যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর মুখমণ্ডল কী রূপ ধারণ করিয়াছে! উমার (রা) রাসূলুল্লাহ (স)–এর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, আমি আল্লাহ্র অসন্তুটি ও তাঁহার রাসূলের অসন্তুষ্টি হইতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি এবং আমরা আল্লাহ্কে রব, ইসলামকে দীন ও মুহাম্মাদ (স)-কে নবীরূপে পাইয়া সন্তুষ্ট আছি। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁহার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! যদি তোমাদের নিকট মূসাও আত্মপ্রকাশ করিতেন এবং তোমরা আমাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিতে, তাহা হইলে তোমরা অবশ্যই সরল পথ হইতে বিচ্যুত হইতে। তিনি যদি জীবিত থাকিতেন এবং আমার নবুওয়াত প্রত্যক্ষ করিতেন, তবে অবশ্যই আমার অনুসরণ করিতেন" (সুনানুদ দারিমীর বরাতে মিশকাত, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ১৯৩-৪, নং ১৮৪)।

উপরিউক্ত হাদীছদ্বয় হইতে বুঝা যায় যে, শরীআতে মুহাম্মাদীর নীতির পরিপন্থী কোন কিছু অন্য ধর্ম হইতে গ্রহণ করা যাইবে না। ইব্ন আব্বাস (রা)-র বক্তব্য হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি ধর্মীয় ব্যাপারে আহলে কিতাবের নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করিয়াছেন (বুখারী, ২খ, পৃ. ৬০৮, নং ২৪৯০)। পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (স) আহ্লে কিতাব-এর বক্তব্য সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ اَهْلُ الْكِتَابِ يَقْرَءُوْنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ وَيُفَسِّرُوْنَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لاَهْلِ الاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تُصَدِّقُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا الاية.

"আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আহলে কিতাবের লোকেরা তাওরাত হিব্রু ভাষায় পাঠ করিয়া মুসলমানদিগকে তাহা আরবী ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তোমরা আহলে কিতাবকে সত্যবাদীও বলিও না এবং মিথ্যাবাদীও সাব্যস্ত করিও না, বরং তোমরা বল, "আমরা ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্র উপর এবং যাহা আমাদের প্রতি নাযিল হইয়াছে তাহাতে" (বুখারী, তাফসীর, বাব ১২, নং ৪১২৭, ৪খ, পৃ. ৩০৪; ৬খ, পৃ. ৪৪৭-৮, নং ৬৮৪৭; পৃ. ৫৪৬-৭, নং ৭০২২)।

مَاحَدَّثَكُمْ اَهْلُ الْكِتَابِ فَلاَ تُصَدِّقُوْهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ وَقُوْلُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرُسُلِه فَاِنْ كَانَ بَاطِلاً لَمْ تُصَدِّقُوْهُ وَاِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُ.

আবূ নামলা আনসারী (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ "আহলে কিতাব তোমাদের নিকট যাহা বর্ণনা করে সেই ব্যাপারে তোমরা তাহাদেরকে সত্যবাদীও বলিও না এবং মিথ্যাবাদীও বলিও না বরং তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলগণের উপর ঈমান আনিলাম। তাহাদের কথা অসত্য হইয়া থাকিলে তোমরা তাহা সত্য প্রতিপন্ন করিলে না এবং সত্য হইয়া থাকিলে অসত্য প্রতিপন্ন করিলে না" (আবূ দাউদ, কিতাবুল ইল্ম, বাব ২)।

অতঃপর মুসলমানগণ ঈমানে, আমলে ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হইলে এবং তাহারা দীনের উপর সুদৃঢ় হইয়া গেলে মহানবী (স) প্রয়োজনবোধে বনূ ইসরাঈলের বিবৃতিসমূহ আলোচনা করার অনুমতি প্রদান করেন।

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ.

"আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ আমার পক্ষ হইতে একটিমাত্র আয়াত (বাক্য) হইলেও তোমরা তাহা (মানুষের নিকট) পৌঁছাইয়া দাও এবং বনূ ইসরাঈল হইতে বর্ণনা করিতে পার, ইহাতে কোন অসুবিধা নাই" (তিরমিযী, ইল্ম, বাব ১৩, নং ২৬০৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (ক) কুরআন ও তাফসীর ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, ১৯শ মুদ্রণ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৪১৭/১৯৯৭, প্রধানত আয়াতসমূহের তরজমার জন্য; (২) আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, ৩য় সং, বৈরূত তা. বি., ৩খ, পৃ. ১০৯-১২; ৬খ, পৃ. ১৬৯-১৯২; ১০খ, পৃ. ১২০-৩; ১১খ, পৃ. ১০৭-৯; ১২ খ, পৃ. ৬৩-৪; ১৫খ, পৃ. ৩৬-৪০; ২০ খ, পৃ. ২২৮, ২৩০; ২২খ, পৃ. ১৯৪-২০১; ২৪ খ, পৃ. ১৮৪; ২৫খ, পৃ. ২৪৫-৬; ২৬খ,

পৃ. ১৮৩-২০০; (৩) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কুরআন (বাংলা অনু.), ১খ, পৃ. ২৬৬-৮, ৬৬৪-৭০, ই, ফা, বা., ৬ষ্ঠ সং, ঢাকা ১৪১২/১৯৯২; ৫খ., ১ম সং, ঢাকা ১৪০৩/১৯৮২, পৃ. ৫৬১; ৬খ, ৩য় সং, ঢাকা ১৪১২/১৯৯২, পৃ. ২১৩-২১, ৬২০-২৩; ৭খ, ৪র্থ সং, ঢাকা ১৪১৫/১৯৯৪, পৃ. ২৫০-৪; ৪৮৮-৯৮; (৪) ঐ লেখক, মাআরেফুল কোরআন, সংক্ষিপ্ত সৌদী সংস্করণ (বাংলা), মদীনা মুনাওয়ারা ১৪১৩ হি.; (৫) সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ২২শ সং, ১খ, লাহোর ১৯৮৩, পৃ. ৮৩-৪, টীকা ৮২-৮৩; পৃ. ১৮৫-৯২, টীকা ২৬৮-২৭৪; ২খ, ১৬শ সং, লাহের ১৪০২/১৯৮২, পৃ. ৮৯-৯২, টীকা ১২২-১২৫; পৃ. ৫৯৫-৮, টীকা ৭, পৃ. ৬২৪, টীকা ৬৩; পৃ. ৬২৪-৫, টীকা ৬৩; ৩খ, লাহোর ১৯৮২ খৃ., পৃ. ১৭৩-৬, টীকা ৭০-৭৩; পৃ. ৫৬১-২, টীকা ১৮-২০; ৪খ, ১১শ সং, লাহোর ১৯৮১, পৃ. ১৭৮, টীকা ১৪, পৃ. ৩২৩-৩১, টীকা ১৬-২৮; (৬) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বাংলা অনু., ১ম সং, ই.ফা.বা., ঢাকা ১৪১৫/১৯৯৪, ১খ, পৃ. ৪৭৩-৮৪; (৭) শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান, কুরআন মজীদের উর্দূ তরজমা, মাওলানা শব্বীর আহ্মাদ উছমানীর টীকাযুক্ত, মদীনা মুনাওয়ারা ১৪০৯/১৯৮৯. পৃ. ১৩, টীকা ৪; পৃ. ৫১, টীকা ১-৩, পৃ. ৫২, টীকা ১-৩; পৃ. ২২৭, টীকা ৪-৭, পৃ. ২২৮, টীকা ১; পৃ. ৩৮১, টীকা ১০; পৃ. ৪৩৭, টীকা ৮-১২; পৃ. ৫০৩, টীকা ১১-১২; পৃ. ৫৭১, টীকা ৮, পৃ. ৫৭২, টীকা ১; পৃ. ৬০৪, টীকা ১০, পৃ. ৬০৫, টীকা ১-৮; (৮) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম (তাফসীরে ইব্ন কাছীর), ১খ. (বাংলা অনু.), ই. ফা. বা., ২য় সং, ঢাকা ১৪১৩/১৯৯২, পৃ. ৩৫৫-৬১; (৯) আয-যামাখশারী (৪৬৭-৫৩৮ হি.), আল-কাশশাফ, বৈরূত তা. বি., ৩খ, পৃ. ৩৬৩-৭২; (১১) আল-বায়দাবী, আনওয়ারুত তানযীল ফী ইসরারির তা'বীল (তাফসীরে বায়দাবী), দেওবন্দ, ইউ.পি., ৩খ, পৃ. ২৩১-৩৩; (১২) ইবনুল আরাবী (৪৬৮-৫৪৩ হি.), আহ্কামুল কুরআন, বৈরূত তা. বি., ৪খ, পৃ. ১৬৩৬; (১৩) আবূ বাক্র আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ৩খ, দারুল ফিকার, বৈরূত তা. বি.; (১৪) আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহ্মদ আল-কুরতুবী, আহ্কামুল কুরআন, বৈরূত তা. বি., ১৪খ. ও ১৫ খ.।

(খ) হাদীছের গ্রন্থাবলী ও উহার ভাষ্য গ্রন্থসমূহ ঃ (১) সহীহ আল-বুখারী (বাংলা সংস্করণ), আধুনিক প্রকশনী, ঢাকা; (২) সহীহ মুসলিম (বাংলা সংস্করণ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (৩) সুনান আবূ দাউদ, মূল আরবী সংস্করণ ও ই. ফা. বা.-এর বাংলা সংস্করণ; (৪) জামে আত্-তিরমিযী (বাংলা সংস্করণ), বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা; (৫) সুনান ইব্ন মাজা (মূল আরবী), ভারতীয় সংস্করণ ও বৈরূত হইতে প্রকাশিত ফুয়াদ আবদুল বাকী সম্পাদিত সংস্করণ; (৬) মুওয়াত্তা ইমাম মালেক (আরবী সংস্করণ); (৭) আল-হাকেম, আল-মুসতাদরাক, দারুল কুতুব আল-আরাবী, বৈরূত তা. বি., ২খ., কিতাবু তাওয়ারীখিল মুতাকাদ্দিমীন আনিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালীন, যিক্র নবী দাউদ (আ) ; (৮) খতীব তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, বাংলা অনু. মেশকাত শরীফ, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ৪র্থ মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৭৮ খৃ., কিতাবুল ঈমান, বাবুল ইতিসাম বিল-কিতাব ওয়াস-সুন্নাহ।

(গ) ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী ঃ (১) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, চতুর্থ সংস্করণ, বৈরূত ১৪০৮/১৯৭৮, ১নং বালাম, ২ খ.; (২) ইবনুল আছীব, আল-কামিল ফিত তা'রীখ, ১ম সংস্করণ, বেরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১ম খণ্ড; (৩) ইব্ন আসাকির, তাহ্যীব তা'রীখ দিমাশ্ক আল-কাবীর, ২য় সং, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯, ৫ম খণ্ড; (৪) আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, দারুল ফিকার, বৈরূত তা. বি; (৫) আনওয়ারে আম্বিয়া (লেখক অজ্ঞাত), শায়খ গোলাম আলী এণ্ড সন্স, ৫ম সং., লাহোর ১৯৮৫ খৃ.; (৬) ইবন জারীর আত-তাবারী, তা'রীখুল উমাম ওয়াল মুলূক, ১খ; (৭) আবূ ইসহাক আহ্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আছ-ছা'আলিবী, কাসাসুল আম্বিয়া (আল-আরাইসুল বায়ান নামে প্রসিদ্ধ); (৮) হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন (বাংলা অনু.), ২য় খণ্ড, এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ২য় সং, ঢাকা ১৯৯৭; (৯) সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমাত (২য় খণ্ড), বাংলা অনু. নির্বাচিত রচনাবলী, আধুনিক প্রকাশনী, ১ম সং, ঢাকা ১৪১২/১৯৯১, ২খ, পৃ. ৫৩-৭৫; (১০) আল-মুনজিদ ফিল-আলাম, শিরো, দাউদ; (১১) শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহ্লাবী, তা'বীলুল আহাদীছ ফী রুমূযি কাসাসিল আম্বিয়া, মাতবা' আহমাদী, দিল্লী তা. বি., পৃ. ৪৪-৫০; (১২) মুহাম্মাদ জামীল আহ্মাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, লাহোর তা. বি., ৩খ, পৃ. ৩৮-৯২।

(ঘ) পাশ্চাত্য উৎস ঃ (১) পবিত্র বাইবেল, পুরাতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা; (২) Encyclopaedia Britannica, London, 15th ed., vol. 5; (৩) Encyclopedia of Religion, New York London, vol. 4; (৪) Encyclopedia Americana, U.S.A., vol. 8; (৫) Encyclopaedia of World Biography, New York, vol. 3; (৬) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মাআরিফ, বৈরূত, তা. বি., ৭ম খণ্ড, পৃ. ৫৭৪-৫, শিরো. দাউদ; ৬খ, পৃ. ৩, শিরো. তাবূত; ৯খ, পৃ. ৪৪১-২, শিরো. সাব্ত; (৭) Faith of the World, Manas Publications, Dehli, 18t ed. 1860, Repr. 1986. (8) Michael H. Hart, The 100, A Ranking of the most influential persons in History, Meera Pulication, Madras (India) 1991.

মুহাম্মদ মূসা

২৬

হযরত সুলায়মান (আ)

حضرت سليمان عليه السلام

হযরত সুলায়মান (আ)

(ক) জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর ৪২ বৎসর বয়সে তাঁহার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) আনু. ৯৯২ খৃ. পূর্বাব্দে জেরুসালেমে জন্মগ্রহণ করেন (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ৯৪-৫)। মতান্তরে তিনি ৯৯০ (তাফসীরে মাজেদী, ১খ, পৃ. ৩৯, টীকা ৩৫৩) অথবা ৯৭৩ (Colliers Ency., ২১ খ, পৃ. ১৯৩) অথবা ৯৭৪ (Brit., ২০ খ, পৃ. ৯৫২) খৃ. পূ. সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাইবেলের বর্ণনামতে তাঁহার মাতার নাম বৎসেবা (২ শমূয়েল, ১২ ঃ ২৪; ১ রাজাবলী, ২ ঃ ১৩)। তাঁহার বংশপরম্পরা নিম্নরূপ ঃ সুলায়মান (আ) ইব্ন দাউদ (আ) ইব্ন ঈশা (ঈশী বা যিশয়) ইব্ন 'আওবিদ ইব্ন আবির (আবিয) ইব্ন সালমূন (সালহূন) ইব্ন নাহশূন ইব্ন আবিনাযিব (আমিনাদিব) ইব্ন ইরাম (রাম) ইব্ন হাসরূন ইব্ন ফারিস ইব্ন ইয়াহূযা (ইয়াহূদা) ইব্ন ইয়া'কূব (আ) ইব্ন ইসহাক (আ) ইব্ন ইবরাহীম (আ) (তারিখ তাবারী, ১ খ, পৃ. ২৪৭; আল-বিদায়া, ২ খ, পৃ. ১৮)। অন্যান্য গ্রন্থে প্রদত্ত নামসমূহের উচ্চারণে কিছুটা ভিন্নতা আছে (তু. আল-মুসতাদরাক, ২ খ, পৃ. ৫৮৫; আল-কামিল, ১ খ, পৃ. ১৬৯; তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৫ খ, পৃ. ১৯০; ছা'আলিবীর কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ২৯৬ ইত্যাদি)। ইব্ন কাছীর তাঁহার উপনাম আবুর রাবী লিখিয়াছেন (বিদায়া, ২ খ, পৃ. ১৮)। জন্মের পর নাথান ভাববাদী তাঁহার নাম রাখেন 'যিদীদীয়' (সদাপ্রভুর প্রিয়) (২ শমূয়েল, ১২ ঃ ২৫), মতান্তরে তাঁহার মাতা উক্ত নাম নির্বাচন করেন (Ency. Brit., ২ খ, পৃ. ৯৫২)। সুলায়মান তাঁহার রাজকীয় উপাধি যাহা তাঁহার রাজত্বকালের শান্তি ও স্থিতিশীল অবস্থা নির্দেশ করে (Colliers Ency., ২, ১ খ, পৃ. ১৯৩; Ency. Brit., পৃ. স্থা.)। বাইবেলের অপর পাঠে আছে যে, তাঁহার মাতাই তাঁহার নাম সুলায়মান রাখেন (২ শমূয়েল, ১২ ঃ ২৪; Ency Brit., পৃ. স্থা.)।ইসলামী সূত্রমতে তাঁহার পিতাই তাঁহার সুলায়মান নাম রাখেন (আরাইস, পৃ. ৩২০; বাইবেলে তাঁহার বংশলতিকার জন্য দ্র. মথি, ১ ঃ ১-৬; আরও তু. রূতের বিবরণ, ৪ ঃ ১৭-২২)। কুরআন মজীদের বর্ণনা অনুযায়ী হযরত সুলায়মান (আ) হযরত ইয়া'কূব (আ)-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর।

وَوَهَبْنَا لَهُ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسٰى وَهٰرُونَ .

"আর আমি তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব, ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; পূর্বে নূহ্‌কেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাউদ, সুলায়মান, আইউব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও" (৬ ঃ ৮৪)।

তিনি ছিলেন গৌরবর্ণের সুন্দর গড়ন, লোমশ দেহের অধিকারী। তিনি ধবধবে সাদা পোশাক পরিধান করিতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহভীরু, বিনয়ী ও দরিদ্রবৎসল, সদা-সর্বদা দীন দুঃখীদের সহিত মেলামেশা ও উঠাবসা করিতেন (আরাইস, পৃ. ৩১৫; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৫; তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬ খ., পৃ. ২৫৭)।

(খ) কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান (আ) ঃ কুরআন মজীদের সাতটি সূরায় ১৫টি আয়াতে মোট ১৭ বার হযরত সুলায়মান (আ)-এর নামের উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার কোন কোন স্থানে তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান।

২ (বাকারা) ঃ আয়াত ১০২

৪ (নিসা) ঃ আয়াত ১৭

৬ (আন'আম) ঃ আয়াত ৮৪

২১ (আম্বিয়া) ঃ আয়াত ৭৮, ৭৯, ৮১

২৭ (নামল) ঃ আয়াত ১৫ ১৬, ১৭, ১৮, ৩৬, ৪৪

৩৪ (সাবা) ঃ আয়াত ১২

৩৮ (সাদ) ঃ আয়াত ৩০-৩৪

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে মোট ১৭ বার হযরত সুলায়মান (আ)-এর নামোল্লেখসহ তাঁহার সম্পর্কে আলোচনা বিদ্যমান। নিম্নে আয়াতসমূহ উল্লেখ করা হইল ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ . وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ- وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ- وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ- وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ- فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ- وَمَاهُمْ بِضَارِّيْنَ بِهِ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ- وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ- وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ- وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُوْنَ -

"যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট রাসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক, তখন যাহাদিগকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহ্‌র কিতাবটিকে

পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা জানে না। এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত। সুলায়মান কুফরী করে নাই বরং শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যাহা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়ের উপর নাযিল করা হইয়াছিল। তাহারা দুইজনে কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ; সুতরাং তুমি কুফরী করিও না। তাহারা উভয়ের নিকট হইতে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত। অথচ আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না। আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত" (২ ঃ ১০১-১০২)।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ- فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا.

"এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা বিচার করিতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে। উহাতে রাত্রিকালে প্রবেশ করিয়াছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ। আমি প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম তাহাদের বিচারকার্য এবং আমি সুলায়মানকে এই বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাদের প্রত্যেককে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান" (২১ ঃ ৭৮-৭৯)।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِىْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِىْ بٰرَكْنَا فِيْهَا- وَكُنَّا بِكُلِّ شَىْءٍ عٰلِمِيْنَ- وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهٗ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ .

"এবং সুলায়মানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে; উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি; প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত। এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদের রক্ষাকারী ছিলাম" (২১ ঃ ৮১-৮২)।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا- وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ- وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَىْءٍ- اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ . وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ . حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ- لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ . فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ

بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ . وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ . لَاُعَذِّبَنَّهٗ
عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَا اَذْبَحَنَّهٗ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ . فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ
مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ . اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ . وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ . اَلَّا
يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ . اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ . قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ . اِذْهَبْ بِّكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ
عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ . قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ . اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ
الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ . قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْ اَمْرِيْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اَمْرًا
حَتّٰى تَشْهَدُوْنَ . قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّاُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ . قَالَتْ اِنَّ
الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً- وَكَذٰلِكَ يَفْعَلُوْنَ . وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنٰظِرَةٌ
بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُوْنَ . فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ فَمَا اٰتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اٰتٰكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُوْنَ . اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَا اَذِلَّةً وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ . قَالَ يٰاَيُّهَا
الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ . قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ
مَّقَامِكَ وَاِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ اَمِيْنٌ . قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ-
فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ ءَاَشْكُرُ اَمْ اَكْفُرُ- وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ
كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ . قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِيْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لَا يَهْتَدُوْنَ . فَلَمَّا جَاءَتْ
قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ- وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ .وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ
اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ . قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ- فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ
اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ . قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .

“আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং তাহারা উভয়ে বলিয়াছিল, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে তাঁহার বহু মু'মিন বান্দাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন। সুলায়মান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী এবং সে বলিয়াছিল, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া ইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে; ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ। সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে—জিন্ন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে। যখন উহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌঁছিল

তখন এক পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে। সুলায়মান উহার উক্তিতে মৃদু হাসিল এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর। সুলায়মান বিহঙ্গদলের সন্ধান লইল এবং বলিল, ব্যাপার কি, আমি হুদহুদকে দেখিতেছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাহ করিব। অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং সাবা হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি তো এক নারীকে দেখিলাম উহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সকল কিছু হইতেই এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম যে, তাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে। শয়তান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদেরকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না; নিবৃত্ত করিয়াছে এইজন্য যে, উহারা যেন আল্লাহ্কে সিজদা না করে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন– যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর। আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহাআরশের অধিপতি। সুলায়মান বলিল, আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? তুমি আমার এই পত্র লইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী? সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে এবং ইহা এই ঃ দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে। অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও। সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদের অভিমত দাও। আমি কোন ব্যাপারে তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। তাহারা বলিল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন। সে বলিল, রাজা-বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে; ইহারাও এইরূপই করিবে। আমি তাহাদের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি; দেখি, দূতেরা কী লইয়া ফিরিয়া আসে। দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদেরকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট, অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ। তুমি উহাদের নিকট ফিরিয়া যাও। আমি অবশ্যই উহাদের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এক সৈন্যবাহিনী যাহার মুকাবিলা করিবার শক্তি উহাদের নাই। আমি অবশ্যই উহাদেরকে তথা হইতে বহিষ্কার করিব লাঞ্ছিতভাবে এবং উহারা হইবে অবনমিত। সুলায়মান আরো বলিল, হে আমার পারিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিতে পারে? এক শক্তিশালী জিন্ন বলিল, আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি

উহা আপনাকে আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত। কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব। সুলায়মান উহা তাহার সম্মুখে রক্ষিত অবস্থায় দেখিয়া বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন– আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো নিজের কল্যাণের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব। সুলায়মান বলিল, তাহার সিংহাসনের আকৃতি অপরিচিত করিয়া বদলাইয়া দাও; দেখি সে সঠিক দিশা পায়, না সে বিভ্রান্তদের শামিল হয়। সেই নারী যখন আসিল, তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলিল, ইহা তো যেন উহাই। আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করিয়াছি। আল্লাহ্র পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে সত্য হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, সে ছিল কাফির সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাহাকে বলা হইল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার পদদ্বয় অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিক মণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছি। আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি" (২৭ : ১৫- ৪৪)।

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر . واسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه . ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور رسيت . اعملوا ال داود شكرا وقليل من عبادى الشكور . فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تاكل منساته فلما خر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى العذاب المهين .

"আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে, যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত। আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম। তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি জ্বলন্ত অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাইব। উহারা সুলায়মানের ইচ্ছা অনুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাউযসদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেক নির্মাণ করিত। আমি বলিয়াছিলাম, হে দাঊদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তোমরা কাজ করিতে থাক। আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ। যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদেরকে তাহার মৃত্যু বিষয়ে জানাইল কেবল মাটির পোকা, যাহা তাহার লাঠিকে খাইতেছিল। সে যখন পড়িয়া গেল তখন জিন্নরা বুঝিতে পরিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না" (৩৪:১২-১৪)।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ . اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ . فَقَالَ اِنِّيْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ . وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ . قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ. وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ . وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِي الْاَصْفَادِ . هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ . وَاِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ .

“আমি দাউদকে দান করিলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল তখন সে বলিল, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। এইগুলিকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনয়ন কর। অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল। আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়। অতঃপর সুলায়মান আমার অভিমুখী হইল। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা। তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত; এবং শয়তানদেরকে, যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে। এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না। এবং আমার নিকট রহিয়াছে তাহার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম” (৩৮ ঃ ৩০-৪০)।

(ঘ) **বাল্যকাল ঃ** হযরত সুলায়মান (আ)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না। তবে তিনি যে বাল্যকাল হইতেই বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৪৩৭, টীকা ৮)। দাউদ (আ) ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রতি বিশেষ যত্নবান হইলেন এবং রাজকার্যে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন, এমনকি কোন কোন ব্যাপারে তাঁহার মতই গ্রহণ করিতেন (আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ১১২)। বিচার সংক্রান্ত এইরূপ একাধিক ঘটনা কুরআন মজীদে ও হাদীছ শরীফে উল্লিখিত হইয়াছে।

(ঙ) নবুওয়াত প্রাপ্তি ও দাওয়াতী কার্যক্রম ঃ হযরত সুলায়মান (আ) কখন নবুওয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টরূপে জানা যায় না। তবে কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর ইনতিকালের পর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং একই সময় নবুয়াতপ্রাপ্ত হন। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ .

"সুলায়মান হইয়াছিল দাউদের উত্তরাধিকারী" (২৭ঃ ১৬)।

বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতে হযরত সুলায়মান ('আ) তাঁহার পিতার নবুওয়াত ও রাজত্বের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, পিতার ব্যক্তিগত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির নয়। কারণ দাঊদ (আ)-এর আরো সন্তান ছিল এবং তাহাদেরকে ওয়ারিসী স্বত্ব হইতে বঞ্চিত করার কোন কারণ নাই (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮; ছা'আলিবীর আরাইস, পৃ. ৩১৫; তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস, পৃ. ৩১৬; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫০৩, টীকা ১১; তাফসীরে কবীর, ২৪ খ, পৃ. ১৮৬; রূহুল মা'আনী, পৃ. ১৭০-১; মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ, পৃ. ৬২৩; তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৫৬১-২, টীকা ২০)। এই পর্যায়ে মহানবী (স)-এর বাণী প্রণিধানযোগ্য।

نَحْنُ مَعَاشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لاَ نُوْرَثُ .

"আমাদের নবীগণের (পরিত্যক্ত সম্পত্তির) কোন ওয়ারিছ নাই" (আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮ হইতে উদ্ধৃত)।

অপর হাদীছে বলা হইয়াছে ঃ

لاَ نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ .

"আমাদের কোন ওয়ারিছ নাই। আমরা যাহা ত্যাগ করিয়া যাই তাহা সাদাকারূপে গণ্য" (বুখারী, নাফাকাত, বাব হাবসি'র রাজুল কূতা সানাতিন, ২খ, পৃ. ৮০৬; মুসলিম, ২খ, পৃ. ৯০-৯১; কিতাবুল জিহাদ; তিরমিযী, সিয়ার, ১খ, পৃ. ১৯৪)। অপর এক আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلٰى نُوْحٍ وَالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَا اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ...... وَسُلَيْمٰنَ .

"আমি তো তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি যেমন নূহ ও তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছিলম। আমি আরও ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম ইবরাহীম... ও সুলায়মানের নিকট" (৪ ঃ ১৬৩)।

৮ ঃ ৮৩-৮৮ আয়াতসমূহে হযরত সুলায়মান (আ)-সহ ১৮জন নবী এবং তাঁহাদেরকে হেদায়াতদানের কথা উল্লেখের পর ৬ ঃ ৮৯ আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ .

"আমি তাহাদেরকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছি"।

উক্ত আয়াতদ্বয় স্পষ্টরূপে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নবুওয়াত ও রিসালাতের প্রমাণ বহন করে। কুরআন মজীদে আরও বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا .

হযরত সুলায়মান (আ)-এর রাজত্ব
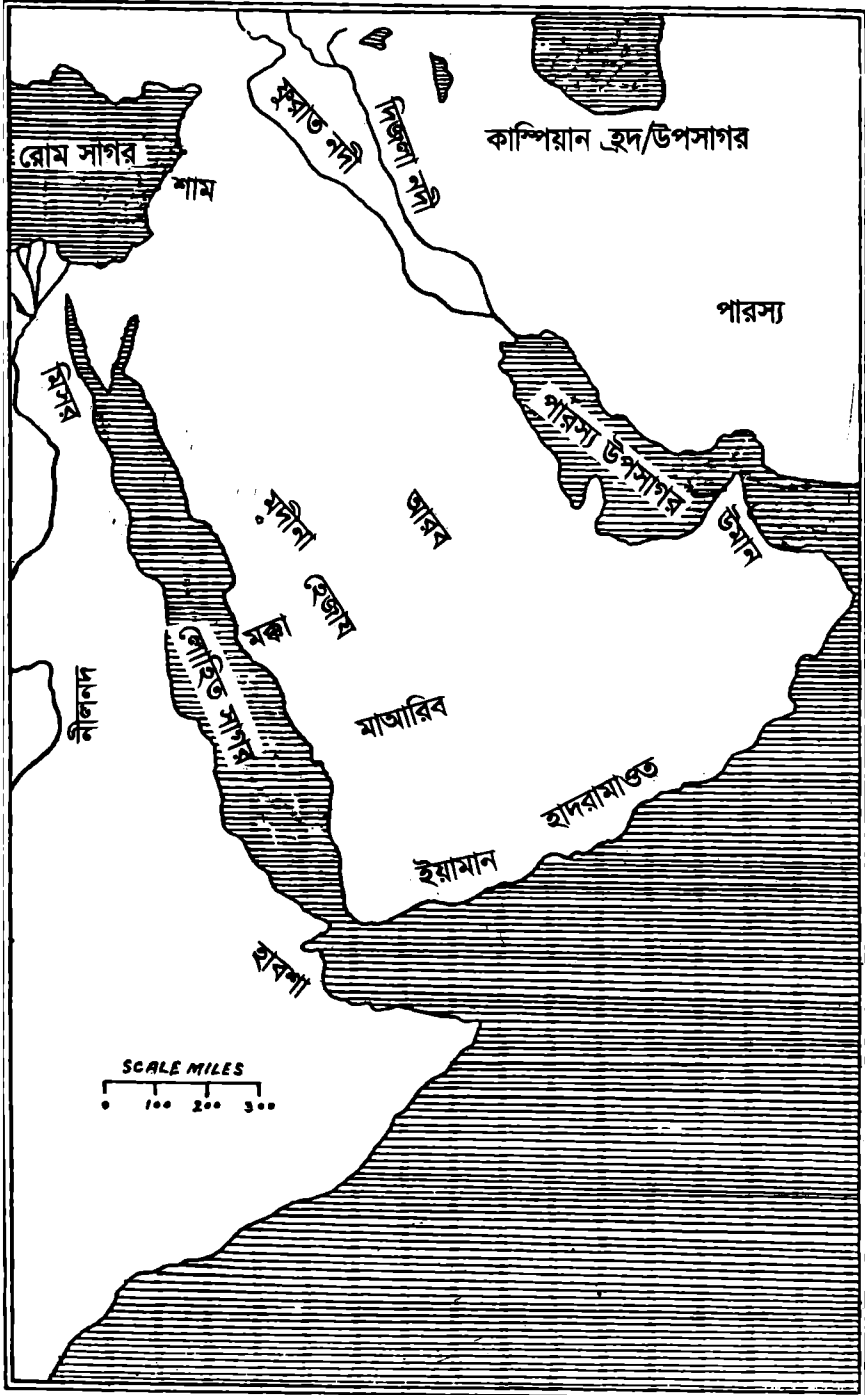
"আমি অবশ্যই দাউদ ও সুলায়মানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম" (২৭ ঃ ১৫)।

وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا .

"এবং আমি তাহাদের (দাউদ ও সুলায়মান) প্রত্যেককে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান" (২১ ঃ ৭৯)।

উক্ত আয়াতদ্বয়ে "জ্ঞান" দ্বারা নবুওয়াত বুঝানো হইয়াছে (দ্র. তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস, পৃ. ২৭৪ ও ৩১৬)।

কুরআন মজীদে স্পষ্টরূপে দ্ব্যর্থহীন বাক্যে হযরত সুলায়মান (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির কথা ব্যক্ত হইয়াছে। কুরআন মজীদ তাঁহাকে যুগপৎ একজন প্রতিপত্তিশালী ন্যায়পরায়ণ শাসক ও মহাসম্মানিত নবী হিসাবে মর্যাদা দান করিয়াছে। কিন্তু তথাকথিত তাওরাত (বাইবেল) হযরত দাউদ ('আ)-এর ন্যায় হযরত সুলায়মান (আ)-কেও শুধুমাত্র একজন শাসক হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে এবং তাঁহার নবুওয়াত অস্বীকার করিয়াছে। ইহা শীলোনীয় "অহিয়"-কে তাঁহার সমকালীন নবী হিসাবে উল্লেখ করিয়াছে (দ্র. ১ম রাজাবলী ১১ঃ ৪-৫, ৭ ও ২৯)। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান বাইবেল জঘন্য ভাষায় তাঁহার প্রতি যাদুটোনা, কুফরী ও মূর্তি পূজায় লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ আরোপ করিয়াছে যাহা উদ্ধৃত করার যোগ্য নহে (দ্র. ১ম রাজাবলী, ১১ ঃ ৩৩)। কুরআন মজীদ বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বাইবেলের এই অপবাদ খণ্ডন করিয়াছে।

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا .

"সুলায়মান কুফরী করে নাই, বরং শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল" (২ ঃ ১০২)।

نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهٗ اَوَّابٌ .

"সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী" (৩৮ ঃ ৩০)।

وَاِنَّ لَهٗ عِنْدَنَا لَزُلْفٰى وَحُسْنَ مَاٰبٍ .

"এবং আমার নিকট তাহার জন্য রহিয়াছে নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম" (৩৮ ঃ ৪০)।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে সাবার রাণীর আত্মসমর্পণ ও ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কিত কুরআন মজীদের বক্তব্য হইতে স্পষ্টরূপে ধারণা করা যায় যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার নবুওয়াতী ও রাষ্ট্রীয় শক্তি সর্বতোভাবে আল্লাহ্‌র দীন প্রচারের জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তিনি সাবার রাণীকে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার দ্বারাও তিনি রাণী ও তাহার সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাইয়াছিলেন (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২১)। কুরআন মজীদের বক্তব্য এই ব্যাপারে স্পষ্ট যে, রাণী ও তাঁহার সভাসদ ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহার দেশবাসীও যে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও কুরআন মজীদের বক্তব্য হইতে ধারণা করা যায় (বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে করা হইবে)।

(চ) **বিচারকার্য ঃ** আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে তাঁহার যুবা বয়সেই গভীর প্রজ্ঞা ও সূক্ষ্ম ন্যায়বিচার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। কুরআন মজীদে যেমন, তদ্রূপ তাওরাতেও তাঁহার

বিচক্ষণতার কথা উল্লেখ আছে ঃ "আর সদাপ্রভু শলোমনকে বিপুল জ্ঞান ও সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং সমুদ্রতীরস্থ বালুকার ন্যায় চিত্তের বিস্তীর্ণতা দিলেন। তাহাতে পূর্বদেশের সমস্ত লোকের জ্ঞান ও মিশ্রীয়দের যাবতীয় জ্ঞান হইতে শলোমনের অধিক জ্ঞান হইল...." (দ্র. ১ম রাজাবলী, ৪ ঃ ২৯-৩৪)।

পিতা হযরত দাউদ (আ) তাঁহার জ্ঞানের কদর করিতেন এবং কোন কোন সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে সন্তানের মতামতকে নিজের মতামতের উপর অগ্রাধিকার দিতেন। বিচার মীমাংসার এইরূপ একটি ঘটনা কুরআন মজীদেও উক্ত হইয়াছে।

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمٰنَ اِذْ يَحْكُمٰنِ فِى الْحَرْثِ اِذْ نَفَشَتْ فِيْهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ . فَفَهَّمْنٰهَا سُلَيْمٰنَ وَكُلاًّ اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا .

"এবং স্মরণ কর দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তাহারা বিচার মীমাংসা করিতেছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে। উহাতে রাত্রিকালে কোন সম্প্রদায়ের মেষ প্রবেশ করিয়াছিল। আমি প্রত্যক্ষ করিতেছিলাম তাহাদের বিচারকার্য। আর আমি সুলায়মানকে এই বিষয়ের মীমাংসা বুঝাইয়া দিয়াছিলাম এবং আমি তাহাদের প্রত্যেককে দিয়াছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান" (২১ ঃ ৭৮-৭৮)।

বাইবেলে অথবা ইয়াহূদী ধর্মীয় সাহিত্যে বিচার সংক্রান্ত উক্ত ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। তাফসীরের গ্রন্থাবলী ও ইসলামের ইতিহাসে ঘটনার বিবরণ মোটামুটি নিম্নরূপ ঃ এক ব্যক্তির শস্যক্ষেত্রে রাত্রিকালে অপর এক ব্যক্তির মেষপাল ঢুকিয়া উহার ফসল নষ্ট করিয়া ফেলে। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে ইহা ছিল কৃষিক্ষেত্র (তাফসীরে কবীর, ২১খ, পৃ. ১৯৫; রূহুল মা'আনী, ১৭খ, পৃ. ৭৩) এবং আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা), শুরায়হ ও মুকাতিল (র)-এর মতে আঙ্গুর ক্ষেত (কবীর, ২১খ, পৃ. ১৯৫; রূহুল মা'আনী, ১৭খ, পৃ. ৭৪; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৫১৬)। উভয় পক্ষ হযরত দাউদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিল। তিনি পক্ষদ্বয়ের শুনানী গ্রহণ করার পর ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে মেষপাল প্রদানের রায় দিলেন। পক্ষবৃন্দ হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট দিয়া প্রত্যাবর্তন করাকালে তিনি তাহাদের নিকট মোকদ্দমার রায় জানিতে চাহিলেন। তিনি তাহা অবহিত হইয়া পক্ষদ্বয়কে অপেক্ষা করিতে বলিয়া পিতার নিকট গমন করিলেন। তিনি তাঁহার রায় সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করিয়া বলিলেন, রায় এইভাবেও হইতে পারে যে, মেষপাল ক্ষেতের মালিকের নিকট সোপর্দ করা হইবে এবং সে ইহার দ্বারা উপকৃত হইতে থাকিবে। অপরদিকে ক্ষতিগ্রস্ত শস্যক্ষেত্র মেষপালের মালিকের নিকট সোপর্দ করা হইবে এবং সে ইহা পূর্বাবস্থাপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ইহার পরিচর্যা করিতে থাকিবে, অতঃপর ইহাকে ইহার মালিকের নিকট অর্পণ করিয়া তাহার নিকট হইতে নিজের মেষপাল ফিরাইয়া লইবে (তাফসীরে কবীর, ২১খ, পৃ. ১৯৫; তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৭৩, টীকা ৭০; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৪৩৭, টীকা ৮; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ২৮৭; তাহ্যীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৫৪; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৫)। ইব্ন আব্বাস (রা)-র মতে হযরত সুলায়মান (আ) তখন এগার বৎসরের বালক (তাফসীরে কবীর, ২১খ, পৃ. ১৯৫)। পিতা-পুত্র উভয়ের এই রায় ছিল ইজতিহাদ ভিত্তিক। আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে ইলহামের মাধ্যমে এই মোকদ্দমার যথার্থ ইনসাফের নিকটতর ফয়সালা

জ্ঞাত করিলেন, যদিও উভয়ের রায়ই ছিল যথার্থ। হযরত দাঊদ (আ) কেবল কৃষকের ক্ষতিপূরণের দিকটি বিবেচনা করেন এবং হযরত সুলায়মান (আ) উভয় পক্ষের জন্য অধিকতর লাভজনক দিকটি বিবেচনা করেন (কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ২৮৭; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৪৩৭, টীকা ৮)। অতঃপর মহান নবীদ্বয় সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "এবং তাহাদের প্রত্যেককে আমি প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করিয়াছিলাম" (২১ ঃ ৭৯)। অর্থাৎ তাহাদের এই যোগ্যতা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত (তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৭৩, টীকা ৭০)।

তৎকালের আরও একটি মোকদ্দমার কথা সহীহ হাদীছে উদ্ধৃত হইয়াছে। দুই নারী একটি শিশু সন্তানের মালিকানার দাবি লইয়া হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। বাইবেলে ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ "সেই সময়ে দুইটি স্ত্রীলোক-তাহারা বেশ্যা-রাজার নিকটে আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। একটি স্ত্রীলোক কহিল, হে আমার প্রভু! আমি ও এই স্ত্রীলোকটি উভয়ে এক ঘরে থাকি এবং আমি উহার কাছে ঘরে থাকিয়া প্রসব করি। আমার প্রসবের পর তিন দিনের দিন এই স্ত্রীলোকটি প্রসব করিল। তখন আমরা একত্র ছিলাম, ঘরে আমাদের সঙ্গে অন্য কোন লোক ছিল না, কেবল আমরা দুইজন ঘরে ছিলাম। আর রাত্রিতে এই স্ত্রীলোকটির সন্তানটি মরিয়া গেল, কারণ এ তাহার উপরে শয়ন করিয়াছিল। তাহাতে এ মধ্যরাত্রে উঠিয়া, যখন আপনার দাসী আমি নিদ্রিতা ছিলাম, তখন আমার পার্শ্ব হইতে আমার সন্তানটিকে লইয়া নিজের কোলে শোয়াইয়া রাখিল এবং নিজের মরা সন্তানটিকে আমার কোলে শোয়াইয়া রাখিল। প্রাতঃকালে আমি আপনার সন্তানটিকে দুধ দিতে উঠিলাম, আর দেখ, মরা ছেলে; কিন্তু সকালে তাহার প্রতি ভাল করিয়া দৃষ্টিপাত করিলাম, আর দেখ, সে আমার প্রসূত সন্তান নয়। অন্য স্ত্রীলোকটি কহিল, না, জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার। প্রথম স্ত্রী কহিল, না, না, মৃত সন্তান তোমার, জীবিত সন্তান আমার। এইরূপে তাহারা দুইজনে রাজার সম্মুখে বলাবলি করিল। তখন রাজা কহিলেন, একজন বলিতেছে, এই জীবিত সন্তান আমার, মৃত সন্তান তোমার; অন্যজন বলিতেছে, না, মৃত সন্তান তোমার, জীবিত সন্তান আমার। পরে রাজা বলিলেন, আমার কাছে একখানা খড়্গ আন। তাহাতে রাজার কাছে খড়্গ আনা হইল। রাজা বলিলেন, এই জীবিত ছেলেটিকে দুই খণ্ড করিয়া ফেল, আর একজনকে অর্ধেক এবং অন্যজনকে অর্ধেক দাও। তখন জীবিত ছেলেটি যাহার সন্তান, সেই স্ত্রী রাজাকে বলিল, হে আমার প্রভু! বিনয় করি, জীবিত ছেলেটি উহাকে দিন, ছেলেটিকে কোন মতে বধ করিবেন না। কিন্তু অপরজন কহিল, সে আমারও না হউক, তোমারও না হউক, দুই খণ্ড কর। তখন রাজা উত্তর করিয়া কহিলেন, জীবিত ছেলেটি উহাকে দাও, কোন মতে বধ করিও না; ঐ উহার মাতা। রাজা বিচারের এই নিষ্পত্তি করিলেন, তাহা শুনিয়া সমস্ত ইস্রায়েল রাজা হইতে ভীত হইল; কেননা তাহারা দেখিতে পাইল, বিচার করণার্থে তাঁহার অন্তরে সদাপ্রভু প্রদত্ত জ্ঞান আছে" (১ম রাজাবলী, ৩ ঃ ১৬-২৮)।

হাদীছ শরীফে ঘটনাটি নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ اِمْرَاَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ اِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْاُخْرٰى اِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا اِلٰى دَاوُدَ فَقَضٰى

بِهِ لِلْكُبْرٰى فَخَرَجَتَا عَلٰى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَاَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُوْنِىْ بِالسِّكِّيْنِ اَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرٰى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللّٰهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضٰى بِهِ لِلصُّغْرٰى .

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ দুইটি স্ত্রীলোকের সহিত তাহাদের নিজ নিজ পুত্রসন্তানও ছিল। একটি নেকড়ে বাঘ আসিয়া তাহাদের একজনের সন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গিনী বলিল, সে তোমার পুত্রকে লইয়া গিয়াছে। অপরজন বলিল, না, সে তোমার পুত্রকেই লইয়া গিয়াছে। তাহারা উভয়ে হযরত দাঊদ (আ)-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হইল। তিনি ছেলেটির ব্যাপারে অধিক বয়স্কা স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন। অতঃপর নারীদ্বয় প্রস্থান করিয়া দাঊদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর সম্মুখ দিয়া অতিক্রম করাকালে তাঁহাকে মোকদ্দমার বিবরণ শুনাইল। তিনি (লোকজনকে) বলিলেন, তোমরা আমার জন্য একটি ছুরি আনো, আমি ইহাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তাহাদের দুইজনের মধ্যে বণ্টন করিব। স্বল্পবয়সী স্ত্রীলোকটি বলিল, আপনি ইহা করিবেন না, আল্লাহ আপনার প্রতি দয়াপরবশ হউন। (আমি মানিয়া লইয়াছি যে,) শিশুটি তাহারই। অতঃপর তিনি শিশুটির ব্যাপারে স্বল্প বয়স্কা স্ত্রীলোকটির পক্ষে রায় দিলেন" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ৪০, ১খ, পৃ. ৪৮৭; মুসলিম, কিতাবুল আকদিয়া, বাব বায়ানি ইখতিলাফিল মুজতাহিদায়ন, ২খ, পৃ. ৭৭; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৫১৬; তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৭০)।

হাদীছের বক্তব্য ও বাইবেলের বিবরণের মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য বিদ্যমান ঃ (১) হাদীছে ইহা হযরত দাঊদ (আ)-এর রাজত্বকালের ঘটনা এবং বাইবেলে হযরত সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বকালের ঘটনা বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। (২) বাইবেলে নারীদ্বয়কে বারাঙ্গনা হিসাবে চিত্রিত করা হইয়াছে, পক্ষান্তরে হাদীছে তাহারা দুইজন সাধারণ নারী হিসাবে উক্ত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রতি চারিত্রিক কলঙ্ক আরোপ করা হয় নাই। (৩) বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, শিশুটি মাতৃপৃষ্ঠে পিষ্ট হইয়া মারা গিয়াছিল, পক্ষান্তরে হাদীছে বলা হইয়াছে যে, নেকড়ে বাঘ শিশুটিকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল। সার্বিক বিবেচনায় হাদীছের বিবরণই যথার্থ। কারণ বাইবেল যুগযুগান্তরের অব্যাহত বিকৃতিসহ বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে। তাই একটি অনির্ভরযোগ্য গ্রন্থের বর্ণনা একজন সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলিয়া স্বীকৃত নবীর বর্ণনার সমতুল্য হইতে পারে না, উহার সমর্থক হইতে পারে মাত্র।

উল্লিখিত দুইটি মোকদ্দমা ব্যতীত সুলায়মান (আ) কর্তৃক মীমাংসিত আর কোন ঘটনা নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয় নাই। অবশ্য ইতিহাস ও কাসাসুল আম্বিয়া জাতীয় গ্রন্থাবলীতে এই জাতীয় কতক ঘটনার উল্লেখ আছে। এক ব্যক্তি হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার প্রতিবেশী আমার রাজহাঁস চুরি করিয়াছে। তিনি নামাযের জন্য সমবেত হওয়ার আহ্বান জানাইলেন, অতঃপর তাহাদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে বলিলেন, তোমাদের মধ্যকার একজন তাহার প্রতিবেশীর রাজহাঁস চুরি করিয়াছে, অতঃপর মসজিদে প্রবেশ করিয়াছে এবং হাঁসের পালক তাহার মাথায় লাগিয়া আছে। একটি লোক তাহার মাথায় হাত তুলিয়া তাহা মর্দন করিলে হযরত সুলায়মান (আ) বলিলেন, ইহাকে গ্রেফতার কর, সে-ই চোর (তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৭০)।

(ছ) জীবজন্তুর ভাষা সম্পর্ক হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রজ্ঞা ঃ প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ তাআলা মু'জিযাস্বরূপ কিছু ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতা দান করিয়া থাকেন। তদনুযায়ী তিনি হযরত সুলায়মান (আ)-কেও মু'জিযাস্বরূপ কতিপয় ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতা দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ্র অসীম দয়ায় তিনি জীব জগতের ভাষা বুঝিতে পারিতেন। হুদহুদ পাখির সহিত তাঁহার কথোপকথন (দ্র. ২৭ ঃ ২২-২৮) এবং পিপিলিকার কথা বুঝিতে পারা (দ্র. ২৭ ঃ ১৮-১৯) ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ

وَقَالَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْئٍ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ .

“এবং সে (সুলায়মান) বলিয়াছিল, হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে; ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ” (২৭ ঃ ১৬)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর (র) বলেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) পাখির ভাষা বুঝিতেন এবং নিজ ভাষায় উহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য মানুষের নিকট ব্যক্ত করিতেন। একদা হযরত সুলায়মান (আ) এক জোড়া চড়ুই পাখির নিকট দিয়া অতিক্রমকালে লক্ষ্য করিলেন যে, নর পাখিটি মাদী পাখিটির চতুষ্পার্শ্বে চক্কর দিতেছে। সুলায়মান (আ) তাঁহার সঙ্গীদেরকে বলিলেন, তোমরা কি জান, নর পাখিটি কি বলিতেছে? সে মাদী পাখিটির নিকট বিবাহের প্রস্তাব দিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে বিবাহ কর। আমি তোমার ইচ্ছানুসারে দামিশকের যে কোন প্রাসাদে তোমার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দিব। সুলায়মান (আ) বলেন, দামিশকের প্রাসাদসমূহ পাথর দ্বারা নির্মিত হওয়ায় তাহা কাহারো বাসযোগ্য নহে। প্রত্যেক প্রেমিকই মিথ্যা প্রলোভন দেয় (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৮-১৯; তাহ্যীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৫৩)। ছা'আলিবী বহু পক্ষীর সহিত হযরত সুলায়মান (আ)-এর কথোপকথনের ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন। একটি কপোত সুলায়মান (আ)-এর নিকট চীৎকার করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কি জানো ইহা কী বলিতেছে? ইহা বলিতেছে, যেমন কর্ম তেমন ফল। একটি হুদহুদ পাখির ডাক শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, সে বলিতেছে, হে পাপিষ্ঠরা! আল্লাহ্কে ভয় কর। এই কারণে রাসূলুল্লাহ্ (স) হুদহুদ পাখি বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। একটি চিলের ডাক শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, ইহা বলিতেছে, “তাঁহার সত্তা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল” (২৮ ঃ ৮৮ দ্র.)। আনকা বলে, পার্থিব স্বার্থলাভই যাহার চিন্তা, সে ধ্বংস হউক। মহানবী (স) বলেন, মোরগ ডাকিয়া বলে, হে অলসেরা! আল্লাহ্কে স্মরণ কর। অনুরূপ আরও কতক প্রাণীর কথা উক্ত আছে (দ্র. আরাইস, পৃ. ৩১৭)। হুদহুদ পাখি তো এক নূতন সাম্রাজ্যের খবরসহ নবী সুলায়মান (আ)-এর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় (দ্র. ২৭ ঃ ২০-২৮)। ইহা ছিল আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সুলায়মান (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযা।

“এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে” (২৭ ঃ ১৬) আয়তাংশের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইব্ন কাছীর বলেন, অর্থাৎ একজন বীর্যবান ন্যায়পরায়ণ শাসকের যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সবই সুলায়মান (আ)-কে দান করা হইয়াছিল। জনবল, সামরিক শক্তি ও সরঞ্জাম, জিন্ন ও

মানবদল, পক্ষীকুল, জীবজন্তু, জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং বাকশক্তিসম্পন্ন ও বাকশক্তিহীন প্রাণীর উদ্দেশ্য অনুধাবন শক্তি ইত্যাদি তাঁহাকে দান করা হইয়াছিল। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা মহান আল্লাহ্র পক্ষ হইতে "ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ" (২৭ ঃ ১৬) ছিল নবী সুলায়মান (আ)-এর জন্য (বিদয়া, ২খ, পৃ. ১৯)।

পিপীলিকার পল্লীতে হযরত সুলায়মান (আ) ঃ একদা হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার মানব, জিন্ন ও পক্ষীবাহিনীসহ অভিযানে রওয়ানা হইলেন। মানব ও জিন্ন বাহিনীদ্বয় তাঁহার সহিত সুশৃঙ্খলভাবে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পক্ষীবাহিনীও সুশৃঙ্খলভাবে সমগ্র বাহিনীর উপর তাহাদের পাখা বিস্তার করিয়া উহাদেরকে ছায়া দান করিতে থাকে। এইভাবে তাহারা পিপীলিকাদের এক পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

পিপীলিকা-সরদার তাহার জাতিকে সুলায়মান (আ)-এর আগমন সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়া নিজ নিজ আশ্রয়স্থলে ঢুকিয়া যাওয়ার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্র নবী সুলায়মান (আ) পিপীলিকার নীরব বক্তব্য বুঝিয়া ফেলিলেন এবং আনন্দিত হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৯; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১১৬-১১৭)। কুরআন মজীদে ঘটনাটি এভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ . حَتّٰى اِذَا اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ لاَ يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهُ وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ .فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِىْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ اَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلٰى وَالِدَىَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضٰهُ وَاَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ .

"সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে– জিন্ন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং উহাদেরকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে। যখন তাহারা পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকায় পৌছিল তখন এক পিপীলিকা বলিল, হে পিপীলিকা বাহিনী! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, যেন সুলায়মান ও তাহার বাহিনী তাহাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে পদতলে পিষিয়া না ফেলে। সুলায়মান উহার উক্তিতে মৃদু হাসিল এবং বলিল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য এবং যাহাতে আমি সৎকার্য করিতে পারি, যাহা তুমি পছন্দ কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের শামিল কর" (২৭ ঃ ১৬-১৯)।

জীবতত্ত্ববিদগণের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতায় প্রতিভাত হইয়াছে যে, এই ক্ষুদ্রতর প্রাণীটির সংঘবদ্ধ জীবন বড়ই অদ্ভুত। মানুষের মত পিপীলিকাদেরও বংশ ও গোত্র আছে। ইহাদের মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব, শ্রম বিভাজনের নীতিমালা এবং জীবনযাপন পদ্ধতি কতকাংশে

মানবজাতির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাদের মধ্যে একটি রাণী পিপীলিকা থাকে, সে ডিম ও বাচ্চা দেয়, একদল শক্তিমান যুবা পিপীলিকা সদা গর্তে অবস্থান করিয়া এইগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং গর্তে কোন বিপদাশঙ্কা হইলে অতি দ্রুত ডিম বা বাচ্চাগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরাইয়া নেয়। অপর একদল পিপীলিকা খাদ্য সংস্থানে নিয়োজিত থাকে। অন্যান্য প্রাণী যেমন খাদ্য পাওয়ামাত্র আহার শুরু করিয়া দেয়, ইহারা তাহা করে না। সংরক্ষণযোগ্য খাদ্য ইহারা সংগ্রহ করিয়া গর্তে নিয়া জমা করে, অতঃপর সকলে মিলিয়া আহার করে। ইহাদের অপর একটি দল নিরাপত্তামূলক পাহারায় নিয়োজিত থাকে। আরও লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, কোন বিপদের পূর্বাভাষ পাওয়া গেলে প্রথমে একটি পিঁপড়া গর্তের বাহিরে আসিয়া পরিস্থিতি যাচাইপূর্বক গর্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া বিপদ সম্পর্কে সকলকে অবহিত করে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর সামরিক বাহিনী আগমনে বিপদাশঙ্কা করিয়া হয়তো একটি পিঁপড়া গর্তের বাহিরে আসিয়া পরিস্থিতি মূল্যায়নপূর্বক অন্যদের সতর্ক করিয়াছিল এবং সুলায়মান (আ) তাহা বুঝিতে সক্ষম হইয়াছিলেন (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১১৮-৯)।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত সুলায়মান (আ) এই ভ্রমণে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌঁছিয়া তথায় নামায পড়েন এবং কুরবানী করেন, অতঃপর তায়েফে পৌঁছিয়া পিঁপড়ার দলের সাক্ষাত পান (আরাইস, পৃ. ৩১৯; বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৯)। কতকের মতে পিপীলিকার উপত্যকা ছিল সিরিয়ায় (তাফসীরে কবীর, ২৪ খ, পৃ. ১৮৭)। হযরত সুলায়মান (আ) তিন মাইল দূর হইতে পিপীলিকার সতর্কবাণী শুনিতে পান। বায়ু এই জাতীয় যে কোন খবর তাঁহার নিকট বহন করিয়া আনিত (আরাইস, পৃ. ৩১৯)।

কেবল তিনিই বিষয়টি অবহিত হইয়াছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে পিঁপড়ার সঠিক সিদ্ধান্ত ও প্রশংসনীয় পদক্ষেপ অবহিত করার আনন্দে তিনি হাসেন এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ঃ "হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও যাহাতে আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পারি, আমার প্রতি ও আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে অনুগ্রহ করিয়াছ তাহার জন্য..." (২৭ ঃ ১৬-১৯)। আল্লাহ তাঁহার এই দু'আ কবুল করেন। আয়াতে "আবাওয়ায়হ" বলিতে তাঁহার পিতা-মাতাকে বুঝানো হইয়াছে। তাঁহার মাতাও ছিলেন দীনদার, সৎকর্মপরায়ণ ও ইবাদতগুযার মহিলা (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২০)। মহানবী (স) বলেন ঃ

قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ يَا بُنَيَّ لاَ تُكْثِرِ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ كَثْرَةَ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تَتْرُكُ الرَّجُلَ فَقِيرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"সুলায়মান (আ)-এর মাতা বলিলেন, হে বৎস! রাত্রিবেলা দীর্ঘক্ষণ নিদ্রা যাইও না। কারণ রাত্রিবেলার দীর্ঘনিদ্রা কিয়ামতের দিন বান্দাকে নিঃস্ব অবস্থায় ত্যাগ করিবে" (ইব্ন মাজা, কিতাবুল ইকামাত, বাব (৭৪) মা জাআ ফী কিয়ামিল লায়ল, ১খ, পৃ. ৯৪, নং ১৩৩২; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২০; তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৭০)।

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলিতে শুনিয়াছি ঃ নবীগণের অন্তর্ভুক্ত একজন নবী লোকজনসহ আল্লাহ্র নিকট পানি প্রার্থনার জন্য রওয়ানা হইলেন। তাহারা দেখিতে পাইলেন যে, একটি পিপীলিকা উহার কতক পা আকাশের দিকে তুলিয়া পানি প্রার্থনা করিতেছে। তখন সেই নবী বলিলেন, তোমরা প্রত্যাবর্তন কর, এই পিপীলিকার উসীলায় তোমাদের দু'আ কবুল হইয়াছে (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২০; তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৬খ, পৃ. ২৭১। অনুরূপ বক্তব্য সম্বলিত আরও কতক হাদীছের জন্য দ্র. আরাইস, পৃ. ৩১৮; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২০)। বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার বাহিনীসহ একটি পিঁপড়ার নিকট দিয়া গমনকালে উহা বলিল, সুবহানাল্লাহিল আজীম! দাঊদ (আ) পরিবারকে কত শান-শওকত দান করা হইয়াছে। ইহার কথায় সুলায়মান (আ) হাসিয়া দিলেন এবং তাঁহার সঙ্গীগণকে ইহা অবহিত করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, এই পিঁপড়ার কথার চাইতেও অধিক উত্তম কথা কি আমি তোমাদেরকে বলিব না? তাহারা বলিল, হাঁ। তিনি বলিলেন, "প্রকাশ্য ও গোপন সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে ভয় কর, প্রাচুর্যে ও দরিদ্রতায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর এবং সন্তোষ ও অসন্তোষ উভয় অবস্থায় ইনসাফের নীতি অবলম্বন কর" (আরাইস, পৃ. ৩১৮)। মহানবী (স) পিপীলিকা নিধন করিতে বারণ করিয়াছেন।

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ وَالضِّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهُدِ .

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (স) সুরাদ, ব্যাং, পিঁপড়া ও হুদহুদ পাখি বধ করিতে নিষেধ করিয়াছেন" (ইব্ন মাজা, কিতাবুস সায়দ, বাব মা ইয়ুনহা আন কাতলিহা, ২খ, পৃ. ২৩২; আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাম, বাব ফী কাতালিয যাররি; দারিমী, আদাহী, বাব ২৬)।

হযরত সুলায়মান (আ) যে পক্ষীকুল ও জীব-জন্তুর ভাষা বুঝিতেন সেই সম্পর্কে বাইবেলে কোন উল্লেখ নাই। তবে ইয়াহূদীদের প্রচলিত বর্ণনায় উহার উল্লেখ পাওয়া যায় (জিউইশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১খ, পৃ. ৪৩৯-এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৫৬২, টীকা ২১)। ইসরাঈলী বর্ণনায় পিপীলিকার ঘটনা এভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) যখন বহু পিপীলিকা অধ্যুষিত একটি প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, একটি পিপীলিকা চীৎকার করিয়া অপর পিপীলিকাগুলিকে বলিতেছে, তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, অন্যথায় সুলায়মানের সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে পিষিয়া মারিবে। এই কথা শুনিয়া হযরত সুলায়মান (আ) সেই পিপীলিকাটির সামনে বড়ই অহঙ্কার প্রকাশ করিলেন। উত্তরে পিপীলিকাটি তাঁহাকে বলিল, তোমার আর মূল্য কি, নিকৃষ্ট এক ফোটা পানি হইতে তোমাকে সৃজন করা হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সুলায়মান (আ) লজ্জিত হইলেন (জিউইশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১খ, পৃ. ৪৪০-এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৫৬৪, টীকা, ২৪)।

এক শ্রেণীর লোক ২৭ ঃ ১৮-১৯ আয়াতের মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়াস পাইয়াছে। তাহারা বলে যে, "পিপীলিকা অধ্যুষিত উপত্যকা" অর্থাৎ "ওয়াদী নামল" সিরিয়ায় অবস্থিত একটি প্রান্তরের নাম। তাহারা উক্ত আয়াতের এইরূপ অর্থ করে ঃ "সুলায়মান 'নামল' নামক গোত্রের প্রান্তরে

পৌঁছিলে সেই গোত্রের এক লোক বলিল, হে নামল গোত্রের লোকেরা..."। ইহা এমন এক মনগড়া ব্যাখ্যা, কুরআন মজীদের শব্দাবলীর সহিত যাহার কোন সম্পর্ক নাই। জীব-জন্তুর নামে আরবদের বহু গোত্রের নাম আছে ঠিকই, যেমন কাল্ব (কুকুর), আসাদ (সিংহ) ইত্যাদি, কিন্তু কোন আরববাসীই কালব গোত্রের কোন ব্যক্তি সম্পর্কে এইভাবে বলে না, "কালা কালবুন" (একটি কুকুর বলিল), "কালা আসাদুন" (একটি বাঘ বলিল)। তাই "কালা নামলাতুন (নামল গোত্রের একটি পিঁপড়া বলিল) এইরূপ বলা আরবী ভাষার ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিপরীত।

দ্বিতীয়ত, "হে নামলীরা! তোমরা তোমাদের গৃহে প্রবেশ কর, অন্যথায় সুলায়মানের সৈন্যবাহিনী অজ্ঞাতসারে তোমাদেরকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিতে পারে", এইরূপ অর্থ করা তো সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন। কারণ মানবগোষ্ঠীর একটি সামরিক বাহিনী মার্চ করিয়া যাইবারকালে মানবগোষ্ঠীর অপর একটি দলকে অজ্ঞাতসারে পদতলে পিষ্ট করিয়া ফেলিবে, অথচ তাহা টেরই পাইবে না, এইরূপ হইতেই পারে না। আর যদি তাহারা আক্রমণের উদ্দেশ্যেই আসিয়া থাকিত তবে নামলীদের গৃহে আশ্রয় গ্রহণও হইত অর্থহীন। কারণ এইরূপ অবস্থায় বিনা বাধায় আরও সহজে ও নির্মমভাবে তাহাদের নিহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। অতএব নামলীরা মানুষ নয়, পিপীলিকার জাতিই।

তৃতীয়ত, ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধানেও 'নামল প্রান্তর' বা 'বানূ নামল' নামে কোন মানবগোত্রের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। যাহারা ইহাকে 'ওয়াদিন নামল' নামকরণ করিয়াছেন, তাহারা সেই এলাকায় পিঁপড়ার আধিক্যের কারণেই তাহা করিয়াছেন। কাতাদা ও মুকাতিল (র) বলেন, واد بارض الشام كثير النمل (সিরিয়ার একটি প্রান্তর যেখানে পিঁপড়ার আধিক্য ছিল)।

চতুর্থত, নামল মানবগোষ্ঠী হইলে, "হে মানুষ! আমাকে বিহঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে, ইহা অবশ্যই সুস্পষ্ট অনুগ্রহ" (২৭:১৬) আয়াতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ তাৎপর্যহীন হইয়া পড়ে। কারণ তাহাতে না কোন মু'জিযা আছে, না বিস্মিত হওয়ার কিছু আছে, না হাসির কিছু আছে, আর না আল্লাহ্র নিকট আরাধনা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কিছু আছে।

অতএব যাহারা নামলের মানবরূপী ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছে তাহারা মূলত কুরআন মজীদের তাৎপর্যগত অর্থের তাহ্রীফ (বিকৃতি) করিতে উদ্যত হইয়াছে। বস্তুত একটি পিপীলিকার কাহারও আগমন সম্পর্কে অপর পিপীলিকাদিগকে সাবধান করা এবং গর্তে প্রবেশ করিতে বলা– জ্ঞান-বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মোটেই অসম্ভব নয় এবং সুলায়মান (আ)-এর তাহা শ্রবণ করাও অসম্ভব নয়। কারণ যাঁহার ইন্দ্রিয় শক্তি ওহীর ন্যায় সূক্ষ্ম কথাও ধরিয়া লইতে পারে, তাঁহার পক্ষে পিঁপড়ার কথার ন্যায় স্থূল বাস্তব জ্ঞান লাভ মোটেই কঠিন নয় (তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৫৬৩-৫, টীকা ২৪; পৃ. ৫৬৬, টীকা ২৬-এর শেষ প্যারা; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১২৭-৮)।

হুদহুদ পাখির সহিত কথোপকথন ঃ হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার সেনাবাহিনীসহ পিঁপড়া অধ্যুষিত এলাকা অতিক্রম করার পর নিজ সৈন্যগণের হিসাব নিলেন এবং পক্ষীবাহিনীর মধ্যে হুদহুদ পাখিকে উপস্থিত না পাইয়া অসন্তুষ্ট হইলেন। অবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সুলায়মান (আ)-কে সাবা রাজ্যের রাণী ও সাবা জাতির ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করিল। কুরআন মজীদে মহান নবী সুলায়মান (আ) ও হুদহুদের মধ্যকার মতবিনিময় নিম্নোক্তভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ اَرَى الْهُدْهُدَ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ . لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ . فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ . اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ . وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُوْنَ . .....قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ . اِذْهَبْ بِكِتٰبِيْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَا ذَا يَرْجِعُوْنَ . قَالَتْ يٰاَيُّهَا الْمَلَؤُ اِنِّيْ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ .

"সুলায়মান বিহঙ্গদলের সন্ধান লইল এবং বলিল, ব্যাপার কি, আমি হুদহুদকে দেখিতেছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাহ্ করিব। অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং সাবা হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি তো এক নারীকে দেখিলাম উহাদের উপর রাজত্ব করিতেছে। তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সকল কিছু হইতেই এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম যে, তাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে। শয়তান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না।... সুলায়মান বলিল, আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ, না তুমি মিথ্যাবাদী? তুমি আমার এই পত্র লইয়া যাও এবং ইহা তাহাদের নিকট অর্পণ কর, অতঃপর তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদের প্রতিক্রিয়া কী? সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমায় এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে" (২৭ ঃ ২০-৩০)।

পত্রাবলী প্রেরণের জন্য ইহা ছিল সর্বপ্রাচীন মাধ্যম। তৎকালে কবুতর ইত্যাদির সাহায্যে পত্রের আদান-প্রদান করা হইত। হযরত সুলায়মান (আ) কবুতরের পরিবর্তে হুদহুদ পাখিকে পত্র বিনিময় ও তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহার করিয়াছিলেন। হুদহুদ সাবা রাজ্যে পৌঁছিয়া উহার রাণী ও জনগণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল। অতঃপর সুলায়মান (আ) তাঁহার পত্রসহ উহাকে সাবার রাণীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। সে তথায় পৌঁছিয়া রাণীর ক্রোড়ে পত্রটি ফেলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসে। রাণী সুলায়মান (আ)-এর নাম ও তাঁহার প্রতিপত্তি সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি পত্রখানি পাঠে পরিস্থিতির মূল্যায়ন করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাই উহা সম্পর্কে আলোচনার জন্য শাসক

পরিষদের পরামর্শ সভা ডাকাইয়াছিলেন (আম্বিয়া-ই-কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২৪; আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ১২০-২১; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২০; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৯)।

সাবার রাণী ও তাঁহার রাজত্ব সম্পর্কে হুদহুদ পাখির তথ্য অবগত হওয়া সম্পর্কে কোন কোন ইতিহাসবিদ বলিয়াছেন যে, সুলায়মান (আ)-এর হুদহুদ পাখি সাবার রাণীর উদ্যানে প্রবেশ করিয়া তথাকার একটি হুদহুদের সাক্ষাত পায়। সেই পাখিটি সুলায়মান (আ)-এর হুদহুদের নিকট রাণীর রাজত্ব, তাঁহার জৌলুসময় সিংহাসন, তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং এখানকার জনগণের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে বর্ণনা করে। হুদহুদ ফিরিয়া আসিয়া তাহাই নবী সুলায়মান (আ)-এর নিকট বর্ণনা করে (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৯; আরাইস, পৃ. ৩৩৫-৬)। কোন কোন তাফসীরকার ও ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, মরুভূমিতে ভূতলে পানির অনুসন্ধানই ছিল হুদহুদের প্রধান দায়িত্ব (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২১; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৯; আরাইস, পৃ. ৩৩৫)। হযরত সুলায়মান (আ) নামাযের উযূ করার জন্য পানি না পাইয়া হুদহুদের অনুসন্ধান করিলেন এবং উহাকে অনুপস্থিত পাইলেন। হুদহুদকে অনুসন্ধানের নানারূপ কারণ উল্লিখিত আছে (আরাইস, পৃ. ৩৩৫; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৯)।

কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর পত্রবাহক 'হুদহুদ' ছিল একটি পাখি। মহানবী (স)-এর বাণীতেও হুদহুদ পাখি হিসাবে আখ্যায়িত (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ইব্ন মাজা, কিতাবুস সায়দ, বাব মা ইয়ুনহা আন কাতলিহা; ২খ., পৃ. ২৩২; আবূ দাউদ, কিতাবুস সালাম, বাব ফী কাতলিয যাররি; দারিমী, কিতাবুল আদাহী, বাবুন নাহ্য়ি আন কাতলিদ দাফাদিই ওয়ান-নাহ্লাহ্; মুসনাদে আহ্মাদ, ১খ, পৃ. ৩৩২, ৩৪৮)। কিন্তু একদল লোক হুদহুদ একটি মানুষের নাম হিসাবে আখ্যায়িত করিতে চাহে। কারণ পাখি যে ঐভাবে তথ্য সংগ্রহ করিয়া 'আসিয়া' মানুষের নিকট বর্ণনা করিতে পারে এবং তাহা মানুষ বুঝিতে পারে, ইহা তাহাদের বোধগম্যের অতীত। তাহারা বলে যে, হুদহুদ নামে একটি মানুষ সুলায়মান (আ)-এর সোনাবাহিনীর সদস্য ছিল। সে-ই সাবার রাণীর তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনে।

কিন্তু ইহা একটি মনগড়া ব্যাখ্যা এবং কুরআন মজীদের তাৎপর্যগত বিকৃতি। কারণ আয়াতের শুরুই হইয়াছে পাখির উল্লেখ করিয়া ঃ "ওয়া তাফাক্‌দাত তায়র" (তিনি বিহঙ্গকুলের সন্ধান লইলেন), পরেই বলা হইয়াছে হুদহুদের কথা। ইহার একটু আগে বলা হইয়াছে ঃ "সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে, জিন্ন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে" (২৭ ঃ ১৭)। আরবী ভাষায় ঐ তিন জাতির যে প্রতিশব্দ (জিন্ন, ইন্স, তায়র) আছে, এখানে তাহাই ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা রূপক অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কোন লক্ষণও এখানে বিদ্যমান নাই। তাই শব্দত্রয়ের কল্পিত অর্থ গ্রহণের কোন অবকাশ নাই। অনন্তর জিন্ন জাতি যে হযরত সুলায়মান (আ)-এর সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল তাহা বাইবেলে উল্লেখ না থাকিলেও, ইয়াহূদীদের তালমূদ গ্রন্থে এবং তাহাদের রিব্বীদের বর্ণনায় উহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় (জিউইশ ইনসাইক্লোপেডিয়া, ১১খ, পৃ. ৪৪০-এর বরাতে তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৫৬২, টীকা ২৩; উক্ত বিষয়ের আলোচনার জন্য দ্র. পৃ. ৫৬৬-৮, টীকা ২৮; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১৪০-৪৩)।

তিনটি বিষয়ের ব্যাখ্যা ঃ (১) হুদহুদ পাখি সাবা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুলায়মান (আ)-কে বলিল, "আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি" (২৭ ঃ ২২)। এখানে লক্ষ্য করা যায় যে, সুলায়মান (আ) যে সম্পর্কে অবগত নহেন সেই সম্পর্কে একটি পাখি অবগত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা যায়, সারা পৃথিবী সম্পর্কে সুলায়মান (আ)-এর জ্ঞান থাকা জরুরী ছিল না, তাঁহার যতটুকু জ্ঞানের প্রয়োজন, আল্লাহ তাঁহাকে ততটুকুই দান করিয়াছিলেন। এখানে বিষয়টি হযরত মূসা (আ) ও খিযির (আ)-এর সহিত তুলনীয় (তাফসীরে কবীর। পৃ.)।

সুলায়মান (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ "আমাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে" (২৭ ঃ১ ৬)। আবার হুদহুদ পাখি সাবার রাণী সম্পর্কে বলিল, "তাহাকে সকল কিছু দেওয়া হইয়াছে" (২৭ ঃ ২৩)। একদিকে একজন মহান নবী ও পরাক্রমশালী শাসক এবং অপরদিকে একজন মুশরিক শাসক সম্পর্কে একই কথা বলা হইয়াছে। এই সম্পর্কে ইমাম রাযী (র) বলেন, সুলায়মান (আ)-কে নবুওয়াত, নবুওয়াতী প্রজ্ঞা এবং রাজকার্য পরিচালনার পার্থিব শক্তি দান করা হইয়াছে। অপরদিকে সাবার রাণীকে শুধু পার্থিব শক্তি দান করা হইয়াছে। একজনকে ইহ-জাগতিক ও অতি-প্রাকৃতিক উভয় শক্তি দান করা হইয়াছে এবং অপরজনকে শুধু ইহ-জাগতিক শক্তি দান করা হইয়াছে।

(৩) হুদুহুদ সাবার রাণীর সিংহাসন সম্পর্কে বলিল, وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ "তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন" (২৭ ঃ ২৩)। অপরদিকে আল্লাহ তাআলার আরশ সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ "এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি" (৯ ঃ ১২৯; আরও দ্র. ২৩ ঃ ৮৬; ২৭ ঃ ২৬)। দুই স্থানেই "আরশ আজীম" ব্যবহৃত হইয়াছে। ইমাম রাযী বলেন, আল্লাহ্র আরশ যদি শাব্দিক অর্থে তাঁহার সিংহাসন হইয়া থাকে, তবে বলা যায় যে, সমকালীন পার্থিব রাজা-বাদশাহগণের সিংহাসনের তুলনায় সাবার রাণীর সিংহাসন ছিল অতুলনীয়। কিন্তু তাহা আল্লাহ্র সিংহাসনের তুলনায় কিছুই নহে। তিনি যেন গোটা বিশ্বলোকের মহান স্রষ্টা, তাঁহার সিংহাসনও তদ্রুপ মহান ও গৌরবময় (তাফসীরে কবীর)।

বায়ুর উপর কর্তৃত্ব ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে বায়ুকে নিজ প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করার মু'জিযা দান করিয়াছিলেন। তিনি যখনই চাহিতেন বায়ুর সাহায্যে দিনের প্রথম প্রহরে এক মাসের দূরত্ব এবং শেষ প্রহরে এক মাসের দূরত্ব স্বল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করিতেন। কুরআন মজীদে এই সম্পর্কে তিনটি কথা বলা হইয়াছে ঃ (১) বায়ুকে সুলায়মান (আ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করা হইয়াছিল; (২) বায়ু তাঁহার নির্দেশের এতই অনুগত ছিল যে, উহা বেগবান ও দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নির্দেশে মোলায়েম ও মৃদু গতিসম্পন্ন হওয়ায় আরামদায়ক হইত; (৩) মৃদু গতিসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও হযরত সুলায়মান (আ) দিনের প্রথম প্রহরে ও অপরাহ্নে পৃথকভাবে এক এক মাসের পথ অতিক্রম করিতেন যেন তাহা বর্তমান কালের উড়োজাহাজের মত দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল, অথচ তাহাতে শক্তিউৎপাদক কোন যন্ত্রপাতি ছিল না, আল্লাহ্র হুকুমেই তাহা

শূন্যে উড্ডয়ন করিত (কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১০৪-৫; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১০৩; আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ১১৪-৫)। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ عَاصِفَةً تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عٰلِمِيْنَ .

"এবং সুলায়মানের বশীভূত করিয়া দিয়াছিলাম উদ্দাম বায়ুকে, উহা তাহার আদেশক্রমে প্রবাহিত হইত সেই দেশের দিকে যেখানে আমি কল্যাণ রাখিয়াছি। প্রত্যেক বিষয় সম্পর্কে আমিই সম্যক অবগত" (২১ ঃ ৮১)।

وَلِسُلَيْمٰنَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَّرَوَاحُهَا شَهْرٌ .

"আমি সুলায়মানের অধীন করিয়াছিলাম বায়ুকে যাহা প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম করিত" (৩৪ ঃ ১২০।

فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيْحَ تَجْرِيْ بِاَمْرِهٖ رُخَاءً حَيْثُ اَصَابَ .

"অতএব আমি তাহার অধীন করিয়া দিলাম বায়ুকে, যাহা তাহার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করিত সেথায় মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইত" (৩৮ ঃ ৩৬)।

হাসান বসরী (র) বলেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) ভোরে দামিশক হইতে যাত্রা করিয়া এক মাসের পথের দূরত্বে ইসতাখর পৌছিয়া সকালের নাশতা করিতেন এবং বিকালে ইসতাখর হইতে যাত্রা করিয়া এক মাসের পথের দূরত্বে কাবুল পৌছিয়া তথায় রাত্রিযাপন করিতেন (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৭)।

নবী-রাসূলগণকে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে প্রদত্ত মু'জিযাসমূহ অতি-প্রাকৃতিক ধরনের, যাহা জড়বুদ্ধির আয়ত্বের বাহিরে। আজকাল বিজ্ঞানের বদৌলতে ইহার কিছু কিছু অনুধাবন করা সহজতর হইতেছে। মানুষ এই বাতাসের শক্তি কাজে লাগাইয়া আকাশযান চালাইতেছে, শীতে ও গরমে বিশেষ যন্ত্রর সাহায্যে প্রয়োজনমত উহা গরম ও ঠাণ্ডা করা হইতেছে, আবার কখনও প্রচণ্ড বেগে তাহা প্রবাহিত করা হইতেছে। নির্দিষ্ট কোন বস্তু বা পাত্রের ভেতর হইতে মানবীয় বুদ্ধিবলে বায়ুকে অপসারণ করা হইতেছে ইত্যাদি। মানবীয় বুদ্ধিই যদি অদৃশ্যমান একটি সৃষ্টিকে এইভাবে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারে, তবে আল্লাহ্‌র কুদরত উহাকে একজন মহান নবীর নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিলে তাহাকে অলিক বলিয়া ধারণা করার কোন ভিত্তি নাই।

জিন্ন জাতির উপর কর্তৃত্ব ঃ অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে একটি অদৃশ্যমান ও অজড় জাতি জিন্নদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। হযরত সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য এই যে, মানবজাতিসহ জিন্ন জাতি তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল। তিনি ইহাদের উপর যাবতীয় ধরনের নিয়ন্ত্রণ লাভ করিয়াছিলেন। ইহারা সমুদ্রের তলদেশ হইতে তাঁহার জন্য দুর্লভ মুক্তা আহরণ করিত। তিনি ইহাদের দ্বারা নূতন নূতন শহর ও প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেন, বৃহদাকারের হাঁড়ি-পাতিল ও পত্রাদি তৈয়ারি করাইতেন। ইহাদের মধ্যে

কেহ বিদ্রোহী বা অবাধ্য হইলে তিনি উহাকে জিঞ্জীরাবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। মোটকথা, আল্লাহ্ তাআলা তাঁহাকে জিন্নদের উপর এতখানি নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দান করিয়াছিলেন যে, তিনি যথেচ্ছা ইহাদিগকে ব্যবহার করিতে পারিতেন। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنَ الشَّيٰطِيْنِ مَنْ يَّغُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ لَهُ عَمَلاً دُوْنَ ذٰلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ .

"এবং শয়তানদের মধ্যে কতক তাহার জন্য ডুবুরীর কাজ করিত, ইহা ব্যতীত অন্য কাজও করিত; আমি উহাদের রক্ষাকারী ছিলাম" (২১ ঃ ৮২)।

বাইবেল হইতে এই সম্পর্কে যৎসামান্য ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঃ "আর হীরমের যে সকল জাহাজ ওফীর হইতে স্বর্ণ লইয়া আসিত, সেই সকল জাহাজ ওফীর হইতে বিস্তর চন্দনকাষ্ঠ ও মনিও আনিত" (১ম রাজাবলী, ১০ ঃ ১১)।

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ .

"তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত" (৩৪ ঃ ১২)।

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَّغَوَّاصٍ وَاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ .

"এবং শয়তানদিগকে (তাহার অধীন করিয়া দিলাম), যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে" (৩৮ ঃ ৩৭-৩৮)।

সুলায়মান (আ)-কে ইহাদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দান করা হইয়াছিল এবং ইহার জন্য তাঁহাকে কোনরূপ জবাবদিহি করিতে হইত না (বিদায়া, ২খ, পৃ. ৩০)। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ اَوْ اَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"এইসব আমার অনুগ্রহ, ইহা হইতে তুমি অন্যকে দিতে অথবা নিজে রাখিতে পার। ইহার জন্য তোমাকে হিসাব দিতে হইবে না" (৩৮ ঃ ৩৯)।

কতক লোক জিন্নের অস্তিত্বকে অস্বীকার করিয়া বলে যে, কুরআন মজীদে জিন্ন দ্বারা তৎকালের অসম শক্তিশালী, বিরাটকায় ও দুর্ধর্ষ একটি জাতিকে বুঝানো হইয়াছে যাহাদেরকে হযরত সুলায়মান (আ) ব্যতীত অপর কেহ নিয়ন্ত্রণে আনিতে পারে নাই (কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১০৬; নির্বাচিত রচনাবলী, ২খ, পৃ. ৯৩)। যে জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ পাওয়া যায় না, সেই জিনিসকে কেবল ধর্মগ্রন্থের সনদের ভিত্তিতে বাস্তব বলিয়া মানিয়া নিতে ইহারা দ্বিধাবোধ করে। তাই তাহারা কুরআন ব্যাখ্যার নামে উহার বিকৃতি সাধনে তৎপর হয়। বস্তুত জিন্ন মানবজাতির মতই একটি অদৃশ্যমান স্বতন্ত্র জাতি। কুরআন মজীদের ১৬টি সূরায় জিন্ন সম্পর্কে বক্তব্য আছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

৬. আল-আন'আম ঃ ১০০, ১১২, ১২৮, ১৩০

৭. আল-আ'রাফ ঃ ৩৮, ১৯৭

১১. হূদ ঃ ১১৯

১৫. আল-হিজর ঃ ২৭

১৭. আল-ইসরা ঃ ৮৮

১৮. আল-কাহ্ফ ঃ ৫০

২৭. আন-নামল ঃ ১৭, ৩৯

৩২. আস-সাজদা ঃ ১৩

৩৪. সাবা ঃ ১২, ১৪, ৪১

৩৭. আস-সাফ্ফাত ঃ ১৫৮

৪১. হা-মীম-সাজদা ঃ ২৫, ২৬

৪৬. আল-আহ্কাফ ঃ ১৮, ২৯

৫১. আয-যারিয়াত ঃ ৫৬

৫৫. আর-রহ্মান ঃ ১৫, ৩৩, ৩৯, ৫৬, ৭৪

৭২. আল-জিন্ন ঃ ১, ৫, ৬

১১৪. আন-নাস ঃ ৬

উপরিউক্ত আয়াতসমূহে ৩২বার জিন্ন, জান্ন, জিন্নাতুন শব্দসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে এবং কোন কোন আয়াতে জিন্ন সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য বিদ্যমান আছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ

وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ .

"এবং তিনি জিন্নকে সৃষ্টি করিয়াছেন নির্ধূম অগ্নিশিখা হইতে" (৫৫ ঃ ১৫)।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ .

"আমি জিন্ন ও মানুষকে এইজন্য সৃষ্টি করিয়াছি যে, তাহারা আমারই ইবাদত করিবে" (৫১ ঃ ৫৬)।

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا لاَ تَنْفُذُوْنَ اِلاَّ بِسُلْطٰنٍ .

"হে জিন্ন ও মনুষ্য সম্প্রদায় ! তোমরা যদি আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করিতে পার তবে অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা অতিক্রম করিতে পারিবে না সনদ ব্যতিরেকে" (৫৫ ঃ ৩৩)।

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ .

"স্মরণ কর, যখন আমি তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিলাম একদল জিন্নকে, যাহারা কুরআন পাঠ শুনিতেছিল" (৪৬ ঃ ২৯)।

قُلْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا .

"বল, আমার প্রতি ওহী প্রেরিত হইয়াছে যে, জিন্নদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করিয়াছে এবং বলিয়াছে, আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি" (৭২ ঃ ১)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীছেও জিন্ন একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। মহানবী (স) বলেন ঃ

خُلِقَتِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُوْرٍ وَّخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ وَّخُلِقَ اٰدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ .

"ফেরেশতাগণকে নূর দ্বারা সৃষ্টি করা হইয়াছে; জিন্নকে সৃষ্টি করা হইয়াছে নির্ধূম অগ্নিশিখা দ্বারা এবং আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হইয়াছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু দ্বারা" (মুসলিম, যুহদ, বাব ফী আহাদীছ মুতাফাররিকা, ২ খ.)।

لاَ تَسْتَنْجُوْا بِالرَّوْثِ وَلاَ بِالْعِظَامِ فَاِنَّهُ زَادُ اِخْوَانِكُمْ مِّنَ الْجِنِّ .

"তোমরা না শুষ্ক গোবর দ্বারা আর না হাড় দ্বারা শৌচকার্য করিবে। কারণ এইগুলি তোমাদের ভ্রাতৃকুল জিন্নদিগের খাদ্য" (তিরমিযী, তাহারাত, বাব কারাহিয়াতি মা ইয়ুসতানজা বিহী, ১খ, আরও দ্র. বুখারী, মানাকিবুল আনসার, বাব মা জাআ মিনাল জিন্ন, নং ৩৫৭৩)।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ .

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, মহানবী (স) সূরা আন-নাজম-এ সিজদা করিলে তাঁহার সহিত মুসলমান, মুশরিক, জিন্ন ও মানব সকলে সিজদা করে" (বুখারী, তাফসীর সূরা নাজ্ম; আরও দ্র. তিরমিযী, আবওয়াবুস সাফার, বাব মা জাআ ফিস-সাজদাতি ফিন-নাজ্ম, ১ খ.)।

কুরআন মজীদ ও হাদীছ শরীফে জিন্নদিগের সম্পর্কে বহুবিধ তথ্য বিদ্যমান যাহা দ্বারা ইহারা স্বতন্ত্র জাতি প্রমাণিত হয়। সুতরাং মু'মিন মুসলমানদের ঈমান এই যে, ইহারা আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ সৃষ্টি।

তামার প্রস্রবণ ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য যেমন লৌহকে মোলায়েম ও নমনীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছিল (দ্র. ৩৪ ঃ ১০), তদ্রূপ হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য তাম্রের প্রস্রবণ প্রবাহিত করা হইয়াছিল। তিনি প্রয়োজনমত ইহা দালান-কোঠা, দুর্গাদি, নৌযান ইত্যাদি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করিতেন। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَاَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ .

"আমি তাহার জন্য গলিত তাম্রের এক প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়াছিলাম" (৩৪ ঃ ১২)।

কতক তাফসীরকার বলেন যে, আল্লাহ তাআলা ইয়ামানে গলিত তামার একটি প্রস্রবণ প্রবাহিত করিয়া উহা হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিয়াছিলেন (মাওদিহুল কুরআন-এর বরাতে আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১০৫)। কতক মুফাসসির বলেন যে, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর প্রয়োজন মাফিক তাম্রকে গলাইয়া দিতেন এবং ইহা ছিল আল্লাহ প্রদত্ত তাঁহার এক মু'জিযা (কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১১১)। আবদুল ওয়াহ্হাব আন-নাজ্জার বলেন, ভূগর্ভস্থ উত্তপ্ত উপাদানের কারণে যে স্তরে তাম্র বিগলিত অবস্থায় থাকে, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে উহার সন্ধান দিয়াছিলেন। তৎপূর্বে কেহই এই সম্পর্কে অবহিত ছিল না (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৯৩)। ইব্ন কাছীর (র) হযরত কাতাদা (র)-এর বরাতে বলেন যে, গলিত তাম্রের এই প্রস্রবণ ইয়ামানে অবস্থিত ছিল, যাহা আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য উন্মুক্ত করিয়াছিলেন (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৮)। সুদ্দী (র) বলেন, তিনি ইহা নির্মাণ ইত্যাদি কর্মে ব্যবহার করিতেন (ঐ, পৃ. ২৮)। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আকাবা উপসাগরের তীরে ঈলাত (বর্তমান আকাবা)-এর পশ্চিমে প্রায় পঁচিশ বর্গমাইল এলাকা জুড়িয়া তাম্র খনির প্রাচীন নিদর্শন আবিস্কৃত হইয়াছে, যাহা হইতে সুলায়মান (আ)-এর যুগে তাম্র উত্তোলন করা হইতে (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১০৬, টীকা ১)।

সামুদ্রিক নৌবহর ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-ই প্রথম ইসরাঈলী শাসক যিনি সামুদ্রিক নৌবহর গঠনের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করিয়াছিলেন। তিনি ইসিয়ূন জাবির নামক স্থানে এক বিরাট নৌবহর গঠন করেন। সূর (লেবানন)-এর শাসক ১ম হীরাম (দাউদ ও সুলায়মান (আ)-এর মিত্র)-এর অভিজ্ঞ ও সচেতন নাবিকগণ ঐ নৌবহরের পরিচালক ছিল। এই সম্পর্কে বাইবেলে বিবৃত আছে ঃ "আর শলোমন রাজা ইদোম দেশে সূফসাগরের তীরস্থ এলতের নিকটবর্তী ইৎসিয়োন-গেবরে কতকগুলি জাহাজ নির্মাণ করিলেন। পরে হীরম শলোমনের দাসদের সহিত সামুদ্রিক কার্যে নিপুণ আপন দাসদিগকে সেই সকল জাহাজে প্রেরণ করিলেন। তাহা ও ফীরে গিয়া তথা হইতে চারি শত বিশ তালন্ত স্বর্ণ লইয়া শলোমন রাজার নিকটে আনিল" ১ম রাজাবলী, ৯ ঃ ২৬-২৮)। হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার শাসনামলে ব্যাপক আকারে সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তাঁহার নৌবহর একদিকে ইসিয়ূন জাবির হইতে লোহিত সাগরস্থ ইয়ামানে এবং দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহে যাতায়াত করিত, অপরদিকে রোম সাগরস্থ বন্দর হইতে পশ্চিম অঞ্চলের দেশসমূহে যাতায়াত করিত (তাফহীমুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬, টীকা ৭৪)।

সামরিক বাহিনী ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে মানবজাতি, জিন্ন জাতি ও বিহঙ্গকুলের সমন্বয়ে গঠিত একটি অত্যন্ত শক্তিশালী, দক্ষ ও প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী সামরিক বাহিনী দান করিয়াছিলেন। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ .

"সুলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হইল তাহার বাহিনীকে– জিন্ন, মানুষ ও বিহঙ্গকুলকে এবং উহাদিগকে বিন্যস্ত করা হইল বিভিন্ন ব্যূহে" (২৭ ঃ ১৭)।

হযরত সুলায়মান (আ) যখন কোন অভিযানে যাত্রা করিতেন, তখন জিন্ন, মানুষ ও বিহঙ্গকুল, এই তিন বাহিনী হইতে প্রয়োজন মাফিক সৈন্য সঙ্গে লইতেন (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫০৪, টীকা ১)। ইহাদের মধ্যে বিহঙ্গকুল পাখা বিস্তার করিয়া মনুষ্য বাহিনীকে ছায়া দান করিত (বিদায়া, ২খ, পৃ. ১৯) এবং জিন্ন বাহিনীকে বিভিন্ন ধরনের শ্রমসাধ্য কর্মে নিয়োগ করা হইত, যাহা কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। কতক ডুবুরির কাজ করিত (২১ ঃ ৮২); কতক অন্যান্য কাজ করিত (৩৪ ঃ ১২), কতক প্রাসাদ, ভাস্কর্য ও চৌবাচ্চা সদৃশ্য রন্ধনপাত্র নির্মাণ করিত।

وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَّعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِاِذْنِ رَبِّهٖ وَمَنْ يَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ اَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيْرِ . يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَاۤءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ .

"তাহার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে জিন্নদের কতক তাহার সম্মুখে কাজ করিত। উহাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ অমান্য করে তাহাকে আমি অগ্নি-শাস্তি আস্বাদন করাইব। উহারা সুলায়মানের ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, ভাস্কর্য, হাওয সদৃশ বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগ নির্মাণ করিত" (৩৪ ঃ ১২-১৩)।

وَالشَّيٰطِيْنَ كُلَّ بَنَّاۤءٍ وَّغَوَّاصٍ وَّاٰخَرِيْنَ مُقَرَّنِيْنَ فِى الْاَصْفَادِ .

"এবং শয়তানদিগকেও (তাহার অধীন করিয়াছিলাম), যাহারা সকলেই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী এবং শৃঙ্খলে আবদ্ধ আরও অনেককে" (৩৮ ঃ ৩৭-৩৮; আরও দ্র. বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৮)।

কোন কোন তাফসীরকার ও ঐতিহাসিক হযরত সুলায়মান (আ)-এর সৈন্যসংখ্যার কল্পনাতীত প্রাচুর্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যাহার কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই। বাইবেলে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর একটি পরিসংখ্যান বিদ্যমান। "শলোমনের রথের নিমিত্ত চল্লিশ সহস্র অশ্বশালা ও বারো সহস্র অশ্বরোহী ছিল" (১ম রাজাবলী, ৪ ঃ ২৬-২৭)। "আর শলোমন অনেক রথ ও অশ্বারোহী সংগ্রহ করিলেন; তাঁহার এক সহস্র চারি শত রথ ও বারো সহস্র অশ্বারোহী ছিল" (১ম রাজাবলী, ১০ ঃ ২৬)।

সুলায়মান (আ) সম্পর্কে অলীক কাহিনী ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে মু'জিযাস্বরূপ বেশ কিছু অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতা দান করিয়াছিলেন। যেমন অজড়দেহী জিন্ন জাতির উপর তাঁহার কর্তৃত্ব, পিপীলিকা ও পশু-পাখির ভাষা অনুধাবনশক্তি, বায়ুর উপর নিয়ন্ত্রণলাভ, মুহূর্তকালের মধ্যে সাবার রাণীর সিংহাসন আনয়ন ইত্যাদি, যে সম্পর্কে কুরআন মজীদেই প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহার সম্পর্কে প্রসিদ্ধ একটি রূপকথা এই যে, তাঁহার একটি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আংটি ছিল যাহা তাঁহাকে উর্ধ্ব জগত হইতে প্রদান করা হইয়াছিল। চারি কোণবিশিষ্ট উক্ত আংটির এক কোণে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকা লাহু, মুহাম্মাদ আবদুহু ওয়া রাসূলুহু", দ্বিতীয় কোণে

اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء تبارکت .

তৃতীয় কোণে كل شيئ هالك الاّ وجهه এবং চতুর্থ কোণে تبارك الهى لا شريك لك খোদিত ছিল। তিনি উহা পরিধান করামাত্র তাঁহার নিকট মানব, দানব (জিন্ন), খেচর, শয়তান, বায়ু, মেঘমালা ইত্যাদি আসিয়া সমবেত হইত এবং তিনি ইহার সাহায্যে শাসনকার্য চালাইতেন (তাহযীব তারীখ দিমাশক্, ৬খ, পৃ. ২৬৫; আরও দ্র. আরাইস, পৃ. ৩৪৮)। হাদীছ শরীফে তাঁহার আংটির উল্লেখ থাকিলেও উহার কোন অলৌকিক শক্তির উল্লেখ নাই। মহানবী (স) বলেন ঃ

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ وَمَعَهَا خَاتِمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ.... وَتَخْتُمُ اَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتِمِ.....

"একটি পশু ভূগর্ভ থেকে আবির্ভূত হইবে এবং উহার সহিত থাকিবে দাঊদ (আ)-এর পুত্র সুলায়মান (আ)-এর আংটি... পশুটি উহা দ্বারা কাফের ব্যক্তির নাকে চিহ্ন অংকন করিবে... (ইব্‌ন মাজা, ফিতান, বাব দাব্বাতুল আরদ, ২খ, পৃ. ২৯৫)।

তাঁহার সম্পর্কে এই জাতীয় অলীক কাহিনীর প্রমাণ হাদীছ শরীফ হইতেও পাওয়া যায়। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আইশা (রা) বলেন ঃ

قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَوْ خَيْبَرَ وَفِىْ سَهْوَتِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتِ الرِّيْحُ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٌ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِىْ وَرَاٰى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هٰذَا الَّذِىْ اَرٰى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هٰذَا الَّذِىْ عَلَيْهِ قُلْتُ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ اَمَا سَمِعْتَ اَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلاً لَهَا اَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى رَاَيْتُ نَوَاجِذَهُ .

"রাসূলুল্লাহ (স) তাবূক অথবা খায়বার-এর যুদ্ধ শেষে ফিরিয়া আসিলেন। আমার হুজরার তাকে (বা দেয়ালের গর্তে) পর্দা ঝুলান ছিল। বায়ু প্রবাহিত হইলে কাপড়ের তৈরী আমার খেলনা পুতুলগুলি হইতে পর্দা অপসারিত হইয়া গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আইশা! ইহা কি? তিনি বলেন, আমার পুতুল। তিনি ঐগুলির মধ্যখানে কাপড়ের দুই পাখাবিশিষ্ট একটি ঘোড়ার পুতুল দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এইগুলির মধ্যখানে যাহা দেখিতেছি তাহা কি? তিনি বলেন, একটি ঘোড়া। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার উপর ইহা কি? আমি বলিলাম, দুইটি পাখা। তিনি বলিলেন, দুই পাখাবিশিষ্ট ঘোড়া! আমি বলিলাম, আপনি কি শুনেন নাই যে, সুলায়মান (আ)-এর কয়েকটি পক্ষবিশিষ্ট একটি ঘোড়া ছিল? আইশা (রা) বলেন, (আমার কথায়) রাসূলুল্লাহ (স) এমন হাসি দিলেন যে, আমি তাঁহার সামনের পাটির দাঁত দেখিতে পাইলাম" (আবূ দাঊদ, কিতাবুল আদাব, বাব ফিল-লাআব বিল-বানাত, ২খ.)।

তাঁহার সম্পর্কে যুগ যুগ ধরিয়া যে অযাচিত পরিমাণ রূপকথা ও উপাখ্যান রচিত হইয়াছে বা প্রচলিত আছে, মনে হয় পৃথিবীর আর কোনও ব্যক্তি সম্পর্কে, বিশেষত কোনও নবী সম্পর্কে, এত অধিক উপাখ্যান রচিত হয় নাই।

সুলায়মান (আ)-এর বৈবাহিক জীবন ও সন্তান-সন্ততি ঃ সুলায়মান (আ) সর্বপ্রথম মিসর-রাজ ফিরআওনের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং উপঢৌকনস্বরূপ জিযার (Gezer) শহর লাভ করেন। (Colliers Ency., ২১ খ, পৃ. ১৯৩)। ইহা ব্যতীত তিনি মুআবীয়, আম্মোনীয়, ইদোমীয়, সীদোনীয় ও হিত্তীয় সম্প্রদায়ের কন্যাগণকে বিবাহ করেন (দ্র. ১ম রাজাবলী, ১১ ঃ ১)। তিনি সাবার রানীকেও বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত (বরাত সস্থানে উক্ত হইবে)। কোন কোন বর্ণনায় তাঁহার এক স্ত্রী গোপনে মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল বলা হইয়াছে এবং তাহার কারণে তিনি কঠিন বিপদে পতিত হইয়াছিলেন (দ্র. আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৮২-৩)। তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যাও অতিরঞ্জিত হইয়াছে। কোনও বর্ণনায় তাহাদের সংখ্যা এক হাজার (সাত শত স্ত্রী এবং তিন শত বাঁদী অথবা ইহার বিপরীত), কোন বর্ণনায় এক হাজার এক শত স্ত্রী (৭০০ স্ত্রী এবং ৪০০ বাঁদী; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৯) এবং কোন বর্ণনায় ২০০ স্ত্রী (তাহ্যীব, ৬খ, পৃ. ২৬৬) উল্লেখ আছে। স্পষ্টরূপেই উপরিউক্ত তথ্য বাইবেল হইতে গৃহীত হইয়াছে (দ্র. ১ম রাজাবলী, ১১ ঃ ৩, যেখানে তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা এক হাজার উল্লেখ আছে)। কিন্তু সহীহ হাদীছসমূহে তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ষাট এবং সর্বোচ্চ এক শত উল্লেখ আছে। যেমন এক হাদীছে মহানবী (স) বলেন ঃ

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ لَاَطُوْفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلٰى مِائَةِ اِمرَأَةٍ اَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِيْنَ كُلُّهُنَّ يَاْتِيْ (تَاْتِيْ) بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَقُلْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَلَمْ يَحْمِلْ (تَحْمِلْ) مِنْهُنَّ اِلاَّ اِمْرَاَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهٖ لَوْ قَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فُرْسَانًا اَجْمَعُوْنَ .

“সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ) বলিয়াছিলেন, আজ রাত্রে আমি অবশ্যই এক শত অথবা নিরানব্বইজন স্ত্রীর নিকট গমন করিব এবং তাহাদের প্রত্যেকে আল্লাহ্র পথে জিহাদকারী এক একজন বীর মুজাহিদ প্রসব করিবে। তাঁহার এক সঙ্গী তাঁহাকে বলিলেন, ইনশাআল্লাহ (আল্লাহ্র মর্জি হইলে), কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার একজন স্ত্রী ব্যতীত অপর কেহই গর্ভধারণ করে নাই এবং সেও একটি অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করিল। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ, যাঁহার হস্তে মুহাম্মাদের প্রাণ! তিনি যদি “ইনশাআল্লাহ” বলিতেন তাহা হইলে (তাঁহার সকল স্ত্রীই গর্ভধারণ করিত এবং এমন সন্তান প্রসব করিত) যাহারা সকলে অবশ্যই অশ্বারোহী মুজাহিদরূপে আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিত” (বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, বাব মান তালাবাল ওয়ালাদ লিল-জিহাদ, ১খ, পৃ. ৩৯৫)।

একই হাদীছ গ্রন্থের কিতাবুল আম্বিয়ায় ৭০ ও ৯০জন (বাব ওয়া ওয়াহাবনা লি-দাঊদা সুলায়মান, ১খ, পৃ. ১৮৭); কিতাবুন নিকাহ-এ ১০০জন (বাব কাওলির রাজুল লাআতূফান্নাল লায়লাতা...., ২খ, পৃ. ৭৮৮); কিতাবুল আয়মান (বাব কায়ফা কানা ইয়ামীনুন নাবিয়্যী, ২খ, পৃ. ৯৮২) ও কিতাবুল কাফফারাত (বাবুল ইসতিছনা ফিল আয়মান, ২খ, পৃ. ৯৯৪)-এ ৯৯ জন এবং

কিতাবুত তাওহীদ (বাব ফিল মাশয়াতি ওয়াল ইরাদাহ, ২খ, পৃ. ১১১৩)-এ ৬০জন স্ত্রীর উল্লেখ আছে। সহীহ মুসলিমের কিতাবুল আয়মানে (বাবুল ইসতিছনা, ২খ, পৃ. ৪৯) চারটি রিওয়ায়াতে ৭০জন ও ৯০জন স্ত্রীর উল্লেখ আছে। জামে আত-তিরমিযীর আবওয়াবুল আয়মান (বাব মা জাআ ফী ইনশাআল্লাহ, ১খ, পৃ. ১৮৫)-এ ৭০ ও ১০০ জন স্ত্রীর উল্লেখ আছে।

উক্ত হাদীছের সবকয়টি সনদসূত্র অত্যন্ত মজবুত এবং ইহার বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও আপত্তি উত্থাপনের কোন কারণ বিদ্যমান নাই। তবে দিরায়াতের (যুক্তি) দিক বিবেচনা করিয়া বলা যাইতে পারে যে, মহানবী (স) হয়তো ইয়াহূদীদের আজেবাজে কথাবার্তার উল্লেখ করিতে গিয়া উপমাস্বরূপ উক্ত সংখ্যা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু রাবী উক্ত সংখ্যাকে তাঁহার নিজের বক্তব্য মনে করিয়া তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যথায় একজন মহান নবীর এইরূপ পত্নীবাহুল্য তাঁহার মর্যাদার পরিপন্থী মনে হয়। তাহা ছাড়া ১০-১২ ঘণ্টার এক রাত্রে ৬০ হইতে ১০০জন স্ত্রীর সহিত মিলিত হওয়া যে কোনও বীর্যবান সুস্থদেহী পুরুষের পক্ষে অসম্ভব। অতএব স্ত্রীর আধিক্যও একটি কল্পকাহিনী হইয়া থাকিবে।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর সন্তানদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তাঁহার পুত্র-কন্যার মধ্যে এক পুত্র ও দুই কন্যার নাম বাইবেলে উক্ত আছে ঃ পুত্র রহবিয়াম (১ম বংশাবলী, ৩ ঃ ১০), পিতার ইনতিকালের পর যিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন (১ম রাজাবলী, ১২ ঃ ১)। দুই কন্যা-টাফত যিনি দোর এলাকার উচ্চভূমির সরদার বিন-অবিনাদরে স্ত্রী ছিলেন (১ম রাজাবলী, ৪ ঃ ১, ১১, ১৫) এবং বাসমাত, যিনি নপ্তালী এলাকার বাসিন্দা অহীমাস-এর স্ত্রী ছিলেন (১ম রাজাবলী, ৪ ঃ ১৫)।

সুলায়মান (আ) ও অশ্বপাল ঃ হযরত সুলায়মান (আ)-এর আলোচনায় কুরআন মজীদে অতি সংক্ষেপে অশ্বপাল সম্পর্কিত একটি ঘটনার উল্লেখ আছে।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابٌ . اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفِنٰتُ الْجِيَادُ. فَقَالَ اِنِّىْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىْ حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ . رُدُّوْهَا عَلَىَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ .

"আমি দাউদকে দান করিলাম সুলায়মান। সে ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী। যখন অপরাহ্নে তাহার সম্মুখে ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট অশ্বরাজিকে উপস্থিত করা হইল তখন সে বলিল, আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হইতে বিমুখ হইয়া ঐশ্বর্যপ্রীতিতে মগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, এদিকে সূর্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছে। এইগুলিকে পুনরায় আমার নিকট আনয়ন কর। অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল" (৩৮ ঃ ৩০-৩৩)। উপরিউক্ত আয়াত কয়টিও দ্ব্যর্থবোধক আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইহার ব্যাখ্যায় হযরত আলী (রা)-র একটি মত এবং আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-র দুইটি মত বিদ্যমান আছে। (১) আলী (রা)-র মতে একদা জিহাদের অশ্বগুলি পরিদর্শনের ব্যস্ততায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর আসরের নামায ছুটিয়া যায়, এমনকি সূর্য অস্তাচলে চলিয়া গেল, যেমন খন্দকের যুদ্ধ চলাকালে অনিবার্য কারণে মহানবী (স)-এর

আসরের নামায কাযা হইয়াছিল। তিনি সম্বিত ফিরিয়া পাইয়া অশ্বগুলিকে ডাকাইয়া আনাইয়া উহাদিগকে যবাহ করিয়া ফেলিলেন, যেন সম্পদের ভালোবাসাকে আল্লাহ্র ভালোবাসায় কুরবানী করিলেন (তাফসীরে তাবারী, ১০ম বালাম, ২খ, পৃ. ৯৯; তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৬খ, পৃ. ২৫৮-৯; কাসাসুল কুরআন ২খ, পৃ. ১১২-৩) এবং ইহাই কিঞ্চিত পার্থক্যসহ হাসান বসরী (র)-এর সূত্রে বর্ণিত ইব্ন আব্বাস (রা)-মত। আল্লামা আলূসী ও ইব্ন কাছীর প্রমুখ এই মত গ্রহণ করিয়া বলেন যে, আগেকার (সালাফ) অধিকাংশ আলেমের এই মত (বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৫)। তিনি আরও বলেন, নামায কাযা হওয়ার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত।

তিনি আল্লাহ্র মহব্বতে তাঁহার ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সর্বোত্তম অশ্বগুলিকে কুরবানী করিলে আল্লাহ তাআলা তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুরস্কারস্বরূপ বায়ুকে তাঁহার নিয়ন্ত্রণাধীন করিয়া দিলেন (রূহুল মা'আনী, ২খ, পৃ. ১৯৩; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৫)। তাঁহারা নিজেদের ব্যাখ্যার সমর্থনে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঃ

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ قَوْلِهِ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ قَالَ قَطَعَ سُوْقَهَا وَاَعْنَاقَهَا بِالسَّيْفِ .

"উবায়্যি ইব্ন কাব (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) আল্লাহ তাআলার বাণী "অতঃপর সে উহাদের পদ ও গলদেশ ছেদন করিতে লাগিল" (৩৮ ঃ ৩৩) সম্পর্কে বলেন ঃ সুলায়মান (আ) তরবারির আঘাতে উহাদের পদযুগল ও গলদেশ কর্তন করিলেন" (রূহুল মা'আনী, ২৩খ, পৃ. ১৯৩; দুররে মানছূর, ৫খ, পৃ. ৩০৯)।

আল্লামা হায়ছামী (র) ইমাম তাবারানীর আল-আওসাত গ্রন্থের বরাতে তাঁহার মাজমাউয যাওয়াইদ গ্রন্থের কিতাবুত তাফসীরে (৭খ, পৃ. ৯৯) হাদীছটি সংকলন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, উক্ত হাদীছের এক রাবী সাঈদ ইব্ন বশীরকে শো'বা (র) প্রমুখ নির্ভরযোগ্য বলিয়াছেন এবং ইব্ন মাঈন প্রমুখ দুর্বল বলিয়াছেন। হাদীছের অবশিষ্ট সকল রাবী নির্ভরযোগ্য (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৭খ, ৯৯-এর বরাতে মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১২-৩)। এই হাদীছের ভিত্তিতে পূর্বোক্ত মুফাসসিরগণের মত শক্তিশালী হয়।

তবে এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে কুরআনের বাহিরের তিনটি কথা কল্পনা করিতে হয় ঃ (ক) প্রথমে কল্পনা করিতে হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর আসরের নামায (মতান্তরে ঐ সময়ে তাঁহার বিশেষ ওজীফা) কাযা হইয়া গিয়াছিল; (খ) অতঃপর কল্পনা করিতে হয় যে, সূর্য অস্তাচলে চলিয়া গিয়াছিল; (গ) অতঃপর কল্পনা করিতে হয় যে, সুলায়মান (আ) অশ্বগুলিকে হত্যা করিয়াছেন। এই তিনটি কথা কুরআন মজীদের বক্তব্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে হয় না (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩৩৩-৪, টীকা ৩৫; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১১৫-৬)।

অপর একদল তাফসীরকারের মতে حَتّٰى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ এবং رُدُّوْهَا عَلَيَّ উভয় বাক্যাংশের সম্পর্ক সূর্যের সহিত। অর্থাৎ যখন আসরের নামায কাযা হইল এবং সূর্য অস্তগমন করিল তখন

হযরত সুলায়মান (আ) ফেরেশতাগণকে বলিলেন, সূর্যকে ফিরাইয়া আন, যেন আসরের ওয়াক্ত ফিরিয়া আসে এবং আমি নামায পড়িতে পারি। তদনুযায়ী সূর্য ফিরিয়াও আসিল এবং তিনি নামাযও পড়িলে। কিন্তু এই তাফসীর পূর্বোক্ত তাফসীরের তুলনায় আরও অধিক অগ্রহণযোগ্য। কারণ কুরআন মজীদের বাচনভঙ্গি হইতে উহার কিঞ্চিৎ সমর্থনও পাওয়া যায় না, যদিও মহান আল্লাহ্র পক্ষে ডুবন্ত সূর্যকে ফিরাইয়া আনা মোটেই অসম্ভব নহে (রূহুল মা'আনী, ২৩ খ, পৃ. ১৯৩)। হযরত সুলায়মান (আ)-এর জন্য এইরূপ বিরাট একটি মু'জিযা সংঘটিত হইয়া থাকিলে এবং সূর্যের পুনরায় ফিরিয়া আসার অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটিয়া থাকিলে পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার অবশ্যই উল্লেখ থাকিত।

উপরিউক্ত মতের তাফসীরকারগণ কয়েকটি হাদীছ পেশ করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, সূর্যের অস্তাচলে ডুবিয়া যাওয়ার পর উহার পুনরায় ফিরিয়া আসার ঘটনা কয়েকবারই ঘটিয়াছিল।

عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْحٰى اِلَيْهِ وَرَاْسُهُ فِىْ حِجْرِ عَلِىٍّ فَلَمْ يُصَلِّ الْعَصْرَحَتّٰى غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّيْتَ يَا عَلِىُّ قَالَ لاَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ، صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ فِى طَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُوْلِكَ فَارْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ . قَالَتْ اَسْمَاءُ فَرَاَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَاَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ وَوَقَعَتْ عَلَى الْاَرْضِ وَذٰلِكَ فِى الصَّهْبَاءِ فِى خَيْبَرَ .

"আসমা বিন্ত উমায়স (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স)-এর উপর ওহী নাযিল হইতেছিল। তখন তাঁহার মস্তক আলী (রা)-র কোলে রাখা ছিল। ফলে তিনি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামায পড়িতে পারেন নাই। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ হে আলী! নামায পড়িয়াছ? তিনি বলিলেন, না। রাসূলুল্লাহ (স) বলিলেন ঃ হে আল্লাহ! সে আপনার আনুগত্যাধীন ও আপনার রাসূলের আনুগত্যাধীন ছিল। অতএব তাহার জন্য সূর্যকে ফিরাইয়া দিন। আসমা (রা) বলেন, আমি সূর্যকে অস্ত যাইতে দেখিয়াছি, পুনরায় অস্ত যাওয়ার পর উহাকে উদিত হইতে এবং ভূ-পৃষ্ঠে উহার আলো পতিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা খায়বার এলাকার আস-সাহ্বা নামক স্থানের ঘটনা" (রূহুল মাআনী, ২৩খ, পৃ. ১৯৩)।

কিন্তু যে ব্যাখ্যার সমর্থনে এই জাতীয় হাদীছ পেশ করা হয় সেই ব্যাখ্যা হইতেও এইগুলি অধিক দুর্বল। হযরত আলী (রা)-র সহিত সংশ্লিষ্ট হাদীছ ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যা ও ইবনুল জাওযী-এর মতে মওযূ' (মনগড়া) এবং ইমাম আহমাদের মতে ইহার কোন ভিত্তি নাই। খন্দকের যুদ্ধকালে সূর্যের ফেরত আসা সংক্রান্ত হাদীছটিও কতক মুহাদ্দিছের মতে দুর্বল এবং কতকের মতে মওযূ' (মনগড়া)। মি'রাজের ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট হাদীছটি নিম্নরূপ ঃ

لَمَّا اُسْرِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَخْبَرَ قَوْمَهُ بِالرِّفْقَةِ وَالْعَلاَمَةِ الَّتِىْ فِى الْعِيْرِ قَالُوْا مَتٰى يَجِيْئُ قَالَ يَوْمِ الْاَرْبِعَاءِ فَلَمَّا كَانَ ذٰلِكَ الْيَوْمُ اَشْرَفَتْ قُرَيْشٌ يَنْظُرُوْنَ وَقَدْ وَلَّى النَّهَارُ وَلَمْ يَجِيْئُ فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَزِيْدَ فِى النَّهَارِ سَاعَةً وَحُبِسَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ .

"মহানবী (স)-কে মি'রাজে নেওয়া হইলে এবং তিনি তাঁহার কওমকে ব্যবসায়ী কাফেলার সহিত সাক্ষাত এবং উহার লক্ষণ বর্ণনা করিলে তাহারা জিজ্ঞাসা করিল যে, উহা কখন প্রত্যাবর্তন করিবে? তিনি বলিলেন ঃ বুধবার। ঐ দিন আগত হইলে কুরায়শগণ উচ্চস্থানে উঠিয়া কাফেলার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু দিন শেষেও উহা প্রত্যাবর্তন করে নাই। এই অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (স) দু'আ করিলে দিনের দৈর্ঘ্য এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং সূর্যকে আটক করিয়া রাখা হয়" (রূহুল মা'আনী, ২৩খ, পৃ. ১৯৩)।

অপর একটি তাফসীর বর্ণনা করিয়াছেন আবু তালহা (রা)-র পুত্র আলী (র) ইব্ন আব্বাস (রা)-র সূত্রে। এক দিন অপরাহ্নে হযরত সুলায়মান (আ) আস্তাবল হইতে অশ্বপাল আনিয়া হাযির করিতে বলিলেন। উহা তাঁহার সামনে উপস্থিত করা হইলে তিনি বলিলেন, এই অশ্বপাল কেবল আমার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য কিংবা ব্যক্তিগত কারণে প্রিয় নহে, বরং এইগুলির সাহায্যে আমি আল্লাহ্র পথে জিহাদ করিব। অশ্বপাল পুনরায় আস্তাবলে ফিরিয়া গেলে (কাহারও মতে ঘোড়দৌড় অনুষ্ঠানে দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গেলে) তিনি সেইগুলিকে পুনরায় ফেরত আনার নির্দেশ দিলেন। অশ্বপাল তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে তিনি ভালোবাসার আবেগে অশ্বগুলির পদযুগল ও ঘাড় মলিয়া দিতে লাগিলেন (তাফসীরে তাবারী, ১০ম বালাম, ২৩খ, পৃ. ১০০; তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ.; মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৩; তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩৩৫, টীকা ৩৫; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১১৪; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৩৪-৫; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৫)। এই তাফসীর কুরআন মজীদে ব্যবহৃত শব্দাবলীর সহিত অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এই ক্ষেত্রে সূর্যকে উহ্য মানার, আসরের নামায কাযা হওয়ার এবং স্পর্শ (মাসহ) অর্থ তরবারির আঘাতে হত্যা করার কল্পনা করার প্রয়োজন হয় না (তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা.; কাসাসুল কুরআন, পৃ. স্থা.)।

এই ব্যাখ্যার দৃষ্টিতে إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ -এর অর্থ হইবে ঃ "নিশ্চয় আমার মালের মহব্বত আমার প্রভুর স্মরণের অন্তর্ভুক্ত"। কারণ এই মাল তো আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্য প্রতিপালন করা হইতেছে। আর تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ -এর অর্থ হইবে ঃ "এমনকি তাহা (অশ্ব) দৃষ্টিসীমার বাহিরে চলিয়া গেল" এবং وَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ -এর অর্থ হইবে ঃ "অতঃপর সে উহার (অশ্বের) পদযুগল ও ঘাড় মলিয়া দিতে লাগিল"।

সুলায়মান (আ)-এর বিপদ বা পরীক্ষা ঃ কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে বিপদগ্রস্ত করিয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ .

"আমি তো সুলায়মানকে পরীক্ষা করিলাম এবং তাহার আসনের উপর রাখিলাম একটি ধড়। অতঃপর সে আমার অভিমুখী হইল" (৩৮ ঃ ৩৪)।

উক্ত আয়াতে কেবল পরীক্ষার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু কি ধরনের বা কিসের পরীক্ষা ছিল এবং 'জাসাদ' (ধড়) বলিতেই বা কি বুঝানো হইয়াছে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা অন্য কোন আয়াতেও উক্ত হয় নাই। হাদীছ শরীফেও ইহার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা বিদ্যমান নাই। কুরআন মজীদের এই আয়াতটি

অত্যন্ত কঠিন ও দুর্বোধ্য অর্থবোধক আয়াতসমূহের একটি। অকাট্যভাবে ইহার তাফসীর করার সন্দেহাতীত কোন উপাত্ত বিদ্যমান নাই। তাফসীরকার ও ইতিহাসবিদগণ ইহার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন ধরনের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কাহারও মতে হযরত সুলায়মান (আ)-এর অজ্ঞাতে তাঁহার প্রাসাদে তাঁহার এক স্ত্রী দীর্ঘ চল্লিশ দিন যাবত প্রতীমা পূজায় লিপ্ত ছিল। এ জন্য আল্লাহ্ তাআলা তাঁহার নবীর প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৮; আরও দ্র. আরাইস, পৃ. ৩৫১; কাসাসুল কুরআন, ৩ খ, পৃ. ১২২; বাইবেলেও ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ বিবৃতি বিদ্যমান আছে, দ্র. ১ম রাজাবলী, ১১ ১—১০)। কিন্তু ইহা আয়াতের কোন যৌক্তিক ব্যাখ্যা নহে। কারণ স্ত্রী একান্ত চুপিসারে মূর্তিপূজা করিয়া থাকিলে সেই পাপ তাহার। আল্লাহ তাআলা তাঁহার নবীকে স্বীয় অজ্ঞাত বিষয়ের জন্য শাস্তি দেন না (পূর্বোক্ত বরাত)।

কতক তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) একাধারে কয়েক দিন (বর্ণনান্তরে তিন দিন) অন্দর মহলে অবস্থান করেন এবং শাসক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ঐ সময় কোন মজলুমের ফরিয়াদ শ্রবণ ও উহার প্রতিকারের জন্য বাহিরে আসেন নাই। ইহাতে তাঁহার রাজ্য ক্ষমতা চলিয়া যায় এবং ঐ তিন দিন শয়তান তাঁহার সিংহাসনে উপবিষ্ট হয় এবং 'জাসাদ'-এর অর্থ এই শয়তান (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৮; যাদুল মাসীর, ৭খ, পৃ. ১৩৩-৪; তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৬খ, পৃ. ২৬৪; আরাইস, পৃ. ৩৫১)। আবার কেহ বলিয়াছেন যে, ইহাতে তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন আংটি হারাইয়া যায়। ফলে উহা শয়তানের হস্তগত হয় এবং শয়তান চল্লিশ দিন ধরিয়া সুলায়মান-বেশে রাজত্ব ও অনাচার করিতে থাকে। তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া সন্দেহ হইলে পর বানূ ইসরাঈলের আলেমগণ তাহার সম্মুখে তাওরাত কিতাব পড়িতে শুরু করিলে সে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিল। পথিমধ্যে আংটিটি সে ফেলিয়া দেয় অথবা তাহার হাত হইতে সমুদ্রে পড়িয়া যায়। একটি মাছ উহা গলাধঃকরণ করে। ঘটনাক্রমে মাছটি হযরত সুলায়মান (আ)-এর হস্তগত হয় এবং তিনি উহা রন্ধনের উদ্দেশ্যে কাটিতে গিয়া আংটি ফেরত পাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যও ফেরত পাইলেন (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৭-৮; যাদুল মাসীর, ৭খ, পৃ. ১৩৫-৮)। শয়তান কর্তৃক আংটি দখলের ঘটনাটি বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্নরূপে বর্ণিত হইয়াছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. তাহ্যীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৬৪-৫; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৮৪-৫; আরাইস, পৃ. ৩৪৮-৫১)।

কতক তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, হযরত সুলায়মান (আ) একটি পুত্র সন্তান লাভ করিলে শয়তানেরা তাহাকে এই ভাবিয়া হত্যা করার ষড়যন্ত্র করে যে, সে জীবিত থাকিলে ইহারা তাহার হাতেও নিগৃহিত হইতে থাকিবে। হযরত সুলায়মান (আ) এই ষড়যন্ত্রের বিষয়টি টের পাইয়া উক্ত সন্তানকে মেঘপুঞ্জের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন এবং তথায় তাহার লালন-পালনের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি এই ফেতনায় পতিত হইলেন যে, তিনি আল্লাহ্র উপর ভরসা করার পরিবর্তে মেঘমালার উপর উহার প্রতিপালনের দায়িত্ব দিলেন। তাঁহাকে ইহার শাস্তি এইভাবে দেওয়া হইল যে, ছেলেটি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া লাশ আকারে পিতার সিংহাসনের উপর পতিত হইল (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৮; যাদুল মাসীর, ৭খ, পৃ. ১৩৪-৫; আরাইস, পৃ. ৩৫১)।

এইসব ঘটনা উল্লেখের পর ইমাম রাযী (র) সেইগুলিকে বাতিল গালগল্প আখ্যা দিয়াছেন। অনুরূপভাবে আল্লামা ইব্ন কাছীর (তাফসীর), ইব্ন হাযম (আল-ফিসাল), কাজী ইয়াদ (শিফা),

বদরুদ্দীন আয়নী (উমদাতুল কারী), ইব্ন হিব্বান (তাফসীর) প্রমুখ ইমামগণ নিজ নিজ গ্রন্থে একই মন্তব্য করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২৩)। ইমাম রাযী আরও বলিয়াছেন যে, শয়তানকে নবী-রাসূলগণের অবয়ব ধারণের শক্তি দান করা হয় নাই। উহাকে সেই শক্তি দেওয়া হইলে শরীআতের কোন বিষয়ের উপরই আর আস্থা রাখা যাইত না (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৮; আরও দ্র. তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৬৫, ওয়া হাযা মিন আবাতীলিহি; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৮২-৩, টীকা নং ১)।

কতক তাফসীরকার উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত সুলায়মান (আ)-এর স্ত্রীসংখ্যা সংক্রান্ত হাদীছটি পেশ করিয়াছেন। কিন্তু মহানবী (স) উক্ত আয়াতের আলোচনা প্রসঙ্গে হাদীছটি বলিয়াছেন এইরূপ প্রমাণ কোথাও বিদ্যমান নাই এবং হাদীছের মূল পাঠেও এইরূপ কথা উক্ত হয় নাই যে, কুরআন মজীদে হযরত সুলায়মান (আ)-এর আসনের উপর যে "দেহ" নিক্ষিপ্ত হওয়ার কথা বলা হইয়াছে তাহা দ্বারা এই অপূর্ণাঙ্গ শিশুকেই বুঝানো হইয়াছে। তাহা ছাড়া হাদীছবেত্তাগণও তাহাদের গ্রন্থের কিতাবুত তাফসীর-এ সংশ্লিষ্ট আয়াতের ব্যাখ্যায়ও উক্ত হাদীছ উল্লেখ করেন নাই বরং অন্য হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব মহানবী (স) এই হাদীছ উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যাস্বরূপ বলিয়াছেন তাহা দাবি করা যায় না (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩৩৭, টীকা ৩৬; মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৬-৭; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২০)।

ইমাম রাযী (র) অপর এক তাফসীরকে অগ্রাধিকার দিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, হযরত সুলায়মান (আ) কোন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া অথবা কোন বিপদের কারণে এতদূর চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন যে, তিনি শুকাইতে শুকাইতে একেবারে কংকালসার হইয়া পড়িলেন (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৯)। তাঁহাকে সিংহাসনে বসানো হইলে মনে হইতে যেন একটি নিস্প্রাণ দেহ উহার উপর ফেলিয়া রাখা হইয়াছে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে সুস্থতা দান করেন এবং তিনি আল্লাহ্র দিকে রুজু হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলন (মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৭)। কিন্তু এই তাফসীরও অনুমানভিত্তিক, কুরআন মজীদের বক্তব্যের সহিত ইহার তেমন কোন সামঞ্জস্য নাই এবং কোন রিওয়ায়াত হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না (মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৭; তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩৩৮, টীকা ৩৬; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২১)।

বাস্তব কথা এই যে, আলোচ্য আয়াতে যে ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে উহার নিশ্চিত বিবরণ জ্ঞাত হওয়ার কোন উপায় আমাদের নিকট নাই। পরীক্ষার কথা উল্লেখ করার আসল উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ কোন বিপদ বা পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হইলে, তাহারা যেন সুলায়মান (আ)-এর মত আল্লাহ্র দিকে আরো অধিক রুজু হয় (মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৭)।

সুলায়মান (আ)-এর বিশাল রাজ্যলাভের আকাঙ্খা ঃ হযরত সুলায়মান (আ) আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার সংগে সংগে এমন এক বিশাল রাজত্বদানের আবেদন করিয়াছিলেন, যদ্রূপ রাজত্ব তাঁহার পরে অপর কেহ যেন লাভ করিতে না পারে। কুরআন মজীদের ভাষায় ঃ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَهَبْ لِىْ مُلْكًا لاَّ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ .

"সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ছাড়া কেহ না হয়। তুমি তো পরম দাতা" (৩৮ ঃ ৩৫)।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়ও তাফসীরকারগণের মতবিরোধ লক্ষ্য করা যায়। একদল বলিয়াছেন, সুলায়মান (আ) এমন একটি রাষ্ট্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন যাহা কেহ ছিনাইয়া লইতে না পারে, যেমন ইতিপূর্বে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল (তাফসীরে তাবারী, ১০ম বালাম, ২৩ খ, পৃ. ১০২; তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২১০; যাদুল মাসীর, ৭খ, পৃ. ১৩৯; তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৬খ, পৃ. ২৬৬)।

কাহারও মতে তিনি একটি বিশালায়তন সাম্রাজ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই মতের তাফসীরকারগণ ইহার এক বিস্তৃত এলাকার বর্ণনা দিয়াছেন যাহা ঐতিহাসিক মূল্যায়নে প্রমাণিত হয় না। বাইবেলে সুলায়মান (আ)-এর সাম্রাজ্যের সীমা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "আর (ফরাত) নদী অবধি পলেষ্টীয়দের (ফিলিস্তিনী) দেশ ও মিসরের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় রাজ্যের উপরে শলোমন কর্তৃত্ব করিতেন" (১ম রাজাবলী, ৪ ঃ ২১০)।

অর্থাৎ উত্তর-পূর্বে ফোরাত নদী পর্যন্ত, দক্ষিণ-পূর্বে ইয়ামন পর্যন্ত, পশ্চিমে ফিলিস্তিনীদের দেশ ও রোম সাগর, উত্তর গালীলী পর্যন্ত এবং দক্ষিণে মিসর পর্যন্ত তাঁহার রাজত্ব বিস্তৃত ছিল (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১১২)। ইব্ন আসাকির তাওরাত কিতাবের বরাতে বলেন যে, সুলায়মান (আ)-এর রাজত্ব ফিলিস্তীন, জর্দান ও আল-গাওর-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং রাফাজ, গাযা, আসকালান, সূর, সায়দা, দিমাশ্ক, আম্মান, বালকা, মুআব ও জাবাল আশ-শারাত কখনও তাঁহার শাসনভুক্ত ছিল না। তিনি তাওরাতের উক্ত বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করিয়া বলেন যে, ইহা তাওরাতের রচয়িতাগণের মিথ্যাচার বৈ কি (তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক, ৬খ, পৃ. ২৬৭)। উক্ত বক্তব্য বর্তমান বাইবেল হইতে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হয় নাই (নিবন্ধকার)।

বর্তমান প্রেক্ষাপটেও বিশালায়তন সাম্রাজ্য সংক্রান্ত মত গ্রহণযোগ্য নহে। কারণ বর্তমান কালেও পৃথিবীতে এমন কয়েকটি বিশালায়তন সাম্রাজ্য আছে যেইগুলির প্রতিটির আয়তন সুলায়মান (আ)-এর সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক বিশাল।

যুক্তিসংগত মত এবং যাহা অধিকাংশ তাফসীরকার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত সুলায়মান (আ)-কে মানবজাতি ছাড়াও জিন জাতি, পক্ষীকুল, এমনকি বায়ুর উপর রাজত্ব ও কর্তৃত্ব করিবার (مَلَكِيَّةُ) এবং নির্বাক প্রাণীর ভাষা বুঝিবার শক্তি (مَلَكَةُ) দান করিয়াছিলেন, অনুরূপ কর্তৃত্বলাভ আজ পর্যন্ত কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই এবং কিয়ামত পর্যন্ত হইবেও না (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৯; যাদুল মাসীর, ৭খ, পৃ. ১৩৮; আরাইস, পৃ. ৩১৫; বিদায়া, ২খ, পৃ. ২৮ ও ৩০; তাহযীব তারীখ দিমাশক, ৬খ, পৃ. ২৫৮; আল-কামিল, ১খ, পৃ. ১৭৫; মাআরিফুল কুরআন, ৭খ, পৃ. ৫১৮-৯)। ইমাম রাযী (র) বলেন, "ইন্নাল মুল্কা হুয়াল কুদরাহ" (মুল্ক অর্থাৎ

শক্তি)। যেন সুলায়মান (আ) বলিয়াছেন, আমাকে কতগুলি জিনিসের উপর এমন নিয়ন্ত্রণশক্তি দান করুন, অবশ্যই আমি ছাড়া অপর কেহ যেন সেইগুলির উপর নিয়ন্ত্রণশক্তি লাভ করিতে না পারে, যাহাতে উহা আমার নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতার দলীলস্বরূপ মু'জিযা হইতে পারে। পরবর্তী (৩৮ ঃ ৩৬-৩৮) আয়াত ('তখন আমি তাহার অধীন করিয়া দিয়াছিলাম বায়ুকে...) হইতেও উক্ত মতের সমর্থন পাওয়া যায় (তাফসীরে কবীর, ২৬খ, পৃ. ২০৯; যাদুল মাসীর, ৭খ, পৃ. ১৩৮; আরও দ্র. পূর্বোক্ত বরাতসমূহ)। মহানবী (স)-এর হাদীছ হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ

اِنَّ عِفْرِيْتًا مِّنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَىَّ صَلٰوتِىْ فَاَمْكَنَنِى اللّٰهُ مِنْهُ فَاَخَذْتُ فَاَرَدْتُّ اَنْ اَرْبِطَهٗ عَلٰى سَارِيَةٍ مِّنْ سِوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ فَرَدَدْتُّهٗ خَاسِئًا عِفْرِيْتٌ مُّتَمَرِّدٌ مِّنْ اِنْسٍ اَوْ جَانٍّ مِثْلَ زِبْنِيَّةٍ جَمَاعَتُهَا الزَّبَانِيَّةُ .

"একটি অবাধ্য দুষ্ট জিন্ন আমার নামায ভঙ্গ করার জন্য গত রাত্রে হঠাৎ আবির্ভূত হইল। আল্লাহ আমাকে উহাকে পাকড়াও করার ক্ষমতা দান করিলে আমি উহাকে ধরিয়া ফেলিলাম। আমি উহাকে মসজিদের একটি খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখিতে মনস্থ করিলাম, যাহাতে তোমরা সকলে উহাকে দেখিতে পাও। তৎক্ষণাৎ আমার ভাই সুলায়মান (আ)-এর একটি দু'আ আমার মনে পড়িল ঃ "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর এমন এক রাজ্য যাহার অধিকারী আমি ব্যতীত আর কেহ না হয়"। অতঃপর আমি জিন্নটিকে ব্যর্থ ও বিফল করিয়া তাড়াইয়া দিলাম।

لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَاَلَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ خِلاَلاً ثَلاَثًا حُكْمًا يُصَادِفُ حُكْمَهٗ وَمُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ وَاَنْ لاَّ يَاْتِىْ هٰذَا الْمَسْجِدَ اَحَدٌ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلٰوةَ فِيْهِ اِلاَّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوْبِهٖ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ اُمُّهٗ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اثْنَتَانِ فَقَدْ اُعْطِيَهُمَا وَاَرْجُوْ اَنْ يَّكُوْنَ قَدْ اُعْطِىَ الثَّالِثَةَ .

"সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করিবার পর আল্লাহ্র নিকট তিনটি বিষয়ের দু'আ করেন ঃ আল্লাহ্র হুকুমমত সুবিচার, এমন রাজত্ব যাহা তাঁহার পরে আর কাহাকেও দেওয়া হইবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদিসে কেবল নামায পড়ার উদ্দেশ্যে আগমন করিবে তাহার গুনাহ্ যেন তাহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া যায় তাহার মাতা তাহাকে প্রসব করার দিনের মত। মহানবী (স) বলেন ঃ প্রথম দুইটি তাঁহাকে দান করা হইয়াছে এবং আমি আশা করি যে, তৃতীয়টিও তাঁহাকে দান করা হইবে" (ইব্ন মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব মা জাআ ফিস-সালাত ফী মাসজিদ বায়তিল মাকদিস, ১খ, পৃ. ১০১; নাসাঈ, কিতাবুল মাসাজিদ, বাবুল মাসজিদিল আকসা ওয়াস-সালাত ফীহি, ১খ, পৃ.)। অতএব এই শেষোক্ত ব্যাখ্যাই যুক্তিগ্রাহ্য।

বায়তুল মাকদিস নির্মাণ

বায়তুল মাকদিস পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন দুইটি মসজিদের একটি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ও বরকতময় তিনটি মসজিদের অন্যতম। মহানবী (স)-এর মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বায়তুল মাকদিস "মাসজিদুল আকসা" (দূরবর্তী মসজিদ নামে একবার উক্ত হইয়াছে) (মি'রাজ শীর্ষক নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.) এবং হাদীছ শরীফে ইহা বায়তুল মাকদিস (বা মুকাদ্দাস), মাসজিদুল আকসা ও মাসজিদ ঈলিয়া নামে অভিহিত হইয়াছে (দ্র. মু'জামুল হাদীস)। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا . اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ .

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি, যিনি তাঁহার বান্দাকে আল-মাসজিদুল হারাম হইতে আল-মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত রজনীযোগে ভ্রমণ করাইয়াছেন, যাহার পরিবেশ আমি বরকতময় করিয়াছিলাম, তাহাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইবার জন্য। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা" (১৭ ঃ ১)।

মহানবী (স) হিজরত করিয়া মদীনায় পৌছিবার পর ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরিয়া নামায পড়িয়াছিলেন (মুসলিম, মাসাজিদ, বাব তাহ্বীলিল কিবলাতি মিনাল মাকদিসি ইলাল কা'বা; বুখারী, সালাত, বাবুত তাওয়াজ্জুহ নাহ্ওয়াল কিবলা)। অতঃপর মসজিদুল হারামকে চিরকালের জন্য কিবলারূপে নির্দ্ধারিত করা হয়। কিবলা পরিবর্তনের এই আলোচনা প্রসঙ্গেও পরোক্ষভাবে বা ইঙ্গিতে বায়তুল মাকদিস প্রসঙ্গ আসিয়াছে (দ্র. ২ঃ ১৪২-১৪৫ এবং তাফসীর গ্রন্থাবলীতে তৎসম্পর্কিত তাফসীর)। মহানবী (স)-এর হাদীছে বায়তুল মাকদিসের পর্যাপ্ত উল্লেখ আছে।

বায়তুল মাকদিস সর্বপ্রথম কোন ব্যক্তি এবং কখন নির্মাণ করেন তাহা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। মহানবী (স)-এর নিকটও এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল ঃ

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ اَوَّلَ قَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ اَىُّ قَالَ الْمَسْجِدُ الْاَقْصٰى قُلْتُ كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ اَرْبَعُوْنَ ثُمَّ قَالَ حَيْثُمَا اَدْرَكَتْكَ الصَّلٰوةُ فَصَلِّ وَالْاَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ .

" আবূ যার (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বপ্রথম কোন মসজিদ নির্মাণ করা হয়? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল হারাম। আমি বলিলাম, উহার পর কোনটি? তিনি বলেন ঃ মসজিদুল আকসা। আমি বলিলাম, এই দুইটির (নির্মাণের) মাঝখানে (কালের) কত ব্যবধান ছিল? তিনি বলেন ঃ চল্লিশ বৎসর। অতঃপর তিনি আরও বলেন ঃ যেখানেই তোমার নামাযের ওয়াক্ত হইবে সেখানেই নামায পড়িবে। গোটা পৃথিবীই তোমার জন্য মসজিদ" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, বাব; এবং বাব ওয়া ওয়াহাবনা লিদাঊদা সুলায়মান, ১খ, পৃ. ৪৭৭ ও ৪৮৭;

মুসলিম, মাসাজিদ, ১ম হাদীস; নাসাঈ, মাসাজিদ, বাব যিকরি আয়্যু মাসজিদ উদিআ আওয়ালা; ইব্ন মাজা, মাসাজিদ, বাব আয়্যু মাসজিদ উদিআ আওয়ালান)।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ইমাম ইবনুল জাওযী (র) বলেন, কাবা ঘরের নির্মাতা হযরত ইবরাহীম (আ) এবং বায়তুল মাকদিসের নির্মাতা হযরত সুলায়মান (আ)-এর যুগের মধ্যে এক হাজার বৎসরের অধিক কালের ব্যবধান। উক্ত হাদীছের তাৎপর্য এই যে, এখানে দুই মুসজিদের ভিত্তি স্থাপনের দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে অর্থাৎ সর্বপ্রথম আদম (আ) কা'বা ঘরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অতঃপর তাঁহার বংশধরের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাহারা দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়ে এবং তাহাদের কোন ব্যক্তি হয়ত (কা'বা ঘর নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর) বায়তুল মাকদিসের ভিত্তি স্থাপন করিয়া থাকিবেন। পরে হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘর এবং হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মাকদিস পুননির্মাণ করেন। খাত্তাবী বলেন, আল্লাহ্র কোন নেকেকার বান্দা হযরত দাউদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ)-এর পূর্বে হয়ত বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আ) কা'বা ঘর এবং হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মাকদিস পুননির্মাণ করেন। পুনর্নির্মাতা হিসাবে তাঁহাদের দুইজনকে দুই মসজিদের নির্মাতারূপে অভিহিত করা হইয়াছে (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, ১খ, পৃ. ৪৭৭, টীকা ২; কুরতুবীর আহ্কামুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৩৮)।

ইমাম ইব্ন তায়মিয়্যা (র) বলেন যে, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগেই বায়তুল মাকদিস নির্মিত হইয়াছিল। অতঃপর হযরত সুলায়মান (আ) উহাকে বৃহদাকারে মজবুত করিয়া নির্মাণ করেন (মাজমূউল ফাতাওয়া, ১৭খ, পৃ.৩৫১-এর বরাতে আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা, পৃ. ৪৭১)। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম মসজিদ হইল কা'বা শরীফ যাহা হযরত ইবরাহীম (আ) নির্মাণ করেন এবং মসজিদুল আকসা (বায়তুল মাকদিস) হইল দ্বিতীয় মসজিদ, যাহা প্রথমোক্ত মসজিদ নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর হযরত ইয়া'কূব (আ) নির্মাণ করেন। অতঃপর হযরত দাউদ (আ) উহার সংস্কার করেন এবং হযরত সুলায়মান (আ) উহার পুনর্নির্মাণ করেন (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫২; ডঃ আবদুল আলীম খিদির রচিত আত-তাতাউর আল-উমরানী লি-মাদীনাতিল কুদ্স গ্রন্থের বরাতে আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা, পৃ. ৩৭)। অপর এক বর্ণনায় আছে যে, আহ্লে কিতাব মতে কা'বা ঘর নির্মাণের চল্লিশ বৎসর পর হযরত ইয়া'কূব (আ)-ই বায়তুল মাকদিসও নির্মাণ করেন (বিদায়া, ১খ, পৃ. ১৫২, দারুল কুতুব আল- ইলমিয়্যা, ৪র্থ সং; আরও দ্র. পৃ. ১৮৪)।

বাইবেলে বলা হইয়াছে যে, হযরত দাউদ (আ) বায়তুল মাকদিস নির্মাণের চিন্তা-ভাবনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধ-সংঘাতে ব্যতিব্যস্ত থাকার কারণে তাঁহার পক্ষে উহার নির্মাণকাজ শুরু করা সম্ভব হয় নাই (দ্র. ১ম রাজাবলী, ৫ ঃ ৩)। তবে তিনি উহার নির্মাণ কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগ্রহে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং হযরত সুলায়মান (আ)-কে উহা নির্মাণের হুকুম দিয়াছিলেন (দ্র. ১ম বংশাবলী, ২২ঃ ১-৭)। এই উদ্দেশে হযরত সুলায়মান (আ) সোর (লেবানন, ফিনিসীয় নামেও অভিহিত)-এর রাজা হীরমের নিকট এরস কাষ্ঠ, দেবদারু ও নির্মাণ শ্রমিক চাহিয়া পাঠাইলে তিনি সানন্দে তাহা দিতে সম্মত হইলেন (১ম রাজাবলী, ৫ম অধ্যায়)। তিনি তাঁহার

রাজত্বের চতুর্থ বর্ষের দ্বিতীয় মাসের দ্বিতীয় দিবসে এবং মিসর হইতে বনূ ইসরাঈলের নির্গত হইয়া আসিবার চারি শত আশি বৎসরের মাথায় বায়তুল মাকদিসের নির্মাণ কাজ শুরু করেন (১ম বংশাবলী, ৬ ঃ ১ ও ৩৭; ২য় বংশাবলী, ৩ ঃ ২; তাফসীরে কুরতুবী, ১৪খ, পৃ. ২৫ ও ২৮১)। হযরত সুলায়মান (আ) ইহার নির্মাণকর্মে অসংখ্য শ্রমিক নিয়োগ করিলেন এবং সাড়ে সাত বৎসরে তাঁহার রাজত্বের একাদশ বৎসরের অষ্টম মাসে ইহার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হইল। এই হিসাবে ইহার নির্মাণ তারিখ খৃ. পূ. ৯৬০-৯৫৩ সাল নির্ণীত হয় (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১০৯)।

তিনি দীর্ঘ সাত বৎসর বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন (১ম রাজাবলী, ৬ ঃ ৩৮)। তিনি আল্লাহ্‌র ঘর নির্মাণে অতি মূল্যবান কাষ্ঠ ও প্রস্তর ব্যবহার করেন এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য দামী ধাতব পাত দ্বারা ইহার দরজা-জানালা ইত্যাদি কারুকার্যময় করিলেন, ইহার দেওয়াল গাত্র কারুবের, খেজুর বৃক্ষের ও বিকশিত পুষ্পের ভাস্কর্যে সুশোভিত করিলেন (বায়তুল মাকদিস নির্মাণ সম্পর্কিত বিষয়ে বিস্তারিত দ্র. ১ম রাজাবলী, ৫-৯ অধ্যায় এবং ২য় রাজাবলী, ৩-৭ অধ্যায়)। এই মহান গৃহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার দীর্ঘ প্রার্থনার সূচনা করেন এইভাবে ঃ "হে সদাপ্রভু! ইসরাঈলের প্রভু! আকাশে কি পৃথিবীতে তোমার তুল্য প্রভু নাই" (২য় বংশাবলী, ৬ ঃ ২৪)।

কুরআন মজীদের বক্তব্য অনুসারে হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার ইমারতাদির নির্মাণকার্যে জিন্নদিগকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাফসীরকারগণের মতে, তিনি তাঁহার নির্মাণকর্ম তদারকরত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। এই সম্পর্কিত কুরআন মজীদের বক্তব্য নিম্নরূপ ঃ

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهِ الاَّ دَابَّةُ الْاَرْضِ تَاكُلُوْا مِنْسَاَتَهُ . فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوْا فِى الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ .

"যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয়ে জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা তাহার লাঠিকে খাইতেছিল। সে যখন পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না" (৩৪ঃ ১৪)।

আয়াতে স্পষ্ট উল্লেখ নাই যে, হযরত সুলায়মান (আ) বায়তুল মাকদিস বা অন্য কোন নির্মাণকার্য তদারকরত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। কতক তাফসীরকার বলিয়াছেন যে, তিনি বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকার্য তদারকরত অবস্থায় ইনতিকাল করেন। ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কয়েক মাস বা এক বৎসর তাঁহার মৃতদেহ লাঠিতে ভর দেওয়া অবস্থায় তাঁহার জীবিত অবস্থার মতই স্থির থাকে। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হওয়ার সংগে সংগে লাঠিটি মাটির পোকায় (উই অথবা ঘুণ) খাইয়া ফেলার কারণে ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহার প্রাণহীন দেহটি মাটিতে পড়িয়া যায় (কুরতুবীর আহ্‌কামুল কুরআন, ১৪খ, পৃ. ২৭৮; তাফসীরে কবীর, ২৫খ, পৃ. ২৫০; তাফসীরে তাবারী, ২২খ, পৃ. ৫২ ইত্যাদি)।

মসজিদে আকসা (বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর ভিতরের দৃশ্য। হযরত ইবরাহীম (আ) সর্বপ্রথম ইহা নির্মাণ করেন। রাসূলুল্লাহ্ (স) মি'রাজের রাত্রে প্রথমে এখানে আগমন করেন।
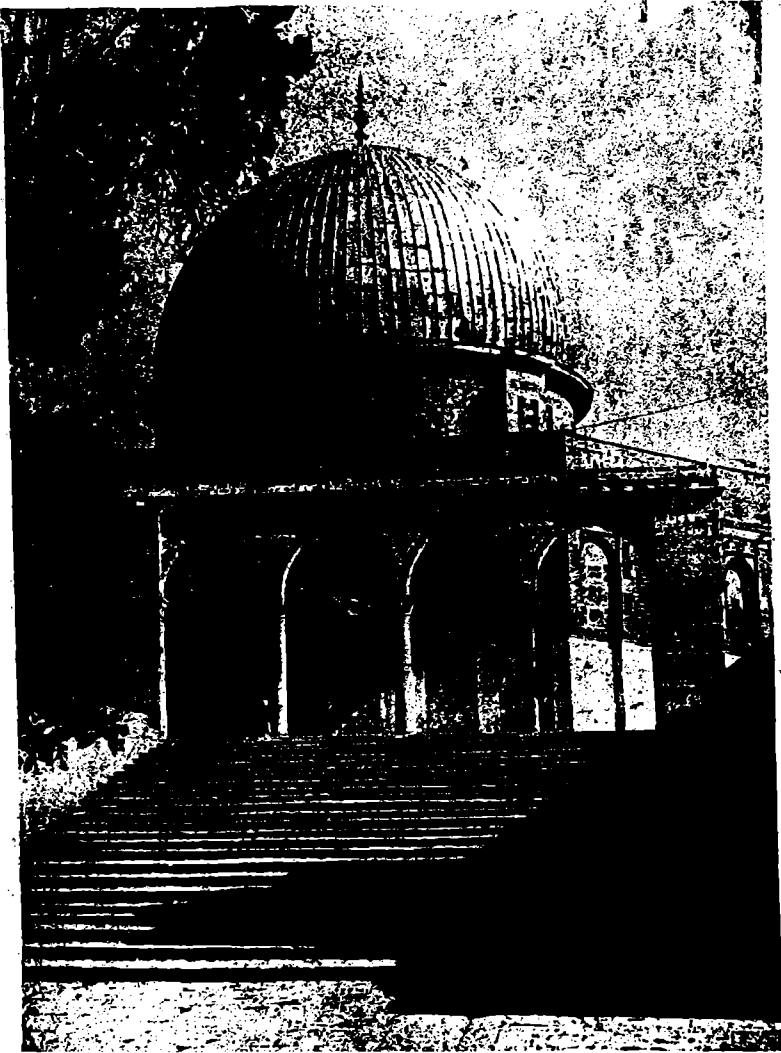
বর্তমান প্রাসাদ সপ্তম শতকে খলীফা আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান নির্মাণ করেন। এখানেই সুলায়মান (আ) মসজিদে আকসা নির্মাণ করেন।

উপরিউক্ত মত যথার্থ নহে। কারণ মহানবী (স)-এর হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর জীবদ্দশায়ই বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকর্ম সমাপ্ত হইয়াছিল। মহানবী (স) বলেন ঃ "সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করিবার পর আল্লাহ্র নিকট তিনটি বিষয়ের দো'আ করেন..." (নাসাঈ, কিতাবুল মাসাজিদ, বাবুল মাসজিদিল আকসা ওয়াস-সালাত ফীহি, ১ম খ, পৃ. ; ইব্ন মাজা, ইকামাতুস-সালাত, বাব মা জাআ ফিস-সালাত ফী মাসজিদ বায়তিল মাকদিস, ১খ, পৃ. ১০১)। ইমাম সুদ্দী (র)-এর বর্ণনায় আছে যে, বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত করিবার দিনটিকে হযরত সুলায়মান (আ) ঈদের দিন হিসাবে গ্রহণ করেন এবং আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বারো হাজার গরু এবং বিশ হাজার মেষ কুরবানী করিয়া জনসাধারণকে আপ্যায়িত করিলেন, অতঃপর সাখরার উপর দণ্ডায়মান হইয়া দো'আ করিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমাকে উক্ত নিয়ামতের শোকর আদায় করার তৌফিক দান করুন, আমাকে আপনার দীনের উপর মৃত্যু দান করুন এবং হিদায়াত প্রাপ্তির পর আর আমার অন্তরে কোনও বক্রতা সৃষ্টি করিবেন না। ইয়া আল্লাহ! যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করিবে আমি তাহার জন্য আপনার নিকট পাঁচটি বিষয়ের দো'আ করিতেছি ঃ (১) গুনাহগার ব্যক্তি তওবা করার জন্য এই মসজিদে প্রবেশ করিলে আপনি তাহার তওবা কবুল করুন এবং তাহাকে মাফ করুন। (২) কোন ব্যক্তি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য এই মসজিদে প্রবেশ করিলে আপনি তাহাকে নিরাপত্তা দান করুন। (৩) রুগ্ন ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করিলে আপনি তাহাকে আরোগ্য দান করুন। (৪) নিঃস্ব ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করিলে আপনি তাহাকে ধনাঢ্য করুন। (৫) এই মসজিদে প্রবেশকারী যতক্ষণ এখানে অবস্থান করে, ততক্ষণ আপনি তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখুন, তবে কেহ অন্যায় অধর্মের কাজে লিপ্ত হইলে তাহার প্রতি নহে"। আল-মাওয়ারদী (র) ইহা উল্লেখ করিয়াছেন (তাফসীরে কুরতুবী, ১৪খ, পৃ. ২৮১-২)। বাইবেলেও অনুরূপ ভোজন উৎসব ও দীর্ঘ দু'আর অনুষ্ঠানের উল্লেখ আছে (দ্র. দ্বিতীয় বংশাবলী, ৫ ঃ ৩-৬; ৬ ঃ ১০-৪২)। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত সুলায়মান (আ)-এর জীবদ্দশায়ই বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হইয়াছিল এবং "তাবূতে সাকীনা"ও উক্ত গৃহের নির্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত করা হইয়াছিল (২য় বংশাবলী, ৫ঃ৭)।

ইয়াহূদী জাতি ও জাহিলী আরবের ধারণা ছিল যে, জিন্নেরা অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত। উক্ত আয়াত নাযিলের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাহাদের জানাইয়া দিয়াছেন যে, জিন্নদের গায়বী বিষয়ের জ্ঞান নাই (কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১৬৮-৯)।

বায়তুল মাকদিসের মর্যাদা

মহান আম্বিয়া-ই কিরাম কর্তৃক নির্মিত পৃথিবীর তিনটি মসজিদ সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী এবং যুগ-যুগান্তরের পরিক্রমায় আজও ইতিহাসের সাক্ষীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। বায়তুল মাকদিস সমভাবে মুসলিম, খৃস্টান ও ইয়াহূদী তিন জাতির নিকটই মর্যাদাপূর্ণ এবং তাহাদের যিয়ারত স্থান।

কুরআন মজীদে বায়তুল মাকদিসের উল্লেখের পরপরই বলা হইয়াছে, "ইহার পরিবেশকে আমি বরকতময় করিয়াছি তাহাকে আমার নিদর্শনসমূহ দেখাইবার জন্য" (১৭ ঃ ১)। শায়খুল হিন্দের তরজমা ঃ "এই ঘরকে আমার বরকত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে" (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৩৭৩)। বায়তুল মাকদিসের এলাকায় বহু সংখ্যক নবী-রাসূলের আর্বিভাব হইয়াছিল, যাহাদের অনেককেই এখানে দাফন করা হইয়াছে। উপরন্তু মহানবী (স) মি'রাজে যাওয়ার পথে এখানেই আম্বিয়া-ই কিরামের সঙ্গে তাঁহার বরকতময় মর্যাদাপূর্ণ সাক্ষাত হয় (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৩৭৪, টীকা ৩; তাফসীরে কুরতুবী, ১০খ, পৃ. ২১২)। মহানবী (স) বলেন ঃ

لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ الاَّ الِىٰ ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِىْ هٰذَا وَمَسْجِدِ الْاَقْصٰى .

"তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোথায়ও (সওয়াবের অভিপ্রায়ে) সফর করা যায় না ঃ মসজিদুল হারাম, আমার এই মসজিদ এবং মসজিদুল আকসা" (তিরমিযী, সালাত, বাব মা জাআ ফী আয়্যুল মাসাজিদ আফদাল, ১খ, পৃ. ৪৪; বুখারী, তাহাজ্জুদ, বাব ফাদলিস সালাত ফী মাসজিদ মাক্কা ওয়াল মাদীনা এবং বাব মাসজিদ বায়তিল মাকদিস; ইহা ব্যতীত দ্র. মুসলিম, হজ্জ; আবূ দাঊদ, মানাসিক; নাসাঈ, মাসাজিদ; মুওয়াত্তা, জুমুআ; ইব্‌ন মাজা, ইকামাতুস সালাত, বাব মা জাআ ফিস সালাত ফী মাসজিদ বায়তিল মাকদিস, ১খ, পৃ. ১০১; দারিমী, সালাত ইত্যাদি অধ্যায়)।

উপরিউক্ত হাদীছের ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন যে, কোন ব্যক্তি এমন কোন মসজিদে নামায পড়ার মানত করিলে, যেখানে পৌঁছাইতে সফর করিতে হয়, মানত পূর্ণ না করিয়া নিজের বসতির নিকটস্থ মসজিদে মানতের নামায আদায় করিবে। তবে হাদীছে উক্ত তিনটি মসজিদে নামায আদায়ের মানত করিলে তথায় পৌঁছিয়া উক্ত নামায আদায় করিবে (তাফসীরে কুরতুবী, ১০খ, পৃ. ২১২)। শায়খুল হিন্দ মাহমূদুল হাসান (র) বলেন, উক্ত তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাইবে না... অর্থাৎ মসজিদের উদ্দেশে সফর করা নিষেধ (তিরমিযী, তাকারীর, পৃ. ১৫-১৬)।

عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاَةَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ اَرْضُ الْمَحْشَرِ وَالْمَنْشَرِ ايْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ فَاِنَّ صَلٰوةً فِيْهِ كَاَلْفِ صَلٰوةٍ فِىْ غَيْرِهِ قُلْتُ اَرَاَيْتَ اِنْ لَّمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اَتَحَمَّلَ اِلَيْهِ قَالَ فَتَهْدِىْ لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيْهِ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَهُوَ كَمَنْ اَتَاهُ .

"মহানবী (স)-এর মুক্তদাসী মায়মূনা (রা) বলেন, আমি বলিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল মাকদিস সম্পর্কে আমাদেরকে ফতওয়া দিন। তিনি বলেন ঃ ইহা তো হাশরের ময়দান এবং সকলের একত্র হওয়ার স্থান। তোমরা উহাতে নামায পড়। কারণ তথায় এক ওয়াক্ত নামায পড়া অন্যান্য স্থানের নামাযের তুলনায় এক হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। আমি বলিলাম, আপনি কি মনে করেন, আমি যদি তথায় পৌঁছিতে সক্ষম না হই? তিনি বলেন ঃ উহাতে বাতি জ্বালাইবার জন্য তুমি

যায়তুন তৈল হাদিয়া পাঠাও। যে ইহা করিল সে যেন তথায় উপস্থিত হইল" (ইব্ন মাজা, মাসাজিদ, ১খ, পৃ. ১০১)।

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ بَيْتِه بِصَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِىْ مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ صَلٰوةً وَصَلٰوتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ يُجَمَّعُ فِيْهِ بِخَمْسِ مِائَةِ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِىْ مَسْجِدِىْ بِخَمْسِيْنَ اَلْفَ صَلٰوةٍ وَصَلٰوتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِائَةِ اَلْفِ صَلٰوةٍ .

"আনাস ইব্ন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ কোন ব্যক্তির নিজ গৃহে এক ওয়াক্ত নামায পড়ার ছওয়াব এক ওয়াক্ত নামাযেরই সমান। তাহার পাড়ার বা গোত্রের মসজিদে তাহার এক নামায পঁচিশ নামাযের সমতুল্য। জুমুআ মসজিদে তাহার এক নামায পাঁচ শত নামাযের সমতুল্য। মসজিদুল আকসায় তাহার এক নামায পঞ্চাশ হাযার নামাযের সমতুল্য। আমার মসজিদে তাহার এক নামায পঞ্চাশ হাযার নামাযের সমতুল্য এবং মসজিদুল হারামে তাহার এক নামায এক লক্ষ নামাযের সমতুল্য" (ইব্ন মাজা, মাসাজিদ, বাব মা জাআ ফিস-সালাত ফিল-মাসজিদিল জামি, ১খ, পৃ. ১০২)।

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ غُفِرَ لَهُ .

"উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ যে ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে উমরার উদ্দেশে ইহ্রাম বাঁধিল, তাহাকে ক্ষমা করা হইল" (ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব মান আহাল্লা বিউমরাতিন মিন বায়তিল মুকাদ্দাস, ২খ, পৃ. ২১৫)। উম্মু সালামা (রা)-র অপর বর্ণনায় আছে ঃ

مَنْ اَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِّنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةً لِّمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ قَالَتْ فَخَرَجَتْ اُمِّىْ مِنْ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ بِعُمْرَةٍ .

"কোন ব্যক্তি বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে উমরার উদ্দেশে ইহ্রাম বাঁধিলে তাহাতে তাহার পূর্বেকার সমস্ত গুনাহ্র কাফ্ফারা হইয়া যায়। উম্মু সালামা (রা) বলেন, অতএব আমার মা বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে উমরার উদ্দেশে রওয়ানা হইলেন" (ইব্ন মাজা, মানাসিক, বাব ঐ, ২খ, পৃ. ২১৫)।

বায়তুল মাকদিসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বায়তুল মাকদিস ও জেরুসালেম নগরীর ইতিহাস ওঁৎপ্রোতভাবে জড়িত। জেরুসালেম শহরের উত্থান-পতনের সঙ্গে সঙ্গে কালের প্রবাহে বায়তুল মাকদিসেরও ভাঙ্গা-গড়া নগরীর অব্যাহত থাকে। এই শহর দীর্ঘ কাল বনী ইসরাঈলের দখলে থাকার পর তাহাদের হাতছাড়া হইয়া যায়। হযরত মূসা (আ) তাঁহার জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে বায়তুল মাকদিস পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ

করেন। তাঁহার ইনতিকালের অব্যবহিত পর হযরত ইউশা ইব্ন নূন (আ) ইহা পুনরুদ্ধার করেন। প্রায় খৃ. পূ. ১০০০ বৎসর পূর্বে আমালিকা সম্প্রদায় জেরুসালেম তাহাদের দখলভুক্ত করে। হযরত দাউদ (আ) খৃ. পূ. ৯৭৭ সালে উহা পুনর্দখল করেন, যাহার ইঙ্গিত ২ ঃ ২৪৬-২৫১ আয়াতে বিদ্যমান (ইতিকথা, পৃ. ৪৬)। তাঁহার পুত্র হযরত সুলায়মান (আ) খৃ. পূ. ৯৬৩-৯২৩ সাল পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি ইবাদত-বন্দেগীর জন্য "মা'বাদ সুলায়মানী" নির্মাণ করেন, যাহা পরবর্তী কালে "হায়কাল সুলায়মানী" নামে আখ্যায়িত হয় এবং কুরআন মজীদে (১৭ ঃ ১) ইহা "মাসজিদুল আকসা" নামে উক্ত হইয়াছে।

সুলায়মান (আ)-এর ইনতিকালের কিছুকাল পর তাঁহার রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ঃ ইয়াহূদা (রাজধানী জেরুসালেম) এবং ইসরাঈল (রাজধানী নাবলুস বা সিক্কীম)। দুই রাজ্যের মধ্যকার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মিসরের ফিরআওন শাইশাক জেরুসালেম দখল করিয়া মা'বাদে সুলায়মানীতে রক্ষিত সম্পদরাজি মিসরে লইয়া যায়। খৃ. পূ. ৭২১ সালে আশূরীয় রাজা সারগন ইসরাঈল দখল করে, কিন্তু শাইশাক তাহা পুনরুদ্ধার করে (ইতিকথা, পৃ. ৪৭)।

খৃ. পূ. ৫৮৭ সালে ব্যাবিলনের রাজা বখ্ত নাসর ইসরাঈল রাজ্য দখল করিয়া মা'বাদে সুলায়মানী তথা বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করে এবং অসংখ্য ইয়াহূদীকে বন্দী করিয়া ব্যাবিলনে লইয়া যায় (ইতিকথা, পৃ. ৪৮)। অতঃপর পারস্য সম্রাট কাওরাস এখমিনী ব্যাবিলন দখল করিলে জেরুসালেম তাহার হস্তগত হয়। তিনি বন্দী ইয়াহূদীদেরকে মুক্তি দেন এবং তাহাদের নিজ ধর্ম পালনের সুযোগ দেন। এই সময় হইতে ইসরাঈলীরা "ইয়াহূদী" নামে অভিহিত হয় এবং তাহারা পুনরায় বায়তুল মাকদিস নির্মাণ করে (ইতিকথা, পৃ. ৪৮-৯)।

খৃ. পূ. ৩২২ সালে মেসিডোনিয়ার আলেকজান্ডারের আদেশে পৌত্তলিক গ্রীকগণ জেরুসালেম দখল করে এবং দীর্ঘ কাল উহা নিজ দখলে রাখে (ইতিকথা, পৃ. ৪৯)। খৃ, পূ. ২৩ সালে রোমান (বায়যানটাইন)-রাজ হিরোদ জেরুসালেম দখল করেন এবং ইয়াহূদীদের সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন খৃ. পূ. ২০-১৮ সালে হায়কালে সুলায়মানী নির্মাণের সুযোগ দেন। পরে তাহা হযরত যাকারিয়া (আ), হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর কাল পর্যন্ত ঐভাবেই বিদ্যমান থাকে (ইতিকথা, পৃ. ৪৯)। যাকারিয়া (আ)-এর যুগে তাহা বিদ্যমান থাকার স্পষ্ট ইঙ্গিত কুরআন মজীদে রহিয়াছে (দ্র. ৩ ঃ ৩৫-৩৯)।

অতঃপর ৬৬ খৃ. রোমান সম্রাট তাইতুস ইয়াহূদীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন এবং দীর্ঘ পাচঁ বৎসর যুদ্ধের পর ৭০ সালে জেরুসালেম দখল করেন, হায়কালে সুলায়মানী ধ্বংস করেন এবং অসংখ্য ইয়াহূদীকে হত্যা ও বন্দী করেন। এই যুদ্ধে জেরুসালেম শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল (ইতিকথা, পৃ. ৫০)। কুরআন মজীদে ইহার প্রতি ইঙ্গিত বিদ্যমান আছে। বখতে নাসরের আক্রমণ ছিল প্রথম আক্রমণ এবং ইহা ছিল দ্বিতীয় আক্রমণ (দ্র. ১৭ ঃ ৪-৫)। তাইতুস জেরুসালেমের নাম পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে ইহার নাম রাখেন 'ঈলিয়া" । তাইতুসের পরবর্তী রোমান সম্রাট

আদরিয়ান জেরুসালেমের সকল চিহ্ন এবং হায়কালের সকল ধ্বংসাবশেষ অপসারণ করিয়া ১৩৫ খৃ. তদস্থলে প্রতিমা পূজারী রোমানদের দেবতা 'গোয়েবতার'-এর নামানুসারে একটি মন্দির নির্মাণ করে (ইতিকথা, পৃ. ৫১)। পরে রোমান সম্রাট কনস্টানটাইন খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়া 'জেরুসালেম' নাম পুনর্বহাল করেন, মন্দির ধ্বংস করিয়া হায়কাল পুনর্নির্মাণ করেন এবং ত্রিত্ববাদ চালু করেন (ইতিকথা, পৃ. ৫১)।

৬১০ খৃ. রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস ক্ষমতায় আসেন। ৬১৪ খৃ. পারস্য-রাজ দ্বিতীয় খসরু জেরুসালেম দখল করিয়া ৯০ হাজার খৃস্টানকে নির্মমভাবে হত্যা করে এবং বহু গির্জা ধ্বংস করে। ইহা ছিল খৃস্টানদের জন্য এক মহা-প্রলয়স্বরূপ। পরে ৬২৪ খৃ. হিরাক্লিয়াস উহা পুনরুদ্ধার করেন এবং পারস্যে প্রবেশ করিয়া পারসিকদের সর্বপ্রধান অনির্বাণ শিখা নির্বাপিত করেন (বিস্তারিত দ্র. তাফহীমুল কুরআন, সূরা রূম-এর ভূমিকা)। এই দুই ঘটনারই ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছিল নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে ঃ

الٓمٓ . غُلِبَتِ الرُّوْمُ . فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ . فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ .

"আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ পরাজিত হইয়াছে, নিকটবর্তী অঞ্চল। কিন্তু তাহারা তাহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই। পূর্বের ও পরের সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই। আর সেই দিন মু'মিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে" (৩০ ঃ ১-৪)।

হিরাক্লিয়াস ৬৪৯ খৃ. পর্যন্ত জেরুসালেম শাসন করেন। তখনও এবং মহানবী (স)-এর মি'রাজ গমনকালেও বায়তুল মাকদিসের এলাকায় চার দেয়াল ব্যতীত আর কোন স্থাপনা ছিল না। মহানবী (স) যে দেয়ালের সহিত বোরাক বাঁধিয়াছিলেন তাহা "হায়ত আল-বুরাক" (বুরাক দেয়াল) নামে অভিহিত (ইতিকথা, পৃ. ৫৩)।

মহনবী (স) নবুওয়াত প্রাপ্তির পর ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের মাধ্যমে কা'বা ঘরকে প্রতিমামুক্ত করেন। তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় বায়তুল মাকদিসকেও প্রতিমা ও ত্রিত্ববাদমুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইনতিকালের আট বৎসর পর ১৮ হিজরীতে হযরত উমার ফারূক (রা)-র খিলাফতকালে জেরুসালেম মুসলিম অধিকারে আসে এবং তখনও বায়তুল মাকদিসের স্থানটি ছিল উন্মুক্ত (ইতিকথা, পৃ. ৫৫-৬)। এই সময় (১৮ হি.) তিনি জেরুসালেম পৌছিয়া 'সাখরা'-এর সম্মুখভাগে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ইহা 'মসজিদুস সাখরা' ও 'মসজিদে উমার' উভয় নামেই প্রসিদ্ধ (ইতিকথা, পৃ. ৫৫)। বর্তমানে এই মসজিদে জামাআতে নামায অনুষ্ঠিত না হইলেও যিয়ারতকারীগণ পৃথক পৃথকভাবে এখানে নামায পড়েন (পূ. গ্র., পৃ. ২৪, ২৫, ২৭)।

সাখরা (صخرة) ঃ শব্দটির অর্থ 'পাথর'। ইহা একটি অতি প্রকাণ্ড পাথর। উত্তর হইতে দক্ষিণে পাথরের দৈর্ঘ্য ১৭.৭০ মিটার এবং পূর্ব হইতে পশ্চিমে উহার প্রস্থ ১৩.৫০ মিটার। পাথরের নিম্নস্থ গুহার ভেতর হইতে মনে হয় যেন উহা শূন্যে ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। প্রাক-ইসলামী যুগে লোকজন পাথরের উপরকার ছিদ্র দিয়া গুহার ভেতর কুরবানীর রক্ত প্রবাহিত করিত (ইতিকথা, পৃ. ২৭-৮)। খৃষ্টান সম্প্রদায়, ইয়াহূদীদের প্রতি বিদ্বেষবশত উক্ত পাথরে আবর্জনা নিক্ষেপ করিত (পৃ. গ্র, পৃ. ৫৫)।

কথিত আছে যে, হযরত আদম (আ) সর্বপ্রথম এই পাথরের নিকট নামায পড়িয়াছিলেন, হযরত ইবরাহীম (আ) ইহার নিকট তাঁহার ইবাদতগাহ নির্মাণ করিয়াছিলেন, ইহার উপর অগ্নিস্তম্ভ দেখিয়া হযরত ইয়া'কূব (আ) এখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, হযরত ইউশা (আ) 'কুব্বাতুয যামান' নামে ইহার উপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন, হযরত দাঊদ (আ) ইহার নিকট তাঁহার মিহরাব নির্মাণ করেন, হযরত সুলায়মান (আ) তাঁহার প্রসিদ্ধ ইবাদতগাহ "হায়কালে সুলায়মানী"ও ইহার নিকটেই নির্মাণ করেন এবং মহানবী (স) এই পাথরের উপর হইতেই মি'রাজে গমন করেন (আল আকসা মসজিদের ইতিকথা, পৃ. ২৪-৫)। দীর্ঘকাল পাথরটি ছিল খোলা আকাশের নীচে। ইহাকে রোদ-বৃষ্টিসহ বিভিন্ন ক্ষতিকর পরিবেশ হইতে হেফাজতের জন্য উমায়্যা খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান ৭০/৬০১ সালে ইহাকে বেষ্টন করিয়া অত্যন্ত চমৎকার ডিজাইনে উচ্চ গুম্বজ নির্মাণ করেণ। মহানবী (স) বলেন ঃ

صَلَّيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِىَ بِىْ اِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ يَمِيْنَ الصَّخْرَةِ .

"আমি মি'রাজ রজনীতে বায়তুল মাকদিসে সাখরার ডানে নামায পড়িয়াছি"।

صَخْرَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ صُخُوْرِ الْجَنَّةِ .

"বায়তুল মাকদিসের সাখরা নামক প্রস্তরখণ্ডটি জান্নাতের প্রস্তররাজির অন্তর্ভুক্ত" (আল-আকসা মসজিদের ইতিকথা, পৃ. ২৫)।

৭৩-৭৪/৬৮৫-৮৯ সালের মধ্যে উমায়্যা খলীফা আবদুল মালিক ইব্ন মারওয়ান মসজিদে উমার-কে অত্যন্ত চমৎকার আঙ্গিকে সুশোভিত করিয়া পুনর্নির্মাণ করেন এবং বায়তুল মাকদিস নির্মাণের জন্য মসজিদুল আকসার সম্পূর্ণ অংশ অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁহার পুত্র ওয়ালীদের আমলে বায়তুল মাকদিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয় এবং তিনি ইহাতে মিহরাব ও মিনার সংযোজন করেন। বস্তুত উমায়্যা আমলেই মসজিদে মিহরাব ও মিনার নির্মাণের সূচনা হয় (ইতিকথা, পৃ. ৫৬)।

১৩২ হি. হইতে ৬৫৬ হিজরী পর্যন্ত আব্বাসী খলীফাগণ বায়তুল মাকদিসের রক্ষণাবেক্ষণ করেন। ১৫৮ হিজরীতে খলীফা মাহদী এবং তাঁহার পরে তৎপুত্র মামূন বায়তুল মাকদিসের সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন (ইতিকথা, পৃ. ৫৬)। ফাতিমী (শী'আ) খলীফা আল-মুইয্য লি-দীনিল্লাহ ৯৬৫ হি. ফিলিস্তীন দখলের পর সেখানে খৃষ্টানদের বসতি স্থাপন শুরু হয় (পূ. গ্র., পৃ. ৫৭)। সালজূক

শাসকগণ ৪৬৫/১০৭১ সালে ফাতিমীদের কবল হইতে জেরুসালেম নিজ দখলে আনয়ন করেন। ১০৯৯ খৃ. পর্যন্ত সুদীর্ঘ পাচঁ শত বৎসর জেরুসালেম মুসলিম অধিকারে ছিল (পূ. গ্র, পৃ. ৫৭)।

১০৯৫ খৃ. জেরুসালেমের খৃস্টান পাদ্রী দ্বিতীয় সোমআন জেরুসালেম উদ্ধারের জন্য খৃস্টান বিশ্বের প্রতি আহবান জানায়। একই বৎসর পোপও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহবান জানায় এবং মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপীয় খৃস্টান রাজগণ তাহার আহবানে সাড়া দেয় (পৃ. ৫৭)। ২৩ শাবান, ৪৯২/১৫ জুলাই, ১০৯৯ সালে খৃস্টান সেনাপতি গডফ্রে ডিবো ইউনের সামরিক অভিযানে ফাতিমীদের নিকট হইতে ৬১ বৎসরের জন্য জেরুসালেম খৃস্টানদের দখলে চলিয়া যায়। এই অভিযানে খৃস্টান বাহিনী নারকীয় তাণ্ডব চালায় এবং ৯০ হাজার মুসলমান হত্যা করে। ১৮ হিজরীতে খৃস্টানদের প্রতি হযরত উমারের ক্ষমার প্রতিদান তাহারা ৪৯২ হিজরীতে এইভাবে পরিশোধ করে। তাহারা মসজিদে উমার বা সাখরাকে গীর্জায় রূপান্তরিত করে, উহার একাংশকে ঘোড়ার আস্তাবলে পরিণত করে এবং অন্য অংশ তাহাদের বসবাসের জন্য ব্যবহার করে (ইতিকথা, পৃ. ৫৮)।

৫৬৭/১১৭১ সালে সুলতান সালাহুদ্দীন খৃস্টানদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন। ১১৮৭ খৃ. জেরুসালেম দখলের লক্ষ্যে মুসলিম সেনাবাহিনী হিত্তিনের যুদ্ধে খৃস্টান বাহিনীর ১ লাখ ৬৩ হাজার অশ্বরোহীকে পরাজিত করে, ৩০ হাজার খৃস্টান সৈন্য হত্যা করে এবং ৩০ হাজারকে বন্দী করে। ২৭ রজব, ৫৮৩/অকটোবর, ১১৮৭ তারিখ শুক্রবার সুলতান সালাহুদ্দীনের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী জেরুসালেমে প্রবেশ করে (পৃ. গ্র, পৃ. ৫৮)।

উছমানী শাসনামলেও বায়তুল মাকদিস মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে থাকে। ১৯১৭-১৯ খৃ. বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতনের মধ্য দিয়া জেরুসালেম বৃটিশ ম্যান্ডেটভুক্ত হয়। দীর্ঘ ৩১ বৎসর বৃটিশ শাসনাধীন থাকার পর জেরুসালেম পুনরায় জর্দানের আরব মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসে এবং ১৯৬৭ খৃ. পর্যন্ত উহা জর্দানের অধীন থাকে। পাশ্চাত্যের খৃস্টান জাতিগুলির সহায়তায় ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইয়াহূদীরা জর্দানের নিকট হইতে জেরুসালেম দখল করিয়া নেয়। বর্তমানে ইহা ইসরাঈলের অবৈধ দখলে আছে। ইয়াহূদীরা বায়তুল মাকদিস ধ্বংস করিয়া তদস্থলে হায়কালে সুলায়মানী নির্মাণের সুযোগের অপেক্ষায় আছে (আল আকসা মসজিদের ইতিকথা, পৃ. ৫৯-৬০)।

সুলায়মান (আ) ও যাদুবিদ্যা

বর্তমান বাইবেল অধ্যয়নে জানা যায় যে, তাওরাত কিতাবকে বিকৃতকারী বনূ ইসরাঈল খুব সম্ভব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, তাহারা তাহাদের কোনও একজন মহান নবীর চরিত্রও কলঙ্কিত না করিয়া ছাড়িবে না। অতএব তাহারা প্রায় প্রত্যেক নিষ্পাপ নবীর বিরুদ্ধে লাগামহীন ও ন্যাক্কারজনক অভিযোগ আরোপ করিয়াছে এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর নিষ্পাপ চরিত্রে সর্বাধিক কলংক লেপন করিয়াছে। তাহারা তাঁহার নবুওয়াতকে অস্বীকার করিয়াছে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে (নাঊযুবিল্লাহ) শিরক্-এ লিপ্ত হওয়ার ও যাদুবিদ্যা চর্চার ভিত্তিহীন অভিযোগও উত্থাপন করিয়াছে।

ইবন্ জারীর তাবারী লিখিয়াছেন। "কতক ইয়াহূদী পণ্ডিত বলাবলি করিল, মুহাম্মাদের কাণ্ড দেখ, সে সুলায়মানকে নবী বলিতেছে। আল্লাহ্র শপথ! সে তো ছিল এক যাদুকর" (তাফসীরে তাবারী, কুরআন মজীদ স্থানে স্থানে এইসব অভিযোগ নাকচ করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিষ্পাপ (মা'সূম) ও নিষ্কলংক হওয়ার ঘোষণা দিয়াছেন (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৩৫-৬; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১৫৯-৬১)। কুরআন মজীদ বনূ ইসরাঈলের খোদাদ্রোহিতা এবং হযরত সুলায়মান (আ)-এর কুফর ও যাদুবিদ্যার সহিত সম্পর্কহীনতা এভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيْقٌ مِّنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُوْرِهِمْ كَاَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ . وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ . وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلاَ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهٖ وَمَا هُمْ بِضَارِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ . وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ . وَلَقَدْ عَلِمُوْا لَمَنِ اشْتَرٰهُ مَا لَهُ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ . وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهٖ اَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ .

"যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট একজন রাসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থক, তখন যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবটিকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল, যেন তাহারা জানে না। এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত। সুলায়মান কুফরী করে নাই, বরং শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যাহা বাবিল শহরে হারূত ও মারূত ফেরেশ্তাদ্বয়ের উপর নাযিল করা হইয়াছিল। তাহারা দুইজনে কাহাকেও শিক্ষা দিত না এই কথা না বলিয়া যে, আমরা পরীক্ষাস্বরূপ, সুতরাং তুমি কুফরী করিও না। তাহারা উভয়ের নিকট হইতে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে যাহা বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে তাহা শিক্ষা করিত, অথচ আল্লাহ্র নির্দেশ ব্যতীত তাহারা কাহারও কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিত না। তাহারা যাহা শিক্ষা করিত তাহা তাহাদের ক্ষতি সাধন করিত এবং কোন উপকারে আসিত না। আর তাহারা নিশ্চিতভাবে জানিত যে, যে কেহ উহা ক্রয় করে আখেরাতে তাহার কোন অংশ নাই। উহা কত নিকৃষ্ট যাহার বিনিময়ে তাহারা স্বীয় আত্মাকে বিক্রয় করিয়াছে, যদি তাহারা জানিত" (২ ঃ ১০১-২)।

যাদুচর্চা একটি পাপাচার। দুনিয়াতে আদি কাল হইতে পাপ-পুণ্যের অস্তিত্বের মত যাদুবিদ্যারও অস্তিত্ব ছিল। হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পূর্বে আগত নবী হযরত সালিহ (আ) ছামূদ জাতিকে পাপাচার ত্যাগ করিয়া সত্য পথের অনুসরণের দাওয়াত দিলে তাহারা বলে ঃ

اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

"তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্যতম" (২৬ ঃ ১৫৩)।

হযরত মূসা (আ)-এর অগ্রবর্তী ও সমসাময়িক নবী ছিলেন হযরত শু'আয়ব (আ)। তিনি তাঁহার জাতিকে সৎপথ অনুসরণের আহব্বান জানাইলে তাহারাও তাঁহাকে একই অপবাদ দেয় ঃ

إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ .

"তুমি তো যাদুগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত" (২৬ঃ ১৮৫)।

হযরত মূসা (আ)-এর যুগেও ফিরআওন শাসিত মিসরে যাদুর ব্যাপক চর্চা হইত এবং সে মূসা (আ)-কে পরাভূত করিবার জন্য যাদুকরদের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছিল, যদিও পরিশেষে তাহার সমস্ত পরিকল্পনা মূসা (আ)-এর মু'জিযার সামনে নস্যাৎ হইয়াছিল (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ৭ ঃ ১৩৩-১২২)। হযরত দাঊদ (আ) ও হযরত সুলায়মান (আ) ছিলেন হযরত মূসা (আ)-এর পরবর্তী কালের রাসূল (দ্র. ২ ঃ২৪৬-২৫২)। হযরত সুলায়মান (আ)-কে প্রদত্ত মু'জিযাসুলভ অলৌকিক শক্তি অবলোকন করিয়া একদল মানবরূপী ও জিন্নরূপী শয়তান অপপ্রচার করিতে থাকে যে, তিনি যাদুবিদ্যাবলে যাবতীয় অসাধ্য সাধন করিতেছেন। ইয়াহূদী জাতি কালক্রমে পথভ্রষ্ট হইয়া সুলায়মান (আ)-কে যাদুকর আখ্যায়িত করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সমকালীন ইয়াহূদীরাও একই ধারণায় নিমজ্জিত ছিল। কুরআন মজীদ ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে, "সুলায়মান কুফরী করে নাই, বরং শয়তানরাই কুফরী করিয়াছিল। তাহারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত" (২ ঃ ১০২)।

সুলায়মান (আ)-এর যুগের যাদুচর্চা সম্পর্কে তাফসীরকারগণ বিভিন্নরূপ বিবৃতি পেশ করিয়াছেন (এই বিষয়ে তাফসীরের গ্রন্থাবলী, বিশেষত তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইব্ন কাছীরে উক্ত আয়াতাধীন তাফসীর দেখা যাইতে পারে)। সুলায়মান (আ)-এর ইনতিকালের পর হইতে পুনরায় বনূ ইসরাঈলের নৈতিক ও বৈষয়িক পতন শুরু হইয়া গিয়াছিল। যে কোন অধঃপতিত জাতি যেমন বিচিত্রমুখী কুসংস্কারে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তদ্রূপ বনূ ইসরাঈল তথা ইয়াহূদী জাতিও মহাসত্য হইতে বিচ্যুত হইয়া কুসংস্কারে লিপ্ত হইয়া পড়ে। যাদুমন্ত্র, তাবিজ-তুমার, টোটকা প্রভৃতির দিকে তাহাদের গোটা সত্তা ঝুঁকিয়া পড়ে (তাফহীমুল কুরআন, ২ ঃ ১০১ আয়াতধীন ১০৪ নং টীকা; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৩৯, টীকা ৩৫৩)। ইয়াহূদী বংশজাত জার্মান পণ্ডিত মার্গোলিওথ রচিত মহানবী (স)-এর জীবনী গ্রন্থে আরববাসী ইয়াহূদীদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "ইহারা ছিল যাদুবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে নীচতার (যাদুর) আশ্রয় লওয়াকে প্রাধান্য দিত" (পৃ. ১৮৯; তাফসীরে মাজেদী হইতে এখানে উদ্ধৃত, পৃ. ৩৯, টীকা ৩৫৩)।

ব্যাবিলনীয় যাদুচর্চার সংস্পর্শে আসিয়া ইয়াহূদীরা চরমভাবে পথভ্রষ্ট ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। প্রাচীন যুগে যে দেশটি বাবিল নামে পরিচিত ছিল, তাহা বর্তমান মানচিত্রে ও ভূগোলে আরব-ইরাক নামে অভিহিত। বাবিল নগরী ফোরাত নদীর তীরে, বর্তমান বাগদাদের প্রায় ষাট মাইল (১০০ কি. মি.) দক্ষিণে বর্তমান 'হাল্লা' নামক স্থানের কাছাকাছি অবস্থিত ছিল। যাদুবিদ্যা, ঝাড়ফুঁক, টোটকা ও তন্ত্রমন্ত্রের কুসংস্কারের জন্য দেশটির প্রচুর খ্যাতি ছিল, বর্তমান কালে যাহা Occult Science বা মহাজাতক বিজ্ঞান নামে খ্যাত। ইয়াহূদী-নাসারাদের সহীফাসমূহে ব্যাপক

হারে এই দেশটির উল্লেখ আছে যাহা হইতে একদিকে যেমন ইহার ধনেজনে সমৃদ্ধির সাক্ষ্য পাওয়া যায়, অন্যদিকে ইহার অপকর্ম, অপসংস্কৃতি ও বিনাশী তৎপরতারও প্রমাণ পাওয়া যায় (দ্র. বাইবেলের দানিয়েল, ৪ ঃ ৩; প্রকাশিত বাক্য, ১৭ ঃ ৬; ১৮ ঃ ১০ ও অন্যত্র)। এই জনপদের অপকর্মের সূচনা হইয়াছিল যাদুচর্চার মাধ্যমেই। বাইবেলে বলা হইয়াছে ঃ "পরে এক শক্তিমান দূত বৃহৎ এক পাট যাঁতার তুল্য একখানা প্রস্তর লইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, ইহার ন্যায় মহানগরী বাবিল মহাবলে নিপতিতা হইবে, আর কখনও তাহার উদ্দেশ পাওয়া যাইবে না। ...কারণ তোমার বণিকেরা পৃথিবীর মহল্লোক ছিল, কারণ তোমার মায়াতে (যাদু) সমস্ত জাতি ভ্রান্ত হইত। আর ভাববাদীগণের ও পবিত্রগণের রক্ত, এবং যত লোক পৃথিবীতে হত হইয়াছে, সেই সকলের রক্ত ইহার মধ্যে পাওয়া গেল" (প্রকাশিত বাক্য, ১৮ ঃ ২১-২৪)। "ব্যবিলনীয় ধর্মের বৃহৎ অংশ জুড়িয়া ছিল যাদুমন্ত্র, জ্যোতিষ বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরন ও প্রকার। ...ব্যবিলনীয় ধর্মগ্রন্থসমূহে চোখ বুলাইয়া দেখুন, সব দিকেই জ্যোতিষী ঠাকুরদের মন্ত্র আর মন্ত্রই দেখা যাইবে" (Ency. Religion and Ethics, ২খ, পৃ. ১১৬)। "বাবিল ও নিনাওয়ার ধর্মমতের অধিকাংশ ছিল ভূত-প্রেতের ঝাড়ফুঁক" (রজার্স, Religion of Babilonia and Aseria, পৃ. ১৪৫)। ইয়াহূদীদের বাবিলে সামাজিক মেলামেশা তাহাদের ফেরেশতা ও শয়তান সম্পর্কিত ধ্যানধারণা প্রভাবিত করিতে থাকে (Ency. Brit., ১৩খ, পৃ. ১৮৭, ১১শ সং.)। ইয়াহূদী পণ্ডিতগণের স্বীকারোক্তি এই যে, ব্যবিলনের ধর্মমতের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ সব অঞ্চলের ইয়াহূদীদের মধ্যেই অক্ষুণ্ন থাকে (Jewish Ency., ৬খ, পৃ. ৪১৩; সম্পূর্ণ আলোচনা তাফসীরে মাজেদী হইতে গৃহীত, পৃ. ৪০-৪১, টীকা ৩৫৮)।

এই বাবিল শহরেই বাবিলবাসীর, বিশেষত ইয়াহূদীদের পরীক্ষার জন্য আল্লাহ তা'আলা হারূত ও মারূত নামক দুই ফেরেশতাকে এমন জ্ঞানসহ প্রেরণ করেন যাহা জনগণের জন্য ছিল ক্ষতিকর। তাই তাহারা উহা শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে তাহাদেরকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিত যে, তাহারা উভয়ে তাহাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ আসিয়াছে। অতএব তাহারা যেন কুফরীতে লিপ্ত না হয়। এই সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া বাবিলবাসী ফেরেশতাদ্বয়ের নিকট হইতে সংসার বিনাশী ও ক্ষতিকর তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কে অবহিত হইত, যাহা তাহাদের কোন উপকারেই আসিত না। তাহারা স্পষ্টভাবেই জানিত যে, তাহারা যাহা অবহিত হইতেছে তাহা তাহাদের আখেরাতের জীবনেও লাঞ্ছনা ও দুর্ভোগের কারণ হইবে (দ্র. ২ ঃ ১০২)। ইয়াহূদীরা তাওরাতের স্পষ্ট বিধান লংঘন করিয়াই যাদুচর্চা করিত। কুরআন মজীদে এই কথার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াই তাহাদের সমালোচনা করা হইয়াছে ঃ "যখন আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তাহাদের নিকট একজন রাসূল আসিল, যে তাহাদের নিকট যাহা (তাওরাত) আছে উহার সমর্থক, তখন যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল তাহাদের একদল আল্লাহ্র কিতাবটিকে (তাওরাত) পশ্চাতে নিক্ষেপ করিল... এবং সুলায়মানের রাজত্বে শয়তানরা যাহা আবৃত্তি করিত তাহারা তাহা অনুসরণ করিত" (২ ঃ ১০১-২)।

যাদুচর্চা সম্পর্কে বাইবেলের নিষেধাজ্ঞা নিম্নরূপ ঃ " তুমি মায়াবিনীকে জীবিত রাখিও না" (যাত্রাপুস্তক, ২২ ঃ১৮)। "তোমরা মোহকের কিংবা গণকের বিদ্যা ব্যবহার করিও না" (লেবীয় পুস্তক, ১৯ঃ২৬)। "তোমার প্রতিপালক সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিতেছেন, সেই দেশে উপস্থিত হইলে তুমি তথাকার জাতিগণের ঘৃণার্হ কার্যের ন্যায় কার্য করিতে শিখিও না। তোমার মধ্যে যেন এমন কোন লোক পাওয়া না যায়, যে পুত্র বা কন্যাকে অগ্নির মধ্য দিয়া গমন করায়, যে মন্ত্র ব্যবহার করে বা গণক, মোহক বা মায়াবী বা ঐন্দ্রজালিক বা ভূতড়িয়া বা গুণী বা প্রেতসাধক। কেননা সদাপ্রভু এই সকল কার্যকারীকে ঘৃণা করেন; আর সেই ঘৃণার্হ কার্য প্রযুক্ত তোমার প্রতিপালক সদাপ্রভু তোমার সম্মুখ হইতে তাহাদিগকে অধিকারচ্যুত করিবেন" (দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ ঃ ৯-১২)। এইসব উদ্ধৃতি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দীন ইসলামের অনুরূপ ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের জন্যও যাদুচর্চা করা সম্পূর্ণ হারাম। দুই ইয়াহূদী মহানবী (স)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে "আমরা মূসাকে নয়টি নিদর্শন দান করিয়াছিলাম" (১৭ ঃ ১০১) শীর্ষক আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিল। তিনি নিদর্শনগুলি উল্লেখ করিলেন, যাহার মধ্যে একটি ছিল "তোমরা যাদুটোনা করিও না" (তিরমিযী, ইসতীযান, ২খ, পৃ. ৯৮; হাতে-পায়ে, চুমু দেয়া, নং ২৬৭০; তাফসীর সূরা ১৭, ২খ, পৃ. ১৪২, নং ৩০৮২; নাসাঈ, তাহরীম, বাবুস সিহ্র, ২খ, পৃ. ১৫৩-৪)।

হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়াও বিচিত্রমুখী উপাখ্যান সৃষ্টি হইয়াছে, যাহা কোন কোন তাফসীর গ্রন্থেও সবিস্তারে বিবৃত হইয়াছে (উদাহারণস্বরূপ দ্র. তাফসীর তাবারী ও তাফসীর ইব্ন কাছীর, সংশ্লিষ্ট আয়াতাধীন আলোচনা)। মূল প্রকৃতিতে তাহারা ফেরেশতাই ছিলেন। কিন্তু একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহাদেরকে সাময়িকভাবে মানবসমাজে বসবাসের জন্য পাঠানো হইলে তখন স্বভাবতই তাহাদের গঠনাকৃতি, অবয়ব, আচার-আচরণ সবই মানবসদৃশই হইয়া থাকিবে (তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৪১, টীকা ৩৫৮)। শিহাব ইরাকী স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, যাহারা বিশ্বাস করে যে, হারূত ও মারূত ফেরেশতাদ্বয় তাহাদের পাপের কারণে শাস্তিভোগ করিবে, তাহারা আল্লাহ্র সহিত কুফরী করে (পূ. গ্র, পৃ. ৪১)।

যাদুচর্চার প্রসার সম্পর্কে তাফসীরে উছমানীতে বলা হইয়াছে যে, মানুষের মধ্যে দুইভাবে ইহার বিস্তার ঘটে। হযরত সুলায়মান (আ)-এর আমলে জিন্ন ও মানুষের সহাবস্থানের ফলে মানুষেরা শয়তানদের নিকট হইতে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহা হযরত সুলায়মান (আ)-এর শিক্ষা বলিয়া প্রচার করে এবং বলে যে, তিনি এই যাদুবিদ্যার দ্বারা জিন্ন ও মানুষের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। আল্লাহ তা'আলা ইহার জবাবে বলেন যে, ইহা কুফরী কাজ, সুলায়মান (আ) কুফরী কাজ করেন নাই। বাবিল শহরে মানবরূপী হারূত ও মারূত নামক ফেরেশতাদ্বয়ের মাধ্যমেও যাদুর বিস্তার ঘটে। কেহ তাহাদের নিকট যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিলে তাহারা তাহাকে সতর্ক করিয়া বলিতেন যে, ইহাতে ঈমান চলিয়া যায়। ফেরশতাদ্বয়ের মাধ্যমে মানুষকে পরীক্ষা করাই ছিল আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। এইরূপ বিদ্যায় আখিরাতের কোন উপকারিতা নাই, বরং ক্ষতিকর; পার্থিব জীবনেও তাহা ক্ষতিকর। আর

আল্লাহ্‌র হুকুম ছাড়া যাদুমন্ত্র দ্বারা কিছুই হয় না। ইহার পরিবর্তে তাহারা যদি দীন ও কিতাবের শিক্ষা গ্রহণ করিত তবে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কৃত হইত (পৃ. ২০, টীকা ১)।

বাইবেলীয় শরীআতের অনুরূপ ইসলামী শরীআতেও যাদুচর্চা নিষিদ্ধ। কুরআন মজীদে যাদুচর্চার সমালোচনা করা হইয়াছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى .

"যাদুকররা যেথায়ই আসুক সফল হইবে না" (২০ ঃ ৬৯)।

মহানবী (সা) বলেন ঃ

لاَ تَسْحَرُوْا .

"তোমরা যাদুটোনা করিও না" (তিরমিযী, তাফসীর সূরা ১৭, ২খ, পৃ. ১৪২, নং ৩০৮২, আরো দ্র. আবওয়াবুল ইসতিযান, বাব মা জাআ ফী কুবলাতিল ইয়াদ ওয়ার-রিজল, ২খ, পৃ. ৯৮, নং ২৬৭০)।

حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ .

"যাদুকরের শাস্তি হইল তরবারির আঘাত (মৃত্যুদণ্ড)" (তিরমিযী, হুদূদ, বাব মা জাআ ফী হাদ্দিস সাহির, ১খ, পৃ. ১৭৬, নং ১৪০০)।

اُقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ .

"প্রত্যেক যাদুকরকে হত্যা কর" (আবু দাউদ, কিতাবুল ইমারা, বাব ফী আখযিল জিয্‌য়া মিনাল মাজূস)।

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا اَوْ عَرَّافًا اَوْ سَاحِرًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

"যে ব্যক্তি কোন গণৎকার, অদৃশ্য বক্তা অথবা যাদুকরের নিকট আসিল এবং তাহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল, সে মুহাম্মাদ (স)-এর প্রতি কাফির হইয়া গেল" (জাসসাসের আহ্‌কামুল কুরআন, বাংলা অনু., ১খ, পৃ. ৯৮-৯)।

ফকীহগণের ঐকমত্য অনুযায়ী যাদুচর্চা করা, উহা শিক্ষা দেয়া বা শিক্ষা করা হারাম এবং উহাকে বৈধ বলিয়া বিশ্বাস করা কুফরী। হানাফী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবমতে যাদুকরের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। শাফিঈ মাযহাবমতে যাদুমন্ত্র কুফরীর পর্যায়ভুক্ত হইলে এবং যাদুকর উহার চর্চা বৈধ্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল-মাযাহিবিল আরবাআ, ৫খ, পৃ. ৪৬১-২; জামে আত-তিরমিযী, কিতাবুল হুদূদ, বাব হাদ্দিস সাহির)। অমুসলিম নাগরিকের (যিম্মী) যাদুচর্চা বৈধ। তবে তাহার যাদুক্রিয়ায় কোন মুসলমান নিহত হওয়া প্রমাণিত হইলে তাহার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল-মাযাহিবি, ৫খ, পৃ. ৪৯৩)।

সাবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কুরআন মজীদের দুইটি সূরার দুই স্থানে 'সাবা'-এর উল্লেখ আছে। "আমি সাবা হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি" (২৭ ঃ ২২)। "সাবাবাসীদের জন্য তো উহার বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন" (৩৪ ঃ ১৫)। ইতিহাস দৃষ্টে 'সাবা' দক্ষিণ আরবের একটি বৃহৎ জাতি-গোষ্ঠীর নাম। এই সম্পর্কে মহানবী (স)-এর একটি হাদীছ বর্ণিত আছে।

عَنْ فَرْوَةَ بْنِ مُسَيْكٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . . . قَالَ وَاُنْزِلَ فِيْ سَبَاٍ مَا اُنْزِلَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا سَبَاٌ اَرْضٌ اَوْ اِمْرَاَةٌ قَالَ لَيْسَ بِاَرْضٍ وَلاَ اِمْرَاَةٍ وَلٰكِنَّه رَجُلٌ وَلَدَ عَشَرَةً مِنَ الْعَرَبِ فَتَيَامَنَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ تَشَائَمَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةٌ فَاَمَّا الَّذِيْنَ تَشَاَمُوْا فَلَخْمٌ وَجُذَامٌ وَغَسَّانُ وَعَامِلَةٌ وَاَمَّا الَّذِيْنَ تَيَامَنُوْا فَالاَزْدُ وَالاَشْعَرِيُّوْنَ وَحِمْيَرُ وَمَذْحِجٌ وَاَنْمَار وَكِنْدَةُ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا اَنْمَارٌ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْهُمْ خَثْعَمُ وَبَجِيْلَةُ-

"ফারওয়া ইব্ন মুসায়ক আল-মুরাদী (রা) বলেন, আমি নবী (স)-এর নিকট আসিলাম। ... রাবী বলেন, অতঃপর সাবা সম্পর্কে যাহা নাযিল হওয়ার ছিল তাহা নাযিল হইল। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'সাবা' কি কোন এলাকার নাম না কোন স্ত্রীলোকের নাম? তিনি বলেন ঃ কোন ভূখণ্ডের নামও নহে বা কোন স্ত্রীলোকের নামও নহে, বরং একজন পুরুষলোকের নাম। তাহার ঔরসে আরবের দশজন লোক জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের ছয়জন ইয়ামানে (দক্ষিণ দিকে) এবং চারজন সিরিয়ায় (বাঁ দিকে) বসতি স্থাপন করে। বাম দিকের লোকদের নাম ঃ লাখ্‌ম, জুযাম, গাসসান ও আমিলা (গোত্র)। আর ডান দিকের লোকদের নাম ঃ আয্‌দ, আশ'আরী, হিম্‌য়ার, কিন্‌দা, মাযহিজ ও আনমার। এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'আনমার' কাহারা? তিনি বলেন ঃ খাছ'আম ও বাজীলা গোত্রের লোকজন তাহাদের অন্তর্ভুক্ত" (তিরমিযী, তাফসীর, সূরা সাবা; আবূ দাউদ, কিতাবুল হুরূফ ওয়াল-কিরাআত, ২০ নং হাদীস; মুসনাদে আহ্‌মাদ, ১খ, পৃ. ৩১৬, নং ২৯০০; তাবাকাত ইব্‌ন সা'দ, ১খ, কিসমুল আওয়াল, পৃ. ২০)।

কুরআন মজীদে সাবা জাতির আর্থিক সমৃদ্ধি, কৃষিজ উন্নতি, পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর শহর সভ্যতা, এই জাতির ধ্বংস, বিশেষত তাহাদের রাজধানী মা'রিবের শস্য-শ্যামল সবুজ বনানীর ধ্বংস সম্পর্কে কুরআন মজীদে একটি নাতিদীর্ঘ বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ جَنَّتٰنِ عَنْ يَّمِيْنٍ وَّشِمَالٍ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ . فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ اُكُلٍ خَمْطٍ وَّاَثْلٍ وَّشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ . ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا وَهَلْ نُجْزِيْ اِلاَّ الْكَفُوْرَ . وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِيْ بٰرَكْنَا فِيْهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَّقَدَّرْنَا فِيْهَا السَّيْرَ سِيْرُوْا فِيْهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا اٰمِنِيْنَ . فَقَالُوْا رَبَّنَا بٰعِدْ بَيْنَ اَسْفَارِنَا وَظَلَمُوْا

اَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنٰهُمْ اَحَادِيْثَ وَمَزَّقْنٰهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيْسُ ظَنَّهٗ فَاتَّبَعُوْهُ اِلَّا فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔ وَمَا كَانَ لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِىْ شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۔

"সাবাবাসীদের জন্য তো তাহাদের বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন ঃ দুইটি উদ্যান, একটি ডানদিকে এবং অপরটি বামদিকে। তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম নগরী এবং ক্ষমাশীল প্রতিপালক। পরে তাহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি তাহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তিত করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলগাছ। আমি তাহাদের কুফরীর জন্য তাহাদেরকে এই শাস্তি দিয়াছিলাম। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না। তাহাদের ও যেসব জনপদের প্রতি আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম সেইগুলির মধ্যবর্তী স্থানে দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন করিয়াছিলাম এবং ঐসব জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করিয়াছিলাম এবং তাহাদেরকে বলিয়াছিলাম, তোমরা এইসব জনপদে নিরাপদে ভ্রমণ কর দিবস ও রজনীতে। কিন্তু তাহারা বলিল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের সফরের মনযিলের ব্যবধান বর্ধিত কর। তাহারা নিজেদের প্রতি যুলুম করিয়াছিল। ফলে আমি তাহাদেরকে কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত করিলাম এবং তাহাদেরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলাম। ইহাতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে ইবলীস তাহার ধারণা সত্য প্রমাণ করিল, ফলে তাহাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ব্যতীত সকলেই তাহার অনুসরণ করিল। তাহাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না; বরং কাহারা আখেরাতে ঈমান আনে এবং কাহারা তাহাতে সন্দিহান তাহা প্রকাশ করিয়া দেওয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য। তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ে হেফাজতকারী" (৩৪ ঃ ১৫-২১)।

অতএব সাবা ছিল আরবের একটি লোকের নাম। বহু প্রাচীন কাল হইতেই আরবের এই জাতিটি খ্যাতিমান ছিল। খৃ.পূ. ২৫০০ সনে উর-এর শিলালিপিসমূহে সাবা জাতি "সাবূম" নামে উক্ত হইয়াছে। অতঃপর ব্যাবিলনীয় ও এ্যাসিরীয় শিলালিপিতে, অনুরূপভাবে বাইবেলের বহু স্থানে ইহার উল্লেখ আছে (উদাহরণস্বরূপ দ্র. গীত সংহিতা, ৭২ ঃ ১৫; যিরমিয়, ৬ ঃ ২০; যিহিষ্কেল, ২৭ ঃ ২২ হইতে ৩৮ ঃ ১৩; ইয়োব, ৬ ঃ ১৯; আরও দ্র. তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা.)। এই সাবা-ই বর্তমান কালে 'ইয়ামন' নামে খ্যাত (তাফহীম, পৃ. স্থা.)।

আদ জাতির মধ্যে হযরত হূদ (আ) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন হযরত নূহ (আ)-এর বংশধর এবং অধস্তন পঞ্চম পুরুষ ঃ হূদ ইব্ন সিল্হ ইব্ন আরফাখসাদ ইব্ন সাম ইব্ন নূহ (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, ১১৯)। বাইবেলে 'হূদ' নামের স্থলে 'এবং' উক্ত হইয়াছে (আদিপুস্তক, ১০ ঃ ১-৩২; ১ম বংশাবলী, ১ ঃ ১-১৮)।

হূদ (আ)-এর দুই পুত্র ফালিজ (Peleg) ও ইয়াকতান (Joktan)। 'ইয়াকতান' আরবদের নিকট 'কাহ্তান' নামে প্রসিদ্ধ। কাহ্তানের তেরো পুত্রের মধ্যকার দশমজনের নাম 'সাবা' (বাইবেলের পূর্বোক্ত বরাতে আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১১৯)। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ তাহার নাম 'আমর' বা 'আবদুশ শামস' এবং উপাধি বা ডাকনাম 'সাবা' বলিয়াছেন। তিনিই ছিলেন সাবা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার বংশধর ইতিহাসে 'সাবা জাতি' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইয়ামনের দক্ষিণাংশে ছিল তাহার রাজত্ব, যাহা ক্রমান্বয়ে হাদরামাওত ও হাবশা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। ইহার রাজধানী ছিল মারিব, যাহা 'সাবা' নামেও কথিত (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১১৯; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১৩৮)। ইসলামী বিশ্বকোষের নিবন্ধের বর্ণনা এইরূপ ঃ সাবার প্রাচীন রাজ্য বর্তমান কালের ইয়ামন, এডেন উপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল, মাহ্রা ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী ও বর্তমান সৌদী আরবের অন্তর্ভুক্ত সুদীর্ঘ উপকূলীয় অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল (১৮খ, পৃ. ১৮৮)।

সাবার সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা

বৃহৎ ইমারতরাজি ও দুর্গাদির জন্য সাবা ছিল তৎকালের একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য। এই জাতি ছিল বণিক এবং ব্যবসায় ব্যাপদেশে ছিল সম্পদশালী। আরবদেশে পর্যাপ্ত স্বর্ণ ও মণি-মুক্তার খনি ছিল, যাহার অধিকাংশ ইহাদের এলাকায় বিদ্যমান ছিল ... হাদরামাওত ও ইয়ামন এলাকা সুগন্ধি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। উমান ও বাহ্রায়নে মণি-মুক্তার খনি ছিল, বর্তমান কালেও তথা হইতে সারা পৃথিবীতে মূল্যবান মণি-মুক্তা রপ্তানী হয়। ইয়ামনের উপকূলে হিন্দুস্তান ও হাবশায় উৎপাদিত পণ্য মজুদের জন্য পণ্যাগার ছিল। তৎকালে সিরিয়া, মিসর, ইউরোপ, হিন্দুস্তান ও হাবশার মধ্যে যে ব্যবসায়িক আদান-প্রদান হইত সাবাই ছিল উহার একচেটিয়া ইজারাদার। এসব কারণে তাহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি বহুল আলোচিত (হিফজুর রহমানের কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩৩২-এর বরাতে আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২১-২২; আরও দ্র. বাইবেলের-যিশাইয়, ৪৫ ঃ ১৪ ও ৬০ ঃ ৬; যিরমিয়, ৬ ঃ ২০; যিহিষ্কেল, ২৭ ঃ ২২-২৪)।

সাবা জাতি ছিল মুশরিক ও প্রতীমা পূজারী, সূর্যই ছিল তাহাদের সর্বপ্রধান দেবতা। যেমন হুদহুদ পাখির যবানীতে কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে (অনুবাদ) ঃ "আমি তাহাকে ও তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্দা করিতেছে। শয়তান উহাদের কার্যাবলী উহাদের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদেরকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে, ফলে উহারা সৎপথ পায় না" (২৭ ঃ ২৪)।

ইয়াহূদী বিশ্বকোষেও ইহাদের সূর্য পূজার কথা উল্লেখ আছে (১১খ, পৃ. ২৩৬-এর বরাতে আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২২)। ইহারা তারকারাজির পূজাও করিত (আরদুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১৬৪, 'আদ্য়ানুল আরাব কাবলাল ইসলাম' অনুচ্ছেদের বরাতে আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২২)। সাবা জাতির ভাষা সম্পর্কে কথিত আছে যে, ইহারা ছিল 'আদ জাতির একটি শাখা। আর 'আদ জাতির ভাষা ছিল প্রাচীন আরামী-আরবী। ইহার খানিকটা পরিবর্তিত রূপই ছিল সাবা জাতির ভাষা। ইহা ছিল প্রাচীন দক্ষিণ আরবীয় অথবা কাহতানী ভাষার একটি শাখা। সাবার অপর গোত্র হিম্য়ারের
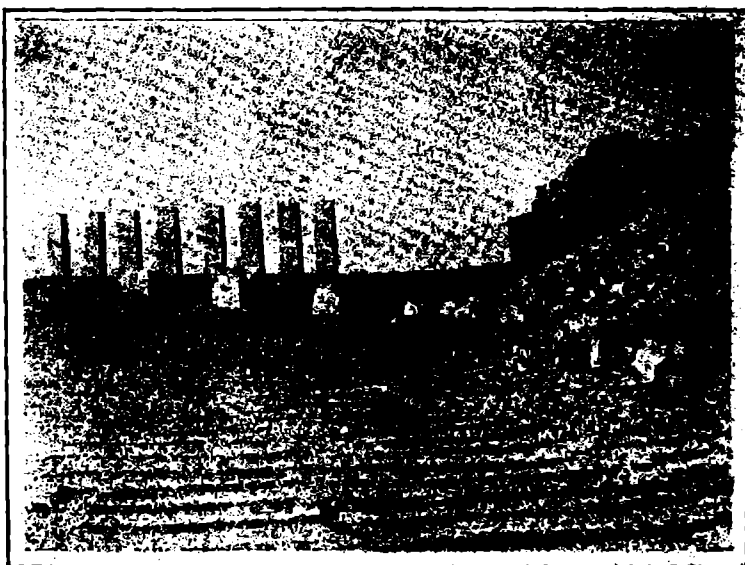
সূর্য দেবতার মন্দির, যাহাকে সাবার রাণীর প্রাসাদও বলা হইত (মাআরিব)। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকালে ইহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

ভাষা ছিল হিম্‌য়ারী। কুরআন মজীদের আরিম (عرم) শব্দটি এই ভাষাভুক্ত (আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২৩)। বর্তমানকালে উক্ত এলাকার জাতি-গোষ্ঠী আরবী ভাষাভাষী।

আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে ইয়ামনে প্রায় তিন হাজার শিলালিপি উদ্ধার হইয়াছে। সেই সঙ্গে আরবী কিংবদন্তী এবং রোমান ও গ্রীক ইতিহাসের সংগৃহীত তথ্যের আলোকে অনুমান করা যায় যে, সাবা রাজ্য উহার গোড়াপত্তন হইতে পতন কাল পর্যন্ত কয়েকটি যুগপর্যায়ে বিভক্ত ছিল।

প্রথম পর্যায় খৃ.পূ. ১১০০ সাল হইতে খৃ. পূ. ৫৫০ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। সর্বপ্রথম যাবূর কিতাবে সাবা রাজ্যের উল্লেখ দেখা যায় (দ্র. গীতসংহিতা, ৭২ ঃ ১০)। এই রাজ্যের উত্থান ঘটে সম্ভবত খৃ. পূ. ৯৫০ সালের দিকে এবং হযরত সুলায়মান (আ) ও সাবার রাণীর সংশ্লিষ্ট ঘটনা এই সময়-কালের এবং সম্রাজ্ঞী সুলায়মান (আ)-এর দাওয়াতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ (খৃ. পূ. ৯৬৫-২৬) করিলে সম্ভবত এই জাতিও ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়। কাসাসুল কুরআনের রচয়িতার মতে তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা খৃ. পূ. ৯৫০ সালের (৩খ., পৃ. ২৮৩)। এই যুগেই সাবা জাতি ধন-সম্পদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করে (কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১৩৯; তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৯৫, টীকা ৩৭; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২০)।

এই সময় সাবা সম্রাটদের উপাধি ছিল 'মুকাররিব সাবা' (مكرب سبا), যাহা সম্ভবত مقرب سبا -এর অপভ্রংশ এবং যাহার অর্থ তখনকার রাজা-বাদশাহগণ নিজদিগকে মানুষ ও দেবতাদের মধ্যবর্তী যোগসূত্র মনে করিত অথবা তাহারা ছিল পুরোহিত বাদশাহ (Priest King)। তখন তাহাদের রাজধানী ছিল সিরওয়াহ (صرواح) নামক স্থানে, যাহা ছিল মা'রিব হইতে পশ্চিম দিকে এক দিনের পথের দূরত্বে এবং যাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। ইহার বর্তমান নাম খারীবা। মা'রিব বাঁধও এই কালেই নির্মিত হয় এবং পরবর্তী শাসকগণ উহার প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সম্প্রসারণ করেন (তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা; আরদুল কুরআন, ১খ, পৃ. ১৯৩-৪; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৮৪)।

সাবা রাজ্যের দ্বিতীয় পর্যায় খৃ. পূ. ৫৫০ সাল হইতে খৃ. পূ. ১১৫ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্যায়ে সাবার সম্রাটগণ 'মুকাররিব' উপাধি ত্যাগ করিয়া 'মালিক' (বাদশাহ) উপাধি গ্রহণ করে এবং তাহারা সিরওয়াহ হইতে মা'রিব-এ (বিস্তারিত দ্র. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮ খ, শিরো. মা'রিব) রাজধানী স্থানান্তরিত করে। স্থানটি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯০০ ফুট উচ্চে এবং সান'আ (صنعاء) হইতে ষাট মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত। সায়লুল আরিম তথা বাঁধভাঙ্গা বন্যার বিপর্যয় এই কাল-পর্যায়ের ঘটনা, যাহা কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে (দ্র. ৩৪ ঃ ১৬)। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখনো সাক্ষ্য দেয় যে, ইহা এক কালে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির লীলাভূমি ছিল (তাফহীমুল কুরআন, পৃ. স্থা.; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২০; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৮৪; আরদুল কুরআন, ১খ,

সাবা রাজ্যের তৃতীয় পর্যায় খৃ. পূ. ১১৫ সাল হইতে ৩০০ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত (কাসাসুল কুরআন ও আম্বিয়া-ই কুরআন ৩০০-এর স্থলে ৩০ খৃ. এবং আরদুল কুরআনে ২৫ খৃ., দ্র. পর্যায়ক্রমে, ৩খ, পৃ. ২৮৫; ৩খ., পৃ. ১২২; ১খ, পৃ. ২১৯)। তবে ৩০০ খৃ.-ই সঠিক মনে হয়। কারণ কাসাসুল কুরআনে চতুর্থ পর্যায় ৩০০ খৃ. হইতে শুরু হইয়াছে, (দ্র. ৩খ., পৃ. ১৮৫)। এই কাল-পর্যায়ে সাবা জাতির হিম্‌য়ার উপগোত্র ক্ষমতাসীন হয় এবং তাহারা মা'রিব হইতে রাজধানী 'রায়দান' নামক স্থানে স্থানান্তরিত করে। ইহা ছিল হিম্‌য়ার-এর কেন্দ্রভূমি এবং ইহার নামকরণ করা হয় যাফার (ظفار)। বর্তমান 'এরেম' (ارم عرم) শহরের কাছাকাছি এক গোলাকার পর্বতের উপর রায়দান-এর ধ্বংসাবশেষ এখনও লক্ষ্য করা যায় এবং ইহার নিকটবর্তী অঞ্চলে 'হিম্‌য়ার' নামে একটি ক্ষুদ্র গোত্র বসবাসরত আছে। ইতিহাসের এই অধ্যায়েই সাবা জাতির পতন শুরু হয় (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৯৬, টীকা ৩৭; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৮৪; আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২২; আরদুল কুরআন, ১খ, পৃ. ২১৯)।

সাবা রাজ্যের চতুর্থ পর্যায় ৩০০ খৃস্টাব্দের পর হইতে দীন ইসলামের সূচনাকাল পর্যন্ত বিস্তৃত (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৮৫ এবং আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, পৃ. ১২২-এ ৫২৫ খৃ. পর্যন্ত বিস্তৃত)। ইহা সাবা জাতির ধ্বংসপ্রাপ্তির অধ্যায়। এই পর্যায়ে তাহাদের মধ্যে ক্রমাগত গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে, বহিশক্তির প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে থাকে। তাহাদের গৃহযুদ্ধের সুযোগে প্রথমে ৩৪০ খৃ. হইতে ৩৭৮ খৃ. পর্যন্ত ইয়ামন হাবশার শাসনাধীনে থাকে। ৪৫০-৫১ খৃ. মা'রিব বাঁধ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এক সর্বগ্রাসী বন্যার সৃষ্টি হয়। কুরআন মজীদে এই বন্যার (সায়লুল 'আরিম) কথাই উক্ত হইয়াছে। ৫২৩ খৃ. ইয়ামনের ইয়াহূদী শাসক যু-নাওয়াস নাজরানের খৃস্টানদের উপর অকথ্য ও নির্মম অত্যাচার চালায়, কুরআন মজীদে যাহা আসহাবুল উখদূদ (দ্র. ৮৫ ঃ ৪-৮) নামে উক্ত হইয়াছে। ইহার প্রতিশোধস্বরূপ হাবশার খৃস্টান রাষ্ট্র ইয়ামন আক্রমণ করিয়া সমগ্র দেশ দখল করিয়া নেয়। অতঃপর ইয়ামনের হাবশী গভর্নর আবরাহা কা'বা ঘরের কেন্দ্রীয় মর্যাদা খতম করিয়া আরবের সমগ্র পশ্চিম অঞ্চল নিজ দখলে আনিবার জন্য ৫৭০ খৃ. মক্কা শরীফ আক্রমণ করিতে ৫৭০ খৃ. বা ৫৭১ খৃ. অগ্রসর হয় এবং আল্লাহ্‌র গযবে আবরাহা বাহিনী সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যাহা কুরআন মজীদে 'আসহাবুল ফীল' নামে উক্ত হইয়াছে (দ্র. ১০৫ ঃ ১-৫)। শেষকালে ৫৭৫ খৃ. পারসিকরা ইয়ামন দখল করে এবং ৬২৮ খৃ. পারসিক শাসক বাযান-এর দীন ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে যাহার অবসান ঘটে। তখন হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাবা তথা বর্তমান ইয়ামন মুসলিম শাসনাধীন রহিয়াছে এবং এখানকার সমগ্র জনগোষ্ঠী মুসলিম জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৯৬-৭, টীকা ৩৭)।

সাবা জাতির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

সাবা জাতি ছিল তখনকার দুনিয়ায় সর্বাধিক সমৃদ্ধিশালী সম্প্রদায়। তাহাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির উৎস ছিল কৃষিকার্য ও ব্যবসা-বাণিজ্য। এক বিশেষ পদ্ধতির উন্নত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে তাহারা কৃষিকার্যে সমৃদ্ধি আনয়ন করিয়াছিল। তাহাদের দেশ শস্য-শ্যামল ক্ষেত-খামার, বাগ-বাগিচা ও

গবাদিপশুতে ভরপুর ছিল। তাহারা জ্বালানী কাঠ হিসাবে দারুচিনি, ছন্দল ও অন্যান্য সুগন্ধি কাষ্ঠ ব্যবহার করিত। তাহারা সোনা-রূপার পাত্র ব্যবহার করিত। তাহাদের বাড়ির ছাদে, প্রাচীরে ও দ্বারদেশে হাতীর দাঁত, সোনা-রূপা ও হীরা-জহরত খচিত থাকিত। রোম ও পারস্যের ধন-সম্পদ ইহাদের দিকেই প্রবাহিত হইতেছিল। তাহাদের নিকটবর্তী তীরভূমি হইতে যেসব পণ্যবাহী নৌযান যাতায়াত করিত তাহা হইতে সে পর্যন্ত সুগন্ধির প্রবাহ পৌঁছিত (তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৯৭-৮, টীকা ৩৭; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৮৯-৯১; আরদুল কুরআন, ১খ, পৃ. ১৯৭-৮)।

সাবা জাতি এক বিশেষ উন্নত সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিকার্যকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করিয়াছিল। বর্ষাকালে পাহাড় পর্বত হইতে যেসব ঝর্ণা প্রবাহিত হইত সেইগুলির মুখে স্থানে স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া সারা দেশব্যাপী অসংখ্য পানি সঞ্চয়াগার গড়িয়া তোলা হইয়াছিল এবং দেশটিকে ফল ও ফসলের সমারোহ ভরিয়া তুলিয়াছিল। কুরআন মজীদে সেদিকেই ইঙ্গিত করিয়া বলা হইয়াছে ঃ "দুইটি উদ্যান, একটি ডানদিকে এবং অপরটি বামদিকে। তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর" (৩৪ ঃ ১৫)। আয়াতের অর্থ এই নহে যে, মাত্র দুইটি বাগান ছিল ; বরং সাবার সমগ্র এলাকা জনপথের দুই পাশ ধরিয়া গুলবাগিচায় ভরিয়া গিয়াছিল। মানুষ চলার পথে যেখানেই থামিয়া দাঁড়াইত, তাঁহার ডাইনে ও বামে কেবল বাগানই দেখিতে পাইত। কেহ ফল সংগ্রহের জন্য মাথায় ঝুড়ি লইয়া এইসব উদ্যানের মধ্য দিয়া অতিক্রম করাকালে তাহাকে কষ্ট স্বীকার করিয়া ফল পাড়ার প্রয়োজন হইত না। গাছের পরিপক্ক ফল পতিত হইয়া তাহার ঝুড়ি ভর্তি হইয়া যাইত (মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত সং, পৃ. ১১০৯, ইব্ন কাছীরের বরাতে; তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাবা, টীকা ২৭; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৫৭২, টীকা ৮ এবং পৃ. ৫৭৩, টীকা ১; কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ২৯৫-৬; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, পৃ. ১৯৬)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন যে, জনপদের ডানে ও বামে তেরটি জনপদ ব্যাপিয়া উদ্যানরাজি বিস্তৃত ছিল (তাফসীর ইব্ন আব্বাস, পৃ. ৩৬০)। আল-মাসউদী বলেন, সাবা অঞ্চলের উর্বর ও আবাদী এলাকা অতিক্রম করিতে একজন অশ্বারোহীর এক মাসের অধিক সময় লাগিত। জন্তুযানে অথবা পদব্রজে ভ্রমণকারীকে এই এলাকা অতিক্রমকালে রৌদ্রের খরতাপের মধ্যে পড়িতে হইত না। কারণ সে সম্পূর্ণ পথই বৃক্ষের ছায়ায় অতিক্রম করিতে পারিত, (ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৭-৮)।

তাহাদের শহরও ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, স্বাস্থ্যকর ও জীবনোপকরণে ভরপুর। কুরআন মজীদে ইহাকে বলা হইয়াছে "উত্তম নগরী" (৩৪ ঃ ১৫)। শহরটি ছিল নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে অবস্থিত এবং ইহার আবহাওয়া ছিল স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ। সমগ্র শহরে মশা-মাছি, ছারপোকা ও সাপ-বিছার মত ইতর প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল না। বহিরাঞ্চল হইতে কোন ব্যক্তি তাহার দেহে ও পরিচ্ছদে উকুন ইত্যাদি বহন করিয়া এই শহরে প্রবেশ করিলে সেইগুলি আপনা আপনি মরিয়া যাইত (তাফসীরে ইব্ন কাছীরের বরাতে মা'আরিফুল কুরআন, সৌদী সং, পৃ. ১১০৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ,

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্প্রসারিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম, দেশব্যাপী উন্নত পদ্ধতির সেচব্যবস্থার মাধ্যমে কৃষিকার্যের সম্প্রসারণ এবং উত্তম ও পরিচ্ছন্ন নগর জীবন সাবাবাসীদের প্রভূত সমৃদ্ধির কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। আল্লাহ তা'আলা তাহাদেরকে এইরূপ উত্তম জীবনোপকরণ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাবাবাসীদেরকে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছেন। তাহাদেরকে বলা হইয়াছিল, "তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযিক ভোগ কর এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ... ক্ষমাশীল প্রতিপালক" (৩৪ ঃ ১৫)। হযরত ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তা'আলা এই সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য তেরজন নবী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাদেরকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনোপকরণ ভোগ করিয়া তাঁহার একত্বকে কবুল করার মাধ্যমে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার আহ্বান জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাদের আহ্বানে কর্ণপাত করে নাই (তাফসীরে ইব্ন আব্বাস, পৃ. ৩৬০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, পৃ. ১৯৬)। তাহারা বলিল, আল্লাহ যে আমাদের প্রতি কোনরূপ নিয়ামত নাযিল করিয়াছেন তাহা আমাদের জানা নাই।

সাবা জাতি হযরত সুলায়মান (আ)-এর সহিত রাণী বিলকীসের সাক্ষাতের পর প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা আল্লাহ্র প্রতি অনুগত থাকিলেও কালের প্রবাহে ক্রমান্বয়ে অত্যাচারী হইয়া উঠে এবং লোভ-লালসা ও ভোগ-বিলাসিতার পথ অনুসরণ করিয়া আল্লাহ তা'আলার অবাধ্য হইয়া পড়ে (ই.বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৬)। ফলে তাহারা আল্লাহ্র গযবে নিপতিত হইয়া ধ্বংস হয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ "পরে তাহারা অবাধ্য হইল। ফলে আমি তাহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং তাহাদের উদ্যান দুইটিকে পরিবর্তিত করিয়া দিলাম এমন দুইটি উদ্যানে যাহাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং সামান্য কুলগাছ। আমি তাহাদের কুফরীর জন্য তাহাদেরকে এই শাস্তি দিলাম। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যতীত আর কাহাকেও এমন শাস্তি দেই না" (৩৪ ঃ ১৬-১৭)।

মা'রিব বাঁধ ও সায়লুল আরিম

সাবা জাতির কৃষিজ উন্নতির চাবিকাঠি ছিল মা'রিব বাঁধ এবং যাহা তাহাদের কৃতকর্মের ফলে তাহাদের ধ্বংসের কারণ হইয়াছিল। এই বাঁধ সম্পর্কে কুরআন মজীদে সরাসরি উল্লেখ না থাকিলেও আল্লাহ্র হুকুমে ইহা বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে যে সর্বগ্রাসী ধ্বংসাত্মক প্লাবন হইয়াছিল "সায়লুল 'আরিম" (বাঁধভাঙ্গা বন্যা) নামে তাহার উল্লেখ আছে (দ্র. ৩৪ ঃ ১৭)। এই বাঁধ কখন এবং কাহার উদ্যোগে নির্মিত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইব্ন আব্বাস (রা) ও ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ প্রমুখের মতে রাণী বিলকীসের নির্দেশে উহা নির্মিত হইয়াছিল (ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৬, কলাম ১)। আদ-দামীরী উল্লেখ করিয়াছেন যে, আস-সুহায়লীর মতে সাবা ইব্ন ইয়াশ'আব উহা নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং উহার মধ্য দিয়া সত্তরটি নদীর পানি প্রবাহিত হইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাঁধের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পূর্বেই তাহার মৃত্যু হইলে পরবর্তী শাসকগণ উহার অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করেন (পৃ. গ্র., ১পৃ. ১৯৬, কলাম ২)। কাহারও মতে হযরত লুকমান (আ) ইব্ন আদ ইব্ন কিব্র ছিলেন এই বাঁধের নির্মাতা (ই.বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৭, কলাম ১)। কবি

মারিব বাঁধের অবস্থানস্থল ও উহার নির্মাণ চিত্র।
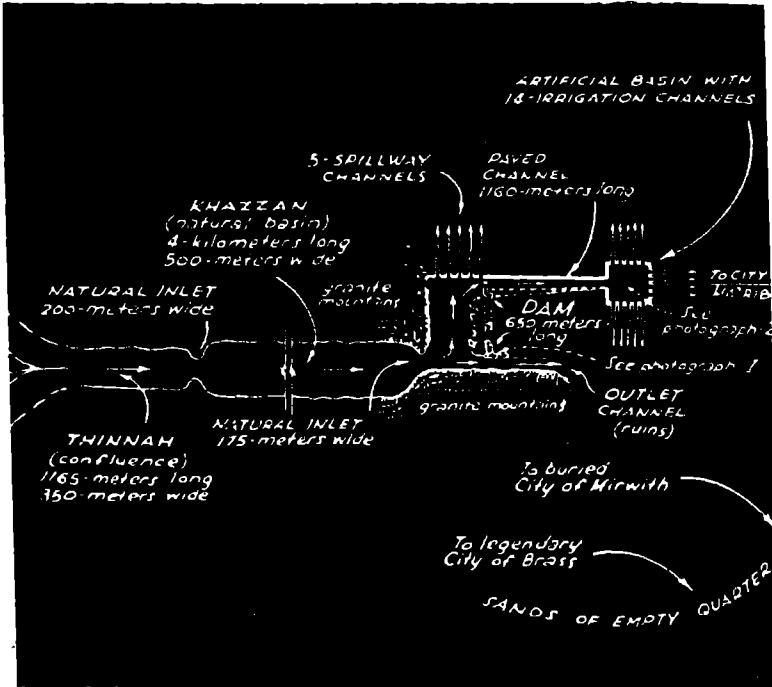
جو رضی صلیبی نے عظمی اور ڈاکٹر احمد فخری ماہرین آثار قدیمہ کے نقشوں کی مدد سے تیار کیا
اور جو اسلامک ریویو (لندن) کی اشاعت بابت اپریل ۱۹۵۳ء میں چھپا تھا -

حوالہ صفحہ نمبر ۱۲۰

আল-আ'শা-র কবিতায় হিম্‌য়ার-কে ইহার নির্মাতারূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (ই.বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৯, কলাম ১)। দুইটি উদ্দেশ্যে এই বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছিল ঃ (১) যাহাতে মা'রিব উপত্যকার উচ্চভূমির কৃষিক্ষেত্রে ও উদ্যানসমূহে পানিসেচের ব্যবস্থা করা যায় এবং তদুদ্দেশ্যে পানির স্তরকে অন্তত পাঁচ মিটার উচ্চতায় আনয়ন করা; (২) বন্যার পানি তথা নদ-নদীর পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে আনা এবং পরবর্তী বর্ষা মৌসুমের পানি সরবরাহ না আসা পর্যন্ত উহাদের পানিকে যথাসম্ভব পরিমাণে সঞ্চিত করিয়া রাখা (ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৯, কলাম ২)।

মা'রিব বাঁধটি মযবুত করার জন্য উহার পশ্চাদভাগে অত্যন্ত শক্তিশালী ও বেশ উঁচু স্তম্ভের ঠেস স্থাপন করা হইয়াছিল। সেইগুলির ভিত্তিসমূহকে তাম্র নির্মিত পেরেকের সাহায্যে পরস্পরের সহিত অত্যন্ত মযবুতভাবে সম্পৃক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্তম্ভশ্রেণী অদ্যাবধি বিদ্যমান ও দণ্ডায়মান আছে। অনেক সংখ্যক লোক একত্র হইয়া ঐ স্তম্ভগুলির একটিকেও মাটিতে শোয়াইয়া ফেলিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইবে (ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৭, কলাম ১, ২)।

এত শক্তিশালী ও মযবুত বাঁধও আল্লাহ্‌র গযব হইতে নাফরমান মা'রিববাসীকে রক্ষা করিতে পারে নাই। সাবা জাতি তাহাদের আসমানী কিতাবসমূহ ও নবী-রাসূলগণের ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের বাঁধ এক দিন না এক দিন ইঁদুর দ্বারা বিধ্বস্ত হইবেই (ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৬, কলাম ১)। সত্যিই ইঁদুরের মত ক্ষুদ্র প্রাণীর দ্বারা এত সুদৃঢ় একটি বাঁধ ধ্বংস হইল এবং বন্যার পানিতে সমগ্র মা'রিব অঞ্চলের ক্ষেত-খামার ও ফলের বাগান ধ্বংস হইয়া গেল। অভাবের তাড়নায় ও বহিশক্তির আক্রমণে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া এই এলাকার জনগোষ্ঠী আরবের বিভিন্ন এলাকায় অভিবাসন করে (ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৮ ও ১৯৯)। ফলে সুজলা-সুফলা মা'রিব ভূমি বনভূমিতে পরিণত হইল। "পরে উহারা আদেশ অমান্য করিল, ফলে আমি উহাদের উপর প্রবাহিত করিলাম বাঁধভাঙ্গা বন্যা এবং উহাদের উদ্যান দুইটিতে হয় বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু কুল গাছ" (৩৪ ঃ ১৬)। মা'রিব বাঁধ ধ্বংস এবং উহার ফলে তৎপার্শ্ববর্তী সুজলা-সুফলা এলাকা বিধ্বস্ত হইয়া বন-জঙ্গলে পরিণত হওয়ার যে ঘটনা কুরআন মজীদে উক্ত হইয়াছে উহা ৫৪৩ খৃ. হইতে ৫৭০ খৃ.-এর মধ্যবর্তী কোনও এক সময় ঘটিয়াছিল (ই.বি., ১৮খ, পৃ. ১৯৫, কলাম ২)।

সায়লুল 'আরিম-এর পূর্বেই খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর কাছাকাছি সময়ে সাবা জাতির আন্তর্জাতিক স্থল ও নৌপথের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া বাণিজ্যের পতন শুরু হয়। একের পর এক গ্রীক, রোমান ও হাবশী শাসক গোষ্ঠীর আক্রমণে এই জাতির একচেটিয়া ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায় (তাফহীমুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ১৯৭-৯৯, টীকা ৩৭। সাবাঈদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, মা'রিব বাঁধ, সায়লুল আরিম ইত্যাদি বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. শিরো. "মা'রিব", ই. বি., ১৮খ, পৃ. ১৮৭-২০৪)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ কুরআন ঃ তরজমা ও তাফসীর ঃ (১) আয়াতসমূহের তরজমার জন্য আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯শ মুদ্রণ, ঢাকা ১৪১৭/১৯৯৭; (২) ইমাম রাযী, তাফসীরে কবীর, বৈরূত তা.বি., ২১খ, ২৪খ, ২৫খ. ও ২৬খ.; (৩) আল-আলূসী, রূহুল মা'আনী,

বৈরূত তা.বি., ২খ, ১৭খ, ১৯খ ও ২৩খ; (৪) কুরতুবী, আহ্কামুল কুরআন, বৈরূত ১৯৬৬ খৃ., ৪খ, ১০খ, ১৪খ.; (৫) ইব্ন জারীর তাবারী, তাফসীরুল কুরআনুল আজীম, ৩য় সং, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮, ১০ম বালাম, ২৩খ; (৬) তাফসীরে ইব্ন আব্বাস (রা); (৭) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ২খ. (বৃহৎ সংস্করণ); (৮) ইবনুল জাওযী, তাফসীর যাদুল মাছীর, ২খ. ও ৭খ.; (৯) শিব্বির আহ্মাদ উছমানী, তাফসীরে উছমানী (উর্দূ), সৌদী সংস্করণ (১০) সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (উর্দূ), ৩খ. ও ৪খ.; (১১) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, মাআরিফুল কুরআন (উর্দূ), ৬খ. ও ৭খ.; (১২) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী (উর্দূ), লাহোর-করাচী তা.বি. (সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা নম্বর নিবন্ধ গর্ভে উক্ত হইয়াছে)।

হাদীছের গ্রন্থাবলী ঃ (১৩) সহীহ আল-বুখারী, কলিকাতা সংস্করণ, ১খ. ও ২খ.; (১৪) সহীহ মুসলিম, দেওবন্দ সং, ২খ.; (১৫) সুনান আবী দাউদ, কলিকাতা সং, ২খ.; (১৬) জামে আত-তিরমিযী, দিল্লী সং, বাংলা অনু., বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সং; (১৭) আল-মুজতাবা মিন সুনান আন নাসাঈ, দেওবন্দ সং; (১৮) সুনান ইব্ন মাজা, বৈরূত সং, ফুআদ আবদুল বাকী সম্পা.; (১৯) আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ, বায়তুল আফকার আদ-দুওয়ালিয়া, রিয়াদ ১৪১৯/১৯৯৮ (৬ খণ্ড একত্রে); (২০) আল-মুজামুল মাফাহ্রিস লি-আলফাজিল হাদীছ আন-নাবাবী (স), ৮ খণ্ডে সমাপ্ত।

ইসলামের ইতিহাস ও অন্যান্য ঃ (২১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল ফিক্র আল-আরাবী, বৈরূত তা.বি., ১খ. ও ২খ.; (২২) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ১ম সং, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭, ১খ.; (২৩) ইব্ন সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, দারু সাদির, বৈরূত তা.বি.; (২৪) ইব্ন জারীর তাবারী, তারীখুল উমাম ওয়াল-মুলূক, বৈরূত তা.বি., ১খ.; (২৫) ইব্ন আসাকির, তাহ্যীব তারীখ দিমাশ্ক আল-কাবীর, বৈরূত সং, ৫খ. ও ৬খ.; (২৬) ছা'আলিবী, কাসাসুল আম্বিয়া (আল-মুসাম্মা বিহি আরাইসুল মাজালিস), তা.বি.; (২৭) মালিক গোলাম আলী এণ্ড সন্স লিঃ, আনওয়ারে আম্বিয়া, ৫ম সং, লাহোর-হায়দরাবাদ-করাচী ১৯৮৫ খৃ.; (২৮) হিফজুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন (উর্দূ), ৪র্থ সং, দিল্লী ১৪০০/১৯৮০, ২খ.; (২৯) মুহাম্মাদ জামীল আহ্মাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, লাহোর তা.বি., ৩খ.; (৩০) সায়্যিদ সুলায়মান নাদবী, আরদুল কুরআন, কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি., ২খ.; (৩১) আবদুর রহমান আল-জাযীরী, কিতাবুল ফিক্হ আলাল-মাযাহিবিল আরবা'আ, বৈরূত তা.বি., ৫খ.; (৩২) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৮খ. (সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীর সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠা নম্বর নিবন্ধগর্ভে উক্ত হইয়াছে)।

পাশ্চাত্য উৎস ঃ (৩৩) বাংলা বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি; (৩৪) Collier's Encyclopaedia, vol. 21; (৩৫) Ency. Britannica, 1962, vol. 13 and 20; (৩৬) Ency. of Religion and Ethics, vol. 2, New York.

মুহাম্মদ মূসা

সুলায়মান (আ) ও সাবার রাণী বিলকীস প্রসংগ

বিলকীসের বংশ পরিচয় ঃ তাঁহার মূল নাম ছিল 'বালকামাহ' এবং ডাকনাম ছিল "বিলকীস"। তাঁহার বংশপরিচয়ের ক্ষেত্রে কয়েকটি বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

বালকামাহ বিন্‌ত আনশারাহ ইবনিল হারিছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজাব ইব্‌ন ইয়ারব ইব্‌ন কাহতান (ইবনুল আছীর ও আল-কামিল, ১খ, ১৭৬)।

ভিন্নমতে, বালকামাহ বিন্‌তিল হুদহাদ (তাহার নাম আনশারাহ) ইব্‌ন তুববা ইব্‌ন বিল আদগার ইব্‌ন তুব্বা' যিল মানার ইব্‌ন তুব্বা' আর-রাইশ (ইবনুল আছীর, ১খ, ১৭৬)।

অথবা বিলকীস বিন্‌তু সীরাহ (হুদহাদ রাহিল) ইব্‌ন যিজাদন ইব্‌ন সায়রাহ ইব্‌ন হারছ ইব্‌ন কায়স ইব্‌ন সায়ফী ইব্‌ন সাবা ইব্‌ন ইয়াশজাব ইব্‌ন ইয়ারুব ইব্‌ন কাহতান (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, ২০)।

হাবশার পুরাতন অধিবাসীরা তাঁহার নাম 'মাকিদাহ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা আরো দাবি করিয়া থাকেন যে, তাহাদের পুরাতন রাজবংশ সুলায়মান (আ) ও রাণী 'মাকিদাহ'-এর বংশধর ('আফীফ তাববারাহ, মা'আল আম্বিয়া ফি'ল কুরআন, পৃ. ২৯০)।

অনেক ঐতিহাসিক এই মর্মে মত পেশ করিয়াছেন যে, বিলকীসের মাতা ছিল জিন্ন সম্রাটের কন্যা। তাঁহার নাম ছিল 'রাওয়াহ বিন্‌ত সুকার' (ইবনুল আছীর, ১খ, ১৭৬) অথবা 'রায়হানাহ বিন্‌ত সাকান' (ইব্‌ন কাছীর, ২খ, ২০)। ইব্‌ন কাছীরের মতে ইহা দুর্বল বর্ণনা। তাঁহার পিতা সেই সময়ে মনুষ্য সমাজে উপযুক্ত পাত্রী না পাইয়া জিন্ন জাতির মধ্য হইতে এই নারীকে বিবাহ করিয়াছিল। ইহা একটি উপাখ্যান মাত্র। ইমাম ছা'লাবী আবূ হুরায়রা (রা)-এর সূত্রে একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছে, যাহার ভাষ্য এইরকম ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحد ابوى بلقيس جنيا .

"নবী (স) ইরশাদ করিয়াছেন, "বিলকীসের মাতা-পিতার মধ্যে একজন ছিল জিন্ন" (আল-বিদায়া, ২খ, ২০)। অবশ্য এই হাদীছের সনদ দুর্বল। বিলকীসের পিতা কিভাবে জিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ধান পাইল সে সম্পর্কেও কিংবদন্তীমূলক গল্প রহিয়াছে (দ্র. ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ১৭৭)। তবে এই জাতীয় ঘটনা এবং গল্পের সাথে বাস্তবতার আদৌ কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন আল্লামা ইবনুল আছীর (আল-কামিল, ১খ, ১৭৭)।

হুদহুদ পাখির মাধ্যমে সুলায়মান (আ) বিলকীস সম্পর্কে অবগত হন। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান (আ)-কে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন। মানুষ, জিন্ন, পাখি সকলেই তাঁহার সৈন্যবাহিনীর অন্তর্গত ছিল। তিনি পাখীদের কথাবার্তা বুঝিতে পারিতেন। একদা এক যুদ্ধের সফরে সুলায়মান (আ) এবং তাঁহার বাহিনীর পানির প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হুদহুদ পাখী বলিতে পারে মাটির নীচে কাছে অথবা দূরে পানি আছে কিনা। তাই এই

সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য সুলায়মান (আ) হুদহুদ পাখীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাহাকে পাওয়া গেল না। এই হুদহুদ অত্যন্ত সুদর্শন পাখী। তাহার মাথার উপর চমকপ্রদ ঝুঁটি রহিয়াছে। হুদহুদকে ইংরেজীতে বলা হয় Hoopoe, ইহার ঠোঁট একটু লম্বা। ডানা দুইখানা অত্যন্ত সুন্দর ও মার্জিত।

এই হুদহুদ পাখীকে দেখিতে না পাইয়া সুলায়মান (আ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইলেন এবং ঘোষণা দিয়া দিলেন যে, অনুপস্থিতির উপযুক্ত কারণ দর্শাইতে না পারিলে হুদহুদকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হইবে। এই বর্ণনা আল-কুরআনে এইভাবে আসিয়াছে ঃ

(وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِيْنَ. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطَانٍ مُّبِيْنٍ)

"সুলায়মান বিহংগদলের সন্ধান লইল এবং বলিল, ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখিতেছি না যে! সে অনুপস্থিত না কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শাইলে আমি অবশ্যই উহাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবাহ করিব" (২৭ ঃ ২০-২১)।

অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন, আমি তাহা অবগত হইয়াছি। আমি সাবা হইতে এক সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।" আল-কুরআনে এইভাবে বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَأٍ بِنَبَأٍ يَّقِيْنٍ. إِنِّيْ وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَاُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ. وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَيَهْتَدُوْنَ. اَلاَّ يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْأَ فِي السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ. اَللّٰهُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ.

"অনতিবিলম্বে হুদহুদ আসিয়া পড়িল এবং বলিল, আপনি যাহা অবগত নহেন আমি তাহা অবগত হইয়াছি এবং 'সাবা' হইতে সুনিশ্চিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছি। আমি তো এক নারীকে দেখিলাম উহাদিগের উপর রাজত্ব করিতেছে, তাহাকে দেওয়া হইয়াছে সকল কিছু এবং তাহার আছে এক বিরাট সিংহাসন। আমি তাহাকে এবং তাহার সম্প্রদায়কে দেখিলাম তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করিতেছে, শয়তান উহাদিগের কার্যাবলী উহাদিগের নিকট শোভন করিয়াছে এবং উহাদিগকে সৎপথ হইতে নিবৃত্ত করিয়াছে; এই জন্য যে, উহারা যেন সিজদা না করে আল্লাহকে যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর লুক্কায়িত বস্তুকে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন, যাহা তোমরা গোপন কর এবং যাহা তোমরা ব্যক্ত কর। 'আল্লাহ', তিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নাই, তিনি মহান আরশের অধিপতি" (২৭ ঃ ২২-২৫)।

রাণী বিলকীস যে সিংহাসনে বসিত তাহা ছিল কারুকার্য খচিত খাটের মত যাহা মূল্যবান স্বর্ণ দ্বারা তৈরী। ইহার ফাঁকে ফাঁকে ছিল হীরা, চুনি-পান্নার মত মূল্যবান পাথর (ইব্‌নুল আছীর, ১খ., ১৭৯)।

বিলকীসের নিকট সুলায়মান (আ)-এর পত্র প্রেরণ

হুদহুদ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যকে পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে এবং তাওহীদের দাওয়াত সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে সুলায়মান (আ) সাবার রাণী বিলকীসের নিকট একখানা পত্র প্রেরণের মনস্থ করিলেন। তিনি চিঠিখানা লিখিলেন। এই চিঠির ভাষা ছিল এই ঃ

إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ .

"ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে এবং ইহা করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। 'অহমিকা বশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও" (২৭ ঃ ৩০-৩১)।

সংক্ষিপ্ত ভাষায় ব্যাপকভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ইহা একটি উত্তম পত্র (ফি যিলালিল কুরআন, ৫খ, ২৬৪০-২৬৪৪)। এই পত্রসহ সুলায়মান (আ) হুদহুদ পাখিকে রাণী বিলকীসের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং নির্দেশ দিলেন ঃ

قَالَ سَنَنْظُرُ اَصَدَقْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ اِذْهَبْ بِكِتَابِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُوْنَ .

"সুলায়মান বলিল, আমি দেখিব তুমি কি সত্য বলিয়াছ না তুমি মিথ্যাবাদী? তুমি যাও আমার এই পত্র লইয়া এবং ইহা তাহাদিগের নিকট অর্পণ কর; অতঃপর তাহাদিগের নিকট হইতে সরিয়া থাকিও এবং লক্ষ্য করিও তাহাদিগের প্রতিক্রিয়া কি" (২৭ ঃ ২৭-২৮)।

যেহেতু 'হুদহুদ' সাবার রাণী বিলকীসের রাজ্য দেখিয়া আসিয়াছিল তাই সুলায়মান (আ) পত্র লইয়া তাহাকেই প্রেরণ করিলেন (মুহাম্মদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ১২৪)।

হুদহুদ পাখি পত্র লইয়া রাণী বিলকীসের নিকট হাযীর হইল এবং তাহার সামনে পত্রখানা রাখিয়া সুলায়মান (আ)-এর নির্দেশমত সরিয়া দাঁড়াইল। রাণী বিলকীস পত্রখানা পাঠ করিলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, ইহা কোন সাধারণ চিঠি নয় অথবা ইহা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং তাহাকে তাহার সকল সভাসদ ও রাজ্য সহকারে আত্মসমর্পণ করিতে বলা হইয়াছে (আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাববারাহ, পৃ. ২৯১)।

এই চিঠি পাইয়া বিলকীস পেরেশান হইয়া পড়িলেন এবং কাল বিলম্ব না করিয়া সভাসদদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন ঃ

قَالَتْ يَا اَيُّهَا الْمَلَاُ اِنِّىْ اُلْقِىَ اِلَىَّ كِتَابٌ كَرِيْمٌ اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ.

"সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমাকে এক সম্মানিত পত্র দেওয়া হইয়াছে। ইহা সুলায়মানের নিকট হইতে এবং ইহা করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে। অহমিকাবশে আমাকে অমান্য করিও না এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হও" (২৭ ঃ ২৯-৩১)।

সুলায়মান (আ)-এর চিঠি পাইয়া বিলকীস সভাসদ ডাকিয়া পরামর্শ করাকে জরুরী মনে করিলেন। কেননা ইহাকে তিনি বড় ধরনের দুর্ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করিলেন। মন্ত্রী পরিষদ ও বিশিষ্ট নাগরিকদিগকে উপস্থিত করিয়া তিনি বলিলেন ঃ

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ.

"সেই নারী বলিল, হে পারিষদবর্গ! আমার এই সমস্যায় তোমাদিগের অভিমত দাও। আমি যাহা সিদ্ধান্ত করি তাহা তো তোমাদিগের উপস্থিতিতেই করি" (২৭ ঃ ৩২)।

নেতৃবৃন্দ এবং পারিষদবর্গের ক্ষমতা ও সমর কৌশলের উপর তাহাদিগের অটুট আস্থা ছিল। তাই তাহারা এই মত পেশ করিতে চাহিল যে, তাহারা সুলায়মান (আ)-এর বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রাণীকেই প্রদান করিতে হইবে। তাহারা বলিল ঃ

قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ.

"উহারা বলিল, আমরা তো শক্তিশালী ও কঠোর যোদ্ধা; তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষমতা আপনারই, কী আদেশ করিবেন তাহা আপনি ভাবিয়া দেখুন" (২৭ ঃ ৩৩)।

রাণী বিলকীস অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, বিচক্ষণ ও প্রত্যুৎপন্নামতি ছিলেন। তাই সভাসদদের পরামর্শে রাজি হইয়াই যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন না, বরং গভীর ধীশক্তির মাধ্যমে উপলব্ধি করিলেন যে, যুদ্ধ ঘোষণার অশুভ পরিণাম কি হইতে পারে (আল-বিদায়া, ২খ, ২১ ঃ মা'আল আম্বিয়া ফিল কুরআন, পৃ. ২৯২)। তাই তিনি যুদ্ধের ক্ষতিকর বিষয়সমূহ সভাষদের নিকট উপস্থাপন করিলেন এবং বলিলেন, যদি তাহারা আমাদের উপর বিজয়ী হয় তাহা হইলে তাহারা ধ্বংসযজ্ঞ চালাইবে এবং আমাদিগকে নিঃশেষ করিয়া দিবে।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ.

"সে বলিল, রাজা-রাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন উহাকে বিপর্যস্ত করিয়া দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদিগকে অপদস্থ করে; ইহারাও এইরূপই করিবে" (২৭ ঃ ৩৪)।

রাণী লোকদিগকে বলিল, "আমি বিপুল পরিমাণে উপঢৌকন পাঠাইয়া সুলায়মানকে পরীক্ষা করিতে চাহিতেছি। যদি তিনি দুনিয়ার সাধারণ কোন রাজা-বাদশাহ হইয়া থাকেন তাহা হইলে উপহার পাইয়া খুশী হইবেন এবং আনন্দচিত্তে তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যদি তিনি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি উপহার গ্রহণ করিবেন না। আর এই পরীক্ষার পরই

আমাদিগকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে" (ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ১৭৯)। কুরআনেও এই বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ.

"আমি তাহাদিগের নিকট উপঢৌকন পাঠাইতেছি, দেখি, দূতেরা কী লইয়া ফিরিয়া আসে" (২৭ ঃ ৩৫)।

রাণী বিলকীসের দূতেরা অতি মূল্যবান অঢেল সম্পত্তির বহর উপঢৌকন লইয়া সুলায়মান (আ)-এর রাজ্যের রাজধানী ফিলিস্তীনে যাইয়া উপস্থিত হইল। সুলায়মান (আ)-এর রাজশক্তি ও আড়ম্বর দেখিয়া তাহারা আশ্চর্য হইয়া গেল এবং আন্দাজ করিতে পারিল যে, এই তুলনায় 'সাবা রাজত্ব' তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। তাহারা বিলকীস কর্তৃক প্রেরিত উপঢৌকন সুলায়মান (আ)-এর নিকট পেশ করিল। এই উপঢৌকন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন, তোমরা কি আমাকে সম্পদ প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করিতে চাহিতেছ? অথচ মহান আল্লাহ আমাকে যাহা প্রদান করিয়াছেন তাহা পার্থিব সম্পদ হইতে অনেক মূল্যবান। আর তাহা হইতেছে নবুয়াতের মূল্যবান বস্তু (তাববারাহ, পৃ. ২৯৩)। কাজেই তোমরা তোমাদিগের উপহার সামগ্রী লইয়া ফিরিয়া যাও এবং যদি তোমরা আমার প্রতি ঈমান আনিয়া হিদায়াতের পথে আগমন না কর তাহা হইলে এমন বাহিনী লইয়া তোমাদিগের উপর হামলা করিব যাহার মোকাবিলা করিবার ক্ষমতা তোমাদিগের নাই। আর তোমাদিগকে অপদস্থ করিয়া 'সাবা' এলাকা হইতে বাহির করিয়া দিব।

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ. ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ.

"দূত সুলায়মানের নিকট আসিলে সুলায়মান বলিল, তোমরা কি আমাকে ধন-সম্পদ দিয়া সাহায্য করিতেছ? আল্লাহ আমাকে যাহা দিয়াছেন তাহা তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে উৎকৃষ্ট। অথচ তোমরা তোমাদিগের উপঢৌকন লইয়া উৎফুল্ল বোধ করিতেছ। উহাদিগের নিকট ফিরিয়া যাও, আমি অবশ্যই উহাদিগের বিরুদ্ধে লইয়া আসিব এমন এক সৈন্যবাহিনী যাহার মোকাবিলা করিবার শক্তি উহাদিগের নাই। আমি অবশ্যই উহাদিগকে তথা হইতে লাঞ্ছিতভাবে বহিষ্কার করিব এবং উহারা হইবে অপদস্থ" (২৭ ঃ ৩৬-৩৭)।

রাণী বিলকীসের দূতগণ ফিরিয়া আসিয়া তাহাকে সুলায়মান (আ)-এর বিস্তারিত সংবাদ প্রদান করিল। ইহা শ্রবণ করিয়া বিলকীস অনুধাবন করিতে পারিলেন যে, তাহাকে আনুগত্য স্বীকার করিয়া সুলায়মান (আ)-এর দরবারে যাইতে হইবে। তাই তিনি অতি শান-শওকতের সহিত ও অসংখ্য অনুসারী লইয়া য়ামান হইতে ফিলিস্তীনের পথে গমন করিল (আল-বিদায়া, ২খ, ২২)।

সুলায়মান (আ) যখন অবগত হইলেন যে, বিলকীস তাহার অসংখ্য অনুসারী সহকারে আনুগত্য প্রকাশ করিবার জন্য আগমন করিতেছেন তখন তিনি চিন্তা করিলেন যে, "বিলকীসকে এমন কোন

অলৌকিক বিষয় দেখাইতে হইবে যাহাতে নবুওয়াতের প্রমাণ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় এবং আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত কুদরতও প্রকাশ পায়। তাই তিনি তাঁহার চারদিকে উপস্থিত জিন্নদেরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তাহারা আমার নিকটে আসিবার পূর্বেই কে বিলকীসের সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিতে পারিবে? সুলায়মান আরো বলিলেন,

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِيْ مُسْلِمِيْنَ.

"হে আমার পারিষদবর্গ! তাহারা আত্মসমর্পণ করিয়া আমার নিকট আসিবার পূর্বে তোমাদিগের মধ্যে কে তাহার সিংহাসন আমার নিকট লইয়া আসিবে" (২৭ ঃ ৩৮)।

একটি শক্তিশালী বিচক্ষণ জিন্ন বলিল ঃ আপনি এই জায়গা হইতে উঠিবার পূর্বেই আমি উহা আনিয়া উপস্থিত করিব।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا أٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّيْ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِيْنٌ.

"এক শক্তিশালী জিন্ন বলিল, আপনি আপনার স্থান হইতে উঠিবার পূর্বে আমি উহা আনিয়া দিব এবং এই ব্যাপারে আমি অবশ্যই ক্ষমতাবান, বিশ্বস্ত" (২৭ ঃ ৩৯)। সুলায়মান (আ) আরও দ্রুত সিংহাসন আনাইতে চাহেন। তখন

قَالَ الَّذِيْ عِنْدَهٗ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا أٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ أَنْ يَّرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ.

"কিতাবের জ্ঞান যাহার ছিল সে বলিল, 'আপনি চক্ষুর পলক ফেলিবার পূর্বেই আমি উহা আপনাকে আনিয়া দিব" (২৭ ঃ ৪০)।

যাহার কিতাবের জ্ঞান ছিল সেই ব্যক্তি কে? এই প্রসংগে কয়েকটি মতামত রহিয়াছে। (ক) তিনি হইলেন আসিফ ইবন বারখিয়া, সুলায়মান (আ)-এর মন্ত্রী এবং খালাত ভাই (ইবনুল আছীর, ১খ, ১৭০)। (খ) জিন্নের মধ্যকার এক মু'মিন ব্যক্তি যিনি আল্লাহর মহান নাম (اسم الله الأعظم) জানিতেন (ইব্ন কাছীর, ২খ, ২২)। (গ) ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, তিনি সুলায়মান (আ)-এর অত্যন্ত বিশ্বস্ত সচিব ছিলেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ১২৯)। (ঘ) দাহ্হাক, কাতাদা ও মুজাহিদ বলিয়াছেন, তিনি জিন্ন নহেন বরং মানব ছিলেন (হিফজুর রহমান, ২খ, ১৪৭)।

হযরত সুলায়মান (আ) যখন বিলকীসের সিংহাসন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত দেখিতে পাইলেন তখন আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাঁহার মাথা নিচু হইয়া আসিল এবং তিনি বলিলেন,

هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ لِيَبْلُوَنِيْ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّيْ غَنِيٌّ كَرِيْمٌ.

"ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ, যাহাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করিতে পারেন, আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তাহা করে নিজের কল্যাণের জন্য এবং যে অকৃতজ্ঞ সে জানিয়া রাখুক যে, আমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, মহানুভব" (২৭ ঃ ৪০)।

সুলায়মান (আ)-এর দরবারে বিলকীস

বিলকীস সুলায়মান (আ)-এর দরবারে প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি নির্দেশ প্রদান করিলেন যে, 'সাবা' হইতে আনীত সিংহাসনের আকৃতি যেন পরিবর্তন করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে বিলকীসকে পরীক্ষা করা যায়, সে কি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনিবার মানসিকতা অর্জন করিয়াছে!

قَالَ نَكِّرُوْا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ اَتَهْتَدِىْ اَمْ تَكُوْنُ مِنَ الَّذِيْنَ لاَ يَهْتَدُوْنَ.

"সে বলিল, তাহার সিংহাসনের আকৃতি বদলাইয়া দাও, দেখি সে সঠিক দিশা পাইতেছে, না সে বিভ্রান্তদিগের শামিল হয়" (২৭ ঃ ৪১)।

বিলকীস যখন উপস্থিত হইলেন সর্বপ্রথম তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে যে, আপনার সিংহাসন কি এইরূপই?

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَاَنَّهُ هُوَ.

"সে যখন আসিল তখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমার সিংহাসন কি এইরূপই? সে বলিল, ইহা তো যেন উহাই" (২৭ ঃ ৪২)।

সুলায়মান (আ) নবী হিসাবে যে অলৌকিক শক্তির অধিকারী বিলকীস তাহা ইতোপূর্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন এবং ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, তিনি দুনিয়ার কোন সাধারণ বাদশাহ নহেন, বরং তাঁহার মূল পরিচয় তিনি আল্লাহর নবী। তাই পূর্ব হইতেই আনুগত্য স্বীকার করিবার মানসিকতা বিলকীসের মধ্যে ছিল। তিনি বলিলেন,

وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ.

"আমাদিগকে ইতোপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হইয়াছে এবং আমরা আত্মসমর্পণও করিয়াছি" (২৭ ঃ ৪২)।

এই পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ দ্বারা অনুমেয় যে, বিলকীস বুঝিতে পারেন নাই তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে হইবে। তিনি বুঝিয়াছিলেন সুলায়মান (আ)-এর নিকট তাহার আত্মসমার্পণ করিলেই চলিবে। সুলায়মান (আ)-এ চিঠিতে উল্লিখিত مسلمين শব্দের অর্থ তিনি মনে করিয়াছেন আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য, ইসলাম গ্রহণ করা নয় (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ১৩১)। কুরআনের এই আয়াত দ্বারাও উহা বুঝা যায় ঃ

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِيْنَ.

"আল্লাহর পরিবর্তে সে যাহার পূজা করিত তাহাই তাহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিল; সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত" (২৭ ঃ ৪৩)।

বিলকীসের ইসলাম গ্রহণ

নির্মাণ শিল্পের অভিনব কারুকার্য বিলকীসকে দেখাইবার জন্য সুলায়মান (আ) স্বচ্ছ স্ফটিক-মণ্ডিত মেঝে সম্বলিত এক প্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করিলেন। ইহার নিচে সামুদ্রিক প্রাণী ও

মাছের ছবি ছিল যাহার কারণে মনে হইতেছিল ইহা প্রকৃত জলাশয়। এই ব্যতিক্রমধর্মী প্রাসাদের সম্মুখ কামরায় সুলায়মান (আ) এক আরাম কেদারায় উপবেশন করিলেন এবং বিলকীসকে তথায় প্রবেশ করিতে বলিলেন। প্রবেশ করিতে গিয়া জলাশয় সদৃশ মেঝে অবলোকন করিয়া তিনি হতবিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং শংকিত হইলেন। কাজেই তিনি তাঁহার উভয় পায়ের নিম্নাংশ অনাবৃত করিয়া কাপড় হাঁটু পর্যন্ত উঠাইলেন যাহাতে পোশাক পানিতে ভিজিয়া না যায়। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিবার জন্য সুলায়মান (আ) বলিলেন, "ইহা স্বচ্ছ কাঁচের তৈরী প্রাসাদ"। বিলকীস ইতোপূর্বে এত চমৎকার প্রাসাদ আর দেখেন নাই (হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ২খ, ১৪৯-১৫০)। সুলায়মান (আ)-এর পক্ষ হইতে এই অসাধারণ সম্মান প্রদানের আয়োজন প্রত্যক্ষ করিয়া বিলকীসের প্রকৃত বোধোদয় হইল এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সুলায়মান আসলেই আল্লাহ্র নবী। তাই তিনি তাহার ভুল স্বীকার করিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া আল্লাহ্র অনুগত হইবার ঘোষণা প্রদান করিলেন (আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাব্বারাহ, পৃ. ২৯৫)। আল-কুরআনেও এই বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيْرَ قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"তাহাকে বলা হইল, এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে উহা দেখিল তখন সে উহাকে এক গভীর জলাশয় মনে করিল এবং সে তাহার উভয় 'সাক' অনাবৃত করিল। সুলায়মান বলিল, ইহা তো স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত প্রাসাদ। সেই নারী বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি তো নিজের প্রতি জুলুম করিয়াছিলাম, আমি সুলায়মানের সহিত জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করিলাম" (২৭ ঃ ৪৪)।

সুলায়মান (আ)-এর সহিত বিলকীসের বিবাহ

বিলকীসের ইসলাম গ্রহণ করিবার পর সুলায়মান (আ) তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন কিনা এই প্রসংগে কুরআন অথবা সহীহ হাদীছে পক্ষে অথবা বিপক্ষে কোন বক্তব্য পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে এই সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য রহিয়াছে যাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

(ক) ইসলাম গ্রহণের পর সুলায়মান (আ) তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে সাংঘাতিক ভালোবাসিতেন। তিনি তাঁহাকে য়ামানের রাজত্ব ফেরত দিয়াছিলেন এবং প্রতি মাসে একবার করিয়া সুলায়মান (আ) তাহার নিকট বেড়াইতে যাইতেন, প্রত্যেকবারে তথায় তিন দিন অবস্থান করিতেন (ইব্ন আছীর ১খ, ১৮১)।

(খ) বলা হইয়া থাকে যে, সুলায়মান (আ) তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন পুরুষ ব্যক্তিকে বিবাহ করিবার নির্দেশ দেন, কিন্তু তিনি তাহা অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, হামাদানের রাজা যদি সম্মত হয় তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত। সুলায়মান (আ) হামাদানের রাজার

সাথে তাঁহার বিবাহের ব্যবস্থা করেন এবং য়ামানের রাজত্ব ফেরত দেন। সাথে সাথে য়ামানের জিন্নদেরকে তাঁহার আনুগত্য করিতে নির্দেশ দেন (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, ২৩)।

সুলায়মান (আ)-এর রাজত্বের সময়কাল ও ইন্তিকাল

রাজত্বের সময়সীমা ঃ Old Testament -এর বর্ণনা অনুযায়ী জানা যায় যে, সুলায়মান (আ) ৪০ বৎসর যাবত ফিলিস্তীনে রাজত্ব পরিচালনা করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বনু ইসরাঈলের সকল গ্রুপের রাজা ছিলেন (১ম রাজাবলী, ১১ ঃ ৪২-৪৩; দ্বিতীয় বিবরণ, ৯ ঃ ৩০-৩১)।

ইমাম যুহরী (র)-এর বর্ণনামতে সুলায়মান (আ)-এর বয়স হইয়াছিল ৫২ বৎসর এবং তিনি রাজত্ব পরিচালনা করিয়াছিলেন ৪০ বৎসর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ৩০)।

ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর এক বর্ণনা মতে সুলায়মান (আ)-এর রাজত্ব ছিল মাত্র ২০ বৎসরের (আল-বিদায়া, ২খ, ৩০)।

ইন্তিকাল ঃ সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকাল সম্পর্কে কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা আসিয়াছে।

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلاَّ دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ.

"যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটাইলাম তখন জিন্নদিগকে তাহার মৃত্যু বিষয় জানাইল কেবল মাটির পোকা যাহা সুলায়মানের লাঠি খাইতেছিল। যখন সুলায়মান পড়িয়া গেল তখন জিন্নেরা বুঝিতে পারিল যে, উহারা যদি অদৃশ্য বিষয়ে অবগত থাকিত তাহা হইলে উহারা লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তিতে আবদ্ধ থাকিত না" (৩৪ ঃ ১৪)।

সুলায়মান (আ) মাঝেমধ্যে দীর্ঘ সময়ের জন্য ইবাদতের নিমিত্তে একাকী বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করিতেন, এমনকি মাঝে-মধ্যে এক মাস, দুই মাস বা এক বৎসর, দুই বৎসর পর্যন্তও এইভাবে কাটাইয়া দিতেন। তিনি তাঁহার সহিত খাদ্যদ্রব্য এবং পানীয় লইয়া যাইতেন। একদা তিনি তাঁহার লাঠিতে ভর করিয়া সালাত আদায় করিতেছিলেন, এমতাবস্থায় তাঁহার ইন্তিকাল হইল। তিনি ইন্তিকালের পূর্বে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করিলেন, জিন্নরা যেন তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে জানিতে না পারে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, জিন্নরা অদৃশ্যের সংবাদ জানে না (ইব্‌ন কাছীর, ১খ., ১৭৬)। সুলায়মান (আ)-এর মৃত্যুর এক বৎসর পর মাটির পোকা তাঁহার লাঠি খাইয়া ফেলিবার পর যখন তিনি পড়িয়া গেলেন কেবল তখনই জিন্নরা তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে জানিতে পারিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ৩০; আয-যামাখশারী, ৩খ., ৫৭৩)।

কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, জিন্নরা যেখানে কাজ করিতেছিল সুলায়মান (আ) তথায় তাঁহার লাঠি দাঁড় করাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার মৃত্যু হইয়া যায় এবং মাটির পোকা এই লাঠি খাইয়া ফেলিবার পরই জিন্নরা তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে জানিতে পারে (তাব্বারাহ, পৃ. ২৯৬)। তবে জিন্ন ব্যতীত অন্য সবাই তাঁহার মৃত্যু সম্পর্কে পূর্বেই জানিতে পারে এবং তাঁহাকে দাফনও করা হয় আর তাঁহার পুত্র রাজত্বের দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছিল (তাব্বারাহ, পৃ. ২৯৬)।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর সন্তান-সন্তুতি

তাওরাতের কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে যে, সুলায়মান (আ)-এর সাত শত স্ত্রী এবং তিন শত দাসী ছিল (১ম রাজাবলী, ১১ ঃ ০১)। তবে সহীহ বুখারী শরীফের বর্ণনামতে সুলায়মান (আ)-এর স্ত্রীর সংখ্যা সত্তরজন ছিল। হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে, নবী করীম (স) বলিয়াছিলেন ঃ

(قال سليمان بن داؤد لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة منهن تلد مجاهدا فى سبيل الله)

"সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) বলিলেন, এই রাত্রে আমি সত্তরজন স্ত্রীর কাছে গমন করিব এবং প্রত্যেকে একজন করিয়া আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহিদ জন্ম দিবে" (ফাতহুল বারী, কিতাবুল আম্বিয়া)।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর সন্তানদিগের সর্বমোট সংখ্যা জানা যায় না। তবে তাওরাতের বিভিন্ন বর্ণনায় তাঁহার তিন সন্তানের নাম পরিলক্ষিত হয় ঃ

(ক) রেহবআম "رحبعام" "Rehoboam"

(খ) তাফাত "طافت"

(গ) যাসমাত "بسمت" (২য় বিবরণ, ৩ঃ১০)।

সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকালের পর 'রেহবিয়াম' ক্ষমতায় সমাসীন হইয়াছিলেন এবং ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপর তদানীন্তন মিসরের ফিরআউন 'মিসাক' ফিলিস্তীন দখল করিয়া নেয় এবং রেহবিয়ামের রাজত্বের অবসান ঘটে (১ম রাজাবলী, ১৪ ঃ ১৫; আরও দ্র. নিবন্ধের সুলায়মান (আ)-এর বৈবাহিক জীবন ও সন্তান-সন্তুতি অনুচ্ছেদ)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআন ঃ উল্লিখিত বিভিন্ন সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াত যাহার বর্ণনা ইতোপূর্বে দেওয়া হইয়াছে; (২) আল কুরআনুল করীম (টীকাসহ বঙ্গানুবাদ), ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ.; (৩) Old Testament, English Translation, New World Translation of Holy Scriptures, New York, Revised 1984; (৪) মুহাম্মাদ ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল-মুজামুল মুফাহরাস লি-আলফাযিল কুরআন, কায়রো, ১৯৯১ খৃ.; (৫) তাব্বারাহ আফীফ আবদুল ফাত্তাহ, মা'য়াল আম্বিয়া ফিল কুরআন, বৈরূত, ১৯৮৯ খৃ.; (৬) ইবনুল আছীর, আল কামিল ফিত তারীখ, বৈরূত, ১৯৮৭ খৃ.; (৭) মুহাম্মাদ জামিল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, লাহোর, তা.বি.; (৮) সীউহারবী, হিফজুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, দিল্লী ১৯৮০ খৃ.; (৯) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, হালাব, দারুর রশীদ, তা.বি.; (১০) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, কায়রো; (১১) নদভী, সায়্যিদ সুলায়মান, আরদুল কুরআন, কুতুবখানা রশীদিয়া তা.বি.; (১২) বা'লাবাক্কী, মুনীর, আল-মাওরিয়া, বৈরূত, ১৯৮৯ খৃ.; (১৩) সায়্যিদ কুতুব, ফি যিলালিল কুরআন, কায়রো ১৪১৪ হি.; (১৪) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, কায়রো ১৪০৮ হি.; (১৫) সাবুনী, মুহাম্মাদ আলী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, বৈরূত, ১৪১৩ হি.; (১৬) আয্-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত, ১৪০৭ খৃ.।

মুহাম্মাদ আবদুর রহমান

২৭

হযরত দানিয়াল (আ)

حضرت دنيال عليه السلام

হযরত দানিয়াল (আ)

পরিচয় ঃ বাইবেলের বর্ণনামতে দানিয়াল (আ) বনূ ইসরাঈলের একজন নবী। পবিত্র ভূমি জেরুসালেমে তাঁহার জন্ম। তিনি ইয়াহূদী জাতির চারজন শীর্ষস্থানীয় নবীর অন্তর্ভুক্ত। তাঁহার প্রতি একখানা সহীফা অবতীর্ণ হয়, যাহা The Book of Daniyel (দানিয়েলের পুস্তক) নামে Old Testament (পুরাতন নিয়ম)-এর অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। পুস্তকখানি বাইবেলে The Book of the Prophet Ezekiel (যিহিস্কেল ভাববাদীর পুস্তক)-এর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, বনূ ইসরাঈলের ধারণামতে দানিয়ালের সহীফাখানি উহার পর অবতীর্ণ হয়। বিভিন্ন বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, তিনি নবী ছিলেন এবং একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতাও ছিলেন। তবে কেহ কেহ এই নামের দুই ব্যক্তির অস্তিত্বের কথা বলিয়াছেন। একজন নবী দানিয়াল (আ) এবং অপরজন কাশ্‌ফ (দিব্যদর্শন)-এর অধিকারী ও স্বপ্নের ব্যাখ্যাদাতা। তবে বাইবেলের বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, উভয়ে একই ব্যক্তি এবং উভয়ে এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। তবে তাঁহার দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায় না। কুরআন কারীম ও হাদীছ শরীফে সুস্পষ্টরূপে দানিয়াল (আ)-এর নাম উল্লিখিত হয় নাই। তাঁহার জীবনচরিত জানার জন্য বাইবেল ও মুসলিম ঐতিহাসিকদের রচনাবলীর উপর নির্ভর করিতে হয়।

সময়কাল ঃ হযরত দানিয়াল (আ)-এর সময়কাল সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনামতে তাঁহার সময়কাল ছিল খৃ. পূ. ৫৮০-৫০০ সাল (মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়া-ই কুরআন, ৩খ, ৫৫৬)। এই বর্ণনা অনুযায়ী তিনি ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তবে এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণ একমত যে, বুখ্‌ত নাস্‌সার (খৃ.পূ. ৬০৪-৫৬১) জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া ইয়াহূদীদিগকে বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া আসেন তন্মধ্যে দানিয়াল (আ)-ও ছিলেন। কিন্তু কত সালে তিনি উহা আক্রমণ করেন সে ব্যাপারে দুইটি মত পাওয়া যায়। এক বর্ণনামতে খৃ. পূ. ৬০৬ সালে (আনওয়ার-ই আম্বিয়া, পৃ.৩১৩)। এই বর্ণনাটি সঠিক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। কারণ তাঁহার রাজত্বকাল শুরুই হয় খৃ.পূ. ৬০৪ সাল হইতে (ফারদীনান্দ তূতিল, আল-মুনজিদ ফিল-আদাব ওয়াল-উলূম, পৃ. ৬৬)।

বাদশাহর অনুকম্পা লাভ

বাইবেলের বর্ণনামতে হযরত দানিয়াল (আ)-কে আল্লাহ তায়ালা জ্ঞান, বিবেক, বিদ্যা-বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কর্মতৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে দেহ সৌষ্ঠব ও বাহ্যিক সৌন্দর্যও দান করিয়াছিলেন। তাঁহার

অপর তিন সঙ্গীও তদ্রূপ ছিলেন। এই কারণে বাদশাহ তাঁহাদের প্রতি সদয় হন। বাদশাহ তাঁহাদের জন্য প্রতি দিন শাহী খাবার বরাদ্দ করেন এবং তাহাদিগকে তাহার খিদমতে হাজির থাকিবার নির্দেশ দেন (আনওয়ার-ই আম্বিয়া, পৃ. ৩১৪; বাইবেল, দানিয়াল পুস্তক, ১ ঃ ১৭)।

অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ও উহা হইতে পরিত্রাণ লাভ

হযরত দানিয়াল (আ) ছিলেন অন্যান্য নবীগণের মতই খাঁটি তাওহীদবাদী। মুশরিকদের শত হুমকি ধমকি ও নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি এক আল্লাহর উপাসনা পরিত্যাগ করেন নাই। বুখ্ত নাস্সার একবার একটি স্বর্ণের মূর্তি বানাইয়া উহা শহরে স্থাপন করেন এবং রাজ্যস্থ সকলকে উহার উপাসনা করিবার নির্দেশ দেন। অন্যান্য সকলে বাদশাহর নির্দেশ মানিলেও দানিয়াল (আ) ও তাঁহার তিন বন্ধু উহার উপাসনা করিতে অস্বীকার করিলেন। বাবিলবাসিগণ বাদশাহর নিকট তাহাদের সম্পর্কে অভিযোগ করে। বাদশাহ তাহাদিগকে স্বীয় দরবারে ডাকাইয়া ধমকাইয়া বলিলেন, তোমরা আমার নির্দেশ পালন করিলে না কেন? তোমরা প্রস্তুত হও, যখন বাদ্য বাজিবে তখন উক্ত মূর্তিকে সিজদা করিবে, অন্যথায় তোমাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। তাঁহারা উত্তর দিলেন, যে আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি আমাদিগকে উক্ত অগ্নিকুণ্ড হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম। আর তিনিই আমাদিগকে আপনার হাত হইতে রক্ষা করিতে পারেন। আমরা কখনও আপনার বানানো মূর্তির উপাসনা করিব না। বাদশাহ ইহা শুনিয়া খুবই ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেন এবং তাহাদিগকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আল্লাহ্র কুদরতে অগ্নি তাঁহাদের কোনই ক্ষতি করিতে পারিল না, বরং যাহারা তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহারাই দগ্ধীভূত হইয়া নিহত হইল। বাদশাহ ইহা দেখিয়া তাহাদিগকে খুবই সম্মান দান করিলেন, রাষ্ট্রের উচ্চ পদে সমাসীন করিলেন এবং ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, ইয়াহূদীদের উপাস্য সম্পর্কে কেহ কোনরূপ খারাপ মন্তব্য করিতে পারিবে না। করিলে তাহাকে খণ্ড-বিখণ্ড করা হইবে এবং তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা হইবে (দানিয়াল পুস্তক, ৩ ঃ ১-৩০)।

বাবিলে সমস্ত বিদ্বান লোকদের প্রধান অধিপতি নিযুক্ত

আল্লাহ তা'আলা হযরত দানিয়াল (আ)-কে অশেষ মেধা ও স্বপ্ন বিশ্লেষণের বিশেষ জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। সম্রাট বুখত নাস্সার একবার ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন দেখিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। অতঃপর স্বপ্নটি ঠিক কি দেখিয়াছিলেন তাহাও ভুলিয়া গেলেন। ফলে তাহার উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা আরও বাড়িয়া গেল। তিনি মন্ত্রবেত্তা, গণক, মায়াবী ও কলদীয়গণকে ডাকাইয়া উক্ত স্বপ্ন ও উহার তাৎপর্য বিবৃত করিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু কেহই উহার মর্ম উদ্ধার তো দূরের কথা, মূল স্বপ্নটি কি ছিল তাহাও বর্ণনা করিতে পারিলনা। বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্বান লোকদের সকলকে হত্যা করিবার নির্দেশ দিলেন। রাজ-সেনাপতি অরিয়োক-এর উপর ইহার দায়িত্ব পড়িল। এই ঘোষণা প্রচারিত

হইবার পর লোকজন দানিয়াল (আ) ও তাঁহার সহচরদিগকে হত্যা করিবার জন্য অন্বেষণ করিতে লাগিল। দানিয়াল (আ) ইহা জানিতে পারিয়া রাত্রি বেলা আল্লাহ্‌র নিকট কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করিলেন। আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে তাঁহাকে উহা জানাইয়া দেওয়া হইল। অতঃপর দানিয়াল (আ) অরিয়োকের সঙ্গে বাদশাহ্‌র নিকট গমন করত স্বপ্ন ও উহার মর্ম সবিস্তারে জানাইয়া দিলেন। সম্রাট দানিয়াল (আ)-কে খুবই সম্মান করিলেন, তাঁহাকে অনেক মূল্যবান উপহার দিলেন এবং তাঁহাকে বাবিলের সমস্ত প্রদেশের কর্তা ও বাবিলস্থ সমুদয় বিদ্বান লোকের প্রধান অধিপতি নিযুক্ত করিলেন (বাইবেল, দানিয়ালের পুস্তক, ২ ঃ ১-৪৮)।

বাদশাহ্‌র স্বপ্ন ও দানিয়াল (আ) কর্তৃক উহার ব্যাখ্যা

সম্রাট বুখত নাস্‌সার স্বপ্ন দেখিলেন যে, একটি মূর্তি, উহার মস্তক স্বর্ণের, বক্ষ রৌপ্যের, পেট তামার, উরুদ্বয় লোহার, পায়ের নলা পোড়া মাটির। সে আরও দেখিল, আকাশ হইতে একটি পাথর উহার উপর পতিত হইল, ফলে উহা ভাঙ্গিয়া গেল। অতঃপর পাথরটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, এমনকি পূর্ব ও পশ্চিম-এর মধ্যবর্তী স্থান ভরিয়া গেল। সে দেখিল, একটি বৃক্ষ যাহার মূল হইল ভূমিতে আর শাখা প্রশাখা আকাশে। উহার উপর একটি লোক, তাহার হাতে কুঠার। সে শুনিল, একজন ঘোষক ঘোষণা করিতেছে, বৃক্ষটির গুড়িতে আঘাত কর, যাহাতে উহার শাখা-প্রশাখা হইতে পক্ষীকুল পৃথক হইয়া যায় এবং চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তু সকল উহার নিচ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। আর উহার মূল দণ্ডায়মান অবস্থায় রাখিয়া দাও।

দানিয়াল (আ) উহার ব্যাখ্যা করিলেন যে, স্বর্ণের মস্তকসম্পন্ন যে মূর্তিটি আপনি দেখিয়াছেন উক্ত স্বর্ণের মস্তক হইলেন আপনি। আর আপিন হইলেন উত্তম বাদশাহ। আর রৌপ্যের বক্ষসম্পন্ন ইহার অর্থ হইল, আপনার পর আপনার পুত্র বাদশাহ হইবে। আর তামার পেটসম্পন্ন যাহা দেখিয়াছেন তাহা হইল, আপনার পুত্রের পর যিনি বাদশাহ হইবেন তিনি। লৌহের উরু হইল পারস্য সম্রাট, তাহারাই পরবর্তীতে বাদশাহ হইবে। আর পোড়া মাটি হইল তাহাদের শেষ সম্রাট। যে পাথরটি আপনি দেখিয়াছেন আকাশ হইতে পতিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং পূর্ব ও পশ্চিম-এর মধ্যবর্তী স্থান পূর্ণ করিয়া ফেলিল, তাহা হইল সেই নবী আল্লাহ যাঁহাকে শেষ যমানায় প্রেরণ করিবেন। অতঃপর তিনি তাহাদের সকল রাজত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবেন এবং তাঁহার রাজত্ব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। আর বৃক্ষটি, তাহার উপরস্থ পক্ষিকুল, নিম্নস্থ চতুষ্পদ ও হিংস্র জন্তু এবং উহা কাটিয়া ফেলার নির্দেশ-এর অর্থ হইল, আপনার রাজত্ব বিলুপ্ত হইবে এবং আল্লাহ আপনাকে একটি পাখিতে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন। আপনি বিরাট এক শকুনে পরিণত হইবেন যাহা সকল পাখীর রাজা হইবে। অতঃপর আল্লাহ আপনাকে একটি ষাঁড়ে রূপান্তরিত করিয়া দিবেন, যে সকল চতুষ্পদ জন্তুর রাজা হইবে। অতঃপর আল্লাহ আপনাকে একটি সিংহে রূপান্তরিত করিবেন যে সকল হিংস্র ও বন্য জন্তুর রাজা হইবে। এই সকল রূপান্তর সংঘটিত হইবে সাত বৎসর ধরিয়া। আপনার অন্তর থাকিবে মানুষের অন্তর, যাহাতে আপনি জানিতে পারেন যে, আল্লাহ

তা'আলা সকল আসমান ও যমীনের বাদশাহ। তিনি যমীন ও উহার উপর যাহা কিছু আছে সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। আর গাছটির মূল যে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিয়াছেন উহার অর্থ হইল আপনার রাজত্ব কায়েম থাকিবে।

অতঃপর বুখত নাস্‌সার পক্ষীকুলের মধ্যে শকুনে, চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে ষাড়ে এবং বন্য জন্তুর মধ্যে সিংহে রূপান্তরিত হইল। অতঃপর আল্লাহ তাহার রাজত্ব ফিরাইয়া দিলেন। অতঃপর তিনি ঈমান আনয়ন করিলেন এবং মানুষকে আল্লাহ্‌র ইবাদতের দিকে দাওয়াত দিলেন। ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহকে প্রশ্ন করা হইল, সে মুমিন ছিল কি না? তিনি বলিলেন, আমি এই ব্যাপারে আহলে কিতাবদের মধ্যে মতভেদ পাইয়াছি। তাহাদের কেহ বলেন, তিনি মুমিন হিসাবে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, আর কেহ বলেন, তিনি কাফির হিসাবে মারা যান। কারণ তিনি বায়তুল মাকদিস এবং উহার মধ্যে রক্ষিত কিতাব পোড়াইয়া দিয়াছেন, নবীদিগকে হত্যা করিয়াছেন। তাই আল্লাহ তাহার উপর ভীষণভাবে রাগান্বিত হন। ফলে সেই দিন তাহার তওবা কবূল করেন নাই (আছ-ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৬)।

একটি দিব্যদর্শন ও বিশ্লেষণ এবং তাহা সত্যে পরিণত হওয়া

সম্রাট বুখত নাস্‌সারের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র বেল শেফার (বেল শৎসর) সিংহাসনে সমাসীন হন। রাজ-মুকুট পরিধান অনুষ্ঠানের দিন তিনি একটি ভোজসভার আয়োজন করেন। সেখানে তিনি মদ্য পানের বিশেষ ব্যবস্থা করেন। তাহার পিতা বুখত নাস্‌সার জেরুসালেমের হায়কাল (বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদ) হইতে যে সকল স্বর্ণ, রৌপ্য লইয়া আসিয়াছিলেন উহার পাত্রে স্বয়ং বাদশাহ, তাহার পত্নী ও উপপত্নিগণ মদ পান করেন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল, ইহা দ্বারা হায়কাল-এর অসম্মান করা। বাদশাহর মধ্যে গর্ব ও অহঙ্কার সৃষ্টি হয়— তিনি স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, লৌহ ও পাথরের মূর্তি তৈরি করত উহার পূজা করেন। মদ পানের সময় বাদশাহ হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, রাজপ্রাসাদের ভিত্তির প্রলেপের উপর একটি হস্ত কি যেন লিখিতেছে। তিনি গণকগণের সকলকে ডাকিয়া ইহার মর্ম জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু কেহই উহার মর্ম উদ্ধার করিতে পারিল না। অবশেষে হযরত দানিয়াল (আ) উহার মর্ম ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন যে, তাহার বাদশাহীর দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। তাহার রাজ্য টুকরা টুকরা করিয়া দেওয়া হইবে। ইরানীগণ উহার মালিক হইবে। অতঃপর শীঘ্রই ইহা সত্যে পরিণত হইল। ইরানী সৈন্যগণ উহা আক্রমণ করত অধিকার করিয়া লইল এবং বাদশাহ বেলশেফার নিহত হইল (বাইবেল ঃ দানিয়েলের পুস্তক, ৫ ঃ ১-৩০; আনওয়ার-ই আম্বিয়া, পৃ. ৩১৬-৩১৭)।

ইরান সম্রাটের মন্ত্রী নিযুক্ত

ইরান সম্রাট বাবিল অধিকার করিয়া সেখানে স্বীয় শাসন সুসংহত করেন এবং কর্তৃত্ব পরিচালনা করেন। তিনি দানিয়াল (আ)-এর বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-বিবেকের কারণে তাঁহাকে খুবই সম্মান ও কদর

করিতেন। তাই তিনি যখন রাষ্ট্রে ১২০ জন নাজিম ও তিনজন মন্ত্রী নিযুক্ত করেন তখন হযরত দানিয়াল (আ)-কেও মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ এবং উহা হইতে পরিত্রাণ লাভ

দানিয়াল (আ) অন্যান্য মন্ত্রী ও নাজিমদের তুলনায় বেশী জ্ঞানী ও কর্মতৎপর বলিয়া প্রমাণিত হইলে অন্যরা তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে থাকে এবং তাঁহার ক্ষতি করিবার ফন্দি আঁটিতে থাকে। কিন্তু তাহাদের কোনও চেষ্টাই ফলবতী না হওয়ায় তাহারা বাদশাহকে পরামর্শ দিল যে, এই মর্মে এক ফরমান জারী করা হউক, ত্রিশ দিন পর্যন্ত কেহ আপনি ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য বা কোনও লোকের নিকট কিছু যাঞ্চা করিলে বা কোনও আবেদন করিলে তাহাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হইবে। বাদশাহ তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করত উক্ত ফরমান জারী করিলেন।

হযরত দানিয়াল (আ)-এর নিয়ম ছিল, দিনে তিনবার নিজের গৃহে বসিয়া তিনি আল্লাহ্র ইবাদত করিতেন এবং তাঁহার নিকট দু'আ করিতেন। ষড়যন্ত্রকারী ও হিংসুকগণ এই সুযোগ কাজে লাগাইল। তাহারা বাদশাহকে জানাইল যে, দানিয়াল (আ) আপনার নির্দেশের কোনও তোয়াক্কা করিতেছেন না; বরং প্রতিদিন তিনবার তিনি তাঁহার আল্লাহর নিকট দু'আ করিতেছেন। বাদশাহ হযরত দানিয়াল (আ)-এর প্রতি সুধারণা রাখিতেন। তাই তিনি চাহিতেছিলেন না যে, তাঁহাকে কোনওরূপ শাস্তি প্রদান করেন। কিন্তু পারিষদবর্গ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল যে, ঘোষণা ও ফরমান অনুযায়ী দানিয়াল (আ)-এর শাস্তি কার্যকর করা হউক এবং তাহাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হউক। অবশেষে বাধ্য হইয়া বাদশাহ হযরত দানিয়াল (আ)-কে তাহাদের নিকট সোপর্দ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে সিংহের খাঁচায় নিক্ষপ করা হইল। আল্লাহর কুদরতে সিংহ তাঁহার কোনই ক্ষতি করিল না। তিনি নির্ভয়ে ও সহীহ-সালামতে খাঁচার মধ্যে সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বাদশাহ এই সংবাদ শুনিয়া নিজেই তাঁহাকে দেখিতে সিংহের খাঁচার নিকট গেলেন। বাদশাহ তাঁহাকে নিরাপদ ও অক্ষত দেখিয়া প্রফুল্ল চিত্তে তাঁহাকে বাহির করিবার নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও নির্দেশ দিলেন যে, যাহারা দানিয়ালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তাহাকে এই শাস্তি দিতে প্ররোচিত ও বাধ্য করিয়াছে তাহাদিগকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ সিংহের খাঁচায় নিক্ষেপ করা হউক, যাহাতে তাহারা আপন কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করিতে পারে। অতঃপর বাদশাহর নির্দেশ মুতাবিক তাহাদিগকে খাঁচায় নিক্ষেপ করা হইল। সিংহ তাহাদের সকলের অস্থি চূর্ণ করিয়া ফেলিল (আনওয়ার-ই আম্বিয়া, পৃ. ৩১৭; বাইবেল ঃ দানিয়ালের পুস্তক, ৬ঃ ১-২৪)।

ইব্ন আবিদ দুনয়া আবদুল্লাহ ইব্ন আবি'ল-হুযায়ল সূত্রে অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা বুখ্ত নাস্সার সম্পর্কিত। তাহা এই যে, বুখ্ত নাস্সার কূপের মধ্যে দুইটি সিংহ রাখেন এবং দানিয়াল (আ)-কে আনিয়া সেখানে উহাদের কাছে কূপে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু উহারা তাঁহার কোনওরূপ ক্ষতি করিল না। দানিয়াল (আ) সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। অতঃপর

মানবিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি তাঁহার আকর্ষণ জন্মিল। আল্লাহ্ তা'আলা শাম-এ উরমিয়ার নিকট ওহী প্রেরণ করিলেন যে, দানিয়ালের জন্য খাদ্য ও পানীয় তৈরি কর। তিনি বলিলেন, ওগো আমার প্রতিপালক! আমি রহিয়াছি পবিত্র ভূমি শাম-এ, আর দানিয়াল রহিয়াছেন ইরাকের বাবিল শহরে! আল্লাহ তাঁহাকে ওহী পাঠাইলেন, আমি তোমাকে যাহা তৈরি করার নির্দেশ দিয়াছি তুমি তাহাই কর। আমি অতি সত্ত্বর এমন একজনকে পাঠাইতেছি, যে তোমাকে এবং তুমি যাহা তৈরী করিয়াছ তাহা বহন করিয়া লইয়া যাইবে। অতঃপর উরমিয়া খাদ্য ও পানীয় তৈরি করিলেন। আল্লাহ্ তাঁহাকে ও তাঁহার তৈরীকৃত সামগ্রী লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি অতপর কূপের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দানিয়াল (আ) জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তিনি বলিলেন, আমি উরমিয়া। দানিয়াল (আ) বলিলেন, কিজন্য এইখানে আসিয়াছ? তিনি বলিলেন, আমাকে আপনার প্রতিপালক আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। দানিয়াল (আ) বলিলেন, আমাকে তাহা হইলে আমার প্রতিপালক স্মরণ করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। দানিয়াল (আ) বলিলেন, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, তিনি তাঁহাকে যে স্মরণ করে তাহাকে ভুলেন না। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাহার ডাকে সাড়া দেন, যে তাঁহার প্রতি আশাবাদী হয়। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র, যিনি তাঁহার উপর ভরসাকারীকে অন্যের হাতে সোপর্দ করেন না। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, যিনি উত্তম কর্মের উত্তম প্রতিদানই দেন। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি ধৈর্যের প্রতিদান দেন মুক্তির দ্বারা। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের উপর মুসীবত আসার পর উহার ক্ষয়ক্ষতি দূর করিয়া দেন। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদিগকে আমাদের কর্ম সম্পর্কে কুধারণা সৃষ্টি হওয়ার মুহূর্তে আমাদিগকে রক্ষা করেন। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর, আমাদের পক্ষ হইতে সকল কলা-কৌশল বন্ধ হইয়া যাওয়ার মুহূর্তে যিনি আমাদের আশা-ভরসা (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪০)।

দানিয়াল (আ)-এর দু'আ ও তাঁহার লাশের অবস্থা

হযরত দানিয়াল (আ) ঠিক কখন এবং কিভাবে ইনতিকাল করেন তাহার কোন সঠিক বর্ণনা পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় খলীফা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর শাসনামলে বর্তমান ইরানের খূযিস্তান বিজিত হইলে তুসতার (শুশ্তার, সূস) নামে উহারই একটি প্রদেশে তাঁহার লাশ পাওয়া যায়। অতঃপর হযরত উমার (রা)-এর লিখিত নির্দেশে তাঁহাকে দাফন করত কবরটির চিহ্ন বিলীন করিয়া দেওয়া হয়। এই সম্পর্কিত বিবরণ পরে আসিতেছে। তিনি আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে, উম্মাতে মুহাম্মাদীর হাতে যেন তাহার দাফন হয়। এই মর্মে একটি রিওয়ায়াত পাওয়া যায়।

ইবন আবিদ দুনয়া (র) আবুল আশ'আছ আল-আহমারী (র) সূত্রে একটি মুরসাল হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, দানিয়াল (আ) আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মাত দাফন করে। অতঃপর আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) যখন

তুসতার জয় করেন তখন তাঁহাকে একটি সিন্দুকের মধ্যে পান। আর রাসূলুল্লাহ (স) ইহাও বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি দানিয়ালের সন্ধান দিবে তাহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিও। অতঃপর হারকূস নামক এক ব্যক্তি তাঁহার সন্ধান দেয়। আবূ মূসা (রা) উমার (রা)-কে এই সংবাদ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। তখন উমার (রা) তাঁহাকে এই নির্দেশ দিয়া পত্র লিখিলেন, লাশটিকে দাফন কর এবং হারকূসকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। কারণ নবী (স) তাঁহাকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়াছেন। এই রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে হাফিজ ইব্‌ন কাছীর (রা) উল্লেখ করিয়াছেন যে, হাদীছটি মুরসাল, ইহা মাহফুজ নহে (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪১)।

হযরত দানিয়াল (আ)-এর জীবদ্দশায় তাঁহার বহু মু'জিযা দেখিয়া লোকজন তাঁহাকে আল্লাহর প্রিয় ও অসাধারণ মানব বলিয়া গণ্য করে। তাই তাঁহার মৃত্যুর পরও তাঁহার লাশকে বরকতময় বলিয়া মনে করিতে থাকে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা তাঁহার লাশ দাফন না করিয়া সযত্নে রাখিয়া দেয়। কথিত আছে যে, একবার সূস (তুসতার) প্রদেশে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে ফসলাদি না হওয়ায় মারাত্মক দুর্ভিক্ষ নামিয়া আসে। তখন উহার অধিবাসিগণ বিশ্বাস করিল যে, দানিয়াল (আ)-এর লাশের উসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করিলে আল্লাহ তা'আলা উহা কবুল করত বৃষ্টি দান করিবেন। তাই উক্ত আশা লইয়া তাহারা বাবিলের অধিবাসীদের নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য উহা চাহিয়া লয়। এইরূপে হযরত দানিয়াল (আ)-এর লাশ সূস-এর অধিবাসীদের নিকট পৌঁছিয়া যায় (আল-বালাযুরী, ফতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৭৮)। অতঃপর তাহারা উক্ত লাশ আর বাবিলে ফেরত দেয় নাই। এমতাবস্থায় আবূ মূসা (রা) সূস জয় করিয়া তাঁহার লাশের সন্ধান পান।

দানিয়াল (আ)-এর লাশের সহিত প্রাপ্ত জিনিসপত্র ও তাঁহার লাশ দাফন

হযরত দানিয়াল (আ)-এর লাশের সহিত আরো কিছু জিনিসপত্র পাওয়া যায়। উহার বিবরণ এবং তাঁহার লাশ দাফন সম্পর্কিত বিভিন্ন চমকপ্রদ বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়।

ইউনুস ইব্‌ন বুকায়র (র) আবুল আলিয়া সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবুল আলিয়া (র) বলেন, আমরা যখন তুসতার জয় করিলাম তখন হুরমুযান-এর কোষাগারে একখানি চৌকি পাইলাম, যাহার উপর একটি লাশ ছিল। লাশটির মাথার নিকট ছিল একখানি মুসহাফ। অতঃপর আমরা মুসহাফখানি উমার (রা)-এর নিকট লইয়া আসিলাম। তখন তিনি কা'ব (র)-কে ডাকাইয়া উহার আরবীতে অনুবাদ করাইলেন। আরবদের মধ্যে আমিই প্রথম ব্যক্তি এই গ্রন্থ পাঠ করি। বর্ণনাকারী আবূ খালিদ বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহাতে কি ছিল ? তিনি বলিলেন, তোমাদের সীরাত, তোমাদের বিভিন্ন কর্মের বিবরণ, তোমাদের বাক্যের লাহান (স্বর) এবং পরবর্তীতে যাহা ঘটিবে তাহা। আমি বলিলাম, আপনারা মৃত লোকটিকে কি করিয়াছিলেন? তিনি বলিলেন, দিনের বেলায় আমরা পৃথক পৃথক তেরটি কবর খনন করি। অতঃপর রাত্রিবেলায় আমরা তাঁহাকে দাফন করি এবং সবগুলি কবরই আমরা সমান করিয়া ফেলি যাহাতে লোকজনের কাছে কোনটি তাঁহার কবর সে কথা গোপন থাকে। ফলে কেহ কবর খুঁড়িয়া তাঁহার লাশ উঠাইতে না পারে। আমি

বলিলাম, তাহারা উহার নিকট কি কামনা করিত? তিনি বলিলেন, বৃষ্টি বন্ধ হইয়া গেলে তাহারা উহার খাটিয়া বাহিরে লইয়া আসিত, অতঃপর বৃষ্টি হইত। আমি বলিলাম, লোকটি কে বলিয়া আপনাদের ধারণা? তিনি বলিলেন, তাঁহাকে দানিয়াল বলা হইত। আমি বলিলাম, কত দিন পূর্বে তিনি মারা গিয়াছিলেন বলিয়া আপনারা ধারণা করেন? তিনি বলিলেন, তিন শত বৎসর পূর্বে। আমি বলিলাম, তাঁহার কিছুই কি পরিবর্তিত হয় নাই? তিনি বলিলেন, পিছনের কয়েকটি চুল ব্যতীত আর কিছুই নষ্ট হয় নাই। নবীদের গোশত মাটিতে মিশিয়া যায় না, আর তাহা জীব-জন্তুতেও খায়না (ইব্‌ন কাছীর, আল- বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪০)।

হাফিজ ইব্‌ন কাছীর উক্ত রিওয়ায়াত উদ্ধৃত করিযা মন্তব্য করিয়াছেন যে, আবুল আলিয়া পর্যন্ত ইহার সনদ সহীহ। কিন্তু তাহার মৃত্যু তারিখ 'তিন শত বৎসর পূর্বে' যদি সঠিক হইয়া থাকে তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে, তিনি নবী দানিয়াল নহেন, বরং একজন সৎ বান্দা। কারণ বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদীছ অনুযায়ী হযরত 'ঈসা (আ) ও মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যখানে অন্য কোনও নবী আসেন নাই। আর তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে চারি শত বৎসরের ব্যবধান। এক বর্ণনামতে ছয় শত বৎসরের এবং অপর এক বর্ণনামতে ছয় শত বিশ বৎসরের। তাঁহার মৃত্যু তারিখ হইতে পারে আট শত বৎসর পূর্বে। ইহাই নবী দানিয়াল-এর যুগের কাছাকাছি সময়। আর বাস্তবেও ইহা নবী দানিয়াল-এর লাশ হওয়াই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। কারণ তাঁহাকে পারস্য-রাজ বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং সেখানেই তিনি বন্দী অবস্থায় কাটান (প্রাগুক্ত, ২খ, ৪০-৪১)।

এই লাশটি যে নবী দানিয়ালের সেই ব্যাপারে হাফিজ ইব্‌ন কাছীর আরো একটি দলীল পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আবুল আলিয়া হইতে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে যে, উহার নাক ছিল এক বিঘত লম্বা। আর আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) হইতে উত্তম সনদে বর্ণিত আছে যে, উহার নাক ছিল এক হাত লম্বা। উক্ত রিওয়ায়তদ্বয়ের আলোকে বলা যায় যে, তিনি প্রাচীন নবীদের একজন হইবেন (প্রাগুক্ত, ২খ, ৪১)। কারণ পরবর্তীকালের লোকজনের নাক এত লম্বা হওয়া যুক্তিযুক্ত নহে। মানুষের গঠনাকৃতি ক্রমান্বয়ে ছোট হইতেছে।

হযরত দানিয়াল (আ) সম্পর্কিত আরো যে সকল বর্ণনা পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ ঃ ইব্‌ন আবি'দ দুনয়া (রা) 'আনবাসা ইব্‌ন সা'ঈদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) দানিয়াল (আ)-এর সহিত একখানি মুসহাফ ও একটি মাটির পাত্র পাইলেন, যাহার মধ্যে কিছু চর্বি, দিরহাম ও তাঁহার অঙ্গুরী ছিল। আবূ মূসা (রা) ইহা জানাইয়া উমার (রা)-কে পত্র লিখিলেন। উমার (রা) তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, মুসহাফখানি এবং চর্বির কিছু অংশ আমার নিকট পাঠাইয়া দাও। আর বাকী চর্বিটুকু দ্বারা মুসলমানদিগকে রোগের চিকিৎসা করাইবার নির্দেশ দাও এবং দিরহামগুলি তাহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দাও। আর অঙ্গুরীটি সৌজন্যমূলক তোমাকে দেওয়া হইল (প্রাগুক্ত)।

ইব্‌ন আবিদ দুনয়া একাধিক সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ মূসা (রা) যখন দানিয়াল (আ)-এর সন্ধান পাইলেন এবং লোকজন তাঁহাকে জানাইল যে, ইনি নবী দানিয়াল (আ), তখন তিনি তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া চুমা খাইলেন। অতঃপর তাঁহার বিষয় জানাইয়া উমার (রা)-এর নিকট পত্র

লিখিলেন। আবূ মূসা (রা) তাঁহার নিকট রক্ষিত প্রায় দশ হাজার দিরহাম পাইলেন। তৎকালে কেহ উহা হইতে ধার গ্রহণ করিয়া ফেরত না দিলে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িত। তিনি তাঁহার নিকট একটি সিন্দুকও পান। অতঃপর উমার (রা)-এর নির্দেশে তাঁহাকে পানি ও বরই পাতা দ্বারা গোসল করানো হয়। অতঃপর কাফন পরাইয়া দাফন করা হয় এবং তাঁহার কবর গোপন রাখা হয়, যাহাতে কেহ উহা জানিতে না পারে। তাঁহার নিকট প্রাপ্ত সম্পদ ও সিন্দুক উমার (রা) বায়তুল মালে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং তাঁহার আংটিটি আবূ মূসা (রা)-কে প্রদান করেন (প্রাগুক্ত)।

আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, দানিয়াল (আ)-কে কবরস্থ করার জন্য তিনি চারজন কয়েদীকে পানির প্রবাহ বন্ধ করিয়া দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর উহা বন্ধ হইয়া গেলে নদীর মধ্যখানে তাহারা কবর খুঁড়িল এবং সেখানেই তাঁহাকে দাফন করিল। অতঃপর বন্দী চারজনকে হত্যা করা হয়। তাই আবূ মূসা (রা) ছাড়া তাঁহার কবরের সন্ধান আর কেহ জানে না (প্রাগুক্ত, তু. আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, পৃ. ৩৭৮)।

দানিয়াল (আ)-এর আংটি

হযরত দানিয়াল (আ)-এর লাশের সহিত যে আংটি পাওয়া গিয়াছিল উহার মণিতে অঙ্কিত ছিল দুইটি সিংহের ছবি। সিংহদ্বয়ের মধ্যখানে একজন মানুষ। সিংহদ্বয় লোকটির শরীর লেহন করিতেছে। এই বিষয়ে ইব্‌ন আবিদ দুনয়া আবুয-যিনাদ (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি আবূ মূসা আশ'আরী (রা)-এর পৌত্রের হাতে একটি আংটি দেখিলাম যাহার মণিতে অঙ্কিত ছিল দুইটি সিংহ, উহাদের মধ্যখানে এক ব্যক্তিকে লেহন করিতেছে। আবূ বুরদা বলেন, ইহা হইল সেই মৃত ব্যক্তির আংটি, যাহার সম্পর্কে সেখানকার অধিবাসিগণ মনে করেন যে, তিনি দানিয়াল (আ)। আবূ মূসা (রা) তাঁহাকে দাফন করার দিন ইহা প্রাপ্ত হন। আবূ বুরদা বলেন, আবূ মূসা (রা) উক্ত আংটির চিত্র সম্পর্কে সেখানকার আলিমগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা জানাইয়াছেন যে, যে বাদশাহের রাজত্বে দানিয়াল (আ) ছিলেন, একদা গণক ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ সেই বাদশাহের নিকট গিয়া বলিল যে, অমুক রাত্রে একটি বালক জন্মগ্রহণ করিবে, সে আপনার রাজ্য বিনাশ করিয়া ফেলিবে। তখন বাদশাহ বলিল, আল্লাহর কসম! সেই রাত্রের সকল বালককে আমি হত্যা করিয়া ফেলিব। তবে রাজ-কর্মচারিগণ দানিয়ালকে লইয়া গিয়া সিংহের মুখে ফেলিয়া দিল। অতঃপর সিংহটি ও তাহার সহধর্মিনী উভয়ে তাহাকে লেহন করিতে লাগিল। উহারা তাঁহার কোনওরূপ ক্ষতি করিল না। অতপর তাহার মাতা আসিয়া সিংহদ্বয়কে এই অবস্থায় পাইল। এই ভাবেই আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে রক্ষা করেন। অতঃপর দানিয়াল (আ) বড় হইয়া উঠেন। আবূ বুরদা (র) আবূ মূসা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, সেখানকার 'আলিমগণ বলিয়াছিলেন, দানিয়াল (আ) তাঁহার আংটির মণিতে নিজের এবং সিংহদ্বয়ের তাঁহাকে লেহনরত অবস্থার প্রতিকৃতি অংকন করেন, যাহাতে এই ব্যাপারে তাঁহার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর নি'মাত তিনি ভূলিয়া না যান (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪১-৪২; ঐ লেখক, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৫৮)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, দারুল-ফিক্র আল-আরাবী, মিসর তা, বি, ২খ, ৪০-৪২; (২) ঐ লেখক, কাসাসুল-আম্বিয়া, আল-মারকাযুল-আরাবী আল-হাদীছ, কায়রো তা. বি, পৃ. ৪৫৬-৪৫৮;(৩) আছ-ছা'লাবী, 'আরাইসুল মাজালিস বা কাসাসুল আম্বিয়া, আল- মাকতাবা আল-কাসতুল্লিয়া-তুরস্ক ১২২৮ হি., পৃ., ৩৬৫-৩৬৯; (৪) ইব্নুল আছীর, আল-কামিল, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, বৈরূত লেবানন, ১ম সং ১৪০৭/ ১৯৮৭, ১খ, ২০২-১০৪; (৫) আল-বালাযুরী, ফুতূহুল বুলদান, সম্পা. E.J. Brill, লইডেন ১৯৬৮ খৃ., পৃ. ৩৭৮; (৬) মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়াই কুরআন, শায়খ গুলাম আলী এণ্ড সন্স, কাশমীরী বাযার, লাহোর তা, বি, ৩খ, ৫৮৬; (৬) কার্ডিন্যাণ্ড টুটেল. আল-মুনজিদফিল আদাব ওয়াল-উলূম, আল-মাতবাআতুল কাতুলিকিয়্যা, বৈরূত, ১৯শ সং ১৯৬৬ খৃ., ১৮৯, ৬৬; (৮) ইসলামী ইনসাইক্লোপিডিয়া, সম্পা. কাসিম মাহমূদ, শাহকার বুক ফাউণ্ডেশন, করাচী তা, বি., পৃ.৮৬৩; (৯) আনওয়ার-ই আম্বিয়া (লেখক অজ্ঞাত), সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত, শায়খ গুলাম আলী এণ্ড সন্স, আনারকলি, লাহোর, ৫ম সং ১৯৮৫ খৃ., ৩১৩-৩১৯; (১০) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, দারুল-মারিফা, বৈরূত তা, বি., ৭খ, ৫৬৯-৫৭২; (১১) পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা ১৯৯৪ খৃ., দানিয়েলের পুস্তক, পৃ.১২৭৭-১৩০৩; (১১) বাংলা বিশ্বকোষ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ., ২খ, ৭৮৪; (১২) J.The Encychlopaedia of Islam, Leiden 2nd edition1965, Vol.2, 111-112; (১১) Encyclopaedia Britannica-Chicago-London, Toronto 1965, vol, 7, 27-28; (১৫). Encyclopaedia Americana, Americana Corporation 1979, Vol, 8, 481;(১৬) Collier's Encyclopaedia, U.S.A. 1980, vol. 7, 701.

আবদুল জলীল

২৮

হযরত যাকারিয়্যা (আ)

حضرت زكريا عليه السلام

হযরত যাকারিয়্যা (আ)

বংশ পরিচয়

বংশ-পরম্পরার মধ্যে বেশকিছু পার্থক্যসহ বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে যাকারিয়্যা (আ)-এর বংশ পরিচয় উপস্থাপন করা হইয়াছে। আল্লামা ইবন কাছীর বলিয়াছেন ঃ যাকারিয়্যা ইবন উদুন (দান) অথবা শাবওয়ায়হ বা লীদুল অথবা বারখিয়া ইবন মুসলিম ইবন সাদূক ইবন হাশবান ইবন দাউদ ইবন সুলায়মান ইবন মুসলিম ইবন সিদ্দীকাহ ইবন বারখিয়া ইব্ন বাল'আতহ ইবন নাহূর ইবন শালূম ইবন বাহফাশাত ইবন আইনামান ইবন রাহবিয়াম ইবন সুলায়মান ইবন দাউদ (আল বিদায়া, ২খ, ৪৭)।

আল্লামা বদরুদ্দীন 'আয়নী বলিয়াছেন ঃ

যাকারিয়্যা ইবন আদান ইবন মুসলিম ইবন সাদূক ইবন নাখশান ইবন দাউদ ইবন সুলায়মান ইবন মুসলিম ইবন সিদ্দীকাহ ইবন নাখুর ইবন শালুম ইবন বাহফাশাত ইবন আসা ইবন আফিয়া ইবন রাহীম ইবন সুলায়মান ইবন দাউদ (উমদাতুল কারী, ৮খ, ২০)।

স্পষ্ট লক্ষণীয় যে, উভয় বর্ণনার মাঝে নামের কিছু বিভিন্নতা রহিয়াছে। সম্ভবত হাশবান নাখ্শান একই নামের দুই ধরনের উচ্চারণ। অন্যদিকে নাহূর এবং নাখূরও একই নামের দুই রূপ।

যাকারিয়্যা (আ)-এর পিতার নাম কি ছিল এই সম্পর্কে মতপার্থক্য রহিয়াছে। (ক) আল্লামা ছা'লাবী বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা ইবন আদান (দ্র. উমদাতুল কারী, ৮খ, ২০)। (খ) ইবন আসাকির বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা ইবন বারখিয়া (দ্র. আল-বিদায়া, ২খ, ৪৭ Book of Matthew, 33 ঃ 35)। (গ) আল্লামা আয়নী বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা ইবন দান زَكَرِيَّا بْنُ دَانٍ (উমদাতুল কারী, ৮খ., ২০)। (ঘ) ইবন কাছীর বলিয়াছেন, زَكَرِيَّا بْنُ لَدُنٍّ (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৭)। (ঙ) কেহ কেহ বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা ইবন উদুন (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫১)।

তবে ইমাম ইব্ন কাছীর এবং আয়নী উল্লিখিত বংশতালিকা বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কেননা উভয় বর্ণনায় যাকারিয়্যা এবং দাউদ (আ)-এর মাঝখানে ১৫/১৬ জন পূর্বপুরুষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যদিকে বাইবেলে হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর যে পূর্বপুরুষের বর্ণনা আসিয়াছে তথায়

শেষ পাঁচজন ব্যতীত অন্যান্যদের উল্লেখ অনুপস্থিত। তাই বলিতে হইবে যে, বংশতালিকা বর্ণনায় সমস্যা রহিয়া গেল (বাইবেল, মথি, ১ ঃ ৬-১৬; লূক, ৩ ঃ ২৩-৩১)।

তবে ঐতিহাসিকদের ঐক্যমতের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয় যে, হযরত যাকারিয়্যা (আ) সুলায়মান ইবন দাউদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন। ইহার সবচাইতে বড় প্রমাণ রহিয়াছে বাইবেলের লূক পুস্তকে। তথায় বলা হইয়াছে ঃ "যিহূদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন; তাঁহার স্ত্রী হারোণ-বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীশাবেৎ। তাহারা দুইজন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন" (লূক, ১ ঃ ৫-৬)।

হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী

প্রসিদ্ধ মত হইল, হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রীর নাম 'ঈসা বিনতে ফাকূয। বাইবেলে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে, "তাহার স্ত্রী হারূন বংশীয়া। তাহার নাম ইলীশাবেৎ" (Elijabeth) (লূক, ১ ঃ ৫)।এই Elijabeth আরবী উচ্চারণ "ঈসা" إيشاع। এই ঈশার অন্য এক বোন ছিল এবং তাহার নাম হইল হান্নাহ বিনতে ফাকূয। তিনি হইলেন ইমরান ইবন মাছান-এর স্ত্রী। এই হান্নাহ বিনতে ফাকূয এবং ইমরান ইবন মাছানের ঘরেই মারয়াম (আ) জন্মগ্রহণ করেন। অতএব "ঈসা" মারয়ামের খালা। ইহা হইতে স্পষ্ট যে, হযরত যাকারিয়্যা (আ) এবং ইমরান ইবন মাছান দুই ভায়রা ছিলেন (ইবনুল আছীর, আল-কামিল, ১খ, ১৬৯)।

বাইবেলের বর্ণনা হইতে আরও একটা বিষয় স্পষ্ট হয় যে, ঈসা বা Elijabeth এবং তাহার বোন হান্নাহ উভয়ই মূসা (আ)-এর ভাই হারূন ('আ)-এর বংশধর। অন্য একটি মতে যাকারিয়্যা ('আ)-এর স্ত্রী ঈশা মারয়াম (আ)-এর খালা নন এবং তিনি মারয়ামের বোন। ইবনুল আছীর বলিয়াছেন, কথিত আছে যে, ঈশা ছিল ইমরানের কন্যা মারয়ামের বোন (আল-কামিল, ১খ,১৬৯)। এই মতের প্রমাণ হইল, মিরাজের হাদীসে ঈসা ('আ)-এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে খালাত ভাই হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বুখারী শরীফে আছে ঃ

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةِ أُسْرِىَ بِه ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى اَتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ قِيْلَ مَنْ هذَا قَالَ جِبْرِيْلُ قِيْلَ وَمَنْ مَّعَكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قِيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْىٰ وَعِيْسى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ قَالَ هذَا يَحْىٰ وَعِيْسى فَسَلِّمْ عَلَيْهِمَا فَسَلَّمْتُ فَرَدَّا ثُمَّ قَالَا مَرْحَبًا لأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ.

"মালিক ইব্‌ন সা'সা'আ (রা) হইতে বর্ণিত। নবী (স) তাহাদিগকে ইসরার ঘটনাটি বর্ণনা প্রসংগে বলিয়াছেন, তিনি উর্ধ্বে গমন করিলেন, এমনকি দ্বিতীয় আসমানে আসিয়া হাযির হইলেন, অতঃপর জিবরাঈল (আ) দরজা খুলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তখন বলা হইল, কে? তিনি

বলিলেন, জিবরাঈল। বলা হইল, আপনার সাথে কে? তিনি বলিলেন, মুহাম্মাদ। বলা হইল, তাঁহাকে কি আসিতে বলা হইয়াছে? তিনি বলিলেন: হাঁ। যখন আমি পৌঁছিলাম তখন সেখানে ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা (আ)-কে দেখিতে পাইলাম। আর তাঁহারা দুইজন খালাত ভাই। জিবরাঈল বলিলেন, ইয়াহ্ইয়া এবং ঈসা, তাঁহাদিগকে সালাম করুন। তৎপর আমি তাঁহাদিগকে সালাম করিলাম, আর তাঁহারাও সালামের উত্তর দিলেন। অতঃপর বলিলেন, স্বাগতম উত্তম ভাইকে এবং উত্তম নবীকে" (বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, দ্র. আয়নী, উমদাতুল কারী, ৮খ, ২২)।

হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর সময়কাল

হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী। যেহেতু তিনি ইয়াহ্ইয়া ('আ)-এর পিতা, 'ইমরান ইব্ন মাছানের ভায়রা, মারয়াম (আ)-এর খালু, তথা ঈসা (আ)-এর মায়ের খালু এবং তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক, তাই প্রমাণিত হয় যে, যাকারিয়্যা (আ), ইয়াহ্ইয়া ('আ) এবং ঈসা ('আ) সমসাময়িক ছিলেন (আম্বিয়া-ই কুরআন, ২খ, ২৬০; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২১খ, ৪৮৫)।

বারনাবাসের বাইবেলের বর্ণনা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত যাকারিয়্যা('আ) হযরত ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশাতে বাঁচিয়া ছিলেন। এখানে বলা হইয়াছে যে, ঈসা ('আ) ইয়াহূদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "অতি সত্বর তোমাদিগকে সেইসব নবীদিগের রক্তের বদলা দিতে হইবে যাহাদিগকে তোমরা যাকারিয়্যা ইবন বারখিয়ার সময় পর্যন্ত হত্যা করিয়াছ, আর যাকারিয়্যাকে তোমরা হায়কাল (ইবাদতখানা) ও কুরবানীখানার মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা করিয়াছ" (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৩৯)।

তাই পূর্বের আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব ১ম শতাব্দী হইতে খৃস্টীয় ১ম শতাব্দী পর্যন্ত [যাকারিয়্যা (আ)-এর সময়-কালের একটি ঐতিহাসিক মানচিত্র সংযোজিত হইল]।

হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর মাযার (বায়তুল মাকদিস)।

বনূ ইসরাঈলদের মধ্যে 'যাকারিয়্যা' খৃস্টপূর্ব প্রায় পঞ্চম শতাব্দীতে আগমন করিয়াছিলেন। ফারিস-এর বাদশাহ দ্বারা ইবন গাশতাসার-এর সময় তিনি আর্বিভূত হন। আর অন্যজন হইলেন বক্ষমাণ প্রবন্ধের আলোচ্য ব্যক্তিত্ব মারয়াম (আ)-এর খালু যাকারিয়্যা (আ) (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৪৩৮)।

প্রথম যাকারিয়্যার বর্ণনা কুরআনে আসে নাই। তবে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে তাঁহার বর্ণনা আসিয়াছে (Book of Zechariah-01 : 01; The New Encyclopaedia of Britannica, 10v, 869; Colliers' Encyclopedia, 23v, 754)। ইব্‌ন গাশতাসাব-এর সময়ে যখন বায়তুল মাকদিস সংস্কার করা হইয়াছিল তখন তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। বাইবেলে বর্ণিত অত্র যাকারিয়্যা এবং যাকারিয়্যা (আ)-এর আগমনের মাঝে পার্থক্য প্রায় পাঁচ শত বৎসর। কেননা যাকারিয়্যা (আ) ঈসা (আ)-এর মাতা মারয়ামের খালু ছিলেন (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫০)।

আল-কুরআনে যাকারিয়্যা (আ) প্রসংগ

আল-কুরআনে ৪টি সূরায় সর্বমোট ৭ বার "যাকারিয়্যা" নামটি উল্লিখিত হইয়াছে।

সূরা নং ০৩, আয়াত নং ৩৭ = ০২ বার

সূরা নং ০৩, আয়াত নং ৩৮ = ০১ বার

সূরা নং ০৬, আয়াত নং ৮৫ = ০১বার

সূরা নং ১৯, আয়াত নং ০২ = ০১বার

সূরা নং ১৯, আয়াত নং ০৭ = ০১বার

সূরা নং ২১, আয়াত নং ৮৯ = ০১বার

(আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাযিল কুরআন, ৪০ পৃ.)।

যাকারিয়্যা (আ)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক ঘটনার বর্ণনা কুরআনে আসিয়াছে। তাহা নিম্নরূপ ঃ

সূরা আল 'ইমরানের ৩৫ নং আয়াত হইতে হযরত মারয়াম (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত আলোচিত হইয়াছ। যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন তাঁহার তত্ত্বাবধায়ক। এই প্রসংগেই যাকারিয়্যা (আ)-এর বিষয় আলোচিত হইয়াছে। ঘটনার শুরু হইতে বর্ণনা এই রকম ঃ

إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ. فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّيْ وَضَعْتُهَا أُنْثٰى وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى وَإِنِّيْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا ۚ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا ۖ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۖ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۖ قَالَ كَذَٰلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ قَالَ آيَتُكَ أَنْ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا ۗ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. —

"স্মরণ কর যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং তুমি আমার নিকট হইতে উহা কবুল কর। নিশ্চয় তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। অতঃপর যখন সে উহাকে প্রসব করিল তখন বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি। সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত। পুত্র তো কন্যার মত নয়। আমি উহার নাম রাখিয়াছি "মারয়াম" এবং অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার আশ্রয় চাহিতেছি। অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে আগ্রহে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করিলেন এবং তিনি তাহাকে যাকারিয়্যার তত্ত্বাবধানে রাখিয়াছিলেন। যখনই যাকারিয়্যা কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, 'হে মারয়াম! এই সব তুমি কোথায় পাইলে?' সে বলিত, উহা আল্লাহর নিকট হইতে। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন। সেখানেই যাকারিয়্যা তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয় তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়্যা কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিল তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতৃস্থানীয়, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বলিলেন, এইভাবেই। আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না। আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিবে" (সূরা আল 'ইমরান ঃ ৩৫-৪১)।

সূরা আন'আমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রসংগ বর্ণনার শেষের দিকে যাকারিয়্যা (আ)-এর উল্লেখ আসিয়াছে ঃ

وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْمُحْسِنِيْنَ. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِيْنَ. وَإِسْمَاعِيْلَ وَالْيَسَعَ وَيُوْنُسَ وَلُوْطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ.

"এবং ইহা আমার যুক্তি-প্রমাণ যাহা ইবরাহীমকে দিয়াছিলাম তাহার সম্প্রদায়ের মুকাবিলায়। যাহাকে ইচ্ছা মর্যাদায় আমি উন্নীত করি, তোমার প্রতিপালক প্রজ্ঞাময়, জ্ঞানী। এবং তোমাদের দান করিয়াছিলাম ইসহাক ও ইয়া'কূব ও ইহাদের প্রত্যেককে সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, পূর্বে নূহকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম এবং তাহার বংশধর দাঊদ, সুলায়মান, আয়্যূব, ইউসুফ, মূসা ও হারূনকেও, আর এইভাবেই সৎকর্মশীলদিগকে পুরস্কৃত করি। এবং যাকারিয়্যা, ইয়াহ্ইয়া, 'ঈসা ও ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম, ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত। আরও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম ইসমা'ঈল, আল-য়াসা'আ, ইউনুস ও লূতকে এবং শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম বিশ্বজগতের উপর প্রত্যেককে" (সূরা আন'আম ঃ ৮৩-৮৬)।

সূরা মারয়ামের ০১ হইতে ১১ নং আয়াত পর্যন্ত যাকারিয়্যা (আ)-এর অতি বৃদ্ধ বয়সে সন্তান জন্ম প্রসংগ বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা বলিয়াছেন ঃ

كٓهٰيٰعٓصٓ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا. إِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا. وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا. قَالَ رَبِّ أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا. قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا. فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحٰى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا.

"কাফ-হা-য়া-'আয়ন-সাদ। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে নিভৃতে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দিগের সম্পর্কে আমি আশংকা করি; আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর। সে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে য়া'কূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন। হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি, তাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া, এই নামে পূর্বে কাহারো নামকরণ করি নাই। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত। তিনি বলিলেন, এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক

বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। যাকারিয়্যা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সহিত তিন দিন বাক্যালাপ করিবে না। অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল ও ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বলিল" (সূরা মারয়াম ঃ ০১-১১)।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ. فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَاَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ. اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ.

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী'। অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইয়াহ্ইয়া এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে সন্তান ধারণের উপযোগী করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত" (সূরা আম্বিয়া ঃ ৮৯-৯০)।

কুরআনে অন্য এক আয়াতে পরোক্ষে যাকারিয়্যা (আ)-এর প্রসংগ আসিয়াছে। মারয়াম (আ)-এর অভিভাবকত্ব গ্রহণের ব্যাপারে যখন তাহারা লটারী করিয়াছিলেন সেই প্রসংগের বর্ণনায় আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ.

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ যাহা তোমাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল, তুমি যখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং যখন তাহারা বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না" (সূরা আল 'ইমরান ঃ ৪৪)।

হাদীছে যাকারিয়্যা (আ) প্রসংগ

হাদীস শরীফে যাকারিয়্যা (আ) সম্পর্কিত বর্ণনা নিতান্ত কম। বুখারী, মুসলিম, ইব্ন মাজা ও মুসনাদে আহমাদে এই সংক্রান্ত কিছু বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় (আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি আলফাযিল হাদীছ, ৮খ, ৮৭)।

(১) বুখারী শরীফের কিতাবু'শ শাহাদাত-এ যাকারিয়্যা (আ) সংক্রান্ত তথ্য ইমাম বুখারী (র) বাবের শিরোনামে এভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

بَابُ الْقُرْعَةِ فِى الْمُشْكِلاَتِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلاَمُ مَعَ الْجِرْيَةِ وَعَالَ قَلَمُ زَكَرِيَّا الْجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا ۔

"সমস্যাসংকুল বিষয়ে লটারী সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ "যখন তাহারা তাহাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল, তাহাদের কে মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক হইবে"। ইবন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, তাহারা লটারী করিল, অতঃপর স্রোতের সহিত কলমগুলি ভাসিয়া গেল এবং যাকারিয়্যার কলম স্রোতের উঁচুতে উঠিয়া গেল, তখন যাকারিয়্যা তাহার অভিভাবক হইল" (আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৫খ, ৩৪৫)।

(২) অনুরূপভাবে বুখারীর কিতাবুল আম্বিয়ার এক স্থানেও যাকারিয়্যা (আ) প্রসংগ উল্লেখ পূর্বক বাবের শিরোনাম। ইমাম বুখারী (র) বলিয়াছেন ঃ

بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى كـــهـــيـــعـــص ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۔ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا إلى قوله – لَمْ نَجْعَلْ له مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۔

"বক্ষমাণ পরিচ্ছেদ আল্লাহ তা'আলার এই বাণী প্রসংগে ঃ কাফ-হা-ইয়া 'আয়ন-সাদ। ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি। যখন সে নিভৃতে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে...... এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই।" অবশ্য ইমাম বুখারী (র) এই বাবে সরাসরি যাকারিয়্যা (আ) সংক্রান্ত কোন হাদীছ উল্লেখ করেন নাই ('আয়নী, উমদাতুল কারী, ৮খ, ১৯)।

(৩) ইমাম মুসলিম (র) এক স্থানে যাকারিয়্যা (আ) সংক্রান্ত একটি হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا ۔

আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ যাকারিয়্যা (আ) কাঠমিস্ত্রি বা সুতার ছিলেন" (সহীহ মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, ৫খ, ১৩৫)।

(৪) ইমাম ইব্ন মাজা মুসলিমে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীছ ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন (দ্র. ইব্ন মাজা, ২খ, ৭২৭, হাদীছ নং ২১৫০)।

(৫) ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলও মুসলিম শরীফে উল্লিখিত একই হাদীছ ভিন্ন সনদে বর্ণনা করিয়াছেন (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৫)।

(৬) ইসহাক ইব্ন বিশ্‌র তাঁহার কিতাব আল-মুবতাদা-এ যাকারিয়্যা (আ) সংক্রান্ত একখানা দীর্ঘ হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য আল্লামা ইব্ন কাছীর হাদীছখানাকে আশ্চর্যজনক এবং মারফূ হিসাবে বর্ণনা করা সঠিক নয়" বলিয়াছেন (ورفعه منكر) (আল-বিদায়া, ২খ, ৫০)।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ رَأَى زَكَرِيَّا فِى السَّمَاءِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ يَا اَبَا يَحْيى خَبِّرْنِىْ عَنْ قَتْلِكَ كَيْفَ كَانَ وَلِمَ قَتَلَكَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أُخْبِرُكَ أَنَّ يَحْيى كَانَ خَيْرُ أَهْلِ زَمَانِهِ وَكَانَ أَجْمَلُهُمْ وَاَصْبَحِهِمْ وَجْهًا وَكَانَ كَمَا قَالَ تَعَالَى (سَيِّدًا وَحَصُوْرًا) وَكَانَ لاَ يَجْتَاجُ إِلَى النِّسَاءِ فَهَوَتْهُ إِمْرَأَةُ مَلِكِ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَكَانَتْ بَغِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَعَصَمَهُ اللهُ وَامْتَنَعَ يَحْيى وَأَبَى عَلَيْهَا فَاَجْمَعَتْ عَلَى قَتْلِ يَحْيى وَلَهُمْ عِيْدٌ يَجْتَمِعُوْنَ فِىْ كُلِّ عَامٍ وَكَانَتْ سُنَّةُ الْمَلِكِ أَنْ يُوْعِدَ وَلاَ يَخْلِفَ وَلاَ يَكْذِبَ قَالَ فَخَرَجَ الْمَلِكُ إِلَى الْعِيْدِ فَقَامَتْ امْرَأَتُهُ فَشَيَّعَتْهُ وَكَانَ بِهَا مُعْجِبًا وَلَمْ تَكُنْ تَفْعَلُه فِيْمَا مَضي فَلَمَّا اَنْ شَيَّعَتْهُ قَالَ الْمَلِكُ سَلِيْنِىْ فَمَا سَأَلْتِنِىْ شَيْئًا إِلاَّ أَعْطَيْتُكِ قَالَتْ أُرِيْدُ دَمَ يَحْيَي بْنَ زَكَرِيَّا قَالَ لَهَا سَلِيْنِىْ غَيْرَهُ قَالَتْ هُوَ ذَاكَ قَالَ هُوَلَكَ قَالَ فَبَعَثَتْ جَلاَوِزَتَهَا إِلَى يَحْيى وَهُوَ فِىْ مِحْرَابِهِ يُصَلِّى وَأَنَا اِلى جَانِبِهِ أُصَلِّىْ قَالَ فَذَبَحَ فِىْ طَشْتٍ وَحَمَلَ رَأْسَه وَدَمَهُ اِلَيْهَا قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَلَغَ مِنْ صَبْرِكَ قَالَ مَا انْفَتَلْتُ مِنْ صَلاَتِىْ فَلَمَّا حَمَلَ رَأْسَهُ إِلَيْهَا فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهَا فَلَمَا اَمْسَوْا خَسَفَ اللهُ بِالْمَلِكِ وَأَهْلِ بَيْتِهِفَلَمَّا أَصْبَحُوْا قَالَتْ بَنُوْ أَسْرَائِيْلَ قَدْ غَضِبَ إِلهُ زَكَرِيَّا لِزَكَرِيَّا فَتَعَالُوْا حَتَّى نَغْضَبَ لِمَلِكِنَا فَنَقْتُلَ زَكَرِيَّا قَالَ فَخَرَجُوْا فِىْ طَلَبِىْ لِيَقْتُلُوْنِىْ وَجَاءَنِى النَّذِيْرُ فَهَرَبْتُ مِنْهُمْ وَإِبْلِيْسُ أَمَامَهُمْ يَدُلُّهُمْ عَلَىَّ فَلَمَّا تَخَوَّفْتُ أَنْ لاَ أُعْجِزَهُمْ عَرَضَتْ لِىْ شَجَرَةٌ فَنَادَتْنِىْ وَقَالَتْ إِلَىَّ إِلَىَّ وَانْصَدَعَتْ لِىْ وَدَخَلْتُ فِيْهَا قَالَ وَجَاءَ إِبْلِيْسُ حَتّى اَخَذَ بِطَرَفِ رِدَائِيْ وَالْتَأَمَتِ الشَّجَرَةُ وَبَقِىَ طَرَفُ رِدَائِىْ خَارِجًا مِنَ الشَّجَرَةِ وَجَاءَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ فَقَالَ إِبْلِيْسُ أَمَا رَأَيْتُمُوْهُ دَخَلَ هذِهِ الشَّجَرَةَ هذَا طَرَفُ رِدَائِهِ دَخَلَهَا بِسِحْرِهِ فَقَالُوْا نُحَرِّقُ هذِهِ الشَّجَرَةَ فَقَالَ إِبْلِيْسُ شُقُّوْهُ بِالْمِنْشَارِ شَقًّا قَالَ فَشُقِقْتُ مَعَ الشَّجَرَةِ بِالْمِنْشَارِ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ وَجَدْتَ لَه مَسًّا قَالَ أَوْ وَجَعًا قَالَ لاَ إِنَّمَا وَجَدْتُ ذلِكَ الشَّجَرَةَ الَّتِىْ جَعَلَ اللهُ رُوْحِىْ فِيْهَا .

"ইব্‌ন আব্বাস (রা) বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর ইসরা ও মি'রাজ হইয়াছিল সেই রাত্রিতে তিনি আসমানে যাকারিয়্যা (আ)-কে দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে সালাম প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে আবূ ইয়াহ্‌ইয়া! আপনাকে কিভাবে হত্যা করা হইয়াছিল সেই সম্পর্কে আমাকে বলুন এবং বনূ ইসরাঈল কেন আপনাকে হত্যা করিয়াছিল? যাকারিয়্যা (আ) বলিলেন, হে মুহাম্মাদ! তাহা হইলে আপনাকে বলি ঃ ইয়াহ্‌ইয়া তাহার সময়ের সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিল, সৌন্দর্য এবং উজ্জ্বলতার দিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ চেহারার অধিকারী, আল্লাহ যেইরূপ বলিয়াছেন (নেতা ও স্ত্রী বিরাগী) ঠিক অনুরূপই ছিল। তাহার মহিলাদের প্রয়োজন হইত

না। কিন্তু বনূ ইসরাঈলের বাদশাহের স্ত্রী তাহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িল। এই নারী ছিল দুশ্চরিত্রা। সে ইয়াহ্ইয়ার নিকট কুপ্রস্তাবসহ লোক পাঠাইল। আল্লাহ্ ইয়াহ্ইয়াকে রক্ষা করিলেন, সে বিরত থাকিল এবং অস্বীকৃতি জানাইল। ফলে কুল্টা নারী ইয়াহ্ইয়াকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। তাহাদের একটি বাৎসরিক উৎসব ছিল, এই উৎসবে তাহারা সকলে একত্রিত হইত। বাদশার অভ্যাস ছিল এই উপলক্ষে সে যে ওয়াদা করিত উহা ভঙ্গ করিত না এবং মিথ্যাও বলিত না। বাদশাহ্ উৎসবের উদ্দেশ্যে বাহির হইবার মনস্থ করিলে তাহার স্ত্রী তাহাকে দাঁড়াইয়া বিদায় জানাইল। বাদশাহ ছিল স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত দুর্বল। ইতোপূর্বে সে এইভাবে বাদশাহকে বিদায় জানাইত না। বাদশাহ বলিল ঃ তুমি আমার নিকট প্রার্থনা কর, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাই তোমাকে প্রদান করা হইবে। স্ত্রী বলিল ঃ আমি ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যার রক্ত চাই। বাদশাহ বলিল, ইহা ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা কর। স্ত্রী বলিল, না, আমি ইহাই চাই। বাদশাহ বলিল, তোমার জন্য ইহাই করা হইবে। নারী তাহার ঘাতককে ইয়াহ্ইয়ার নিকট প্রেরণ করিল। তখন তিনি মিহ্রাবে সালাত আদায় করিতেছিলেন। আমিও (যাকারিয়্যা) তাহার পার্শ্বে সালাত আদায় করিতেছিলাম। সে তাহাকে হত্যা করিল এবং তাহার মস্তক ও রক্ত একটি থালায় করিয়া ঐ নারীর নিকট বহন করিয়া লইয়া গেল। রাসূলুল্লাহ (স) যাকারিয়্যা (আ)-কে বলিলেন ঃ আপনি কি পরিমাণ ধৈর্য ধারণ করিলেন? তিনি বলিলেন ঃ আমি সালাত হইতে বিরত হই নাই। বাদশাহের স্ত্রীর সামনে ইয়াহ্ইয়ার মস্তক ও রক্ত রাখিবার পর যখন সন্ধ্যা হইল তখন আল্লাহ্ তাআলা বাদশাহ ও তাহার পরিবারকে ভূগর্ভে ধ্বসাইয়া দিলেন। যখন প্রভাত হইল তখন বনূ ইসরাঈল বলিতে থাকিল যে, যাকারিয়্যার প্রভু যাকারিয়্যার স্বার্থে রাগান্বিত হইয়াছেন। কাজেই আমরা আমাদের বাদশাহের জন্য রাগান্বিত হইব এবং যাকারিয়্যাকে হত্যা করিব। যাকারিয়্যা বলিলেন ঃ তাহারা আমাকে হত্যা করিতে আমার অনুসন্ধানে বাহির হইল। সতর্ককারী আমাকে সতর্ক করিয়া দিলে আমি পলায়ন করিলাম, কিন্তু ইবলীস তাহাদের সম্মুখে ছিল এবং আমার ব্যাপারে তাহাদিগকে পথ দেখাইতেছিল। যখন আমি ভয় করিলাম যে, তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারিব না, তখন একটি বৃক্ষ আমার সামনে পড়িল। বৃক্ষটি আমাকে ডাক দিয়া বলিল, আমার দিকে, আমার দিকে। আমার জন্য বৃক্ষটি ফাঁক হইয়া গেল এবং আমি উহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম, কিন্তু ইবলীস আসিয়া আমার চাদরের আঁচল ধরিয়া ফেলিল। বৃক্ষটি জোড়া লাগিয়া গেল কিন্তু আমার চাদরের আঁচল বাহিরে রহিয়া গেল। বনূ ইসরাঈল আসিলে ইবলীস বলিল, তোমরা কি প্রত্যক্ষ কর নাই যে, সে যাদু করিয়া এই গাছের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে, আর এই হইল তাহার চাদরের আঁচল। তাহারা বলিল, তাহা হইলে আমরা বৃক্ষটিকে পোড়াইয়া ফেলিব। ইবলীস বলিল, না, বরং করাত দ্বারা বৃক্ষকে খণ্ডিত করিয়া ফেল। যাকারিয়্যা (আ) বলেন, গাছের সহিত করাত দ্বারা আমিও দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেলাম। নবী (স) বলিলেন ঃ আপনি কি কোন স্পর্শ, ভয় বা ব্যথা পাইয়াছিলেন? যাকারিয়্যা (আ) বলিলেন, না, বরং এই বৃক্ষের মধ্যেই আল্লাহ আমার প্রাণশক্তি রাখিয়া দিয়াছিলেন" (আল-বিদায়া, ২খ, ৫৪)।

হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর পেশা

নিঃসন্দেহে যাকারিয়্যা (আ) বানূ ইসরাঈলের মধ্যে অত্যন্ত মর্যাদাবান নবী ছিলেন। আল্লাহ্‌র নবীগণ কখনও পরনির্ভর বা অন্যের গলগ্রহ হইয়া থাকিতে মোটেই পছন্দ করিতেন না। তাই দেখা যায় এক এক নবী জীবন যাপনের জন্য এক এক ধরনের পেশা বাছিয়া লইয়াছিলেন। মানুষ হইতে কোন কিছু গ্রহণ করাকে দাওয়াতী কাজের বিনিময় মনে করা হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা সর্বদা মানুষের অনুগ্রহ হইতে দূরে থাকিতেন (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫৩)। আল-কুরআনে নবীদের বক্তব্য আসিয়াছে এইভাবে ঃ

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ اَجْرِىَ إِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"উহার মুকাবিলায় আমি তোমাদের নিকট কোন বিনিময় চাহি না, আমার বিনিময় একমাত্র জগৎসমূহের প্রতিপালকের নিকট" (সূরা শুয়ারা ঃ ১০৯)।

এই দৃষ্টিভঙ্গিতে হযরত যাকারিয়্যা (আ)-ও নিজের জীবিকার জন্য কাঠমিস্ত্রির পেশা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সহীহ মুসলিম, ইব্ন মাজা ও মুসনাদে আহমাদের বর্ণনা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় ঃ

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا .

"আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (আ) বলিয়াছেন ঃ যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন কাঠমিস্ত্রি" (মুসলিম, কিতাবুল ফাদায়িল, ৫খ, ১৩৫; ইব্ন মাজা, কিতাবুত তিজারাত, ২খ, ৭২৭)।

মারয়াম (আ)-এর জন্ম ও যাকারিয়্যা (আ)

আল-কুরআনের সূরা আল 'ইমরানে হযরত যাকারিয়্যা (আ) প্রসংগ শুরু করিবার পূর্বে মারয়াম (আ)-এর জন্ম প্রসংগ উল্লেখ করা হইয়াছে। হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রীর এক বোন ছিল যার নাম বাইবেলে "আদার হান্নাহ" এবং মুসলিম ঐতিহাসিকদিগের নিকট "হান্নাহ বিনতে ফাকূয"। (আল-কামিল, ১খ, ১৬৯)। এই হান্নাহ্‌র স্বামীর নাম ছিল 'ইমরান ইবন মাছান, যিনি অত্যন্ত মর্যাদা-সম্পন্ন বুযুর্গ এবং বনূ ইসরাঈলের মধ্যে বিখ্যাত নেককার ও সাথে সাথে "হায়কাল"-এর প্রসিদ্ধ যাজক ছিলেন। হান্নাহ বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছিলেন কিন্তু কোন সন্তানের মা হইতে পারেন নাই। তিনি একদা একটি বৃক্ষের ছায়ায় উপবেশন করিয়াছিলেন এবং সেই অবস্থায় দেখিতে পাইলেন যে, একটি পাখি তাহার ছানাকে আহার করাইতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া তাহার সন্তান লাভের আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইল (আল-কামিল, ১খ, ১৬৯)। তখন তিনি একাগ্রচিত্তে আল্লাহ তাআলার নিকট দো'আ করিয়া বলিলেন, "হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে একটি পুত্র সন্তান দান কর তাহা হইলে তাহাকে আমি হায়কালের খিদমতের জন্য ওয়াক্ফ করিয়া দিব"। তাহাদের নিকট এইরূপ মান্নতের পদ্ধতি চালু ছিল। এই জাতীয় সন্তানেরা সারা জীবন গীর্জার খিদমতে অতিবাহিত করিত। এইরূপ মান্নত শুধুমাত্র পুত্র সন্তানদের ক্ষেত্রে করা হইত। কেননা কন্যাসন্তানগণ এই জাতীয় খিদমতের উপযুক্ত ছিল না (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৩-৪৪)।

আল্লাহ তা'আলা হান্নাহ বিনতে ফাকূযের দো'আ কবুল করিয়া তাহাকে গর্ভধারিনী হইবার সৌভাগ্য দান করিলেন। এই সময়ে হান্নাহ তাহার গর্ভের সন্তানকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য দান করিয়াছিলেন। তাহার উদ্দেশ্য ছিল এই সন্তান জাগতিক যাবতীয় কার্যকলাপ হইতে মুক্ত থাকিয়া শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত এবং "হায়কাল"-এর খেদমতে জীবন কাটাইয়া দিবে। তাহার একান্ত আকাংখা ছিল যেন পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হয়। পবিত্র কুরআনে এই প্রসংগ বিবৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

إِذْ قَالَتِ امْرَءَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَافِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

"স্মরণ কর যখন 'ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং আমার নিকট হইতে তুমি ইহা কবুল কর, তুমি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (সূরা আল 'ইমরান ঃ ৩৫)।

হান্নাহ আশা করিয়াছিলেন যে, তাহার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, কিন্তু হইল বিপরীত। তাই তিনি মনে মনে আফসোস করিতেছিলেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ, ৩৩৯)। কন্যা সন্তান দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, আল কুরআনের ভাষায় ঃ رَبِّ إِنِّىْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰى

"হে আমার প্রতিপালক! আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি"(আল 'ইমরান ঃ ৩৬)।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা এই রকমই ছিল। তাই আল্লাহ তা'আলার পথ হইতে বলা হইল ঃ

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثٰى

"সে যাহা প্রসব করিয়াছে আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত; পুত্র তো কন্যার মত নহে" (আল 'ইমরান ঃ ৩৬)।

এইখানে মূলত বুঝানো হইয়াছে যে, কন্যা সন্তান হইলেও সে অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন হইবে (ফী যিলালিল কুরআন, ১খ, ৩৯২)। তখন হান্নাহসহ উপস্থিত সকলে মিলিত হইয়া তাহার নাম রাখিলেন মারয়াম (مَرْيَمْ)। তাহাদের ভাষায় 'মারয়াম' শব্দের অর্থ হইল 'ইবাদতকারিণী, আল্লাহর জন্য নিবেদিতা' اَلْعَابِدَةُ وَخَادِمَةُ لِرَبِّ (দ্র.সাফওয়াতু'ত-তাফাসীর, ১খ, ১৯৯)। আর সাথে সাথে শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে সংরক্ষণের দু'আ করিয়া তিনি বলিলেন ঃ

وَاِنِّىْ سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَاِنِّىْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"আমি উহার নাম রাখিয়াছি "মারয়াম"; এবং অভিশাপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি" (আল 'ইমরান ঃ ৩৬)।

আল্লাহ তা'আলা হান্নাহ্র এই দু'আ কবুল করিয়াছেন এবং মারয়াম ও তাহার পুত্র 'ঈসাকে শয়তানের কুমন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিয়াছেন (তাফসীর বায়দাবী, ১খ, ১৫৭)। ইহার প্রমাণ রহিয়াছে বুখারী এবং মুসলিমে বর্ণিত হাদীছে ঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ إِلاَّ مَسَّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّهِ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ قَرَأَ وَإِنِّيْ أُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ·

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ এমন কোন নবজাতক নাই যাহাকে জন্মের মুহূর্তে শয়তান স্পর্শ করে না। আর তখন সে শয়তানের স্পর্শে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। তবে মারয়াম এবং তাহার সন্তান ইহার ব্যতিক্রম। অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করিলেন ঃ অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার নিকট আশ্রয় চাহিতেছি" (ইবন কাছীর, তাফসীর, ১খ, ৩৩৯)।

মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে যাকারিয়্যা (আ)

এই মারয়াম নাম্নী ক্ষণজন্মা কন্যার তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন হযরত যাকারিয়্যা (আ)। আল্লাহ তা'আলা মারয়ামকে বিশেষ ফযীলত ও মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে 'হায়কাল'-এর প্রচলিত নিয়মনীতি ভঙ্গ করিয়া উহার খিদমতকারিনী হিসাবে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন। ফলে হায়কালের খাদেমদের মনে তাঁহার ব্যাপারে বিশেষ কৌতুহল সৃষ্টি হইয়াছিল (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, ২৬৬; আল-বিদায়া, ১খ, ৪৪)। আল্লাহ তা'আলা তাহাকে গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাহার সবচাইতে বড় প্রমাণ হইল কুরআনের বাণী ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ·

"অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে সাগ্রহে কবুল করিলেন এবং তাহাকে উত্তমরূপে লালন-পালন করিলেন" (আল ইমরান ঃ ৩৭)।

তবে একটা প্রশ্নে 'হায়কাল'-এর যাজকগণ পরস্পর মতানৈক্য করিতে লাগিলেন যে, কে মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইবেন? কেননা মারয়াম ছিল তাহাদের নেতা এবং উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক 'ইমরান ইবন মাছানের দুহিতা। তাই তাহাদের প্রত্যেকেই মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হওয়াকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় মনে করিতে লাগিলেন (আল-কামিল, ১খ, ১৭০; তাফসীর ফাতহুল কাদীর, ১খ, ৩৩৯)।

হযরত যাকারিয়্যা (আ) বলিলেন, আমি তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইবার বেশি হকদার। কেননা তাহার খালা আমার নিকটে রহিয়াছে। কিন্তু অন্যরা এই ব্যাপারে ছাড় দিতে রাজি হইল না। তাই অবশেষে লটারীর মাধ্যমে ফয়সালা হইবে বলিয়া ঠিক করা হইল। আল্লাহ তা'আলার ভাষায় ঃ

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُوْنَ أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ·

"ইহা অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ, যাহা তোমাকে ঐশীবাণী দ্বারা অবহিত করিতেছি। মারয়ামের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব তাহাদের মধ্যে কে গ্রহণ করিবে ইহার জন্য যখন তাহারা তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিতেছিল, তুমি তখন তাহাদের নিকট ছিলে না এবং যখন তাহারা বাদানুবাদ করিতেছিল তখনও তুমি তাহাদের নিকট ছিলে না" (আল 'ইমরান ঃ ৪৪)।

এই আয়াতের তাফসীরে বিস্তারিত ঘটনা বিভিন্ন তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার সংক্ষিপ্তসার হইল ঃ হায়কালে সুলায়মানীর খেদমত এবং হেফাযতের জন্য একদল খাদেম এবং স্বেচ্ছাসেবক নিযুক্ত থাকিতেন। তাহারা 'ইবাদতখানার রক্ষণাবেক্ষণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, সালাতে ইমামতি করা ইত্যাদি দায়িত্ব অতি যত্নের সহিত পালন করিতেন। মারয়ামের পিতা 'ইমরান এই দলের নেতা ছিলেন এবং সালাতে তিনি ইমামতিও করিতেন। তাহার ইন্তিকালের পর যখন হান্নাহ মারয়ামকে লইয়া বায়তুল মাকদিসে গিয়া বলিলেন, এই কন্যাকে আমি হায়কালের উদ্দেশ্যে রাখিয়া যাইতে চাই। তখন যাকারিয়্যা (আ) বলিলেন, আমিই তাহার তত্ত্বাবধায়ক হইব। কিন্তু তাহাতে অন্যান্য যাজকগণ রাজি হইলেন না, বরং তাহারা লটারী করিবার পরামর্শ দিলেন। অবশেষে তাহারা সকলে জর্দান নদীর তীরে যাইয়া হাজির হইলেন এবং যে কলম দ্বারা তাহারা তাওরাত লিখিতেন সেই কলমকে নদীর স্রোতের মধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। যে কোন লটারীর ক্ষেত্রেই তাহারা এইরূপ তাওরাত লিখিবার কলমকে নিক্ষেপ করিতেন। যাহার কলম স্রোতে ভাসিয়া না যাইয়া স্থির থাকিত অথবা স্রোতের উল্টা দিকে যাইত তিনি লটারী জিতিয়াছেন বলিয়া মান্য করা হইত। অবশেষে সবাইকে অবাক করিয়া দিয়া যাকারিয়্যা (আ)-এর কলম স্থির রহিল এবং স্রোতের উল্টা দিকে যাইতে লাগিল (তাফসীরু'ত-তাবারী, ৩খ, ৩৬২; তাফসীর ইব্ন আতিয়্যাহ, ৩খ, ১১৬-১১৭; তাফসীর ইব্ন কাদীর, ১খ, ৩৪৩; জাসসাস, আহকামুল কুরআন, ২খ, ১৬; কুরতুবী, আল-জামে লি-আহ্কামিল কুরআন, ৪খ, ৯১-৯৪; ফাতহুল কাদীর, ১খ, ৩৩৯; আল-কামিল, ১খ, ১৭০; আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী তাফসীরে কুরআন, পৃ. ১৩৩)। বুখারী শরীফেও এই সংক্রান্ত স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে ঃ

بَابُ الْقُرْعَةِ فِى الْمُشْكِلاَتِ وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ (إِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِقْتَرَعُوْا فَجَرَتِ الاَقْلاَمُ مَعَ الجِرْيَةِ وَعَالَ قَلَمُ ذَكَرِيَّا الجِرْيَةَ فَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا .

"সমস্যাসংকুল বিষয়ে লটারী প্রসংগে এই পরিচ্ছেদ; এবং আল্লাহ তা'আলার বাণী ("যখন তাহারা তাহাদের কলমগুলি নিক্ষেপ করিতেছিল তাহাদের মধ্যে কে মারয়ামের তত্ত্বাবধায়ক হইবে"?)। ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, তাহারা লটারী করিল, অতঃপর স্রোতের সহিত কলমগুলি ভাসিয়া গেল এবং যাকারিয়্যার কলম স্রোতের উঁচুতে উঠিয়া গেল তখন যাকারিয়্যা তাহার অভিভাবক হইলেন" (ফাতহুল বারী, ৫খ, ৩৪৫)। এইভাবে আল্লাহ তা'আলা মারয়ামকে তাঁহার স্নেহময় খালু এবং স্নেহময়ী খালার ক্রোড়ে নিয়া আসিলেন।

যাকারিয়্যা (আ)-এর ক্রোড়ে শিশু মারয়াম

লটারীর মাধ্যমে যে অসাধারণ শিশুর তিনি তত্ত্বাবধায়ক হইয়াছেন তাহার প্রতি তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী 'ঈশা' বিশেষ যত্ন নিতেন। শিশু মারয়াম তাঁহার খালা উম্মে য়াহ্য়ার তত্ত্বাবধানে দুধ পান করিতেন (আল-কামিল, ১খ, ১৭০)। খালা ব্যতীত অন্য কোন মহিলার দুধ সাধারণত তিনি পান করিতেন না। শিশুকাল হইতেই এক ব্যতিক্রম চরিত্র লইয়া এই শিশুকন্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই রকম পূত-পবিত্র এক শিশুর তত্ত্বাবধায়ক হইতে পারিয়া হযরত যাকারিয়্যা (আ) সদাসর্বদা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করিতেন এবং তাঁহার যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর থাকিতেন। এই শিশু মারয়াম যখন একটু বড় হইলেন তখন যাকারিয়্যা (আ) তাঁহার জন্য মসজিদের একটি উচু প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দিনের বেলায় তিনি একাকী ঐ প্রকোষ্ঠে নিরিবিলি 'ইবাদতে মশগুল থাকিতেন, এমনকি খাবার-দাবারের জন্যও বাহির হইতেন না, আর আপন খালার গৃহেই রাত্রি যাপন করিতেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, ২৬৭)।

মারয়ামের প্রতি আল্লাহর বিশেষ নেয়ামত ও যাকারিয়্যা (আ)-এর ভূমিকা

মসজিদের মধ্যে মারয়ামের জন্য যে প্রকোষ্ঠ নির্দিষ্ট হইয়াছিল ঐ প্রকোষ্ঠে সিঁড়ি ব্যতীত আরোহণ করা যাইত না এবং যাকারিয়্যা (আ) মারয়ামের নিকট নিয়মিত যাতায়াতরত অবস্থায় দেখিতে পাইতেন যে, মারয়ামের নিকট টাটকা বেমৌসুমী ফলমূলের বিপুল সমাহার। একাধিকবার যখন তিনি ইহা প্রত্যক্ষ করিলেন তখন মারয়ামকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "এই ফলমূল তোমার জন্য কোথা হইতে আসিল"? মারয়াম উত্তর দিলেন, "ইহা তো আল্লাহর পক্ষ হইতে"। আল-কুরআনে এইভাবে বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"যখনই যাকারিয়্যা কক্ষে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট খাদ্য-সামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, হে মারয়াম! এইসব তুমি কোথায় পাইলে? সে বলিত, উহা আল্লাহর নিকট হইতে, আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত জীবনোপকরণ দান করেন" (আল 'ইমরান ঃ ৩৭)। (দ্র. রূহুল মা'আনী, ২খ, ১৪৩; জালালায়ন, পৃ. ১৭; তাফসীর সা'দী, পৃ. ১০৬)।

যাকারিয়্যা (আ) যে স্থানে দাঁড়াইয়া ইমামতি করিতেন ঐ স্থানকেও মিহরাব বলা হইত। বায়তুল মাকদিসে এখনও পর্যন্ত হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর মিহরাবকে সংরক্ষণ করিয়া রাখা হইয়াছে। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে আমরা এই ঐতিহাসিক মিহরাবের ছবি সংযোজন করিলাম।

যাকারিয়্যা (আ)-এর মিহ্‌রাব (বায়তুল মাকদিস)।
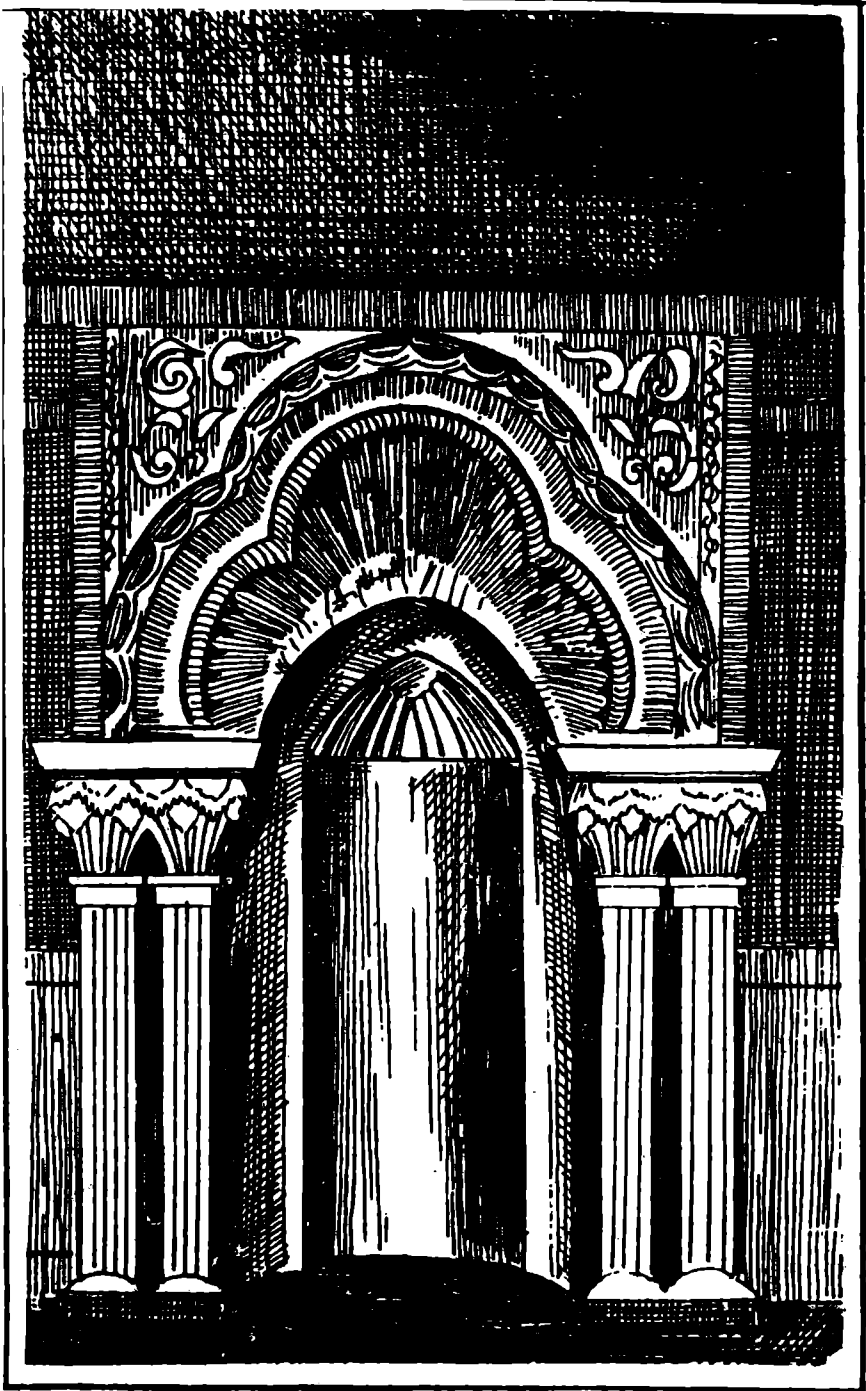
যাকারিয়্যা (আ)-এর পুত্র সন্তানের জন্য দু'আ

আল্লাহর নবী যাকারিয়্যা (আ) কখনও আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হন নাই। তদুপরি যখন তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মারয়ামকে বেমৌসুমী ফলমূল দান করিতেছেন তখন তাঁহার আশা-ভরসাও প্রবল হইল। তাই তিনি পুত্র সন্তান লাভের জন্য দু'আ করিবার মনস্থ করিলেন। এই সময়ে যাকারিয়্যা (আ) অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। ইবন কাছীরের বর্ণনামতে তাঁহার বয়স ছিল সাতাত্তর বৎসর। ছা'লাবীর বর্ণনা অনুযায়ী তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯০/৯২ অথবা ১২০ বৎসর (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫৫)। তদুপরি তাঁহার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। তাই নিজের বার্ধক্য এবং স্ত্রীর বন্ধ্যাত্বের দরুণ স্বাভাবিক নিয়মে সন্তান হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। বাইবেলের বর্ণনায় "কিন্তু তাহাদিগের কোন সন্তান ছিল না, কেননা এলিজাবেথ ("ঈশা" যাকারিয়্যার স্ত্রী) বন্ধ্যা ছিলেন এবং তাহারা উভয়ে বয়সের দিক দিয়াছিলেন অত্যন্ত প্রৌঢ়" (লূক লিখিত সুসমাচার, ১ ঃ ৭)।

যাকারিয়্যা (আ) পুত্র সন্তানের জন্য এই কারণে বেশী আগ্রহী ছিলেন যাহাতে তাঁহার অনুপস্থিতিতে এই সন্তান তাঁহার সম্প্রদায়কে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাইতে পারে। কেননা ভ্রষ্টতার কিছু কিছু চিহ্ন তাঁহার সম্প্রদায়ের নিকট ইতোমধ্যে প্রকাশিত হইতেছিল (মা'আল আম্বিয়া ফিল কুরআন, পৃ. ৩১৩)। আল্লাহর কুদরত এবং অকল্পনীয় শক্তির ব্যাপারে যাকারিয়্যা (আ)-এর ছিল দৃঢ় ঈমান। তাই তিনি অত্যন্ত বিনয়াবনত চিত্তে, হৃদয়ের সবটুকু আবেগ উজাড় করিয়া দিয়া, আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাসী হইয়া সন্তানের জন্য দু'আ করিলেন। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ‧

"সেখানেই যাকারিয়্যা তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে তোমার পক্ষ হইতে সৎ বংশধর দান কর; তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী" (আল 'ইমরান ঃ ৩৮)।

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا‧إِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا‧قَالَ رَبِّ إِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَّلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ‧ وَإِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ وَكَانَتِ امْرَأَتِيْ عَاقِرًا ‧ فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ‧ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ‧

"ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি, যখন সে নিভৃতে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে; হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দিগের ব্যাপারে আমি আশংকা করি, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়া'কূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন" (সূরা মারয়াম ঃ ০২-০৬)।

কাতাদা (র) বলিয়াছেন, বৃদ্ধ ব্যক্তির সন্তানের জন্য দু'আ নিভৃতে হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেননা অন্যদের নিকটে ইহা অবশ্যই অসামাঞ্জস্যপূর্ণ মনে হইবে। তাই গভীর রাত্রে সমগ্র প্রকৃত যখন

ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছে তখন তিনি কায়মনোবাক্যে আল্লাহকে ডাকিতে থাকিলেন। তিনি বলিলেন, ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি! ইয়া রাব্বি! সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা ডাকে সাড়া দিয়া বলিলেন, লাব্বায়িক, লাব্বায়িক, লাব্বায়িক! (আল-বিদায়া ,২খ, ৪৪)।

যাকারিয়্যা (আ) ধনসম্পদ এবং পার্থিব বস্তুর উত্তরাধিকারিত্বের জন্য সন্তান প্রার্থনা করেন নাই; বরং উত্তরাধিকারিত্ব বলিতে এইখানে মূলত নবুওয়াত, রিসালাত ও দাওয়াতী কাজের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝান হইয়াছে। তাই তিনি বলিয়াছেন ঃ

فَهَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۔ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ ۔

"তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে উত্তরাধিকারী দান কর, যে আমার এবং ইয়া'কূবের বংশের উত্তরাধিকারিত্ব করিবে" (মারয়াম ঃ ৫-৬)।

নবীগণ যে সম্পদ রাখিয়া যান উহা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদে পরিণত হয়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযীসহ অন্যান্য হাদীসে আসিয়াছে ঃ

نَحْنُ مَعْشَرَ الْاَنْبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ۔

"আমরা নবীদের দল, আমাদের উত্তরাধিকারী হয় না। আমরা যাহা রাখিয়া যাই তাহা সাদাকাহ" (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৫)।

অন্যদিকে যাকারিয়্যা (আ) তেমন কোন সম্পদের মালিক ছিলেন না, নিজের জীবিকার জন্য তাঁহার কাঠমিস্ত্রির কাজ করিতে হইত। আল্লাহর নবী দাউদ (আ)-ও নিজ শ্রমে উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এইখানে উত্তরাধিকারিত্ব বলিতে নবুওয়াতের উত্তরাধিকারিত্ব বুঝান হইয়াছে।

যাকারিয়্যা (আ)-এর সন্তানের জন্য দু'আকে আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত অলংকারপূর্ণ ভাষায় পরিপূর্ণ ভাব-গাম্ভীর্যের সহিত অতি সংক্ষেপে সূরা আম্বিয়াতে এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ

وَزَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۔

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ বা চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী" (আম্বিয়া ঃ ৮৯)।

আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়্যা (আ)-এর একনিষ্ঠ অন্তরের দু'আ কবুল করিলেন এবং তাঁহাকে ফেরেশতার মাধ্যমে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করিলেন। যাকারিয়্যা (আ) মিহরাবে সালাত আদায় করিতে ছিলেন এমন সময়ে এক সুদর্শন যুবককে দেখিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, আমি জিবরাঈল! তোমাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করিবার নিমিত্তে আগমন করিয়াছি (আল-কামিল, ১খ, ১৭০)। আল-কুরআনে এই সুসংবাদের বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

"যখন যাকারিয়্যা কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিল তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন। সে হইবে আল্লাহর বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী-বিরাগী এবং পূণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী" (আল ইমরান ঃ ৩৯; দ্র. আত-তাফসীর আল-ওয়াদিহ, ৩খ, ৫৭)।

يَازَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۔

"হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি। তাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া, পূর্বে এই নামে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই" (মারয়াম ঃ ০৭)।

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَاَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۔

"তৎপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম ইয়াহ্ইয়া, আর তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়াছিলাম"(আম্বিয়া ঃ ৯০)।

বাইবেলের বিভিন্ন স্থানেও অনুরূপ বর্ণনা আসিয়াছে। যেমন, "একদা যখন সখরিয় নিজ পালার অনুক্রমে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন, তখন যাজকীয় কার্যের প্রথানুসারে গুলিবাট ক্রমে তাঁহাকে প্রভুর মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ধূপ জ্বালাইতে হইল। সেই ধূপদাহের সময়ে সমস্ত লোক বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল। তখন প্রভুর এক দূত ধূপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়, ভয় করিও না, কেননা তোমার মিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন, ও তুমি তাহার নাম যোহন রাখিবে। আর তোমার আনন্দ ও উল্লাস হইবে, এবং তাহার জন্মে অনেকে আনন্দিত হইবে। কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে; এবং ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে অনেককে তাহাদের সদাপ্রভুর প্রতি ফিরাইবে" (লূক, ০১ ঃ ৮-১৭)।

সুসংবাদ প্রাপ্তিতে যাকারিয়্যা (আ)-এর প্রতিক্রিয়া

এই অসম্ভব বস্তু লাভের সুসংবাদে যাকারিয়্যা (আ) যেমন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন অনুরূপভাবে একজন মানুষ হিসাবে আশ্চর্যান্বিতও হইলেন যে, কিভাবে সাধারণ নিয়ম-নীতির বাহিরে তাহার সন্তান জন্ম নিবে (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৫)। আল-কুরআনে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা আসিয়াছে ঃ

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَّقَدْ بَلَغَنِىَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِىْ عَاقِرٌ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَايَشَاءُ ۔

"সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে আর আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা! তিনি বলিলেন, এইভাবেই, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন" (আল ইমরান ঃ ৪০)।

قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَاَتِىْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۔ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۔

"সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে? অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত? তিনি বলিলেন, এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না" (মারয়াম ঃ ৮-৯)।

বাইবেলেও অনুরূপ বর্ণনা আসিয়াছে, "তখন সখরিয় দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল, সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এই সকল বিষয়ে সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি" (লূক, ০১ ঃ ১৮-১৯)।

মানব প্রকৃতির চাহিদা হইল, এই জাতীয় আশ্চর্যজনক ও নজীরবিহীন মহান ঘটনার নিদর্শন জানিতে চাওয়া। যেমন পরিপূর্ণ ঈমান ও দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহীম (আ) বলিয়াছিলেন ঃ

رَبِّ اَرِنِىْ كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ ٠

"হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে অবলোকন করাও কিভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর? তিনি বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না? সে বলিল, হাঁ অবশ্যই, তবে ইহা আমার অন্তরের প্রশান্তির জন্য" (সূরা বাকারা ঃ ২৬০)।

ঠিক একইভাবে আত্মতৃপ্তির জন্য হযরত যাকারিয়্যা (আ) আল্লাহ তাআলার নিকট ফরিয়াদ করিলেন, হে আল্লাহ! তুমি ইয়াহইয়ার জন্মের নিদর্শন দেখাও। কুরআনের ভাষায় ঃ

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَنْ لاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ٠

"সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না, আর তোমার প্রতিপালকের অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিবে" (আল 'ইমরান ঃ ৪১; দ্র. তাফহীমুল কুরআন, ২খ, ৬)।

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَنْ لاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ٠ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ٠

" সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন দিন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবে না। অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইঙ্গিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বলিল" (মারয়াম ঃ ১০-১১)।

ইব্‌ন কাছীর বলিয়াছেন, "নিদর্শন হইল, তোমার জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হইবে তিন দিন বাধ্যতামূলক তোমাকে মানুষের সাথে বাক্যালাপ হইতে বিরত থাকিতে হইবে। তুমি ইচ্ছা করিলেও ইঙ্গিত ব্যতীত সরাসরি কথা বলিতে পারিবে না; অথচ তোমার শরীর, মেযাজ, স্বাস্থ্য সব কিছুই অক্ষত রহিয়াছে" (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৬)।

মুজাহিদ, কাতাদাহ, 'ইকরিমা ও সুদ্দী বলিয়াছেন,

"কোন রোগ ব্যতীত তাঁহার জিহ্বার কথা বলিবার ক্ষমতা রহিল না" (আল-বিদায়া, ২খ,৪৬)। ইব্‌ন যায়দ বলিয়াছেন, "তিনি পড়িতে এবং তাসবীহ করিতে পারিতেন কিন্তু কাহারও সহিত কথা বলিতে পারিতেন না" (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৬)। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতামতের ভিত্তিতে বলা যাইতে পারে যে, হযরত যাকারিয়্যা (আ) মুক বা বোবা হইয়া যান নাই, বরং আল্লাহর যিকির ও 'ইবাদতের সময়ে তাঁহার জিহ্বা যথার্থ চালু ছিল, মানুষের সহিত কথা বলিতে গেলে তাহা বন্ধ হইয়া যাইত (আদওয়াউল বায়ান, ১খ, ২১৮)। কিন্তু মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তরজমানুল কুরআনের দ্বিতীয় খণ্ডে ৪৩২ পৃষ্ঠায় একটু ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "কুরআনের বক্তব্য দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত যে, যাকারিয়্যা (আ) মুক হইয়া যান নাই....। স্পষ্ট কথা হইল এই যে, যাকারিয়্যা (আ)-কে ইবাদত ও রোযা পালনের নির্দেশ দান করা হইয়াছিল। আর রোযা পালনের অন্যতম কাজ ছিল কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া নিশ্চুপ থাকা" (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, ২৭৩)।

বাইবেলেও এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়, "আর দেখ, এই সকল যে দিন ঘটিবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে, কথা কহিতে পারিবে না; যেহেতু আমার এই যে সকল বাক্য যথাসময়ে সফল হইবে, ইহাতে তুমি বিশ্বাস করিলে না। আর লোক সকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল, এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন; আর তিনি তাহাদের নিকটে নানা সংকেত করিতে থাকিলেন, এবং বোবা হইয়া রহিলেন। পরে তাঁহার উপাসনার সময় পূর্ণ হইলে তিনি নিজ গৃহে চলিয়া গেলেন। এই সময়ের পরে তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হইলেন; আর তিনি পাঁচ মাস আপনাকে সংগোপনে রাখিলেন" (বাইবেল, লূক, ০১ ঃ ২০-২৪)।

ইয়াহ্‌ইয়ার (আ)-এর জন্ম

আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইল। যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী 'ঈশা' গর্ভবতী হইলেন। ইয়াহ্‌ইয়া (আ) গর্ভে থাকিতেই বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা ঘটিতে থাকে। উল্লেখ্য যে, 'ঈসা (আ)-এর মাতা মারয়াম এবং ইয়াহ্‌ইয়ার মাতা 'ঈশা' একই সময়ে গর্ভবতী ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়া মাতৃগর্ভে থাকিতেই 'ঈসা'-কে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। "আল্লাহর কালিমা (ঈসা) সত্যতা স্বীকারকারী" (আল 'ইমরান ঃ ৩৯) এই আয়াতের তাফসীরে ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন—

"ইয়াহ্‌ইয়া এবং ঈসা খালাত ভাই ছিলেন। ইয়াহ্‌ইয়ার মাতা মারয়ামকে বলিতেন, আমার মনে হয় আমার পেটের বাচ্চা তোমার পেটের বাচ্চাকে সিজ্‌দা করিতেছে। ইহাই হইল মাতৃগর্ভে

ইয়াহ্ইয়ার পক্ষ হইতে ঈসা (আ)-কে সত্য বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান। ইয়াহ্ইয়াই সর্বপ্রথম ঈসাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন; আর আল্লাহর কালিমা হইল ঈসা। ইয়াহ্ইয়া (আ) ঈসা (আ) হইতে বয়সে সামান্য বড় ছিলেন" (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১খ, ৩৪১; আল-কামিল, ১খ, ১৭০)।

গর্ভধারণের নির্ধারিত সময় শেষ হইবার পর যাকারিয়্যা (আ)-এর ঘরে নব চাঁদের উদয় ঘটিল। ইয়াহ্ইয়া দুনিয়াতে আগমন করিলেন। শিশুকাল হইতেই আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে অসাধারণ নিয়ামত দান করিয়াছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ছিলেন অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন (মাআল আম্বিয়া ফিল কুরআন, পৃ. ৩১৫)। ইবনুল আছীর ইয়াহইয়ার জন্মের সময়ে যাকারিয়্যা (আ)-এর আবেগ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

"যখন তিনি জন্মগ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার পিতা দেখিলেন যে, বাচ্চাটি অত্যন্ত সুদর্শন, কম চুল, খাট খাট আঙ্গুল, যুগল ভ্রুবিশিষ্ট, সূক্ষ্ম স্বরবিশিষ্ট এবং ছেলেবেলা হইতে আল্লাহর আনুগত্যে প্রবল" (আল-কামিল, ১খ, ১৭১; বিস্তারিত দ্র. ইয়াহ্ইয়া নিবন্ধ)।

অলৌকিক ঘটনা হিসাবে যাকারিয়্যা (আ)-এর ঘর আলোকিত হইল এবং বৃদ্ধ বয়সে তিনি উপযুক্ত সন্তানের পিতা হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিলেন। আল্লাহ তা'আলার এত বিরাট নিয়ামত লাভ করিয়া যাকারিয়্যা (আ) রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়ায় বিনয়াবনত হইবেন ইহাই স্বাভাবিক। এই শুকরিয়া আদায়ের সর্বোত্তম পন্থা হইল অধিক হারে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করা। তাই যাকারিয়্যা (আ) সন্তান জন্মগ্রহণের পর আরও অধিক আগ্রহ সহকারে আল্লাহর আনুগত্য করিতে থাকিলেন। আল-কুরআনের ভাষায় ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِيْنَ.

"তাহারা সৎকর্মের প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আশা ও ভীতির সহিত আমাকে ডাকিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত" (সূরা-আম্বিয়া ঃ ৯০)।

বাইবেলে এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং শুকরিয়া আদায়ের বিস্তারিত বর্ণনা আসিয়াছে। উহার কিয়দংশ এইরূপ, "তখন তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, ভাববাণী বলিলেন; তিনি কহিলেন, ধন্য প্রভু, ইস্রায়েলের প্রভু; কেননা তিনি তত্ত্বাবধান করিয়াছেন, আপন প্রজাদের জন্য মুক্তি সাধন করিয়াছেন, আর আমাদের জন্য আপন দাস দায়ূদের কুলে পরিত্রাণের এক শৃঙ্গ উঠাইয়াছেন, যেমন তিনি পুরাকাল অবধি তাঁহার সেই পবিত্র ভাববাদিগণের মুখ দ্বারা বলিয়া আসিয়াছেন— আমাদের শত্রুগণ হইতে ও যাহারা আমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের সকলের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন। আমাদের পিতৃপুরুষগণের প্রতি কৃপা করিবার জন্য, আপন পবিত্র নিয়ম স্মরণ করিবার জন্য। এ সেই দিব্য, যাহা তিনি আমাদের পিতৃপুরুষ আব্রাহামের কাছে শপথ করিয়াছিলেন, আমাদিগকে এই বর দিবার জন্য যে, আমরা শত্রুগণের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া নির্ভয়ে সাধুতায় ও ধার্মিকতায় তাঁহার আরাধনা করিতে পারিব, তাঁহার সাক্ষাতে যাবজ্জীবন করিতে পারিব। আর হে বালক! তুমি পরাৎপরের ভাববাদী বলিয়া আখ্যাত হইবে, কারণ তুমি প্রভুর সম্মুখে চলিবে, তাঁহার পথ প্রস্তুত করিবার জন্য; তাঁহার প্রজাদের পাপ মোচনে তাহাদিগকে পরিত্রাণের জ্ঞান

দিবার জন্য। ইহা আমাদের সদাপ্রভুর সেই কৃপাযুক্ত স্নেহহেতু হইবে, যদ্দ্বারা ঊর্ধ্ব হইতে ঊষা আমাদের তত্ত্বাবধান করিবে, যাহারা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া আছে, তাহাদের উপরে দীপ্তি দিবার জন্য, আমাদের চরণ শান্তিপথে চালাইবার জন্য" (বাইবেল ঃ লূক, ০১ ঃ ৬৭-৭৯)।

বাইবেলে উল্লিখিত যাকারিয়্যা (আ)-এর এই কৃতজ্ঞতামূলক বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইয়াহ্ইয়া (আ) বনূ ইসরাঈলের জন্য আল্লাহর অনুকম্পা হিসাবেই আগমন করিয়াছিলেন। ইয়াহ্ইয়া (আ) -এর জন্মকে যাকারিয়্যা (আ), পূর্বপুরুষ তথা ইবরাহীম (আ), দাউদ (আ)-সহ পরবর্তী লোকদের জন্যও বিধাতার অপার করুণা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, ২৭৪-২৭৫)।

যাকারিয়্যা (আ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রম

এই ধরাধামে আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন পথহারা মানবতাকে হিদায়াতের আলোর দিকে দাওয়াত প্রদান করিবার জন্য। প্রত্যেক নবীই তাঁহার উপর অর্পিত এই দায়িত্ব সুচারূপে আঞ্জাম দিয়াছেন। হযরত যাকারিয়্যা (আ)-ও এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করিয়াছেন। আল্লামা আফীফ তাব্বারার ভাষায় ঃ

"যাকারিয়্যা (আ) আল্লাহর একজন নবী। তিনি তাঁহার জীবনকে আল্লাহর দিকে দাওয়াতের কাজে এবং আল-কুদস শরীফের পবিত্র 'ইবাদতখানার খেদমতে ব্যয় করিয়াছেন" (মা'আল আম্বিয়া ফিল কুরআন, পৃ. ৩১৩)।

যাকারিয়্যা (আ) আল-কুদস শরীফে যাজকদিগের নেতা ছিলেন। তাই সেই সমাজে তাঁহার অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যতা ছিল। আল্লাহর নবী হিসাবে সবাই তাঁহাকে সম্মান করিত এবং তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিত। 'ইবাদতখানা বা হায়কালের সংরক্ষণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত তৎপর (দাইরাতুল মাআরিফ, ৯খ, ২৩২)। এইভাবে তিনি হায়কালের খেদমতের মাধ্যমে সর্বদা দাওয়াতে লিপ্ত থাকিতেন।

তিনি নিজ হাতে তাওরাত লিখিয়া মানুষের মাঝে বিতরণ করিতেন এবং লোকদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। এই তাওরাত লিখিবার প্রমাণ রহিয়াছে মারয়াম (আ)-এর তত্ত্বাবধায়ক নির্ধারণ করিবার ঘটনার মধ্যে। লটারীর জন্য যাজকগণ যে কলম নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ইহা দ্বারা তাওরাতের কপি করা হইত। ইমাম ইব্ন জারীর 'ইকরিমার সনদে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "এইজন্য যখন তাহারা লটারী করিল ঐ কলমসমূহের মাধ্যমে যাহা দ্বারা তাহারা তাওরাত লিপিবদ্ধ করিত...." (তাফসীর তাবারী, ৩খ, ৩৬৪-৩৬৫)।

যাকারিয়্যা (আ) স্বীয় সম্প্রদায়ের হেদায়াতের জন্য অত্যন্ত পেরেশান ছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের জন্য দু'আর একমাত্র কারণ ছিল যেন তাঁহার অবর্তমানে তাঁহার পুত্র দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখিতে পারেন (দ্র. মা'আল আম্বিয়া ফিল কুরআন পৃ. ৩১৩)।

যাকারিয়্যা (আ) কোন জনসমাবেশে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে চাহিলে প্রথমে দেখিতেন তথায় ইয়াহ্ইয়া (আ) রহিয়াছেন কিনা। ইয়াহ্ইয়া (আ) উপস্থিত থাকিলে তিনি জান্নাত অথবা জাহান্নামের প্রসংগ বক্তব্যের মধ্যে উল্লেখ করিতেন না (আল-কামিল, ১খ, ১৭১)।

তিনি সবর্দা লোকদিগকে আল্লাহ্র ইবাদত করিবার জন্য দাওয়াত পেশ করিতেন। সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র মহিমা ও প্রশংসা করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতেন। লোকেরা সর্বদা তাহার নির্দেশের অপেক্ষা করিত। এমনকি ইয়াহইয়ার জন্মের নিদর্শনস্বরূপ যখন তিন দিন তিনি লোকদের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারেন নাই, সেই সময়েও লোকেরা তাঁহার নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিল। তাই তিনি ইংগিতে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্র মহিমা-কীর্তন করিবার জন্য তাহাদের নির্দেশ দেন। আল্লাহ তা'আলার ভাষায় ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ٠

"অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল ও ইংগিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতে বলিল"(মারয়াম ঃ ১০)।

যাকারিয়্যা (আ) প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, যাহারা প্রকৃত 'দাঈ ইলাল্লাহ' (আল্লাহ্র পথে আহ্বানকারী) তাহারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মানুষের নিকট প্রতিদান চাহেন না।

وَمَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِىَ اِلاَّ عَلٰى رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٠

"উহার মুকাবিলায় আমি তোমাদের নিকট হইতে কোন প্রতিদান চাহি না, আমার প্রতিদান একমাত্র জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট" (সূরা শুআরা ঃ ১০৯)।

এই বক্তব্যই ছিল যাকারিয়্যা (আ)-এর জীবনের মিশন। তিনি নিজের কর্মের মাধ্যমে ইহাও প্রমাণ করিয়াছেন যে, যাহারা 'দাঈ ইলাল্লাহ' তাহারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যে কোন বৈধ পেশা গ্রহণ করিবেন । তিনি নিজে পেশায় কাঠমিস্ত্রি ছিলেন। মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে ঃ

"আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন-যাকারিয়্যা ছিলেন কাঠমিস্ত্রি বা সুতার" (মুসলিম, কিতাবুল ফাদাইল, ৫খ, ১৩৫)।

যাকারিয়্যা (আ)-এর ইন্তিকাল

যাকারিয়্যা (আ) কি স্বাভাবিকভাবে ইন্তিকাল করিয়াছিলেন, নাকি শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তাদের মধ্যে সামান্য মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। একদল মনে করেন, তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তিকাল করিয়াছিলেন। ওয়াহ্ব ইবন মুনাব্বিহ-এর বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ইব্ন কাছীর বলিয়াছেন, "তবে যাকারিয়্যা স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করিয়াছেন" (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৮)।

তবে প্রসিদ্ধ মত হইল, যাকারিয়্যা (আ) শাহাদাত বরণ করিয়াছিলেন। ইসলাম বিরোধী শক্তির হাতে তিনি তাজা লহু বিসর্জন দিয়া আল্লাহর দরবারে পাড়ি জমাইয়াছেন। তিনি কোন্ স্থানে কিভাবে শহীদ হইয়াছিলেন এই প্রসঙ্গে দুইটি মত রহিয়াছে ঃ

(ক) বাইবেলের নূতন নিয়ম হইতে জানা যায় যে, তিনি শত্রু পক্ষের হাতে বায়তুল মাকদিস এবং যবেহখানার মধ্যবর্তী স্থানে শহীদ হইয়াছেন। বাইবেল, মথিতে বলা হইয়াছে, নির্দোষ হাবিলের

খুন হইতে আরম্ভ করিয়া আপনারা যে, বরখিয়ের ছেলে যাকারিয়্যাকে পবিত্র স্থানে ও বেদীর মাঝখানে খুন করিয়াছিলেন সেই যাকারিয়্যার খুন পর্যন্ত দুনিয়াতে যত নির্দোষ লোক খুন হইয়াছে, আপনারা সেই সমস্ত রক্তের দায়ী হইবেন"(Book of Matthew, 11 : 51)। বাইবেলের এই বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকারিয়্যা (আ) 'ইবাদতখানা এবং বেদীর (যবেহখানা) মধ্যবর্তী স্থানে শাহাদত লাভ করিয়াছিলেন।

(খ) ইবনুল আছীর (আল-কামিল, ১খ, ১৭৪-১৭৫) এবং ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া, ২খ, ৪৮) যাকারিয়্যা-এর শাহাদাতের ঘটনা ভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। বাদশাহ হিরোডসের ভ্রাতুষ্পুত্রীর প্ররোচনায় ইয়াহ্ইয়া (আ) নিহত হইবার পর যাকারিয়্যা (আ) স্বীয় সম্প্রদায় হইতে পলায়ন করিয়া বায়তুল মাকদিসের নিকটবর্তী এক বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বাদশাহ তাঁহার অনুসন্ধানে লোক পাঠাই। তাহারা যখন বাগানে প্রবেশ করিল তখন তিনি একটি গাছের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। গাছটি ডাকিয়া বলিল, হে আল্লাহর নবী! আমার নিকট আশ্রয় নিন। তিনি গাছের নিকট গেলে উহা দুই ভাগ হইয়া গেল এবং তিনি উহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশকালে ইবলীস আসিয়া তাঁহার কাপড়ের অগ্রভাগ গাছের বাহিরে রাখিয়া দিল। এমতাবস্থায় গাছ জোড়া লাগিয়া গেল। অনুসন্ধানকারিগণকে ইবলীস বলিল, তোমরা কি খোঁজ করিতেছ? তাহারা বলিল, যাকারিয়্যাকে। ইবলীস বলিল, সে যাদু করিয়া এই গাছের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা বলিল, তুমি মিথ্যাবাদী। তখন ইবলীস তাহাদিগকে তাঁহার কাপড়ের অগ্রভাগ দেখাইল। তখন তাহারা বিশ্বাস করিল এবং একটা করাত লইয়া গাছকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিল। আর এইভাবেই যাকারিয়্যা (আ) শাহাদাত বরণ করিলেন (আল-কামিল, ১খ, ১৭৪-১৭৫)।

'আল-কামিল' কিতাবের সম্পাদনা এবং পাদটীকা প্রণয়ন বোর্ড ঘটনাকে কাল্পনিক বলিয়া অভিহিত করিয়াছে এবং বলিয়াছেন, ইহার দ্বারা ইবলীসের ক্ষমতার নিকট 'মু'জিযা পরাজিত হয়। তাই এই ঘটনা কাল্পনিক (আল-কামিল বৈরূত, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১খ, ১৭৫, পাদটীকা)।

যাকারিয়্যা (আ)-এর ইন্তেকালের সময়কাল

এ সম্পর্কে সরাসরি কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর শাহাদাতের ঘটনার সাথে সাথেই তাঁহার পিতা যাকারিয়্যা (আ)-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া বিভিন্ন ইতিহাসে উল্লেখ রহিয়াছে (আল-কামিল, ১খ, ১৭৪)। আর ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর শাহাদাতের ঘটনা ঘটিয়াছিল ৩০ খৃস্টাব্দে ঈসা (আ)-কে আসমানে উত্তোলনের মাত্র তিন বৎসর পূর্বে (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ২খ, ২৯৪)। এই ঘটনার উপর অনুমান করিয়া বলা যায় যে, যাকারিয়্যা (আ)-ও ৩০ খৃস্টাব্দে শাহাদত বরণ করেন।

যাকারিয়্যা (আ)-এর কবর

যাকারিয়্যা (আ) সারা জীবন বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই পবিত্র মসজিদের চত্বরে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছিল। এখনও পর্যটকগণ বায়তুল মুকাদ্দাসের চত্বরে যাকারিয়্যা (আ)-এর কবর যিয়ারত করিয়া থাকে (আম্বিয়ায়ে কুরআন ঃ ২খ, ২৬৪-২৬৫)।

যাকারিয়্যা (আ)-এর মর্যাদা

আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়্যা (আ)-কে অত্যন্ত মর্যাদাবান করিয়াছিলেন। আল-কুরআনে বিভিন্ন স্থানে ইহার বর্ণনা আসিয়াছে। সূরা আন'আমে তাঁহাকে প্রথম কাতারের নবীদের মধ্যে গণ্য করিয়া 'সৎকর্মশীল' বলা হইয়াছে ঃ

وَكُلاًّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِيْنَ وَمِنْ اٰبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۔

"এবং প্রত্যেককে বিশ্বজগতের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছিলাম এবং ইহাদিগের পিতৃপুরুষ, বংশধর এবং ভ্রাতৃবৃন্দের কতককে, তাহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলাম এবং সরল পথে পরিচালিত করিয়াছিলাম" (আন'আম ঃ ৮৫-৮৭)।

"উহাদিগকে কিতাব, কর্তৃত্ব এবং নবুওয়াত দান করিয়াছি" (আন'আম ঃ ৮৯) ।

বিশ্বনবী (সা)-কে আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়্যাসহ উল্লিখিত অন্যান্য নবীদিগের অনুসরণের নির্দেশ দিয়াছেন ঃ

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ ۔

"উহাদিগকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করিয়াছেন। অতএব তুমি তাহাদিগের পথের অনুসরণ কর" (আন'আম ঃ ৯০) ।

আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়্যা (আ)-কে স্বীয় বান্দা হিসেবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার নিজের সহিত যাকারিয়্যাকে সম্বন্ধযুক্ত করিয়াছেন। নিঃসন্দেহে ইহা মহান মর্যাদা।

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۔

"ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুকম্পার বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি" (মারয়াম ঃ ২)।

অন্যান্য নবীদের সঙ্গে যাকারিয়্যা (আ)-এর প্রশংসায় কুরআনে আসিয়াছে ঃ

إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ۔

"নিশ্চয় তাহারা কল্যাণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিত এবং আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকিত, আর তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত" (আম্বিয়া ঃ ৯০)।

যাকারিয়্যা (আ) কোন কিতাবের অনুসরণ করিতেন?

যাকারিয়্যা (আ)-কে যে নবুওয়াত দান করা হইয়াছিল তাহার প্রমাণ কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন স্থানে রহিয়াছে। সবচাইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইল আল্লাহর বাণী—

أُولٰئِكَ الَّذِيْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۔

"আমি উহাদিগকে কিতাব, কর্তৃত্ব ও নবুওয়াত দান করিয়াছি" (আনআম ঃ ৮৯)।

কিন্তু প্রশ্ন হইল তিনি কোন কিতাবের অনুসরণ করিতেন? তাফসীর এবং ইতিহাসের বিভিন্ন বর্ণনায় জানা যায় যে, যাকারিয়্যা (আ) তাওরাত কিতাবের অনুসরণ করিতেন। তাওরাতে নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী নিজে চলিতেন, বিচার-ফয়সালা করিতেন, লোকদিগকে ইহার দিকে আহ্বান জানাইতেন এবং নিজ হাতে তাওরাত লিখিয়া লোকদের মধ্যে বিতরণ করিতেন।

যাকারিয়্যা (আ) এবং মুহাম্মাদ (স)-এর মধ্যে সাদৃশ্য

(ক) আল্লাহ্ তা'আলা যাকারিয়্যা (আ)-কে এবং মুহাম্মাদ (স)-কে নিজের বান্দা বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন। যাকারিয়্যা (আ)-এর ক্ষেত্রে বলিয়াছেন—

ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۔

"ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুকম্পার বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি" (মারয়াম ঃ ২)।

আর মুহাম্মাদ (সা)-এর ক্ষেত্রে বলিয়াছেন—

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ ۔

"আমি আমার বান্দার প্রতি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছি তাহাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকিলে তোমরা তাহার অনুরূপ কোন সূরা আনায়ন কর" (বাকারা ঃ ২৩)।

তবে পার্থক্য এইটুকু যে, নবী করীম (স)-কে আমার বান্দা আর যাকারিয়্যা (আ)-কে তাঁহার বান্দা বলা হইয়াছে (দ্র. রাহমাতুললিল-'আলামীন, ২খ, ৩২৬)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম, (টীকাসহ বঙ্গানুবাদ) ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬ খৃ; (২) আল-কুরআনুল কারীম (টীকাসহ উর্দূ অনুবাদ, আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী), লাহোর, তা.বি., পৃ. ১৩৩; (৩) Old Testament (English translation) new world translation of the holy scriptures. Newyork revised 1984; (৪) New Testament (English translation) new world translation of the holy scriptures, New York revised 1984; (৫) The New Encyclopaedia Britannica, 15th edition, v. 10, 869; (৬) Collier's Encyclopedia, Macmillan, Educational Corporation, New York v. 23,745; (৭) মুহাম্মাদ ফুওয়াদ আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাযিল কুরআন, কায়রো ১৯৯৯ খৃ., পৃ. ৪২০; (৮) আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাযিল হাদীস, ইস্তাম্বুল ১৯৮৮ খৃ., ৮খ, ৮৭; (৯) আবদুল ওয়াহহাব নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, বৈরূত তা. বি., পৃ. ৪৩৯; (১০) আফীফ আবদুল ফাততাহ তাব্বারাহ, মা'আল আম্বিয়া ফিল কুরআন, বৈরূত ১৯৮৯ খৃ., পৃ. ৩১৩-৩১৫; (১১) ইব্ন আতিয়্যাহ, আল-মুহাররারুল ওয়াজিব, কাতার, ১ম সংস্করণ, ৩খ, স্থা.; (১২) ইব্ন আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, বৈরূত, ৭ম সংস্করণ, ১খ; ১৬৯, স্থা.; (১৩) ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, বৈরূত, ১৯৯৯ খৃ. শিরো. 'যিক্র'; (১৪) আবূ জাফর তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরি আই'ল কুরআন, বৈরূত ১৪১৫ হি, ৩খ, ৩৬২, ৩৬৪-৩৬৫; (১৫)

আল-ফারুমী, আল-মিসবাহুল মুনীর, বৈরূত ১৯৯০ খৃ. শিরো 'যিক্র'; (১৬) মুহাম্মাদ জামীল আহমদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, লাহোর তা. বি., ২খ, ২৬০-২৭৭; (১৭) আবুল আলা মাওদূদী, তাফহীমুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ), ঢাকা ১৯৯৭ খৃ, ২খ, ২৬; (১৮) হিফযুর রহমান সীউহারবী, কাসাসুল কুরআন, করাচী ১৯৯৪ খৃ., ২খ, স্থা.; (১৯) আল- মুজামুল ওয়াসীত, কায়রা, মাজমাউল লুগাহ আল-আবারিয়্যা, শিরো; (২০) রাগিব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত, তা.বি, শিরো; (২১) বদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল কারী, বৈরূত, দারুল ফিকর, তা.বি, ৮খ, ২০, ২২; (২২) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, হালাব, দারুর রশীদ, তা.বি, ২খ, স্থা; (২৩) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআন আল-আযীম, কায়রো ১৪০৮ হি., ১খ, স্থা.; (২৪) ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৬ খৃ., ২১খ, ৪৮৫-৮৭; (২৫) আবু হায়্যন, আল-বাহরুল মুহীত, বৈরূত ১৪১৩ হি., ১খ, ৪৬০; (২৬) ফখরুদ্দীন রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, বৈরূত ১৪১১ হি, ৮খ, ২৬; (২৭) আল-আলূসী, রূহুল মায়ানী, বৈরূত ১৪১৫ হি, ২খ, ১৪৩; (২৮) মাহাল্লী ও সুয়ূতী, জালালায়ন, বৈরূত, তা.বি. পৃ. ১৭; (২৯) আবদুর রহমান সা'দী, তাইসিরুল কারীমির রহমান ফি তাফসীরে কালামিল মান্নান, বৈরূত ১৪১৭ হি, পৃ-১০৬; (৩০) মুহাম্মাদ আল-আমীন শান্কীতী, আদওয়াউল বায়ান, বৈরূত ১৪১৭ হি, ১খ, ১২৮; (৩১) আল-জাসসাস, আহকামুল কুরআন, বৈরূত ১৪১৫ হি., ২খ, ১৬; (৩২) কুরতুবী, আল-জামি' লি-আহকামিল কুরআন, কায়রো ১৪১৬ হি., ৪খ, ৯১-৯৪; (৩৩) ডঃ মুহাম্মাদ মাহমূদ হিজাযী, আত-তাফসীর আল-ওয়াদিহ, কায়রো ১৩৮৯ হি., ৩খ, ৫৭; (৩৪) বুতরুস আল-বুসতানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, বৈরূত, তা.বি, ৯খ, ২৩২; (৩৫) যামাখশারী, আল-কাশশাফ, কায়রো ১৪০৭ হি., ১খ, পৃ.৩৫৮; (৩৬) বায়দাবী, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুত তা'বীল, বৈরূত ১৪০৮ হি, ১খ, ১৫৭ ও স্থা; (৩৭) মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, দামেশক ১৪০৩ হি., ১খ, ১৯৯; (৩৮) সায়্যিদ কুতব, ফী যিলালিল কুরআন, কায়রো ১৪১৪ হি ১খ, ৩৯২; (৩৯) শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, কায়রো, তা.বি, ১খ., ৩৩৯; (৪০) ইমাম মুসলিম, সাহীহ মুসলিম, কায়রো ১৪০৭ হি, ৫খ, ১৫৩; (৪১) ইব্ন মাজা, সুনান, বৈরূত, তা.বি, ২খ, ৭২; (৪২) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, কায়রো ১৪০৯ হি., ৫খ, ৩৪৫; (৪৩) সুলায়মান মানসূরপূরী, রাহমাতুললিল আলামীন, করাচী, ১৪১১ হি, ২খ, ৩২৬, ৩২৭; (৪৪) ফীরুযাবাদী, আল-কামূস আল-মুহীত, বৈরূত, ১৪১৩ হি,, শিরো; (৪৬) আল-মা'লূফ, আল-মুনজিদ, (২৮ তম সংস্করণ) বৈরূত, তা.বি, শিরো.।

মুহাম্মদ আবদুর রহমান

২৯

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)

حضرت يحى عليه السلام

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) পবিত্র কুরআনে নামোল্লিখিত বিশিষ্ট নবী-রাসূলগণের অন্যতম। পবিত্র কুরআনে উহার নিজস্ব বর্ণনা ধারায় বিভিন্ন প্রসংগে তাঁহার আলোচনা অন্তর্ভুক্ত। কুরআন-হাদীস ও অন্যান্য উৎস গ্রন্থের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন তাওরাত অনুসারী সর্বশেষ ইসরাঈলী নবী এবং ইনজীলের বাহক হযরত ঈসা (আ)-এর ঘনিষ্ট আত্মীয়, তাঁহার আবির্ভাবের আগাম বার্তাবাহক, তাঁহার সর্বপ্রথম অনুসারী এবং তাঁহাকে সত্যায়নকারী নবী। ইহা ছাড়া কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য উৎসগ্রন্থে তাঁহার জন্ম ও জন্মকালীন বৈশিষ্ট্য, নামকরণ এবং কতিপয় বিশেষ গুণের অধিকারী হওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে।

পবিত্র কুরআনে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)

পবিত্র কুরআনের চারটি সূরায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। সূরা আল ইমরানের ৩৭-৪১ নং আয়াত, সূরা আন'আমের ৮৫ নং আয়াত (৮৪-৯০ নং আয়াত একাধিক নবী প্রসংগে), সূরা মারয়ামের ১-১৫ নং আয়াত এবং সূরা আম্বিয়ার ৮৯-৯০ নং আয়াতে তাঁহার জন্ম, নামকরণ প্রসংগ ও অন্যান্য বেশিষ্ট্যের বর্ণনা রহিয়াছে (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৫৬; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৪৯, ২৬২; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৭৮)। এইসব আয়াতের মধ্যে আল ইমরান ৩৯ নং আয়াত, আন'আম ৮৫, মারয়াম ৭ ও ১২ এবং আম্বিয়া ৯০ নং আয়াতসমূহে তাঁহার নাম ইয়াহ্ইয়া উল্লেখ রহিয়াছে (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৮)।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيسٰى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔

"এবং যাকারিয়্যা, ইয়াহ্ইয়া ঈসা এবং ইল্য়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম। ইহারা সকলে সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত" (৬ ঃ ৮৫)।

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادٰى رَبَّهٗ رَبِّ لَا تَذَرْنِىْ فَرْدًا وَّأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِيْنَ ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ وَوَهَبْنَا لَهٗ يَحْيٰى وَأَصْلَحْنَا لَهٗ زَوْجَهٗ ۔ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّرَهَبًا وَكَانُوْا لَنَا خَاشِعِيْنَ ۔

"এবং স্মরণ কর যাকারিয়্যার কথা, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একা (নিঃসন্তান) রাখিও না, তুমি তো শ্রেষ্ঠ মালিকানার অধিকারী।

অতঃপর আমি তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে দান করিয়াছিলাম 'ইয়াহ্ইয়া' এবং তাহার জন্য তাহার স্ত্রীকে যোগ্যতাসম্পন্ন করিয়াছিলাম। তাহারা সৎকর্মে প্রতিযোগিতা করিত, তাহারা আমাকে ডাকিত আশা ও ভীতির সহিত এবং তাহারা ছিল আমার নিকট বিনীত" (২১ ঃ ৮৯, ৯০)।

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۔ فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ۔ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ ۔ قَالَ كَذٰلِكَ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلَّا رَمْزًا ۔ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْاِبْكَارِ ۔

"সেখানেই যাকারিয়্যা তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তুমি তোমার নিকট হইতে সৎ বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। যখন যাকারিয়্যা কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিল তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আল্লাহ্ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন নবী। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমার পুত্র হইবে কিরূপে? আমার তো বার্ধক্য আসিয়াছে এবং আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। তিনি বলিলেন, এইভাবেই! আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহা করেন। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না, আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে" (৩ ঃ ৩৭ - ৪১)।

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ۔ اِذْ نَادٰى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۔ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ الرَّاْسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۔ وَاِنِّيْ خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَّرَائِيْ وَكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۔ يَّرِثُنِيْ وَيَرِثُ مِنْ اٰلِ يَعْقُوْبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۔ يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۔ قَالَ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّكَانَتِ امْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۔ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَّقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ لَمْ تَكُ شَيْئًا ۔ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۔ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ۔ يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۔ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا زَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا ۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۔ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۔

হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আ)-এর যুগে পবিত্র ভূমি ও তাঁর কর্মস্থল।

"ইহা তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহের বিবরণ তাঁহার বান্দা যাকারিয়্যার প্রতি, যখন সে তাহার প্রতিপালককে আহ্বান করিয়াছিল নিভৃতে। সে বলিয়াছিল, হে আমার রব! আমার অস্থি দুর্বল হইয়াছে, বার্ধক্যে আমার মস্তক শুভ্রোজ্জ্বল হইয়াছে। হে আমার প্রতিপালক! তোমাকে আহ্বান করিয়া আমি কখনও ব্যর্থকাম হই নাই। আমি আশংকা করি আমার পর আমার স্বগোত্রীয়দের সম্পর্কে, আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। সুতরাং তুমি তোমার নিকট হইতে আমাকে দান কর উত্তরাধিকারী, যে আমার উত্তরাধিকারিত্ব করিবে এবং উত্তরাধিকারিত্ব করিবে ইয়া'কূবের বংশের এবং হে আমার প্রতিপালক! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন। তিনি বলিলেন, হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিতেছি। তাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া; এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, যখন আমার স্ত্রী বন্ধ্যা ও আমি বার্ধক্যের শেষ সীমায় উপনীত! তিনি বলিলেন, এইরূপেই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিলেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য, আমি তো পূর্বে তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। যাকারিয়্যা বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দাও। তিনি বলিলেন, তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও কাহারও সহিত তিন দিন বাক্যালাপ করিবে না।

"অতঃপর সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইংগিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল। হে ইয়াহ্ইয়া! এই কিতাব দৃঢ়তার সহিত গ্রহণ কর। আমি তাহাকে শৈশবেই দান করিয়াছিলাম জ্ঞান এবং আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা; সে ছিল মুত্তাকী, পিতা-মাতার অনুগত এবং সে ছিল না উদ্ধত ও অবাধ্য। তাহার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে" (১৯ ঃ ২ - ১৫)।

বাইবেলে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ.)-এর জন্ম ও নামের বৈশিষ্ট্যসহ তাঁহার কার্যাবলীর যথেষ্ট বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল বিবরণ রহিয়াছে যিশাইয় পুস্তকের ৪০ নং অধ্যায়ে ও মালাখী পুস্তকের ৩.৪ অধ্যায়ে, মথি পুস্তকে লিখিত ৩,১১, ১৪, ১৬, ১৭, ও ২১ অধ্যায়ে ; মার্ক লিখিত পুস্তকের ১, ৬, ৮ ,৯ ও ১১ অধ্যায়ে; লূক লিখিত পুস্তকের ১, ৩, ৫, ৭, ৯ ও ১১ অধ্যায়ে এবং যোহন লিখিত পুস্তকের ১, ৩, ৪, ও ৫ অধ্যায়সমূহে (দ্র. জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৭৮)।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্ম

হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে তাঁহার সম্পর্কে ঘোষণাকারী হিসাবে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) আগমন করেন। পবিত্র কুরআনেও বলা হইয়াছে ঃ

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ٠

"আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন ইয়াহ্ইয়ার, যে আল্লাহ্‌র কালেমা'র সত্যায়নকারী হইবে" (৩ ঃ ৩৯)। এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহর বিশেষ কুদরতে সৃষ্টি হওয়ার কারণে পবিত্র কুরআনে

হযরত ‘ঈসা (আ)-কে ‘আল্লাহ্র কালেমা’ অভিধায় ভূষিত করা হইয়াছে। মালাখী পুস্তকে (মালাখী পুস্তক, ৩ ঃ ১;৪:৩-৬) যাহাকে ‘এলিয়’ (ইলয়াস) বলা হইয়াছে তিনিই হযরত ইয়াহইয়া (আ) এবং ইয়াহ্ইয়া (আ) নিজেকে এলিয় দাবি না করিলেও (দ্র. যোহন ১ ঃ ২১)। হযরত ঈসা (আ) তাঁহার শিষ্যদের নিকটে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পরিচয় প্রদান কালে তাঁহাকে এলিয় বলিয়াছেন (দ্র. মথি, ১৭ ঃ ১০-১৩)।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন পিতা হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর দু‘আর ফল এবং তাঁহার জন্মের ঘটনাটি ইতিহাসের অন্যতম বিরল ঘটনা। সম্ভবত এই কারণে পবিত্র কুরআনে যাকারিয়া ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর ঘটনা সংযুক্তরূপে ও অভিন্ন আয়াতসমূহে বিবৃত হইয়াছে এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্মের ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বর্ণিত হইয়াছে। য়াকারিয়্যা (আ) ছিলেন মূসা (আ)-এর তাওরাতের অনুসারী এবং বনী ইসরাঈলের দায়িত্বপ্রাপ্ত অন্যতম নবী। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা এবং বার্ধক্যের সীমায় উপনীত হওয়া পর্যন্ত তাহাদের কোন সন্তান জন্মে নাই। তবে নবী হিসাবে যাকারিয়্যা (আ) আল্লাহর ফয়সালায় পূর্ণ তুষ্ট ছিলেন এবং সন্তান কাম্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও নিঃসন্তান থাকিবার কারণে তাঁহার মনে কোন ক্ষোভ বা দুঃখ ছিল না। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, সমকালীন বনী ইসরাঈলের প্রায় সকলেই অপরাধপ্রবণ ও দুষ্টমতি স্বভাবের (রূহুল মা‘আনী, ৮/২খ, ৬১) এবং তাঁহার নিজের কোন সন্তান নাই এবং ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের মধ্যেও এমন কেহ নাই য়াহার প্রতি তাঁহার উত্তরসুরিরূপে বনী ইসরাঈলকে দীনের পথে সুষ্ঠরূপে পরিচালিত রাখিবার ব্যাপারে নির্ভর করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহার অবর্তমানে বনী ইসরাঈলের পথহারা হওয়ার এবং আল্লাহর দীন তাঁহার সন্তুষ্টির পথ হইতে সরিয়া যাওয়ার আশংকায় শংকিত হওয়ার কারণে তাঁহার অন্তরে যোগ্য উত্তরসুরির চাহিদা সৃষ্টি হইল। ইতোমধ্যে অপর একটি বিস্ময়কর ঘটনা তাঁহার এই চাহিদাকে আরও প্রবল করিয়া তুলিল (বিস্তারিত দ্র. ‘যাকারিয়্যা’ ও ‘মারয়াম’ নিবন্ধদ্বয়)। উহা এই যে, যাকারিয়্যা (আ)-এর সমকালীন ও তাঁহার আত্মীয়া এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের ‘যাজক’ সম্প্রদায়ের নেতা ইমাম ইব্ন মাছান (অথবা ইমরান ইব্ন নাশী, কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫৫) দীর্ঘকাল নিঃসন্তান থাকিবার পর তাহার পূণ্যবতী স্ত্রী মানতের সূত্রে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন। মাছান পরিবার সমকালীন বনী ইসরাঈলের ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত ছিল (মাজহারী, ২খ, ৪১; আল-কামিল, ১খ, ২২৮) এবং যাকারিয়্যা (আ)-ও ইমরান উভয়ই সুলায়মান ইব্ন দাঊদ (আ)-এর অধস্তন পুরুষ ছিলেন (ঐ, দ্র.)। এক আবেগঘন মুহূর্তে ‘ইমরান-এর পূণ্যবতী স্ত্রী হান্না বিনতে যাকূদ আল্লাহ তা‘আলার নিকট সন্তান প্রার্থনা করিলেন (দ্র. মাজহারী, ২খ, ৪১) এবং দু‘আ কবূল হওয়ার ফলস্বরূপ গর্ভবতী হইলে গর্ভস্থ সন্তান ‘হায়কাল’ অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের খিদমতের জন্য ‘মুক্ত’ রাখিবার মানত করিলেন (৩ ঃ ৩৫)। যথা সময়ে ইমরানের স্ত্রী তাহার কাংখিত পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান প্রসব করিলেন এবং তাহার নাম মারয়াম রাখিলেন (৩ ঃ ৩৬)। এই মারয়ামই হইলেন আল্লাহ তা‘আলার বিশিষ্ট পয়গাম্বর ও রাসূল হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা। লটারীর মাধ্যমে এই সন্তানের লালন-পালন ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেয়া হয় হযরত যাকারিয়্যা (আ)-কে। প্রথমে মারয়াম খালার নিকট লালিত-পালিত হইলেন এবং এক সময় যাকারিয়্যা (আ) তাহার জন্য মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দাসে) একটি স্বতন্ত্র সুরক্ষিত কক্ষ নির্মাণ করিয়া সেখানে তাহার অবস্থানের ব্যবস্থা

করিলেন। যাকারিয়্যা (আ) নিয়মিত তাহার দেখাশুনা করিতেন ও প্রয়োজনীয় খাদ্য-পানীয় প্রভৃতি পৌঁছাইয়া দিতেন (মাজহারী, ২খ, ৪৩)। কিন্তু যাকারিয়্যা (আ) মারয়ামের এই রুদ্ধদ্বার কক্ষে অ-মৌসুমী ফল-ফলাদির উপস্থিতি দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইলেন এবং এ বিষয়ে মারয়ামকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (মারয়াম) জবাব দিলেন ঃ

هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"উহা আল্লাহ্র নিকট হইতে; আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা বে-হিসাব রিযিক দান করেন" (৩ ঃ ৩৭)। তখন তিনি রাব্বুল আলামীনের দরবারে সন্তান লাভের জন্য দু'আ করিলেন। পবিত্র কুরআনের বর্ণনায় ঃ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهٗ (৩ ঃ ৩৮) "যাকারিয়া তাহার প্রতিপালকের নিকট দু'আ করিল।"

তাফসীরের বর্ণনামতে যাকারিয়্যা (আ) গভীর রাত্রে তাঁহার সংঙ্গী-সাথীদের নিদ্রামগ্ন থাকিবার অবস্থায় সম্প্রদায়ের লোকদের হইতে গোপনে দু'আ করিলেন (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪২; কুরতুবী ৬/১খ, ৭৬; আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৪৮)।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً .

"আমাকে দান করুন আপনার নিকট হইতে সৎ বংশধর" (৩ ঃ৩৮ এবং ১৯ ঃ ৫)।

এই দু'আ ছিল একজন নবীর এবং উহাও ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিস্বার্থমুক্ত ও কওমের হিদায়াত ও কল্যাণের লক্ষ্যে নিবেদিত। সুতরাং উহা কবূল হইতে বিলম্ব ঘটিল না। তৎক্ষণাত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে জবাব আসিল, يَازَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ نِ اسْمُهٗ يَحْيٰى "হে যাকারিয়্যা! আমি তোমাকে সুসংবাদ দিতেছি এক পুত্র সন্তানের, যাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া" (১৯ ঃ ৭) এবং ইহার ব্যাখ্যা-মূলক বর্ণনা ঃ

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّيْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى

"ফেরেশতারা তাহাকে ডাকিয়া বলিল, তখন সে মিহরাবে সালাত আদায়রত ছিল, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন" (৩ ঃ ৩৯)।

যাকারিয়্যা (আ) সালাতের মধ্যে দু'আ করিয়াছিলেন এবং সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় তাঁহাকে দু'আ কবুলের সুসংবাদ দেওয়া হইল (কুরতুবী ৬/১খ, ৭৬)।

সন্তানের সুসংবাদে হযরত যাকারিয়্যা (আ) একদিকে আনন্দাতিশয্যে ও অপরদিকে প্রচণ্ড বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং সুসংবাদটি ফেরেশতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হইলেও তিনি সরাসরি প্রতিপালকের নিকট বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ঃ

رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَاَتِيْ عَاقِرٌ.

"হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে, অথচ বার্ধিক্য আমাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা" (৩ ঃ ৪০)।

رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ غُلٰمٌ وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ـ

"হে আমার প্রতিপালক! কেমন করিয়া আমার সন্তান হইবে, অথচ আমার স্ত্রী বন্ধ্যা এবং অপরদিকে আমি পৌঁছিয়াছি বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে" (১৯ ঃ ৮)।

ঐতিহাসিক বর্ণনামতে এই সময় যাকারিয়্যা (আ)-এর বয়স হইয়াছিল ষাট, সত্তর, পঁচাত্তর, সাতাত্তর, আটাশি, নব্বই, বিরানব্বই, আটানব্বই, নিরানব্বই অথবা এক শত বিশ বৎসর (রূহুল মা'আনী, ২/১খ, ১৮৯; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫৪)। কুরতুবীর বর্ণনায় যাকারিয়্যা (আ)-এর বয়স ছিল নব্বই বৎসর এবং তাঁহার স্ত্রীও ছিলেন ইহার কাছাকাছি। মুকাতিলের মতে পঁচানব্বই বৎসর এবং কাতাদার মতে সত্তর বৎসর। ইব্ন আব্বাস (রা) ও দাহ্হাকের মতে এক শত বিশ বৎসর এবং প্রায় সকলের মতে তাঁহার স্ত্রীর যৌবনকালীন বন্ধ্যাত্বসহ এই সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল আটানব্বই বৎসর (কুরতুবী, ২/২খ, ৭৯; ৬/১খ, ৭৯)।

সন্তান লাভের সুসংবাদের ব্যাপারে মনের পূর্ণাংগ স্থিরতা অর্জিত হইলে যাকারিয়্যা (আ) তাঁহার আবেগপূর্ণ ও সবিনয় প্রার্থনায় বলিলেন, رَبِّ اجْعَلْ لِّىْ اٰيَةً "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একটি নিদর্শন দিন" (৩ ঃ ৪১; ১৯ ঃ ১০)।

যাকারিয়্যা (আ)-এর জবাবে আল্লাহ তা'আলা বলিলেন, اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اِلاَّ رَمْزًا "তোমার নিদর্শন এই যে, তিন দিন তুমি ইংগিত ব্যতীত কথা বলিতে পারিবে না" (৩ ঃ ৪১) এবং অন্য আয়াতে আছে ঃ اٰيَتُكَ اَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلٰثَ لَيَالٍ سَوِيًّا "তোমার নিদর্শন এই যে, তুমি সুস্থ থাকা সত্ত্বেও তিন দিন কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিবে না" (১৯ ঃ ১০)। যিক্র, ইবাদত ও তাসবীহ ব্যতীত কাহারও সহিত কোন কথা বলিতে না পারা তাঁহার জন্য সর্বক্ষণ আল্লাহর যিক্র ও শোকরে লাগিয়া থাকিবার সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছিল এবং অধিক হারে শোকর করিবার সুযোগ লাভ। আয়াতের পরবর্তী অংশেও ইহার প্রতি ইংগিত রহিয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ كَثِيْرًا وَّسَبِّحْ بِالْعَشِىِّ وَالْاِبْكَارِ ـ

"আর তোমার প্রতিপালককে অধিক স্মরণ করিবে এবং সন্ধ্যায় ও প্রভাতে তাঁহার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিবে" (৩ ঃ ৪১)। অতঃপর আল্লাহ তা'আলার হুকুমে যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী গর্ভবতী হইলেন এবং ইয়াহ্ইয়া (আ) মাতৃগর্ভে আগমন করিলে আল্লাহ তা'আলার ঘোষিত আলামত অনুসারে যাকারিয়্যা (আ) স্বাভাবিক বাক্যালাপে বাকরুদ্ধ হইলেন (মাজহারী, ৬খ, ৮৬; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫৫; মাআরিফুল কুরআন, ৬খ, ১৬-১৭)। কুরআনের বর্ণনায় ঃ

فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحٰى اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوْا بُكْرَةً وَّعَشِيًّا ـ

"তখন যাকারিয়্যা (আ) কক্ষ হইতে বাহির হইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট আসিল এবং ইংগিতে তাহাদিগকে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করিতে বলিল" (১৯ ঃ ১১)।

পরবর্তী পর্যায়ে যথাসময়ে ইয়াহ্ইয়া (আ) জন্মলাভ করিলেন এবং আল্লাহ্র ওয়াদা ও সুসংবাদ বাস্তবায়িত হইল।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বংশধারা ও পিতৃ-মাতৃ পরিচয়

পবিত্র কুরআনে নবীগণের তালিকায় হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও তাঁহার পিতা হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে এবং বাইবেলের কোন পুস্তকেই ইয়াহ্য়া (আ) ও তাঁহার পিতা যাকারিয়্যা (আ)-এর বংশধারার উল্লেখ নাই। তবে বাইবেলে যাকারিয়্যা ইব্ন বারখিয়্যা ইদ্দোর পৌত্র, বেরিখিয়ের পুত্র সখরিয় নামে একজন ভাববাদী ও তাহার পুস্তক সংকলিত হইয়াছে, যিনি রাজা দারিয়ূসের (দারিয়াবস-দ্র. সখরিয় পুস্তক ১ঃ১) যুগের নবী ছিলেন এবং যাহার পুস্তকের নবম অধ্যায়ে হযরত উমার (রা)-এর বিজয়ী বেশে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জেরুসালেমে প্রবেশের ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে (দ্র.সখরিয়, ৯ ঃ ৯)। কিন্তু ইনি ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পিতা যাকারিয়্যা নহেন। কেননা রাজা দারিয়ূসের সময়কাল ছিল ঈসা (আ)-এর প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বে (কাসাসুল আম্বিয়া, ৩৬৮) “এবং দারা ইব্ন গেস্টাসব-এর সময়কাল ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পাঁচ শত বৎসর পূর্বে। কেননা দারা রাজা মনোনীত হইয়াছিল কায়েকোবাদ ইব্ন কায়খসরুর মৃত্যুর পরে খৃ.পূ. ৫১২ সনে। অথচ পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন ঈসা (আ)-এর মাতা মরয়ামের অভিভাবক ও তাঁহার প্রায় সমসাময়িক এবং যাকারিয়্যা (আ), তদীয় পুত্র ইয়াহ্ইয়া (আ) এবং ঈসা (আ)-এর মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোন নবীর আগমন ঘটে নাই (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৪৯, ২৫০; বরাত, ফাতহুল বারী, ৬খ, ৩৬৫)। “তবে এতটুকু বুঝা যায় যে, ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পিতা যাকারিয়্যা (আ) ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে ‘হায়কাল’ (বায়তুল মুকাদ্দাস)-এর বিশিষ্ট খাদিম ও যাজক ছিলেন। এই হিসাবে তিনি লেবী (ইব্ন ইয়াকূব)-এর বংশধর হইবেন।..... এবং যাকারিয়া (আ) ঈসা (আ)-এর মাতা মারয়ামের খালু ছিলেন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৮)।

ইয়াহূদীরা ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে অস্বীকার করে এবং খৃস্টানরা তাঁহাকে ঈসা (আ)-এর ‘ঘোষক’ (বার্তাবাহক) সাব্যস্ত করে এবং তাঁহার পিতা যাকারিয়্যা (আ)-কে ‘কাহিন’ অর্থাৎ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির নেতা (যাজক) মান্য করে (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৭৫)। বাইবেলে লূক পুস্তকে যাকারিয়্যা (আ)-কে ‘কাহিন’ বলা হইয়াছে ঃ “যিহুদিয়ার রাজা হেরোদের সময়ে অবিয়ের পালার মধ্যে সখরিয় নামে একজন যাজক ছিলেন; তাহার স্ত্রী হারোন বংশীয়া, তাঁহার নাম ইলীসাবেৎ। তাহারা দুইজন সদাপ্রভুর সাক্ষাতে ধার্মিক ছিলেন, প্রভুর সমস্ত আশা ও বিধি অনুসারে নির্দোষরূপে চলিতেন। তাহাদের সন্তান ছিল না। কেননা ইলীসাবেৎ বন্ধ্যা ছিলেন এবং দুইজনেরই অধিক বয়স হইয়াছিল” (লূক, ১ঃ ৫-৭)। তবে বার্নাবাসের বাইবেলে তাঁহার নবী হওয়ার কথা স্পষ্ট ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ঈসা (আ) ইয়াহূদীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “সেই সময় নিকটবর্তী যখন তোমাদিগের উপরে নবীগণের রক্তের দায় ও উহার অভিসম্পাত আগত হইবে, যাকারিয়্যা ইবন বারখিয়া পর্যন্ত যাহাদিগকে তোমরা হত্যা করিয়াছিলে” (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ.৩৬৮; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫১)[১] ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পিতামহ অর্থাৎ যাকারিয়্যা (আ)-এর পিতার নামের ব্যাপারে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন উক্তি রহিয়াছে। ইব্ন আসাকির তাঁহার প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ আল-হাফিল (الحافل)-এ সেই

১. বার্নাবাসের বাইবেল পুস্তক বাইবেলের (নূতন নিয়ম) প্রসিদ্ধ চার পুস্তকের অতিরিক্ত পঞ্চম পুস্তক, যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর অন্যতম ‘হাওয়ারী’ বার্নাবাসের নামের সহিত সম্পৃক্ত। এই ইনজীলটি রোম-এর পোপ সূট-এর লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত ছিল এবং জনৈক পাদ্রী উহার সন্ধান লাভ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেননা উহাতে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের আগমনবার্তা স্পষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল (কাসাসুল কুরআন, ২খ., ২৫১, টীকা ৩)।

সকল উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন এবং হাফিজ ইব্ন হাজার ফাতহুল বারীতে এবং আল্লামা ইব্ন কাছীর তাঁহার তাফসীর ও তারীখ আল-বিদায়া গ্রন্থে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনামতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বংশধারা নিম্নরূপঃ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন উদ্ন (দান) উয়ন (মাজহারী, ২খ, ৪৩) লুদ্ন/শাব্বী/বারখিয়া অথবা ইব্ন আবী ইব্ন বারখিয়া ইব্ন মুসলিম ইব্ন সাদুক (সাদুন, মাজহারী,২খ,৪৩) ইব্ন হাশবান/জাশান ইব্ন দাউদ সুলায়মান ইব্ন মুসলিম ইব্ন সুদায়কা ইব্ন বারখিয়া ইব্ন বাল'আতা ইব্ন নাহুর ইব্ন শালুম ইব্ন বাহফাশাত ইব্ন ঈয়ামিন ইব্ন রাহবয়াম ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ আলায়হিমুস সালাম (বিদায়া, ২খ, ৪৭; ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৪১; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫০; বরাত ফাতহুল বারী)। তারীখে ইব্ন কাছীর এবং সাধারণভাবে ঐতিহাসিকগণ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা ইব্ন বারখিয়্যা বলিয়াছেন (দ্র. নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ ৩৬৮; আল-কামিল ১খ, ২২৮)। মাসউদী তাঁহার মুরূজুয যাহাব গ্রন্থে বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা ইব্ন আদাকু ইয়াহূদার গোষ্ঠীভুক্ত দাউদ (আ)-এর বংশধর। ইব্ন কুতায়বা তাঁহার আল-মা'আরিফে লিখিয়াছেন, যাকারিয়্যা ইব্ন আযান/উয্ন ইয়াহুদা গোষ্ঠীভুক্ত দাউদ (আ)-এর বংশধর (আল-বিদায়া, ২খ, ৫৬, টীকা ১)।

ইব্ন হাজার লিখিয়াছেন, যাকারিয়্যা ...... এবং মারয়াম বিনতে ইমরান ইব্ন নাশী উভয়ই সুলায়মান ইব্ন দাউদের (আ) বংশধর। (কেননা), মারয়ামের মাতা হান্না বিনতে ফাকূয ইব্ন কুনবুল এবং তাঁহার ভগ্নী ইয়াহ্য়ার মাতা ঈশা বিনতে ফাকূয। ইব্ন ইসহাক তাঁহার আল-মুবতাদা গ্রন্থে বলিয়াছেন, হান্না (احنة / حنا) ছিল ইমরানের স্ত্রী এবং তাহার ভগ্নী ছিল যাকারিয়্যার স্ত্রী (ফাতহুল কারী, ৬খ, ৫৪০)। যাকারিয়্যা (আ) দাউদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী ঈশা (ايشاع) বা আল-ইয়াশা (اليشع) ছিলেন হারূন (আ)-এর বংশধর (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫১; বরাত ফাতহুল বারী, ৬খ, তারীখে ইব্ন কাছীর ২খ)। পূর্বোক্ত বর্ণনায় উভয়কে সুলায়মান ইব্ন দাউদের (আ) বংশধর এবং অত্র বর্ণনায় যাকারিয়্যা (আ)-কে দাউদ (আ)-এর বংশধর ও তাহার স্ত্রীকে হারূন (আ)-এর বংশধর বলার বাহ্য বিরোধের সমন্বয় এই যে, উভয়ই সর্বোচ্চ ঊর্ধ পুরুষ বিচারে ইয়া'কূব (আ)-এর বংশধর ছিলেন। তবে যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন মূসা (আ)-এর ভাই হারূনের বংশধর এবং হারূন ও মূসা (আ) লাবী ইব্ন ইয়া'কূব (আ)-এর বংশধর। আর মারয়ামের মাতা হান্না বিনতে ফাকূয ও তাহার ভগ্নী ঈশা বিনতে ফাকূয যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা এবং মতান্তরে মারয়াম বিনতে ইমরান ও তাঁহার ভগ্নী ঈশা বিনতে ইমরান ছিলেন সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর বংশধর এবং দাউদ (আ) ইয়াহুযা (يهوذا) ইব্ন ইয়া'কূব (আ)-এর বংশধর। মোটকথা তাহারা সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ)-এর বংশধর হওয়া সর্বস্বীকৃত (বিদায়া ২খ, ৫৭, টীকা, ৩; আল-কামিল, ১খ, ২২৮; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৫০)। ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা ঈশা মারয়াম বিনতে ইমরানের ভগ্নী ছিলেন অথবা মারয়ামের খালা অর্থাৎ তাহার মাতা হান্না বিনতে ফাকূযের ভগ্নী ছিলেন, ইহাতে ঐতিহাসিকদের ভিন্নমত রহিয়াছে। সুহায়লী বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী ঈশা বিনতে ফাকূয হইলেন মারয়ামের মাতা হান্না বিনতে ফাকূযের ভগ্নী। এই বক্তব্য তাবারীর। উতবী বলিয়াছেন, যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী হইলেন ঈশা বিনতে ইমরান। এই বক্তব্য অনুসারে ইয়াহ্ইয়া (আ) প্রত্যক্ষরূপে 'ঈসা (আ)-এর খালাত ভাই হইবেন (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৩, টীকা নং ২; আরও দ্র. বিদায়া, ২খ, ৫৭, টীকা ৩; আল-কামিল, ১খ, ২২৮)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পিতা যাকারিয়্যা (আ) নবীগণের জীবনধারা অনুসারে কায়িক শ্রমের উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন। আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিছেন, كَانَ زَكَرِيَّا نَجَّارًا "যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন একজন সূত্রধর" (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৩; বিদায়া, ২খ, ৫৮; কাসাসুল কুরআন, ২খ., ২৫১, ২৫২; বরাত মুসলিম, কিতাবুল আম্বিয়া, ৪৩; ৪৫, ১৬৫; মুসনাদ আহমাদ, ২খ, ২৯৬, ৪০৫, ৪৮৫; ইব্ন মাজা ও অন্যান্য)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর দৈহিক গঠন (হুলিয়া)

আল্লাহ্ প্রদত্ত সুসংবাদ অনুযায়ী যাকারিয়্যা (আ)-এর উত্তরসুরিরূপে ইয়াহ্ইয়া (আ) জন্মলাভ করিলেন। "তাঁহার জন্ম হইলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এক সুশ্রী শিশু, হালকা কেশ, ক্ষুদে ক্ষুদে আংগুলবিশিষ্ট, ভ্রূদ্বয় সংযুক্ত ও ক্ষীণ স্বর বিশিষ্টরূপে এবং শৈশব হইতে আল্লাহ্র ইবাদতে সক্ষমরূপে" (আল-কামিল, ১খ, ২৩০)।

বাইবেলে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত

এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "একদা যখন সখরিয় নিজ পালার অনুক্রমে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাজকীয় কার্য করিতেছিলেন,........ সমস্ত লোক (মন্দিরের) বাহিরে থাকিয়া প্রার্থনা করিতেছিল, তখন প্রভুর এক দূত ধুপবেদির দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে দর্শন দিলেন। দেখিয়া সখরিয় ত্রাসযুক্ত হইলেন, ভয় তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কিন্তু দূত তাঁহাকে বলিলেন, সখরিয়, ভয় করিও না, কেননা তোমার মিনতি গ্রাহ্য হইয়াছে, তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন ও তুমি তাহার নাম যোহন রাখিবে।......... তখন সখরিয় দূতকে কহিলেন, কিসে ইহা জানিব? কেননা আমি বৃদ্ধ এবং আমার স্ত্রীরও অধিক বয়স হইয়াছে। দূত উত্তর করিয়া কহিলেন, আমি গাব্রিয়েল (জিবরীল), সদাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকি, তোমার সহিত কথা কহিবার ও তোমাকে এই সকল বিষয়ের সুসমাচার দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছি। আর দেখ, এই সকল যেদিন ঘটিবে, সেই দিন পর্যন্ত তুমি নীরব থাকিবে; কথা কহিতে পারিবে না;...... আর লোকসকল সখরিয়ের অপেক্ষা করিতেছিল এবং মন্দিরের মধ্যে তাঁহার বিলম্ব হওয়াতে তাহারা আশ্চর্য জ্ঞান করিতে লাগিল। পরে তিনি বাহিরে আসিয়া তাহাদের কাছে কথা কহিতে পারিলেন না; তখন তাহারা বুঝিল যে, মন্দিরের মধ্যে তিনি কোন দর্শন পাইয়াছেন; আর তিনি তাহাদের নিকট নানা সংকেত করিতে থাকিলেন এবং বোবা হইয়া রহিলেন।...... এই সময়ের পরে তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেৎ গর্ভবতী হইলেন, আর তিনি পাঁচ মাস আপনাকে সংগোপনে রাখিলেন, বলিলেন, লোকদের মধ্যে আমার (বন্ধ্যা হওয়ার) অপযশ খণ্ডাইবার নিমিত্ত এই সময় দৃষ্টিপাত করিয়া প্রভু আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।....... পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন" (লূক, ১ঃ ৮-১৩, ১৮-২৫, ৫৭)। জিবরীল (আ) যখন মরয়াম (আ)-এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে ঈসা (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দিয়াছিলেন তখন তাঁহাকে এই কথাও বলিয়াছিলেন, "আর দেখ, তোমার জ্ঞাতি যে ইলীশাবেৎ, তিনিও বৃদ্ধ বয়সে পুত্র সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছেন; লোকে তাঁহাকে বন্ধ্যা বলিত, এই তাঁহার ষষ্ঠ মাস" (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬২, ২৬৩; বরাত লূক, ১ঃ ২৬,৩৬)।

নামকরণ ও নামের বৈশিষ্ট্য

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। উহা এই যে, এই নামটি স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হইতে নির্ধারিত হইয়াছিল এবং তাঁহার জন্মের পূর্বেই উহা বিঘোষিত হইয়াছিল। তদুপরি ইহা ছিল এমন একটি নূতন ও বিরল নাম যাহা ইতোপূর্বে বনূ ইসরাঈল তথা পৃথিবীর কোথাও কাহারও জন্য রাখা হয় নাই। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের বর্ণনা اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى "আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন"।

يٰزَكَرِيَّا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ‏.

"হে যাকারিয়্যা আমি তোমাকে এমন একটি সন্তানের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাম হইবে ইয়াহ্ইয়া, এই নামে পূর্বে আমি কাহারও নামকরণ করি নাই" (১৯ : ৭)।

سَمِيًّا শব্দটির অর্থ সমনামের অধিকারী। আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রা), ইকরিমা, কাতাদা, যায়দ ইব্ন আসলাম, সুদ্দী ও কালবী প্রমুখ বলিয়াছেন, ইতোপূর্বে অন্য কাহারও নাম ইয়াহ্ইয়া' ছিল না। ইব্ন জারীরও এই মতটি সমর্থন করিয়াছেন (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৩; কুরতুবী, ৬/১খ, ৮৩; আল-মাসাল,১খ, ২২৯; ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৩৯; মাজহারী, ৬খ, ৮৪; মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ, ১৯; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮২; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬২)। এই রূপ নামকরণের কারণ ও নামের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলিয়াছেন, বিরল নাম ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা প্রকাশ করে। জন্মের পূর্বেই নাম নির্ধারণ দ্বারা ওয়াদার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছে এবং তাঁহাকে মহিমান্বিত করা হইয়াছে। ইব্ন আব্বাস, কাতদা প্রমুখের বর্ণনামতে বিরল ও বিশেষ ধরনের নামকরণ তাঁহার অধিক মর্যাদা ও মাহাত্ম্যেরই পরিচয়। যামাখশারী বলিয়াছেন, ইহা প্রমাণ করে যে, বিরল নামকরণ উহার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হওয়ার ইঙ্গিতবহ এবং আরবরাও এইরূপ অভিনব নাম রাখাকে প্রশংসনীয় মনে করিত (রূহুল মা'আনী, ৮/২ খ., ৬৫; মাজহারী, ৬খ, ৮৪, ৮৫)। মুফাসসিরদের মতে নামটি (يحيى) অ-আরবী। কেননা, বনূ ইসরাঈলের মধ্যে আরবী নামকরণের ব্যাপক প্রচলন ছিল না। পক্ষান্তরে কেহ কেহ বলিয়াছেন, আরবী ক্রিয়া يحيى নাম (বিশেষ্য) রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং আরবী হওয়ায় উহা বিরল হওয়ার অন্যতম কারণ। আরবী ক্রিয়াটির অর্থ'বাঁচিয়া থাকিবে' অর্থাৎ যেন যাকারিয়্যা (আ)-এর উত্তরাধিকারী হওয়ার বয়স পর্যন্ত সন্তানটি বাঁচিয়া থাকিবার ইংগিত করা হইয়াছে । বাইবেলে তাঁহার নাম ইউহান্না (يوحنا = যোহন) বলা হইয়াছে। এমন হইতে পারে যে, হিব্রু য়ূহান্না ও আরবী ইয়াহ্ইয়া সমার্থবোধক অথবা হিব্রু ভাষার য়ূহান্না আরবীতে 'ইয়াহ্ইয়া' উচ্চারণ পরিগ্রহ করিয়াছ (রূহুল মা'আনী), ৮/২খ, ৬৬; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৭৫)। নামটির রূপান্তর সম্বন্ধে কেহ বলিয়াছেন যে, নামটি মূলত 'হায়া' (حيى) ছিল এবং সারা [ইবরাহীম (আ)-এর প্রথম স্ত্রী]-র নাম ছিল 'য়াসারা' (يسارة) অর্থাৎ যে সন্তান জন্ম দেয় না । য়াসারা হইতে সারা বিলুপ্ত করিয়া "ইয়্"কে 'হায়া'-র পূর্বে যুক্ত করিয়া ইয়াহ্ইয়া (يحيى) বানানো হইয়াছে (কুরতুবী, ২/২খ, ৭৫,৭৬)। নামটির অর্থ বর্ণনায় কাতাদা বলিয়াছেন,

এইরূপ নামকরণের কারণ এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে ঈমান ও নবুওয়াত দ্বারা 'জীবন্ত' করিয়াছিলেন অথবা তাহার হৃদয়কে ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্য দ্বারা জীবন্ত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কখনও কোন পাপে লিপ্ত হন নাই, এমনকি কোন পাপের ইচ্ছাও করেন নাই। কেহ্ কেহ বলিয়াছেন, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহার মাধ্যমে মানব হৃদয়গুলি হিদায়াতের দ্বারা জীবন্ত করিয়াছিলেন। কাহারও মতে তিনি প্রজ্ঞা ও পবিত্রতা দ্বারা জীবন্ত হইয়াছিলেন অথবা মানবজাতিকে হিদায়াত ও সঠিক পথের দিশা দানের মাধ্যমে তিনি 'জীবন্ত' হইয়াছিলেন। ইব্ন'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত মতে তাঁহার দ্বারা তাঁহার মাতার বন্ধ্যাত্ব অবসান ঘটাইয়া তাহার গর্ভকে জীবন্ত করা হইয়াছিল। মুকাতিলের মতে আল্লাহ্র নাম 'হাওয়্যুন' (حيى) হইতে নামটি গৃহীত হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার শাহাদাত মর্যাদা লাভের দ্বারা জীবন্ত হওয়ার কথা বলিয়াছেন (কুরতুবী, ২/২খ, ৭৫; ৬/১খ, ৮২; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৬৬; মাজহারী, ২খ, ৪৫)।

খাতনা ও আকীকা অনুষ্ঠান

বাইবেলের বর্ণনামতে বুঝা যায় যে, ইয়াহূদী সমাজে শিশুর জন্মের অষ্টম দিবসে তাহার খাতনা ও নামকরণ অনুষ্ঠান উদযাপিত হওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর ক্ষেত্রেও এই নিয়মের উল্লেখ পাওয়া যায় (লূক, ২ ঃ ২১)। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর ক্ষেত্রেও প্রচলিত নিয়মানুসারে যাকারিয়্যা (আ)-এর প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজন ও ভক্ত-অনুরক্তগণ শিশুর জন্মের অষ্টম দিনে সমবেত হইয়া খাতনা ও নামকরণ অনুষ্ঠান উদযাপন করে। এই প্রসংগে বাইবেলের বর্ণনা নিম্নরূপ,...... তোমার স্ত্রী ইলীশাবেৎ তোমার জন্য পুত্র প্রসব করিবেন ও তুমি তাহার নাম যোহন রাখিবে (লূক, ১ ঃ ১৩)। পরে ইলীশাবেতের প্রসবকাল সম্পূর্ণ হইলে তিনি পুত্র প্রসব করিলেন। তখন তাঁহার প্রতিবেশী ও আত্মীয়গণ শুনিতে পাইল যে, প্রভু তাঁহার প্রতি মহা দয়া করিয়াছেন, আর তাহারা তাঁহার সহিত আনন্দ করিল। পরে তাহারা অষ্টম দিনে বালকটির ত্বকছেদ (খাতনা) করিতে আসিল, আর তাহার পিতার নামানুসারে তাহার নাম সখরিয় রাখিতে চাহিল। কিন্তু তাহার মাতা উত্তর করিয়া কহিলেন, তাহা নয়, ইহার নাম যোহন (يحيى/يوحنا) রাখা যাইবে। তাহারা তাঁহাকে কহিল, আপনার গোষ্ঠীর মধ্যে এ নামে তো কাহাকেও ডাকা হয় না। পরে তাহারা তাহার পিতাকে সংকেতে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার ইচ্ছা কি ? ইহার কি নাম রাখা যাইবে ? তিনি একখানা লিপি ফলক চাহিয়া লইয়া লিখিলেন, ইহার নাম যোহন। তাহাতে সকলে আশ্চর্য জ্ঞান করিল। আর তখনই তাঁহার মুখ এবং তাঁহার জিহ্বা খুলিয়া গেল। আর তিনি কথা কহিলেন, সদাপ্রভুকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন" (লূক; ১ ঃ ৫৭-৬৫; বরাত কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৭৫; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮২, ২৮৩)।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী

পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত যাকারিয়্যা (আ)-এর উত্তরাধিকারী প্রার্থনার বর্ণনায় কাংখিত সন্তানটির জন্য দুইটি গুণবাচক শব্দ সম্বলিত প্রার্থনা লক্ষ্য করা যায়। সূরা আল-ইমরানের বর্ণনায় রহিয়াছে ذرية طيبة 'পবিত্র' সন্তান (৩ ঃ ৩৮) অর্থাৎ সুদ্দীর মতে 'বরকতময়; অন্যদের মতে মুত্তাকী ও

পরিচ্ছন্ন আমলের অধিকারী (রূহুল মা'আনী, ২/১খ, ১৪৪) এবং সূরা মারয়ামের বর্ণনায় واجعله ربّ رضيا "হে আমার প্রতিপালক ! তাহাকে করিও সন্তোষভাজন" (১৯ ঃ ৬) অর্থাৎ যাহার প্রতি আপনি তুষ্ট থাকিবেন এবং আপনার বান্দারাও যাহাকে পসন্দ করিবে (তাবারীর বরাতে ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৯)। "আপনার ও আপনার সৃষ্টির নিকটে পসন্দনীয়, যাহার দীনদারী ও চরিত্রগুণের কারণে আপনিও তাহাকে ভালবাসিবেন এবং সৃষ্টির নিকটে তাহাকে ভালবাসার পাত্র করিয়া দিবেন" (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৩)।

'চরিত্রগুণে ও কর্মে পসন্দনীয় অথবা তকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট অথবা পুণ্যবান যাহাকে আপনি পসন্দ করিবেন অথবা তাহার পূর্বপুরুষের ন্যায় নবী' (কুরতুবী, ৬/১খ, ৮২)। 'কথায় ও কাজে আপনার নিকট পসন্দনীয় অথবা আপনার প্রতি সন্তুষ্ট অথবা আপনার বান্দাদিগের মধ্যে পসন্দনীয় অর্থাৎ তাহাদের বরেণ্য ও অনুসরণীয়। এক কথায় একটি 'আলিম ও আমলদার সন্তান (রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৯৩)। "তাহার পূর্বসূরী ও পূর্বপুরুষদের ন্যায় নবুওয়াত ইত্যাদির মর্যাদায় মর্যাদাবান" (বিদায়া, ২খ,৫৭)।

পবিত্র কুরআনের বর্ণনামতে আল্লাহ তা'আলা যাকারিয়্যা (আ)-এর এই মিনতিপূর্ণ দু'আ মঞ্জুর করিলেন এবং উহা এমন পূর্ণাংগরূপে কবুল করিলেন যে, সন্তানের সুসংবাদ দেওয়ার সাথে সাথে তাঁহাকে প্রায় দশ-বারটি সদগুণে গুণান্বিত করিবার আগাম ঘোষণাও প্রদান করিলেন। যেমন سميا আমি ইতোপূর্বে এই নামে কাহারও নামকরণ করি নাই। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় سميا শব্দের অর্থ অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে 'সমনাম' হইলেও উহাতেও বৈশিষ্ট্যের অর্থ বিদ্যামান। কেননা নামের এককত্ব ও অভিনবত্ব বিশেষ গুণের ইংগিত বহন করে (মা'আরিফুল কুরআন, ৬খ, ১৯)। ইহা ছাড়া অনেক বিশেষজ্ঞ মুফাসসির سميا শব্দের অর্থ বলিয়াছেন তুলনীয়, দৃষ্টান্ত, সাদৃশ্যপূর্ণ ও নজীর। ইব্ন আব্বাস ও মুজাহিদ প্রমুখ বলিয়াছেন, তাঁহার তুলনীয় ও উপমা নাই। কোন বন্ধ্যা নারী তাঁহার মত কোন সন্তান প্রসব করে নাই (ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৩৯; কুরতুবী, ৬/১খ, ৮২৩; মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৩; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৬৫)। ইব্ন কাছীর আরও বলিয়াছেন, ইহা (سميا) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা। ইহার ব্যাখ্যা রহিয়াছে আল-ইমরানের আয়াতে ঃ

اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ.

(১) আল্লাহ্র কালেমা অর্থাৎ ঈসা (আ) কে সত্যায়নকারী (পরে দ্র.); (২) সায়্যিদ (মহান নেতা); (৩) হাসূর (কামরিপু মুক্ত); (৪) নবী; (৫) পুণ্যবানদের অন্তর্ভুক্ত (বিদায়া, ২খ, ৫৮,৫৯; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৬৫)। এই গুণাবলীর অতিরিক্ত দ্বারা মারয়ামের বর্ণনায় ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا . وَحَنَانًا مِنْ لَّدُنَّا زَكٰوةً وَكَانَ تَقِيًّا . وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا . وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا .

"তাহাকে আমি শৈশবেই দান করিলাম (৬) জ্ঞান, (৭) আমার নিকট হইতে হৃদয়ের কোমলতা ও পবিত্রতা এবং (৮) সে ছিল মুত্তাকী; (৯) এবং পিতা-মাতার অনুগত এবং (১০) সে ছিল না উদ্ধত

ও অবাধ্য এবং (১২) তাহার প্রতি শান্তি যেদিন সে জন্মলাভ করে, যেদিন তাহার মৃত্যু হইবে এবং যে দিন সে জীবিত অবস্থায় উত্থিত হইবে" (১৯ ঃ ১২-১৫)।

এই গুণাবলীর ব্যাখ্যায় ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণ বলিয়াছেন, সায়্যিদ (سيد) শব্দের সরল অর্থ নেতা বা সরদার। আল-জায়ারীর নিহায়া গ্রন্থে سيد শব্দের অর্থ বলা হইয়াছে প্রভু, মালিক, অভিজাত, গুণী, মহান, সহনশীল, স্বীয় সম্প্রদায়ের অনাচার বহনকারী, স্বামী, নেতা, অগ্রবর্তী ইত্যাদি (মাজহারী, ২খ, ৪৫; বরাত নিহায়া)। মুফাসসিরগণ শব্দটির আরও কিছু অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। যাজ্জাযের মতে সর্বাধিক কল্যাণকর বিষয়ে যে তাহার সমসাময়িকদের উর্ধ্বে (কুরতুবী, ২/২খ, ৭৭)। ইব্ন আব্বাস (রা) ও মুজাহিদের মতে আল্লাহ্র নিকট মর্যাদাবান ; দাহ্হাক ও ছওরীর মতে সহনশীল, আল্লাহ্-ভীরু; সাঈদ ইব্নুল মুসায়্যিবের মতে 'আলিম, ফকীহ; অন্যান্যদের মতে আল্লাহ্র ফয়সালায় সন্তুষ্ট; কাতাদা ঃ ইল্ম ও ইবাদাতে নেতৃস্থানীয়; ইকরিমা ঃ এমন সহনশীল ক্রোধ যাহাকে কাবু করিতে পারে না; সুফয়ান ছওরী ঃ যে হিংসা করে না, হিংসার পাত্রও হয় না ; খলীল ঃ সমশ্রেণীর উপরে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, অনুসরণীয় নেতা; আবু বাক্র ওয়াররাক ঃ আল্লাহ্তে তাওয়াক্কুলকারী; তিরমিযী ঃ সমুচ্চ মনোবলসম্পন্ন; আবু ইসহাক ঃ স্বীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কল্যাণে শীর্ষস্থানীয়; কাহারও মতে অল্পে তুষ্ট। এই সকল গুণ ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্য প্রয়োজ্য হইতে পারে এবং এক কথায় ইলম, ইবাদত, তাক্ওয়া-পরহেযগারী ও সমগ্র উত্তম স্বভাব ও গুণে সমকালীন সকলের চেয়ে তিনি শ্রেষ্ঠ (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ, ৩৬১; রূহুল মা'আনী, ২/২খ, ১৪৭ ; মাজহারী, ২খ, ৪৫, ৪৬; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৩)।

তবে সংক্ষেপে শব্দটির সরল অর্থ সম্প্রদায়ের অনুসরণীয় নেতা এবং আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় ব্যক্তি (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৪; রূহুল মা'আনী, ২/২খ, ১৪৭)। حصورا। আত্মরুদ্ধ ও অতিশয় সংযমী। এ শব্দটির ব্যাখ্যায়ও বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন অর্থ উপস্থাপন করিয়াছেন। ইব্ন মাস'উদ, ইব্ন আব্বাস, ইব্ন জুবায়র, কাতাদা, 'আতা, মুজাহিদ, 'ইকরিমা, সাঈদ ইব্ন জুবায়র, আবুশ শা'ছা, আতিয়্যা, হাসান বসরী, সুদ্দী, ইব্ন যায়দ প্রমুখের মতে, "যে নারীসংগ হইতে নিজেকে বিরত রাখে এবং কামশক্তি অটুট ও পূর্ণাংগ থাকা সত্ত্বেও নারী সহবাস করে না" (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ, ৩৬১; কুরতুবী, ২/২খ, ৭৮)। ইব্ন মাস'উদের একটি বর্ণনায় 'যাহার জন্য নারী সংগ নিষিদ্ধ'। সুতরাং ইহার অর্থ হইবে, যে নিজেকে সকল বাসনা হইতে অবরুদ্ধ ও বিরত রাখে (কুরতুবী, ঐ; রূহুল মা'আনী, ২/২খ, ১৪৮)।

বস্তুত ইয়াহ্ইয়া (আ) শৈশব হইতেই আল্লাহ্র প্রতি এমন নিবেদিত ছিলেন যে, কোন প্রকার পার্থিব ভোগ-বিলাসে, আমোদ-স্ফুর্তি, নারীসংগ তথা বিবাহ, এমনকি শিশু বয়সেও খেলাধুলার প্রতি অনীহ ছিলেন। বিভিন্ন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি কখনও কোন গুনাহের ইচ্ছা করেন নাই। ইব্ন জারীর, ইবনুল মুনযির, ইব্ন আবূ হাতিম ও ইব্ন আসাকির প্রমুখ (কাতাদা, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সাঈদ ও সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব হইতে মাওকূফরূপে এবং 'আম্র ইবনুল 'আস, আবূ হুরায়রা, মু'আয (রা) প্রমুখ হইতে মারফূ' রূপে) বর্ণিত হইয়াছে, নবী (স) বলিয়াছেন ঃ

كل ابن ادن ادم يلقى الله بذنب قد اذنبه يعذبه عليه ان شاء او يرحمه الا يحيى بن زكريا فان الله يقول سيدا وحصورا ·

"প্রত্যেক আদম সন্তান আল্লাহ্ সমীপে উপস্থিত হইবে এই অবস্থায় যে, সে কেননা কোন গুনাহ্ করিয়াছে। ইচ্ছা করিলে তিনি তাহাকে আযাব দিবেন অথবা দয়া করিবেন, কিন্তু ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (ব্যতিক্রম)। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলিতেছেন, নেতা ও স্ত্রী-বিরাগী" (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৯খ, ৩৬১; বিদায়া ২খ, ৫১; রূহুল মা'আনী ২/২খ, ১৪৮ ; মাজহারী, ২খ, ৪৬)।

ইব্ন 'আব্বাস (রা) প্রমুখের বরাতে কেহ কেহ ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বীর্যশূন্য বা বীর্যপাতে অক্ষম অথবা পুরুষত্ব রহিত ও সহবাসে অক্ষম হওয়ার কথা বলিয়াছেন। বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণ কঠোর ভাষায় উহা খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলা حصور শব্দটি ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রশংসাসূচক গুণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। আর পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি পুরুষের জন্য দূষণীয়, উহা গুণবাচক নহে। আল্লামা সীউহারুবী লিখিয়াছেন, "আমাদের মতে এই সকল অর্থ অভিন্ন মৌলিক বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা। কেননা অভিধানে حصر ধাতুমূলটির অর্থ বাধা-বিপত্তি বা রুদ্ধতা এবং حصور উহার অতিশয়ার্থবোধক কর্তৃরূপ। সুতরাং এখানে অর্থ হইবে, যে সকল বিষয় হইতে বিরত থাকা বা উহাতে সংযম অবলম্বন করা আল্লাহ্ তা'আলার বিধানে অপরিহার্য উহা হইতে বিরত ব্যক্তিকেই 'হাসূর' বলা হয়। যেহেতু ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মধ্যে উল্লিখিত বিষয়াদি সামগ্রিকরূপে বিদ্যমান ছিল, সুতরাং শব্দটির সমস্ত অর্থই পূর্ণরূপে তাঁহার জন্য প্রযোজ্য হইবে। এখানে حصور শব্দের অপর অর্থ পুরুষত্বহীনতা হইতেই পারেনা। কেননা এই অর্থটি পুরুষের জন্য প্রশংসা সূচক নহে, বরং উহা অপূর্ণতা ও দোষরূপে বিবেচিত অথবা শব্দটি এখানে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রশংসারূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণে বিশেষজ্ঞ মুফাসসিরগণ ঐ অর্থটি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কাযী ইয়ায তাঁহার প্রসিদ্ধ 'আশ-শিফা' গ্রন্থে এবং খাফাজী উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাগ্রন্থ নাসীমুর রিয়াদ-এ উক্ত অর্থটির কঠোর সমালোচনাপূর্বক অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে উহাকে বাতিল সাব্যস্ত করিয়াছেন, বরঞ্চ কাম শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও উহাকে নিয়ন্ত্রিত রাখিবার ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলার বিশিষ্ট বান্দাগণ সর্বদা দুইটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রথমত, কুমার জীবন গ্রহণ করিয়া চূড়ান্ত সাধনা ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে কাম চাহিদাকে চিরতরে প্রদমিত করিয়া রাখা এবং উহাকে শূন্যের কোঠায় পৌছাইয়া দেওয়া, যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর জীবন ধারায় সমুজ্জ্বলরূপে লক্ষণীয়। আর ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সাধনা ব্যতিরেকে জন্মকালেই আল্লাহ্ তা'আলা এই বিষয়টি দান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি কামশক্তিকে নির্মূল না করিয়া উহা সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ন রাখিয়া বৈধ ক্ষেত্রসমূহে উহা ব্যবহার করা এবং অবৈধ কোনও ক্ষেত্রে ব্যবহার না করিবার ব্যাপারে নিজেকে এমন পূর্ণাংগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যে, কখনও এক মুহূর্তের জন্যও যেন উহার নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা সৃষ্টি না হয়। উল্লেখ্য যে, মানব বংশধারা ও সামাজিক জীবনধারা রক্ষার খাতিরে নবী-রাসূলগণ সাধারণত এই দ্বিতীয় পন্থার অনুসারী ছিলেন। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ও বিশেষ পরিস্থিতির কারণে কোন কোন নবী-রাসূলের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৪, ২৬৫)।

উল্লেখ্য যে, ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর অনীহা শুধু বিবাহ বা নারী সংগ লাভেই ছিল না, বরং উত্তম পানাহার, উত্তম পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান, আরাম-আয়েশ এই সবের কোন কিছুর প্রতিই তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না। মোটকথা, অবিবাহিতরূপে ও পার্থিব ভোগ-বিলাস ও মোহমুক্ত জীবন যাপন ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। আবু উমামা (রা) সূত্রে তাবারানীর বর্ণিত একটি হাদীসে এই বিষয়টির ইংগিত পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

اربعة لعنوا فى الدنيا ولاخرة وامنت الملائكة رجل جعله الله تعالى ذكرا فانثى نفسه فتشبه بالنساء وامرأة جعلها الله تعالى انثى فتذكرت وتشبهت بالرجال والذى يضل الاعمى ورجل حصور ولم يجعل الله تعالى حصورا الا يحيى بن زكريا .

"চার ব্যক্তিকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিসম্পাত দেওয়া হইয়াছে এবং ফেরেশতাগণ ইহাতে আমীন বলিয়াছেন ঃ (১) কোন পুরুষ, যাহাকে আল্লাহ তা'আলা পুরুষ বানাইয়াছেন, অতঃপর সে নিজেকে নারী বানায় এবং নারীদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে; (২) কোন নারী যাহাকে আল্লাহ তা'আলা নারী বানাইয়াছেন, অতঃপর সে নিজেকে পুরুষ বানায় এবং পুরুষের সাদৃশ্য গ্রহণ করে; (৩) যে ব্যক্তি অন্ধকে বিপথগামী করে এবং (৪) যে স্ত্রী-বিরাগী (হাসূর) হয়। আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন যাকারিয়্যা (আ) ব্যতীত কাহাকেও 'হাসূর' করেন নাই" (রূহুল মা'আনী, ৩/১খ, ১৪৮)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর পরবর্তী বৈশিষ্ট্য তিনি নবী তালিকাভুক্ত ছিলেন। অর্থাৎ অন্যান্য গুণাবলীর সহিত তাহাকে পূর্বপুরুষের ধারায় এবং পিতার উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত দু'আ কবুল করিয়া তাঁহাকে নবুওয়াতে মর্যাদায় ভূষিত করা হইয়াছিল এবং তিনিই ছিলেন তাওরাত অনুসারী সর্বশেষ নবী।

পরবর্তী বৈশিষ্ট্য পূণ্যবানদের অন্তর্গত দ্বারা অনেকের মতে নবুওয়াতসুলভ যোগ্যতা এবং নবী বংশধারার সদস্য ও 'মা'সুম' হওয়ার অর্থ। তবে অন্যরা বলিয়াছেন যে, এখানে নবী বলিবার পরেও 'সালিহ' গুণের উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, তিনি নবুওয়াত পদমর্যাদার জন্য উপযোগী ও অপরিহার্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর অধিক আরও চূড়ান্ত স্তরের যোগ্যতা-গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন। যেরূপে সুলায়মান (আ) নবী হওয়া সত্ত্বেও (فِىْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ) "এবং আমাকে আপনার রহমত দ্বারা আপনার 'পুণ্যবান' সালিহ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন" (২৭ঃ১৯) (রূহুল মা'আনী, ৩/১খ, ১৪৮)।

সূরা মারয়ামে উল্লিখিত পরবর্তী বৈশিষ্ট্য হিকমত ও মহাজ্ঞান দান। (اتينه الحكم صبيا)"শৈশবেই আমি তাহাকে হিকমত দান করিয়াছি" (১৯ ঃ ১২)। শৈশবে হিকমত দান দ্বারা কেহ কেহ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রমরূপে শৈশবে নয় বৎসর বা সাত বৎসর বয়সে অথবা তিন বা দুই বৎসর বয়সেই তাঁহাকে নবুওয়াত দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (১) কিন্তু মুহাক্কিক মুফাসসিরগণের মতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে সাধারণ নিয়ম তথা চল্লিশ বৎসরের নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া ত্রিশ বৎসরের পূর্বে নবুওয়াত প্রদানের কথা স্বীকৃত হইলেও অতি শিশু বয়সে নবুওয়াতের ন্যায় অত্যোচ্চ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত নহে। তাহাদের মতে আয়াতের হিকমত (الحكم) দ্বারা ইল্‌ম, বুদ্ধিমত্তা, সাধনা, সাহসিকতা, যাবতীয় কল্যাণের প্রতি

আকর্ষণ এবং উহাতে যাথাসাধ্য সাধনা করিবার যোগ্যতা উদ্দেশ্য। কাতাদা বলিয়াছেন, দুই বা তিন বৎসর বয়সের সময়ই ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মধ্যে এই যোগ্যতার উন্মেষ ঘটিয়াছিল। মোটকথা, ভবিষ্যত তুলনামূলক কম বয়সে নবুওয়ত প্রদানের ভূমিকা ও পূর্ব প্রস্তুতিরূপে তাঁহাকে শৈশবেই হিকমত ও তাওরাতের ইলম দান করা হইয়াছিল। আবদুল্লাহ ইব্ন মুবারক সূত্রে মা'মার (র) হইতে এবং ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত মারফূ' হাদীসে আছে, নবী (স) এই প্রসংগে বলিয়াছেন ঃ

قال الغلمان يحيى بن زكريا عليهما السلام اذهب بنا نلعب فقال اللعب خلقنا ما للعب خلقنا اذهبوا نصلى فهو قوله تعالى واتيناه الحكم صبيا ·

"বালকরা (বালক) ইয়াহ্ইয়াকে বলিল, চল, আমরা খেলিতে যাই। তিনি বলিলেন, খেলাধুলার জন্য আমাদিগকে বা আমাকে সৃষ্টি করা হয় নাই, (বরং) চল আমরা সালাত আদায় করি; ইহাই আল্লাহ তা'আলার বাণী واتيناه الحكم صبيا -এর মর্ম।"

সুতরাং আয়াতের দূত حكم শব্দ দ্বারা হিকমত ও প্রজ্ঞা উদ্দেশ্য হওয়াই অধিক সংগত। আবূ নু'আয়ম, ইব্ন মারদুওয়ায়হ ও দায়লামী ইব্ন 'আব্বাস (রা) সূত্রে নবী (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি এই প্রসংগে বলিয়াছেন. اعطى الفهم والعبادة وهو بين سبع سنين "সাত বৎসর বয়সেই তাঁহাকে বুদ্ধিমত্তা ও ইবাদাত (-এর অভ্যাস) দান করা হইয়াছিল" (তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ, ১১৩ ; কাসাসুল আম্বিয়া, ১খ, ৩৩৬; বিদায়া, ২খ, ৫৯; কুরতুবী, ৬/১খ, ৮৭; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭২; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৬; আল-কামিল, ১খ, ২২৯; ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৪০; মাজহারী, ৬খ, ৮৬)।

পরবর্তী বৈশিষ্ট্য (حنانا) শব্দটির আভিধানিক অর্থ দয়া, মমতা, হৃদয়ের কোমলতা, বরকত ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ তা'আলার অন্যতম মুবারক নাম حنان একই ধাতুমূল হইতে গঠিত। এখানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে ইব্নে আব্বাস (রা)-এর একটি বর্ণনায় এবং হাসান, মুজাহিদ, কাতাদা, ইকরিমা, দাহ্হাক, ফাররা, আবূ উবায়দা প্রমুখ বলিয়াছেন, বিশেষ রহমত অর্থাৎ তাঁহার প্রতি আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে মানুষের জন্য রহমতস্বরূপ, যাহাতে তিনি তাহাদিগকে কুফর ও শিরক হইতে মুক্ত করেন। ইব্নুল আরাবীর মতে, বিশেষ বরকতময়। ইকরিমার মতে মহব্বত ও ভালবাসা অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তরে তাঁহার প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া দেন। যে কেহ তাঁহার সাক্ষাতে আসিবে সে-ই তাঁহাকে ভালবাসিবে। অন্যরা বলিয়াছেন, মানুষের প্রতি, বিশেষত পিতামাতার প্রতি তাঁহার অন্তরে প্রচণ্ড মমতা দান করিলাম। মোটকথা, দয়া, মমতা, ভালবাসা ইত্যাদি আল্লাহ তা'আলা নিজের পক্ষ হইতে (من لدنا=আমার পক্ষ হইতে) বিশেষভাবে দান করেন (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৫; বিদায়া ২খ, ৫০; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭২; মাজহারী, ৬খ, ৮৬)।

পরবর্তী বিশেষণ زكواة-এর অর্থ পবিত্রতা। মুফাসসিরগণের মতে ইব্ন আব্বাস (রা) বলিয়াছেন, বরকত; কাতাদার মতে নেক আমল; দাহ্হাকের মতে পরিচ্ছন্ন নেক আমল। ইব্ন

কাছীর ও অন্যদের মতে পংকিলতা হইতে পবিত্র এবং কাহারও কাহারও মতে তাঁহার পিতাকে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার দান ও সাদাকা (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৫; বিদায়া, ২খ, ৫০; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭৩; মাজহারী, ৬খ, ৮৬)।

পরবর্তী বিশেষণ تَقِيًّا অর্থ মুত্তাকী, আল্লাহভীরু। আল্লাহ্র আদেশাবলী পালন এবং পাপাচার ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ বর্জনের মাধ্যমে নিষ্ঠার সহিত ও পূর্ণ আত্মসমর্পণের সহিত আনুগত্যকারী। যেমন হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে যে, ইয়াহ্ইয়া (আ) কখনও কোন গুনাহের কাজ করেন নাই এবং উহার ইচ্ছাও করেন নাই (মুখতাসার ইব্ন কাছীর ও প্রাগুক্ত, কুরতুবী, ৬/১খ, ৮৮; তাফসীরে তাবারী, ৮/২খ, ৪৫)।

পরবর্তী বিশেষণ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ পিতা-মাতার অনুগত, ইহার সংযুক্ত নেতিবাচক গুণ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا "তিনি উদ্ধত অবাধ্য ছিলেন না।" সৃষ্টির প্রতি উদ্ধত আচরণকারী ছিলেন না, আল্লাহ্র হুকুমের অবাধ্য ছিলেন না। তদ্রূপ পিতা-মাতার প্রতি দুর্ব্যবহারকারী ও তাহাদের অবাধ্য ছিলেন না। ইব্ন কাছীর লিখিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্র আনুগত্য, তাঁহাকে বিশেষ বিশেষ মায়া-মমতাসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করা এবং তাঁহার বরকতময় পুতপবিত্র, আল্লাহভীরু হওয়ার গুণাবলী উল্লেখের পর পিতা-মাতার প্রতি তাঁহার নিরংকুশ আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার এবং কথা ও কাজে, আদেশ ও নিষেধে পিতা-মাতার অবাধ্যতা বর্জনের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا (মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৫; বিদায়া, ২খ, ৫০; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭৩; মাজহারী, ৬খ, ৮৬)।

পবিত্র কুরআনে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বিশেষণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ يَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۔

"তাহার প্রতি 'সালাম' তাহার জন্মদিনে, তাহার মৃত্যুদিবসে এবং যে দিন তাহাকে পুনরুত্থিত করা হইবে" (১৯ ঃ ১৫)।

সালাম শব্দের অর্থ শান্তি ও নিরাপত্তা। তাবারী বলিয়াছেন, মানব শিশুর জন্মকালে শয়তান তাহাকে যে নির্যাতন করে উহা হইতে ইয়াহইয়া (আ)-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁহার পক্ষ হইতে নিরাপত্তার ঘোষণা দিলেন (يَوْمَ وُلِدَ)। তদ্রূপ মৃত্যুবরণ কালে পৃথিবী ত্যাগের কষ্ট ও কবরের আযাব হইতে নিরাপত্তা (يَوْمَ يَمُوْتُ) এবং কিয়ামতে পুনরুত্থানকালে হাশর ময়দানের ভয়াবহতা ও জাহান্নামের আযাব হইতে নিরাপত্তা (وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) (রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭৩; বরাত, তাফসীরে তাবারী, ৮/২খ, ৪৫; মাজহারী, ৬খ, ৮৬)। ইব্ন আতিয়্যা, সুফয়ান ইব্ন 'উয়ায়না ও ইব্ন কাছীর বলিয়াছেন, জন্ম, মৃত্যু ও কিয়ামতে পুনরুত্থান এই তিনটি সময় মানুষের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। এই ভয়াবহতা হইতে আল্লাহ ইয়াহইয়া (আ)-কে নিরাপত্তা দান করিয়াছেন (তাবারী, ৮/২খ, ৭৬; মুখতাসার ইব্ন কাছীর, ২খ, ৪৪৫; তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ, ১১৪; বিদায়া, ২খ,

৫০; মাজহারী, ৬খ, ৮৬; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭৩)। তবে ইব্ন 'আতিয়্যা এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ভিন্নমত পোষণ করিয়া 'সালাম' অর্থ পারিভাষিক সালাম (অর্থাৎ আসসালামু আলায়কুম) বলিয়াছেন। কেননা উহাতে নিরাপত্তার অর্থের চাইতে অধিক মর্যাদার প্রকাশ রহিয়াছে।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বৈশিষ্ট্যময় জীবনধারা

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 'হাসূর' গুণের প্রতিফলনস্বরূপ ইয়াহ্ইয়া (আ) আজীবন অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যাপারে দরবেশী জীবন যাপন করিয়াছেন। শৈশব হইতেই তিনি ছিলেন গৃহহারা এবং তাঁহার অবস্থান ছিল জর্দান নদীর তীরবর্তী বনে-জংগলে। দীন প্রচারের কাজও তিনি বনে-জংগলে ও জর্দান তীরে করিয়াছেন। নাজ্জার ও ইব্ন কাছীর প্রমুখ ইসরাঈলী বর্ণনার বরাতে লিখিয়াছেন, ইয়াহ্ইয়া (আ) একাকী ও মানব সমাজ হইতে দূরে নির্জন জীবন যাপন পসন্দ করিতেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়াছে প্রান্তরে ও বনে-জংগলে। তাঁহার খাদ্য ছিল ঘাস, গাছের পাতা এবং কাহারও মতে যবের রুটি (আল-কামিল, ১খ, ২৩০) ও নদীর পানি। তাঁহার পোশাক ছিল উটের পশমের তৈরী। তাঁহার কোন বাসগৃহ ছিল না, সহায়- সম্পদ ও কোন দাস-দাসী ছিল না। যেখানেই রাত্রির আগমন হইত সেখানেই রাত্রি যাপন করিতেন। তাহার পরও তিনি নিজেকে বলিতেন, 'ইয়াহ্ইয়া'! তোমার চাইতে সুখী জীবন আর কাহার আছে ? ইব্ন শিহাব যুহরী বলেন, আবু ইদরীস খাওলানী একদিন তাঁহার ওয়াজে উপস্থিত লোকদিগকে বলিলেন, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন মানব কুলের মধ্যে সর্বাধিক পবিত্র খাদ্য গ্রহণকারী; মানুষদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে এই আশংকায় তিনি বন্য পশুর সহিত খাদ্য গ্রহণ করিতেন (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৯; বিদায়া, ২খ, ৫১, ৫৩; আল-কামিল, ১খ, ২৩০ ; কাসাসুন নাবিয়্যীন, ২খ, ২৬৯; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮৬, ২৮৪)।

বাইবেলে তাঁহার খাদ্য ও পোশাক সম্পর্কে বলা হইয়াছে,"যোহন উটের লোমের কাপড় পরিতেন, তাঁহার কটিদেশে চর্মপটুক (বেল্ট) ও তাঁহার খাদ্য পংগপাল ও বনমধু ছিল" (মথি, ৩ ঃ ৪; মার্ক, ১ ঃ ৬ এও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে)।

তাঁহার অবস্থান ক্ষেত্র সম্পর্কে বাইবেলের বর্ণনা "পরে বালকটি (ইয়াহ্ইয়া) বাড়িয়া উঠিতে এবং আত্মায় বলবান হইতে লাগিল; আর সে যতদিন ইস্রায়েলের নিকটে প্রকাশিত না হইল, তত দিন প্রান্তরে ছিল" (লূক, ১ ঃ ৮০)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর হৃদয়ের কোমলতা ও প্রচণ্ড আল্লাহভীরুতা

ইবন 'আসাকির ওয়াহ্ব ইবন মুনাব্বিহ হইতে এবং ইবনুল মুবারক উহায়ব ইবনুল ওয়ারদ হইতে বর্ণনা কারিয়াছেন, ইয়াহ্ইয়া (আ) অত্যন্ত কোমলপ্রাণ ছিলেন এবং প্রচণ্ড আল্লাহ ভীতির কারণে সর্বদা ক্রন্দন করিতেন। এমন কি কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার গণ্ডদেশে অশ্রুরেখার দাগ বসিয়া গিয়াছিল এবং তাঁহার মাড়ি উন্মুক্ত হইয়া গিয়াছিল (আল-কামিল, ১খ, ২৩০)।

একবার পিতা যাকারিয়্যা (আ) তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য প্রান্তরে আসিলেন এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখিলেন যে, তিনি একটি কবর খনন করিয়া উহার মধ্যে বসিয়া কাঁদিতেছেন।

পিতা বলিলেন, প্রাণপ্রিয় পুত্র ! আমরা তোমার অদর্শনে অস্থির আর তুমি এইভাবে কাঁদিয়া জীবন কাটাইতেছ ? ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আব্বাজান! আপনিই তো আমাকে বলিয়াছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে এমন একটি বিশাল মরু প্রান্তর রহিয়াছে যাহা আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারীদের চোখের অশ্রু ব্যতীত অতিক্রম করা যাইবে না এবং জান্নাতে পৌছান যাইবে না। যাকারিয়্যা (আ) বলিলেন, পুত্র! কাঁদ এবং উভয়ে একসংগে কাঁদিতে লাগিলেন (বিদায়া, ২খ, ৫৩; কাসাসুন নাবিয়্যীন, ২খ, ২৬৯, ২৭০; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮৪)। আল জাবারীর বর্ণনায় তাঁহার মাতা তাঁহার নিকট আসিলেন এবং যাকারিয়্যা (আ) ও বিদ্বানগণ (আহ্বার) তাঁহার খোঁজে বাহির হইলেন..... ইহার পরবর্তী সময়ে যাকারিয়্যা (আ) পুত্র ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর উপস্থিতকালে ওয়াজ করিলে জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা করিতেন না (আল-কামিল, ১খ,২৩০)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নবুওয়াত ও নবুওয়াতী কর্মধারা

ইয়াহূদীরা তাহাদের বদ প্রকৃতির ধারায় ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নবুওয়াতের স্বীকৃতি প্রদান করে নাই। খৃস্টানরা যাকারিয়্যা (আ)-কে 'যাজক' সাবস্ত করে এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হযরত ঈসা (যীশু) (আ)-এর অগ্রবর্তী ঘোষক সাব্যস্ত করে। পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে তাঁহাদের উভয়কে বিশিষ্ট নবীগণের তালিকাভুক্তরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে (পূর্ব উদ্ধৃতি দ্র.) এবং বিশেষরূপে সূরা আল ইমরানে (৩ ঃ ৩৯) স্পষ্ট ভাষায় ইয়াহ্ইয়া (আ) কে নবী (وَنَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ) বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া সূরা মারয়ামের يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ "হে ইয়াহ্ইয়া! কিতাব (তাওরাত) শক্ত করিয়া ধারণ কর" (১৯; ১২) দ্বারাও তাঁহার নবী হওয়ার ইংগিত প্যাওয়া যায়।

উল্লিখিত ১৯ঃ১২ আয়াতের وَاٰتَيْنٰهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا, "শৈশবেই আমি তাহাকে 'হিকমত' দান করিয়াছি" দ্বারা কোন কোন মুফাসসির ও ঐতিহাসিক শিশু বয়সে (২/৩/৭/৯ বৎসর) তাঁহার নবুওয়াত লাভের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৪০; আল-কামিল, ১খ, ২৩০; মাজহারী, ৩খ, ৮৬ ও অন্যান্য)। কিন্তু মুফাসসিরগণ এ আয়াত দ্বারা শৈশবে তাওরাত মুখস্ত করিবার (মাজহারী, ৬খ, ৮৬) মত পোষণ করিয়া প্রাপ্ত বয়সে নবুওয়াত লাভের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। তবে নবুওয়াতের সাধারণ বয়সসীমা চল্লিশ বৎসরের পূর্বেই (ত্রিশ বৎসর বয়সে যেহেতু তাঁহার ওফাত (শাহাদাত) হইয়াছিল (পরে দ্র.) সে কারণে মুফসসিরগণ ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে তাঁহার নবুওয়াত লাভের কথা বলিয়াছেন (নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, ৩৬৯)

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নবুওয়াতী কর্মধারাকে দুইটি মৌলিক পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় ঃ (ক) হযরত মূসা (আ)-এর শরী'আতের পুনরুজ্জীবন তথা তাওরাতের শিক্ষা বিস্তার, (খ) হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদান ও পথ প্রস্তুতকরণ এবং তাঁহার সত্যায়ন ও অনুসরণ।

ইয়া'কূব বংশধর তথা বনী ইস্রাঈলের উত্তরাধিকারী ও তত্ত্বাবধায়ক সন্তানের জন্য যাকারিয়্যা (আ)-এর দু'আ এবং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে তৎক্ষণাৎ মঞ্জুরী দ্বারা বুঝা যায় যে, ইয়াহ্ইয়া (আ) কে মূসা (আ)-এর শরী'আতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এবং তাওরাতের শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্যই নবুওয়াতের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া (يٰيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ) (হে

ইয়াহ্ইয়া! দৃঢ়তার সহিত কিতাব ধারণ কর)-এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ প্রায় সর্বসম্মতরূপে কিতাব দ্বারা তাওরাত বুঝানো হইয়াছে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, ৩খ, ১১৩)। ইহা দ্বারা তাওরাতের শিক্ষা বিস্তার ও বাস্তবায়ন তাঁহার অন্যতম দায়িত্ব হওয়া বুঝা যায়। ইব্ন ইসহাক বলেন, যাকারিয়্যা (আ) ও তাঁহার পুত্র ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে বনূ ইসরাঈলের জন্য প্রেরিত নবীগণের শেষ পর্যায়ের (ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৪০)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নবুওয়াতী দায়িত্বের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর সত্যায়ন। পবিত্র কুরআনে তাঁহার পরিচিতির বিবরণ তাঁহার অন্যতম গুণরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ হে যাকারিয়্যা! আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিতেছেন পুত্র ইয়াহ্ইয়ার, যে হইবে 'আল্লাহ্র কলেমার' সত্যায়নকারী। 'আল্লাহ্র কলেমা' অর্থ ইবন 'আব্বাস (রা), মুজাহিদ, কাতাদা এবং অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ঈসা (আ) (কুরতুবী, ২/২খ, ৭৬; রূহুল মা'আনী, ২/১খ., ১৪৭; আল-কামিল, ১খ., ২২৯ ও অন্যান্য)। কেননা পবিত্র কুরআনের একাধিক আয়াতে ঈসা (আ)-কে আল্লাহর কলেমা অভিধায় অভিহিত করা করা হইয়াছে।

মূলত তাওরাত যুগের শেষ ও ইনজীল যুগের সুচনা সন্ধিক্ষণে আগমনের কারণে ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন দুইটি যুগের সমন্বয়কারী এবং সেই কারণে তিনি একাধারে তাওরাত অনুসারী বনী ইসরাঈলের শেষ নবী এবং ইনজীলের বাহক হযরত ঈসা (আ)-কে সত্যায়নকারী, তাঁহার অগ্রবর্তী 'পথ প্রস্তুতকারী' ও তাঁহার বিশিষ্ট দ্বাদশ শিষ্যের (হাওয়ারী) অন্যতম।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর তাবলীগ ও তা'লীম

নবুওয়াত লাভের পর হইতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবীরূপে আবির্ভূত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইয়াহ্ইয়া (আ) তাওরাতের বিধান ও শিক্ষা প্রচারে নিমগ্ন থাকেন। এই সময় তিনি জর্দান নদীর তীরবর্তী প্রান্তর ও বনাঞ্চলে অবস্থান করিতেন এবং পথহারা বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্র দীন ও বিধান মানিয়া জীবন যাপন করিতে উদ্বুদ্ধ করিতেন। এইভাবে তিনি তাওরাতের পুনরুজ্জীবনের সাথে সাথে পরবর্তী নবী ও রাসূল হযরত ঈসা (আ)-এর জন্য অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুতির কর্ম সম্পাদন করিতেছিলেন।

প্রচলিত বাইবেল (তাওরাত ও ইনজীল) আল্লাহ্র প্রেরিত আসমানী কিতাবের অবিকৃত আসল রূপে নহে। ইহা হযরত ঈসা (আ)-এর দীর্ঘকাল পর তখনকার বিদ্বান ধার্মিকদের শ্রুতি নির্ভর গ্রন্থ এবং উহা যুগে যুগে বহুবার বিকৃত হইয়াছে। সুতরাং ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর তাবলীগ ও ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য ও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়ার কোন উপায় নাই। প্রচলিত বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে তাঁহার তাবলীগ ও তা'লীমের প্রতি ক্ষীণ আলোকপাত লক্ষ্য করা যায়। যেমন, সেই সময় যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া যিহূদিয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল।'..... তখন যিরূশালেম, সমস্ত যিহূদিয়া ও যর্দ্দনের

নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বাহির হইয়া তাঁহার নিকট যাইতে লাগিল; আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দ্দন নদীতে তাহার দ্বারা বাপ্তাইজ[১] হইতে লাগিল। কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দূকী বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশেরা! আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল ? অতএব মন পরিবর্তনের (তওবার) উপযোগী ফলে ফলবান হও। আর ভাবিও না যে, তোমরা মনে মনে বলিতে পার, আব্রাহাম আমাদের পিতা। কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সদাপ্রভুর এই সকল পাথর হইতে আব্রাহামের জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর এখনই গাছগুলির মূলে কুড়ালি লাগান আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়। আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের জন্য বাপ্তাইজ করিতেছি বটে........" (মথি, ৩ ঃ ১-২, ৫-১)। লূক পুস্তকে এ প্রসংগে আরও আছে, "তিবরীয় কৈসরের রাজত্বের পঞ্চদশ বৎসরে যখন পন্তীয় পলিত যীহূদিয়ার অধ্যক্ষ, হেরোদ গালীলের রাজা, তাঁহার ভ্রাতা ফিলিপ যিতরিয়া ও নাখোনীতিয়া প্রদেশের রাজা এবং লুষানিয় অবিলীনীর রাজা, তখন হানন ও সায়াদার মহাযাজকত্ব কালে সদাপ্রভুর বাণী প্রান্তরে সখরিয়ের পুত্র যোহনের নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাতে তিনি যর্দ্দনের নিকটবর্তী সমস্ত দেশে আসিয়া পাপমোচনের জন্য মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম প্রচার করিতে লাগিলেন; যেমন যিশাইয় (يسعية) ভাববাদীর বাক্য গ্রন্থে লিখিত আছে. 'প্রান্তরে একজনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর।..... অতএব যে সমস্ত লোক তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে বাহির হইয়া আসিল, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, হে সর্পের বংশেরা,...... অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া অগ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া যায়। (পূর্বানুরূপ) তখন লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে আমাদের কি করিতে হইবে ? তিনি উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যাহার দুইটি আঙরাখা (জামা) আছে, সে, যাহার নাই, তাহাকে একটি দিওক; আর যাহার কাছে খাদ্যদ্রব্য আছে, সেও তদ্রূপ করুক। আর করগ্রাহীরাও বাপ্তাইজিত হইতে আসিল এবং তাহাকে কহিল, গুরো! আমাদের কি করিতে হইবে ? তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের জন্য যাহা নিরূপিত, তাহার অধিক আদায় করিও না। আর সৈনিকেরাও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমাদেরই বা কি করিতে হইবে ? তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, কাহারও প্রতি দৌরাত্ম করিও না, অন্যায় পূর্বক কিছু আদায় করিও না এবং তোমাদের বেতনে সন্তুষ্ট থাকিও" (লূক, ৩ ঃ ১-৪, ৭ ৯-১-৪; তদ্রূপ মার্ক, ১ ঃ ১-১১)।

---

১. বাপ্তাইজ বা বাপ্তিস্ম তৎকালীন দীক্ষাদানের পারিভাষিক নাম। ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য যুগে যুগে ও দেশে দেশে বিভিন্ন প্রতীকী প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে। খৃষ্টধর্মে বর্তমানেও রংগীন পানিতে গোসল করাইবার কথা জানা যায়। যে সকল লোক হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নিকট উপস্থিত হইয়া বিগত পাপ হইতে তওবা করিত এবং ভবিষ্যত জীবনে পাপ বর্জন করিয়া তাহার তা'লীম ও শিক্ষা অনুসারে জীবন যাপনের অংগীকার করিত তিনি তাহাদের মাথায় জর্দন নদীর পানি ছিটাইয়া দিতেন অথবা গোসল করাইয়া দিতেন এবং তাহাদের জন্য খায়র ও বরকতের দু'আ করিতেন। দীক্ষার এই প্রক্রিয়াকেই বাপ্তিস্ম বলা হয়। হযরত ঈসা (আ)-এর দা'ওয়াতী কার্যধারায়ও বাপ্তিস্মের উল্লেখ রহিয়াছে। প্রসংগত ইসলামের 'বায়আত' পদ্ধতি তুলনীয় এবং পবিত্র কুরআনের "আল্লাহর রংগে রংগীন হও"......(২ ঃ ১৩৮) আয়াত এবং তাফসীর গ্রন্থসমূহে উহার ব্যাখ্যা লক্ষণীয়। (দ্র. আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮৩; মাজহারী, ১খ, ১২৭ ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ)।

বাইবেল চতুষ্টয়ের (নূতন নিয়ম) বিভিন্ন পুস্তকে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বিভিন্ন তা'লীম ও হিদায়াতের ইংগিত বিদ্যমান। যেমন 'ঈসা (আ)-এর শাগরিদগণ তাঁহাকে বলিল, 'যোহনের শিষ্যগণ বারবার উপবাস করে (সিয়াম পালন করে) ও প্রার্থনা করে, ফরিশীদের শিষ্যেরাও সেইরূপ করে ....." (লূক, ৫ ঃ ৩৩)। অদ্রূপ, 'তাঁহার [ঈসা (আ)-এর] শিষ্যদের মধ্যে একজন তাঁহাকে কহিলেন, প্রভু, আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিউন, যেমন যোহনও আপন শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন (লূক, ১১ ঃ ১ আরও দ্র. ৭ ঃ ২৬-৩১; নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৯)।

পাঁচটি বিশেষ বিষয়ের তা'লীম

হাদীছ গ্রন্থসমূহে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর তা'লীম ও দীন প্রচারের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ পাওয়া যায়। মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী ও ইবন মাজা প্রভৃতি গ্রন্থে হারিছ আশ'আরী (রা) সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ

ان الله امر يحيى بن زكريا بخمس كلمات ان يحمل بهن وان يأمر بنى اسرائيل ان يعملوا بهن وكاد ان يبطئ فقال له عيسى عليه السلام انك قد امرت بخمس كلمات ان تعمل بهن وتامر بنى اسرائيل ان يعملوا بهن - فاما ان تبلغهن واما ان ابلغهن- فقال يا اخى انى اخشى ان سبقتنى ان اعذب او يخسف بى قال فجمع يحيى بنى اسرائيل فى بيت المقدس حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرف فحمد الله واثنى عليه وقال ان الله عز وجل امرنى بخمس كلمات ان اعمل بهن وامركم ان تعملوا بهن. واولهن ان تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا فان مثل ذالك مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق او ذهب فجعل يعمل وفؤدي غلته لى غير سيده فايكم يسره ان يكون عبده كذالك وان الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. (الثانى) وامركم بالصلاة فان الله ينصب وجهه قبل عبده مالم يلتفت فاذا صليتم فلا تلتفتوا. (الثالث) وامركم بالصيام فان مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة كلهم يجد ريح المسك وان خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك . (الرابع) وامركم بالصدقة فان مثل ذلك كمثل رجل اسره العدو فشدوا يده الى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه فقال هل لكم ان افتدى نفسى منكم فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. (الخامس) وامركم بذكر الله عز وجل كثيرا فان مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى اثره فاتى حصنا حصينا فتحصن فيه وان العبد احصن ما يكون من الشيطان اذا كان فى ذكر الله عز وجل.

"আল্লাহ তা'আলা ইয়াহ্ইয়া ইবন যাকারিয়্যা (আ)-কে পাঁচটি বাক্য দ্বারা আদেশ করিলেন, যেন তিনি নিজে সেইগুলি অনুসারে আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকেও তদনুসারে আমল করিবার আদেশ দেন। কিন্তু (কোন কারণে) ইহাতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বিলম্ব হইয়া যায়। তখন ঈসা (আ) তাঁহাকে বলিলেন, (ভ্রাতা) আপনাকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আপনি নিজে

উহা আমল করেন এবং বনী ইসরাঈলকে তদনুসারে আমল করিবার আদেশ প্রদান করেন। সুতরাং আপনি নিজে বনী ইসরাঈলকে কথাগুলি জানাইয়া দিবেন অথবা (আপনি সংগত মনে করিলে) আমি সেগুলি তাহাদিগকে জানাইয়া দিব। ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, ভ্রাত ! আমার ভয় হইতেছে যে, আপনি আমার পূর্বে সেগুলি প্রচার করিলে আমাকে শাস্তি দেওয়া হইবে অথবা ভূমিতে ধ্বসাইয়া দেওয়া হইবে। সুতরাং আমিই আমার দায়িত্ব পালন করিতেছি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ইয়াহ্ইয়া (আ) সমস্ত বনী ইসরাঈলকে বায়তুল মুকাদ্দাসে সমবেত করিলেন। মসজিদ পূর্ণ হইয়া গেলে তিনি উঁচু স্থানে বসিলেন এবং আল্লাহ্র হামদ ও ছানা পাঠ করিবার পর বলিলেন, "মহান আল্লাহ আমাকে পাঁচটি বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন যেন আমি নিজে তদনুসারে আমল করি এবং তোমাদিগকেও তদনুসারে আমল করিতে বলি। (১) তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করিবে। তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক করিবে না। কেননা শিরক-এর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে তাহার নিজস্ব সম্পদ স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বারা একটি গোলাম খরিদ করিল। কিন্তু সে গোলাম কাজকর্ম করিয়া উপার্জন করিতে লাগিল এবং তাহার উপার্জন তাহার মনিব ব্যতীত অন্য কাহাকেও দিতে থাকিল। এখন বল, তোমাদের কেহ কি তাহার গোলামের এইরূপ আচরণ পছন্দ করিবে ? সুতরাং যে আল্লাহ তোমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তোমাদিগকে খাদ্য দান করিতেছেন তোমরা শুধু তাঁহারই ইবাদত কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার সহিত শরীক সাব্যস্ত করিও না। (২) তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়াছেন, তোমরা সালাত আদায় কর। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁহার 'মুখ' (রহমত ও সন্তুষ্টি) বান্দার অভিমুখী করিয়া রাখেন, যতক্ষণ না বান্দা অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত করে (মনোযোগ দেয়)। সুতরাং সালাত আদায়কালে অন্য কিছুর দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। (৩) তোমাদিগকে সিয়াম পালনের আদেশ প্রদান করিয়াছেন। কেননা সিয়াম পালনকারীর দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যাহার নিকট মিশকের একটি থলে রহিয়াছে-এবং সে একদল মানুষের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। সকলেই তাহার নিকট হইতে মিশকের সুগন্ধি আহরণ করিয়া মাতোয়ারা হইতেছে। মূলত রোযাদারের মুখের ঘ্রাণ আল্লাহ তা'আলার নিকটে মিশকের সুঘ্রাণ হইতে পবিত্রতর। (৪) তিনি তোমাদিগকে দান-সাদাকা করিবার আদেশ করিয়াছেন। কেননা সাদাকাকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যাহাকে তাহার শত্রুরা (অতর্কিতে) বন্দী করিয়াছে এবং ঘাড়ের সহিত তাহার হাত বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে বধ্যভূমিতে নিয়া চলিয়াছে। এইরূপ (নৈরাশ্যজনক) পরিস্থিতিতে সে বলিতেছে, তোমরা কি মুক্তিপণের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দিবে? পরে সে তাহার যাবতীয় সম্পদ মুক্তিপণরূপে প্রদান করিয়া আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিল। তিনি তোমাদেরকে আরও নির্দেশ দিয়াছেন যে, (৫) তোমরা সর্বদা অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিক্র করিতে থাকিবে। কেননা যিক্রকারীর দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় শত্রু দ্রুত গতিতে পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। সে দৌড়াইয়া গিয়া একটি সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল এবং শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিল। নিঃসন্দেহে মানুষ আল্লাহ্র যিক্রে (-র দুর্গে) আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই শয়তান শত্রুর আক্রমণ হইতে সুরক্ষা অর্জন করিতে পারে "(বিদায়-নিহায়া, ২খ, ৫২/৬২; বরাত, মুসনাদে আহমদে, ৪খ, ২০২; আবূ দাঊদ তায়ালিসী, মুসনাদ, হাদীস নং ১১৬১; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৭, ২৬৮; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮৬, ২৮৭)।

হযরত 'ঈসা ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)

পবিত্র কুরআনের আয়াতে পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নুবুওয়াতের অন্যতম কর্মধারা ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর সুসংবাদ প্রদান ও তাঁহাকে সত্যায়ন করা। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তা'আলা মারয়াম, তাঁহার পুত্র ঈসা(আ) ও যাকরিয়্যা (আ)-এর পুত্র ইয়াহ্ইয়া-এর মাধ্যমে তাঁহার কুদরতের মহিমার বহিঃপ্রকাশ ঘটাইয়াছেন। মারয়ামের মাতার সন্তান প্রার্থনা এবং তাঁহার কাংখিত পুত্র সন্তানের স্থলে কন্যা সন্তান দান, পরবর্তীতে যাঁহার ঈসা (আ)-এর মাতা হওয়া আল্লাহ্র দরবারে সিদ্ধান্তকৃত ছিল এবং মারয়ামের নিকটে অ-মৌসুমের ফল দেখিয়া যাকারিয়্যা (আ)-এর অন্তরে তাঁহার দীনী উত্তরসুরিরূপে সন্তান লাভের প্রবল বাসনা দিয়া যে কুদরতের বহিঃপ্রকাশের সুচনা হইয়াছিল, পরবর্তীতে বৃদ্ধ পিতা-মাতার ঘরে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্মলাভ এবং কুমারী মারয়ামের গর্ভে আল্লাহ্র কলেমারূপে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম লাভ ও ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক তাঁহাকে সত্যায়নের মাধ্যমে কুদরতী প্রক্রিয়াটি পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।

হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্মকালও ছিল প্রায় একই সময়ে। কেহ কেহ ঈসা (আ)-এর তিন বৎসর পূর্বে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্মের কথা বলিয়াছেন (আল-কামিল, ১খ, ২২৯)। তবে অধিকাংশের মতে এবং বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে ঈসা (আ)-এর মাত্র ছয় মাস পূর্বে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্ম হইয়াছিল। ইবন আবূ হাতিম মালিক ইবন আনাস (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, আমি জানিতে পারিলাম যে, ঈসা ইবন মারয়াম (আ) ও ইয়াহ্ইয়া ইবন যাকারিয়্যা (আ) উভয়ে একই সময়ে মাতৃগর্ভে ছিলেন। ছা'লাবী বলিয়াছেন, ঈসা (আ)-এর ছয় মাস পূর্বে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর জন্ম হইয়াছিল (ফাতহুল বারী, ৬খ, ৩৬৪; কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৬৩; আল কামিল, ১খ, ২৩০)।

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অনেকের মতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা (ঈশা' বা ইয়াসাবা) এবং মারয়াম সহোদর ভগ্নী, ভিন্নমতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা মারয়ামের খালা ছিলেন। পরস্পরিক আত্মীয়তা সম্বন্ধের কারণে এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা বৃদ্ধ বয়সে ও মারয়াম কুমারী অবস্থায় অস্বাভাবিকরূপে গর্ভবতী হওয়ার কারণে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে এই বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইত। জাযারীর বর্ণনামতে, "ইয়াহ্ইয়া (আ) ছিলেন ঈসা (আ)-এর প্রতি ঈমান আনয়নকারী ও তাঁহাকে সত্যায়নকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি। ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে গর্ভে ধারণকালে একদিন তাঁহার মাতা মারয়াম (আ)-এর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা মারয়াম (আ)-কে বলিলেন, তুমি কি গর্ভবতী? মারয়াম (আ) বলিলেন, এইরূপ জিজ্ঞাসার হেতু কি? ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা বলিলেন, কারণ, আমি অনুভব করিতেছি যে, আমার গর্ভে যে আছে, সে তোমার গর্ভে যে আছে তাহাকে 'সিজদা' করিতেছে। ইহাই ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক 'ঈসা (আ)-কে স্বীকৃতি প্রদান। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিন বৎসর বয়সের সময় ইয়াহ্ইয়া (আ) মাসীহ (আ)-কে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছেন" (আল-কামিল, ১খ, ২২৯)।

ইব্ন কাছীর ইবন জুরায়জের বরাতে লিখিয়াছেন, 'ইবন আব্বাস (রা) مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ -এর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ) খালাত ভাই ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা বলিতেন, আমি অনুভব করিতেছি যে, আমার গর্ভে ...... (পূর্বানুরূপ)। ইহাই মাতৃগর্ভে থাকাকালে ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক 'ঈসা (আ)-কে স্বীকৃতি প্রদান। ঈসা (আ)-ই কালিমাতুল্লাহ। ইয়াহ্ইয়া (আ) ঈসা (আ)-এর চাইতে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইবন কাছীর ও ইবন হাজার মালিক ইবন আনাস (র) হইতে অনুরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মালিক (র) বলিয়াছেন, আমার মতে ঈসা (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্বের কারণে। সুদ্দী (র)-এর বর্ণনায় এক ভিন্নতা রহিয়াছে। মারয়াম (আ) একদিন তাঁহার ভগ্নীর নিকট (ইয়াহ্ইয়া-এর মাতা) গমন করিলে ভগ্নী তাঁহাকে বলিল, "তুমি কি জান যে, আমি (এই বৃদ্ধ বয়সে) গর্ভবতী হইয়াছি" ? তখন মারয়াম (আ) বলিলেন, 'তুমি কি জান যে, আমিও (কুমারী হওয়া সত্ত্বেও) গর্ভবতী হইয়াছি ?' তখন তাহারা কোলাকুলি করিল এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাতা বলিল, আমি অনুভব করিতেছি ..... (পূর্বানুরূপ)। ইহাই مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ -এর মর্ম। তবে সিজদা করার অর্থ আনুগত্য ও সম্মান প্রদর্শন ...... যাহা আমাদের পূর্ববর্তী শরী'আতে ছিল এবং যেরূপ আল্লাহ ফেরেশতাগণকে আদম (আ)-কে সিজদা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন" (আল-বিদায়া, ২খ, ৬৫; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ১খ, ৩৬১)।

আবূ নু'আয়ম আবূ সুলায়মান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, একবার ঈসা ইবন মারয়াম (আ) ও ইয়াহ্ইয়া ইবন যাকারিয়্যা একসংগে পথ চলিতেছিলেন। তখন ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত এক নারীর ধাক্কা লাগিলে ঈসা (আ) বলিলেন, খালাত ভাই! তুমি আজ এমন একটি অন্যায় করিয়াছ যে, আমার ধারণায় কখনও উহার ক্ষমা হইবে না। ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, খালাত ভাই! ব্যাপারটি কি? ঈসা (আ) বলিলেন, তুমি এক নারীকে ধাক্কা দিয়াছ ? ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো বলিতেই পারি না। ঈসা (আ) বলিলেন, সুবহানাল্লাহ! তোমার দেহ তো আমার সংগে রহিয়াছে, তোমার আত্মা কোথায় অবস্থান করিতেছে ? ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, 'আরশের সহিত ঝুলন্ত রহিয়াছে। ইবন কাছীর বর্ণনাটিকে 'বিরল' ও ইসরাঈলী বর্ণনা হওয়ার মন্তব্য করিয়াছেন (আল-বিদায়া, ২খ, ৫১)। আহমাদ তাঁহার আয্-যুহ্দ কিতাবে এবং অন্যরা কাতাদা সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, হাসান (র) বলেন, একবার ইয়াহ্ইয়া (আ) ও 'ঈসা (আ) একত্র হইলে ঈসা (আ) ইয়াহ্ইয়া (আ) কে বলিলেন, আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন, কেননা আপনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আপনি আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। তখন 'ঈসা (আ) বলিলেন, আপনিই আমার চাইতে শ্রেষ্ঠ। কেননা, আমি নিজে নিজের জন্য সালাম ও নিরাপত্তা ঘোষণা করিয়াছি (وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا) (১৯ঃ ৩৩) এবং আপনাকে আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং সালাম ও নিরাপত্তা প্রদান করিয়াছেনঃ (وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا) (১৯ঃ১৫; বর্ণনাকারী বলেন, ইহাতে উভয়ের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিভাত হইল (মুখতাসার ইবন কাছীর, ২খ, ৪৪৫; বিদায়া, ২খ, ৫০; কুরতুবী, ৬/১খ, ৮৯; রূহুল মা'আনী, ৮/২খ, ৭৪)। ইবন কাছীর খায়ছামা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, ঈসা (আ) 'সূফ' (ভেড়ার পশম বস্ত্র) পরিধান করিতেন এবং ইয়াহ্ইয়া (আ) 'ওয়াবর' (উট-গরুর পশম বস্ত্র) পরিধান করিতেন। তাঁহাদের কাহারও কোন ধন-সম্পদ ছিল না, কোন

দাস-দাসী ছিল না এবং বসবাসের জন্য কোন আশ্রয়স্থল (ঘর) ছিল না। যেখানেই রাত্রির আগমন ঘটিত সেখানেই তাঁহারা রাত্রি যাপন করিতেন। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় ইয়াহ্ইয়া (আ) ঈসা (আ)-কে বলিলেন, আমাকে উপদেশ দিন। 'ঈসা (আ) বলিলেন, 'রাগ করিবে না।' ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আমি রাগ না করিয়া থাকিতে পারিব না।' ঈসা (আ) বলিলেন, 'সম্পদ সঞ্চয় করিবে না'। জবাবে ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, 'হাঁ, আশা করি, তাহা সঞ্চয় করিব না' (বিদায়া, ২খ., ৫১-৫২)।

প্রচলিত বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকেও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও হযরত ঈসা (আ)-এর পরস্পরিক স্বীকৃতি প্রদান এবং ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক 'ঈসা (আ)-এর অনুসরণের মোটামুটি বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে বাইবেলের বর্ণনায় অন্যান্য সাধারণ মানুষের সহিত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নিকট হইতে তাঁহার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও ঈসা (আ)-এর বাপ্তিস্ম গ্রহণ ও পরক্ষণে 'মাসীহ'রূপে আত্মপ্রকাশের বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রসংগে যোহন পুস্তকের বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ একজন মনুষ্য উপস্থিত হইলেন, তিনি হইতে প্রেরিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম যোহন। তিনি সাক্ষ্যের জন্য আসয়াছিলেন, যেন সেই জ্যোতির বিষয়ে সাক্ষ্য দেন, যেন সকলে তাঁহার দ্বারা বিশ্বাস করে।....... যোহন তাঁহার (যীশুর) বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, আর উচ্চৈস্বরে বলিলেন, ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে আমি বলিয়াছি, যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন, তিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন। কেননা, তিনি আমার পূর্বে ছিলেন।........ আর যোহনের সাক্ষ্য এই, যখন যিহুদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যেরুশালেম হইতে তাহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, 'আপনি কে ? তখন তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খৃষ্ট নই তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি এলিয় ? তিনি বলিলেন, আমি নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহার তাঁহাকে কহিল, আপনি কে ? যাঁহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি বলিলেন, আমি প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমার প্রভুর পথ সরল কর, যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। তাহারা ফরীশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খৃষ্ট নহেন, এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন ? যোহন উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, আমি জলে বাপ্তাইজ করিতেছি; তোমাদের মধ্যে এমনজন দাঁড়াইয়া আছেন যাঁহাকে তোমরা জান না। যিনি আমার পশ্চাতে আসিতেছেন, আমি তাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবারও যোগ্য নহি। যর্দ্দনের পরপারে, বৈথনিয়াতে, যেখানে যোহন বাপ্তাইজ করিতেছিলেন, সেইখানে এই সকল ঘটিল (যোহন, ১ ঃ ৬-৭, ১৫, ১৯-২৮; কাসাসুল কুরআন , ২খ, ২৭৬; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৮৮)। মথি পুস্তকে আছে (ইয়াহ্ইয়া এর উক্তি), "আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাতে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি " (মথি, ৩ ঃ ১২)। "পরে যোহন কারাগারে থাকিয়া খৃষ্টের কর্মের বিষয়ে শুনিয়া আপনার শিষ্যদের দ্বারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, যাঁহার আগমন হইবে, সেই ব্যক্তি কি আপনি না আমরা অন্যের অপেক্ষায় থাকিব? যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা যাও, যাহা যাহা শুনিতেছ ও দেখিতেছ, তাহার সংবাদ যোহনকে দেও" (মথিঃ ১২ ঃ ২-৪)।

শেষাংশের বর্ণনা লূক পুস্তকে একটু বিশদরূপে রহিয়াছে, “আর লোকেরা যখন অপেক্ষায় ছিল এবং যোহনের বিষয়ে সকলে মনে মনে এই তর্ক-বিতর্ক করিতেছিল, কি জানি, ইনিই বা সেই খৃষ্ট, তখন যোহন উত্তর করিয়া সকলকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু এমন একজন আসিতেছেন, যিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান, যাঁহার পাদুকার ফিতা খুলিবার যোগ্য আমি নই; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন” (লূক, ৩ ঃ ১৫-১৭; আরও দ্র. ৩ ঃ ৪-৮; মথি, ৩ ঃ ১২; মার্ক, ১ ঃ ১-৪,৭-৮; লূক ৭ ঃ ১৮-২২)।

বাইবেলের বর্ণনামতে ঈসা (আ) মিসরে ও গালীলের নাশারত নগরে শৈশব ও বাল্যকাল অতিবাহিত করেন (দ্র. মথি, ২ ঃ ১-২৬)। ইয়াহ্ইয়া (আ) দীন প্রচারের কাজ আরম্ভ করিলে ঈসা (আ) ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সহিত সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্য গালীলের নাশারত (নাসিরা) নগর হইতে জর্দান নদের তীরবর্তী অঞ্চলে আগমন করিলেন এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নিকট হইতে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিতে চাহিলেন (বাইবেল, মথি, ৩ ঃ ১৩-১৭; মার্ক, ১ ঃ ৯-১১; লূক, ৩ ঃ ২১ ও যোহন ১ ঃ ২৯-৪২)।

ইয়াহ্ইয়া (আ) সম্পর্কে ঈসা (আ)-এর সাক্ষ্য বিষয়ে বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে, “যোহনের দূতেরা প্রস্থান করিলে পর তিনি লোকদিগকে যোহনের বিষয়ে বলিতে লাগিলেন, তোমরা প্রান্তরে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি বায়ু কম্পিত নল ? তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে ? কি কোমল বস্ত্র পরিহিত কোন ব্যক্তিকে ? দেখ, যাহারা জাঁকাল পোশাক পরে এবং ভোগে-সুখে কাল যাপন করে, তাহারা রাজবাটিতে থাকে। তবে কি দেখিতে গিয়াছিলে? কি একজন ভাববাদীকে ? হ্যাঁ, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ভাববাদী হইতেও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে। ইনি সেই ব্যক্তি, যাঁহার বিষয়ে লেখা আছে, ‘দেখ, আমি আপন দূতকে তোমার অগ্রে প্রেরণ করি, সে তোমার অগ্রে তোমার পথ প্রস্তুত করিবে।” আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, স্ত্রীলোকের গর্ভজাত সকলের মধ্যে যোহন হইতে মহান কেহই নাই ;তথাপি সদাপ্রভুর রাজ্যে অতি ক্ষুদ্র যে ব্যক্তি সে তাঁহা হইতেও মহান”...... (লূক, ৭ঃ২৪-২৮; মথি, ১১ঃ৭-১১)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর কারাবরণ ও শাহাদাত লাভ

বনী ইসরাঈল তথা ইয়াহূদী সম্প্রদায় তাহাদের বিবিধ কুকর্মের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাহাদের অপকর্মের তালিকায় জঘন্যতম বিষয়রূপে রহিয়াছে তাহাদের কুকর্মে বাধা প্রদানকারী পূণ্যবানদিগকে, এমনকি নবীগণকেও হত্যা করা (দ্র. ৩ ঃ ২১; ৪ ঃ১৫৫ ও অন্যান্য)। ইতিহাস ও তাফসীরের বর্ণনামতে ইয়াহূদী অথবা তাহাদের অন্যতম সামন্ত রাজা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করিয়াছিল। হত্যার সূত্র ও ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও মুফাসসিরগণের মধ্যে মতবিরোধ থাকিলেও তাঁহার শাহাদাত বরণের বিষয়টি প্রায় সর্বসম্মত। তবে বাইবেলের বর্ণনামতে প্রথমে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং পরে জেলখানায়ই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। বাইবেল মথি পুস্তকের বর্ণনা নিম্নরূপ, “সেই সময় হেরোদ রাজা যীশুর বার্তা শুনিতে পাইলেন, আর আপনার

দাসগণকে কহিলেন, ইনি সেই যোহন বাপ্তাইজক, তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, আর সেই জন্য পরাক্রম সকল তাঁহার কার্য সাধন করিতেছে। কারণ হেরোদ আপন ভ্রাতা ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্য যোহনকে ধরিয়া বাঁধিয়া কারাগারে রাখিয়াছিলেন। কেননা যোহন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, উহাকে রাখা আপনার বিধেয় নয়। আর তিনি তাঁহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিলেও লোকসমূহকে ভয় করিতেন; কেননা লোকে তাঁহাকে ভাববাদী বলিয়া মানিত" (মথি, ১৪ ঃ ১-৫)। মার্ক পুস্তকেও প্রায় অনুরূপ রহিয়াছে ঃ "কারাগারে বদ্ধ করিয়াছিলেন, কেননা তিনি (রাজা হেরোদ) তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।...... আর হেরোদিয়া তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু পারিয়া উঠে নাই। কারণ হেরোদ যোহনকে ধার্মিক ও পবিত্র লোক জানিয়া ভয় করিতেন ও তাঁহাকে রক্ষা করিতেন। আর তাঁহার কথা শুনিয়া তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন হইতেন এবং তাঁহার কথা শুনিতে ভালবাসিতেন" (মার্ক, ৬ ঃ ১৭-২০)। লূক পুস্তকে আছে, "কিন্তু হেরোদ রাজা আপন ভ্রাতার স্ত্রী হেরোদিয়ার বিষয়ে এবং আপনার সমস্ত দুষ্কর্মের বিষয়ে তাঁহা কর্তৃক দোষীকৃত হইলে, নিজ দুষ্কার্যসকলের উপরে এইটাও যোগ করিলেন, যোহনকে কারাগারে বদ্ধ করিলেন" (লূক, ৩ ঃ ১৯২০; আরও দ্র. মথি, ১১ ঃ ২-৬)।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, সমসাময়িক কালে ইয়াহূদীদের পূর্ণাংগ স্বাধীন রাজ্য ছিল না। তখন ফিলিস্তীন ও সিরিয়া (শাম) রোম সম্রাটের শাসনাধীন ছিল এবং ইয়াহূদীদের বসতি এলাকা চারটি প্রাদেশিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং উহাতে শাসন পরিচালনার জন্য রোম সম্রাট কর্তৃক চারজন শাসনকর্তা (সামন্ত রাজা) নিয়োজিত ছিল। হেরোদ ও তাহার ভাই ফিলিপ ছিল সেই চার প্রদেশের মধ্যে যথাক্রমে গালীল ও যিতুরিয়া ও ত্রাযোনীতিয়া (IKERAEA, TRACHONITIS)-এর রাজা। ইহা ছিল রোম সম্রাট তিবরীয়-এর রাজত্বকাল এবং এই সম্রাটের রাজত্বকালের পঞ্চদশ বর্ষে ইয়াহ্ইয়া (আ) নবুওয়াত লাভ করিয়াছিলেন (দ্র. লূক, ৩ঃ ১-৩)। ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়া ছিল অত্যন্ত সুন্দরী, কিন্তু দুশ্চরিত্রা। হেরোদের সহিত তাহার ভ্রাতৃ-বধুর অবৈধ প্রণয় ছিল এবং হেরোদ তাহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়াছিল। ইয়াহ্ইয়া (আ) ইহাকে হারাম ঘোষণা করিলেন। তিনি রাজার কোপানলে পড়িলেন এবং বিশেষত দুশ্চরিত্রা হেরোদিয়ার প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের পাত্রে পরিণত হইলেন। রাজা হোরোদ ভ্রাতৃ-বধুকে বিবাহ করিবার অপকর্মসহ অন্যান্য অপকর্মের জন্য ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক প্রকাশ্যে তিরস্কৃত ও বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তাহার অন্তরে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর নবুওয়াতে বিশ্বাস ও তাঁহার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকিবার কারণে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে ভীত-শংকিত ছিল, কিন্তু হেরোদিয়ার উস্‌কানী ও চক্রান্তের কারণে অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৯০ ২৯১)।

মূল বিষয়ের অভিন্নতাসহ এই প্রসংগে একটি ভিন্ন বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ ইয়াহ্ইয়া (আ) যখন আল্লাহ্র দীনের দাওয়াত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার পরে একজন মহান পয়গাম্বরের আগমন সংবাদ ঘোষণা করিতে লাগিলেন তখন ইয়াহূদীরা তাঁহার প্রতি শত্রুতা পোষণ করিতে লাগিল এবং তাঁহার জনপ্রিয়তা ও তাঁহার প্রতি সাধারণ মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও তাঁহার আগাম ঘোষণা

স্বার্থান্ধ ইয়াহূদীদের অস্থির করিয়া ফেলিল। তাহারা তাঁহার নিকট সমবেত হইয়া প্রশ্ন করিল, তুমি কি মাসীহ? তিনি বলিলেন, না। তাহারা বলিল, তবে কি তুমি সেই (বিশ্ব) নবী? তিনি বলিলেন, না। তাহারা বলিল, তবে কি তুমি ঈলিয়া (এলিয়া) নবী ? তিনি বলিলেন, না। তখন তাহারা বলিল, তবে তুমি কে, যে এইরূপ ঘোষণা করিতেছ ও দীনের দাওয়াত দিতেছ ? তখন ইয়াহ্ইয়া (আ) বলিলেন, আমি প্রান্তরে আহ্বানকারীর একটি ধ্বনি যাহা সত্য-ন্যায়ের জন্য উচ্চকিত করা হইয়াছে (দ্র. যোহন, ১ ঃ ১৯-৮)। তাঁহার এই বক্তব্য শুনিয়া ইয়াহূদীরা উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং অবশেষে তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলিল (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৭০)।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যার ঘটনা

বাগাবী ইব্ন ইসহাকের বরাতে, ইব্ন হাজার হাকেমের বরাতে এবং ইব্ন কাছীর ইব্ন আসাকির-এর আল-মুসতাকসা ফি ফাদাইলিল আকসা গ্রন্থের বরাতে মু'আবিয়া (রা)-এর মাওলা (আযাদকৃত দাস) কাসিমের বর্ণিত রিওয়ায়তে এবং ইবন জারীর তাবারী ও ইবনুল আছীর আল-জাযারী সুদ্দী হইতে, তাবারী ইবন আব্বাস (রা) হইতে এবং আল-জাযযার তাঁহার কাসাসুল আম্বিয়ায় এ প্রসংগে যে বিবরণ পেশ করিয়াছেন উহার সারমর্ম এই যে, সেই সময় অন্যতম রাজা বর্ণনান্তরে দামেশকের রাজা হাদ্দাদ ইব্ন হাদ্দাদ (অথবা) হাদ্দাদ ইব্ন হুদার (هداد بن حدار কাসাসুল কুরআন) তাহার জন্য শরী'আতী বিধানে নিষিদ্ধ ('মাহরাম') কোন নারীকে বিবাহ করিতে চাহিতেছিল। কোন কোন বর্ণনায় এই নিষিদ্ধ বা মাহরাম নারী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিল। অপর বর্ণনামতে ভ্রাতৃবধু ছিল (যাহার সহিত ভাইয়ের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় নাই), অপর বর্ণনামতে রাজার নিজেরই তিন তালাক প্রদত্তা স্ত্রীকে 'হালাল' করা ব্যতীত পুনঃ বিবাহ করিতে চাহিতেছিল। অন্য একটি বর্ণনায়, রাজা তাহার স্ত্রীর পূর্ব সংসারের কন্যাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছিল (বিদায়া, ২খ, ৬৪/৫৪, টীকা ৩)। মোটকথা, রাজা শরীআতের নিষেধাজ্ঞা লংঘন করিয়া বিবাহ করিতে চাহিতেছিল এবং ইয়াহ্ইয়া (আ) উহার নিষিদ্ধতা ঘোষণা করিয়া ইহাতে বাধা প্রদান করিতেছিলেন। তাবারীর বর্ণনায় আছে, 'ঈসা (আ) তাঁহার বিশিষ্ট দ্বাদশ শিষ্য হাওয়ারীকে দীন প্রচারের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাইলেন, ইহাদের অন্যতম ছিলেন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (আ)। তাঁহাদের প্রচারিতব্য বিষয়াবলীর অন্যতম ছিল ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা (যাহা ইতোপূর্বে বৈধ ছিল; বিদায়া, ২খ, ৬৪, টীকা ১)। পরবর্তী বর্ণনামতে রাণী ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রতি ক্ষিপ্ত হইয়া প্রতিশোধপরায়ণা হইয়া উঠিল এবং যে কোন উপায়ে তাঁহাকে হত্যা করিবার চক্রান্ত করিতে লাগিল এবং এক সময় রাজাকে বাধ্য করিয়া তাহার নিকট হইতে হত্যার অনুমোদন হাসিল করিল। ইয়াহ্ইয়া (আ) হেবরোনের মসজিদে সালাতে নিমগ্ন অবস্থায় রাণীর হুকুমে তাঁহাকে হত্যা করা হইল এবং তশতরীতে করিয়া তাঁহার মস্তক রাণীর নিকট উপস্থিত করা হইল। কিন্তু কর্তিত মস্তক তখনও বলিতেছিল, "হালাল নয়, হালাল নয়, যতক্ষণ না অন্যের সহিত বিবাহ হইবে"। এই সময় আযাব আসিয়া রাণীকে মাটিতে ধ্বসাইয়া দিল।

ভ্রাতুষ্পুত্রীকে বিবাহ করিবার বর্ণনায় আছে, রাজা কন্যাটিকে ভালবাসিত এবং কন্যা ও তাহার মাতাও এই বিবাহ ঘটাইতে চাহিতেছিল এবং ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতীক্ষায় অস্থির জীবন যাপন করিতেছিল। রাজার অভিষেক অনুষ্ঠান বার্ষিকীর দিনে মাতা তাহার কন্যাকে সাজগোজ করাইয়া নাচের আসরে পাঠাইয়া দিল। রাজা তাহার নৃত্যে অভিভূত হইয়া তাহাকে বলিল, "বল কী চাই, যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে"। এই সবের পিছনে নারী চক্রান্ত ক্রিয়াশীল ছিল। কন্যার মাতা এইরূপ পরিস্থিতির বিষয়ে পূর্বে আঁচ করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং সে তাহার কন্যাকে দৃঢ়ভাবে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, রাজা তাহাকে বাসনার কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে, 'ইয়াহ্ইয়ার মস্তক চাই'। কন্যা মাতার শিখানোমতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মস্তক প্রার্থনা করিল। রাজা ইহাতে হতভম্ব হইয়া বলিল, অন্য কিছু চাও। কন্যাটি তাহার দাবিতে অনড় রহিল। রাজা অতিথি-অভ্যাগতদের সম্মুখে কথা দিয়াছিল এবং প্রচলিত রীতি অনুসারে তাহার ফিরিবার পথ ছিল না। সুতরাং সে বাধ্য হইয়া সৈনিকদের কারাগারে পাঠাইয়া ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করাইল এবং তাঁহার মাথা আনাইয়া তশতরীতে করিয়া দুর্ভাগা কন্যার হাতে তুলিয়া দিল। কন্যা তশতরী নিয়া তাহার মাতার নিকট গেল। মস্তক তখনও বলিতেছিল 'হালাল নয়' ...... । কন্যা মাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ামাত্র মাটিতে দাবিয়া যাইতে লাগিল। কাঁধ পর্যন্ত দাবিয়া গেলে মাতা জল্লাদদের তাহার গর্দান কাটিতে বলিল। অন্য বর্ণনামতে মাতা প্রাসাদের ছাদে উঠিলে কন্যা সেখান হইতে নিচে পড়িয়া গেল এবং হিংস্র কুকুরেরা তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া খাইয়া ফেলিল। এই বর্ণনার শেষাংশে রহিয়াছে যে, ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মস্তক যেখানে বায়তুল মুকাদ্দাসে দাফন করা হইয়াছিল সেখানে সর্বদা রক্ত টগবগ করিত।

বুখ্ত নাস্সার (নেবুকাদ নেজার) যখন ফিলিস্তীন আক্রমণ করিয়াছিল তখন বিজয় বিলম্বিত হইলে সে অবরোধ তুলিয়া নিয়া ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিতেছিল। তখন এক ইসরাঈলী নারী নিজের নিরাপত্তা ও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর খুনের প্রতিশোধ গ্রহণে গণহত্যার শর্তে বুখ্তকে পরামর্শ ও সাহায্য প্রদানে উদ্যত হইল। সে আক্রমণকারী বাহিনীকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়া অতি প্রত্যূষে হাত তুলিয়া "ইয়া আল্লাহ! অমরা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (আ)-এর খুনের দোহাই দিয়া আপনার সকাশে বিজয় প্রার্থনা করিতেছি" বলিয়া দু'আ করিতে ও আক্রমণ করিতে পরামর্শ দিল। এইরূপ করিলে পরদিন শহর বুখ্তের পদানত হইল। খুনের ফোয়ারা দেখিয়া বুখত উহার কারণ জানিতে চাহিলে উপস্থিত ইয়াহূদীরা ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে খুন করিবার কথা স্বীকার করিল। বুখ্ত সত্তর হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা করিল এবং অবশেষে হযরত ইরমিয় (আ) রক্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, 'হে খুন! এখনও তুমি শান্ত হইবে না? কত শত সহস্র প্রাণ তুমি বধ করিলে, এখন একটু শান্ত হও'। তখন খুনের ফেয়ারা স্থির হইল। মোটকথা, এইভাবে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর হত্যায় অংশগ্রহণকারী ও উহাতে সম্মত ইয়াহূদীদের শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হইল।

তাবারী ও জাযারী প্রমুখ এই ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া ইহার বাস্তবতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বিগত যুগের ঘটনাবলীর বিশেষজ্ঞ ও ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মতে এই কাহিনী

অসত্য ও বানোয়াট। কেননা ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, বুখত নাস্সারের ফিলিস্তীন (বা দামেশক) আক্রমণের সময় ছিল ইয়াহূদীগণ কর্তৃক শা'য়া (شعيا) নবী (আ)-কে হত্যা করিবার পরে, ইরমিয় (ارميا)-এর যুগ। আর হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) ও ইরমিয়া (আ)-এর মাঝে সময়ের ব্যবধান ছিল ৩৬৩ অথবা ৪১১ অথবা ৪৬১ বৎসর কিংবা ৫০০ বৎসরেরও অধিক।

কিন্তু ইব্ন হাজার হাকেমের মুসতাদরাকের বরাতে এবং ইব্ন কাছীর ইব্ন আসাকিরের বরাতে ঘটনার বিবরণ উল্লেখ করিয়া মন্তব্য হইতে বিরত রহিয়াছেন। মাওলানা হিফজুর রহমান বিষয়টি বিধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন,"এই বর্ণনায় এমন একটি বিষয়ের উল্লেখ আছে যাহাতে পূর্ণ বর্ণনাটি অপ্রামাণ্য হইয়া যায়। অর্থাৎ ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মুবারক দেহ হইতে ফোয়ারার ন্যায় রক্ত প্রবাহিত হওয়া, বুখ্ত নাস্সারের আক্রমণ, সত্তর হাজার ইয়াহূদী নিধন ও ইরমিয়া (আ)-এর দু'আ প্রভৃতি.....বর্ণনা। এই অংশটি ইতিহাসের প্রাথমিক স্তরের যে কোন ছাত্র নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করিবে। কেননা ইহা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, বুখ্ত নাসসারের যুগ ছিল 'ঈসা (আ)-এর কয়েক শতক পূর্বে। সুতরাং তাহার আক্রমণের সহিত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর শাহাদতের ঘটনা জড়াইয়া দেওয়া কিরূপে যথার্থ হইতে পারে ? কিন্তু অত্যধিক বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, হাফিজ ইবন আসাকির ও হাফিজ ইব্ন কাছীরের ন্যায় স্বনামধন্য গবেষক ও ইতিহাসবিদ ঐতিহাসিক বর্ণনাসমূহের পর্যালোচনা বিশারদ হওয়া সত্ত্বেও মন্তব্যবিহীন এই ধরনের বিস্ময়কর ও বিরল বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ প্রামাণ্য ও প্রত্যক্ষ সনদযুক্ত বিবরণ ব্যতীত এই ধরনের বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না (সমগ্র আলোচনার জন্য দ্র. আল-বিদায়া, ২খ, ৫৪, ৫৫, ৬৪, ৬৫; কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৯; আল-কামিল, ১খ, ২৩১, ২৩২, ৩০১, ৩০২; মা'আরিফ, পৃ. ২৪; তাবারী, ২খ, ১৫; বিদায়া, ২খ, পৃ. ৬৪-এর টীকা ১ ও ৩ এবং পৃ. ৬৫-এর টীকা ২-এর বরাতে কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৭০, ২৭১; মাজহারী, ৫খ, ৪১৩-৪১৭)। কাযী ছানাউল্লাহ তাফসীরে মাজহারীতে ইবন ইসহাকের বর্ণনাকে সঠিক বলিয়াছেন (মাজহারী, ৫খ, ৪১৭)।

অন্য একটি বর্ণনায় আছে, বনী ইসরাঈলের পবিত্র কুরআনে বিঘোষিত দুইবারের ভয়ংকর ধ্বংসলীলার (১৭ ঃ ৪-৭) প্রথমটি সংঘটিত হইয়াছিল বুখ্ত নাসসারের মাধ্যমে। আর দ্বিতীয়টির বিবরণ এই যে, ইয়াহূদীরা যখন ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করিল এবং আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা (আ)-কে ঊর্ধ্বাকাশে তুলিয়া লইলেন, ইহার পরে বাবিল সম্রাট খিরদাওস (خردوش) অথবা জুদরীস (جود ريس) ইয়াহূদীদের আক্রমণ করিল এবং বিজয় লাভের পর তাহার হস্তীবাহিনীর সেনাপতি য়াবুর যাযান (يبور زاذان) অথবা নাবুযাযান (نبوزاذان) -কে ডাকিয়া পাঠাইয়া বলিল, 'আমি পণ করিয়াছিলাম যে, বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করিতে পারিলে ইয়াহূদীদের এমনভাবে হত্যা করিব যে, আমার সেনা ছাউনীতে রক্ত প্রবাহিত হইবে। এই কথা বলিয়া সম্রাট সেনাপতিকে ইহার ব্যবস্থা গ্রহণে আদেশ প্রদান করিল। সেনাপতি বায়তুল মুকাদ্দাসের কুরবানী করিবার স্থানে পৌঁছিয়া সেখানে রক্তের উচ্ছল ফোয়ারা দেখিয়া সে বিষয়ে ইয়াহূদীদিগকে জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল, ইহা আমাদের একটি কুরবানী যাহা কবুল না হওয়ার কারণে এই অবস্থা হইয়াছে। সেনাপতি তাহাদিগকে

অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের সাত শত সত্তরজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি, সাত শতজন বিদ্বান ও সাত শত কিশোরকে সেই রক্তের নিকট খুন করিল। ইহাতেও রক্তের ফোয়ারা শান্ত না হওয়ায় সেনাপতি ইয়াহূদীদিগকে ডাকিয়া বলিল, "তোমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অপকর্ম ও যথেচ্ছাচার করিয়া আসিতেছ। এখন তোমরা সত্য কথা না বলিলে আমি তোমাদের একটি প্রাণীকেও রেহাই দিব না"। তখন তাহারা নিরুপায় হইয়া একজন নবীকে হত্যা করিবার কথা স্বীকার করিল, যিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টির কার্য হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দিতেন এবং বর্তমানে আগত শত্রুদের সর্বনাশা ধ্বংসযজ্ঞের বাপারেও তাহাদিগকে সতর্ক করিতেন।

সেনাপতির জিজ্ঞাসার জবাবে তাহার সেই নবীর নাম 'ইয়াহ্ইয়া' বলিলে সেনাপতি বলিলেন, এইবার তোমরা সত্য বলিয়াছ। তখন সেনাপতি তাহার বাহিনীকে বাহিরে যাওয়ার আদেশ প্রদান করিল এবং সিজদায় পতিত হইয়া আল্লাহ্র হুকুমে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর রক্তকে শান্ত হওয়ার নিবেদন করিলে উহা শান্ত হইয়া গেল। অতঃপর সেনাপতি বনী ইসরাঈলের 'রবের' প্রতি ঈমান আনিয়া উপস্থিত ইয়াহূদীদিগকে সম্রাটের আদেশের বিষয় অবহিত করিল এবং সকল পশু আনিয়া সেইগুলি জবাই করিয়া মৃতদেহগুলি স্তূপীকৃত করিল এবং উহার উপরে ইতোপূর্বে নিহতদের লাশগুলি রাখিয়া দিল। ওদিকে রক্ত প্রবাহিত হইয়া সেনা ছাউনী পর্যন্ত পৌঁছিলে সম্রাট উহাকে বনী ইসরাঈলের রক্ত মনে করিয়া সেনাপতির নিকট হত্যা বন্ধ করিবার আদেশ পাঠাইল। ইহাই ছিল বনী ইসরাঈলের দ্বিতীয় ধ্বংসযজ্ঞের ঘটনা এবং এইটি ধ্বংসযজ্ঞদ্বয়ের মধ্যে বৃহত্তর। (আল-কামিল ১খ, ৩৩২, ৩৩৫; মাজহারী, ৫খ, ৪১৩, ৪১৪)। মোটকথা ইয়াহূদীরা অথবা তাহাদের রাজা তাহার স্ত্রীর প্ররোচনায় ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করিয়াছিল।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর শাহাদতের স্থান

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে কোথায় শহীদ করা হইয়াছিল এই ব্যাপারে সীরাত ও ইতিহাসবিদগণের দুইটি মত রহিয়াছে। শাম্মার ইব্ন 'আতিয়্যা হইতে সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর বর্ণনা অনুসারে বায়তুল মুকাদ্দাসের 'হায়কাল' ও কুরবানীর স্থানের মধ্যবর্তী সত্তরজন নবীকে শহীদ করা হইয়াছিল এবং ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়্যা (আ) ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। অপর দিকে সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (র) হইতে আবূ উবায়দ কাসিম ইব্ন সাল্লামের বর্ণনামতে তাঁহাকে দামিশকে শহীদ করা হইয়াছিল এবং বুখ্ত নাসসারের দামিশকে আক্রমণকালে সে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর রক্ত উত্তোলিত হইতে দেখিয়া এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল এবং ইয়াহূদীরা ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করিবার কথা স্বীকার করিলে বুখ্ত নাস্সার সত্তর হাজার ইয়াহূদীকে হত্যা করিবার পর ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর রক্ত শান্ত হইয়াছিল। ইবন কাছীর এই বর্ণনাকে প্রামাণ্য বলিয়াছেন। তবে সেই সংগে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা আতা ও হাসান বসরীর বর্ণনার সমর্থনে বুখ্ত নাস্সার-এর দামিশক অভিযান ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক হওয়া মানিয়া নিবার প্রয়োজন দেখা দেয় (বিদায়া, ২খ, ৫৪, ৫৫)। কিন্তু তখন আবার বিষয়টি ইতিহাসের প্রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের সহিত সংঘাতপূর্ণ হইয়া দাঁড়ায় (কাসাসুল

কুরআন, ২খ, ২৭১, ২৭২)। তবে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর শাহাদাতের স্থান দামিশকে হওয়ার বিষয়টি ইবন আসাকিরের একটি বর্ণনা দ্বারা সমর্থিত হয়। ইহা যায়দ ইব্ন ওয়াকিদ (র) হইতে ওয়ালীদ ইব্ন মুসলিমের সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ওয়াকিদ বলেন, দামিশকের (উমূদুস সাকাসিকা নামে পরিচিত স্থানের) একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য খননকালে মসজিদের মিহরাবের নিকটবর্তী পূর্ব পার্শ্ব হইতে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মাথা বাহির হইয়াছিল এবং মুখমণ্ডল, এমনকি চুল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অক্ষত ও অবিকৃত ছিল। তাহা এমনভাবে রক্তরঞ্জিত দেখাইতেছিল যেন এখনই তাঁহাকে হত্যা করা হইয়াছে। (বিদায়া, ২খ, ৫৫)। তবে এখানেও প্রাপ্ত মাথাটি যে ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর ছিল উহার নিশ্চয়তার ব্যাপারটি প্রশ্নের সম্মুখীন থাকিয়া যায় (কাসাসুল কুরআন, ২খ, ২৭২)।

ইব্ন কাছীর (র) ইসহাক ইব্ন বিশরের কিতাব আল-মুরতাদার বরাতে ইয়াহ্ইয়া ও যাকারিয়্যা (আ)-এর শহীদ হওয়া প্রসংগে ইব্ন 'আব্বাস একটি দীর্ঘ রিওয়ায়াত উপস্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, মি'রাজের ভ্রমণকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম আকাশ জগতে যাকারিয়্যা (আ)-এর সাক্ষাত লাভ করিলে তাঁহাকে সালাম করিয়া বলিলেন, হে ইয়াহ্ইয়ার পিতা! আপনার হত্যার ঘটনা এবং উহার কারণ সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। তখন তিনি বলিলেন, হে মুহাম্মাদ (স)! আমি আপনাকে অবহিত করিতেছি যে, ইয়াহ্ইয়া ছিল সমকালীন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং সর্বাধিক সৌন্দর্যের অধিকারী এবং আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা অনুসারে সে ছিল 'সায়্যিদ ও হাসূর' (নারীর প্রতি নিরাসক্ত)।

এ বিষয়ে শেষ কথা এই যে, ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করিবার কারণ ও সূত্র সম্পর্কে এবং তাঁহার শাহাদতের স্থান সম্পর্কে বর্ণনায় বিরোধ থাকিলেও এই বিষয়টি স্বীকৃত যে, ইয়াহূদীরা তাঁহাকে শহীদ করিয়া ঈসা (আ)-এর নিকট তাঁহার শাহাদতের সংবাদ পৌঁছাইলে তিনি প্রকাশ্যে দীনের দাওয়াতের কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন (কাসাসুল আম্বিয়া, পৃ. ৩৬৯; কাসাসুল কুরআন, ২খ, পৃ. ২৭২, ২৭৩)। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে হত্যা করিবার পর ইয়াহূদীরা তাঁহার পিতা যাকারিয়্যা (আ)-কে হত্যা করিবার জন্য ছুটিল। পরবর্তী সময়ে তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যার চক্রান্ত করিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে উর্ধ্বাকাশে তুলিয়া নিলেন।

ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বয়স

ইয়াহ্ইয়া (আ) ঈসা (আ)-এর ছয় মাস পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন (দ্র. ফাতহুল বারী, ৬খ, ৫৪০ ; লূক ১ ঃ ২৬-৩৫)। ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর শাহাদতের পরে যখন ঈসা (আ) প্রকাশ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করিলেন তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর ছিল বলিয়া কথিত। সুতরাং এই হিসাবে শাহাদাত লাভের সময় ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর বয়স সাড়ে ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল এবং তিনি খৃ., পূ. ১ সনে জন্মগ্রহণ করেন (আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, ২৯৪)।

"যখন আমি (দ্বিতীয়) আকাশে পৌঁছিলাম তখন দেখিলাম ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা-দুই খালাত ভাইকে। তিনি (জিবরীল) বলিলেন, ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা। সুতরাং আপনি তাহাদিগকে সালাম করুন।

তখন আমি সালাম করিলে তাঁহারা সালামের জওয়াবে বলিলেন, মারহাবা শ্রেষ্ঠ নবীকে, শ্রেষ্ঠ ভাইকে (কাসাসুল কুরআন ২খ, ২৭৪; আম্বিয়ায় কুরআন, ৩খ, ২৯৫; বরাত বুখারী কিতাবুল আম্বিয়া হাদীছ নং ১৯)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম তাফসীর গ্রন্থ; (২) ইব্ন কাছীর, তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১ম খ, ৩খ; (৩) ঐ, মুখতাসার তাফসীরে ইব্ন কাছীর; (৪) আল কুরতুবী, আল জামি'লিআহকামিল কুরআন-তাফসীর কুরতুবী ২/২খ., ১খ.; (৫) আল-আলুসী, তাফসীরে রুহুল মা'আনী, ২/২খ, ৮/২খ; (৬) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে, মাজহারী, ২খ, ৫খ, ৬খ; (৭) মুফতী মুহাম্মাদ শফী; মা'আরিফুল কুরআন, ২খ, ৬খ; (৮) ইব্ন জারীর আত-তাবারী, তাফসীরে তাবারী; ও ইতিহাস গ্রন্থ); (৯) ইব্ন কুতায়বা, আল-আ'আরিফ; (১০) নাজ্জার, কাসাসুল আম্বিয়া; (১১) ছা'লাবী, কাসাসুল আম্বিয়া; (১২) ইবন কাছীর, আল কামিল ১খ; (১৩) ইব্ন কাছীর, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ; (১৪) হিফজুর রহমান সীওহারবী, কাসাসুল করআন, ২খ; (১৫) জামীল আহমদ এম, এ, আম্বিয়ায়ে কুরআন; লাহোর ৩খ, পৃ. ২৭৮-২৯৫; (১৫) ইসলামী বিশ্বকোষ, ই,ফা,বা; ২২খ, শিরো; (১৬) ইব্ন হাজার আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৬খ. এবং (১৭) পবিত্র বাইবেল, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি।

মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাইল

৩০

হযরত মারয়াম (আ)

حضرت مريم عليها السلام

হযরত মারয়াম (আ)

জন্ম ও বংশপরিচয়

তিনি আল্লাহর রাসূল হযরত ঈসা (আ)-এর কুমারী মাতা, নারী কুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মহিলা, আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টি বৈচিত্র্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। মেরী (Mary), আরবী ও উর্দূ ভাষায় কুরআন মজীদের অনুসরণে তাঁহার নাম মারয়াম (مريم)। ল্যাটিন ও প্রাচীন ইংরেজীতে এবং হিব্রুতে মিরিয়াম (Miryam বা Miriam) (দ্র. William Little, H.W. Fowler and Iessic Coulson, The Shorter Oxford English Dictionary on historical principles, vol.2, p. 1284)। বাংলায় প্রচলিত বানানে 'মরিয়ম' লেখা হয়। বাইবেলের বঙ্গানুবাদেও 'মরিয়ম' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (বাইবেলের নূতন নিয়ম, লূক, ১ঃ২৭; বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ১৯৯৩/৯৭)। কিন্তু ইহার শুদ্ধ উচ্চারণ 'মারয়াম'।

আল-কুরআন হইতে জানা যায়, হযরত মারয়ামের মাতাই তাঁহাকে এই নামকরণ করেন (দ্র. ৩ ঃ ৩৬); যদিও তাঁহার পূর্বে ও পরে অনেকের নাম ছিল মারয়াম। তবে তাঁহার পূর্বে বাইবেলে একমাত্র হযরত হারূন (আ)-এর ভগ্নীর নাম উল্লেখ করা হইয়াছে মারয়াম (দ্র. বাইবেলের পুরাতন নিয়ম, যাত্রাপুস্তক, ১৫ঃ২০)। তাঁহার সমসাময়িক হিসাবে মগদলীনী মরিয়ম, যোহানা ও যাকোবের মাতা মরিয়ম, এই দুই মহিলার নাম বাইবেলে উল্লেখ আছে (দ্র. মথি, ২৭ ঃ ৫৬; লূক ২৪ ঃ ১০)।

Collier's Encyclopedia-তে Mary শিরোনামে জন এ. হার্ডন (John A. Hardon) উল্লেখ করেন, মেরী (Mary) শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষত রূপবতী, তিক্ত বা বেদনা-দায়ক, বিদ্রোহ, দ্যুতিময় বা উজ্জ্বল, সম্ভ্রান্ত মহিলা (প্রভুর প্রিয়)। হার্ডন শেষোক্ত অর্থটিকে অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন। কারণ চতুর্থ শতাব্দীতে মিসরে ইসরাঈলীগণ কর্তৃক এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে (দ্র. Collier's Encyclopedia, vol.15, p. 470)।

The Encyclopedia Americana-তে "Mary" শিরোনামে উইলিয়াম জি. মোস্ট (Wiliam G. Most) ইহার ৬০-টিরও অধিক অর্থের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, বর্তমানে প্রাপ্ত সবচেয়ে ভাল তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয়, ইহার অর্থ "উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বা মহিমান্বিত হওয়া" (দ্র. The Encyclopedia Americana, vol. 18, P. 345)।

উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে মারয়াম (مريم) শব্দটি ৩৪ বার উক্ত হইয়াছে। মুফাস্সিরগণ এই শব্দটির বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। আল্লামা রাগিব ইসফাহানীর মতে ইহা একটি আজমী তথা অনারব শব্দ (রাগিব আল-ইসফাহানী, আল-মুফ্রাদাত ফী গারীবিল কুরআন, পৃ. ৪৬৭)। অনেকের

মতে ইহা সুরয়ানী শব্দ, যাহার অর্থ খাদেম। কারণ হযরত মারয়াম (আঃ)-কে তাঁহার মাতা বায়তুল মাকদিসের সেবার জন্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন (দ্র. আয-যামাখ্শারী, আল-কাশ্শাফ, ১খ, পৃ. ২৯৪; আল-খাযিন, তাফসীর, ১খ, পৃ. ৬৪)। কুরতুবীর মতে, তাহাদের ভাষায় (অর্থাৎ সুরয়ানী ভাষায়) ইহার অর্থ প্রভুর সেবাকারী (কুরতুবী, আল-জামি, ৪খ, পৃ. ৬৮)। রাযীর মতে, তাহাদের ভাষায় ইহার অর্থ ইবাদতকারী (আত্-তাফসীরুল কাবীর, ৮খ, পৃ. ২৯)। ইমাম শায়খযাদার মতে ইহা মূলত সুরয়ানী ভাষার অর্থে একটি গুণবাচক শব্দ, অর্থ সেবাকারী, যাহাকে পরবর্তীতে নাম হিসাবে ব্যবহার করা হয় (শায়খ যাদাহ, তাফসীর বায়দাবীর টিকা, ১খ., পৃ. ৩৪৬)। কেহ কেহ ইহাকে হিব্রু শব্দ বলিয়া অভিহিত করেন, যাহার অর্থও সেবাকারী (বায়দাবী, তাফসীরুল বায়দাবী, ১খ., পৃ.৮৯)। কেহ কেহ বলেন, ইহা হিব্রু শব্দ তবে ইহার অর্থ ইবাদতকারী।

অনেকে এই শব্দটিকে আরবী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, যে মহিলা পুরুষের সাথে বেশী বেশী কথাবার্তা ও উঠাবসা করে কিন্তু পাপাচারে লিপ্ত হয় না তাহাকে মারয়াম বলা হয় (প্রাগুক্ত, আরো দ্র. ফীরোযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত, ৪খ., ১২৩-১২৪)। ইহাই আরবী ব্যাকরণবিদগণের মত। তাঁহাদের মতে মারয়াম (مريم) مفعل-এর ওযনে আসিয়াছে (দ্র. যামাখশারী, প্রাগুক্ত; বায়দাবী, প্রাগুক্ত; নাসাফী, তাফসীরুন্ নাসাফী, ১খ, পৃ. ৮৭; আলূসী, প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, মারয়াম শব্দটি আরবীতে ব্যবহৃত হইলেও তাহা মূলত অনারব, যাহার অর্থ সেবাকারীনী, ইবাদতকারীনী, যাহা মারয়াম (আ)-এর জীবনের আলোকেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

যেই নারী পুরুষের সঙ্গে উঠাবসা করিতে ভালবাসেন, তাহাকে মারয়াম বলা হয়। হযরত মারয়াম (আ)-এর ক্ষেত্রে ইহার কিছুটা বাস্তবতা থাকিলেও উক্ত অর্থ তাঁহার মর্যাদার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে বলিয়া আলূসী মত প্রকাশ করিয়াছেন (দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত)। তাই তাঁহার মতে শব্দটি হিব্রু ভাষার হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে হযরত মারয়াম (আ)

আল-কুরআনে মারয়াম (مريم) শব্দটি যে ৩৪ বার উল্লিখিত হইয়াছে তন্মধ্যে আলাদাভাবে ১১ বার আসিয়াছে। ঈসা ইব্ন মারয়াম বলিয়া ১৩ বার, মাসীহ ইব্ন মারয়াম বলিয়া ৫ বার, মাসীহ ঈসা ইব্ন মারয়াম বলিয়া ৩ বার এবং শুধু ইব্ন মারয়াম বলিয়া ২ বার উল্লেখ করা হইয়াছে। আল-কুরআনে নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহে তাঁহার প্রসঙ্গে আলোচনা আসিয়াছে ঃ

সূরার নাম	আয়াত নং
সূরা আল-ইমরান	৩৩-৩৭, ৪২-৪৭
সূরা নিসা	১৫৬, ১৭১
সূরা মাইদা	১৭, ৭৩-৭৫, ১১০, ১১৬
সূরা মারয়াম	১৬-৩৭
সূরা মুমিনূন	৫০
সূরা তাহ্রীম	১২

উপরিউক্ত স্থানসমূহে হযরত মারয়াম (আ)-এর বংশ, জন্ম-বৃত্তান্ত, লালন-পালন, মস্জিদে আক্সায় অবস্থান ও পবিত্র পরিবেশে ইবাদত-বন্দেগী, আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত হওয়া, ঈসা (আ)-কে আলৌকিকভাবে গর্ভে ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইয়াছে। আল কুরআনে হযরত মারয়াম (আ)-এর বিশেষ মর্যাদার উল্লেখ রহিয়াছে। একটি সূরার নামকরণ করা হইয়াছে সূরা মারয়াম। এই সূরা এবং সূরা আল-ইমরানেই তাঁহার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রহিয়াছে।

হাদীছ গ্রন্থাবলীতেও তাঁহার জন্মকালীন অবস্থা ও চারিত্রিক শূচিতা এবং নারী সমাজে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাঁহার মর্যাদার কথা বিবৃত হইয়াছে।

বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের সুসমাচার ও পত্রাবলীতে মারয়াম সম্পর্কে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে যাহারা হযরত মারয়ামের জীবনী লিখিয়াছেন বা গবেষণা করিয়াছেন তাহারা একমত যে, শুধুমাত্র ঐ সকল বাইবেলীয় উৎসের উপর নির্ভর করিয়া মারয়াম (আ)-এর জীবনী লেখা সম্ভব নহে (দ্র. Encyclopaedia Britannica, vol.14, P.996; The New Encyclopaedia Britannica, vol. 11, P. 560)।

বাইবেলে তাঁহার জীবনী সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়— যোশেফ (ইউসুফ)-এর বাগদত্তা হিসাবে নাসেরা পল্লীতে তাঁহার অবস্থান এবং সেখানে জিবরাঈল ফেরেশতা কর্তৃক গর্ভ ধারণের সংবাদ সম্পর্কিত ঘটনাবলী ও যিহুদার এক নগরে গিয়া যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাত ও নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন (লূক, ১ ঃ ২৬-৫৬), অতঃপর ঈসা (আ)-কে প্রসব ও নাসেরায় প্রত্যাবর্তন (লূক, ২ ঃ ১-৩৯) ও মিসরে গমন, আশ্রয় গ্রহণ এবং হেরোদ রাজার মৃত্যুর পর প্রত্যাবর্তন (মথি, ২ ঃ ১-২৩) ইত্যাদি আলোচনায়।

ঈসা (আ)-এর বার বৎসর বয়সে তাঁহাকে লইয়া জেরুসালেমে ইয়াহূদীদের পাসওভার (Pasover) অনুষ্ঠানে যোগদান (লূক, ২ ঃ ৪১-৫২), গালীলের কান্না নগরীর এক বিবাহ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও পুত্রের সাথে কিছু দিন কফর নাহুমে অবস্থান (যোহন, ২ ঃ ১-৬,১২), ঈসা (আ) কর্তৃক স্বীয় শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার সময় তাঁহার সাক্ষাত লাভের আবেদন (মথি, ১২ ঃ ৪৬-৫০; মার্ক, ৩:৩১-৩৫, লূক, ৮:১৯-২১), ঈসাকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কথিত ঘটনার সময় উপস্থিতি (মথি, ২৭ : ৫৬; মার্ক, ১৫ ঃ ৪৭ যোহন, ১৯ ঃ ২৬), ঈসা (আ)-এর কথিত সমাধির পার্শ্বে গমন (মথি, ২৭ ঃ ৬১, ২৮ ঃ ১; মার্ক, ১৫ : ৪০), ঈসা (আ) উর্ধারোহণের সময় শেষ বিদায়ী সাক্ষাত (মার্ক, ১৬ ঃ ৯), ঈসা (আ)-এর উর্ধারোহণের পর তাঁহার সঙ্গে ইবাদতে নিবিষ্ট থাকা (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ, ১ ঃ ১৪)।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, খৃস্টানদের চারটি সুসমাচারে হযরত মারয়াম (আ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার বিচ্ছিন্নভাবে কিছু তথ্য রহিয়াছে। বিশেষত তাঁহার জন্ম, বংশ, পিতা-মাতা, লালন-পালন ও বায়তুল মাকদিসে অবস্থান সম্পর্কে চারিটি সুসমাচারে কিছুই উল্লেখ নাই।

তবে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ উল্লেখ করিয়াছেন, "উনিশ শতকে পরিত্যক্ত বাইবেলের যে সংকলন ভ্যাটিকানের গ্রন্থাগারে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হযরত মারয়ামের জন্মের এই বিলুপ্ত

ঘটনার উল্লেখ আছে। ইহাতে মনে হয় যে, অন্তত চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত ঘটনার এই বিলুপ্ত অংশও কিতাবের অংশ বলিয়া বিশ্বাস করা হইত, যেইভাবে অবশিষ্ট অংশগুলিকে কিতাবের অংশ বলিয়া মনে করা হয় (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তরজমানুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৫৮৮-৫৮৯)।

খৃস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থের অনেক কিছুই অবলুপ্ত। তাই বর্তমানে তাহাদের কাছে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এককভাবে নির্ভরশীল না হইয়া বিভিন্ন উৎসের সমন্বয়ে তাঁহার জীবন-বৃত্তান্তের মোটামুটি একটি আলেখ্য তুলিয়া ধরা যায়।

বংশপরিচয়

ঐতিহাসিকগণ একমত যে, হযরত মারয়াম (আ)-এর পিতার নাম 'ইমরান ও মাতার নাম হান্না। আল কুরআনেও তাঁহাকে 'ইমরানের কন্যা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (৬৬ ঃ ১২)। বাইবেলে মারয়াম (আ)-এর পিতা-মাতার নাম উল্লেখ না থাকিলেও ইমরান (খৃস্টান কিংবদন্তিতে তাঁহার নাম ইওয়াখীম (Ioachim) এবং হান্না (Anna)-এর নাম পুরাতন বর্ণনায় পাওয়া যায় (দ্র Encyclopedia Americana, vol. 18. P.345)।

যাহা হউক বনূ ইসরাঈলের মধ্যে হযরত 'ইমরান একজন একনিষ্ঠ ইবাদতগুযার ও সঠিক ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। এই কারণে তাহাদের নামাযে ইমামতির দায়িত্বও তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। এমনকি বর্ণিত আছে যে, তিনি ইসরাঈলের পক্ষে কুরবানী পেশ করিতেন (দ্র.তাবারী, তাফসীর, বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫খ, ৩৫৫; আন্-নাসাফী, মাদারিকুত তানযীল, ১খ, ২১৬)।

তাহা ছাড়া, তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি মসজিদে আকসার খাদিমদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন (দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বঙ্গানুবাদ, ২খ., ৬২)। এক বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি বনূ ইসরাঈলের হযরত হারূন (আ)-এর বংশধর ছিলেন। আল-কুরআনেও হযরত মারয়াম (আ)-কে উখ্ত হারূন (হারূনের বোন) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১৯ ঃ ২৮)। এই মতটি ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত (ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, ৫খ, ২২৭)।

মুসলিম ঐতিহাসিক ও মুফাস্সিরগণ হযরত মারয়াম (আ)-এর পিতা 'ইমরানের এক বংশলতিকার উল্লেখ করিয়াছেন যাহা হযরত সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) পর্যন্ত পৌছিয়াছে।

ইব্ন কাছীর ঐতিহাসিক মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক ইব্ন য়াসার-এর বরাতে ইমরানের বংশলতিকা নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন এবং আত-তাবারী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে 'ইমরান ইব্ন বাশিম ইব্ন মীশা ইব্ন হিযকিয়া ইব্ন ইব্রাহীম ইব্ন গারায়া ইব্ন নাউশ ইব্ন আজার ইব্ন বাহ্ওয়া ইব্ন নাযিম ইব্ন মুকাসিত ইব্ন ঈশা ইব্ন ইয়ায ইব্ন রুখায়ইম ইব্ন সুলায়মান ইব্ন দাউদ (আ) (দ্র. তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ, পৃ.৩৫৮)। তবে ইব্ন কাছীর আল-বিদায়াতে কিছু পার্থক্যসহ বংশলতিকা উল্লেখ করিয়াছেন।

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলি পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে, ইব্ন ইসহাকের প্রথম বর্ণনায় হযরত মারয়াম (আ)-এর পূর্বপুরুষের তালিকায় দাউদ (আ) পর্যন্ত ১৬ জন, দ্বিতীয় বর্ণনায় ১৮ জন, তাবারীর বর্ণনায় ১৭ জন এবং ইব্ন আসাকিরের বর্ণনায় ২৬ জন। তবে ইমরান যে দাউদের বংশধর ছিলেন এই ব্যাপারে কাহারো দ্বিমত নাই (দ্র. ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

মারয়াম (আ)-এর পূর্বপুরুষগণ বনূ ইসরাঈলের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন। মারয়াম (আ)-এর মাতাও বনূ ইসরাঈলের সম্ভ্রান্ত ধর্মীয় পরিবারের মহিলা ছিলেন। তিনি হান্না বিন্ত ফাকূদ বা ফাকূয ইব্ন কাবীল (দ্র. তাফসীরে ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৯, রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৩৩)।

আল্লামা ইবনুল 'আরাবী উল্লেখ করেন, ইমরান ইব্ন মাছানের দুই কন্যা ছিল একজনের নাম হান্নাহ, অপরজনের নাম য়ানাম (ইবনুল আরাবী, আহকামুল কুরআন)। এই মতটি জমহূরের মতের বিপরীত ও অগ্রহণযোগ্য। কাহারো মতে যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী ঈশায়া মায়ের দিক দিয়া হান্নার বোন আর বাপের দিক দিয়া মারয়ামের বোন। আল্লামা আলূসী এই মতটিকে দুর্বল বলিয়াছেন। সহীহ হাদীছে হযরত ঈসা (আ) ও হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে যে খালাতো ভাই বলা হইয়াছে তাহা আক্ষরিক অর্থে নহে, বরং রূপক অর্থে খালাতো বোনের ছেলেকেও খালাতো ভাই বলা যায়।

মহিউস সুন্নাহ বাগাবীর মতে ঈশায়া ও হান্নাহ ফাকূযের কন্যা ছিলেন (প্রাগুক্ত)। অনেক তাফসীরকার লিখিয়াছেন, সিরিয়ায় হান্নার নামে একটি প্রসিদ্ধ গীর্জা রহিয়াছে এবং দামিশক নগরীতে তাঁহার কবর রহিয়াছে (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫; তাফসীরে মাজেদী, ২খ, পৃ. ৪৮)। ইমরান ও তাঁহার স্ত্রী উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত রাজকীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইমরানের এই পরিবার-পরিজন সম্পর্কে আল-কুরআনেও প্রশংসা করা হইয়াছে। এমনকি তাঁহাদেরকে আল্লাহর মনোনীত বংশ হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে ঃ

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ

"অবশ্যই আল্লাহ আদম, নূহ এবং ইবরাহীম-এর বংশধর ও ইমরানের বংশধরকে সমগ্র বিশ্ব জাহানে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৩৩)।

আয়াতে উল্লিখিত ইমরান দ্বারা মারয়ামের পিতাকেই বুঝানো হইয়াছে (দ্র. তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ১খ, পৃ. ৩৫৮)। আর ইহাই হাসান বাসরী ও ওয়াহবের মত, য্যহাকে অধিকাংশ মুফাসসির গ্রহণ করিয়াছেন। কাহারো কাহারো মতে, ঐ আয়াতে ইমরান দ্বারা মূসা (আ)-এর পিতা 'ইমরান ইব্ন ইয়াসহারকে বুঝানো হইয়াছে। তাই আল 'ইমরান দ্বারা মূসা ও হারূন (আ) এবং তাঁহাদের বংশধরকে বুঝানো হইয়াছে। আর এই মতের প্রবক্তা মুকাতিল ইব্ন সুলায়মান (দ্র. ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, ১খ, পৃ.৩৭৫; রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৩১)। আল্লামা মারাগী আল 'ইমরান (৩ ঃ ৩৩) এবং ইমরা'আতু 'ইমরান (৩ ঃ ৩৫)-এ উল্লিখিত 'ইমরান ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া

উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, প্রথম ইমরান হযরত মূসা (আ)-এর পিতা এবং দ্বিতীয় ইমরান মারয়াম (আ)-এর পিতা। আর উভয়ের মধ্যে প্রায় ১৮০০ বৎসরের ব্যবধান (তাফসীরুল মারাগী, ৩খ, পৃ. ১৪৪)।

কিন্তু পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মুফাস্‌সির-এর মতে উভয় আয়াতেই হযরত মারয়াম (আ)-এর পিতাকে বুঝানো হইয়াছে। আর ইহাই পূর্বাপর প্রসঙ্গের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ ঃ

(ক) উপরিউক্ত আয়াতে আল ইব্‌রাহীম বলিয়া নিকটতম ইশারায় মূসা (আ) ও হারূনের কথা আসিয়া গিয়াছে। তাই পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

(খ) আল ইমরান উল্লেখের পরেই মারয়াম পিতা ইমরানের স্ত্রীর কথা আলোচনা করা হইয়াছে। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি মারয়াম (আ)-এর পিতা ছিলেন।

(গ) সূরা আল 'ইমরানে হযরত মারয়াম ও ঈসা (আ)-এর কথাই বেশী আলোচিত হইয়াছে। তাহাতে মূসা (আ)-এর প্রসঙ্গের উল্লেখ নাই।

সুতরাং প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জ্ঞাত। এইখানে উভয় ইমরানই উদ্দেশ্য হওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক, ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতাকে কেন্দ্র করিয়া মানব সৃষ্টির বিশেষ কীর্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা যায়, এইখানে মারয়ামের পিতা ইমরান গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসংগত (দ্র. আলূসী, রূহুল মা'আনী, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১; তাফসীরে মাজেদী, ২খ, পৃ.৪৭)।

হযরত মারয়াম (আ)-এর জন্মবৃত্তান্ত

হযরত মারয়াম (আ)-এর জন্মের এক বিশেষ পটভূমি রহিয়াছে। (ক) জন্মের পটভূমি ঃ হযরত ইমরান (আ)-এর স্ত্রী হান্না বিন্‌ত ফাকূদা বন্ধ্যা ছিলেন। আর এইভাবেই তিনি বার্ধক্যে উপনীত হন। বর্ণিত আছে যে, বৃদ্ধাবস্থায় তিনি একবার বাড়ির আংগিনায় পায়চারি করিতে ছিলেন। এমন সময় দেখিতে পাইলেন, একটি পাখি নিজের বাচ্চাকে আদর-সোহাগ করিতেছে (হিফযুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা ৪খ, পৃ. ৬)। অপর এক প্রসিদ্ধ বর্ণনায় আছে, হান্না তখন একটি গাছের ছায়ায় বসা ছিলেন। এই সময় হঠাৎ তাঁহার চোখে পড়িল, একটি পাখি তাহার ছানাকে আহার করাইতেছে। ইহা অবলোকনে তাঁহার নারী মন সন্তানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহ— ভক্ত ও পরহেযগার মহিলা। তখন তিনি আল্লাহর কাছে দু'আ করিলেন যে, তাঁহাকে যদি একটি সন্তান দান করা হয় তবে তিনি তাহাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিবেন। ইবন জরীর তাবারী স্বীয় তাফসীরে ইকরিমা ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাকের সূত্রে ঐরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র.তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৩৪৩, ৩৪৫) আল্লামা ইব্‌ন কাছীর ও মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখ হইতে সেই রূপ বর্ণনা বিবৃত করিয়াছেন (দ্র. আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৫২)।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, হযরত মারয়াম (আ)-এর জন্মের উপলক্ষ ছিল তাঁহার পুণ্যবতী মায়ের দু'আ। আল্লাহ্ পাক তাঁহার দু'আ কবুল করিয়াছিলেন।

(খ) হযরত মারয়াম (আ)-এর মাতা যখন অনুভব করিতে পারিলেন যে, তিনি সন্তান সম্ভবা তখন এই অনুভূতি তাঁহাকে এতই আন্দোলিত করিল যে, তিনি আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ করিয়া ঘোষণাই দিয়া দিলেন যে, তাঁহার গর্ভের সন্তানকে তিনি হায়কালে সুলায়মানী তথা বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে উৎসর্গ করিয়া দিবেন। আল-কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

إِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّيْ نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ـ

"স্মরণ করুন যখন ইমরানের স্ত্রী বলিয়াছিল, হে আমার প্রভু! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্ত আপনার জন্য আমি উৎসর্গ করিলাম। সুতরাং আপনি আমার নিকট হইতে তাহা কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ" (৩ ঃ ৩৫)।

উল্লেখ্য, তৎকালীন ইয়াহূদী সম্প্রদায়ের মধ্যে হায়কালে সুলায়মানীর খিদমতের জন্য সন্তান মানত করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। তাহারা মসজিদের খিদমত ও ইবাদাতেই নিয়োজিত থাকিত। পিতামাতার খিদমত বা বৈষয়িক কোন কাজে তাহাদেরকে নিয়োজিত করা হইত না। তাহারা বিবাহ শাদী করিত না, একমাত্র আখেরাতের কাজেই মশগুল থাকিত। তাই পিতা-মাতার খিদমতের দায়িত্ব হইতে তাহাদিগকে বিমুক্ত (মুহাররার) করা হইত (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ.৬৭; আরো দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ.১৩৩; শায়খ ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরু রূহুল বায়ান, ২খ, পৃ. ২৬)।

তাফসীরে খাযিনে উল্লেখ করা হইয়াছে, এই মানতের জন্য হান্নার স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, হায়! সর্বনাশ! তুমি ইহা কি করিলে? তুমি কি জানিতে না, যদি তোমার পেটে কন্যা সন্তান থাকে তবে সে ঐ কাজের জন্য উপযুক্ত হইবেনা? অতঃপর ঐ মানত রক্ষার ব্যাপারে তাহারা উভয়ে খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন (আল-বাগদাদী, তাফসীরুল খাযিন, ১খ, পৃ. ২২৯)।

হাফেয ইব্ন আসাকির ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, হযরত হান্না স্বীয় স্বামীর ভর্ৎসনা শুনিয়াই আল্লাহর নিকট দু'আ করিয়াছিলেন ঃ

نَذَرْتُ لَكَ مَافِيْ بَطْنِيْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّيْ ـ

"হে প্রভু! আমার গর্ভে যাহা আছে তাহা একান্তভাবে আপনার জন্য উৎসর্গ করিলাম। আপনি আমার পক্ষ হইতে কবুল করুন" (৩ ঃ ৩৫)।

বস্তুত ইহা তাঁহার পুত্র সন্তান লাভেরই প্রার্থনা (রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৩৩)। অধিকাংশ মুফাস্সির-এর মতে, হযরত মারয়াম (আ) মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায়ই তাঁহার পিতা ইনতিকাল করেন (দ্র. প্রাগুক্ত, তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ.৩৪৩; আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৩৬)।

যথাসময়ে হযরত হান্নার গর্ভে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, তিনি যাহার নাম রাখেন মারয়াম (আ)। এইখানে উল্লেখ্য যে, তিনি কখন ও কোথায় জন্মগ্রহণ করেন সে বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রহিয়াছে। তবে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাঁহার ১৩ বৎসর বয়সের সময় ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে বলা যায়, তিনি খৃস্টপূর্ব ১৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনসাইক্লোপিডিয়া অব এমেরিকানাতে হযরত মারয়ামের জন্মস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ রহিয়াছে। কোনটিতে তাঁহার জন্মস্থান হিসাবে নাসেরা (Nazreth) জনপল্লী, কোনটিতে সেপোরিশ (Sepphoris) এবং অন্য আরেকটিতে জেরুসালেম (Jerusalem) শহরের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে জেরুসালেম হওয়ার দিকটিই অধিক যুক্তিযুক্ত (Encyclopedia Americana, vol. 14., P. 345H)।

জন্মোত্তর কালে তাঁহার মায়ের আক্ষেপ ও দু'আ ঃ হযরত মারয়াম (আ) জন্মগ্রহণ করিবার পর তাঁহার মাতা যেই অনুভূতি ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার আফসোস-এর সুর প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, (দ্র. ইসমাঈল হাক্কী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ২৭), যাহার ইশারা আল-কুরআনেও আসিয়াছে নিম্নোক্তভাবে ঃ

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى.

"তারপর সে যখন সন্তান প্রসব করিল তখন বলিল, হে আমার প্রভু! আমি তো কন্যা সন্তান প্রসব করিয়াছি" (৩ ঃ ৩৬)।

এই মেয়ে তোমার ইবাদতগাহের খেদমত কিভাবে সম্পন্ন করিবে (দ্র. তাফসীরে মাজেদী, ২খ, পৃ.৪৯)। হযরত মারয়ামের মাতা অত্যন্ত বিনয় ও নম্রতা সহকারে মহান আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করিতেছিলেন যে, তাঁহার মানত ছেলে সন্তানের লক্ষ্যেই ছিল, যাহাতে সে সুচারুরূপে হায়কালে সুলায়মানীর খেদমত করিতে পারে। কিন্তু মানতের পর তাহা কন্যা সন্তান হওয়ায় তাহাকে দিয়া মানত পুরা করা তো সম্ভব হইবে না। কন্যা সন্তান তো ঋতুবতী অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া পুরুষের সঙ্গে কন্যা সন্তানের সহ-অবস্থান শোভনীয় হইবে না। সমাজে মহিলাদের দ্বারা গীর্জার খেদমতের কোন ব্যবস্থাও প্রবর্তিত ছিল না (তাফসীরে মাজেদী, প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, উপরিউক্ত কারণে তাঁহার মাতা কিছুটা আক্ষেপের সুরেই স্বীয় অনুভূতি প্রকাশ করিলেন (দ্র. শাওকানী, ফাতহুল কাদীর, ১খ, পৃ. ৩৩৪)। কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى.

"সে যাহা প্রসব করিয়াছে, আল্লাহ তাহা সম্যক অবগত। ছেলে তো মেয়ের মত নহে" (৩ ঃ ৩৬)।

আল-কুরআনের এই বক্তব্যটি আল্লাহ পাকের উক্তি হিসাবে ধরা যায়। কিন্তু وضعت শব্দে কোন কোন কিরাআত-এ "পেশ" ধরা হয়, যাহাতে অর্থ হয় "আমি যাহা প্রসব করিয়াছি তাহা সম্পর্কে আল্লাহই সম্যক জ্ঞাত" (তাফসীর তাবারী, ৫খ, পৃ.৩৪৬)। এই কিরাআত দ্বারা বুঝা যায় ইহা তাহার উক্তি। কেহ কেহ পরবর্তী বাক্যটি وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى মারয়ামের মায়ের হওয়ার বিষয়টি অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু অধিকাংশের মতে ইহা আল্লাহর উক্তি। "ছেলে তো মেয়ের মত নহে" ইব্ন আমির প্রমুখের কিরাআত হিসাবে ইহাও হান্নার উক্তি। অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের সেবায় এই সন্তান উৎসর্গের উপযুক্ত না হওয়ার কারণ পুত্র সন্তান শক্তি-সামর্থ্যের কারণে গীর্জার সেবায় কন্যা সন্তানের মত দুর্বল নহে। তাহার পর্দাজনিত কোন বাধা আর রজঃ ও প্রসব-জনিত স্রাবের অসুবিধা ইত্যাদিও নাই।

ইহা আল্লাহর উক্তিও হইতে পারে। সেই হিসাবে ইহার অর্থ হইবে, তুমি যে পুত্র কামনা করিয়াছিলে তাহা তো এই কন্যার মত নহে, বরং এ কন্যা তো তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। বাক্যের গঠন প্রণালীর দিকে লক্ষ্য করিলে শেষোক্ত অর্থই বেশী যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা হান্নার উক্তি হইলে বাক্যটি وليست الأنثى كالذكر, 'কন্যা তো পুত্রের মত নহে' হইত (তাফসীর মাযহারী, ২খ., পৃ. ২৭২)। যাহাই হউক হযরত হান্নার নিজের পক্ষ হইতে অথবা ইলহামের মাধ্যমে জ্ঞাত হইয়া সান্ত্বনা লাভ করিয়া ও উক্ত কন্যা সন্তানের মর্যাদার ইঙ্গিত পাইয়া তাহার ভবিষ্যত জীবন পূত পবিত্র হইবার জন্য দু'আ করিলেন। হযরত মারয়াম (আ)-এর মাতা মারয়ামের জন্য এইভাবে দু'আ করিয়াছিলেনঃ

وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ .

"আর অবশ্যই আমি তাহার ও তাহার বংশধরদের অভিশপ্ত শয়তান হইতে রক্ষা করিবার জন্য তোমার আশ্রয়ে সোপর্দ করিয়া দিতেছি"।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ "যে কোন শিশুর জন্ম হয়, শয়তান নিজে তাহাকে স্পর্শ করে, শুধুমাত্র মারয়াম ও তাহার পুত্র (ঈসা) ইহার ব্যতিক্রম" (সহীহ বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, কিরমানীর ভাষ্যসহ, ১৭খ., পৃ. ৫০)।

ইমাম তাবারী স্বীয় তাফসীরে কাতাদার সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন, প্রত্যেক আদম সন্তানকে শয়তান তাহার পার্শ্বদেশ স্পর্শ করে, কিন্তু হযরত ঈসা ইবন মারয়াম (আ) ও তাঁহার মাতাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের ও শয়তানের মধ্যে একটি পর্দা বা আড়াল সৃষ্টি করা হইয়াছিল। তখন সে পর্দায় স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাদের কাছে শয়তানের স্পর্শ পৌঁছিতে পারে নাই" (দ্র. তাফসীরে তাবারী, ৩খ., পৃ. ১৬১)।

ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, আল্লাহ পাক হযরত মারয়াম (আ)-এর মায়ের দু'আ পূর্ণরূপে কবুল করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাদের শরীরে শয়তানের স্পর্শ লাগিতে দেন নাই, যাহা হইতে এমনকি অন্যান্য নবী ও ওলীগণও মুক্ত ছিলেন না (দ্র. কুরতবী, প্রাগুক্ত. ৪খ. পৃ. ৬৮)। রাসূলুল্লাহ (স)-ও শয়তানের স্পর্শ হইতে নিরাপদ ছিলেন (রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৩৮)। কোন কোন বর্ণনায়

আছে, হযরত ফাতিমা (রা)-ও তাঁহার সন্তান হাসান-হুসায়নের ব্যাপারেও মহানবী-এর ঐরূপ দু'আয় তাঁহারা শয়তান হইতে নিরাপদ ছিলেন (দ্র. তাফসীরে মাযহারী, ২খ. পৃ. ২৭৩)। কুরআন কারীমে হযরত মারয়াম (আ)-এর মায়ের দু'আ কবুল হওয়া এবং উত্তমভাবে পালিত হওয়ার কথা বিধৃত হইয়াছে এই আয়াতে ঃ

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۔

"অতঃপর তাহার প্রতিপালক তাহাকে উত্তমরূপে কবুল করিলেন এবং তাহাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করিলেন" (৩৪ ঃ ৩৭)।

মারয়াম (আ)-এর লালন-পালন

হযরত মারয়াম (আ) জন্মলাভের পর তাঁহার লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে মূল দায়িত্ব পালন করেন তাঁহার খালু ও তৎকালীন নবী হযরত যাকারিয়া (আ)। তবে তিনি জন্মগ্রহণের পর বায়তুল মুকাদ্দাসে পেশের পূর্বে কত দিন মায়ের কাছে ছিলেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় না। এই সম্পর্কে মুসলিম ঐতিহাসিক ও মুফাস্সিরগণ বিভিন্ন রূপ তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন ঃ

১. ইবন কাছীর উল্লেখ করেন, অনেক মুফাসসির বর্ণনা করিয়াছেন যে, মারয়ামের মাতা যখন তাঁহাকে প্রসব করিলেন তখন তাঁহাকে একটি কাপড়ের টুকরায় আবৃত করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে লইয়া মসজিদে আকসায় গেলেন এবং সেইখানে অবস্থানকারী আবেদগণের নিকট তাঁহাকে হাস্তান্তর করিলেন (ইব্ন কাছীর, বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৫৭-৫৮)। ইব্ন জারীর তাবারীও কাতাদা, ইকরিমা ও সুদ্দী সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়াছেন (তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫; কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৬৭)। ইবনুল আছীরও ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন (দ্র. আল-কামিল ফিত তারীখ, ১খ, পৃ. ২২৮)। হযরত হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণিত যে, মারয়াম কখনো স্তন্য পান করেন নাই (দ্র. ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, ১খ, পৃ. ৩৮০; (আরো দ্র. রাযী, মাফাতীহুল গায়ব, ৮খ, পৃ. ২৮, ইসমাঈল হাক্কী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)। এই মর্মে মুকাতিল হইতে বর্ণিত আছে, মারয়ামের জন্য একজন ধাত্রী নিয়োগ করা হইয়াছিল। এইসব বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, শিশুকাল হইতে তিনি মায়ের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন (ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত)।

ইব্ন জারীর তাবারী স্বীয় তাফসীরে মুহাম্মদ ইব্ন জা'ফর ইব্ন যুবায়র (র) হইতে এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন, হযরত মারয়াম (আ)-এর মাতা ও পিতা মারা যাওয়ায় তাঁহার ইয়াতীম অবস্থায় হযরত যাকারিয়্যা (আ) তাঁহাকে লালন-পালন করেন (তাফসীরে তাবারী, ৫খ., পৃ. ৩৫৬)।

২. ইনসাইক্লোপেডিয়া এমেরিকানাতে উল্লিখিত আছে যে, ঈসা (আ)-এর জন্মের ৪০ দিন পর তাঁহাকে হায়কালে সুলায়মানীতে লইয়া যাওয়া হয়। আর ইহাই ইয়াহূদীদের রীতি (vol. 18, P. 345)। ইহা হইতে কেহ কেহ ধারণা করেন, জন্মের ৪০ দিন পর হযরত মারয়াম (আ)-কে তাঁহার মাতা মসজিদে আকসায় লইয়া গিয়াছিলেন।

৩. কাহারো কাহারো মতে দুধ ছাড়ানো অবস্থা অবধি হযরত মারয়াম (আ) তাঁহার মায়ের কাছেই লালিত-পালিত হইয়াছিলেন। আর সাধারণত দুধ ছাড়ানো হয় দুই কি আড়াই বৎসর কাল পরে। আল্লামা ইব্ন কাছীর এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন। ইহার সপক্ষে দুইটি যুক্তি পেশ করা হয় ঃ

(এক) আল্লাহ পাক বলিয়াছেন, وَاَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (তিনি তাহাকে সুন্দরভাবে বাড়াইয়া তুলিলেন)। ইহার পর বলিয়াছেন ঃ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا (এবং যাকারিয়া তাহার লালন-পালনের দায়িত্ব বহন করিলেন)। এই আয়াতংশ দ্বারা ধারণা করা যায় যে, বাড়াইয়া তুলিবার পর যাকারিয়া (আ) লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

(দুই) পরবর্তী আয়াতাংশে উল্লেখ করা হয় যে, যাকারিয়্যা (আ) যখনই মারয়ামের ঘরে যাইতেন তখন খাদ্যবস্তু দেখিতে পাইতেন। আর ইহা প্রমাণ করে যে, মারয়াম তখন দুধ পান করা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন (দ্র. আর-রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)। তিনি বলেন, আয়াতে উক্ত 'ওয়াও' অব্যয়টি "পরবর্তী" বুঝানোর জন্য নহে। হইতে পারে সব কয়টি ঘটনা একই সময়ে হইয়াছে অথবা খাদ্যবস্তু পাওয়ার ঘটনা ভরণ-পোষণের শেষ সময় কালের (প্রাগুক্ত)। ইমাম রাযীর মতে, দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত নহে, বরং আরো শিশুকালে তাঁহাকে হস্তান্তর করা হয়। তিনি এই মত ব্যক্ত করিয়া ইহার বিপক্ষের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইহার সমর্থনে অনেক রিওয়ায়াত বিদ্যমান (দ্র. রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯)।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী স্বীয় তাফসীরে Hastings রচিত ডিকশনারী অব দ্য বাইবেল (৩খ., পৃ. ২৮৮) ও Budge রচিত Legends of Lady mary -এর বরাতে উল্লেখ করেন, "খৃষ্টীয় লিপি অনুসারে হযরত মারয়াম-কে তিন বৎসর বয়ঃক্রম কালে হায়কালে সুলায়মানীর সেবিকা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। আর ইবাদতখানার সকল খাদেমই এই শিশুটিকে দেখিয়া খুবই আনন্দিত হয়" (তাফসীরে মাজেদী, ২খ., পৃ. ৫০)।

ইমাম আবূ বকর জাস্সাসের মতে, ইবাদতে নিমগ্ন হওয়ার উপযুক্ত সময়েই মারয়ামকে হস্তান্তর করিবার মানত করা হইয়াছিল (দ্র. জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, ২খ, পৃ. ১১)।

উপরিউক্ত মতামত পর্যালোচনায় দেখা যাইবে, ইব্ন কাছীরের দুধ ছাড়ানোর পর হস্তান্তরের মতটিই অধিক ভারসাম্যপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য। যদিও কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় তাঁহার মাতা শিশুকালেই ইনতিকাল করেন, কিন্তু কখন ইনতিকাল করেন তাহা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। তাহা ছাড়া বর্ণিত আছে, ইয়াহূদী সমাজে ছোট শিশুদেরকেই মানত হিসাবে হায়কালে পেশ করা হইত। তাহারা বড় হওয়ার পর ইচ্ছা করিলে সেইখানে থাকিত অথবা চলিয়াও যাইতে পারিত (দ্র. তাফসীরে খাযেন, ১খ., পৃ. ২২৯)।

মারয়াম শিশু অবস্থায়েই কথা বলিতে পারিতেন। এই ধরনের একটি রিওয়ায়াত হযরত হাসান বসরী হইতে বর্ণিত আছে (ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৩৮০)। আরো বর্ণিত আছে যে,

সাধারণ শিশু এক বৎসরে যতটুকু বৃদ্ধি পায়, হযরত মারয়াম (আ) এক দিনেই ততটুকু বৃদ্ধি পাইতেন (রাযী, প্রাগুক্ত, ৮খ., পৃ, ২৯; কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৬৯)।

লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য লটারী

হযরত মারয়াম (আ)-এর মাতা যখন তাঁহাকে পূর্ববর্তী মানত অনুসারে বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া গেলেন, তখন হায়কালের সেবায়েতদের মধ্যে তিনি কাহার তত্ত্বাবধানে থাকিবেন তাহা লইয়া সমস্যা দেখা দিল। প্রত্যেকেই মারয়াম (আ)-এর তদারকির দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া গৌরবান্বিত হইতে চাহিয়াছিলেন। কেননা হযরত মারয়াম তাহাদের ইমামের কন্যা এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে উৎসর্গকৃত সর্বপ্রথম কন্যা সন্তান। বনূ ইসরাঈলের লোকেরা বলিল, আমাদেরই বেশী হক। কারণ সে আমাদের ইমামের কন্যা।

অবশ্য আল্লাহর নবী যাকারিয়্যা (আ), যিনি সেইখানের পুরোহিতগণের প্রধানও ছিলেন (রূহুল মাআনী, ৩খ, পৃ.১৩৮), তিনি মারয়াম-এর খালু হিসাবে আত্মীয়, তার দাবিতে মারয়াম (আ)-এর তত্ত্বাবধায়ক হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

আল্লামা তাবারী ইকরিমা (র) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত যাকারিয়্যা (আ) তখন বলিয়াছিলেন, "তোমরা সকলে তাহাকে আমার নিকট রাখিয়া দাও অর্থাৎ তাহার লালন-পালনের দায়িত্ব আমাকে বহন করিতে দাও। কেননা তাহার খালা আমার স্ত্রী" (দ্র. তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, ৫খ., পৃ. ৩৫৫)।

যাকারিয়া (আ)-এর ঐ প্রস্তাবে তাহারা রাযী হইল না। সকলেই তাহাদের দাবির উপর অটল রহিল। অবশেষে লটারীর মাধ্যমে তাহা মীমাংসার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে ইহাতে ২৭ জন অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন (ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৭)। আর ইমাম বাকের (রা)-এর মতে নিক্ষিপ্ত কলমের সংখ্যা ছিল ৬টি (দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৫৯)। তবে প্রথম বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু কতবার ও কিভাবে লটারী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلاَمَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ٠

"ইহা অদৃশ বিষয়ের সংবাদ, যাহা আপনাকে ওহী দ্বারা অবহিত করিতেছি। আর আপনি তখন তাহাদের মাঝে ছিলেন না, যখন তাহারা কলম নিক্ষেপ করিতেছিল, মারয়ামের লালন পালনের দায়িত্ব কে বহন করিবে (তাহা নির্ণয়ে) এবং আপনি তখনও তাহাদের মধ্যে হাযির ছিলেন না যখন তাহারা (ঐ ব্যাপারে) বাদানুবাদ করিতেছিল" (৩ ঃ ৪৪)।

উক্ত লটারীতে কি ধরনের কলম, কিভাবে, কোথায় নিক্ষেপ করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে মুফাসসিরগণ বিভিন্ন মত ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লামা ইব্ন কাছীর উল্লেখ করেন, মুফাস্সিরগণ

বলেন, প্রতিদ্বন্দ্বীগণের প্রত্যেকেই নিজ নিজ কলম চিহ্নিত করিয়া এক স্থানে রাখেন। অতঃপর একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে সেইগুলি হইতে যে কোন একটি লইয়া আসিবার জন্য নির্দেশ দিল। অতঃপর সে একটি কলম লইয়া আসিলে দেখা গেল তাহা যাকারিয়্যা (আ)-এর কলম। কিন্তু ইহাতে তাহারা সম্মত না হইয়া পুনরায় লটারী দিতে চাহিল। তাহা এই পদ্ধতিতে যে, সকলে নদীতে তাহাদের কলম নিক্ষেপ করিবে। যাহার কলম স্রোতে ভাসিয়া গিয়া স্থির থাকিবে, মতান্তরে উল্টা দিকে প্রবাহিত হইবে, তিনিই বিজয়ী হইবেন। তাহারা তাহাই করিল। ফলে দেখা গেল হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর কলম স্রোতের উল্টা প্রবাহিত হইল, আর বাকীদের কলম পানির সহিত ভাসিয়া গেল। কিন্তু তাহারা ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তৃতীয় বারের মত আর একটি লটারীতে অবতীর্ণ হইতে চাহিল। তাহা এই পদ্ধতিতে যে, যাহারা কলম স্রোতের সহিত ভাসিয়া যাইবে তিনিই বিজয়ী হইবেন, আর যাহাদের কলম স্রোতের উল্টা দিকে যাইবে তাহারা নহে। অতঃপর দেখা গেল হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর কলম স্রোতের সহিত ভাসিয়া গেল এবং অন্যদের কলম স্রোতের উল্টা দিকে যাইতে লাগিল। ইহাতেও তিনি বিজয়ী হইলেন। আর এইভাবে তিনি হযরত মারয়াম (আ)-এর লালন-পালনের যিম্মাদারী লাভ করিলেন (দ্র. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৫৩)

আল্লামা আলূসী কিছু পার্থক্যসহ লটারীর এই ধরনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের লটারীতে যাহার কলম "পানির উপর ভাসিয়া উঠিবে তিনিই বিজয়ী হইবেন" বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছিল (দ্র. আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৩৮)।

অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে যেই নদীর পানিতে কলমগুলি নিক্ষেপ করা হইয়াছিল তাহার নাম জর্দান নদী (দ্র. তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৩৫৩)। নিক্ষিপ্ত কলমের স্বরূপ লইয়াও মতভেদ আছে। তাবারীর মতে সেইগুলি ছিল তীর (তাবারী, তাফসীর, ৫খ., পৃ. ৩৮৮)। রাযীর মতে সেইগুলি ছিল লাঠি (রাযী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ. ৪৫)। অধিকাংশের মতে সেগুলি ঐ কলমসমূহ যাহা দ্বারা তাহারা তাওরাত লিপিবদ্ধ করিত (প্রাগুক্ত)। কাহারাও মতে সেইগুলি পিতলের তৈরী ছিল (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯)।

তবে কলম নিক্ষেপের পর তাহা স্রোতে স্থির থাকার, ভিন্ন বর্ণনায় বিপরীত দিকে যাওয়ার মতটি অধিকাংশ মুফাসসির গ্রহণ করিয়াছেন। ইবনুল আরাবী ইহার সমর্থনে একটি হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন। নবী (সা) বলেন, "সকলের কলমই ভাসিয়া গেল এবং যাকারিয়্যা (আ)-এর কলম থামিয়া গেল। ইহা ছিল একটি মু'জিযা। তিনি নবী ছিলেন। অতএব তাঁহার মাধ্যমে মু'জিযা প্রকাশিত হইল" (ইবনুল আরাবী , আহকামুল কুরআন, ২খ., পৃ. ২৭৩)।

আল্লামা হিফযুর রহমান সিওহারবী তিনবার লটারী অনুষ্ঠিত হওয়ার বর্ণনাটিকে ইসরাঈলী বর্ণনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. কাসাসুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ ঃ মুহাম্মদ মূসা, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৮৯ খৃ., ১৪০৯ হি., ৪খ, পৃ. ৯)।

মোটকথা, লটারী যতবার ও যেইভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, ইহার চূড়ান্ত ফলাফল যাকারিয়্যা (আ)-এর পক্ষেই গেল। আর তাঁহার প্রতিযোগিগণ যখন দেখিল আল্লাহর সাহায্য যাকারিয়্যা (আ)-এর অনুকূলেই রহিয়াছে, তখন তাঁহারা নির্দ্বিধায় এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইল।

ইমাম রাযী ঐ পুরোহিতগণের আগ্রহের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ (১) কাহারো মতে মারয়ামের পিতা ইমরান (রা) ছিলেন তাহাদের ইমাম। (২) তাঁহার মাতা আল্লাহর ইবাদত ও বায়তুল্লাহর খিদমতের জন্য তাঁহাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। (৩) মারয়াম ও তাঁহার সন্তান ঈসা সম্পর্কে ঐশী গ্রন্থাদিতে যে উল্লেখ রহিয়াছে তাহা তাহারা জানিত (দ্র. রাযী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ. ৪৬)।

মারয়ামের সাথে পারিবারিক সম্পর্ক, মারয়াম সম্পর্কে আল্লাহর সিদ্ধান্ত, নেককার আল্লাহভীরু ও বিশ্বস্ত লোকের মাধ্যমে প্রতিপালন, শিক্ষা-দীক্ষা এই সব দিক চিন্তা করিলে হযরত যাকারিয়্যার মত ব্যক্তিই সেই সময় উক্ত দায়িত্ব পালনে অধিক উপযুক্ত ছিলেন। তাই যাকারিয়্যা (আ) এককভাবেই তাঁহার লালন-পালন করিয়াছিলেন এবং ইহাই যুক্তিযুক্ত।

কেহ কেহ বলেন, মারয়ামের ছোটকালে একবার লটারী হয়, আবার বড় হওয়ার পর দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আবার লটারী অনুষ্ঠিত হয় (আলূসী, রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ. ১৫৯)। ইহা একটি দুর্বল মত যাহার পক্ষে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

বায়তুল মুকাদ্দাসে যাকারিয়্যা (আ)-এর তত্ত্বাবধানে মারয়াম (আ)

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে, এক কঠিন পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হইয়া মহান আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় হযরত যাকারিয়্যা (আ) বরকতময় কন্যা মারয়াম (আ)-এর ভরণ-পোষণসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইমাম রাযী উল্লেখ করেন, তিনি (মারয়াম) যখন যৌবনে পদার্পণ করিলেন তখন যাকারিয়্যা (আ) তাঁহার জন্য মসজিদে একটি কক্ষ তৈরি করিলেন, যাহার মধ্যভাগে দরজা রাখিলেন এমনভাবে যে, ইহাতে সিঁড়ি ছাড়া কেহ উঠিতে পারিত না। আর তিনি যখন বাহিরে কোথায়ও যাইতেন, ইহার দরজা বন্ধ করিয়া যাইতেন (রাযী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ. ৩০)।

আলূসী উল্লেখ করেন, ইহা ইব্‌ন আব্বাস হইতে বর্ণিত (রূহুল মা'আনী, ৩খ, পৃ.১৩৯)। মারয়াম (আ) শৈশব কাল হইতেই কন্যা সন্তান হিসাবে মসজিদে বিশেষ ব্যবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন, ইহাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আলূসী এই মত সমর্থন করেন। হযরত মারয়াম (আ)-এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাস্বরূপ যেই কক্ষ নির্ধারিত হইয়াছিল, ইহা এক বিশেষ প্রযুক্তিতে তৈরী ছিল। আল-কুরআনে ইহাকে 'মিহ্‌রাব' নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। ইমাম রাযীর উপরিউক্ত বর্ণনাসহ অনেক মুফাসসির উক্ত মিহরাবটির নির্মাণ কৌশল ও অবস্থান সম্পর্কে বৈচিত্র্যময় তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন।

ভাষাবিদ আসমাঈ (أصمعى) -এর মতে ইহা ছিল এমন একটি কক্ষ যাহাতে প্রবেশ করিতে হইলে দেওয়ালের উপর দিয়া প্রবেশ করিতে হইত (রাযী, প্রাগুক্ত, ৮খ, পৃ.৩০)। ইমাম রাযী, আবূ

উবায়দ ও যাজ্জায প্রমুখের মতে মিহরাব হইল মসজিদের সবচেয়ে সম্মানজনক ও সুউচ্চ স্থান (প্রাগুক্ত)। প্রত্যেক মজলিস কিংবা সালাত আদায় করিবার জায়গার অগ্রবর্তী স্থানকে মিহরাব বলা হয়। ইহা সকল মজলিসের প্রধান, সম্মানিত ও উত্তম স্থানকেই বুঝায়। এমনিভাবে ইহা মসজিদের অন্তর্গতও বটে (তাফসীরে তাবারী, আরবী সং, ৩খ, ১৬৬)।

মারয়াম (আ)-এর জন্য যেই মিহরাব বা কক্ষটি নির্ধারণ করা হইয়াছিল তাহা ছিল অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের জন্য নির্ধারিত বিশেষ কক্ষ, যাহা মসজিদের অভ্যন্তরেই এক পার্শ্বে ছিল। তাঁহার নিরাপত্তার জন্য ইহাকে বিশেষ স্থাপত্য শৈলীতে তৈরি করা হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, পরপর সাতটি দরজা অতিক্রম করিয়া মারয়াম (আ)-এর নিকট পৌছানো যাইত। আরো নিরাপত্তার স্বার্থে এই দরজাগুলির চাবিসমূহ একমাত্র হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর কাছেই থাকিত, ইহাতে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না (তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৩৬০)।

যাকারিয়্যা (আ) দৈনিক তাঁহার পানাহার সামগ্রী, তৈল ইত্যাদি পৌছাইয়া দিতেন (তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৭৫)। বর্ণিত আছে, মারয়াম (আ) যখন ঋতুবতী হইতেন, তখন হযরত যাকারিয়্যা তাঁহার স্ত্রীর নিকট তাহাকে লইয়া যাইতেন, আবার পবিত্র হওয়ার পর মসজিদে তাহার জন্য নির্দিষ্ট মিহ্রাবে লইয়া আসিতেন (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৭১)।

কাহারও কাহারও মতে মারয়াম (আ)-এর হায়েয হইত না। তিনি প্রকৃতিগতভাবে হায়েয হইতে পবিত্র ছিলেন (প্রাগুক্ত)। আল্লামা সিওহারবী উল্লেখ করেন, মারয়াম আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে রত থাকিতেন। আর রাতের বেলায় তাঁহাকে যাকারিয়্যা (আ) নিজ স্ত্রী ও মারয়ামের খালা আইশা'র কাছে লইয়া আসিতেন এবং এইখানেই তিনি রাত্রি যাপন করিতেন (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১০)।

কোন কোন মুফাস্সির বলেন, সব কিছুর পাশাপাশি হযরত যাকারিয়্যা (আ) হযরত মারয়াম (আ)-এর শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্বও পালন করিতেছিলেন (দ্র. তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৩৫৪; ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১খ, পৃ. ৩৬০)।

কাহারো মতে বায়তুল মুকাদ্দাসে কোন মানুষ মানতের ছেলে লইয়া আসিলে সেইখানে বসিয়া যাহারা তাওরাত লিখিতেন তাহারা লটারীর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিতেন যে, কে তাঁহাকে গ্রহণ করিবেন এবং বিদ্যা শিক্ষা দিবেন। এইভাবেই যাকারিয়্যা (আ) মারয়াম (রা)-এর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন (দ্র. তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত)।

ইবন কাছীর বলেন, আল্লাহ পাক হযরত যাকারিয়্যা (আ)-কে মারয়াম (আ)-এর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিবার ফয়সালা করিয়াছিলেন তাঁহার মঙ্গলার্থেই, যাহাতে মারয়াম যাকারিয়্যার অগাধ 'ইলম ও 'আমলে সালিহ (নেককাজ) আয়ত্ত করিতে পারেন (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)। আর এইভাবে তিনি এক দিকে মসজিদের পবিত্র পরিবেশ, অন্যদিকে নবী যাকারিয়্যা (আ)-এর নবুওয়াতী তারবিয়াতে লালিত-পালিত হইতে থাকিলেন।

কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায়, তিনি হায়কালের খিদমতে কিছু কাজও করিতেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করিতেন। যেমন ইবন জারীর তাবারীর এক বর্ণনায় রহিয়াছে, হযরত মারয়াম (আ) যে ইবাদতখানাতে থাকিতেন তাঁহার সাথে সেই ইবাদতখানায় আরো একটি বালক থাকিত, যাহার নাম ছিল ইউসুফ। তাহার মাতা-পিতাও তাহাকে ইবাদতখানার জন্য মানত করিয়াছিল। তাহারা উভয়ে সেইখানেই বসবাস করিতেন। তাহারা উভয়ে পানি আনার জন্য মাঠে যাইতেন এবং সেখান হইতে কলসী ভর্তি সুস্বাদু পানি লইয়া আসিতেন (দ্র. তাফসীরে তাবারী, ৫খ, ৩৮৪)।

এই বর্ণনাটি ইবন ইসহাকের নিজস্ব। তিনি কোন্ উৎস হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা বলেন নাই। তাই এই বর্ণনা সংশয়ের উর্ধ্বে নহে। কেহ কেহ ইহাকে ইসরাঈলীদের কল্পকাহিনীর আওতাভুক্ত মনে করেন। বিশেষত যেহেতু মারয়াম (আ)-এর লালন-পালন সুরক্ষিত অবস্থায় সম্পন্ন হইতেছিল সেই দৃষ্টিকোণ হইতে পানি আনিবার জন্য দূরে মাঠে গমন করা সঙ্গতিপূর্ণ নহে। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র অঙ্গনে হযরত যাকারিয়্যা (আ)-এর তত্ত্বাবধানে তাঁহার ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষার কাজ অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছিল। কুরআন মজীদে বলা হইয়াছে ঃ

أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا .

"আর তাহাকে সুন্দরভাবে বাড়াইয়া তুলিলেন" (৩ ঃ ৩৭)।

হযরত ইবন আব্বাস (রা) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, প্রভু তাঁহাকে তাঁহার ইবাদত ও আনুগত্যের উপর উত্তম তরবিয়াত প্রদান করিলেন (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, ১৩৯)। আল্লামা আলূসী বলেন, অত্র আয়াতে তাঁহার তরবিয়াতের বিষয়টিকে রূপকার্থে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কৃষক যেইভাবে প্রয়োজনে পানি সেচন করিয়া কৃষিক্ষেত্রের পরিচর্যা করে, বিভিন্ন আপদ হইতে রক্ষা করে, তাহার ফসলের জন্য ক্ষতিকর অন্য উদ্ভিদ সমূলে উপড়াইয়া ফেলে, তেমনি শস্যক্ষেত্রের মত তাঁহাকে পরিচর্যা করা হয় (প্রাগুক্ত)।

আল্লামা যামাখশারীও এই আয়াতের তফসীরে অনুরূপ কথা বলিয়াছেন (যামাখশারী, আল-কাশশাফ, বৈরূত, দারুল মা'রিফা, তা.বি., ১খ, ১৮৭)। অর্থাৎ দৈহিক গঠন বিন্যাস, আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও বিকাশ, চারিত্রিক পরিশুদ্ধতা ও মাধুর্য, ইবাদতে নিবিষ্টতা ও নিষ্ঠা, জ্ঞান-গরিমায় ও পাণ্ডিত্যে তথা সকল দিক দিয়া তাঁহাকে গড়িয়া তুলিবার জন্য আল্লাহ পাক উন্নত পরিচর্যার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

অলৌকিকভাবে বেহেশতী খাদ্য লাভ

মারয়ামের শৈশব হইতেই তাঁহার প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য শৈশব কালেই হযরত যাকারিয়্যা তাঁহার সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছিলেন, "নিশ্চয় ইমরানের কন্যার জন্য

বিশেষ মর্যাদা রহিয়াছে" (তাফসীরে তাবারী, ৩খ., ১৮১)। হযরত যাকারিয়্যা তাঁহার খোঁজখবর নিতে প্রায়ই মরিয়ামের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিতেন তাঁহার প্রতিপালনে আল্লাহ তাআলার বিশেষ দৃষ্টির কিছু কিছু দিক যাকারিয়্যা (আ)-এরও অজ্ঞাত ছিল, যাহা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে ঃ

كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَامَرْيَمُ اَنّٰى لَكِ هٰذَا ۚ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

"যখনই যাকারিয়্যা সেই মিহরাবে তাহার সহিত সাক্ষাত করিতে যাইত তখনই তাহার নিকট বিশেষ খাদ্যসামগ্রী দেখিতে পাইত। সে বলিত, হে মারয়াম! এইসব তুমি কোথা হইতে পাইলে? সে বলিত, উহা আল্লাহর নিকট হইতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা অপরিমিত রিযক দান করেন" (৩ ঃ ৩৭)।

ইবন কাছীর এই আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ, ইকরিমা, সাঈদ ইবন জুবায়র ও সুদ্দী প্রমুখের বরাতে লিখিয়াছেন, "যাকারিয়্যা (আ) তাঁহার নিকট শীতকালে গ্রীষ্মকালীন ফল এবং গ্রীষ্মকালে শীতকালীন ফল দেখিতে পাইতেন (ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ১খ, ৩৬০; ঐ লেখক, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, ৫৪)। ইবন জারীর তাবারীও কাতাদা, হযরত ইবন আব্বাস প্রমুখ হইতেও ঐরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারো কাহারো মতে ঐ আয়াতের অর্থ হইতেছে, যাকারিয়্যা (আ) যখন মিহরাবে মারয়াম (আ)-এর কাছে প্রবেশ করিতেন, তখন তাঁহাকে প্রদত্ত খাদ্যসামগ্রী ছাড়াও অতিরিক্ত খাদ্য দেখিতে পাইতেন। তখন তিনি এই অতিরিক্ত খাদ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতেন (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৮-৯)।

ফখরুদ্দীন রাযী বর্ণনা করেন, আবূ আলী আল-জুব্বাঈ তাঁহার তাফসীরে উল্লেখ করিয়াছেন, যাকারিয়্যা (আ) উহা দেখিয়া এই ভাবিয়া ভয় পাইয়াছিলেন যে, হয়ত এই রিযক এমন দিক হইতে আসিয়াছে যাহা আসা উচিত নহে (রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১)। ইমাম রাযী ইহাকে খুবই দুর্বল মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (প্রাগুক্ত) এবং পূর্বোক্ত মতকে অকাট্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)। ইবন জারীর তাবারী ও ইবন ইসহাক প্রথমোক্ত মতটি গ্রহণ করিয়াছেন (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬০)।

ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, এইগুলি বেহেশতী ফল ছিল (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৪০)। ইবন আব্বাস (রা) হইতে অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে, ইহার অর্থ হইতেছে যাকারিয়্যা (আ) মারয়াম (আ)-এর কাছে একটি থলির মধ্যে অসময়ের আঙ্গুর ফল দেখিতে পাইতেন (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৭)। সাঈদ ইবন জুবায়র, ইবরাহীম নাখাঈ, মুজাহিদ (র)-এর নিকট হইতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে (প্রাগুক্ত)।

ইবন কাছীর ও রাযীর মতে উহা ছিল এক আশ্চর্যজনক ও বিস্ময়কর ধরনের খাদ্যবস্তু (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৫৩)। রিযক শব্দটি (অনির্দিষ্টবাচক শব্দ) আসিয়াছে বিস্ময় ও গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বুঝাইবার জন্য (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০)।

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী উল্লেখ করেন, কোন কোন আধুনিক তাফসীরকার 'রিযিক' অর্থ ফয়েয ও জ্ঞান-বিজ্ঞান করিয়াছেন। কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির ও বিশেষজ্ঞগণের মতের পরিপন্থী। এই ধরনের ব্যাখ্যা তাফসীরী নীতিমালা লংঘনের শামিল (দরিয়াবাদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২)।

মোটকথা, দুনিয়ার খাদ্যবস্তুর ঐ সকল খাদ্যদ্রব্যের সহিত কোন মিল ছিল না (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০)। সেইজন্য হযরত যাকারিয়্যা (আ) প্রশ্ন করিয়াছিলেন—এইগুলি কোথা হইতে পাইয়াছ? আর তিনি উত্তর দিয়াছিলেন—এইগুলি আল্লাহর পক্ষ হইতে। এইভাবেই হযরত মারয়াম (আ) বারবার গায়েবী মদদ পাইতে থাকেন। পিতৃ-মাতৃহীন মারয়াম শিশু অবস্থা হইতে এক পবিত্র পরিবেশে ও পুরাপুরি ধর্মীয় চেতনায় লালিত-পালিত হইয়া আসিতেছিলেন। এইভাবে তিনি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিতেছিলেন এবং তাহার মাধ্যমে বিশেষ কারামত তথা অলৌকিক ঘটনা প্রকাশ পাইতেছিল।

মুতাযিলী সম্প্রদায় উহা মারয়ামের কারামত বলিতে অস্বীকার করিয়া উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—উহা যাকারিয়্যা (আ)-এর মুজিযা অথবা ঈসা (আ)-এর মুজিযা হিসাবে সংঘটিত হইয়াছিল (রাযী, প্রাগুক্ত)। তাহাদের উত্তরে বলা যায়, উহা যাকারিয়্যার মুজিযা হইলে তিনি এই ব্যাপারে জানিতেন না কেন? আর ঈসা (আ)-এর মুজিযা কি করিয়া হইতে পারে? তিনি তো তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

মারয়াম (আ)-এর ইবাদত-বন্দেগী ও কঠোর সাধনা

সেই শৈশব কাল হইতেই মারয়াম (আ) মসজিদে আকসায় এক আল্লাহর নবীর তরবিয়াতে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের আশায় কঠোর সাধনা ও ইবাদতে মশগুল থাকেন। অবশ্য হায়কালে সুলায়মানীর খিদমতের পালা আসিলে তাহাও তিনি অত্যন্ত যত্নের সহিত সুসম্পন্ন করিতেন (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১)। এমনিভাবে তিনি দিনরাত ইবাদতে নিমগ্ন থাকিয়া সময় অতিবাহিত করিতেছিলেন, এমনকি তাঁহার তাকওয়া ও 'ইবাদত বানূ ইসরাঈলের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হয়। আর যত্রতত্র তাঁহার ইবাদত-বন্দেগীর ও একনিষ্ঠ সাধনার কথা আলোচিত হইতে থাকে (প্রাগুক্ত)।

ইবন কাছীর (র) উল্লেখ করেন, তিনি যখন প্রাপ্তবয়স্কা হইলেন তখন ইবাদতে এতই কঠোর সাধনা করিতে থাকিলেন যে, ইবাদতে তাঁহার সময়ে তাহার সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। আর তাঁহার মধ্যে এমন কিছু কিছু অবস্থা দেখা দিতে লাগিল, যাহাতে হযরত যাকারিয়্যা (আ)-ও মোহিত হইতে লাগিলেন (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫৯)।

ফেরেশতার মাধ্যমে মর্যাদার ঘোষণা ও আরো কঠোর সাধনার নির্দেশনা লাভ

হযরত মারয়াম (আ) স্বীয় প্রভুর ইবাদত ও সান্নিধ্য লাভের সাধনায় রত ছিলেন একযুগ পর্যন্ত। নিজের কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়া নিষ্কলুষ জীবন যাপন করিবার পর তাঁহার সেই সাধনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। আল্লাহ পাক তাঁহার কাজে এতই খুশী হইয়াছিলেন যে, তাঁহার তাকওয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার স্বীকৃতি এবং নারীকুলের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা প্রদানের ঘোষণা ফেরেশতা পাঠাইয়া তাঁহাকে অবহিত করেন। আল্লাহ বলেন,

وَاِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَامَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ .

"যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন এবং বিশ্বের নারীকূলের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৪২)।

ইমাম ইবন জারীর তাবারীর মতে, আল্লাহর বাণী اصْطَفَاكِ -এর অর্থ তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন, তোমাকে তাঁহার আনুগত্যের জন্য বাছিয়া লইয়াছেন, তাঁহার মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তোমাকেই নির্বাচন করিয়াছেন (তাফসীরে তাবারী, ৩খ, পৃ. ১৭৯-১৮০)।

اصطفى। শব্দ صفوة হইতে উদ্ভূত যাহার অর্থ সবচেয়ে পূত-পবিত্র নিষ্কলুষ কিছু বাছিয়া লওয়া (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১৩৩)।

মাওলানা ছানাউল্লাহ পানিপথী ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, "তিনি তোমাকে তাঁহার সত্তাগত তাজাল্লী দ্বারা কবূল করিয়া লইয়াছেন। সুফিয়ায়ে কিরাম এ তাজাল্লীকে নবুওয়াতের বৈশিষ্ট্য বলিয়া অভিহিত করেন। মৌলিকভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম এই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হইয়া থাকেন। আর সিদ্দীকগণ তাহা উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেন। মারয়াম (আ) সিদ্দীকা ছিলেন" (তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৮৫)।

তিনি আরও কয়েকটি দিক তুলিয়া ধরিয়াছেন। যথা ঃ (১) মারয়ামকে হিফাজত ও মাগফিরাতের মাধ্যমে সকল গুনাহ হইতে পবিত্র করিয়াছেন। (২) শয়তান তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে নাই। ইহা তাঁহার মায়ের পূর্ববর্তী সেই দু'আ যাহা আল্লাহ পাক কবুল করিয়াছিলেন তাহার বরকতে। (৩) কাহারও কাহারও মতে এই পবিত্রতার অর্থ পুরুষের স্পর্শ হইতে দূরে থাকা। (৪) কেহ কেহ বলেন, আল্লাহ পাক তাঁহাকে মাসিক ঋতু হইতে পবিত্র রাখিয়াছিলেন (দ্র. তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত)।

আর উপরিউক্ত আয়াতে طَهَّرَكِ -এর অর্থের ব্যাখ্যায় ইবন জারীর তাবারী বলেন, মহিলাদের দীনী ব্যাপারে যে সকল সীমাবদ্ধতা বিদ্যমান সেইগুলি হইতে মারয়ামকে পবিত্র করিয়াছেন (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, ৫খ, ৩৮২)। মোটকথা, তিনি ইবাদত-বন্দেগী ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতার এতই উচ্চ স্তরে অবস্থান করিতেছিলেন যে, নারীকূলের মধ্যে হযরত মারয়াম এই সম্মান ও মর্যাদার স্বীকৃতি পাওয়ারই যোগ্য হইয়া গিয়াছিলেন। উপরিউক্ত সম্মান ও মর্যাদায় আরো সমুন্নত রাখিবার জন্য আল্লাহ পাক তাঁহাকে অধিক কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আল-কুরআনের পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ

يَا مَرْيَمُ اقْنُتِيْ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ .

"হে মারয়াম! তোমার প্রতিপালকের অনুগত হও ও সিজদা কর এবং যাহারা রুকূ করে তাহাদের সহিত রুকূ কর" (৩ ঃ ৪৩)।

এই আয়াতের قَنَتِي শব্দের ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন। মুজাহিদের মতে ইহার অর্থ সালাতে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়ানো। আয়াতের মমার্থ হইল—হে মারয়াম! তুমি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইবে (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪)। মুজাহিদ (র) হইতে অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে, হযরত মারয়াম (আ)-কে ঐ আদেশ দেওয়ার পর তিনি নামাযে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আদায় করিতেন যে, তাঁহার পা দুইটি ফুলিয়া যাইত। অপর এক বর্ণনায় আসিয়াছে, তাঁহার পায়ের গিটদ্বয় ফুলিয়া গিয়াছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫)। ইহা ছাড়া ইমাম আওযাঈ আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মারয়াম (আ) যখন সালাতে দাঁড়াইতেন, তখন এমনকি তাঁহার দুইটি পা হইতে পুঁজ গড়াইয়া পড়িত (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫; আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) রাসূলুল্লাহ (স) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, কুরআন মজীদের যেইখানেই القنوت শব্দ উল্লিখিত হইয়াছে, সেইখানেই উহার অর্থ আল্লাহর আনুগত্য (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত)। কাতাদা, সূদ্দী প্রমুখ তাফসীরকারকগণ ঐ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন, হে মারয়াম! তুমি তোমার প্রতিপালকের আনুগত্য কর (প্রাগুক্ত)। হযরত সাঈদ (র) ইবন জুবায়র-এর মতে কুনূতের অর্থ একনিষ্ঠ হওয়া (প্রাগুক্ত)। হাসান বসরী (র)-এর মতে উহার অর্থ তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর (প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, ইবাদত হইল আনুগত্যের প্রতীক। উভয়ের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নাই। মুমিন জীবনে সকল কাজ যাহা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য করা হয় সবই ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আর হযরত মারয়াম (আ)-এর ক্ষেত্রে সব কয়টি অর্থই প্রযোজ্য। সেইজন্য ইমাম ইবন জারীর তাবারী ঐ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, 'বিশুদ্ধ যুক্তিতর্ক ও দলীলসহ আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, রুকূ সিজদার উদ্দেশ্য আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বিনয়ী ও নম্র হওয়া। এই প্রেক্ষিতে আয়াতের মর্ম হইল, 'হে মারয়াম! মনোনয়ন দ্বারা, পবিত্রকরণ দ্বারা এবং তোমার যুগের নারী জাতির মধ্যে তোমাকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়া আল্লাহ তাআলা তোমাকে যে সম্মান দিয়াছেন, ইহার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তুমি তোমার প্রতিপালকের একনিষ্ঠভাবে ইবাদত কর। সে সকল লোকের সাথে তুমিও বিনয়ী হও যাহারা তাঁহার প্রতি বিনয়ী' (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫-৩৮৬)।

মারয়াম (আ)-এর জন্য উপরিউক্ত আদেশটির শেষাংশ অর্থাৎ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ-এর ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণ তাঁহার সম্পর্কে অনেক তথ্য তুলিয়া ধরিয়াছেন। অধিকাংশের মতে 'রুকূকারীদের সাথে রুকূ কর' এই আদেশের অর্থ হইল সালাত আদায়কারীদের সাথে জামাআতে সালাত আদায় কর (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭)। কেহ কেহ ধারণা করেন যে, মারয়ামকে আদেশ করা হইয়াছিল, রুকূকারিগণ যেই ধরনের কাজ করে তুমি তাহাদের সাথে নামাযে শরীক না হইলেও সেই ধরনের কাজ কর (দ্র. কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৮৫; আরও দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত)।

আলূসী উক্ত ধারণা খণ্ডন করিয়াছেন। তাহাদের যুক্তি ছিল, মারয়াম (আ) তাঁহার মিহরাবে নামায পড়িতেন। তাহা ছাড়া তিনি যুবতী ছিলেন আর জামাআতে নামায পড়া যুবতীদের জন্য

মাকরূহ (আলূসী, প্রাগুক্ত)। আলূসী এই যুক্তিগুলির খণ্ডনে বলেন, ইহা বিনা প্রয়োজনে মূল বক্তব্যকে পরিহার করার শামিল। মারয়াম (আ) মিহরাবে নামায পড়িতেন তাহা স্বীকার্য বিষয়, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা প্রমাণ করে না যে, তিনি জামাআতে নামায আদায় করিতেন না। মিহরাবে থাকিয়াই জামাতে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আর আমাদের পূর্ববর্তী শরীআতে যুবতী মহিলাদের জামাআতে সালাত আদায় করা মাকরূহ ছিল—এই ধরনের কথাও প্রমাণিত নহে; বরং সালাত আদায় করা জামাআতে মাকরূহ ছিল না বলিয়া ইমাম মাতুরীদী উল্লেখ করিয়াছেন। আর ইহাও বলা হয় যে, যাহাদের সাথে তিনি সালাত আদায় করিতেন, তাহারা সকলেই তাহার মাহরাম ছিলেন।

মোটকথা, মারয়াম (আ) আল্লাহর আনুগত্যে উৎসর্গকারী সমভাবাপন্ন লোকজনের সাথেই ইবাদতে অংশগ্রহণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অত্যন্ত ইবাদতগুযার ও সচ্চরিত্রা নারী মারয়াম (আ) আল্লাহর নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে তাঁহার জীবনে বাস্তবায়ন করিয়া জগৎবাসী নারীকূলের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁহার সেই ভূমিকায় এতই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, পিতৃবিহীন সন্তান ধারণের জন্য তাঁহাকে মনোনীত করেন। ঈসা (আ)-কে গর্ভ ধারণের সুসংবাদ লইয়া যখন হঠাৎ ফেরেশতার আগমন ঘটে, তখন তিনি তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া যেই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা হইতে তাঁহার বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। আগন্তুকের উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন— যাহা আল-কুরআনেও নিম্নোক্ত আয়াতে আসিয়াছে "সে (মারয়াম) বলিল, আল্লাহকে ভয় কর যদি তুমি মুত্তাকী হও যে, আমি তোমা হইতে দয়াময় (আল্লাহ)-র আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি" (১৯ ঃ ১৮)।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়, মারয়াম (আ)-এর মধ্যে তাকওয়া-পরহেযগারীর চেতনা সদা জাগ্রত ছিল।

অলৌকিকভাবে ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ

আল্লাহ তা'আলা কাহারও মাধ্যম ব্যতীতই আদম (আ)-কে সৃষ্টি করিয়াছেন। বর্ণিত আছে, "হযরত হাওয়া (আ)-কে আদম (আ)-এর পাঁজরের হাড় হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তথা কোন নারীর গর্ভ ছাড়াই তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। শুধু বাকী ছিল পিতা ছাড়া একমাত্র মায়ের মাধ্যমে কোন মানব সন্তান সৃষ্টি করা। আল্লাহর সৃষ্টির পূর্ণাঙ্গ বিধানে সেই সৌভাগ্যবতী মা কে হইবেন—তাহারই ছিল অপেক্ষা। পুণ্যশীলা মারয়াম (আ) ও তাঁহার মায়ের ইবাদত ও দু'আর কথা পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন রকম পুরুষের স্পর্শবিহীন সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য সারা বিশ্বময় নারীর মধ্য হইতে আল্লাহ পাক হযরত মারয়াম (আ)-কেই নির্বাচন করিলেন। এই শুভ সংবাদটি তিনি তাঁহার ফেরেশতা জিবরাঈল-এর মাধ্যমেই সেই মহিয়সী নারী মারয়াম (আ)-কে প্রদান করিয়াছিলেন। তবে তাহা কখন ? সে সুসংবাদটি মারয়াম (আ)-কে সন্তানের রূহ গর্ভে ফুঁকিয়া দেওয়ার সময় তাৎক্ষণিকভাবেই, না ইহার পূর্বেই দিয়াছিলেন? এই সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে কিছু বলা হয় নাই। তবে আল-কুরআনের দুই স্থানে মারয়ামের গর্ভ ধারণের বিষয়টি আলোচিত হইয়াছেঃ প্রথমত সূরা আল-ইমরানে, দ্বিতীয়ত সূরা মারয়ামে। সূরা আলে ইমরানে বলা হইয়াছে ঃ

إِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ إِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ . وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَّمِنَ الصَّالِحِيْنَ . قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলিল, হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কালেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ, মারয়াম তনয় 'ঈসা, সে দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে। দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন। সে (মারয়াম) বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কীভাবে? তিনি বলিলেন, 'এইভাবেই', আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন, তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়" (৩ : ৪৫-৪৭)।

হাসান বসরী (র) বলিয়াছেন, মারয়াম ছোটকাল হইতেই বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর তখনই তাঁহার নিকট সেই সুসংবাদটি আসিবার সম্ভাবনা আছে। তবে আলূসী এই অভিমতকে দুর্বল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৬০)।

মোটকথা, ফেরেশতা তাঁহার নিকট একাধিকবার আসিয়াছিলেন, এমনকি শৈশবে বেহেশতী খাবার লইয়াও আসিতেন। সেই সময় কোন এক মুহূর্তে প্রথম সুসংবাদটি লাভ করিয়া থাকিতে পারেন। যদিও কোন কোন তাফসীরকার ঐ সুসংবাদকে ইলহাম আকারে কিংবা কোন গায়বী আওয়াজ আকারে হইতে পারে বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (দ্র. তাফসীরে মাজেদী, ২খ, ৫৯)। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই জ্ঞাত। খাদ্য লইয়া সরাসরি ফেরেশতা আগমনের বিষয়টিকে অসম্ভব বলা যায় না। কেননা মারয়াম (আ) সেইগুলিকে আল্লাহর পক্ষ হইতে আগত বলিয়া স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন, যাহা আল-কুরআনেও স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে (দ্র. ৩ : ৩৭)। তবে ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণের সুসংবাদ লইয়া একজন ফেরেশতা, প্রসিদ্ধ মতে জিবরাঈল (আ) মারয়ামের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, যাহা আল-কুরআনের সূরা মারয়ামে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। বলা হইয়াছে :

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا . فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا . قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا . قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا . قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا . قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهُ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا . فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا .

"এই কিতাবে মারয়ামের কথা বর্ণনা কর, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল, অতঃপর উহাদিগ হইতে সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে (জিবরাঈল) পাঠাইলাম। সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে

আত্মপ্রকাশ করিল। মারয়াম বলিল, আল্লাহকে ভয় কর যদি মুত্তাকী হও, আমি তোমা হইতে দয়াময়ের শরণ লইতেছি। সে বলিল, আমি তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য। মারয়াম বলিল, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি? সে বলিল, এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক অনুগ্রহ; ইহা তো স্থিরীকৃত ব্যাপার। তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করিল; অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল" (১৯ ঃ ১৬-২২)।

ফেরেশতার সাথে উপরিউক্ত কথোপকথনে স্পষ্ট যে, জিবরাঈল (আ) মানব আকৃতি ধারণ করিয়া মারয়াম (আ)-এর নিকট আগমন করিয়া প্রথমে সেই সুসংবাদটি দেন। প্রথমত মারয়াম (আ) সেই অবস্থায় সন্তান ধারণের সংবাদটি মানিয়া লইতে ছিলেন না।

ইমাম আবূ জাফর তাবারী এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ফেরেশতা হযরত মারয়াম (আ)-কে যখন মহান আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি 'কালেমা'র সুসংবাদ দিলেন, তখন তিনি বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক! কোন্ পদ্ধতিতে আমার সন্তান হইবে? আমি বিবাহ করিব এবং সেই দাম্পত্য জীবনে স্বামীর পক্ষ হইতে আমার গর্ভে সন্তান আসিবে, না কি কোন মানুষের স্পর্শ ব্যতীত সরাসরি আমার উদরে সন্তান জন্ম লাভ করিবে? আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে জানাইলেন, আল্লাহ তা'আলা এইভাবেই সৃষ্টি করিতে পারেন অর্থাৎ কোন মানুষের স্পর্শ ব্যতীত তিনি তোমার গর্ভে সন্তান সৃষ্টি করিবেন। ইহা মানুষের জন্য নিদর্শন ও শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে থাকিবে (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫-৩৯৬)।

হযরত মারয়াম (আ)-কে সুসংবাদ দেওয়ার ঘটনার পর তিনি ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করেন। আল-কুরআনের অন্যত্র হযরত মারয়াম (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا .

"আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান-তনয়া মারয়ামের, যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম" (৬৬ ঃ ১২)।

ইবন কাছীর উল্লেখ করেন, সলফে সালেহীনের মধ্যে অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, জিবরাঈল (আ) হযরত মারয়ামের জামার বুকের ফাঁকা অংশে ফুঁক দেন। অতঃপর সেই ফুঁ তাঁহার গর্ভাশয়ে পৌঁছিয়া যায়। ইবন কাছীর আরো উল্লেখ করেন, কাহারও মতে জিবরাঈল (আ) মারয়াম (আ)-এর মুখের ভিতরে ফুঁ দিয়াছিলেন, আবার কাহারও মতে জিবরাঈল নহে বরং রূহ (আত্মা)-টি নিজেই মারয়ামের মুখ দিয়া ভিতরে চলিয়া যায়। কিন্তু এই ধরনের বক্তব্য আল-কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনার পরিপন্থী। কেননা কুরআনে স্পষ্টত বুঝা যায়, মারয়াম (আ)-এর কাছে মানবাকৃতি জিবরাঈল (আ)-কে পাঠানো হইয়াছিল। তিনি মারয়াম (আ)-এর মুখে নহে, তাঁহার জামার বুকের ফাঁকা অংশে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, জিবরাঈলের ফুঁকের মাধ্যমেই তিনি গর্ভবতী হইয়াছিলেন। যখন সেই ফেরেশতার মুখেই উচ্চারিত হইয়াছিল, আমি তোমাকে এক পবিত্র সন্তান দান করিতে প্রেরিত হইয়াছি (দ্র. ১৯ ঃ ১৯), আবার অন্য একাধিক আয়াতে রূহ ফুঁকিয়া দেওয়ার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

এই ঘটনাটি সম্পর্কে এমনকি খৃস্টানদের বাইবেলেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঈসা মাসীহ (আ)-এর মাতা মারয়ামের বিবাহের কথাবার্তা ইউসুফের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল; কিন্তু ইউসুফের সহিত মিলনের পূর্বেই রূহুল কুদুস-এর আগমনের পর আল্লাহ তা'আলার কুদরতে তিনি গর্ভবতী হন (দ্র. মথি, সুসমাচার ১ ঃ ১৮)।

উল্লেখ্য, জিবরাঈল (আ) কোথায় মারয়াম (আ)-এর সামনে হাযির হইয়াছিলেন ইহা লইয়া বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। আল-কুরআনে সে স্থানটিকে মাকান শারকী (পূর্বদিকে এক স্থান) বলিয়া উল্লেখ করা হয়। মুফাস্সিরীনে কেরাম 'পূর্বদিক' বলিতে মসজিদে আকসার মিহরাবের পূর্বদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। হইতে পারে ইহা মসজিদের অভ্যন্তরেই পূর্বদিকে কিংবা দেয়ালের অপর পার্শ্বে পূর্বদিকে (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১১ খ., পৃ. ৯০)। মারয়াম (আ) স্বীয় পরিজন হইতে মসজিদের পূর্ব দিকে নিরালায় পর্দার আড়ালে অবস্থান করিতেছিলেন। সুদ্দীর মতে, তিনি তখন হায়েযের জন্য দেয়ালের আড়ালে অবস্থান করিতেছিলেন (তাফসীরে তাবারী, ১৬ খ, পৃ. ৪৫-৪৬)। কারণ তাঁহার হায়েব সমাগম হইলে স্বভাবত যেই স্থানে বসিয়া ইবাদত করিতেন তাহা হইতে দূরে চলিয়া যাইতেন। আর সেইখানেই পবিত্রতার জন্য অপেক্ষা করিতেন। একবার যখন তিনি পবিত্র অবস্থায় সেই স্থানে পদার্পণ করেন, তখনই জিবরাঈলের আগমন ঘটিয়াছিল (রাযী, প্রাগুক্ত, ২১খ, পৃ. ১৯৬)। কাহারও মতে, যখন তিনি পবিত্রতার জন্য গোসল করিতে পূর্বদিকে পর্দার আড়ালে গমন করিয়াছিলেন তখন জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। এইজন্য ইমাম রাযী মাকান শারকী বলিতে বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিক কিংবা তাঁহার বাড়ির পূর্বদিক বুঝানো হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, বায়তুল মুকাদ্দাসের অভ্যন্তরে পূর্বদিকে যেইখানে মারয়াম পর্দার আড়ালে ইতিকাফে থাকিতেন সেই স্থানটি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মাওলানা আবদুল হক হাক্কানী উল্লেখ করেন, মারয়াম (আ) হায়েয হইতে পবিত্র হইয়া যখন তাঁহার হুজরায় অবস্থান করিতেছিলেন, সেই অবস্থায় জিবরাঈল (আ) আগমন করেন (তাফসীরে হাক্কানী, তৃতীয় পারা, পৃ. ৫২)।

অপরদিকে খৃস্টানদের বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে, জিবরাঈল (আ) গ্যালিল (আল-খালীল শহর)-এর নাসিরাহ (নাযেরাথ) নামীয় পল্লীতে এক কুমারীর নিকট অবতরণ করিলেন, যাহার বিবাহের কথাবার্তা হযরত দাউদ (আ)-এর বংশীয় এক যুবকের সহিত সম্পন্ন হইয়াছিল, যাহার নাম যোসেফ এবং কুমারীর নাম মারয়াম (দ্র. লূক সুসমাচার, ১ ঃ ২৬-২৭; আরও দ্র. মথি, ১ ঃ ১৮)।

খৃস্টানদের বাইবেলের এই তথ্য আল-কুরআনে উল্লিখিত তথ্যের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে। কারণ বাইবেলে উল্লিখিত নাসেরাহ জেরুসালেম হইতে উত্তর দিকে অবস্থিত, পূর্ব দিকে নহে (সায়্যিদ মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, প. ৬৩)।

আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আ) ফুঁক দেওয়ার কিছুকাল পর হযরত মারয়াম নিজেকে অন্তঃসত্ত্বা অনুভব করিলেন। এইভাবে দিনরাত অতিবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু গর্ভে ধারণকৃত সন্তান সম্পর্কে সুসংবাদ তাঁহার জন্য এক অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করিল (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৩৫)। তাঁহার চলাফেরা ক্রমে সংকীর্ণ হইতে লাগিল। আর তিনি বুঝিতে পারিলেন, অনেক লোকই তাঁহার ব্যাপারে বাজে মন্তব্য করিবে (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০)।

ইবন কাছীর আরও উল্লেখ করেন, ওয়াহ্ব ইবন মুনাববিহসহ অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার গর্ভ ধারণের প্রাথমিক পর্যায়ে এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম যিনি বিষয়টি আঁচ করিতে পরিয়াছিলেন তিনি হইলেন বানূ ইসরাঈলেরই এক আবিদ ব্যক্তি, যাহার নাম ইউসুফ ইবন য়া'কূব আন্-নাজ্জার, যিনি সম্পর্কে মারয়ামের খালাতো ভাই। তিনি মারয়ামের ঐ অবস্থা দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে শুরু করিলেন। একদা তিনি মারয়াম (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হে মারয়াম! বীজ ব্যতীত কোন কিছু কি উৎপন্ন হয়? মারয়াম বলিলেন, হাঁ, অন্যথায় প্রথম উদ্ভিদ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনি আবার বলিলেন, পানি ও বৃষ্টি ব্যতীত কোন গাছ জন্মায়? মারয়াম উত্তরে বলিলেন, হাঁ, প্রথম গাছটি অন্যথায় কে সৃষ্টি করিলেন? তিনি আবার প্রশ্ন করিলেন, পুরুষ ব্যতীত কোন সন্তান হয়? মারয়াম জবাবে বলিলেন, হাঁ হয়। নিশ্চয় আল্লাহ পাক আদমকে নারী-পুরুষ ছাড়াই সৃষ্টি করিয়াছেন। তখন তিনি বলিলেন, মারয়াম! তুমি আমাকে ঘটনাটি খুলিয়া বল। তখন মারয়াম (আ) তাঁহাকে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে প্রাপ্ত সুসংবাদের কথা জানাইলেন এবং বলিলেন, গর্ভস্থ এই সন্তানের নাম হইবে ঈসা; সে দুনিয়া ও আখেরাতে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইবে (প্রাগুক্ত)।

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, মারয়ামের গর্ভধারণের বিষয়টি জানিতে পারিয়া ইউসুফ তাঁহাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বপ্নে প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করা হইতে বিরত থাকেন। স্বপ্নে প্রভুর এক দূত তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যোষেফ, দায়ূদ সন্তান, তোমার স্ত্রী মারয়ামকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে, আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন এবং তুমি তাহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে, কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন' (মথি সুসমাচার, ১ ঃ ২০-২২)।

ইবন কাছীরের বর্ণণামতে দেখা যায়, হযরত যাকারিয়্যা (আ)-ও মারয়ামকে ঐরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)। ঐতিহাসিক সুদ্দী কয়েকজন সাহাবী (রা)-এর বরাতে উল্লেখ করিয়াছেন, মারয়াম (আ) একদিন তাঁহার খালার নিকট গেলেন। তখন তাঁহার খালা ইয়াহ্য়াকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন, আমার গর্ভে সন্তানের উপস্থিতি অনুভব করিতেছি। অতঃপর মারয়াম (আ)-ও তাঁহাকে বলিলেন, আমিও আমার গর্ভে সন্তানের উপস্থিতি অনুভব করিতেছি। তৎপর ইয়াহইয়ার মাতা তাঁহাকে বলিলেন, আমি অনুভব করিতেছি আমার গর্ভস্থ সন্তান তোমার গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি সিজদা অবনত (প্রাগুক্ত)। ইবন কাছীর ইবন আবী হাতিমের সূত্রে ইমাম মালিক হইতেও ঐরূপ একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন (প্রাগুক্ত)।

বাইবেলে বর্ণিত, যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রী ইয়াহইয়াকে গর্ভ ধারণের ছয় মাস পর হযরত মারয়াম (আ) গর্ভবতী হইয়া ইয়াহূদার এক নগরীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন। তখন মাতৃগর্ভে ইয়াহইয়া (আ) উল্লাসে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন (দ্র. লূক সুসমাচার, ১ ঃ ২৬, ৩৯-৪৫)।

হযরত মুজাহিদ হইতে বর্ণিত, মারয়াম (আ) বলিয়াছিলেন, আমি যখন নির্জনে যাইতাম, তখন আমার গর্ভস্থ শিশু আমার সহিত কথা বলিত, আর যখন মানুষের মধ্যে যাইতাম তখন আমার পেটে তাসবীহ পাঠ করিত এবং তাকবীর বলিত (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

অনন্তর স্বাভাবিকভাবে একজন মহিলা যত দিন স্বীয় সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে, তিনিও তত দিন অর্থাৎ নয় মাস তাঁহার সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন (প্রাগুক্ত)। ইবন আব্বাস (রা) ও ইকরিমার বর্ণনা মতে আট মাস (প্রাগুক্ত)। কাহারও মতে নয় ঘন্টা, আবার কাহারও মতে এক ঘন্টা তিনি ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করেন (প্রাগুক্ত)। কাহারও মতে ফুঁক দেওয়ার পরপরই তাঁহাকে প্রসব করেন (রাযী, প্রাগুক্ত, ২১খ, পৃ. ২০২)। ইবন কাছীর প্রথমোক্ত মতকেই প্রাধান্য দিয়াছেন (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, এক নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় যাহা সম্পর্কে আল্লাহ অধিক জ্ঞাত, অতিক্রম করিবার পর মারয়াম (আ) অনুভব করিলেন তাঁহার শারীরিক অবস্থা দ্রুত পরিবর্তিত হইতেছে এবং প্রসবের সময়ও সমাগত। দিন যতই আগাইয়া আসিতেছে ততই তিনি চিন্তিত হইতে লাগিলেন। বিশেষত তিনি চিন্তা করিলেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা যেহেতু প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে অবহিত নহে, এই অবস্থায় যদি তাহাদের মধ্যে এই সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহা হইলে না জানি তাহারা কি অপবাদ রটায়। এইজন্য দূরের কোন এলাকায় চলিয়া যাওয়াই উচিত। এই কথা ভাবিয়া তিনি জেরুসালেম (বায়তুল মুকাদ্দাস) হইতে নয় মাইল দূরে সারাত (সেঈর) পর্বতের একটি টিলায় চলিয়া গেলেন, যাহা বর্তমানে বায়তুল লাহম (বেথেলহাম) নামে প্রসিদ্ধ। এইখানে পৌঁছার কয়েক দিন পর প্রসব বেদনা শুরু হইল (দ্র. সিওহারবী, প্রাগুক্ত)। কষ্ট ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় তিনি একটি খেজুর গাছে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। এই অবস্থার তিনি যেই নাযুক পরিস্থিতির ও দুশ্চিন্তার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহা আল-কুরআনে এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا . فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا .

"তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করিল, অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল। প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, 'হায়! ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইতাম" (১৯ ঃ ২২-২৩)।

অতঃপর সেই অবস্থায় তিনি সন্তান প্রসব করিলেন। কিন্তু তাঁহার মানসিক অস্থিরতার ও নাযুক পরিস্থিতির সময়ে আল্লাহর পক্ষ হইতে ফেরেশতা আসিয়া সান্ত্বনা ও সাহায্যের সুসংবাদ এবং পরিস্থিতি মুকাবিলার কৌশল শিক্ষা দিলেন। তাহা আল-কুরআনে নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে ঃ
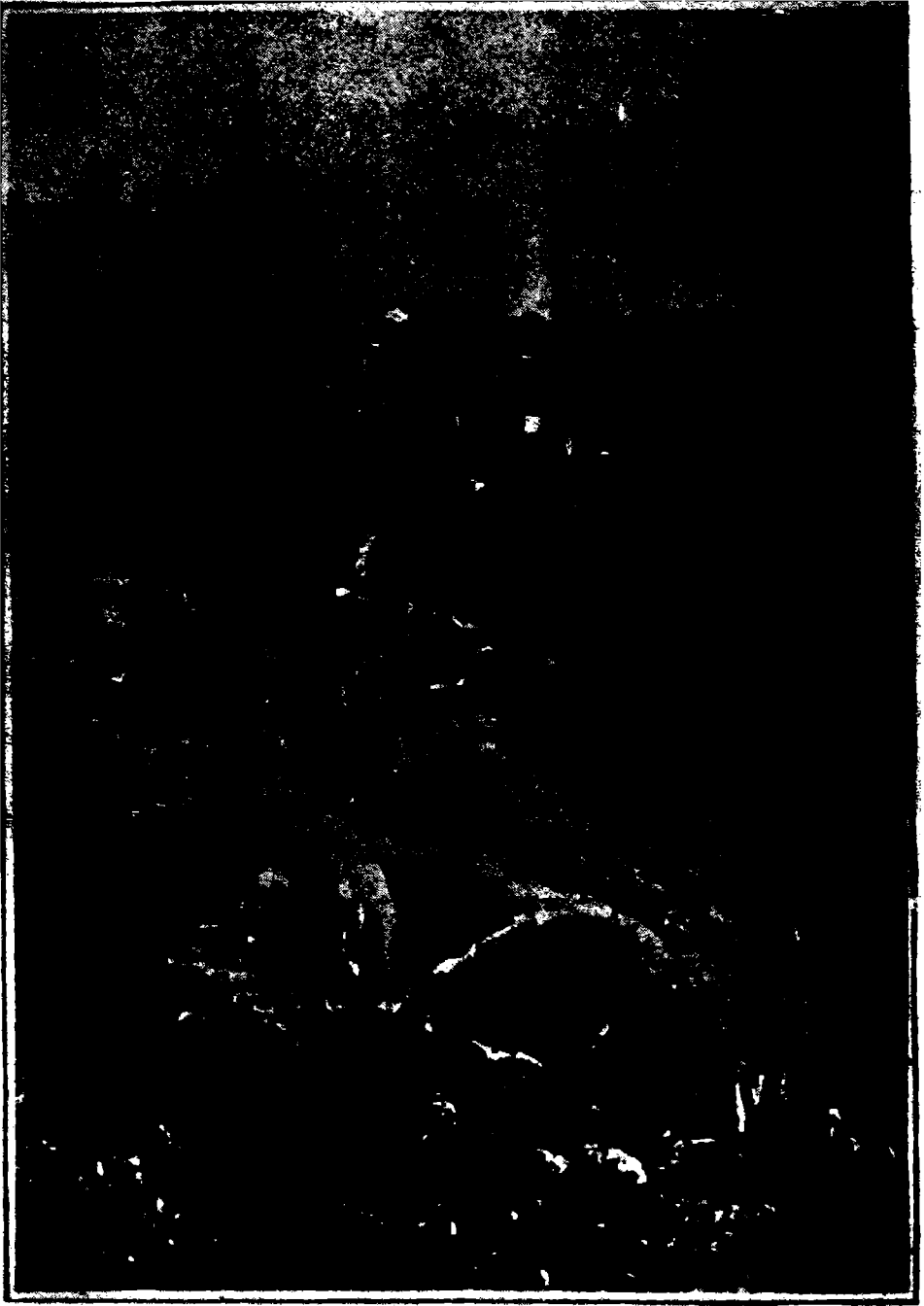
হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান বেথেলহামের একটি দৃশ্য।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান বেথেলহামের বর্তমান দৃশ্য। কুরআন মজীদের বর্ণনা মোতাবেক পিছনে দৃশ্যমান টিলা ভূমিতে খুব সম্ভব তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا اَلاَّ تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۔ وَهُزِّىْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۔ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا .

"ফেরেশতা তাহার নিম্নপার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক ঝর্ণাধারা সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করিবে। সুতরাং তুমি আহার কর, পান কর ও (সন্তান দেখিয়া) চক্ষু জুড়াও" (১৯ ঃ ২৪-২৬)।

এই সবই ছিল মারয়াম (আ)-এর জন্য আল্লাহ তাআলার নির্দেশনা ও সাহায্যের ব্যবস্থা। মারয়াম (আ) তাহা লাভ করিয়া পরিস্থিতি সামলাইয়াছিলেন। পূর্বে প্রাপ্ত সুসংবাদ অনুযায়ী তিনি দেখিতে পাইলেন, সত্যই শিশু সন্তান তাঁহার কোলে কথাবার্তা বলিতেছে এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে।

যাহাই হউক, ফেরেশতার সান্ত্বনা মিশ্রিত বাণী, আল্লাহর পক্ষ হইতে অফুরন্ত সাহায্যের আশ্বাস এবং হযরত ঈসা (আ)-এর মত সৌভাগ্যবান সন্তান দর্শনে তাঁহার দুশ্চিন্তা অনেকাংশে লাঘব হয়, তবে তাঁহার দুশ্চিন্তা পরিপূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নাই। কেননা তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার সতীত্ব ও পূত-পবিত্র চরিত্র সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্ত্বেও তাহাদের এই সংশয় কি করিয়া দূর করা যাইবে যে, বিনা বাপে কেমন করিয়া মায়ের পেটে সন্তান পয়দা হইতে পারে!

সেই সময় আল্লাহ মারয়াম (আ)-এর কাছে ফেরেশতা পাঠাইয়া জানাইয়া দিলেন, তুমি যখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে ফিরিয়া যাইবে এবং তাহারা যখন এই বিষয়ে তোমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করিবে, তখন তুমি নিজে উহার উত্তর দিবে না বরং তুমি তাহাদের ইশারায় বলিবে, আমি রোযা রাখিয়াছি। এইজন্য আমি আজ কাহারও সহিত কথা বলিব না। তোমাদের যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার আছে, তাহা এই শিশুকে জিজ্ঞাসা কর। তখন তোমার প্রতিপালক তাঁহার অসীম কুদরতের নিদর্শন প্রকাশ করিয়া শিশুর মাধ্যমে জবাব দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন এবং তাহাদের বিস্ময়কে দূর করিয়া দিবেন। তাহাদের অন্তরকে শান্ত ও নিশ্চিত করিয়া দিবেন (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫-৩৬)।

فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِىْ إِنِّىْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا .

"মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও, আমি দয়াময়ের উদ্দেশ্যে মৌনতা অবলম্বনের মানত করিয়াছি (বা রোযা রাখিয়াছি)। সুতরাং আমি আজ কিছুতেই কোন মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না" (১৯ ঃ ২৬)।

হযরত মারয়াম (আ) আল্লাহর পক্ষ হইতে এই বার্তায় সন্তুষ্ট হইয়া শিশু সন্তানকে কোলে তুলিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি যখন শহরে গিয়া পৌঁছিলেন এবং লোকেরা তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইল, তখন তাহারা চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল এবং বলিতে লাগিল, মারয়াম! এ কী দেখিতেছি? তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ। তোমার বিবাহ হয় নাই। তাহা হইলে এই সন্তান কিভাবে তোমার গর্ভে আসিল? হে হারূনের বোন! তোমার

পিতাও তো খারাপ লোক ছিলেন না, আর তোমার মাও চরিত্রহীনা ছিলেন না; তুমি কী করিয়া বসিলে (সিওহারবী, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৬)? আল-কুরআনে এই তথ্য নিম্নোক্তভাবে পরিবেশন করা হয় ঃ

فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۔ يٰاُخْتَ هَارُوْنَ مَاكَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا .

"অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল। উহারা বলিল, হে মারয়াম! তুমি তো এক অদ্ভূত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ। হে হারূনের ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না আর তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী" (১৯ ঃ ২৭-২৮)।

এইভাবে হযরত মারয়াম (আ) লোকজনের পক্ষ হইতে বাক্যবাণে জর্জরিত হইতে লাগিলেন। আল্লামা ইবন জারীর তাবারীর বর্ণনামতে, তাহারা হযরত মারয়ামের ব্যাপারে হযরত যাকারিয়্যা (আ)-কে অপবাদ দিতেছিল। তাহাদের মধ্যে মুনাফিক শ্রেণীর কেহ কেহ তাঁহার খালাতো ভাই ইউসুফের সহিত জড়িত করিয়া অপবাদ দিতে শুরু করিল (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২)।

ইব্‌ন কাছীর মারয়ামের সেই সংকটময় পরিস্থিতি ব্যাখ্যায় বলেন, যখন অবস্থা সংকটাপন্ন হইয়া গেল, চলাফেরার ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং লোকদের সহিত কথাও বন্ধ হইয়া গেল তখন তিনি মহিমান্বিত আল্লাহর উপর তাওয়াককুল করিলেন (প্রাগুক্ত)। তিনি এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুসারে তাহাদিগকে শিশু সন্তানের দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন ঃ

فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِى الْمَهْدِ صَبِيًّا ۔ قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتَانِىَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۔ وَجَعَلَنِىْ مُبَارَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصَانِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۔ وَالسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۔ ذٰلِكَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ .

"অতঃপর মারয়াম সন্তানের প্রতি ইঙ্গিত করিল। উহারা বলিল, যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? সে (শিশু) বলিয়া উঠিল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন, যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে। আর তিনি আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার প্রতি সালাম যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি উত্থিত হইব। এই-ই মারয়াম তনয় 'ঈসা। আমি বলিলাম, সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে" (১৯ ঃ ২৯-৩৪)।

আল্লামা সিউহারবী উল্লেখ করেন, সম্প্রদায়ের লোকেরা একটি সদ্যজাত শিশুর মুখ হইতে এইরূপ জ্ঞানগর্ভ কথা শুনিতে পাইয়া আশ্চর্যান্বিত হইয়া গেল এবং তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাইল যে, মারয়াম (আ)-এর চরিত্র যে কোন ধরনের অপবিত্রতা ও কলুষতা হইতে মুক্ত এবং তাঁহার সন্তানের

জন্মের ব্যাপারটি আল্লাহর পক্ষ হইতে নিশ্চিত একটি নিদর্শন (সিউহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯)। কিন্তু সকলেই তাহা মানিয়া লইতে পারে নাই, কিছু লোকের মনে সন্দেহ থাকিয়া গেল। এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানায় উল্লেখ রহিয়াছে, ঈসার বয়স যখন ৪০ দিন তখন তাঁহার মাতা মারয়াম ইয়াহূদীদের প্রথানুসারে তাহাকে হায়কালে লইয়া গিয়াছিলেন (vol. 18, P. 345 H)। এই ধরনের একটি ইশারা লূক সুসমাচারেও রহিয়াছে (দ্র. লূক সুসমাচার, ২ ঃ ২২)।

আল্লামা কিরমানী উল্লেখ করেন, ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণ করিবার সময় হযরত মারয়াম (আ)-এর বয়স ছিল তের বৎসর (কিরমানী, শারহ সহীহ বুখারী, ১৪খ, পৃ. ৬১)।

ঈসা (আ)-এর লালন-পালনের দায়িত্বে মারয়াম (আ)

হযরত মারয়াম (আ) হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর তাঁহাকে লইয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে বানূ ইসরাঈলের নিকট আসা ও শিশু ঈসা-এর বক্তব্যে পরিস্থিতি মুকাবিলার বিষয়টি আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু পরবর্তীতে হযরত মারয়াম (আ)-এর জীবনের ঘটনাবলী সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। আল-কুরআনে অন্য স্থানে শুধু এইটুকু বলা হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ .

"আর আমি মারয়াম তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে" (২৩ ঃ ৫০)।

কিন্তু হযরত মারয়াম (আ) তাঁহার সন্তানসহ যে প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহা কোথায় অবস্থিত সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায়। ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত, ঈসা (আ)-এর শিশু অবস্থা হইতেই বিভিন্ন রকম আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত হইতেছিল। আর এইগুলির সংবাদ ইয়াহূদী সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতেছিল। অন্যদিকে ঈসা (আ) বড় হইতেছিলেন। তখন ইয়াহূদীগণ তাঁহার ক্ষতিসাধন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাঁহার মাতা স্বীয় সন্তানের হিফাযতের ব্যাপারে শংকিত হইয়া পড়িলেন। এহেন অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন তাঁহার পুত্রসহ মিসরে চলিয়া যান। উপরিউক্ত আয়াতটি দ্বারা ইহার দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ.৭১)। ইবন কাছীর ইবন আব্বাস (রা) হইতে নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রাপ্ত অন্য এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, নিরাপদ ভূমি বলিতে দামিশকের নদনদী সম্পন্ন এলাকা বুঝানো হইয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২)। কাহারো কাহারো মতে রামলা অঞ্চল (প্রাগুক্ত)।

মথি সুসমাচারে উদ্ধৃত হইয়াছে, "প্রভুর এক দূত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর। আর আমি যতদিন তোমাকে না বলি, তত দিন সেখানে থাক। কেননা হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাহার অনুসন্ধান করিবে। তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রিযোগে শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানে থাকিলেন" (দ্র. ২ ঃ ১৩-১৫)।

ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ বলিয়াছেন, ঈসা (আ) যখন ১৩ বৎসরে উপনীত হইলেন তখন আল্লাহ পাক ঈসাকে মিসর হইতে জেরুসালেমে লইয়া আসিবার আদেশ করিলেন। তখন তাঁহার মাতার খালাতো ভাই ইউসুফ উভয়কে গাধায় আরোহণ করাইয়া মিসর হইতে জেরুসালেমে লইয়া আসিলেন। তিনি মারয়াম (আ)-এর সহিত সেইখানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

মথি সুসমাচারে আসিয়াছে, হেরোদ রাজার মৃত্যুর পর ইউসুফ স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়াই মারয়াম (আ) ও তাঁহার পুত্রকে লইয়া মিসর হইতে ইসরাঈলী অঞ্চলে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং আল খলীল প্রদেশের নাসরাত জনপল্লীতে বসবাস করিতে থাকিলেন (দ্র. মথি, ২ ঃ ১৯-২৩)।

লূক সুসমাচারে আসিয়াছে, শিশু ঈসা (আ) যখন বলবান হইলেন, প্রতি বৎসর নিস্তার পর্ব উদযাপনে যেরুসালেমে আসিতেন। এইভাবে একবার মারয়াম (আ) স্বীয় পুত্র ঈসাকে উৎসবের মধ্যে হারাইয়া ফেলিলেন, পরে তাহাকে ইয়াহূদী আলেমদের সহিত বিতর্কে লিপ্ত অবস্থায় পাইলেন। অতঃপর তাহারা সকলেই নাসরাতে ফিরিয়া গেলেন। এইভাবে হযরত মারয়াম (আ) স্বীয় পুত্রের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন (দ্র. লূক, ২ ঃ ৪০-৫২)।

কিন্তু ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির পর মারয়ামের ভূমিকা কি ছিল ইতিহাস এই ব্যাপারে নীরব। সম্ভবত তিনিও তাঁহাকে সমর্থন করিয়াছিলেন। তবে কিভাবে ও কখন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাত হইত তাহা জানা যায় নাই। মারয়াম (আ) কাহার সহিত কোথায় অবস্থান করিতেন তাহাও জানা যায় না। ঈসা (আ)-এর ঊর্ধারোহণের পূর্বে মারয়াম (আ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল-খলীল প্রদেশের 'কান্না নগরে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে ঈসা (আ)-এর সহিত মারয়াম (আ)-এর সাক্ষাত হইয়াছিল (দ্র. যোহন সুসমাচার, ২ ঃ ১-২)। আর একবার ঈসা (আ) তাঁহার শিশুদেরকে শিক্ষা প্রদান করিতেছিলেন, সেইখানে হযরত মারয়াম (আ) তাঁহার সাক্ষাতের জন্য আসিয়াছিলেন (দ্র. মার্ক : ৩ : ৩১-৩২)।

এই সকল তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা যায়, ঈসা (আ) যদিও পাহাড়-পর্বতে, নদ-নদীর তীরে ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেন তবুও তাঁহার মাতা হযরত মারয়াম (আ)-এর সাথে তাঁহার কিছু যোগাযোগ ছিল। কেননা আল-কুরআনেও আসিয়াছে, 'তিনি ছিলেন স্বীয় মাতার সাথে সদাচারী' (১৯ ঃ ৩২)। তাই বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিবার প্রশ্নই উঠে না। অবশ্যই যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তৎকালীন ইয়াহূদী সমাজের বৈরী পরিবেশের কারণে হয়ত অনেক তথ্য অজানা রহিয়া গিয়াছে।

বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, কথিত যীশুকে যেখানে শূলিতে চড়ানো হয় সেইখানে আরও কিছু মহিলাসহ হযরত মারয়াম (আ) উপস্থিত ছিলেন (দ্র. যোহন সুসমাচার, ১৯ ঃ ২৫-২৭)। সেইখানে ঈসা (আ) তাঁহার মাতাকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন এবং তাঁহার এক শিস্যকে তাঁহার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য উপদেশ দিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, ১৯ ঃ ২৫-২৭)।

ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বারোহণের মুহূর্তে মারয়াম (আ)

হাফিয ইবন 'আসাকির ইয়াহ্ইয়া ইবন হাবীবের সূত্রে উল্লেখ করেন, হযরত মারয়াম (আ) জিবরাঈল (আ)-এর দিকনির্দেশনায় ঐ গহীন জঙ্গলে গিয়া ঈসা (আ)-এর সাক্ষাত পাইলেন। ঈসা

(আ) তাঁহাকে দেখিয়া দ্রুত তাঁহার পানে আগাইয়া আসিলেন এবং জড়াইয়া ধরিলেন, মাথায় চুমা খাইলেন, তাঁহার জন্য দু'আ করিলেন এবং বলিলেন, আম্মাজী! এই (ষড়যন্ত্রকারী) গোষ্ঠী আমাকে হত্যা করিতে পারে নাই, বরং আল্লাহই আমাকে তাঁহার কাছে উঠাইয়া নিয়াছেন এবং আপনার সাক্ষাতের অনুমতি দিলেন। অচিরেই আপনার মৃত্যু হইবে। অতঃএব আপনি সবর করুন, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করুন। তাহার পর ঈসা (আ) উর্ধ্বারোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মারয়াম (আ)-এর ইন্তিকাল পর্যন্ত তাঁহার সাথে ঈসা (আ)-এর আর সাক্ষাত হয় নাই (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮)।

খৃস্টানদের বাইবেলে উল্লেখ রহিয়াছে, 'ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বারোহণের সময় গালীল তথা, আল-খলীল প্রদেশের এক পল্লী পাহাড়ে তাঁহার এগারজন সাথীর সাথে তাঁহার সাক্ষাত হইয়াছিল। তাহাদের সাথে তাঁহার মাতা মারয়াম (আ)-ও ছিলেন (দ্র. মথি, ২৮ ঃ ১, ১৬; মার্ক, ১৬ ঃ ১২, ২৪ ঃ১০, ২৪, ২৭-৪২)।

ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বারোহণের পর মারয়াম-এর অবস্থান

খৃস্টীয় উৎস হইতে জানা যায়, ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বারোহণের পর তাঁহার এগারজন্য শিষ্য মারয়াম (আ)-সহ জেরুসালেমে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন (দ্র. লূক সুসমাচার, ২৪ ঃ ৫৩)। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি কোথায় কিভাবে অবস্থান করেন সেই সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত ইয়াহূদীদের তল্লাশি ও ষড়যন্ত্রের মুখে ঈসা (আ)-এর এগারজন সাথীর সাথে মারয়াম (আ)-ও পাহাড়ে-জঙ্গলে আত্মগোপন করিয়াছিলেন এবং ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থাকিয়া বাকি জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

মারয়াম (আ)-এর ওফাত

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মারয়াম (আ)-এর মৃত্যুর বিষয়ে ঈসা (আ) নিজেই আগাম সংবাদ দিয়াছিলেন। কিন্তু ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বারোহণের পর কত বৎসর মারয়াম (আ) জীবিত ছিলেন সেই সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়। হাফিয ইবন আসাকিরের বর্ণনা অনুযায়ী 'ঈসা (আ)-এর উত্তোলনের পর মারয়াম (আ) ৫ (পাঁচ) বৎসর জীবিত ছিলেন। তিনি ৫৩ বৎসর বয়সে ইনতিকাল করেন (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)। কুরতুবী উল্লেখ করেন, খৃস্টানদের ধারণামতে মারয়াম (আ) ঈসা (আ)-এর উত্তোলনের পর ছয় বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তখন তাঁহার মোট বয়স ছিল ৫৬ বৎসর (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১১ খ, পৃ. ৯১)। আল্লামা কিরমানী উল্লেখ করেন, ঈসা (আ)-এর উত্তোলনের পর মারয়াম (আ) ৬৬ বৎসর জীবিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ১১২ বছর (দ্র. কিরমানী, শারহ বুখারী, ১১খ, ৬১)।

The World Book Encyclopedia-এর ভাষ্য অনুসারে মারয়ামের শেষ জীবন সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। ইহা বিশ্বাস করা হয়, তিনি জেরুসালেমে প্রায় ৬৩ খৃস্টাব্দে মারা যান (vol. 13, P.191; আরো দ্র. Ency. Americana, vol. 18, P. 347)। খৃস্টানগণ, বিশেষত ক্যাথলিক সমাজ ধারণা করে যে, মারয়ামের মৃত্যুর পর তাঁহাকে স্বর্গে উঠাইয়া নেওয়া হয় (Ency. Britannica, vol. 14, p. 998)। ঐসব মতামত তাহাদের ধারণা মাত্র। প্রকৃত অবস্থা আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

মারয়াম (আ) কি নবী ছিলেন?

মারয়াম (আ) নবী ছিলেন কি না ইহা লইয়া আলিমগণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী মতামত রহিয়াছে। 'আল্লামা ইব্ন হায্ম উল্লেখ করেন, উহা এমন প্রসঙ্গ যাহা সম্পর্কে আমাদের যুগে কর্ডোভায় (স্পেন) প্রচণ্ড মতবিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে। কেননা একদল আলিমের মতে কোন মহিলা নবী হইতে পারেন না। আর যেই লোক বলে, স্ত্রীলোক নবী হইতে পারে সে একটি বিদ'আতের জন্ম দিল। অপর দলের মতে মহিলারা নবী হইতে পারেন এবং নবী হইয়াছেনও। তৃতীয় একদল আলিম এই ব্যাপারে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছেন (দ্র. ইব্ন হায্ম, আল-ফাস্ল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়াই ওয়ান নিহাল, ৫খ, ১৭)।

যাঁহারা মহিলাদের নবী হওয়ার পক্ষে মতামত দিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক, আবুল হাসান আশআরী, ইমাম ইবন হাযম কুরতুবী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য (দ্র. 'আসকালানী, ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৩৬৮; ইবন হাযম, প্রাগুক্ত; 'আয়নী, 'উমদাতুল কারী, ১৫খ, পৃ. ৩০৯; কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৮৩; সিওহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩)। এমনকি ইবন হাযম দাবি করিয়াছেন, ছয়জন মহিলা নবী ছিলেন। তাঁহারা হইলেন হাওয়া, সারা, হাজেরা, উম্মে মূসা, আসিয়া ও মারয়াম (আ) (দ্র. ইবন হাযম, প্রাগুক্ত)।

মুহাম্মদ ইবন ইসহাক বলেন, অধিকাংশ ফিকহবিদের মত হইতেছে মহিলারা নবী হইতে পারেন (সিউহারবী, প্রাগুক্ত), আর মারয়াম (আ) নবী ছিলেন। অবশ্য কুরতুবী সারা ও হাজেরার নাম উল্লেখ করেন নাই। ইবন ইসহাকের মতকে 'আল্লামা সুহায়লী অধিকাংশ ফকীহ্-এর মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. আসকালানী, প্রাগুক্ত)। 'আল্লামা তকীউদ্দীন সুব্কী এই মত সমর্থন করিয়াছেন (দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৫৪)। ইবন হায্ম ও কুরতুবীর মতকে 'আল্লামা ইবনুস সায়্যিদ প্রাধান্য দিয়াছেন (প্রাগুক্ত)। তাহারা নিজ নিজ মতের পক্ষে কয়েকটি দলীল পেশ করিয়াছেন। যেমন ঃ

১. আল-কুরআনে মারয়াম (আ) সম্পর্কে যেইসব ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে পরিষ্কার দেখা যায় যে, তাঁহার কাছে ফেরেশতা আল্লাহর পক্ষ হইতে ওহী লইয়া আসিয়াছিলেন এবং বিভিন্ন সুসংবাদ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করিয়াছিলেন। যেমন ফেরেশতা মানব রূপ ধারণ করিয়া মারয়াম (আ) -কে সম্বোধন করিয়াছিলেন, যাহা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ

فَارْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۔ قَالَتْ إِنِّي اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۔ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلاَمًا زَكِيًّا ۔

"অতএব আমি তাহার নিকট আমার রূহ (ফেরেশতা) পাঠাইলাম........সে বলিল, আমি তো আপনার রবের প্রেরিত যেন আপনাকে একটি পবিত্র পুত্র সন্তান দান করিতে পারি" (১৯ ঃ ১৭-১৯)।

এই প্রেক্ষিতে ইবন হাযম বলেন, "ইহা তো প্রকৃত ওহীর মাধ্যমে প্রকৃত নবুওয়ত (ইবন হাযম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮)।

২. বিশেষ করিয়া সূরা মারয়ামে হযরত মারয়াম (আ) সম্পর্কে যেইভাবে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী ছিলেন। কেননা নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে কুরআন কারীমে যেই ভঙ্গিতে আলোচনা করা হইয়াছে, এইখানে হযরত মারয়াম (আ)-এর ক্ষেত্রেও সেই প্রকাশ ভংগীই অবলম্বন করা হইয়াছে। যেমন ঃ

"আর এই কিতাবে মূসার কাহিনী বর্ণনা করুন".....(১৯ ঃ ৫১)। وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مُوْسٰى

"আর এই কিতাবে ইদ্‌রীসের কাহিনী বর্ণনা করুন".....(১৯ ঃ ৫৬)। وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِدْرِيْسَ

"আর এই কিতাবে ইসমাঈলের কাহিনী বর্ণনা করুন".....(১৯ ঃ ৫৪)। وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِسْمَاعِيْلَ

"আর এই কিতাবে ইবরাহীমের কাহিনী বর্ণনা করুন".....(১৯ ঃ ৪১)। وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ

"আর এই কিতাবে মারয়ামের কাহিনী বর্ণনা করুন".....(১৯ ঃ ১৬)। وَاذْكُرْ فِى الْكِتَابِ مَرْيَمَ

অনন্তর সূরা আল ইমরানে আল্লাহ্‌র ফেরেশতা তাঁহার বাণীবাহক হইয়া হযরত মারয়াম (আ)-কে যেইভাবে সম্বোধন করিয়াছেন তাহাও এই দাবির পক্ষে সুস্পষ্ট প্রমাণ (সিউহারবী, প্রগুক্ত, পৃ. ১৬)

৩. সহীহ বুখারীতে এক হাদীছে আসিয়াছে, মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية إمراة فرعون ومريم بنت عمران.

"পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণতায় পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু নারীদের মধ্যে কেবল ফিরআওনের স্ত্রী আছিয়া এবং ইমরান-এর কন্যা মারয়াম এই পূর্ণতায় পৌঁছিতে পারিয়াছেন" (বুখারী, কিতাবু আম্বিয়া, বাব اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ مِنَ الخ 'আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৭)।

৪. মারয়াম (আ) সম্পর্কে আল-কুরআনে আল্লাহর বাণী اِصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ "বিশ্ব জগতের নারীকুলের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন"। ইবন হাজার আসকালানী উল্লেখ করেন, এই আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করা হয় যে, মারয়াম (আ) নবী ছিলেন ('আসকালানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮)।

অপরদিকে অনেক 'আলেমে দীন মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, মারয়াম (আ) নবী ছিলেন না, বরং সিদ্দীকা ছিলেন। এই মতের প্রবক্তাগণের মধ্যে হাসান বসরী, ইমামুল হারামাইন শায়খ আবদুল 'আযীয, কাযী 'ইয়াদ, আবু বকর আল-জাস্‌সাস, ফখরুদ্দীন রাযী, ইবন কাছীর প্রমুখ (দ্র. ইবন হাজার 'আসকালানী, প্রাগুক্ত; জাসসাস, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ১২; রাযী, প্রাগুক্ত; ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫৫)।

আবুল হাসান 'আশআরীর সূত্রে ইবন কাছীর উল্লেখ করেন, জমহুর তথা অধিকাংশ আলেমের ইহাই মত (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)। কাযী ইয়াদও বলিয়াছেন যে, ইহাই জমহুরের মত (আসকালানী,

প্রাগুক্ত)। আর ইমামুল হারামাইন আল্লামা কিরমানীও এই ব্যাপারে ইজমার দাবি করিয়াছেন (প্রাগুক্ত; কিরমানী প্রাগুক্ত, ১৪খ, পৃ. ৬০)। এই সকল 'আলেমের মতে মহিলারা নবী হইতে পারেন না তথা মারয়াম (আ)-ও নবী ছিলেন না। তাঁহারা নিজেদের মতের সমর্থনে নিম্নোক্ত দলীলগুলি পেশ করিয়া থাকেন ঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ ·

"আপনার পূর্বে আমি যে নবী-রাসূল পাঠাইয়াছি তাহারা সকলে পুরুষই ছিল, আমি তাহাদের কাছে ওহী পাঠাইতাম" (১২ ঃ ১০৯)।

২. হযরত মারয়াম (আ) যে নবী ছিলেন না বরং সিদ্দীকা ছিলেন, তাহা আল-কুরআনেও একটি আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

مَا الْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيْقَةٌ ·

"মারয়াম তনয় মাসীহ তো একজন রাসূল মাত্র। তাহার পূর্বে আরও অনেক রাসূল গত হইয়াছে। তাহার মা ছিল একজন সিদ্দীকা তথা সত্যপন্থী মহিলা" (৫ ঃ ৭৫)।

এই আয়াতে রাসূলগণের প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া মারয়ামকে সিদ্দীকা হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, কুরআন কারীম সূরা নিসায় নি'আমতপ্রাপ্তদের যেই তালিকা দিয়াছে তাহা এই ব্যাপারে চূড়ান্ত দলীল। অর্থাৎ (সিদ্দীক)-এর মর্যাদা নবুওয়াতের মর্যাদার পর বলা হইয়াছে ঃ

فَأُولٰئِكَ الَّذِيْنَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيْقًا ·

"(যেইসব লোক আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের আনুগত্য করিবে) তাহারা সেই লোকদের সংগী হইবে যাহাদের প্রতি আল্লাহ নি'আমত দান করিয়াছেন। তাহারা হইতেছে নবীগণ, সত্যবাদী তথা সিদ্দীকগণ, শহীদগণ এবং নেক্‌কার লোকসকল। তাহারা যাহাদের সঙ্গী-সাথী হইবে, তাহাদের পক্ষে উহারা কতই না উত্তম সাথী" (৪ ঃ ৬৯)।

এই মতাবলম্বিগণ পূর্বোক্ত দলের যুক্তি খণ্ডন করিয়াছেন। যেমন বলা হইয়াছে, ফেরেশতার সহিত কথাবার্তা বলাই নবুওয়াতের প্রমাণ নহে। আল্লামা আসকালানী বলেন, ফেরেশতাগণ এমন অনেক ব্যক্তির সহিত কথা বলিয়াছেন যাহারা নবী ছিলেন না বলিয়া সকলেই একমত। বর্ণিত আছে যে, কোন এক ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাহাদের এক ভাইয়ের সাক্ষাতে বাহির হইয়াছিলেন। তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে সুসংবাদ দেন যে, তাহাকে আল্লাহ পাক তেমনি ভালবাসেন যেমনি তিনি তাহার ভাইকে ভালবাসেন (আলূসী, প্রাগুক্ত)।

দ্বিতীয়ত, বলা হয়, সূরা মারয়ামে হযরত মারয়াম (আ)-কে বিশেষভাবে বর্ণনা করিবার উদ্দেশ্য হইল, তিনি ছিলেন আল্লাহর কুদরতের এক নিদর্শন যিনি পিতাবিহীন সন্তান জন্ম দিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন উচ্চাঙ্গের আবেদ ও মুত্তাকী। ইহাতে তিনি নবী ছিলেন বলিয়া প্রমাণিত হয় না।

তৃতীয়ত, সারা বিশ্বের নারীকুলের মধ্যে মনোনীত করিবার অর্থ সম্পর্কে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে তৎকালীন বিশ্বের, কাহারও মতে গোটা নারী জাতির। এই বিতর্কিত বিষয় দ্বারা দলীল পেশ করা শক্তিশালী নহে।

চতুর্থত, মারায়ম ও আছিয়ার পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছার অর্থ নবুওয়াতের স্তরে পৌঁছা বুঝায় না।

আল্লামা কিরমানী বলেন, "কামাল তথা পূর্ণাঙ্গতা শব্দটি দ্বারা উভয়ের নবূওয়াত লাভ করা বুঝায় না। কেননা কোন বস্তু বা বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা ও শেষ পর্যায়ে পৌঁছার ব্যাপারেই উহা ব্যবহৃত হয়। আর নারীরা যেইসব উন্নত মর্যাদায় পৌঁছিয়া থাকেন তাহারা উভয়েই সেই মর্যাদায় পৌঁছিয়াছিলেন" (প্রাগুক্ত)।

পঞ্চমত, কুরআন মজীদের বহু স্থানে নবী এবং রাসূল শব্দদ্বয়কে সমার্থবোধক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে" (উদাহরণস্বরূপ দ্র. ২ ঃ ১৩৬, ২১৩; ৩ ঃ ৮৪, ৪ ঃ ২০, ৪৪)। সাধারণত উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয় যে, রাসূলকে কিতাব দেওয়া হয়, নবীকে কিতাব দেওয়া হয় না। অথচ বলা হইয়াছে ঃ

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ .

"আর যখন আল্লাহ নবীদের থেকে অঙ্গীকার লইলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব ও হিকমত যাহা কিছু দিয়াছি" (৩ ঃ ৮১)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, নবীগণকেও কিতাব দেওয়া হয়। আর মারয়ামকে কিতাব দেওয়া হইয়াছিল এই মর্মে কোন প্রমাণ নাই। কাহারো মতে নবুওয়াত অর্থ (আল্লাহর পক্ষ হইতে) সংবাদ প্রাপ্তি আর রিসালাত অর্থ তাহা পৌঁছানো। কিন্তু এই পার্থক্য যথাযথ নহে। কারণ কোন নবীকে আল্লাহর পক্ষ হইতে বার্তা দেওয়া হইবে আর তিনি তাহা পৌঁছাইবেন না বা না পৌঁছাইলেও চলিবে ইহা সমর্থনযোগ্য নহে। অথচ আল-কুরআনে রাসূল অভিধায় ব্যবহৃত আয়াতে যেই দায়িত্বের কথা বলা হইয়াছে নবী অভিধায় ব্যবহৃত আয়াতে একই দায়িত্বের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন রাসূল সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

رُسُلاً مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ لِئَلاَّ يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَي اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزاً حَكِيْماً .

"সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রাসূল পাঠাইয়াছি, যাহাতে রাসূলগণের পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ বাকী না থাকে। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৬৫)।

এমনিভাবে নবীগণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ .

"সমস্ত মানুষ একই উম্মতভুক্ত ছিল। তাহার পর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী-রূপে প্রেরণ করেন এবং তাহাদের সাথে সত্য কিতাব নাযিল করেন, মানুষের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবার জন্য, যাহা লইয়া তাহারা মতবিরোধ সৃষ্টি করিয়াছিল" (২ ঃ ২১৩)।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে, নবীগণও সতর্ককারী ও সুসংবাদ দানকারী তথা দাওয়াতী কাজে নিমগ্ন ছিলেন, তাঁহাদিগকে কিতাব দান করা হইয়াছিল। তাঁহারা মানুষের মধ্যে ফয়সালাকারী ছিলেন। আর মারয়াম (আ) ঐ ধরনের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন বলিয়া কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন আবেদ, সিদ্দীকা। পিতৃহীন সন্তান ধারণের জন্যই তাঁহাকে বিশেষভাবে লালন করা করা হইয়াছিল। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র ওলী, আর ওলীগণের মাধ্যমে কারামতের প্রকাশ ঘটিয়া থাকে। তাই আল্লাহর পক্ষ হইতে আহার্য লাভ তাঁহার একটি কারামত, নবী হিসাবে মুজিযা নহে।

দুনিয়ার নারীকুলের মধ্যে মারয়াম (আ)-এর মর্যাদা

এই সম্পর্কে আল-কুরআন ও হাদীছে আলোচনা উল্লেখ রহিয়াছে। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلٰى نِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ ·

"যখন ফেরেশতাগণ বলিয়াছিল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করিয়াছেন, আর বিশ্বের নারীগণের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ ঃ ৪২)।

হযরত মারয়াম তথা কোন মহিলার নবুওয়াত লাভের বিষয়টি কুরআন হাদীছের প্রত্যক্ষ, সুস্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নহে। ফলে পক্ষে বা বিপক্ষে যে কোন মত গ্রহণ করার অবকাশ রহিয়াছে। তবে নবুওয়াতের গুরুদায়িত্ব পালনে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজের ধরন ও মহিলাদের অবস্থান বিবেচনায় জমহুর আলিমগণ মহিলার নবী না হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাফসীরকারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। আল্লামা তাবারী মন্তব্য করেন, হযরত মারয়াম (আ) নবী ছিলেন না (তাফসীরে তাবারী, বৈরূত ১৯৫৬ খৃ, ১৬খ, পৃ. ৩৬)। হাফিয ইবন কাছীর বলেন ঃ

اما قول الجمهور كما قد حكاه ابو الحسن الاشعرى وغيره من اهل السنة والجماعة من ان النبوة مخص بالرجال وليس فى النساء نبية فيكون اعلى مقامات مريم كما قال الله تعالى ما المسيح بن مريم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقة ·

"জমহূরের মতে যেমনটি আহলুস সুন্নাতের ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও অন্যান্য আলিম বর্ণনা করেন যে, নবুওয়াত পুরুষগণের বৈশিষ্ট্য, মহিলাগণের মধ্যে কেউ নবী ছিলেন না। তাই মারয়াম (আ)-এর সর্বোচ্চ মর্যাদা ছিল এই যে, তিনি ছিলেন সিদ্দীকা, যেমনটি আল্লাহ তা'আলা বলেন, মরিয়ম তনয় মসীহ....তাহার মাতা একজন সত্যপন্থী নারী" (বিদায়া, ২খ., ৫৯)।

আলূসী বলেন ,

لان مريم لا نبوة لها على المشهور وهذا هو الذى ذهب اليه اهل السنة والشيعة وخالف فى ذالك المعتزلة .

"প্রসিদ্ধ মতে মারয়াম (আ) নবী ছিলেন না। আহলুস সুন্নাহ ও শীআপন্থী আলিমগণ এই মতই গ্রহণ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে অবশ্য মুতাযিলা সম্প্রদায় ভিন্নমত পোষণ করেন" (আলূসী, তাফসীর, ৩খ, ১৪০; আরো দ্র. দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৫০৯)।

প্রখ্যাত তাফসীরকার মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন, জমহূর উম্মতের মতে মারয়াম নবী ছিলেন না এবং কোন মহিলা নবী হইতে পারেন না (মাআরিফুল কুরআন, ৬খ, ৩৪)।

মহিলার নবুওয়াত লাভ সম্পর্কিত উপরিউক্ত দুই মত ছাড়াও তৃতীয় একটি মতেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তাহা এই যে, এই বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে মত প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকা উচিত। এই মত অবলম্বনকারিগণের মধ্যে শায়খ তকীউদ্দীন সুবকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাওলানা হিফযুর রহমান মন্তব্য করেন, সম্ভবত এই তৃতীয় মত অবলম্বনকারী উলামার সংখ্যাই অধিক (কাসাসুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৩২০-৩৩)।

কোন কোন মুফাস্‌সিরের মতে অত্র আয়াতে বিশ্ব-নারী বলিতে মারয়ামের পূর্ব ও পরের তথা সকল যুগের সকল নারীর কথা বুঝানো হইয়াছে (দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫)। এই মতের সমর্থনে কিছু হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করা হয়। সেইগুলি হইল ঃ

১. হাফেজ ইবন আসাকির ইব্‌ন আব্বাস (রা.) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, মহানবী (স.) বলিয়াছেন,

سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية آمراة فرعون .

"জান্নাতে নারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন মারয়াম বিনতে ইমরান, অতঃপর ফাতিমা, অতঃপর খাদীজা, অতঃপর ফিরআওনের স্ত্রী আছিয়া" (ইবন্ কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬; আলূসী, প্রাগুক্ত)।

ইবন কাছীর এই হাদীছের ব্যাখ্যায় বলেন, এইখানে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দ দ্বারা ক্রম অর্থ লওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইবন মারদাওয়ায়হ এই হাদীছটি আবদুল্লাহ ইবন আবু জাফর আর-রাযীর সনদে এবং ইবন আসাকির অপর এক সূত্রে আনাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন। তাহাতে 'ছুম্মা' (অতঃপর) শব্দের পরিবর্তে 'ওয়াও' (এবং) উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহার দ্বারা ধারাক্রম বুঝায় না (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৭)। আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হাদীসটির ভাষ্য নিম্নরূপ ঃ

خير نساء العالمين أربع مريم بنت عمران وآسية إمراة فرعون وخديجة بنت خوليد وفاطمة بنت محمد رسول الله .

"জগৎশ্রেষ্ঠ মহিলা চারজন ঃ মারয়াম বিনতে ইমরান, ফিরআওনের স্ত্রী আসিয়া, খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ এবং আল্লাহ রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমা" (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত; ইবন কাছীর, পৃ. ৩৮৩; ৫৫)।

২. ইবন জারীর তাবারী এক সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) ও কাতাদা (র) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ উট-এর আরোহিণী কুরায়শ বংশীয় পূণ্যবান নারিগণই উত্তম নারী। তাহারা তাহাদের সন্তানদের প্রতি শৈশবকালে অধিক স্নেহময়ী এবং স্বামীর সম্পদের পরম সংরক্ষণকারিণী" (প্রাগুক্ত)।

হযরত কাতাদা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, আমি যদি এই তথ্য পাইতাম যে, মারয়াম উটে চড়িয়া ছিলেন, তাহা হইলে অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর মর্যাদা দিতাম না (প্রাগুক্ত)। মারয়াম (আ)-এর সকল নারীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভের বিষয়টি উপরিউক্ত হাদীছের আলোকে স্পষ্ট নহে, বরং ইহাতে কুরায়শ বংশীয় হিসাবে খাদীজা (রা) ও ফাতিমা (রা)-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে।

৩. আবূ মূসা আশআরী (রা) হইতে বর্ণিত, নবী করীম (সা) বলিয়াছেন,

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية إمراة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام .

"পুরুষদের মধ্যে অনেকেই পূর্ণত্বে পৌছিয়াছেন, কিন্তু নারীদের মধ্যে পৌছিয়াছেন শুধু মারয়াম বিনতে ইমরান ও ফির'আওন পত্নী আসিয়া। আর খাদ্যের মধ্যে ছারীদ যেমন শ্রেষ্ঠ, ঠিক তেমনি নারীকূলের মধ্যে 'আইশা শ্রেষ্ঠ" (সহীহ বুখরী, কিতাবু আহাদীছিল আম্বিয়া, দ্র. কিরমানী, প্রাগুক্ত)।

'আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী এই দলীলের ব্যাখ্যায় বলেন, "আমার মতে এখানে নবী (সা.) অতীত কালের নারীদের মধ্যে মারয়াম ও আসিয়ার পূর্ণত্বের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা তিনি সাথে সাথে 'আইশা (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্বও তুলিয়া ধরিয়াছেন, যাহা দ্বারা বুঝা যায়, মারয়াম ও আসিয়ার উপরেও তাঁহার মর্যাদা ছিল বেশি (তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৮৬)।

৪. তিরিমিযী শরীফে উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, ফাতিমা (রা.) বলেন ঃ

أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سيدة نساء أهل الجنة الإمريم بنت عمران ·

"রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে জানাইয়াছেন, আমি বেহেশতী নারিগণের নেত্রী, তবে মারয়াম বিনতে ইমরান ব্যতীত (তিরমিযী, আবওয়াবুল মানাকিব, দিল্লী, তা. বি., ২খ, পৃ. ২২০)।

'আল্লামা ছানাউল্লাহ পানিপথী বলেন, এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, মারয়াম (আ) ফাতিমা (রা)-এর চাইতে নিম্ন মর্যাদার নহেন। কিন্তু তিনি যে ফাতিমার চাইতে শ্রেষ্ঠ তাহা বুঝা যায় না (প্রাগুক্ত)।

ইবন জারীর তাবারী স্বীয় তাফসীরে এক সূত্রে হযরত আম্মার ইবন সা'দ (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, "আমার উম্মতের মহিলাদের মধ্যে খাদীজা (রা)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে যেমন জগতের সকল নারীর মধ্যে মারয়াম (আ)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হইয়াছে" (তাফসীরে তাবারী, ৫খ., পৃ. ৩৮৩)।

অপরদিকে অধিকাংশ মুফাসসিরের প্রসিদ্ধ মত হইল, মারয়ামের উদ্দেশ্যে আল্লাহর বাণী "বিশ্বের নারীকুলের মধ্যে তোমাকে মনোনীত করিয়াছি"-এর মধ্য 'বিশ্ব' দ্বারা উদ্দেশ্য তৎকালীন বিশ্ব অর্থাৎ হযরত মারয়ামের সমসাময়িক বিশ্বে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ নারী। ইবন জারীর তাবারী, ইবন কাছীরসহ অনেকে এই মতটিকে প্রাধান্য দিয়াছেন (দ্র. তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২; ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯)। এই ব্যাপারে দলীল হিসাবে তাহারা বলেন, অতীতের অনেকের শ্রেষ্ঠত্বের কথা আল-কুরআনে বলা হইয়াছে, যাহার দ্বারা তাহাদের সমসাময়িক যুগকে বুঝানো হইয়াছে। যেমন হযরত মূসা (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ يَا مُوْسٰى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالاَتِيْ وَبِكَلاَمِيْ فَخُذْ مَا اٰتَيْتُكَ وَكُنْ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ .

"তিনি বলিলেন, হে মূসা! আমি তোমাকে আমার রিসালাত ও ব্যাক্যালাপ দ্বারা মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। সুতরাং আমি যাহা দিলাম তাহা গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ হও" (৭ ঃ ১৪৪)।

আর এই কথা প্রসিদ্ধ যে, হযরত ইব্রাহীম (আ) মর্যাদাগত দিক দিয়া হযরত মূসা (আ) হইতে শ্রেষ্ঠ। আর হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহাদের উভয়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪)। এমনিভাবে আল-কুরআনে বানূ ইসরাঈল সম্পর্কে বলা হয় ঃ

وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلٰى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِيْنَ .

"আমি জানিয়া শুনিয়াই উহাদিগকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছিলাম" (৪৪ ঃ ৩২)।

এই ধরনের আয়াতগুলিতে বিশ্ব বলিতে তৎকালীন বিশ্ব বুঝানো হইয়াছে। কেননা উম্মতে মুহাম্মাদী পূর্ববর্তী সকল উম্মত হইতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাক উম্মতে মুহাম্মাদী সম্পর্কে অন্য আয়াতে ঘোষণা দিয়াছেন ঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ .

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হইয়াছে। তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান কর, অসৎকার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। আহলে কিতাব (ইয়াহূদী-নাসারা) যদি ঈমান আনিত তবে তাহাদের জন্য কল্যাণকর হইত" (৩ ঃ ১১০)।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, পূর্ববর্তী উম্মতের কোন জাতি বা ব্যক্তির বিশ্বের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা যাহা আসিয়াছে তাহা দ্বারা তৎকালীন বিশ্ব বুঝানো হইয়াছে। তাই মারয়াম (আ) তৎকালীন বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা ছিলেন। হাফিয ইবন আসাকির বর্ণিত কোন কোন হাদীছে যেইখানে মারয়াম (আ)-এর নাম প্রথমে উল্লেখ করা হইয়াছে, আবার তাহারই বর্ণিত অন্য একটি হাদীছে মারয়াম (আ)-এর নাম সর্বশেষে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা.) বলিয়াছেন ঃ

حسبك منهن أربع سيدات نساء العالمين فاطمة بنت محمد وخديجة بنت خويلد واسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران.

"নারীদের মধ্যে বিশ্বশ্রেষ্ঠ চারজনের উল্লেখই তোমার জন্য যথেষ্ট। তাহারা হইল ঃ ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, খাদীজা বিনতে খুওয়ায়লিদ, আসিয়া বিনতে মুযাহিম ও মারয়াম বিনতে ইমরান" (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

এইভাবে মারয়াম (আ)-কে সমকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হিসাবে ধরিলে তিনি ফাতিমা ও খাদীজা (রা)-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ গণ্য হইবেন। অথচ অন্যান্য হাদীছে তাঁহাদের উভয়কেও বলা হইয়াছে।

হযরত আসিয়া (রা)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এইজন্য যে, তিনি নবী মূসা (আ)-কে লালন-পালন করিয়াছিলেন। আর হযরত মারয়াম (আ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব এইজন্য যে, তিনি ঈসা (আ)-এর জন্মদানকারিনী, লালন-পালনকারিনী। এমনিভাবে হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রা.) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (স.)-এর সুখে-দুঃখে পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনিই প্রথম মুসলমান। নিজের অগাধ ধন-সম্পদ সবকিছু আল্লাহর রাস্তায় বিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আল্লাহর দীনের বিজয়ে খাদীজা (রা.)-এর ভূমিকা কোনভাবে খাটো করিয়া দেখিবার অবকাশ নাই। আবু দাঊদ, নাসাঈ ও হাকেম ইবন আব্বাস (রা)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد.

"জান্নাতবাসিনী নারীদের মধ্যে খাদীজা বিন্তে খুওয়ায়লিদ ও ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ সর্বশ্রেষ্ঠ" (তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬)।

অপর কয়েকটি হাদীছে হযরত ফাতিমা (রা)-কে সাধারণভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়, যেইখানে মারায়াম (আ)-এর নাম আলাদা করা হয় নাই। বুখারী ও মুসলিম শরীফে 'আইশা (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

يا فاطمة الاترضين أن تكونى سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين .

"হে ফাতিমা! তুমি কি ইহাতে খুশী নও যে, তুমি জান্নাতবাসিনী নারীদের বা মুমিন নারীদের নেত্রী হইবে" (প্রাগুক্ত)?

উল্লিখিত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফাতিমা (রা) মারয়াম (আ) হইতেও শ্রেষ্ঠ। কেননা, তিনি যুগ ও কাল নির্বিশেষে সকল জান্নাতী নারীদের নেত্রী। তাঁহার এই বিশেষত্বকে কোন কালের সাথে নির্দিষ্ট করা চলে না। পক্ষান্তরে মারয়াম (আ) সম্পর্কে বলা হইয়াছে, তাঁহাকে বিশ্বের নারীদের মধ্যে মনোনীত করা হইয়াছে। উহা তৎকালীন বিশ্বের জন্য নির্দিষ্ট হইতে পারে (প্রাগুক্ত)। উল্লেখ্য, উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা হযরত মারয়াম (আ)-এর মর্যাদা খাট করা উদ্দেশ্য নহে। মূল প্রশ্নটি দাঁড়াইয়াছিল সার্বিকভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার ক্ষেত্রে। অন্যথায় সারা বিশ্বের নারী সমাজের

মধ্যে মারয়াম (আ)-কে আল্লাহ পাক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেন এবং বিভিন্ন মর্যাদায় ভূষিত করেন।

প্রথমত, তিনি তাঁহার মায়ের আকুল প্রার্থনায় অকালে জন্মলাভ করেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহ পাক প্রথম হইতেই তাঁহাকে বাছাই করিয়া লইয়াছিলেন, যে কারণে মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও বায়তুল মুকাদ্দাসের খেদমতে মানত হিসাবে তাঁহাকে কবুল করা হয়। তিনিই এই ক্ষেত্রে প্রথম মহিলা। তৃতীয়ত, তাঁহার নিকট আল্লাহর পক্ষ হইতে সরাসরি বেহেশতী খাবার আসিত এবং তাঁহার মাধ্যমে বিভিন্ন কারামত প্রকাশ পাইয়াছিল। যেমন অমৌসুমী ফল, শুকনা খেজুর গাছ হইতে তাজা খেজুর লাভ, তাঁহার জন্য সুমিষ্ট প্রস্রবণ প্রবাহিতকরণ, শিশু সন্তানটির কথার দ্বারা তাঁহার পবিত্রতার ঘোষণা ইত্যাদি। চতুর্থত, তিনি আল্লাহ্র ইবাদতের ক্ষেত্রে নারী সমাজে এক আদর্শনীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পঞ্চমত, তিনি নির্মল চরিত্র, অনাবিল প্রকৃতি এবং দৈহিক সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে উন্নীত হইয়াছিলেন। এমনকি স্বয়ং আল্লাহ পাক তাঁহার নিষ্কলুষ চারিত্রিক গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا .

"মারয়াম বিনতে ইমরান যে তাহার গোপনাঙ্গকে পবিত্র রাখিয়াছে (সতীত্ব ধরিয়া রাখিয়াছে)" (৬৬ ঃ ১২)।

ষষ্ঠত, তিনিই সেই মহিলা যিনি একাধিকবার ফেরেশতার সরাসরি সাক্ষাত লাভ করিয়াছেন এবং কথা বলিয়াছেন। সপ্তমত, পুরুষের স্পর্শ ব্যতিরেকে কেবল তাঁহার একার অস্তিত্ব হইতে হযরত মাসীহ ঈসা (আ)-এর মত একজন মহান নবীর জন্মদান করা হইয়াছে। এই বৈশিষ্ট্য দুনিয়ার আর কোন নারী লাভ করে নাই (দ্র. রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩; আরো দ্র. তাফসীরে উসমানী, ১খ, পৃ. ২৩২)। আল-কুরআনে তাঁহাকে ও তাঁহার সন্তানকে কিয়ামতের নির্দশন হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَا هُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِيْنٍ .

"আর আমি মারয়াম-তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে" ২৩ ঃ ৫০)।

পৃথিবীর খুব কম মহিলাই আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে ঐ ধরনের সরাসরি সাহায্য ও করুণা লাভে ধন্য হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহার নামে আল-কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হইয়াছে। জগতের অন্য কোন মহিলার নামে কোন সূরার নামকরণ করা হয় নাই।

হযরত মারয়াম (আ)-এর মর্যাদার আর একটি দিক হইল তিনি আখেরাতে বেহেশতে মহানবী (স)-এর জীবনসঙ্গিনিগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। এই মর্মে আল্লামা ইবন কাছীর বিদায়া গ্রন্থে তাবারানী, আবু ইয়ালা, ইব্ন আসাকিক প্রমুখের বরাতে একাধিক হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

তাবারানী এক সূত্রে হযরত সা'দ ইব্ন জুনাদা আল-আওফী হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা জান্নাতে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে মারয়াম বিন্‌তে ইমরান ও ফির'আওনের স্ত্রী এবং মূসার বোনের সঙ্গে আমার বিবাহ নির্ধারিত করিয়াছেন" (ইব্‌ন কাছীর , প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭)।

ইয়াহূদী ও খৃস্টান জগতে মারয়াম (আ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি ও তাহা খণ্ডন

কুরআন-সুন্নাহে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে মুসলমানগণ হযরত মারয়াম (আ)-কে যেইরূপ আদর্শ স্থানীয় মহিলা হিসাবে ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ তেমনি ধারণা পোষণ করে না। ইয়াহূদী ও খৃস্টান জগত মারয়াম (আ) সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করিয়াছে, বিরূপ ও বিকৃত মন্তব্য করিয়াছে। কেহ তাঁহাকে মর্যাদাহীন প্রমাণ করিতে গিয়া বাড়াবাড়ি করিয়াছে, অন্যরা তাঁহাকে বেশী মর্যাদা দিতে গিয়া সীমা লংঘন করিয়াছে।

স্মর্তব্য যে, হযরত মারয়াম (আ) যখন পিতৃহীন সন্তান ঈসা (আ)-কে জন্ম দেন, তখন ইয়াহূদীগণ প্রথমে মারয়াম (আ) সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। কিন্তু যখন তাহারা ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্মের প্রমাণ দোলনা হইতে মুজিযাসুলভ কথা বলিবার মাধ্যমে পাইল, তখন এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে ইয়াহূদীদের আর কোনরূপ সন্দেহ রহিল না। অতঃপর তাহারা সতীসাধ্বী মারয়াম (আ)-কে পরবর্তী ত্রিশ বৎসর পর্যন্ত কোন অপবাদ দেয় নাই, আর ঈসা (আ)-কেও কখনও অবৈধ সন্তান বলিয়া তিরস্কার করে নাই। হযরত ঈসা (আ)-এর বয়স যখন ত্রিশ বৎসর হইল তখন তিনি নবুওয়াত লাভ করিয়া দাওয়াতী কাজ শুরু করিলেন। তিনি ইয়াহূদী সমাজের, বিশেষত ইয়াহূদী আলেম সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি যখন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন তখনই তাহারা 'ঈসা (আ)-এর বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাহারা কেবল ঈসা (আ) সম্পর্কে কটূক্তি ও নিন্দাবাদ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, বরং তাঁহার সতী সাধ্বী মাতাকেও জঘন্য অপবাদ দিতে লাগিল যে, মারয়াম ব্যভিচারিণী ও ঈসা তাঁহার ব্যভিচারের ফসল (নাউযুবিল্লাহ)।

কুরআন মজীদে ইয়াহূদীদের এই অপবাদের নিন্দা জানানো হইয়াছে। এই অপবাদ দেওয়ার জন্য তাহাদের উপর লানত বর্ষিত হইয়াছে। যেমন আল্লাহ আ'তালার বাণী ঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا .

"আর তাহারা লানতগ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদের কুফরীর জন্য ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য" (৪ ঃ ১৫৬)।

ইয়াহূদীদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার সম্পর্কে আল্লাহর নবী যাকারিয়্যা (আ)-কেও অপবাদ দিয়া থাকে। আর এইজন্য বলা হয়, যাকারিয়্যা (আ)-কে হত্যার কারণও তাহাই (দ্র. ইব্নুল আছীর,

প্রাগুক্ত)। তাহাদের কেহ কেহ আর এক আবিদ ইউসুফের সহিত জড়িত করিয়া মারয়াম (আ)-কে অপবাদ দিয়া থাকে। অথচ ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী এমন তথ্যও আছে, ইউসুফের সহিত মারয়ামের কোন কালেই বিবাহ হয় নাই, উভয়ে অত্যন্ত ধার্মিক ইবাদতগুযার ছিলেন (তাফসীরে মাজেদী, ২খ., পৃ. ৪৩৫; The new Encyclopedia of Britanica, vol. 1, P. 562. এইসব ভিত্তিহীন রটনাকে আল-কুরআনে গুরুতর অপবাদ (বুহতান আযীম) বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

মোটকথা, তাহাদের ঐ অপবাদের সূত্র ধরিয়াই ইয়াহূদী সাহিত্যে হযরত মারয়াম (আ)-এর গর্ভে ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্মের ঘটনা অস্বীকার করা হয় (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, পৃ. ১২৪)। এনসাইক্লোপেডিয়া বাইবেলিকায় Mary নিবন্ধে এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে এবং সুসমাচারসমূহের (Gospels) বরাত দিয়া এই কথা প্রমাণিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম অলৌকিক ছিল না। যেমন লূকের সুসমাচারের বরাতে মন্তব্য করা হয়, আমরা আরো অগ্রসর হইয়া বলিতে পারি যে, লূকের প্রথম দুই অধ্যায় কুমারীরা সন্তান জন্মের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য বহন করে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, ১২৪)।

আর উক্ত বরাতে এই কথাও প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, হযরত মারয়াম (আ) কোন উচ্চ মর্যাদার অধিকারিনী ছিলেন না; বরং তিনিও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত গুনাহের কলংক হইতে বাঁচিয়া থাকিতে পারেন নাই (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৮খ, ১২৪)। এই পর্যায়ে শুধু ইয়াহূদী লেখক বা নাস্তিক পর্যায়ের পাশ্চাত্যের নব্য খৃস্টবাদীদের প্রচেষ্টাই নহে বরং খোদ সুসমাচারসমূহেও হযরত মারয়াম (আ)-এর প্রতি যথাযথ শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই।

যথা মথি লিখিত সুসমাচারে রহিয়াছে, "যখন তিনি জনতার নিকট এই সকল কথা বলিতেছিলেন এমন সময়ে দেখ, তাঁহার মাতা ও ভাই বাহিরে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলিতে চাহিতেছিলেন। কেহ তাঁহাকে বলিলঃ আপনার মাতা ও ভ্রাতারা বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং আপনার সহিত কথা বলিতে চাহিতেছেন। তিনি সংবাদদাতাকে উত্তরে বলিলেন, আমার মাতা কে? আমার ভ্রাতারাই বা কাহারা? পরে তিনি তাঁহার শাগরিদগণের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেনঃ এই দেখ, আমার মাতা ও আমার ভ্রাতারা; কেননা যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সেই আমার ভ্রাতা, ভগিনী ও মাতা (মথি, ১২ ঃ ৪৬-৫০, মার্ক, ৩ ঃ ৩১-৫; লূক, ৮ ঃ ৯-২১; আরও (দ্র. মথি ঃ ৩ ঃ ৫৫; মার্ক, ৬ ঃ ৩, লূক, ৩ ঃ ২৩)।

অথচ কুরআন কারীম, যাহা আল্লাহ তা'আলার শাশ্বত ও সংরক্ষিত বাণী, তাহাতে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের মারয়াম সম্পর্কে অপবাদ ও অসম্মান প্রদর্শনকে সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করিয়াছে এবং উভয় সম্প্রদায়ের ভুলগুলি চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে। হযরত মারয়াম (আ)-কে একজন মুত্তাকী, পবিত্র চরিত্রের অধিকারিনী, সতী সাধ্বী, ফেরেশতার সহিত বাক্যালাপকারিনী, সিদ্দীকা এবং অতি উচ্চতর

পর্যায়ের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের অধিকারিনী মহিলা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ৩ ঃ ৩৬-৩৭, ৪২, ৪৫)। সূরা আম্বিয়ায় হযরত মারয়াম (আ)-এর নির্মল অত্যুজ্জ্বল চারিত্রিক মাধুর্যের বর্ণনা আসিয়াছে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ঃ

وَالَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا اٰيَةً لِلْعَالَمِيْنَ .

"আর সেই নারী, যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর তাহার মধ্যে আমি আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাঁহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নির্দশন" (২১ ঃ ৯১)।

সূরা তাহরীমের একটি আয়াতে হযরত মারয়াম (আ)-এর ক্রিয়াকলাপকে এক মহান রূহানী ব্যক্তিত্বের গুণে ভূষিত করিয়া পেশ করা হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِيْنَ .

"(আল্লাহ আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন) ইমরান তনয়া মারয়ামের, যে তাহার সতীত্ব হিফাযত করিয়াছিল। ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়ছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; সে ছিল অনুগতদের একজন" (৬৬ ঃ ১২)।

অপরদিকে খৃস্টানগণ হযরত মারয়াম (আ)-কে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিশয় বাড়াবাড়ি করিয়া থাকে। তাহাদের শিল্প, সংগীত ও সাহিত্যে হযরত মারয়াম (আ) একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করিয়া আছেন। তাঁহার প্রশংসা ও প্রার্থনায় নিবেদিত হয় বিশেষ সংগীত। খৃস্টান জগত মারয়াম (আ) সম্পর্কে যে সকল ধারণার জন্ম দিয়াছে তাহাকে দর্শনে রূপ দিয়াছে যাহাকে Doctrine of Mary বা Mariology বলা হয়। যদিও এই ধারণাগুলি একদিনে গড়িয়া উঠে নাই (Encyclopaedia of Britanica, Vol. 14, P. 996)।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকায় ঐ দর্শনের আলোকে যুগে যুগে প্রাপ্ত তত্ত্বের ভিত্তিতে মারয়ামকে বিভিন্ন অভিধায় অভিহিত করা হইয়াছে। যেমন, কুমারী মাতা (Virgin mother), প্রভু মাতা (Mother of god) বা প্রভুর বাহক (God bearer), চির কুমারী (ever virgin), আদি পাপমুক্ত (Immaculate), স্বশরীরে স্বর্গে প্রবেশকারিনী (Assumed into the Heaven), (দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯৭)। The new Encyclopaedia of Britanica তে তাঁহাকে দ্বিতীয় হাওয়া (Second Eve) নামেও আখ্যায়িত করা হইয়াছে (১১খ., পৃ. ৫৬১)।

এইগুলি শুধু তাঁহার উপাধিই নহে, বরং খৃস্টানদের আকীদারও অংশ। এইজন্য তাঁহার প্রতি খৃস্টান চার্চ (রোমান ক্যাথলিক হউক বা অর্থোডক্স হউক) স্তুতিমূলক বিশেষ প্রার্থনা (Rosary)

পরিবেশন করিয়া থাকে। তাহা ছাড়া, মারয়ামের উদ্দেশ্যে তাহারা রোযা রাখে, ভক্তিমূলক ইবাদত (Devotional Services) করিয়া থাকে (প্রাগুক্ত)।

আল্লামা আলূসী উল্লেখ করেন যে, খৃস্টানদের মধ্যে মারয়ামপন্থী (مريمية) নামে এক উপদল ছিল। তাহারা ঈসা (আ)-কে ইলাহ বা মা'বূদ বলার পাশাপাশি মারয়াম (আ)-কেও ইলাহ বা মা'বুদ বলিয়া মান্য করিত (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ৬৫)। সম্ভবত তাহাদের দিকেই ইশারা করিয়া আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয় যে, খৃস্টানগণ মারয়ামকেও ইলাহ হিসাবে গ্রহণ করে। তাই হযরত ঈসা (আ)-কে সম্বোধন করিয়া তাহা খণ্ডন করা হইয়াছে ঃ

وَإِذْ قَالَ اللّٰهُ يَاعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ إِنَّكَ اَنْتَ عَلّٰمُ الْغُيُوْبِ. مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا اَمَرْتَنِىْ بِهِ إَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ.

"যখন আল্লাহ বলিবেন, হে মারয়াম তনয় 'ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার মাকে দুই ইলাহরূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে, তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই, তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তাহা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নই। তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই। তাহা হইল ঃ তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর যিনি আমার প্রভু আর তোমাদেরও প্রভু" (৫ ঃ ১১৬-১১৭)।

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ত্রিত্ববাদ (Trinity)-এর একটি অংশ হিসাবে মারয়ামকে অন্যতম ইলাহ মনে করে। John R. Hinnells সম্পাদিত Who's who of World Religions-এর তথ্য অনুসারে হযরত মারয়াম (আ)-কে মাদার অফ গড গণ্য করা হইয়াছে। ৪৩১ খৃস্টাব্দে খৃস্টানগণ আরো বিশ্বাস করে যে, পরকালে মানব মুক্তিতে ঈসার পাশাপাশি মারয়ামও ভূমিকা পালন করিবেন।

মোটকথা, মারয়াম (আ) খৃস্টান সমাজের আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত ও সংস্কৃতিতে এক বিরাট স্থান দখল করিয়া আছে। তাহাদের বিশ্বাসের সূচনা লূক সমাচারে উদ্ধৃত মারয়ামের একটি বাণীকে কেন্দ্র করিয়া (দ্র. লূক সুসমাচার, ১ ঃ ৪৮)। কিন্তু তাহারা তাহাকে সম্মান দিতে গিয়া সীমাতিক্রম করিয়াছে। প্রথমত, তাহারা তাঁহাকে প্রভু মাতা মনে করে, অতঃপর তাঁহাকে ইলাহ মনে করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে ইবাদত নিবেদন করা শুরু করে, যাহা মূলত শিরক। আল-কুরআন মারয়াম (আ)-কে যথাযথ সম্মান দিয়া খৃস্টানদের এই ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটন করিয়াছে।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) William Little, H.W. Fowler and Iessie Coulson, The Shorter Oxford English dictionary on historical priciple, vol. 2 (Oxford : clorind on 1973); (২) বাইবেল বঙ্গানুবাদ (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ১৯৯৩/৯৭); (৩) Colliers Encyclopedia, vol. 15 (NewYork : Macmillan Educational Corporation, 1977); (৪) The Encyclopedia Americana, vol. 18 (Danbury : Americana Corporation, 1979); (৫) আবুল কাসিম আল-হুসায়ন ইবন মুহাম্মাদ (রাগিব আল-ইসফাহানী হিসাবে পরিচিত), আল-মুফরাদাতু ফী গরীবিল কুরআন (বৈরূত, দারুল মারিফা, তা. বি.); (৬) আলাউদ্দীন আল-বাগদাদী, আল-খাযিন, লুবাবুত্-তাবীল ফী মা'আনিয়্যিত-তানযীল (তাফসীরে খাযিন হিসাবে প্রসিদ্ধ) (বৈরূত, দারুল মারিফা, তা. বি.); (৭) আবুল কাসিম জারুল্লাহ আয-যামাখশারী, আল-কাশশাফ (বৈরূত, দারুল মারিফা, তা. বি.); (৮) আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী আল-জামিলি-আহ্কামিল কুরআন (বৈরূত, দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল আরাবী , তা. বি.); (৯) কাযী ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, আত্-তাফসীরুল কবীর (বৈরূত, দারু ইহ্য়াইত তুরাছিল আরাবী, তা. বি.); (১০) শায়খ যাদাহ্, হাশিয়া আলা তাফসীরিল বায়দাবী (তাফসীরে বায়দাবীর উপর টীকা; মুলতান ঃ মাক্তাবা ইমদাদিয়া, তা. বি.); (১১) বায়দাবী, তাফসীর বায়দাবী (কলিকাতা, এম বশীর হাসান এন্ড সন্স, তা. বি.); ১২. ফীরোযাবাদী, আল-কামূসুল মুহীত; (১৩) ইমাম 'আবদুল্লাহ আহ্মদ ইব্ন মাহমূদ আন-নাসাফী, মাদারিকুত্ তানযীল ওয়া হাকায়িকুত্ তাবীল (তাফসীরে নাসাফী হিসাবে প্রসিদ্ধ, করাচী, কাদেমী কুতুবখানা, তা.বি.); (১৪) Encyclopaedia Britannica, vol.14 (Chicago : Ency. Britannica LTD,1962); (১৫) The New Encyclopaedia Britannica, vol.11, (Chicago : Encyclopaedia Britannica Inc. 1980); (১৬) মাও. আবুল কালাম আযাদ, তরজমানুল কুরআন, ৪খ, নয়াদিল্লী, সাতিয়া একাডেমী, ৩য় সং, ১৯৮০; (১৭) আবূ জাফর মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর তাবারী, জামিউল বায়ান ফী তাফসীরিল কুরআন, আরবী, বৈরূত ঃ দারুল মারিফা, ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ., ও বঙ্গানুবাদ তাফসীরে তাবারী শরীফ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৪; (১৮) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বঙ্গানুবাদ মাওলানা মহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৪; (১৯) ইব্নুল জাওযী, যাদুল মাসীর, (দামিশ্ক ঃ আল-মাক্তাবুল ইসলামী, ১ম সং, ১৩৮৪ হি./১৯৬৪ খৃ.); (২০) ইব্ন কাছীর, তাফ্সীরুল কুরআনিল আযীম (বৈরূত ঃ দারুল মারিফা, ১৪০০ হি./১৯৮০ খৃ.); (২১) ঐ, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (কায়রোঃ দারুদ দায়্যান, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.); (২২) ইবনুল আরাবী, আহ্কামুল কুরআন (বৈরূত ঃ দারুল মারিফা তা.বি.); (২৩) সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী, রূহুল মা'আনী (বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়াইত্ তুরাছিল আরাবী, তা.বি.); (২৪) মাও. হিফযুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৪খ., বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,

১৯৮৯ খৃ./১৪০৯ হি.); ২৫. ছানাউল্লাহ পানিপথি, তাফসীরে মাযহারী, বঙ্গানুবাদ ই.ফা.বা. ১৯৯৭ খৃ.; (২৬) কিরমানী, শারহি সহীহিল বুখারী, বৈরূত. দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১৪০১ হি./১৯৮১ খৃ.; (২৭) জাস্সাস, আহকামুল কুরআন, দামিশক ঃ দারুল ফিক্‌র তা.বি.; (২৮) ইসমাঈল হাক্কী, রূহুল বায়ান, বৈরূত, দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫ হি./১৯৮৫ খৃ.; (২৯) আবদুল হক হাক্কানী, তাফসীরে হাক্কানী, দিল্লী ঃ ইতিকাদ পাবলিকেশান্স হাউস, তা.বি.; (৩০) মাও. মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, উর্দু (৩খ. পৃ. ৬৩), দিল্লী ঃ মারকযী মাক্তাবা ইসলামী, ১৯৮২ খৃ.; (৩১) ইব্‌নুল আছীর, আল-কামিল ফিত্ তারীখ, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইসলামিয়া, ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.; (৩২) ইব্‌ন হাজার আসকালানী, ফাত্‌হুল বারী (বৈরূত), দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, ১৪০২ হি.; (৩৩) ইব্‌ন হাযম, আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়াল আহ্ওয়াই ওয়ান-নিহাল (৫খ, পৃ.১৭), বৈরূত, দারুল মারিফা, ১৩৯৫ হি./১৯৭৫ খৃ.; (৩৪) বদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল কারী, শারহু সাহীহিল বুখারী, বৈরুত. দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, তা.বি.; (৩৫) সুনান তিরমিযী, দিল্লী, কুতুবখানা রশীদিয়া, তা.বি; (৩৬) John R. Hinnclis, who's who of world Religions, London, Macmillan press, 1991।

ডঃ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

৩১

হযরত ঈসা (আ)

حضرت عيسى عليه السلام

হযরত ঈসা (আ)

হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের প্রেক্ষাপট

আল্লাহ্ তা'আলা ইসরাঈল জাতির হেদায়াতের জন্য এবং তাহাদের অবস্থার সংস্কার ও উন্নতির জন্য হযরত ঈসা (আ)-কে নবী ও রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও কঠোর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (اولو العزم) রাসূলগণের অন্যতম। সাইয়্যিদুনা নূহ, ইবরাহীম ও মূসা (আ)-এর মত তাঁহাকেও নূতন শরীআত প্রদান করিয়া সম্মানিত করা হইয়াছিল। বনূ ইসরাঈলের মধ্যে তিনিই সর্বশেষ নবী। বিশ্বে প্রচলিত সর্ববৃহৎ ধর্মগুলির অন্যতম খৃস্টান ধর্মের অনুসারিগণ তাঁহার অনুসারী বলিয়া দাবি করিয়া থাকে।

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসহাক (আ)-এর অন্যতম পুত্র ছিলেন ইয়াকূব (আ)। তিনিও নবী ছিলেন। তাঁহার অপর নাম ছিল ইসরাঈল। তাই তাঁহার বংশধরকে বনূ ইসরাঈল বলা হয়। পূর্ববর্তী যুগে মহান আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের মধ্যে অসংখ্য নবী প্রেরণ করিয়া জগৎময় তাহাদিগকে বিশেষ মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। এই বনূ ইসরাঈলের প্রথম নবী ছিলেন হযরত ইউসুফ (আ), আর শেষ নবী হইলেন হযরত ঈসা (আ)। তাঁহাদের মূল আবাসস্থল ছিল ফিলিস্তীন অঞ্চল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাহারা এই অঞ্চল ছাড়িয়া বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আবাসন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দেশে দুর্ভিক্ষের কারণে মিসরের শাসনকর্তা ইউসুফ (আ)-এর সময় তাহারা মিসরে চলিয়া গিয়াছিল কিন্তু পরবর্তীতে ফেরাউনদের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া দীর্ঘদিন পর হযরত মূসা (আ)-এর নেতৃত্বে ফিলিস্তীনের উদ্দেশে মিসর হইতে বাহির হইয়া আসে। কিন্তু তখন ফিলিস্তীনে দুর্ধর্ষ জাতি বসবাস করিত। তাহাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য মূসা (আ) আহবান জানান। তাহারা তাহাতে সাড়া দিতে অস্বীকার করে। ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সিনাই মরু অঞ্চলে তাহারা আবদ্ধ থাকে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে নূতন বংশধর সৃষ্টি হইলে আল্লাহর নবী ইউশা ইবন নূন (আ)-এর নেতৃত্বে তাহারা ফিলিস্তীন অঞ্চল তথা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করে। পরে হযরত দাউদ (আ)-এর সময়ে ফিলিস্তীনের অধিকাংশ অঞ্চল বনী ইসরাঈল-এর নিয়ন্ত্রণে আসে। খৃ. পূ. ৯৮৪ অব্দে হযরত সুলায়মান (আ) এই রাষ্ট্রকে সম্প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিয়া মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। আল্লাহর নির্দেশে তিনি এখানে বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদ নির্মাণ করেন। পিতৃপুরুষের নামানুসারে এই রাষ্ট্রের নাম রাখা হয় 'ইয়াহুদা'। খৃস্টপূর্ব ৯৩৭ অব্দে হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইন্তিকালের পর তাঁহার পুত্র রহবিয়াম ইয়াহুদা রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন। রহবিয়ামের ভ্রান্ত

শাসননীতি ও ব্যর্থতার সুযোগে রাষ্ট্রের দীনী চেতনা ও শাসনতান্ত্রিক দৃঢ়তায় ব্যাপক ধ্বস নামে। ইহাতে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। এই সময় সুলায়মান (আ)-এর এক প্রাক্তন কর্মচারী য়ারবিয়াম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ইসরাঈল নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে দীর্ঘদিনের জন্য বনী ইসরাঈল দুইটি শিবিরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উত্তরে ছিল ইসরাঈল রাষ্ট্র, যাহার রাজধানী ছিল সামেরিয়া (Samaria) এবং দক্ষিণে ছিল ইয়াহূদা রাষ্ট্র, যাহার রাজধানী ছিল জেরুসালেম।

তাহা ছাড়া মূর্তিপূজা, ব্যভিচার, হত্যা, রাহাজানি ইত্যাদি পাপকর্মে ইসরাঈলীরা প্রচণ্ডভাবে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছিল। তাহাদের সংশোধন করিবার উদ্যোগ নেওয়াই কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। এই লক্ষ্যে যখনই কোন হেদায়াতকারী তথা নবীকে পাঠানো হইত তখন তাহারা সেই আহবানকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করিত। এমনকি অনেক নবীকে তাহারা হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। তাই তাহাদের নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক বিশৃংখলা ও রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে তাহাদের আশেপাশের রাজ্যগুলির শাসকগণ তাহাদের উপর চড়াও হয়। ব্যাবিলন সম্রাট বখ্তনসর বনূ ইসরাঈলদের রাজ্য দখল করে। হায়কালে সুলায়মানী ধ্বংস করে, হাজার হাজার ইসরাঈলীকে হত্যা করে এবং বহু ইয়াহূদীকে গ্রেফতার করিয়া ব্যাবিলনে নিয়া যায়। খৃস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে পারস্য সম্রাট কৌরস কর্তৃক ব্যাবিলন হইতে মুক্তি ও খৃস্টপূর্ব ৪৫১ অব্দে হায়কাল পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইলেও পরবর্তীতে গ্রীক শাসকরা আবার ধ্বংসলীলা চালায়। অতঃপর খৃস্টপূর্ব ১৬৫ অব্দে সিরিয়ার শাসনকর্তা আনাতিয়াস আইপি ফিনেস বনূ ইসরাঈল তথা ইয়াহূদীদের উপর বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং তাহাদের ধর্মীয় গ্রন্থের সমস্ত কপি জ্বালাইয়া দেয়। অতঃপর খৃস্টপূর্ব ৬৩ অব্দে রোমানরা ফিলিস্তীন দখল করিয়া লয়। ইসরাঈলীদের পাপ-পংকিলতা, ভ্রষ্টতা ও আল্লাহ কর্তৃক বারবার দণ্ডারোপের বিষয়টি এমনকি বাইবেলেও উদ্ধৃত হইয়াছে (দ্র. বর্তমান বাইবেল পুরাতন নিয়ম, হোশেয় ১, ৪৭, আমোষ, ৮, মীখা ১, ২, ৩, সকনিয় ১,৩ ইত্যাদি)।

সম্ভবত ইসরাঈলীদের এ অবস্থার কথা আল-কুরআনেও নিম্নোক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَاِذْ تَاَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَّسُوْمُهُمْ سُوْٓءَ الْعَذَابِ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ. وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ. وَقَطَّعْنٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اُمَمًا مِنْهُمُ الصّٰلِحُوْنَ وَمِنْهُمْ دُوْنَ ذٰلِكَ وَبَلَوْنٰهُمْ بِالْحَسَنٰتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন যে, তিনি তো কিয়ামত পর্যন্ত তাহাদিগের উপর এমন লোকদিগকে প্রেরণ করিবেন যাহারা তাহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকিবে, আর তোমার প্রতিপালক তো শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়ও। দুনিয়ায় আমি তাহাদিগকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করি, তাহাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ এবং মঙ্গল ও অমঙ্গল দ্বারা আমি তাহাদিগকে পরীক্ষা করি, যাহাতে তাহারা প্রত্যাবর্তন করে" (৭ ঃ ১৬৭-১৬৮)।

যাহা হউক ইসরাঈলীদের ঐ ধরনের রাজনৈতিক নিপীড়ন ভোগ এবং ধর্মীয় ও নৈতিক স্খলনের করুণ অবস্থায় তাহারা মনেপ্রাণে একজন ত্রাণকর্তার আবির্ভাব কামনা করিত এবং কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে উহার জন্য দুআ করিত। বিশেষ করিয়া, হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বক্ষণে সেই চেতনা ও আকাংক্ষা আরও প্রকট আকার ধারণ করে। ঈসা (আ)-এর সময়ে রাজনৈতিকভাবে ইসরাঈলীগণ রোমান সাম্রাজ্যের অধীন ছিল। তখনকার রোমান সম্রাট ছিল অগাষ্টাস (Augutus)। তাহার শাসন কাল ছিল ৩০ খৃ. পূ. হইতে ১৪ খৃ. পর্যন্ত। তাহার পর রোমান সম্রাট হয় তিবিরিয়াস (Tiberius), তাহার শাসনকাল ১৪ হইতে ৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত।

আর পণ্ডীয় পীলাত নামে একজন রোমীয় লোক ফিলিস্তীনের শাসনকর্তা ছিলেন। রোম রাজ্যের সম্রাট কায়সার অনেক দূরে রোম শহরে বসি করিতেন। ইয়াহূদীরা স্বাধীনতা ভালবাসিত বলিয়া রোম সরকারকে ভাল চোখে দেখিত না। রোম সরকারের অধীন ছিল বলিয়া ইয়াহূদী নেতাদের হাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ইয়াহূদীদের মধ্যে এক চালাক প্রকৃতির লোক ছিল যাহার নাম হেরদ (Herod)। সে রোমান আঞ্চলিক শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবে এমন একজন ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে ইয়াহূদীদের রাজা (king of Jews) হিসাবে নিয়োগের জন্য রোমান সম্রাটকে প্রভাবিত করে এবং নিজেই ইয়াহূদীদের রাজা হইয়া যায়। তাহার সময়কাল ৩৭-৪ খৃ. পূ. (The new Encyclopaedia Britannica, vol. 10, p. 146)। তাহাদের আমলে ফিলিস্তীন অঞ্চল প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত ছিল।

(১) ইয়াহূদীয়া প্রদেশ ঃ ইহা ফিলিস্তীনের দক্ষীণ দিকের একটি প্রদেশ। শুকনা পাথুরে একটি মরু এলাকা। তবুও ইহা অন্যান্য প্রদেশ হইতে উন্নত ছিল। এই প্রদেশে জেরুসালেম ও বেথেলহাম অবস্থিত।

(২) সামারিয়া প্রদেশ ঃ ইহা ভূমধ্য সাগরের তীর ঘেঁষিয়া ইয়াহূদীয়া প্রদেশের উত্তরাঞ্চল, এই এলাকার লোকজনকে সামরিয়া বলা হইত। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা ইয়াহূদী হইলেও অ-ইয়াহূদীদের বিবাহ করিবার ফলে তাহারা একটি মিশ্র জাতিতে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। যদিও তাহাদের ধর্ম অনেকাংশে ইয়াহূদী ধর্মের মত, তবুও আসলে তাহা ছিল আলাদা। এই দুইটি কারণে ইয়াহূদীরা তাহাদের ঘৃণা করিত এবং তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করিত না।

(৩) গালীল বা জালীল প্রদেশ ঃ ইহা সামারিয়া প্রদেশের উত্তরে পাহাড়ী অঞ্চল। এই প্রদেশেই নাসারত নামে জনপল্লী অবস্থিত। ভারত, ইরাক, সিরিয়া হইতে মিসর তথা উত্তর আফ্রিকার সহিত সংযোগকারী যে আন্তর্জাতিক রাস্তাটি ছিল তাহা ঐ প্রদেশ ঘেঁষিয়াই চলিয়া গিয়াছে (Encyclopaedia Americana, vol.-16, p. 42)।

মোটকথা, ঈসা (আ)-এর আগমনের সন্ধিক্ষণে তাহারা রাজনৈতিক দিক দিয়া শতধা বিভক্ত ছিল। Encyclopaedia Britannica -র বর্ণনা অনুসারে তাহারা ছিল নির্বীর্য ও দলাদলিতে লিপ্ত। তাই সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী শক্তির কোপানলে পড়া ছিল স্বাভাবিক। যদিও তাহাদের দেশপ্রেমিক কিছু কিছু ব্যক্তি ছিল যাহারা কখনও কখনও রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বসিত (মার্ক লিখিত সুসমাচার, ১৫ ঃ ৭, ৮)।

রাজনৈতিক অবস্থার মত তাহাদের ধর্মীয় অবস্থাও ছিল খুবই শোচনীয়। তাহাদের সমাজে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও মূর্খতা বিরাজমান ছিল। ইয়াহূদী সম্প্রদায় বিভিন্ন পাপাচার ও অপরাধজনক কর্মে লিপ্ত ছিল। শত শত বৎসরের চিন্তাধারায় বন্ধ্যাত্ব এবং শিক্ষা বিমুখতা তাহাদিগকে জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। তাহারা ধর্মের প্রকৃত মর্ম ও তাৎপর্য অনুধাবন ও আল্লাহ্র বিধি-বিধানের অনুসরণের পরিবর্তে লোকাচার ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানাদিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করিত (ইমাম মুহাম্মাদ আবু যুহ্রা, মুহাদিরাত ফিন-নাসরানিয়্যা, পৃ. ২২১)। হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের সময় ইয়াহুদীগণ নিম্নলিখিতকয়েকটি দলে বিভক্ত ছিল।

১. সাদুকী ঃ তাহারা বলিত, মানুষের ভালমন্দ কাজের ফল এই দুনিয়াতেই সে পাইবে, আখিরাতে নহে, অন্য কথায় তাহারা পরকালে অবিশ্বাসী ছিল। তাহাদের এই বিষয়টি এমনকি বর্তমান খৃস্টানদের স্বীকৃত বাইবেলেও একাধিকবার উল্লেখ করা হইয়াছে (লূক লিখিত সুসমাচার, ২০ ঃ ২৭; ২৮; মথি লিখিত সুসমাচার, ২২ ঃ ২৪)। তাহারা অনেকটা বস্তুবাদী ছিল, বৈষয়িক ভোগবিলাসে মত্ত থাকিত। এই কারণে তাহারা ইবাদতখানা তথা হায়কালে সুলায়মানী এবং সরকার উভয় দিকের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়োজিত। (২) ফরীসী ঃ এই ফেরকার অনুসারীরা সাদুকীর চাইতেও সংখ্যায় বেশি ছিল। ইহারা সর্বপ্রকার ভোগবিলাস হইতে বিমুখ থাকাকেই মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করিত। রাষ্ট্রীয় কোন পদ বা বিত্তশালী হওয়াকে পছন্দ করিত না, নিজেদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ও আল্লাহ্র মনোনীত লোক হিসাবে মনে করিত (আবদুল ওয়াহীদ খান, ঈসাইয়্যাত, পৃ. ১২)। ধর্মীয় বিভিন্ন বিধিবিধান ও ইবাদত প্রচার-প্রচারণায় কঠোর ভূমিকা পালন করিত। হায়কালে সুলায়মানীর প্রতি তেমন আকৃষ্ট থাকিত না, তাহা সত্ত্বেও খোদার রাজ্য ফিরাইয়া নিতে দাউদ বর্ণিত 'মাসীহ' আগমনের আকীদা প্রচণ্ডভাবে হৃদয়ের মাঝে লালন করিত। হায়কালের প্রতি তেমন আগ্রহ না দেখাইয়া নিজেদের বাড়িতেই তাহাদের ধর্মীয় উৎসবাদি পালন করিত। এতদসত্ত্বেও তাহারা নানাবিধ অসাধু কর্মে লিপ্ত থাকিত।

(৩) আসেনীয় ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক যুগে ইয়াহূদীদের একটি ধর্মীয় গোপন দল। তাহারা তাহাদের ইবাদত ও ধর্মীয় উৎসবের আলাদা পন্থা অবলম্বন করিত, তাহাদের সাংগঠনিক ভিত্তি অত্যন্ত মজবুত ছিল। কিন্তু ইহা গোপন দল হওয়ার কারণে মাওলানা আবদুল ওয়াহিদ খান উল্লেখ করেন, এই সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক রোগের মুক্তি সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক বলিয়া দাবি করিত। তাহারা যুদ্ধ পছন্দ করিত না, অস্ত্র ধরাকে খুব খারাপ মনে করিত। মৃত্যুর পর জীবন, কিয়ামত, হাশর এইগুলির উপর তাহারা বিশ্বাস রাখিত। তাহাদের নাজাত ও মুক্তির জন্য একজন মাসীহ-এর আগমনের অপেক্ষায় থাকিত (আবদুল ওয়াহিদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১২)।

কিন্তু সম্প্রতি ১৯৪৭ সালে মৃত সাগরে (Dead Sea) ঐ সম্প্রদায়ের কিছু লিখিত দলিল-দস্তাবেজ পাওয়া যায় যাহাকে (Dead sea scrolls) হিসাবে নামকরণ করা হইয়াছে। উহার

মাধ্যমে ঐ সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য উদঘাটিত হইয়াছে। বার বার যখন সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ইয়াহূদীদের ইবাদতখানা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইতেছিল এবং ইয়াহূদীদের রাজ্য দখল করিয়া নেওয়া হইতেছিল, সেই বিদেশী আগ্রাসন মুকাবিলার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য তাহারা গহীন বন জঙ্গলে জীবন যাপন করিতেছিল। এই মুজাহিদ বাহিনীর দলকে তাহাদের শত্রুরা Zealot নামে আখ্যা দিত (দ্র. দি নিউ এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার ভাষ্য অনুসারে হযরত ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ) ঐ দলের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।

ইয়াহূদী ও অসুরীয়দের যৌথ রক্তের মিশ্রণে গড়িয়া ওঠা সামেরী সম্প্রদায়ও নিজেদের আকীদা বিশ্বাসে আসল ইসরাঈলী হিসাবে মনে করিত। অন্যদেরকে ইয়াহূদী হিসাবে মানিয়া নিলেও ইসরাঈলী হিসাবে মানিয়া লইত না। এইজন্য তাহারা বায়তুল মুকাদ্দাসে আলাদা ইবাদতখানা তৈয়ারী করিয়া তাহাকে কেবলা, যিয়ারতের কেন্দ্রস্থল এবং হজ্জ অনুষ্ঠানের আয়োজনের আকাংখা করিত। এবং সেই কারণে জুযীম-এ এক ইবাদতখানা নির্মাণ করিয়াছিল এবং বায়তুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করিবার চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু ইহাতে সফলকাল হয় নাই (আবদুল ওয়াহীদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩)। যাহা হউক ইয়াহূদী সমাজে ধর্মীয় দিক দিয়া যাহারা নেতৃত্ব দিত এবং তাহাদের ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যার মাধ্যমে বিকৃতি সাধনে লিপ্ত থাকিত তাহারা হইল আহবার ও রিব্বীগণ। জনগণের মধ্যে তাহারা খুবই প্রভাবশালী ছিল।

আহবার (أحبار) বা ধর্মযাজক ইয়াহূদী ধর্মের হর্তাকর্তা হইয়া বসিয়াছিল, তাহারা যাহা ইচ্ছা হালাল করিত এবং যাহা ইচ্ছা হারাম করিত। তাওরাতের বিকৃতিতে ইহাদের প্রধান ভূমিকা ছিল। এতদ্ব্যতীত তাহাদের ধর্মীয় জ্ঞান ও নৈতিকবোধের এত অবক্ষয় হইয়াছিল যে, সুলায়মান (আ)-এর মসজিদকে তাহারা ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছিল। হযরত ঈসা (আ) ইয়াহূদী ধর্মযাজকদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন ঃ "তোমরা এই উপাসনালয়কে দস্যুদের আখড়া করিয়াছ" (মথি, ২১ ঃ ১২-১৩)।

বস্তুত তাহারা ধর্মকে একটি ব্যবসায়ে পরিণত করিয়াছিল। তাহারা ছিল নির্দয় ও কঠোর। দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিদের জন্য তাহাদের মনে কোন সমবেদনার উদ্রেক হইত না (ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলা, ইফাবা, ৫খ, পৃ. ৫১২)।

তাহা ছাড়া রিব্বীরা ছিল ইয়াহূদী শিক্ষকমণ্ডলী। ইয়াহূদী এলাকায় বিভিন্ন মজলিস প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যেখানে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় আলোচনা-পর্যালোচনা ও শিক্ষা দেওয়া হইত এবং ধর্মীয় রায় ঘোষণা দেওয়া হইত। ইহার পাশাপাশি সেখানে তাওরাত শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা ছিল। ইহার শিক্ষকগণকে রিব্বী বলা হয়। আহবারের পাশাপাশি ধর্মীয় অপব্যাখ্যা প্রদান করিয়া রিব্বীগণও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করার জন্য সতত চেষ্টা করিত।

কাহিন বা ভবিষ্যৎ বক্তা হিসাবেও কিছু কিছু ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে ছিল। তাহারা উপাসনার কর্মকাণ্ডে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিবর্তে সম্পদ আহরণকেই একমাত্র লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করিয়াছিল। মোটকথা তৎকালীন ইয়াহূদীরা সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে

অশিক্ষা, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, হত্যা, রাহাজানি ইত্যাদির সয়লাব বহিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে প্রভাবশালী ধর্মীয় অভিজাত শ্রেণী জন্ম নিয়াছিল। সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক দিকে লক্ষ্য করিলেও দেখা যায়, ইয়াহূদী সমাজে হেলেনেষ্টিক তথা গ্রীক সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রচণ্ডভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল। সেই অঞ্চলের ভাষা হিব্রু, এরামিক বা সুরিয়ানী হইলেও সরকারীভাবে গ্রীক ভাষায় কাজ-কর্ম চলিত। এইজন্য ঐতিহাসিক গবেষণায় দেখা যায়, বাইবেলের অধিকাংশ লেখক গ্রীক ভাষায় তাহাদের গ্রন্থ রচনা বা অনুবাদ করিয়াছিলেন। আর শিক্ষিত সমাজেও গ্রীক দর্শন ও ভাষার বিরাট প্রভাব ছিল। আর হিব্রু ভাষা ইয়াহূদী ধর্মীয় পণ্ডিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমন কি তাহা মৃত ভাষায় পর্যবসিত হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ জনগণ সুরিয়ানী ভাষাতেই অভ্যস্ত ছিল। তবে ফিলিস্তীনের সাধারণ অধিবাসীরা সুরিয়ানী ভাষায় একটা উপভাষা ব্যবহার করিত যাহার স্বর, উচ্চারণ ভংগি ও কথন দিমাশক এলাকায় ব্যবহৃত সুরিয়ানী হইতে ভিন্নতর ছিল। এই দেশের জনগণ গ্রীক ভাষা একেবারেই জানিত না। ৭০ খৃস্টাব্দে জেরুসালেম দখল করার পর রোমীয় সেনাধ্যক্ষ টিটাস (Titus) জেরুসালেমবাসীদের সম্মুখে গ্রীক ভাষায় ভাষণ দিয়াছিলেন। ফলে উহা সুরিয়ানী ভাষায় তরজমা করিতে হইয়াছিল (সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, ১৭খ, পৃ. ১০১)।

কুরআন ও হাদীসে হযরত ঈসা (আ)

হযরত ঈসা (আ) যুগে যুগে প্রেরিত নবীগণের অন্যতম মহান নবী। তাই ইসলামের মৌলিক উৎস কুরআন-হাদীসেও তাঁহার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এমনকি পূর্ববর্তী আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে আল-কুরআনে যাহাদের কথা বেশী বেশী আলোচনায় আসিয়াছে, তন্মধ্যে হযরত ঈসা (আ) অন্যতম।

কুরআন মজীদে হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত পাওয়া না গেলেও তাঁহার জীবন-প্রবাহের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ও ঘটনাবলী বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু তাঁহার পূত-পবিত্র জীবনের উপক্রমণিকা হিসাবে তাঁহার মা হযরত মরিয়ম (আ)-এর জীবনের ঘটনাবলীও তুলিয়া ধরা হইয়াছে। আলোচনার স্থানগুলি ছকে দেখানো হইল ঃ

ক্রমিক	সূরার	সূরা ও আয়াতের	যে নামের উল্লেখ আছে				
সংখ্যা	নাম	ক্রমিক সংখ্যা	ঈসা	মসীহ	আব্দুল্লাহ	ইব্ন মারয়াম	মোট আয়াত
১।	বাকারা	২ ঃ ৮৭, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ২৫৩	৩			২	৫
২।	আল ইমরান	৩ ঃ ৪২-৬৪, ৮৪	৫	১		১	২৪
৩।	নিসা	৪ ঃ ১৫৬-১৫৯, ১৭১-১৭২	৩	৩		২	৬
৪।	মাইদা	৫ ঃ ১৭-৪৬, ৭২, ৭৫, ৭৮, ১১০, ১২০	৬	৫	১০	১৮	
৫।	আন'আম	৬ ঃ ৮৫	১				১
৬।	তাওবা	৯ ঃ ৩০-৩১		১		১	২

ক্রমিক সংখ্যা	সূরার নাম	সূরা ও আয়াতের ক্রমিক সংখ্যা	যে নামের উল্লেখ আছে ঈসা	মসীহ	আবদুল্লাহ	ইব্‌ন মারয়াম	মোট আয়াত
৭।	মারয়াম	১৯ ঃ ১৬-৩৫	১	১	১	১	১৯
৮।	মুমিনূন	২৩ ঃ ৫০				১	১
৯।	আহ্‌যাব	৩৩ ঃ ৭-৮	১			১	২
১০।	শূরা	৪২ ঃ ১৩					১
১১।	যুখরুফ	৪৩ ঃ ৫৭-৬৩	১			১	২
১২।	হাদীদ	৫৭ ঃ ২৭	১			১	১
১৩।	সাফ	৬১ ঃ ৬-১৪	২			২	২
		মোট	২৫	১১	১	২৩	

কুরআন কারীমের মোট ১৩টি সূরায় তাঁহার ও তাঁহার মায়ের আলোচনা আসিয়াছে। সেই সূরাগুলির ক্রমানুসারে তাঁহার সম্পর্কে আয়াতসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهٖ بِالرُّسُلِ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ اَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لاَ تَهْوٰى اَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ.

"এবং নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব দিয়াছি এবং তাহার পরে পর্যায়ক্রমে রাসূলগণকে প্রেরণ করিয়াছি, মারয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছি এবং পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। তবে কি যখনই কোন রাসূল এমন কিছু আনিয়াছে যাহা তোমাদের মনঃপূত নহে তখনই তোমরা অহংকার করিয়াছ আর কতককে অস্বীকার করিয়াছ এবং কতককে হত্যা করিয়াছ" (২ ঃ ৮৭)?

قُوْلُوْآ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰي وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِىَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ.

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহতে ঈমান রাখি এবং যাহা আমাদের প্রতি এবং ইব্‌রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকূব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হইয়াছে এবং যাহা তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীগণকে দেওয়া হইয়াছে। আমরা তাহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণকারী" (২ ঃ ১৩৬)।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ وَلٰكِنِ اخْتَلَفُوْا فَمِنْهُمْ مَنْ اٰمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا اقْتَتَلُوْا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ.

"এই রাসূলগণ, আমি তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ কথা বলিয়াছেন, আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মারয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা দ্বারা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের পরবর্তীরা তাহাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ সমাগত হওয়ার পর পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল। ফলে তাহাদের কতক বিশ্বাস করিল এবং কতক কুফরী করিল। আল্লাহ্ ইচ্ছা করিলে তাহারা পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত না; কিন্তু আল্লাহ যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন" (২ ঃ ২৫৩)।

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا
وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۰ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۰ قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ
يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ۰ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ
وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَرَسُوْلاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ
الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۰ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ
يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِاُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۰ اِنَّ اللّٰهَ
رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۰ فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ
الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ۰ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا
مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ۰ وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ ۰ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى اِنِّىْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ اِلَىَّ
وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ
بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ۰ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ
نّٰصِرِيْنَ ۰ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ۰

"স্মরণ কর, যখন ফেরেশতাগণ বলিল, হে মারয়াম! আল্লাহ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কলেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ্, মারয়াম তনয় ঈসা, সে ইহলোক ও পরলোকে সম্মানিত এবং সন্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন। সে বলিল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কিভাবে ? তিনি বলিলেন, এইভাবেই, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল এবং তাহাকে বনী ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন। সে বলিবে, আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের

নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষীসদৃশ আকৃতি গঠন করিব, অতঃপর উহাতে আমি ফুৎকার দিব, ফলে আল্লাহ্‌র হুকুমে উহা পাখি হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্‌র হুকুমে মৃতকে জীবন্ত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর ও মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মুমিন হও তবে উহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে। আমি আসিয়াছি তোমাদের সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তাহাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতগুলিকে বৈধ করিতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত করিবে। ইহাই সরল পথ। যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, আল্লাহ্‌র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী? হাওয়ারীগণ বলিল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্যদানকারীদের তালিকাভুক্ত কর। আর তাহারা চক্রান্ত করিয়াছিল, আল্লাহও কৌশল করিয়াছিলেন, আল্লাহ কৌশলীদের শ্রেষ্ঠ। স্মরণ কর, যখন আল্লাহ বলিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে পবিত্র করিতেছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি। অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব। যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ইহকালে ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই। আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম করিয়াছে, তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন। আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না" (৩ ঃ ৪৫-৫৭)।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ·

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল" (৩ ঃ ৫৯)।

قُلْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِىَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ·

"বল, আমরা আল্লাহ্‌তে এবং আমাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে এবং ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়া'কূব ও তাঁহার বংশধরগণের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং যাহা মূসা ও অন্যান্য নবীগণকে তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে প্রদান করা হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছি, আমরা তাহাদের মধ্যে কোন তারতম্য করি না এবং তাঁহারই নিকট আত্মসমর্পণকারী" (৩ ঃ ৮৪)।

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلٰى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيْمًا ٠ وَقَوْلِهِمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيْحَ عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَاِنَّ الَّذِيْنَ اخْتَلَفُوْا فِيْهِ لَفِيْ شَكٍّ مِّنْهُ مَالَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ اِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ٠ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ٠ وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكُوْنُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا ٠

"এবং তাহারা লানত গ্রস্ত হইয়াছিল তাহাদের কুফুরীর জন্য ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের জন্য, আর আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মারয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি তাহাদের এই উক্তির জন্য। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই, কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার বিরুদ্ধে মতভেদ করিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই বরং আল্লাহ্ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন; এবং আল্লাহ্ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে" (৪ ঃ ১৫৬-১৫৯)।

اِنَّا اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰى وَاَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَهٰرُوْنَ وَسُلَيْمٰنَ وَاٰتَيْنَا دَاوٗدَ زَبُوْرًا ٠

"আমি তোমার নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি, যেমন নূহ এবং তাহার পরবর্তী নবীগণের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম, ইবরাহীম, ইয়া'কূব, ইসমাঈল, ইসহাক ও তাহার বংশধরগণ, ঈসা, আইয়ব, ইউনুস, হারূন এবং সুলায়মানের নিকটও ওহী প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং দাউদকে যাবূর দিয়াছিলাম" (৪ঃ ১৬৩)।

يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ٠ لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ٠

"হে কিতাবীগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না এবং আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মারয়াম তনয় ঈসা মসীহ তো আল্লাহ্‌র রাসূল এবং তাঁহার বাণী, যাহা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলে ঈমান আন এবং বলিও না, তিন। নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ তো একমাত্র ইলাহ, তাঁহার সন্তান হইবে—তিনি ইহা হইতে পবিত্র। আসমানে যাহা কিছু আছে ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহরই, কর্ম বিধানে আল্লাহই যথেষ্ট। মসীহ্ আল্লাহর বান্দা হাওয়াকে কখনো হেয়

জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও করে না। আর কেহ তাঁহার ইবাদতকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাহার নিকট একত্র করিবেন" (৪ ঃ ১৭১-১৭২)।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُّهْلِكَ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ·

"যাহারা বলে, মারয়াম তনয় মসীহই আল্লাহ, তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। বল, আল্লাহ মারয়াম তনয় মসীহ, তাহার মাতা এবং দুনিয়ার সকলকে যদি ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাঁহাকে বাঁধা দিবার শক্তি কাহার আছে ? আসমানসমূহে ও যমীনে এবং ইহাদের মধ্যে যাহা কিছু আছে তাহার সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই। তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান" (৫ঃ১৭)।

وَقَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ · وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ·

"মারয়াম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইন্‌জীল দিয়াছিলাম, ইহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো। ইনজীল অনুসারিগণ যেন আল্লাহ উহাতে যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে বিধান দেয়। আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে যাহারা বিধান দেয় না তাহারা সত্যত্যাগী" (৫ ঃ ৪৬-৪৭)।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْآ اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ · اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ · مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ·

"যাহারা বলে, আল্লাহই মারয়াম তনয় মসীহ। তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই। অথচ মসীহ বলিয়াছেন, হে বনূ ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। কেহ আল্লাহর শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই। যাহারা বলে, আল্লাহ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা কুফরী করিয়াছেই—যদিও এক ইলাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি

আপতিত হইবেই। তবে কি তাহারা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না ? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। মারয়াম তনয় মসীহ্ তো কেবল একজন রাসূল; তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, আমি উহাদের জন্য আয়াতসমূহ কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি। আরও দেখ, উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়" (৫ ঃ ৭২-৭৫)।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ. كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

"বনী ইসরাঈলের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা দাঊদ ও মারয়াম তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছিল। ইহা এই হেতু যে, তাহারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তাহারা যেসব গর্হিত কার্য করিত উহা হইতে তাহারা একে অন্যকে বারণ করিত না। তাহারা যাহা করিত তাহা কতই না নিকৃষ্ট" (৫ ঃ ৭৮-৭৯)।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰى ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُوْنَ .

"অবশ্যই মুমিনদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহূদী ও মুশরিকদিগকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখিবে এবং যাহারা বলে, 'আমরা খৃস্টান' মানুষের মধ্যে তাহাদিগকেই তুমি মুমিনদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখিবে। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত ও সংসারবিরাগী আছে, আর তাহারা অহংকারও করে না" (৫ ঃ ৮২)।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْ اِسْرَاۤئِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ .

"এবং যখন আল্লাহ বলিলেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ করঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে, তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়াছিলাম, তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখি হইয়া যাইত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করিতে। আমি তোমা হইতে বনী ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম। তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু" (৫ ঃ ১১০)।

وَاِذْقَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلاَ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ. مَاقُلْتُ لَهُمْ اِلاَّ مَا اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ .

"আল্লাহ যখন বলিবেন, "হে মার্‌ইয়াম তনয় 'ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর?" সে বলিবে, "তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি; তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত।" তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই, তাহা এই ঃ "তোমরা আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র 'ইবাদত কর এবং যত দিন আমি তাহাদের মধ্যে ছিলাম তত দিন আমি ছিলাম তাহাদের কার্যকলাপের সাক্ষী, কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ববিষয়ে সাক্ষী।" "তুমি যদি তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৬-১১৮)।

وَزَكَرِيَّا وَيَحْيٰى وَعِيْسٰى وَاِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

"এবং যাকারিয়্যা, ইয়াহ্‌ইয়া, ঈসা এবং ইলয়াসকেও সৎপথে পরিচালিত করিয়াছিলাম; ইহারা সকলে সজ্জনদিগের অন্তর্ভুক্ত" (৬ ঃ ৮৫)।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُنِ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ . اِتَّخَذُوْا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَالْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ اُمِرُوْآ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْآ اِلٰهًا وَّاحِدًا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

"ইয়াহূদীরা বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র। ইহা তাহাদের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফরী করিয়াছিল উহারা তাহাদের মত কথা বলে। আল্লাহ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। আর কোন্ দিকে উহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে! তাহারা আল্লাহ ব্যতীত তাহাদের পণ্ডিতগণকে ও সংসার বিরাগিগণকে তাহাদের প্রভুরূপে গ্রহণ করিয়াছে এবং মারয়াম তনয় মসীহকেও। কিন্তু উহারা এক ইলাহের ইবাদত করিবার জন্যই আদিষ্ট হইয়াছিল। তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। তাহারা যাহাকে শরীক করে তাহা হইতে তিনি কত পবিত্র" (৯ ঃ ৩০-৩১)!

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا · فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا
رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا · قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا · قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ
لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا · قَالَتْ اَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلٰمٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِيْ بَشَرٌ وَّلَمْ اَكُ بَغِيًّا · قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ
عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا · فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَكَانًا قَصِيًّا · فَاَجَآءَهَا
الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِيْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا · فَنَادٰىهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلَّا تَحْزَنِيْ
قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا · وَهُزِّيْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا · فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ
عَيْنًا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيْٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا · فَاَتَتْ بِهٖ قَوْمَهَا
تَحْمِلُهٗ قَالُوْا يٰمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا · يٰٓاُخْتَ هٰرُوْنَ مَا كَانَ اَبُوْكِ امْرَاَ سَوْءٍ وَّمَا كَانَتْ اُمُّكِ بَغِيًّا · فَاَشَارَتْ
اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا · قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا · وَّجَعَلَنِيْ
مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا · وَّبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ·
وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا · ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِيْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ·
مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ · وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ·

“বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারয়ামের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্বদিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল, অতঃপর উহাদিগ হইতে সে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম। সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল। মারয়াম বলিল, তুমি যদি আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আমি তোমা হইতে দয়াময়-এর শরণ লইতেছি। সে বলিল, আমি তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য। মারয়াম বলিল, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি ? সে বলিল, এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন এবং আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ। ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার। তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করিল, অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল। প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, হায় ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম! ফেরেশতারা তাহার নিম্নপার্শ্ব হইতে আহবান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড নাড়া দাও, উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান

করিবে। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও। মানুষের মধ্যে কাহাকেও যদি তুমি দেখ তখন বলিও, আমি দয়াময়ের উদ্দেশে মৌনতা অবলম্বনের মানত করিয়াছি। সুতরাং আজ আমি কিছুতেই কোন মানুষের সহিত বাক্যালাপ করিব না। অতঃপর সে সন্তানকে লইয়া তাহার সম্প্রদায়ের নিকট উপস্থিত হইল। উহারা বলিল, হে মারয়াম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করিয়া বসিয়াছ। হে হারূন ভগ্নি! তোমার পিতা অসৎ ব্যক্তি ছিল না এবং তোমার মাতাও ছিল না ব্যভিচারিণী। অতঃপর মারয়াম সন্তানের প্রতি ইংগিত করিল। উহারা বলিল, যে কোলের শিশু তাহার সহিত আমরা কেমন করিয়া কথা বলিব? সে বলিল, আমি তো আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে, আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব। এই-ই মারয়াম তনয় ঈসা। আমি বলিলাম সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নহে; তিনি পবিত্র, মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। আল্লাহ্ আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং তোমরা তাঁহার ইবাদত কর, ইহাই সরল পথ" (১৯ : ১৬-৩৬)।

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ أٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَآ اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ٠

"এবং আমি মারয়াম তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে" (২৩ : ৫০)।

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيّٖنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ٠

"স্মরণ কর যখন আমি নবীদের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারয়াম তনয় ঈসার নিকট হইতেও। তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অংগীকার" (৩৩ : ৭)।

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ اَللّٰهُ يَجْتَبِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَيَهْدِيْٓ اِلَيْهِ مَنْ يُّنِيْبُ ٠

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করিয়াছেন দীন, যাহার নির্দেশ দিয়াছিলেন তিনি নূহকে আর আমি যাহা ওহী করিয়াছি তোমাকে এবং যাহার নির্দেশ দিয়াছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে, এই বলিয়া যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং উহাতে মতভেদ করিও না। তুমি মুশরিকদিগকে যাহার প্রতি আহবান করিতেছ তাহা উহাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়। আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা দীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁহার অভিমুখী তাহাকে দীনের দিকে পরিচালিত করেন" (৪২ : ১৩)।

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ ۰

"যখন মারয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল আরম্ভ করিয়া দেয়" (৪৩ ঃ ৫৭)।

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ ۰

"সেতো ছিল আমারই এক বান্দা যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বনী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত" (৪৩ ঃ ৫৯)।

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ۰ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ۰ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۰

"ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল তখন সে বলিয়াছিল, আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে কতক বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ্ই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; ইহাই সরল পথ। অতঃপর উহাদের বিভিন্ন দল মতানৈক্য সৃষ্টি করিল; সুতরাং জালিমদের জন্য দুর্ভোগ মর্মন্তুদ দিবসের শাস্তির" (৪৩ ঃ ৬৩-৬৫)।

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةَ ۰ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۰

"অতঃপর আমি তাহাদেরকে পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম তনয় ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইনজীল এবং তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দায়। কিন্তু সন্ন্যাসবাদ— ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল। আমি উহাদিগকে ইহার বিধান দেই নাই। অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই। উহাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছিল, উহাদিগকে আমি— দিয়াছিলাম পুরস্কার এবং উহাদের অধিকাংশই সত্যত্যাগী" (৫৭ ঃ ২৭)।

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۰

"স্মরণ কর, মারয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, হে বানূ ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার

সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদের নিকট আসিল তখন উহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু" (৬১ ঃ ৬)।

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْآ اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۔

"হে মু'মিনগণ আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী হও, যেমন মারয়াম তনয় ঈসা হাওয়ারীগণকে বলিয়াছিল, আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হইবে? হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, আমরাই আল্লাহর পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বনী ইসরাঈলের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। পরে আমি মু'মিনদেরকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদের শত্রুদিগের মুকাবিলায়; ফলে তাহারা বিজয়ী হইল" (৬১ ঃ ১৪)।

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِىْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۔

"আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান-তনয়া মারয়ামের, যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; সি ছিল অনুগতদের একজন" (৬৬ ঃ ১২)।

এই আয়াতে রূহ বলিতে হযরত ঈসা (আ)-এর রূহকেই বুঝানো হইয়াছে।

এখানে স্মর্তব্য যে, মহানবী (স)-এর হাদীছের পাশাপাশি তাঁহার সাহাবীগণ হইতে ও ইসরাঈলী উৎস হইতে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেইগুলি নব্য ইসলাম ধর্মগ্রহণকারী সাহাবীগণ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে কা'ব আল-আহবার (র) ও ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ (র) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অন্যান্য ধর্মগ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)

বর্তমান বিশ্বে হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী হওয়ার দাবিদার খৃস্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ হইল বাইবেল। এই গ্রন্থের দুইটি অংশ ঃ ১. ওল্ড টেস্টামেন্ট ও ২. নিউ টেস্টামেন্ট। খৃস্টান জগত ঈসা (আ)-এর জীবনের জন্য নিউ টেস্টামেন্টকেই আদি উৎস মনে করে। ঈসা (আ)-এর জীবনী সম্পর্কে মৌখিক উৎস হইল ৪টি গসপেল ঃ মথি, মার্ক, লূক ও যোহন। মথি ও লূক গসপেল বা সুসমাচারে ঈসা (আ)-এর বংশলতিকা উল্লেখ করা হইয়াছে। চারটি গসপেলই ঈসা (আ)-এর বাপ্তিস্ম গ্রহণ করা, শয়তানের আহবান প্রত্যাখ্যান করা, হাওয়ারী গ্রহণ করা, শরীয়াতের কিছু কিছু বিধিবিধান,

চারিত্রিক দিকনির্দেশনা, ঈসা (আ) কর্তৃক বিভিন্ন অলৌকিক বিষয়ের অবতারণা করা, বিভিন্ন ধরনের রোগীকে সুস্থ করা, বিভিন্ন উপমা-উদাহরণ দিয়া সঙ্গীদিগকে শিক্ষা দেওয়া, ইয়াহূদী পণ্ডিতদের সহিত যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হওয়া, বিভিন্ন স্থানে গিয়া তাঁহার দীন প্রচার করা, অবশেষে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র ও রোমান শাসক পীলাতের সৈন্যদের হাতে গ্রেফতার হইয়া ফাঁসিকাষ্ঠে মৃত্যুবরণ করিয়া তিন দিন পর মৃত্যুর উপর জয়লাভ করার কথা বিবৃত হইয়াছে। খৃস্টজগতের দাবি অনুসারে এই গসপেলগুলি ৬৫-১২৫ খৃস্টাব্দ-এর মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত হইয়াছে (Encyclopedia Americana, vol. 16, p. 41)।

কতিপয় পত্রাবলীতে যাহা আসিয়াছে, তন্মধ্যে হযরত ঈসা-এর ইয়াহূদী হিসাবে জন্মলাভ (গালাতীয়, ৩ ঃ ১৬, রোমীয়, ৯ ঃ ৫), তিনি দাউদের বংশধর (রোমীয়, ১ ঃ ৩-৪), তাঁহার মানবীয় চরিত্রের কিছু কিছু দিক, যেমন নম্রতা, ভদ্রতা (২ করিন্থীয়, ১০ ঃ ১, ১ করিন্থীয়, ১৩), এমনিভাবে অন্যায়ভাবে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার দাবি (১ করিন্থীয়, ২ ঃ ৮, ২ করিন্থীয়, ১৩ ঃ ৪) ইত্যাদি। এই চিঠিগুলির মধ্যে অধিকাংশই সেন্ট পল কর্তৃক লিখিত। উপরিউক্ত গসপেলসমূহে ও পত্রাবলীতে ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্র পুত্র (নাঊযুবিল্লাহ) বলিয়া আখ্যা দিয়া অতি মানবীয় সত্তায় রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা অব্যাহত ছিল। সেইগুলি বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করিয়া রচিত যাহা খৃস্টান গবেষকদের দৃষ্টিও এড়ায় নাই। Encyclopaedia Britannica তে বলা হয়, Each of the four Gospels is written from a prospective and for a purpose even though the prospective and the purpose may not always be lasy to discern to day (vol. 13, p. 14)।

তাহা ছাড়া ঐ উৎসগুলিতে ঈসা (আ)-এর জীবনী সম্পর্কে খুব অল্পই তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। ইহার উপর নির্ভর করিয়া ঈসা (আ)-এর কোন গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য জীবনী লিখা সম্ভব নয়। রুডলফ, জ্যাকস জারমিয়াসের মত অনেক বাইবেল বিশেষজ্ঞও সেই সত্যটি নির্দ্বিধায় স্বীকার করিয়াছেন।

মূলত প্রাথমিক যুগে ঈসা (আ)-এর এক শ্রেণীর ভক্তরা তাঁহার সম্পর্কে যেই ধরনের বিশ্বাস পোষণ করিত এবং লোক সম্মুখে প্রচার করিত তাহাই মানুষের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। সেই মৌখিক বর্ণনার ভিত্তিতেই উপরিউক্ত গ্রন্থ ও পত্রাবলী সংকলিত হইয়াছে (Encyclopedia Americana, vol. 16, p. 41)।

আর ঐগুলিতে ঈসা (আ)-এর জীবনের ঘটনাপঞ্জী কালানুক্রমিক গ্রন্থনা অনুসারেও বিন্যস্ত করা হয় নাই, বরং বিচ্ছিন্নভাবে ঈসা (আ)-এর বিভিন্ন শিক্ষা ও কিছু কিছু কার্যাবলী বিবৃত করা হইয়াছে, এমন কি তাঁহার জীবনের অনেক অধ্যায় সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। যেমন শিশুকাল হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত তাঁহার অবস্থা, সাত হইতে বার বৎসর বয়সে জেরুসালেম আগমনের পূর্বাবস্থায় তিনি কোথায় কি অবস্থায় ছিলেন তাহার সম্পর্কে ঐ উৎসগুলি নীরব। এমনিভাবে জেরুসালেম হইতে

নাসেরাতে ফিরার পর তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি কোথায় কিভাবে ছিলেন, কি করিয়াছেন তাহার সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নাই। সেইজন্য উনিশ শতকের কতিপয় পশ্চিমা খৃস্টান সমালোচক ঈসা বা যিশু নামে কোন ব্যক্তির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করিয়াছেন (Encyclopaedia Britannica, vol. 13, p.14)।

এই মতামতে বাড়াবাড়ি করা হইয়াছে নিঃসন্দেহে। কারণ খৃস্টানদের উৎস ছাড়াও তৎকালীন বিশ্বের অন্যান্য এলাকার ঐতিহাসিকদের লেখায়ও নাসেরাতের মাসীহ ঈসা তথা যীশু খৃস্টের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ঃ রোমান লেখক টাসিটাস, সোয়টনিয়াস, প্লেনি দি ইয়ংগার এবং ইয়াহূদী ঐতিহাসিক জুসেফাস প্রমুখ।

ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাঁহার আগমনের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। দুঃখজনক হইলেও সত্য যে, তাঁহার চেয়ে আরও অনেক প্রাচীন ব্যক্তিবর্গের জীবনী স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা তাঁহার জীবনী ভালভাবে সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন। আল-কুরআন যদি নাযিল না হইত তাহা হইলে নবী হিসাবে ঈসা (আ) কি ছিলেন এবং কি ছিলেন না তাহা সম্পর্কে জগৎবাসীর নিকট অস্পষ্টতা থাকিয়াই যাইত। উল্লেখ্য যে, ত্রিত্ববাদীদের উপরিউক্ত চারিটি গসপেল ও পত্রাবলী ছাড়াও অনেক গসপেল রচিত হইয়াছিল, যাহা ৩২৫ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত খৃষ্টীয় সম্মেলনে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। সেইগুলিতে ঈসা সম্পর্কে ত্রিত্ববাদ বিরোধী তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছিল (মুতাওয়াল্লী ইউসুফ শালাবী, আদওয়া আলাল মাসীহিয়্যা, পৃ. ৬২)। ইহাতে অন্যান্য গসপেলের মতই ঈসা (আ)-এর বিভিন্ন শিক্ষা, কার্যাবলী ও ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে তাঁহার তাওহীদের শিক্ষা, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী, কিয়ামতের আলামত এই সব বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, সাথে সাথে ঈসা (আ)-কে ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনাকেও অবান্তর বলিয়া অস্বীকার করা হইয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে, ঈসা (আ)-কে ফেরেশতার মাধ্যমে সশরীরে স্বর্গারোহণ করানো হইয়াছে। আর সৈন্যরা যাহাকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়াছিল তাহার নাম ছিল জুদাস (বার্নাবাসের বাইবেল, বঙ্গানুবাদ আফজাল চৌধুরী, পৃ. ২৫৪-২৫৫)। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে ঈসা (আ)-এর ঘটনাবহুল জীবনের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। আর ঈসা (আ) সম্পর্কে খৃস্টান সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত ধারণা একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহ পরিবেশিত তথ্যের মাধ্যমেই দূরিভূত হইতে পারে।

ইয়াহূদীদের ধর্মীয় গ্রন্থ তালমুদের যে অংশ প্রথম ও দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীতে লিখা হইয়াছে তাহাতেও ঈসা (আ)-এর প্রসঙ্গ আসিয়াছে এবং তাহাতে তাঁহার পরিচয় বিকৃত করা হইয়াছে (The new Encyclopaedia Britannica, vol.10, P.145)। নিঃসন্দেহে তালমুদ ঈসা (আ)-এর প্রতি আক্রমণাত্মক ও বিদ্বেষপ্রসূত তথ্যে ভরপুর।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম ও বংশপরিচয়

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, বনী ইসরাঈলের ধর্মীয় বিধিবিধানের বিকৃতি ও গোমরাহী, নৈতিক অধপতন এবং রাজনৈতিক বিপর্যয় হইতে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ তাআলা ঈসা (আ)-কে প্রেরণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান-কাল-পাত্র লইয়া ইয়াহূদী-খৃস্টানসহ সকল ধর্মের পণ্ডিতগণের মধ্যে প্রচুর মতভেদ বিদ্যমান।

হযরত ঈসা (আ) বনূ ইসরাঈল জাতিভুক্ত হযরত দাঊদ (আ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি পিতা ছাড়াই আল্লাহ্‌র কুদরতে জন্মগ্রহণ করেন। এই সম্পর্কে বাইবেলেও স্বীকৃতি রহিয়াছে (দ্র. মথি, ১ঃ ১৮-২২, লুক, ১ঃ ৩৪)। তাই স্বভাবতই তাঁহার মায়ের সাথে সম্পর্কিত করিয়া তাঁহার বংশ নিরূপিত হয়। সুতরাং মুসলিম ঐতিহাসিকগণ হযরত মারয়াম (আ)-এর বংশের পরম্পরায় হযরত ঈসা-এর বংশ নিরূপণ করিয়াছেন (দ্র. মারয়াম নিবন্ধ)। হযরত ঈসা (আ)-এর মাতা হযরত মারয়াম (আ) ছিলেন উচ্চ বংশীয়া মহিলা, ইবাদত ও পরহেযগারীতে অনুপম আদর্শ নারী। কুরআন কারীমের বর্ণনা অনুযারী হযরত মারয়ামের পিতা ও হযরত ঈসা (আ)-এর নানা ছিলেন ইমরান (আ)। তিনি ছিলেন বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদের ইমাম ও ধর্মীয় প্রধান। তাঁহার স্ত্রী ছিলেন আল্লাহ প্রেমিক আবেদা ও পরহেযগার মহিলা। আল-কুরআনেও ইমরান পরিবারের ভুয়সী প্রশংসা করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى اٰدَمَ وَنُوْحًا وَّاٰلَ اِبْرٰهِيْمَ وَاٰلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ٠

"আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং ইমরানের বংশধরকে আল্লাহ্ বিশ্বজগতে মনোনীত করিয়াছেন" (৩ঃ৩৩)।

এই পরিবারেই আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন হিসাবে অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেন হযরত ঈসা (আ)। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় হইল, 'ঈসা (আ)-এর নানা ইমরান সম্পর্কে যেহেতু বাইবেলে কিছুই উল্লেখ নাই, সেইহেতু বাইবেলে (নূতন নিয়ম) হযরত ঈসা (আ)-এর আসল বংশতালিকা অর্থাৎ মাতার দিক একেবারেই উপেক্ষা করা হইয়াছে। বরং আরো আশ্চর্যের বিষয় হইল, কোন কোন বাইবেলে (মথি ও লুক) ঈসা (আ)-এর বংশলতিকা পেশ করা হয় ইউসুফ নামে জনৈক ব্যক্তিকে সম্পর্কিত করিয়া অর্থাৎ ঈসা ইবনে ইউসুফ। অথচ সেই বাইবেলগুলিতেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইউসুফের সঙ্গে বাস করিবার পূর্বেই পাক রূহের শক্তিতে মারয়ামের গর্ভ সঞ্চার হইয়াছিল। মারয়ামের স্বামী ইউসুফ সৎলোক ছিলেন (মথি সুসমাচার, ১ঃ১৮-১৯; লুক সুসমাচার, ২ঃ৫)। মথি ও লুক সুসমাচারে যে বংশলতিকার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে চরম বৈপরীত্য বিদ্যমান, একটির সঙ্গে অন্যটির মিল নাই। মোটকথা পিতাবিহীন জন্ম নেওয়ায় গোটা জগতের মানুষের মধ্যে ঈসা (আ) এক ব্যতিক্রম। তাই সকল মানুষকে তাহাদের পিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত করিয়া বংশ নির্ধারণ করা গেলেও ঈসা (আ)-কে মায়ের দাবিতেই বংশ নির্ধারণ করা যথাযথ ও বাস্তবসম্মত। আল-কুরআন তাহাই করিয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে শুভ সুসংবাদ

হযরত মারয়াম (আ) সব সময় নিজ প্রকোষ্ঠে আল্লাহর ইবাদতে লিপ্ত থাকিতেন এবং বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কখনো বাহিরে যাইতেন না। প্রসিদ্ধ বর্ণনামতে যখন তাঁহার বয়স ১৩, তখন একদিন তিনি মসজিদুল আকসার পূর্বদিকে পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশ্যে লোকজন হইতে পৃথক হইয়া নির্জনে অবস্থানরত ছিলেন। তখন হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। হযরত মারয়াম (আ) একজন অপরিচিত লোককে এইভাবে পর্দাহীন অবস্থায় সামনে উপস্থিত দেখিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, তোমার মধ্যে যদি সামান্যতম আল্লাহ্র ভয় থাকে তাহা হইলে আমি আল্লাহর দোহাই দিয়া তোমা হইতে আশ্রয় চাহিতেছি। ফেরেশতা বলিলেন, মারয়াম! ভয়ের কোন কারণ নাই। আমি মানুষ নহি, আমি আল্লাহ্র ফেরেশতা। আমি তোমাকে একটি পুত্র সন্তান লাভের সুসংবাদ দিতে আসিয়াছি। পবিত্র কুরআনে এই প্রসঙ্গে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاذْكُرْ فِى الْكِتٰبِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۔ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ حِجَابًا فَاَرْسَلْنَآ اِلَيْهَا رُوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۔ قَالَتْ اِنِّىْٓ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۔ قَالَ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّكِ لِاَهَبَ لَكِ غُلٰمًا زَكِيًّا ۔

"বর্ণনা কর এই কিতাবে উল্লিখিত মারয়ামের কথা, যখন সে তাহার পরিবারবর্গ হইতে পৃথক হইয়া নিরালায় পূর্ব দিকে এক স্থানে আশ্রয় লইল, অতঃপর উহাদিগ হইতে পর্দা করিল। অতঃপর আমি তাহার নিকট আমার রূহকে পাঠাইলাম, সে তাহার নিকট পূর্ণ মানবাকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করিল। মারয়াম বলিল, তুমি যদি আল্লাহ্কে ভয় কর তবে আমি তোমা হইতে দয়াময়ের শরণ লইতেছি। সে বলিল, আমি তো তোমার প্রতিপালক প্রেরিত, তোমাকে এক পবিত্র পুত্র দান করিবার জন্য" (১৯ ঃ ১৬-১৯)।

হযরত মারয়াম (আ) পুত্র সন্তানের সংবাদ শুনিয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "মারয়াম বলিল, কেমন করিয়া আমার পুত্র হইবে যখন আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই এবং আমি ব্যভিচারিণীও নহি" (১৯ ঃ ২০)?

তখন ফেরেশতা বলিলেন ঃ

قَالَ كَذٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗٓ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ اَمْرًا مَّقْضِيًّا ۔

"এইরূপই হইবে। তোমার প্রতিপালক বলিয়াছেন, ইহা আমার জন্য সহজসাধ্য এবং আমি উহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার" (১৯ ঃ ২১)।

বর্তমান প্রচলিত বাইবেলেও এই বিষয়টির উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন লুক সুসমাচারে উল্লেখ্য আছে ঃ দূত তাহাকে কহিলেন, মারয়াম! ভয় করিও না। কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পাইয়াছ। আর দেখ তুমি গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম যীশু রাখিবে। তিনি মহান

হইবেন। তখন মারয়াম দূতকে কহিলেন, ইহা কিরূপে হইবে? আমি ত পুরুষকে জানি না। দূত উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপর ছায়া করিবে। এই কারণে যে, পবিত্র সন্তান জন্মিবে" (লুক, ১ ঃ ২৬-২৮)। বার্নাবাসের বাইবেলেও অনুরূপ বর্ণিত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, লুক সুসমাচারের ভাষ্যমতে হযরত মারয়ামের কাছে জিবরাঈল ফেরেশতা উক্ত সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন যখন হযরত মারয়াম গালীল প্রদেশের নাসেরা জনপল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন (লুক সুসমাচার, ১ ঃ ২৬)।

অপরদিকে বার্নাবাসের বাইবেলে উল্লেখ করা হইয়াছে, মারয়াম তাঁহার কামরায় অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাসের কামরায় অবস্থান করিতেছিলেন। আর বায়তুল মুকাদ্দাসের ঐ কামরাটি পূর্ব দিকে অবস্থিত। সম্ভবত এইজন্য আল-কুরআনে মাকান শরকি বলা হইয়াছে (১৯ ঃ ১৬)। ইবন কাছীরসহ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের মতে তখন মারয়াম মসজিদের পূর্ব দিকেই অবস্থান করিতেছিলেন (ইবনে কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২খ, পৃ. ৫৯)। আর ভৌগোলিক পর্যালোচনায় দেখা গিয়াছে, বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে নাসেরা জনপল্লীটি পূর্ব দিকে নহে, বরং উত্তর দিকে অবস্থিত।

মায়ের গর্ভে হযরত ঈসা (আ)

কোন কোন বর্ণনামতে, জিবরাঈল (আ) মারয়াম (আ)-কে ঐ সুসংবাদ শুনাইয়া তাঁহার মুখের ভিতর হযরত ঈসা (আ)-এর রূহ মুবারক ফুঁকিয়া দেন। কিন্তু প্রসিদ্ধ মতে জিবরাঈল (আ) মারয়াম (আ)-এর জামার কলারের ফাঁক দিয়া ফুঁক দিলেন আর এইভাবে তাঁহার গর্ভে ঈসা (আ)-এর রূহ পৌঁছিয়া গেল (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫৯)।

যাই হউক, এইভাবে কিছুকাল পর তিনি নিজেকে অন্তঃসত্তা অনুভব করিলেন। এই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ঃ

"আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান তনয়া মারয়ামের, যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল, ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল; সে ছিল অনুগতদিগের একজন" (৬৬ ঃ ১২)।

উল্লেখ্য, হযরত মারয়াম অন্তঃসত্তা হওয়ার পর হযরত ঈসা (আ) তাঁহার গর্ভে কত সময় ছিলেন সে সম্পর্কে প্রচুর মতবিরোধ রহিয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হইল ঃ

হযরত মারয়াম ঈসা (আ)-কে গর্ভে ধারণের সাথে সাথেই প্রসব করেন। ইব্নুল জাওযীর বর্ণনা মতে ইহা ইব্ন আব্বাসের মত। আর উহার অর্থ তাঁহার গর্ভ ধারণের সময়কাল দীর্ঘ ছিল না। তবে ইহার অর্থ এই নয় যে, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সন্তান প্রসব করেন। কেননা আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন ঃ

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا . فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا .

"তৎপর সে গর্ভে উহাকে ধারণ করিল, অতঃপর তৎসহ এক দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেল, প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষতলে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল" (১৯ ঃ ২২-২৩)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, গর্ভ ধারণ আর প্রসব করিবার মাঝামাঝি এতটুকু সময় ছিল যাহাতে দূরবর্তী স্থানে যাওয়া সম্ভব হয় (ইবনুল জাওযী, যাদুল মাসীর, ৫খ., পৃ. ১৫৪)।

গর্ভধারণের ক্ষণকাল পরই প্রসব করেন। ইহা ছা'লাবীর মত (প্রাগুক্ত)। ইহার সমর্থনে দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করা হয় ঃ

إِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ .

"আল্লাহর নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল" (৩ ঃ ৫৯)।

অতএব আল্লাহ তা'আলা যেখানে বলিলেন, "হইয়া যাও", সেখানে গর্ভ ধারণের সময়কাল সম্পর্কে চিন্তা করা যায় না (আলূসী, রূহুল মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ৭৯)।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার গর্ভকাল ৩ ঘন্টা, ৯ ঘন্টা, ৬ মাস, ৭ মাস, ও ৮ মাস ছিল বলিয়া বিভিন্ন বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে (আল-মাওয়ারদী, তাফসীর, ৩খ, পৃ. ৬২; দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৭৯-৮০)।

ঐ গর্ভকালীন সময় ছিল ৯ মাস। ইব্ন কাছীর এই মতটিকেই অগ্রাধিকার দিয়াছেন। আর আলূসী ইহাকে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার প্রবক্তাদের মতে, অন্যান্য নারী স্বাভাবিকভাবে ৯ মাসে যেমনি করিয়া সন্তান প্রসব করে তেমনি ৯ মাস পর মারয়াম (আ) হযরত ঈসা (আ)-কে প্রসব করিয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; আলূসী, প্রাগুক্ত)। ইব্ন কাছীর ইহার সহিত আরও বলিয়াছেন যে, এই সময়ের ব্যতিক্রম হইলে অবশ্যই তাহা কুরআন-হাদীছে উল্লেখ থাকিত (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)। আলূসীর মতে এই বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন বর্ণনা সহীহ নহে (দ্র. আলূসী, প্রাগুক্ত)। প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত মুজাহিদ (র) হইতে বর্ণিত, মারয়াম বলিয়াছেন —

"আমি যখন একাকী থাকিতাম তখন সে (ঈসা) আমার সহিত কথা বলিত। আর যখন আমি মানুষের মধ্যে থাকিতাম সে আমার পেটে তাসবীহ্ পাঠ করিত" (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত)।

বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে হযরত ঈসা যখন তাঁহার মায়ের পেটে ছিলেন তখন তাঁহার মা মারয়াম আপন জাতির ইউসুফ নামে একজন সৎ মিস্ত্রীকে নিজের জীবনসঙ্গী করিয়া লইয়াছিলেন (লুক সুসমাচার, ২ ঃ ৫-৬; বার্ণাবাসের বইবেল, পৃ. ২)। ইব্ন কাছীর বলেন, সালাফে সালেহীনের মধ্যে অনেকেই উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত মারয়ামের গর্ভধারণের আলামত যখন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল তখন প্রথম জানিতে পারেন ইউসুফ আন্-নাজ্জার। তিনি মারয়ামের খালাত ভাই ছিলেন। মারয়ামের একদিকে পূত পবিত্রতা ও ইবাদত-পরহেযগারি, অন্যদিকে তাঁহার ঐ অবস্থা অবলোকন করিয়া তিনি খুবই আশ্চর্যান্বিত হন। একদিন তিনি মারয়ামকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রকৃত

অবস্থা তথা ফেরেশ্তার সুসংবাদ জানিয়া লইয়া আর কিছু বলেন নাই (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ. পৃ. ৬০)। কিন্তু বাইবেলে আসিয়াছে যে, ইউসুফ মারয়ামের সহিত বিবাহের পূর্ব-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিচ্ছিন্ন থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে স্বপ্নে ফেরেশতা কর্তৃক প্রকৃত অবস্থা জানিয়া তাহার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন (মথি, ১ ঃ ২০-২১; বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ৩)।

হযরত মারয়াম (আ)-এর বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ

হযরত মারয়াম (আ)-এর অন্তঃসত্তার পর যখন গর্ভধারণের বিভিন্ন আলামত প্রকাশ পাইতে থাকে তখন তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করেন। কারণ তিনি আশংকা করিতেছিলেন যে, মানুষ ঘটনার আকস্মিকতায় বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহার জীবন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে। তাই তিনি বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন, কিন্তু বাহির হইয়া কোথায় গেলেন সেই সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু জানা যায় নাই। আল-কুরআনে শুধু এতটুকু বলা হইয়াছে, তিনি দূরবর্তী স্থানে চলিয়া গেলেন। আলূসীর মতে, তিনি তাহার পরিবার-পরিজন হইতে দূরে পাহাড়ের আড়ালে চলিয়া গেলেন (আলূসী, প্রাগুক্ত)।

কোন কোন বর্ণনামতে তিনি তাঁহার খালা যাকারিয়্যা (আ)-এর স্ত্রীর নিকট চলিয়া গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ ধরনের গর্ভধারণের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আর তিন মাস সেখানেই ছিলেন (মথি সুসমাচার, ১ ঃ ৩৯-৫৬)। অন্য বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি নবী পরিবারেই ছিলেন কিন্তু গর্ভের আকার বৃদ্ধি পাওয়ায় লজ্জা বোধ করেন এবং লজ্জায় স্বজাতির লোকজন হইতে বাহির হইয়া পূর্বদিকে চলিয়া যান (আলূসী, প্রাগুক্ত)। এই সব বর্ণনার কোন ভিত্তি নাই। বাইবেলের বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি নাসারত পল্লীতে নিজ গৃহে চলিয়া যান (লূক, ১ ঃ ৫৬, ২ ঃ ৪; বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ৩)।

ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার স্থান

ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ট হওয়ার সময় নিকটবর্তী হইলে হযরত মারয়াম জেরুসালেম হইতে নয় মাইল দূরে সারাত (সাঈর) পর্বতের একটি টিলায় চলিয়া গেলেন যাহা বর্তমানে 'বেথেলহাম' নামে প্রসিদ্ধ (সিওহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৪খ., পৃ. ৩৫)। অধিকাংশ আলিমের মতে এইখানেই হযরত ঈসা (আ) ভূমিষ্ট হন।

বার্ণাবাসের বাইবেলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রোম সম্রাট অগাষ্টাস-এর এক ডিক্রিবলে ঐ সময় ইয়াহূদা রাজ্যের শাসক ছিলেন হেরোদ। অগাষ্টাস সীজারের ফরমান অনুসারেই গোটা সাম্রাজ্যে শুমারী প্রথা চালু ছিল, যে কারণে প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজ নিজ প্রদেশে গিয়া আপন আপন গোত্রের নামে সরকারী করদভুক্ত প্রজারূপে গণ্য হইত। সীজারের এই ডিক্রি অনুযায়ী নিজেকে করদভুক্ত করার জন্য ইউসুফ অন্তঃসত্তা মারয়ামকে লইয়া গ্যালিলী অঞ্চলের নাসারত শহর ত্যাগ

করিয়া বায়তুল লাহমে গেলেন। কেননা দাউদ-এর বংশধারার লোকদের বাসভূমিরূপে ইহা ছিল তাহাদের নিজস্ব শহর। ইউসুফ ক্ষুদ্র শহর বাইতুল-লাহামে গিয়া দেখিলেন, অধিবাসীরা অধিকাংশই বহিরাগত যাহাদের কাছে তাঁহার আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই শহরতলীতে রাখালদের জন্য নির্মিত সাধারণ ছাউনিতে তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন (বার্নাবাসের বইবেল, পৃ. ৩-৪)।

মারয়াম (আ)-এর সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে আল কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ اِلٰى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يٰلَيْتَنِىْ مِتُّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا . فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلاَّ تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا . وَهُزِّىْ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا .

"প্রসব বেদনা তাহাকে এক খর্জুর বৃক্ষতলে আশ্রয় লাইতে বাধ্য করিল। সে বলিল, হায়! ইহার পূর্বে আমি যদি মরিয়া যাইতাম ও লোকের স্মৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইতাম। ফেরেশতা তাহার নিম্ন পার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না। তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি তোমার দিকে এক খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও। উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করিবে" (১৯ ঃ ২৩-২৫)।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, মারয়াম (আ) স্বীয় সন্তান (ঈসা) প্রসবের জন্য খর্জুর বৃক্ষবিশিষ্ট কোন বাগানে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং তাঁহার সন্তানের বরকতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেইখানে একটি নহর জারি করিয়া দেন। কিন্তু এই স্থানটি কোথায় সুনির্দিষ্টভাবে তাহার উল্লেখ করা হয় নাই।

ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহের ধারণা যে, ঈসা (আ) মিসরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইব্ন কাছীর ইহাকে সঠিক নহে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৬৯)। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ-এর মতে হযরত ঈসা (আ) নাসীরা নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তারজুমানু'ল কুরআন, ২খ, পৃ. ৪৩৩)। Encyclopaedia Britannica-তে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আধুনিক কিছু গবেষকের মতে তাঁহার জন্ম হয় নাযারাথ (Nagarath) পল্লীতে।

ঐতিহাসিক মুফাস্সিরগণের প্রসিদ্ধ মতে হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান হইল বেথেলহাম। মহানবী (সা)-এর মি'রাজ সম্পর্কিত বর্ণিত যে হাদীছ আছে, তাহাতে বেথেলহামকেই ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার স্থান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই হাদীছটি ইমাম নাসাঈ আনাস (রা) সূত্রে এবং ইমাম বায়হাকী শাদদাদ ইব্ন আউস (রা) হইতে এবং সহীহ সূত্রে বর্ণনা করেন। তাই এই হাদীছের বক্তব্যের পরিপন্থী মত গ্রহণযোগ্য নহে (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৬৯)।

বেথেলহামে ঈসা (আ)-এর ভূমিষ্ঠ হওয়ার জায়গায় রোমান সম্রাটগণ একটি গীর্জা নির্মাণ করিয়াছিলেন (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত; আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮১)। পূর্ববর্তী আম্বিয়ার মাধ্যমে এই কথা বলা হইতেছিল যে, মাসীহ দাউদ (আ)-এর নগরীতে জন্মগ্রহণ করিবেন (মথি, ২ ঃ,৫-৬)। আর বাইবেলে আসিয়াছে যে, হযরত দাউদ (আ)-এর জন্ম হইয়াছিল

বেথেলহামে। হযরত মারয়াম বেথেলহামে থাকিতেই তাঁহার সন্তান ঈসা (আ)-এর জন্ম হয় (লূক সুসমাচার, ২ ঃ ৪-৭)।

ঈসা (আ)-এর জন্মতারিখ

ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান লইয়া যেমন মতপার্থক্য রহিয়াছে, তেমনিভাবে তাঁহার জন্মসন তারিখ নির্ণয়েও মতপার্থক্য রহিয়াছে। যথা ঃ ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট টেইলর (Vincent Taylor)-এর মতে ঈসা-এর জন্ম খৃস্টপূর্ব ৮ সালেও হইতে পারে (J. Lehman, The Jews Report, pp. 14-15); Encylopaedia Britannica (vol. 13, p. 55)-এর মতে সম্ভবত খৃস্টপূর্ব ৪সালে জন্মগ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ডাইওনেসিয়াস এক্সিগিওস (Disnysius Exigius) দ্বারা প্রণীত এন্‌নোডমিনি (Anno Domini সংক্ষেপে AD) নামে খৃস্টীয় পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে হযরত ঈসা (আ) ১ খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার সময় হইতেই খৃস্টীয় সন হিসাব করা হয়। ঈসা (আ)-এর জন্মের তারিখ হিসাবে ঐ সনটিই বেশি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, যাহা মুসলিম ঐতিহাসিকগণও সমর্থন করিয়াছেন (দ্র. ড. মুহাম্মদ আত্-তায়্যিব আন্-নাজ্জার, তারীখুল আম্বিয়া, পৃ. ২৭৬)।

ড. সাজ্জাদ হোসাইন উল্লেখ করেন যে, বলা হয় ঈসা (আ) তিন খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন (Syed Sajjad Husain, p. 21)। আতাউর রহীম উল্লেখ করেন যে, লূক সুসামাচার অনুসারে দেখা যায়, আদমশুমারীর সময়ে ঈসা (আ) জন্মগ্রহণ করেন আর আদমশুমারী অনুষ্ঠিত হয় ৬ খৃস্টাব্দে (M. Ataur Rahim, Jesus A prophet of Islam, p. 17)। মোটকথা ঈসা (আ) কোন সালে জন্মগ্রহণ করেন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না।

বার্নাবাসের বাইবেলে আসিয়াছে যে, খৃস্টীয় সনের সাথে ঈসা (আ)-এর জন্মসনের সম্পর্ক নাই। এইজন্য খৃস্টান পণ্ডিতগণও বর্তমান খৃস্টীয় পঞ্জিকার সমালোচনা করিয়াছেন এবং ইহা যে ঈসার জন্মের তারিখের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে, তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন (Encylopedia Americana, Vol. 16, p. 41)। মোটকথা খৃস্টপূর্ব ১১ হইতে ৪-এর মধ্যে যে কোন সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তবে খৃস্টপূর্ব ৬ সাল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

ঈসা (আ)-এর জন্মলগ্নে সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলী

বিশ্বে প্রতিটি মহামানব যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার উপর উহার অলৌকিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়-এবং ঘটনা ঘটে। আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত ঈসা (আ)-এরে জন্মলগ্নেও সেই ধরনের কিছু কিছু ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা ঘটে।

তাবারী আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে রাসূলুল্লাহ (সা) হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলিয়াছেন, বনী আদমের যে কোন সন্তান ভূমিষ্ট হইবার সাথে সাথে শয়তান তাহাকে স্পর্শ করে। এই স্পর্শের কারণে সে চীৎকার দিয়া উঠে। তবে মারয়াম (র) ও তাঁহার সন্তানের বিষয়টি ভিন্নরূপ। এরপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, হে শ্রোতাবৃন্দ! এই প্রসঙ্গে অত্র আয়াতটি পাঠ করা যায়।

وَاِنِّيْ اُعِيْذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ٠

"আর আমি অভিশপ্ত শয়তান হইতে তাহার ও তাহার বংশধরদের জন্য তোমার শরণ লইতেছি" (সূরা আল ইমরান, ৩৬; দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯)।

অপরদিকে বাইবেলেও ঈসা (আ)-এর জন্মলগ্নের কিছু অলৌকিক ঘটনার কথা বর্ণিত হইয়াছে (দ্র. বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ৪)।

এমনিভাবে বাইবেলীয় গ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে, হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মের পর পারস্যের জ্যোতিষীরাও আসমানের তারকায় এক অস্বাভাবিক প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ধারণা করিয়াছিল যে, নিশ্চয়ই আজ কোন মহামানবের জন্ম হইয়াছে। তাহাদের একটি দল আসমানে নক্ষত্রের তাৎপর্যময় গতিবিধি বিস্ময়ের সাথে পর্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। উহাতে হঠাৎ একটি মহা উজ্জ্বল তারকার উদগতি তাহাদের দৃষ্টি এড়ায় নাই। নিজেদের মধ্যে এই আলামতের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহারা আসিয়া ইয়াহূদায় উপস্থিত হইলেন। জেরুসালেমে প্রবেশ করিয়া ইয়াহূদীদের নবজাত রাজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাজা হেরোদ এই সংবাদ পাইয়া ভীত হইলেন। জ্যোতিষীদের আহবান করিয়া হেরোদ জানিতে চাহিলেন, আপনারা বলুন তো মসীহর জন্ম কোথায়? তাঁহার জন্ম বায়তুল লাহমেই হওয়া উচিত বলিয়া তাহারা অভিমত প্রকাশ করিলেন। হেরোদ বলিলেন, আপনারা তবে বায়তুল লাহমে যান। সেই শিশুকে আবিষ্কার করুন। যদি আপনারা তাঁহার সন্ধান পান তবে ফিরতি আসিয়া আমাকেও তাহা অবগত করাইবেন। কেননা আমিও তাঁহাকে তসলীম জানাইতে ইচ্ছা পোষণ করি। অবশ্য শেষ কথাটি তিনি ছলনা করিয়াই বলিলেন। অতএব পারসিক পণ্ডিতগণ জেরুসালেম হইতে প্রস্থান করিলেন। আর যেই তারকাটি প্রাচ্য দেশে তাহাদের গোচরীভূত হইয়াছিল সেইটি এখন তাহাদের সামনে বিচরণশীল হইল। পারসিক পণ্ডিতগণ তারকাটি অবলোকন করিয়া অসীম পুলক লাভ করিলেন। বায়তুল লাহমের শরতলীতে আসিয়া তারাটি যেন সোজা দাঁড়াইল সেই ছাউনির উপর যেখানে ঈসা (আ) জন্ম নিয়াছিলেন। অতএব পারসিক পণ্ডিতগণ সেখানে প্রবেশ করিলেন এবং মাতা পুত্রকে দেখিতে পাইয়া তাহারা নবজাতককে আদাব আরয করিলেন। পারসিক পণ্ডিতগণ কুমারী মাতাকে তাহাদের আগমনের কারণ জানাইয়া সোনা-রূপাসহ মাল-মসলাপাতি নজরানারূপে পেশ করিলেন। তখন নিদ্রিত অবস্থায় হেরোদের কাছে ফিরিয়া না যাইবার জন্য তাহারা নবজাতকের হুঁশিয়ারী লাভ করিলেন। ফলে ভিন্ন পথ দিয়া তাহারা স্বদেশের পথ ধরিলেন (বার্নাবাসের বাইবেল, ৫-৭)। ঐ ধরনের একটি বর্ণনা মথি সুসমাচারেও পাওয়া যায় (২ঃ ১-১২)।

এইভাবে আরও অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। কিন্তু বর্ণনাসূত্রের ধারাবাহিকতা না থাকায় ঐগুলি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। তবে বিভিন্ন সূত্রে উপরিউক্ত ঘটনাগুলি বর্ণিত হওয়ায় সেইগুলির বাস্তবতাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। মহান নবী ঈসা (আ)-এর জন্মলগ্নে তাহা ঘটিতেই পারে। প্রকৃত অবস্থা একমাত্র আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

হযরত ঈসা (আ)-এর নামকরণ ও উপাধি

আল-কুরআনের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈসা মাসীহ বা মসীহ ঈসা নামকরণটি আল্লাহ্র পক্ষ হইতেই স্থিরীকৃত হইয়াছে এবং তাহা ঈসা (আ)-এর জন্মের পূর্বেই। ফেরেশতা আসিয়া যখন মারয়াম (আ)-এর কাছে ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে শুভ সংবাদ দিতেছিলেন তখন ফেরেশতা বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার নাম হইবে মাসীহ ঈসা ইবন মারয়াম (দ্র. ৩ ঃ ৪৫)।

অবশ্য মথি সুসমাচারে আসিয়াছে যে, মারয়াম অলৌকিকভাবে গর্ভধারণের পর তাঁহার সাথী ইউসুফের নিকট স্বপ্নে ফেরেশতা দেখা দিয়া তাহাকে আদেশ করেন, "তুমি তাহার নাম যীশু রাখিবে" (মথি সুসমাচার, ১ ঃ ২১)। পরবর্তীতে ইউসুফ তাঁহার নাম যীশুই রাখিলেন (প্রাগুক্ত, ১ ঃ ২৫)। অপরদিকে লূক সুসমাচারে বলা হইয়াছে যে, জিবরাঈল ফেরেশ্তা মারয়াম (আ)-কে আদেশ করিলেন যে, তাহার গর্ভের পুত্রের নাম যীশু রাখিবে (লূক সুসমাচার, ২৬ ঃ ৩২)।

তাঁহার প্রসিদ্ধ নাম ঈসা। মাসীহ্ তাঁহার উপাধি, ইব্ন মারয়াম তাঁহার ডাকনাম। কুনিয়াতগুলির মধ্যে কোথাও তাঁহাকে মাসীহ, কোথাও তাঁহাকে মাসীহ ইব্ন মারয়াম, কোথাও মাসীহ ঈসা ইব্ন মারয়াম, কোথাও শুধু ইব্ন মারয়াম। ইতিপূর্বে ইহার একটি তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

ঈসা শব্দটি আরবী। হিব্রুতে যিহোশূয় (Jehoshuah) অথবা যশূয়া (Joshua) আরবীতে উচ্চারণে ইহা ইয়াশু বা ইয়াশূ। ইহার অর্থ ত্রাণকর্তা, সায়্যিদ বা সরদার, নেতা ইত্যাদি। Encyclopedia Americana-এর বর্ণনামতে ঈসা (আ)-এর সমসাময়িক কালে প্রায় ১৯ জন ব্যক্তির নাম ছিল ঈসা (vol.16, p. 41)। গ্রীক ভাষায় বলা হয় জেসাস (Jesus,) যাহাকে ইংরেজী ও বাংলা সংস্করণে যীশু বলা হয়। মাসীহ শব্দটি হিব্রু মাশীয়াখ (Mashyach) বা মসীয়াহ (Mesiah)-এর আরবী রূপ।

গ্রীক ভাষায় তাঁহাকে বলা হয় খৃস্ট (Christ)। মাসীহ্ শব্দটি উৎপত্তিমূলে আরবী বা হিব্রু ইহা লইয়া প্রচুর মতভেদ আছে। আল্লামা কুরতুবীর মতে, ইহা মূলত অনারব শব্দ যাহা আরবীতে প্রচলিত। ইব্ন ফারিস-এর মতে মাসীহ সিদ্দীক বা মসৃণ মুদ্রা (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৮৮)। আরবীতে মাসাহা শব্দটির অর্থ লেপন করা, স্পর্শ করা, পরিভ্রমণ করা ইত্যাদি। কিন্তু ঈসা (আ)-এর কেন মাসীহ নামকরণ করা হইল এই সম্পর্কেও বিভিন্ন বিশ্লেষণ পাওয়া যায়, এমনকি ইব্ন আব্বাস (রা) থেকেই একাধিক মত বর্ণিত আছে। নিম্নে কয়েকটি মতামত পেশ করা গেল ঃ

১. যেহেতু ঈসা (আ) কোন রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করিলেই সেই ব্যক্তি রোগমুক্ত হইত সেইজন্য ঈসা (আ)-কে মাসীহ বলা হয়।

২. কাহারও মতে তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আর এই পরিভ্রমণ হইতেই তাঁহার নামকরণ হয় মাসীহ (দ্র. ফীরোযাবাদী, তানবীরুল মিক্য়াস মিন তাফসীরি ইব্ন আব্বাস, পৃ. ৬১)।

৩. কাহারও মতে ঈসা (আ)-এর পায়ের পাতা সমান ছিল, তাই তাঁহাকে মাসীহ বলা হইত। 'আতা (র)-এর সূত্রে ইহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত (ইব্নুল জাওযী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩২৯)।

৪. কাহারও মতে তাঁহার শরীরে বরকতময় তৈল দ্বারা লেপন করা ছিল, যাহা ছিল খুবই সুগন্ধিযুক্ত।

৫. কাহারও মতে জিবরাঈল (আ) তাঁহাকে স্বীয় পাখা দ্বারা স্পর্শ করার কারণে তাঁহার উপাধি হয় মাসীহ (আবু হায়্যান, আল-বাহরুল মুহীত, ৩খ, পৃ. ১৫২)।

৬. ইব্ন আব্বাস (রা), ইব্ন জুবায়র প্রমুখের মতে মাসীহ অর্থ রাজা (ফীরোযাবাদী, প্রাগুক্ত, আবু হায়্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩)।

ইব্ন আব্বাস উল্লেখ করেন, বর্ণিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের রাজা শৌলের সময় হইতে রাজাকে মাসীহুর রব (সদাপ্রভু অভিষিক্ত) বলা হইত। যেমন ওল্ড টেস্টামেন্টে (২ শমূয়েল, ১ ঃ ১৪) আসিয়াছে, হযরত দাঊদ (আ) শৌল রাজাকে মাসীহুর রব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (ইব্ন আশূর, তাফসীরুত্ তাহরীর ওয়াত্-তানবীর, ৩খ, পৃ. ২৪৬)। আর এই রাজাদেরকে শুই উপাধি প্রদানের ধারা বনূ ইসরাঈল সমাজে চালু ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এমন একজন মাসীহ আগমন করিবেন, যিনি তাহাদেরকে সকল অত্যাচার-অনাচার, পাপ-পঙ্কিলতা হইতে মুক্ত করিবেন। আর সেই দিক দিয়া হযরত ঈসাকে মাসীহ উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

তাঁহাকে যখন তাঁহার বিরোধীরা গ্রেফতার করিয়া হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল, তখন তাহারা তাঁহাকে 'ইয়াহূদীদের রাজা' বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল (মথি, ২৭ ঃ ৩০; মার্ক, ১৫ ঃ ৩২; লূক ২৩ ঃ ৩৮; যোহন ১৯ ঃ ৩)। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বনূ ইসরাঈলের কাঙ্ক্ষিত ত্রাণকর্তা রাজাকে মাসীহ বলিয়া অভিহিত করা হইত।

হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মকাল হইতে নবুওয়াত-পূর্ব জীবন

জন্মকাল হইতে নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত হযরত ঈসা (আ) কোথায় কিভাবে জীবন অতিবাহিত করেন সেই সম্পর্কে কুরআন ও হাদীছে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে কুরআনে শুধু জন্মের পর তাঁহার তত্ত্বাবধান ও তাঁহার মায়ের পবিত্রতার ঘোষণাসহ নিজের পরিচয় প্রদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে, ধারাবাহিক ঘটনাপঞ্জির বিস্তারিত উল্লেখ নাই। তবে আল-কুরআনে উক্ত বর্ণনাসহ বাইবেলে কিছু কিছু তথ্য, কিছু ইসরাঈলী রিওয়ায়াত এবং অধুনা প্রাপ্ত কিছু প্রাচীন দলীল-দস্তাবেয-এর ভিত্তিতে ঈসা (আ)-এর জন্মকাল হইতে নবুওয়াত পর্যন্ত অবস্থাদির এক সংক্ষিপ্ত আলেখ্য এখানে পেশ করা হইল।

আল্লাহ্র কুদরতে শুষ্ক খর্জুর বৃক্ষ হইতে তাহাদের জন্য অসময়ে খেজুর সরবরাহসহ সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। অপরদিকে শিশু ঈসাকে দেখিয়া তিনি চক্ষু জুড়াইতেন। এই মর্মে আল-কুরআনে উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

فَنَادٰهَا مِنْ تَحْتِهَآ اَلاَّ تَحْزَنِىْ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۔ وَهُزِّىْٓ اِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسٰقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۔ فَكُلِىْ وَاشْرَبِىْ وَقَرِّىْ عَيْنًا ۔

"ফেরেশতা তাহার নিম্ন পার্শ্ব হইতে আহ্বান করিয়া তাহাকে বলিল, তুমি দুঃখ করিও না, তোমার পাদদেশে তোমার প্রতিপালক এক নহর সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি তোমার দিকে খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ডে নাড়া দাও। উহা তোমাকে সুপক্ক তাজা খর্জুর দান করিবে। সুতরাং আহার কর, পান কর ও চক্ষু জুড়াও" (১৯ ঃ ২৪-২৬)।

বার্নাবাসের বাইবেলে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ফেরেশতাদের নিকট হইতে অবগত হইয়া বেথেলহামের নিকটস্থ মাঠের রাখালেরা আসিয়া মারয়ামকে বিবিধ উপঢৌকন দিয়া নবজাতকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিল (বার্নাবাসের বাইবেল)। কোন কোন বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত মারয়াম পূর্ব হইতেই বেথেলহাম শহরতলীতে ছাউনিতে আশ্রয় লইয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)। মথি সুসমাচারের বর্ণনামতে পারস্য দেশীয় একদল পণ্ডিতও ঈসা (আ)-কে কিছু উপহার দিয়াছিলেন (মথি সুসমাচার, ২ ঃ ১২)। এই সমস্ত বর্ণনা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্তসহ অন্যান্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদিরও বিভিন্ন পন্থায় ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। জন্মোত্তরকালে শিশু ঈসার অলৌকিকভাবে মাতার পবিত্রতা ঘোষণায় তাঁহাকে সান্ত্বনা দান প্রভৃতি বিস্তারিত তথ্যের জন্য দ্র. মারয়াম নিবন্ধ।

আল্লামা নাসাফী বর্ণনা করেন যে, ঈসা (আ) তাঁহার জন্ম দিনেই কিংবা চল্লিশ দিন বয়সে কথা বলিয়াছিলেন (তাফসীরে নাসাফী, ২খ., পৃ. ৩৮)। দাহহাকের বর্ণনামতে তিনি ছেচল্লিশ দিন বয়সে কথা বলিয়াছিলেন (তাফসীরে মাওয়ারদী, ৩খ., পৃ. ৩৭০)। বর্ণিত আছে যে, তিনি তখন স্তন্য পান করিতেছিলেন। তাহাদের কথা শুনিয়া তিনি মাতৃস্তন ছাড়িয়া তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া এবং বাম দিকে ভর করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা ইশারা করিতে করিতে তাঁহার বক্তব্য প্রদান করিয়াছিলেন। কাহারও মতে হযরত যাকারিয়া (আ) তাঁহার কাছে আসিয়া কথা বলিয়াছিলেন (আলূসী, প্রাগুক্ত ১৬খ, পৃ. ৮৯)। যাহাই হউক, কাহার মাধ্যমে কখন কথা বলিয়াছিলেন আল-কুরআনে তাহা উল্লেখ নাই, তবে দোলনায় থাকা অবস্থায় তিনি কথা বলিয়াছিলেন তাহা বলা হইয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর ইহা এক মু'জিযা। কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় হইল, খৃস্টান সম্প্রদায় ঈসা (আ)-এর দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলিবার বিষয়টিকে বরাবরই অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। আল্লামা আলূসী উল্লেখ করেন যে, নাসারাগণ ধারণা করে ঈসা (আ) শিশু থাকা অবস্থায় কথা বলেন নাই, শৈশবে তাঁহার মাতার পবিত্রতার কথা বলেন নাই এবং এইভাবেই ত্রিশ বৎসর কাটিয়া যায় (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৬৩)। নাসারাগণ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে যে,

দোলনায় থাকা অবস্থায় ঈসা (আ)-এর কথা বলিবার বিষয়টি অত্যাশ্চর্যজনক বিষয়। এই ধরনের যদি কিছু ঘটিত, লোকজন অবশ্যই তাহা বর্ণনা করিত। আর এই ধরনের বর্ণনা থাকিলে নাসারাগণেরই সকলের আগে জানার কথা।

তাহাদের এই যুক্তি খণ্ডনে বলা হয়, বর্ণিত আছে যে, ঈসা (আ) সেইবার কথা বলিয়াই চুপ হইয়া যান। স্বাভাবিক শিশুরা যখন কথা বলিতে শিখে তখনই ঈসা (আ) পরবর্তীতে কথা বলিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইহা ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও বর্ণিত (প্রাগুক্ত)। সুতরাং ঈসা (আ) যখন কথা বলিয়াছিলেন তখন শ্রোতাদের সংখ্যা হয়তো এমন পর্যায়ে ছিল না যাহাকে মুতাওয়াতির বলা যায়, যাহাকে কেহ মিথ্যা বলিয়া ধারণাও করিতে পারে না।

ঈসা (আ)-এর কথা বলার ঘটনাটি ছিল তাৎক্ষণিক। এমনও হইতে পারে যে, সেইখানকার শ্রোতাগণ তাহা বর্ণনা করিয়াছিলেন, কিন্তু লোকজন তাহাদিগকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিতে শুরু করিয়াছিল। অতঃপর বর্ণনাকারিগণ নিরব হইয়া যান। আর এইভাবে বিষয়টি চাপা পড়িয়া যায়। তাহা ছাড়া যদি ধরিয়াও লওয়া হয় যে, ঈসা (আ) দোলনায় থাকা অবস্থায় অনেক বার কথা বলিয়াছেন বা অনবরত কথা বলিতেইছিলেন কিন্তু লোকজন এই বিষয়টি বর্ণনার প্রতি তেমন গুরুত্বই দেন নাই। কারণ ইহার চাইতে আরও গুরুত্বপূর্ণ আলৌকিক ঘটনা ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে ঘটিয়াছিল। যেমন মৃতকে জীবিত করা, জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে নিরাময় করা, গায়েবী খবর দেওয়া, মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করা ইত্যাদি। এইগুলিই লোকমুখে বেশী বেশী আলোচিত হইয়া আসিতেছিল (প্রাগুক্ত)। অবশ্য মারয়াম (আ)-এর পবিত্রতা প্রমাণের দিক হইতে উক্ত বিষয়টি শুধু প্রাসংগিকই নহে, বরং খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ইহা ছাড়া শুধু হযরত ঈসা (আ) যে দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলিয়াছেন তাহা নহে, বরং বর্ণিত আছে যে, তিনি ব্যতীত আরও অনেকে দোলনায় শিশু অবস্থায় কথা বলিয়াছেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত আছে, মহানবী (সা) বলিয়াছেনঃ তিনজন দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলেন, তাহারা হইলেন ঈসা ইবন মারয়াম, জুরায়জের পবিত্রতার সাক্ষী শিশু ও জাব্বার প্রসঙ্গে দুগ্ধপোষ্য শিশু (সহীহ মুসলিম, ২খ , পৃ. ২৭৬)। অন্যান্য বর্ণনায় রহিয়াছে, ঈসা (আ), ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষ্যদাতা নবজাতক ও সাহেবে জুরায়াজ।

আসহাবুল উখদূদের ঘটনায় আসিয়াছে, এক ঈমানদার মহিলাকে ঈমান আনার অপরাধে আগুনে নিক্ষেপের সময় তাহার সাথে নবজাতক এক শিশু ছিল। সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুকে ফেলিয়া আগুনে ঝাঁপ দিবে কিনা এই ব্যাপারে এ মহিলা ইতস্তত করিতেছিল। আর তখন হঠাৎ করিয়া শিশুটি বলিয়া উঠিল, ওহে মাতা! আপনি ধৈর্য ধরুন, আপনি সত্যের উপরই আছেন (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৯১)।

দাহহাক হইতে বর্ণিত আছে যে, ছয়জন নবজাতক দোলনায় থাকা অবস্থায় কথা বলিয়াছেন। তাহারা হইলেন, ইউসুফ (আ)-এর পক্ষে সাক্ষীদাতা নবজাতক, ফেরাউনের স্ত্রীর মাথা আঁচড়ানো কাজে নিয়োজিত মহিলার শিশু, ঈসা (আ), ইয়াহ্ইয়া (আ), সাহেবে জুরায়জ ও সাহেবুল জাব্বার

(প্রাগুক্ত)। উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহে দেখা যায়, যুগে যুগে অনেক নবজাতক শিশু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কথা বলিয়াছেন, যাহা ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাই ঈসা (আ) মায়ের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অবশ্যই কথা বলিয়াছিলেন, কেননা তাহার প্রয়োজন ছিল।

পিতাবিহীন জন্মের হিকমত

হযরত আদম (আ)-এর পর আল্লাহ পাক যত মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদিগকে পিতা-মাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ্‌র নবী ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। মহান আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁহাকে পিতার মাধ্যম ছাড়া শুধু মাতার মাধ্যমেই সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহার পিছনে হিকমত বা রহস্য কি ? আর ইহা সম্ভব কিনা ? এই সম্পর্কে উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

(১) পিতাবিহীনভাবে ঈসা (আ)-এর জন্মলাভের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ সর্বশক্তিমান। কার্যকারণ বা উপকরণ ব্যতীত তিনি যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করিতে পারেন। কেননা বিশ্বজগতে প্রচলিত নিয়ম-কানুন যিনি প্রবর্তন করিয়াছেন তিনি ইচ্ছা করিলে স্বীয় ব্যবস্থাপনায় ইহার ব্যতিক্রমও ঘটাইতে পারেন। ঈসা (আ)-এর জন্ম আল্লাহ পাকের সেই ক্ষমতা ও শাশ্বত ইচ্ছার প্রতিফলন স্বরূপ।

উল্লেখ্য, ঈসা (আ)-এর জন্ম এমন সম্প্রদায়ে হইয়াছিল যাহারা বস্তুগত উপকরণকেই সবকিছু হওয়ার মাধ্যম মনে করিত। এমন এক যুগে তাঁহার জন্ম যখন সকল কিছুর সৃষ্টির ব্যাপারে কার্যকারণ তত্ত্বের দর্শনকেই একমাত্র সত্য বলিয়া প্রচার করা হইতেছিল। আর প্রাকৃতিক উপকরণ ব্যতীত ঈসা (আ)-এর জন্মলাভ করায় সৃষ্টিজগতে তিনি আল্লাহর আলৌকিক নিদর্শন হিসাবে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। বলা হইয়াছে,

وَلِنَجْعَلَهُ أيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وكَانَ اَمْرًا مَقْضِيًّا .

"আর আমি উহাকে এইজন্য সৃষ্টি করিব যেন সে হয় মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার নিকট হইতে এক অনুগ্রহ; ইহাতো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার" (১৯ : ২১)।

(২) ঈসা (আ)-এর পিতাবিহীন জন্ম ছিল এক রূহানী জগতের অস্তিত্বের সুস্পষ্ট ঘোষণা। এই ঘোষণা এমন এক সম্প্রদায়ের মাঝে যাহারা রূহানী জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করিত না। তাহারা মনে করিত মানুষ দেহ সর্বস্ব প্রাণী। তাহার রূহ বলিতে কিছু নাই। বলা হয় যে, মানুষ যে দেহ ও আত্মার সমষ্টি তাহা ইয়াহূদীরাও স্বীকার করিত না। দার্শনিক রেনান উল্লেখ করেন যে, গ্রীকরা মনে করিত, মানুষ দেহ ও রূহ সর্বস্ব জীব। তাই ইসরাঈলিরা গ্রীক শিক্ষার প্রতি বিদ্বেষবশত রূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে প্রত্যাখ্যান করে (শায়খ আবূ যাহরা, মুহাদিরাতু ফিন্ নাসরানিয়্যা, পৃ. ১৭-১৮)।

সুতরাং আল্লাহ পাক একটি রূহ সৃষ্টির মাধ্যমে এবং সেই রূহকে পুরুষের স্পর্শ ব্যতীত মারয়ামের গর্ভে প্রদান করিয়া তথা পিতা বিহীনভাবে ঈসা (আ)-কে সৃষ্টি করেন। ইরশাদ হইয়াছেঃ

"এবং স্মরণ কর সেই নারীকে যে নিজ সতীত্বকে রক্ষা করিয়াছিল, অতঃপর আমি তাহার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং তাহাকে ও তাহার পুত্রকে করিয়াছিলাম বিশ্ববাসীর জন্য এক নিদর্শন" (৬৬ ঃ ১২)।

এই সৃষ্টিকর্মে এক ফেরেশতা কর্তৃক মারয়ামের জামার ফাঁকে রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া ব্যতীত আর কোন উপকরণই ছিল না।

৩। আল্লাহ পাকের সৃষ্টিকর্মের পূর্ণাঙ্গতা বিধানের জন্যই ঈসা (আ)-এর পিতাবিহীন জন্মলাভ। কেননা মানুষ চারটি প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হইতে পারে।

(ক) পিতা-মাতাবিহীন ঃ যেমন আদমকে সৃষ্টি। (খ) মাতাবিহীন ঃ যেমন হাওয়া (আ)-কে সৃষ্টি। (গ) পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্টি ঃ যেমন সাধারণ মানুষ সৃষ্টি। (ঘ) পিতাবিহীন সৃষ্টি। তাই এই প্রকারের সৃষ্টি কৌশলের বহিঃপ্রকাশ হযরত ঈসা (আ)-এর জন্ম। প্রথমোক্ত তিন প্রকারের সৃষ্টির কথা আল্লাহ পাক কুরআন মজীদে বর্ণনা করিয়াছেন নিম্নোক্ত আয়াতে ঃ

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি তোমাদিগকে এক ব্যক্তি হইতেই সৃষ্টি করিয়াছেন ও যিনি তাহা হইতে তাহার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেন, যিনি তাহাদের দুইজন হইতে বহু নর-নারী ছড়াইয়াছেন" (৪ ঃ ১)।

আর চতুর্থ প্রকার মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে সুস্পষ্ট। বলা হইয়াছে ঃ

قَالَتْ رَبِّ اَنّٰى يَكُوْنُ لِىْ وَلَدٌ وَّلَمْ يَمْسَسْنِىْ بَشَرٌ قَالَ كَذٰلِكِ اللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ·

"সে (মারয়াম) বলিল, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে কোন পুরুষ স্পর্শ করে নাই, আমার সন্তান হইবে কিভাবে? তিনি বলিলেন, এইভাবেই; আল্লাহ যাহা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়" (৩ ঃ ৪৭)।

সুতরাং আল্লাহ্র পক্ষে ঈসা (আ)-কে পিতাবিহীন সৃষ্টি করা সম্ভব। তিনি সর্বশক্তির আধার। বর্ণিত আছে যে, নাজরানের খৃস্টান প্রতিনিধি দল মহানবী (স)-এর কাছে আসিয়া বলিয়াছিল, আপনার কি হইল যে, আমাদের সাহেব তথা প্রাণপুরুষকে গালি দিতেছেন? মহানবী (স) বলিলেন, আমি কি বলিলাম ? তাহারা বলিল, আপনি বলেন যে, তিনি আল্লাহ্র বান্দা। তখন মহানবী (স) বলিলেন, হাঁ, তিনি তো আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল এবং সেই কলেমা যাহাকে কুমারী মারয়াম (আ)-এর প্রতি ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া তাহারা রাগান্বিত হইল এবং বলিল, আপনি কি দেখিয়াছেন, কোন মানুষ পিতাবিহীন জন্মলাভ করিয়াছে? যদি আপনার দাবিতে সত্যবাদী হন তবে এইরূপ সৃষ্টির কোন নজীর দেখান। তখন আল্লাহ পাক নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন।

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ·

"আল্লাহ্‌র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদমের দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'হও', ফলে সে হইয়া গেল" (৩ ঃ ৫৯) (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৮৫-১৮৬)।

উল্লেখ্য যে, আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়, যাহার পিতা-মাতা কিছুই ছিল না। ইহা কি করিয়া সম্ভব হইল? যাহারা এই ধরনের সন্দেহ পোষণ করেন, তাহাদের সন্দেহ নিরসনে ঈসা (আ)-এর পিতাবিহীন জন্মটিও একটি নিদর্শনস্বরূপ। এই হিকমতের কারণেও আল্লাহ্ পাক ঈসাকে ঐভাবে সৃষ্টি করিলেন।

অপরদিকে আদম (আ)-এর সৃষ্টিতে তাঁহার কোন পিতা-মাতা ছিল না। কিন্তু ঈসা (আ)-এর সৃষ্টিতে পিতা না থাকিলেও মাতা ছিলেন। তাই ঈসা (আ)-এর সৃষ্টিকর্ম আরও সহজসাধ্য। তাহা ছাড়া উলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত যুক্তিও প্রদর্শন করিয়া থাকেন। যথা ঃ পুরুষের সকল শুক্রকীট নারীর গর্ভে প্রবেশের মাধ্যমে গর্ভধারণ সম্পন্ন হইয়া যায় না। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কোন একটি শুক্রকীট নারীর ডিম্বকোষের সহিত মিশ্রিত হওয়ার পরই ইহার প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কয়েকটি স্তর অতিক্রম করার পর তাহাতে রূহ প্রবেশ করে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, শুক্রকীটের অনুপ্রবেশ ও রূহের অনুপ্রবেশের পর্যায় হইল ভিন্ন ভিন্ন।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রজনন বিদ্যার বিভিন্ন কলাকৌশল, তত্ত্বাদি ও তথ্যাদি এবং সর্বোপরি এই ক্ষেত্রে সফলতা উপরিউক্ত বিষয়টিকে আরও সম্ভাবনাময় করিয়া তুলিয়াছে।

পিতাবিহীন জন্ম ও আল-কুরআন

হযরত ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে জমহূর তথা অধিকাংশ উলামার বিশ্বাস যে, তিনি পিতাবিহীন জন্মলাভ করিয়াছেন। কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহের স্পষ্ট ভাষ্য দ্বারা তাহাই প্রমাণিত। একথা ঠিক যে, আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই যে, ঈসা (আ)-এর কোন পিতা নাই। আধুনিক যুগে স্যার সৈয়দ আহমদ খান এবং ডঃ তৌফিক সিদ্দীকিসহ আরও কয়েকজন ব্যক্তি ভুল ব্যাখ্যা ও অলৌকিকতাকে এড়াইয়া যাওয়ার প্রয়াসে জমহূরের ঐ বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইয়া গিয়াছেন (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তরজমানুল কুরআন, ২খ., ৪৪৪-৪৫)। আর দুর্ভাগ্যবশত আধুনিক শিক্ষিত অনেকেই সেই ধরনের ধ্যান-ধারণা পোষণ করিতে শুরু করিয়াছেন। হযরত ঈসার প্রভুত্ব প্রমাণে একদিকে একদল খৃস্টান যেমন তাঁহাকে খোদার পুত্র সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, অন্যদিকে ইয়াহূদীরা তাঁহার জন্মকে অবৈধ বলিতেও দ্বিধাবোধ করে নাই।

(১) মারয়াম (আ)-এর সাথে কোন পুরুষের দৈহিক সম্পর্ক ঘটে নাই। তিনি নিজেকে হেফাজত করিয়াছিলেন। আর তখনই তাঁহার গর্ভে ঈসা (আ)-এর রূহ ফুঁকিয়া দেওয়া হয়। এই কথা আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ.

“আরও দৃষ্টান্ত দিতেছেন ইমরান তনয়া মারয়ামের, যে তাহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল। ফলে আমি তাহার মধ্যে রূহ ফুঁকিয়া দিয়াছিলাম এবং সে তাহার প্রতিপালকের বাণী ও তাহার কিতাবসমূহ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল। সে ছিল অনুগতদিগের একজন” (৬৬ ঃ ১২)।

(২) আল-কুরআনে মারয়ামের মত তাঁহার সন্তানের পূত-পবিত্রতা, দুনিয়া ও আখেরাতে লোক সমাজে সম্মানিত হওয়ার কথাও ব্যক্ত করা হইয়াছে। যেমন ঈসা (আ) সম্পর্কে আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ‏·

“সে ইহ ও পরলোকে সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে” (৩ ঃ ৪৫)।

(৩) আল-কুরআনে একাধিক জায়গায় হযরত ঈসা (আ)-কে সৃষ্টির নিদর্শন বলা হইয়াছে। পিতা-মাতার মাধ্যমে স্বাভাবিক জন্ম হইলে তিনি নিদর্শন কিভাবে হইলেন ? যেমন সূরা আম্বিয়াতে বলা হয়, وَابْنَهَا اٰيَةً لِلْعَالَمِيْنَ “এবং তাহার সন্তান জগৎবাসীর জন্য এক নিদর্শনস্বরূপ” (২১ ঃ ৯১)।

এমনিভাবে সূরা মুমিনূনে বলা হয়—

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَاُمَّهٗ اٰيَةً وَّاٰوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ‏·

“আর আমি মারয়ামের পুত্র (ঈসা) এবং তাহার মাকে (কুদরতের) নিদর্শনস্বরূপ বানাইয়াছি” (২৩ ঃ ৫০)।

(৪) ঈসা (আ)-এর পিতামাতা উভয়ের মাধ্যমে স্বাভাবিক জন্ম হইলে আল-কুরআনে তাঁহাকে হযরত আদম (আ)-এর সহিত তুলনা করা হইত না। আদম (আ)-এর কোন পিতা-মাতা ছিল না। ইহা স্বীকৃত বিষয়। এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর মাতা থাকিলেও পিতা ছিল না। পিতা না থাকার দিক দিয়া উভয়ের মধ্যে মিল আছে। সেজন্য তাঁহার সৃষ্টি আদম (আ)-এর সৃষ্টির সহিত তুলনা করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ مَثَلَ عِيْسٰى عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ‏·

“আল্লাহ্র নিকট ঈসার দৃষ্টান্ত আদম (আ)-এর দৃষ্টান্ত সদৃশ। তিনি তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, অতঃপর তাহাকে বলিয়াছিলেন, হও, ফলে সে হইয়া গেল” (৩ ঃ ৫৯)।

(৫) মানব সমাজে সন্তানদেরকে সর্বদা পিতার সহিত সম্পর্কিত করিয়া সম্বোধন করা হয়। কিন্তু আল-কুরআনে হযরত ঈসা (আ)-কে ২৩ বার ইব্ন মারয়াম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার কোন পিতা ছিল না। এইজন্য তাঁহাকে ইব্ন মারয়াম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৬) আল-কুরআনে আল্লাহ পাক বারবার ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার কোন সন্তানাদি নাই। যাহারা আল্লাহ্র পুত্র সাব্যস্ত করিতে চায় তাহাদের ভ্রান্ত আকীদাও খণ্ডন করা হইয়াছে। কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ۰ مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهٗ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ۰

"এই-ই মারয়াম-তনয় ঈসা। আমি বলিলাম্ সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্র কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমাময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলে, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়" (১৯ ঃ ৩৪-৩৫)।

অতএব আল-কুরআনের উপরিউক্ত স্পষ্ট বক্তব্যের পরও কাহাকেও ঈসা (আ)-এর পিতা সাব্যস্ত করার দাবি চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন বৈ কিছু নহে।

হযরত ঈসা (আ)-এর খৎনা ঃ ইয়াহূদীদের শরীয়াত অনুসারে নবজাতক শিশুকে জন্মের অষ্টম দিনে খৎনা করানো হয়। বার্নাবাসের বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে এই নিয়মটি মূসা (আ)-এর কিতাবে উল্লিখিত ছিল। তাই নবজাতক ঈসা (আ)-কে ইবাদত গৃহে লইয়া আসা হয় এবং তাহাকে খৎনা করানো হয় (ঐ. পৃ. ৫)।

জন্মের চল্লিশতম দিবসে বায়তুল মুকাদ্দাসে আগমন

হযরত ঈসা (আ) ইয়াহূদী সমাজে লালিত-পালিত হন। মূসা (আ)-এর শরীয়ত মতে ইয়াহূদীদের প্রথা অনুসারে কোন সন্তানের চল্লিশ দিন বয়স হইলে বরকতের দোআ ও পাক-পবিত্র হইবার জন্য বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হইত। সুতরাং হযরত মারয়াম (আ) স্বীয় সন্তান ঈসা (আ)-এর জন্মের চল্লিশ দিনে তাঁহাকে লইয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে গেলেন (লূক, ২ ঃ ২২-২৪)।

সম্ভবত তখনই সর্বপ্রথম ঈসা (আ)-কে জনসম্মুখে আনা হইয়াছিল এবং তাহাদের সামনে মারয়াম (আ) বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীন হইয়াছিলেন। আর তখনই ঈসা (আ) মায়ের পক্ষে ও নিজের পরিচয় দিতে কথা বলিয়াছিলেন। আর তখনই এই বিষয়টি ইয়াহূদী সমাজে লোকমুখে প্রচারিত হইয়া যায়। কেহ কেহ সন্দেহ করিলেও ইবাদতখানায় যাহারা মারয়াম (আ)-এর পূত-পবিত্রতা ও ইবাদত পর্যবেক্ষণ করিয়াছে তাহারা সেই অলৌকিক জন্মে বিশ্বাস করিয়াছে, এবং ঈসা (আ)-এর প্রতিও উচ্চ ধারণা পোষণ করিয়াছে। কেহ কেহ ভাবিয়াছে এই সন্তান ভবিষ্যতে মহান কেহ হইবেন। বর্ণিত আছে, জেরুসালেমে সামাউন নামে একজন ধার্মিক ও খোদাভক্ত লোক ছিলেন। একজন মাসীহ প্রেরণের মাধ্যমে আল্লাহ পাক কখন ইসরাঈলীদের দুঃখ দূর করিবেন সেই সময়ের জন্য তিনি অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি আল্লাহ্র ইবাদতে প্রচণ্ডভাবে মশগুল থাকার কারণে ইলহামের মাধ্যমে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি তাহার মৃত্যুর পূর্বেই প্রতিশ্রুত মাসীহকে দেখিতে পাইবেন। আর ঈসা (আ)-কে যেদিন বায়তুল মুকাদ্দাসে লইয়া যাওয়া হয় সামউন নামের সেই ব্যক্তিটিও সেই দিন সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈসা (আ)-কে কোলে লইয়া দোআ করেন এবং তিনিই যে প্রতিশ্রুত মাসীহ সেই ব্যাপারে মারয়াম (আ)-কে অবহিত করেন (লূক, ২ ঃ ৩৪-৩৫)।

নিরাপদ আশ্রয় লাভের উদ্দেশ্যে বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ

জন্মলাভের পর হযরত ঈসা (আ) প্রতিকূল পরিবেশের সম্মুখীন হন। তাঁহার অলৌকিক জন্ম, নবজাতক হিসাবে দোলনায় কথা বলা এবং আরও অলৌকিক কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকজন ধারণা করিতে শুরু করে যে, সম্ভবত এই শিশুই তাহাদের প্রতিশ্রুত মাসীহ্ বা ত্রাণকর্তা আর এই শিশুর বিষয়টি সেই সময়ে ইয়াহূদী রাজা হেরোদের দৃষ্টিও এড়ায় নাই। বর্ণিত আছে যে, হেরোদ রাজাও শিশু ঈসা (আ)-কে গোপনে হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছিল। অন্যদিকে কিছু কিছু মুনাফিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের মাধ্যমে ঈসা (আ)-এর জন্মকে কেন্দ্র করিয়া তিক্ত রটনাও গোটা পরিবেশকে বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছিল। মোটকথা, এই অস্বস্তিকর ও নিরাপত্তাহীন পরিবেশে ঈসা (আ)-কে লালন-পালন করার জন্য তাহার মা উপযুক্ত মনে করেন নাই। তাই তিনি সন্তর্পণে ঈসা (আ)-কে লইয়া বায়তুল মুকাদ্দাস ত্যাগ করিলেন, যাহাতে শিশু ঈসার পরিচয় গোপন রাখিয়া সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে লালন-পালন করা সম্ভব হয়।

বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে বাহির হইয়া ঈসা (আ)-এর মা কোথায় গিয়াছিলেন তাহা লইয়া অনেক কিংবদন্তি ইয়াহূদী ও খৃস্টান সমাজে সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার যথার্থতা সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নহে।

বায়তুল মুকাদ্দাসের ইবাদতখানায় ঈসা (আ)-এর খৎনা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর মারয়াম (আ) স্বীয় সন্তানকে লইয়া গালীল প্রদেশে তাঁহার নিজ গ্রাম নাসরতে ফিরিয়া যান। আর এইভাবে তিনি সেইখানে লালিত-পালিত হন (লূক, ২ ঃ ৩৯-৪০)।

রাজা হেরোদ সমস্ত প্রধান ধর্মীয় নেতা ডাকিয়া ইয়াহূদীর বেথেলহামে ঈসা (আ)-এর জন্মের বিষয়টি নিশ্চিত হন এবং তাঁহাকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন (মথি, ১ ঃ ১৩)। এদিকে মারয়ামের সহযোগী সাথী ইউসুফ স্বপ্নে আদিষ্ট হইলেন যে, হেরোদ শিশু ঈসাকে বিনাশ করিতে চায়। তাই তুমি মা-পুত্রকে লইয়া অতি শীঘ্র মিসরে চলিয়া যাও। আর তিনি ঘুম হইতে উঠিয়া তাহাদেরকে লইয়া মিসরে চলিয়া গেলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই রহিলেন (বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ৬-৭; মথি সুসমাচার, ২ ঃ ১৩-১৪)।

স্মর্তব্য, হযরত ঈসা (আ)-কে নাসরতে লইয়া যাওয়ার বর্ণনাটি একমাত্র লূক সুসমাচার সূত্রেই পাওয়া যায়। কিন্তু অপর অধিকাংশ বর্ণনায় দেখা যায় যে, তাঁহাকে লইয়া মিসরেই যাওয়া হইয়াছিল। যদিও মিসরে পালাইয়া যাওয়ার উপলক্ষ বা কারণ সম্পর্কে মতভেদ আছে।

আল্লামা রহমতুল্লাহ কীরানবী এই ঘটনার সমালোচনা করিয়াছেন। কেননা ঘটনার এক পর্যায়ে বলা হয় যে, পারস্য পণ্ডিতেরা ঈসা (আ)-এর সন্ধান লাভ করার পর স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া যখন নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন এবং হেরোদ রাজার সাথে সাক্ষাৎ করিলেন না তখন হেরোদ ভীষণ রাগিয়া গিয়াছিল এবং সেই পণ্ডিতদের নিকট হইতে যে সময়ের কথা সে জানিয়াছিল সেই সময়ের হিসাব মতে দুই বৎসর ও তাহার কম বয়সের যত ছেলে বেথেলহাম ও তাহার আশেপাশের জায়গাগুলিতে ছিল সকলকে হত্যা করার হুকুম দিয়াছিল (মথি, ২ ঃ ১৬-১৭)।

আল্লামা রহমতুল্লাহ কীরানবী বলেন, এই বিষয়টি ঐতিহাসিক বর্ণনা ও যুক্তি উভয় দিক দিয়াই ভ্রান্ত বলিয়া ধরা যায়। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, খৃস্টান ঐতিহাসিকসহ অন্যান্য নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিকদের কেহই ঐ ঘটনার উল্লেখ করেন নাই (রহমতুল্লাহ কীরানবী, ইযহারুল হক, ২খ, পৃ. ৩০৭-৩০৮)।

তাঁহার মিসর গমনের প্রাক্কালে প্রতিকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার আরও কিছু কারণ বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া যায়। কাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র) সুদ্দী (র)-এর সূত্রে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেন। সূদ্দী (র) বলেন, ঈসা (আ) মকতবে শিশুদের বলিতেন, কাহার বাপ কি খাবার তৈরী করিয়াছে। কাহাকে ও বলিতেন, যাইয়া দেখ বাড়ির সকলে এই খাইয়াছে। তোমার জন্য অমুক অমুক খাবার তুলিয়া রাখিয়াছে। ছেলেটি বাড়ি চলিয়া যাইত এবং সে খাবার চাহিত, না দিলে বায়না ধরিত, কান্নাকাটি করিত, শেষ পর্যন্ত তাহাদেরকে তাহা দিতেই হইত। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, কে বলিয়াছে তোমার জন্য এই খাবার রাখা হইয়াছে। সে বলিত, ঈসা (আ)। ফলে তাহারা তাহাদের শিশুদের আটকাইয়া রাখিল এবং বলিল, সে একজন যাদুকর। তাঁহার কাছে আর যাইও না। একবার তাহারা শিশুদের একটি ঘরে একত্র করিল। ঈসা (আ) তাহাদের ডাকিতে আসিলেন, কিন্তু তাহারা বলিল, তাহারা এইখানে নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা হইলে এই ঘরে কি? তাহারা বলিল, এক পাল শূকর। তিনি বলিলেন : তবে তাহাই হইবে। তিনি চলিয়া গেলে তাহারা শিশুদের ছাড়িয়া দিতে আসিয়া দেখিল একপাল শূকর। মুহূর্তের মধ্যে এই সংবাদ বনূ ইসরাঈলে ছড়াইয়া পড়িল। ফলে তাহারা তাঁহার পিছনে লাগিয়া গেল। ঈসা (আ)-এর মা ভয় পাইয়া গেলেন, হয়ত তাহারা ঈসা (আ)-কে মারিয়াই ফেলিবে। সুতরাং তিনি তাঁহাকে লইয়া একটি গাধায় সওয়ার হইলেন এবং মিসরে পালাইয়া গেলেন (কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, ২খ., পৃ. ২৯৬-২৯৭; তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৪০৪)।

মোটকথা, একদিকে হেরোদের ষড়যন্ত্র, অন্যদিকে ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইবার প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতি তাঁহাকে অধিকাংশের মতে মিসরে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। এই শয়নের আশ্রয়ের কথা আল-কুরআনেও উল্লেখ করা হইয়াছে। তবে তাহা মিসরে না অন্য কোথাও তাহা স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। বলা হইয়াছে :

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنٰهُمَا اِلٰى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَّمَعِيْنٍ ـ

"আর আমি মারয়াম তনয় ও তাহার জননীকে করিয়াছিলাম এক নিদর্শন, তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণবিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে" (২৩ : ৫০)।

আল্লামা ইব্ন কাছীর বলেন, আয়াতে 'রাবওয়া' শব্দটির অর্থ সমতল ভূমি হইতে উচ্চ এলাকা যাহার শীর্ষদেশ সমতল ও বাসযোগ্য। এই প্রশস্ত উচ্চ ভূমি হওয়া সত্ত্বেও সেইখানে ঝরণাধারা প্রবাহিত ছিল (ইব্ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৭১-৭২)।

এই অঞ্চলটি সম্পর্কে মুফাসসিরীনে কেরাম-এর মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কাহারও মতে ঈসার জন্মস্থান বেথেলহাম, কাহারও মতে বর্তমান দামিশ্কের নদীমাতৃক অঞ্চল, কাহারও মতে রামলা

অঞ্চল, কাহারও মতে মিসর (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২; আরও দ্র. তাফসীরে নাসাফী, ২খ, পৃ. ১৩৭)। তবে ইহার যে পরিচয় উক্ত আয়াতে বিধৃত হইয়াছে তাহা উচ্চ ভূমিতে নদী বা ঝর্না প্রবাহিত কোন এলাকায় হইবে। অধিকাংশের মতে, তাহা নীল নদ বিধৌত মিসর অঞ্চলকেই বুঝানো হইয়াছে। আল্লামা ইবন কাছীর খৃস্টানগণ ধারণা করিত যে, ঈসা (আ)-কে মিসরেই লইয়া যাওয়া হইয়াছিল তাঁহার মাতাসহ তিনি 'আয়ন শামস নামক শহরে বসবাস করিয়াছিলেন। খৃস্টানরা আরও বলে যে, মা মারয়াম ও মাসীহ যে গাছের ছায়াতলে অবস্থান করিতেন সেই গাছটি অনেক দিন পর্যন্ত টিকিয়াছিল। খৃস্টানগণ ইহার নামকরণ করিয়াছিল শাজারাতুল 'আযারা বা কুমারী বৃক্ষ যাহা পরিদর্শনের জন্য লোকজন ভ্রমণ করিত। ইহা আল-মাতারিয়া নামক শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত (আবদুল ওয়াহ্হাব নাজ্জার, প্রাগুক্ত)।

ইহা ছাড়া ফ্রান্সের এক প্রত্নতাত্ত্বিক মিসর হইতে ৮৩ খৃস্টাব্দের একটি লিখিত পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করেন, মাসীহ্ বাল্যকালে মিসরে অবস্থানের কথা উল্লেখ আছে (ইসলামী ইনসাইক্লোপেডিয়া, উর্দু, সম্পাদনা সৈয়দ কাসিম মাহমুদ, পৃ. ১১০৮)।

স্বদেশ নাসেরাতে প্রত্যাবর্তন ও বসবাস

হযরত ঈসা (আ)-এর মাতার জন্মস্থান ছিল নাসরাত জনপল্লী। হযরত মারয়াম স্বীয় সন্তানকে লইয়া কখন বিদেশ বিভূঁই হইতে স্বদেশভূমি নাসেরাতে আসিয়াছিলেন সেই ব্যাপারে মতবিরোধ আছে। মথি সুসমাচার, বার্নাবাসের বাইবেল ও কতিপয় মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে ইয়াহূদী রাজা হেরোদের মৃত্যুর পরই তিনি মিসর হইতে নাসেরাতে চলিয়া আসিয়াছিলেন (মথি, ২ ঃ ২০-২৩; বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ.৭; তারীখে তাবারী, ১খ, পৃ. ৭২৯)। বার্নাবাসের বর্ণনামতে তখন ঈসা (আ)-এর বয়স ছিল সাত বৎসর (বার্নাবাসের বাইবেল, প্রাগুক্ত)।

ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ-এর এক বর্ণনায় দেখা যায়, ঈসা (আ)-এর ১২ বছর বয়স হওয়া পর্যন্ত তিনি মিসরেই ছিলেন। অন্য বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি সেখানে ১৩ বৎসরে পদার্পণ করিবার পর তাঁহাকে মিসর হইতে জেরুসালেমে ফিরিয়া আসিবার আদেশ দেয়া হয় (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০-৭২)।

আল্লামা হিফযুর রহমান সিউহারবী উল্লেখ করেন, হযরত মারয়াম (আ) শিশু ঈসা (আ) -কে লইয়া মিসরে তাঁহার কোন আত্মীয়ের কাছে চলিয়া যান এবং পরে সেখান হইতে নাসেরায় চলিয়া আসেন। ঈসা (আ) যখন তের বৎসরে পদার্পণ করিলেন তখন তিনি তাঁহাকে সাথে করিয়া পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়া আসিলেন (সিওহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৪খ, পৃ. ৪১)।

মথি ও বার্নাবাসের বাইবেল হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতার মিসর হইতে ফিরিয়া আসার উপলক্ষ হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, হেরোদের মৃত্যুর পর একদা স্বপ্নযোগে মারয়ামের সাথী ইউসুফ আদিষ্ট হইলেন যে, তিনি যেন তাহাদেরকে লইয়া ইয়াহূদায় ফিরিয়া আসেন (বার্নাবাসের বাইবেল,

পৃ. ৭; মথি, ২ ঃ ১৯-২০)। অন্য বর্ণনায় আছে যে, ঈসা (আ)-এর বয়স বার অতিবাহিত হওয়ার পর বায়তুল মুকাদ্দাসের শাসকের মৃত্যু হইলে হযরত যাকারিয়া (আ) হযরত মারয়ামকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তখন হযরত মারয়াম (আ) তাঁহার সন্তানসহ বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরিয়া আসিলেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ৫খ, পৃ. ৫০৫)।

উল্লেখ্য যে, খৃস্টানদের বাইবেলসহ মুসলিম ঐতিহাসিকদের অধিকাংশ কিতাবে বর্ণিত হয় যে, নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তিনি সেই নাসেরাত পল্লীতেই বসবাস করিয়াছিলেন এবং খৃস্টানদের কিছু কিছু উৎস ইংগিত করে যে, সেই নাসরাত হইতে তিনি মারয়াম এবং ইউসুফের সহিত বার্ষিক উৎসব বা ঈদুল ফেসাখ পালনের জন্য প্রতি বৎসর জেরুসালেমে আগমন করিতেন।

তাঁহার বয়স যখন বার বৎসর তখন জেরুসালেমে ঈদ উৎসবে অংশগ্রহণ শেষে ইবাদতখানার ইয়াহূদী আলেমদের সহিত আলোচনায় লিপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। অবশেষে মারয়াম এক দিনের পথ চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহাকে না পাইয়া আবার জেরুসালেমে ফিরিয়া আসিয়া ইবাদতখানায় ঈসা (আ)-কে পাইলেন। অতঃপর ঈসা (আ) তাহাদের সঙ্গে নাসেরাতে ফিরিয়া গেলেন এবং তাহাদের সাথেই রহিলেন (দ্র. লুক, ২ ঃ ৪১-৫১)। ইহা হইতে বুঝা যায়, নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত সময়টুকু তিনি নাসেরাতেই কাটাইয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে নাসরাতের ঈসা বলিয়া অভিহিত করা হইত (মথি, ২ ঃ ২৩)।

তবে কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, তিনি মিসর হইতে জেরুসালেমে ফিরিয়া আসেন এবং নবুওয়াত লাভ পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করিয়াছিলেন (ইবন কাছীর, ২খ, পৃ. ৭২)। তবে ইহা তৎকালীন প্রেক্ষাপট ও প্রসিদ্ধ বর্ণনার পরিপন্থী। কারণ মথি ও বার্নাবাসের বাইবেলের তথ্যে দেখা যায় যে, হেরোদ মৃত্যুবরণ করিলেও তাহার পুত্র আকিলাস সেই পদে সমাসীন হন। তিনিও পিতার ন্যায় প্রতিহিংসাপরায়ণ জানিতে পারিল সেখানে বসবাস ভীতিপ্রদ বিবেচনায় ঈসা (আ)-কে ইয়াহূদীয়া প্রদেশের জেরুসালেম হইতে গালীল প্রদেশের নাসরাত জনপল্লীতে লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনি সেখানেই বসবাস করেন (বার্নাবাসের বাইবেল, প্রাগুক্ত, ২ ঃ ২২-২৩)। অতএব তিনি দুইবার হিজরত করেন। একবার জেরুসালেম হইতে মিসরে, আবার জেরুসালেম হইতে নাসেরাতে।

ঈসা (আ)-এর শিক্ষালাভ

ঈসা (আ) ছিলেন আল্লাহর নবী। তাই তাঁহার মূল শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। আল্লাহই তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীর ব্যুৎপত্তি দান করিয়াছিলেন। আল-কুরাআনেও সরাসরি সেই শিক্ষা দেওয়ার নেয়ামত সম্পর্কে উল্লেখ আছে। বলা হইয়াছে—

"আল্লাহ বলিবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সাথে কথা বলিতে, তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজিল শিক্ষা দিয়াছিলাম" (১৯ ঃ ১১০)।

ঈসা (আ)-এর লালন-পালন ও শিক্ষার ব্যাপারে বাইবেলেও কিছু কিছু ইশারা পাওয়া যায়। "পরে বালকটি বাড়িয়া উঠিতে ও বলবান হইতে লাগিলেন, জ্ঞানে পূর্ণ হইতে থাকিলেন, আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ তাহার উপর ছিল" (লূক, ২ ঃ ৪০)। বার বৎসর বয়সে জেরুসালেমে যাত্রাশেষে যখন আবার তিনি নাসরাতে ফিরিয়া যান সেই অবস্থা সম্পর্কেও নিম্নরূপ বিবরণ রহিয়াছে ঃ "পরে যীশু জ্ঞানে ও বয়সে এবং ঈশ্বরের ও মনুষ্যের নিকটে অনুগ্রহে বৃদ্ধি পাইতে থাকিলেন (লূক, ২ঃ ৫২; আরো দ্র. বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ৭)।

মোটকথা, আল্লাহই তাঁহাকে ইলহাম ও ওহীর মাধ্যমে সব শিক্ষা দেন। প্রাচীন তাফসীর গ্রন্থসমূহেও এমন একাধিক বর্ণনা পাওয়া যায়, যাহাতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে শিক্ষালয়ে ভর্তি করিয়া দেওয়ার একটি ধারণা সৃষ্টি হয়।

ইবন জারীর তাবারী স্বীয় তাফসীরে ইব্ন ইসহাকের সূত্রে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আ)-এর বয়স যখন নয় কি দশ তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক মকতবে ভর্তি করিয়া দিলেন। জনৈক শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে তিনি থাকিতেন। কিন্তু তাঁহাকে কোন কিছু শিখাইতে গেলে তিনি নিজেই তাহা বলিয়া দিতেন। শিক্ষক বলিতেন, আরে এই ছেলের কাণ্ড দেখিয়া তোমরা কি বিস্মিত হইতেছ না ? আমি কিছু শিখাইতে গেলে দেখি উক্ত বিষয়ে সে আমার চাইতেও বেশী জানে (তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ, ৪০৩)। ইবন কাছীর বলেন, তাঁহার বয়স যখন ৭ বৎসর তখন তাঁহার মা তাঁহাকে মকতবে শিক্ষার জন্য পাঠান কিন্তু কোন বিষয় শিক্ষক বলিবার পূর্বেই তিনি তাহা বলিয়া দিতে শুরু করিতেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১)।

আলূসী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, ইহাই প্রমাণ করে যে, তাঁহার ইল্ম ছিল পুরাটিই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রদত্ত (তাফসীর, ৩খ, পৃ. ১৬৭)। এইজন্য দেখা যায়, তাঁহার জন্ম সম্পর্কে তাঁহার মায়ের নিকট যখন সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তখন তাঁহাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাহা কিছু শিক্ষা দিবেন তাহার কথাও বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যেমন আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ـ

"এবং তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইঞ্জীল" (৩ ঃ ৪৮)।

উপরিউক্ত আয়াতে কিতাব শিক্ষা দিবেন বলার সূত্র ধরিয়া মুফাসসিরীনে কিরাম বলেন যে, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ)-কে সুন্দর হাতের লিখা শিক্ষা দিয়াছিলেন (আলাউদ্দীন বাগদাদী , তাফসীরুল খাযিন, ১খ, পৃ. ২৫১; আরও দ্র. তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৯২)। ইবন জারীর তাবারী বলেন যে, তারপর তাঁহাকে কিতাব অর্থাৎ লিখন পদ্ধতি শিক্ষা দেন (তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৩৯৬)। আর হিকমত শিক্ষার অর্থ হইল বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শরীয়তের বিধানসমূহ শিক্ষা দেওয়া (তাফসীরুল খাযিন, প্রাগুক্ত)।

বর্ণিত আছে যে, তিনি রঞ্জন বিদ্যাও অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মা এক রঙ কারকের (সাব্বাগ নিকট তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন যেন তাঁহাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দেন। অথচ ঐ সাব্বাগ যখন

তাহাকে কিছু শিক্ষা দিতেন তখন মনে হইত যেন ঈসা (আ)-ই তাহার চাইতে বেশী জানেন। একদা ঐ সাব্বাগ কোন এক কাজে কোথাও চলিয়া গেলেন এবং বলিয়া গেলেন, এখানে বিভিন্ন প্রকারের কাপড় আছে এবং প্রত্যেকটিতে চিহ্ন দেওয়া আছে, এইগুলিকে ঐসকল রঙ দ্বারা রঞ্জিত কর। অতঃপর ঈসা (আ) এক ধরনের দানা জ্বালাইলেন এবং তাহাতে সব কাপড় রাখিয়া দিলেন আর বলিলেন, আমি যেরূপ ইচ্ছা করি আল্লাহ্র নির্দেশে সেরূপ হইয়া যাও। অনন্তর সেই সাব্বাগ ফিরিয়া আসিল। আর ঈসা (আ) যাহা করিয়াছিলেন সেই ব্যাপারে তাহাকে অবহিত করিলেন।

তখন সে বলিল, তুমি তো সব কাপড় নষ্ট করিয়া দিয়াছ। ঈসা (আ) বলিলেন, যান, অতঃপর দেখুন। অনন্তর সেই ব্যক্তি কাপড় বাহির করা শুরু করিল যাহা একটি তাহার চাহিদামত ছিল লাল, অন্যটি সবুজ, আরেকটি হলুদ। অতঃপর উপস্থিত সকলেই তাহা দেখিয়া আশ্চর্য হইল (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৭৬)।

Encyclopaedia Britannica-এর বর্ণনামতে ঈসা (আ) কৃষিজীবি মানুষের মধ্যে বসবাস করিতেন (Vol. 13, p. 15)। তাই সম্ভবত তিনি কৃষি বিদ্যাতেও পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। Encyclopedia Americana মন্তব্য করে যে, ঈসা গালিলীতে বাস করার কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পর্যটন পথের সংস্পর্শে ছিলেন, যেখান হইতে ব্যবসায়ীরা মিসর ও উত্তর আফ্রিকা, ব্যাবিলন, ভারতবর্ষ, স্পেন ইত্যাদি এলাকার লোকজনের আসা-যাওয়া ছিল। তাহা ছাড়া গালিল ছিল ইয়াহূদী, অ-ইয়াহূদী, পৌত্তলিক, ধনী, গরীব, বিভিন্ন ধরনের লোকের বাসস্থল। তাই গরীব ও নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা তাঁহার বৈশিষ্ট্য ছিল (vol. 16, p. 42)।

মোটকথা, তাঁহার নবুওয়ত-পূর্ব জীবন সম্পর্কে সঠিক তথ্য কমই জানা যায়। ইবন কাছীর (র) ইসহাক ইবন বিশর-এর সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, ঈসা (আ) সেই শিশুকালে যখন কথা বলিতে শুরু করেন তখন প্রথমেই আল্লাহ্র প্রশংসামূলক স্তুতি এমনভাবে করিতে শুরু করিয়াছিলেন যাহা মানুষ কখনও শুনে নাই। তিনি সূর্য, চন্দ্র, পাহাড়, নদী, ঝরনা এই ধরনের কোন কিছুকেই ডাকেন নাই বা তাহাদের কাছে প্রার্থনা করেন নাই, বরং একমাত্র আল্লাহরই মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়াছেন। ইবন কাছীর এই সূত্রে হযরত ঈসা (আ)-এর এক দীর্ঘ দু'আর উল্লেখ করিয়াছেন (দ্র. প্রাগুক্ত)। মোটকথা, বার বৎসর হইতে উনত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঈসা (আ) কিভাবে অতিবাহিত করেন, কোথায় ছিলেন, বাইবেলগুলি এই ব্যাপারে নীরব ভূমিকা পালন করে। আল-কুরআন ও হাদীছে এই ব্যাপারে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। আল্লাহ্ই অধিক জ্ঞাত।

নবুওয়তপ্রাপ্তি ও ইঞ্জীল লাভ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে বনূ ইসরাঈল বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত ছিল। তাহারা আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মে গোমরাহীতে নিমজ্জিত ছিল, এমনকি তাহারা নবী-রাসূলগণকে পর্যন্ত হত্যা করে। ইয়াহূদীয়ার বাদশা হেরোদ সম্পর্কে জানা যায় যে, সে তাহার

প্রেমিকার ইঙ্গিতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মত এক মহান নবীকে লোমহর্ষক পন্থায় হত্যা করায় (দ্র. ইয়াহ্ইয়া নিবন্ধ)। হযরত ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশায় এবং নবুওয়ত প্রাপ্তির পূর্বে এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৪২)।

গোটা ইয়াহূদী এলাকায় রোমান শাসকরা নিষ্পেষণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বরাবরই চালাইয়া যাইতেছিল। ইয়াহূদী সমাজের অভ্যন্তরেই সৃষ্টি হইয়াছিল সেই বিদেশী শোষকদের এক চাটুকারের দল। এহেন এক বিভীষিকাময় পরিবেশে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বনূ ইসরাঈল জাতিকে হেদায়াত দান এবং তাহাদেরকে বিপর্যয় হইতে রক্ষা করার জন্য হযরত ঈসা (আ)-কে তাহাদের মধ্যে পাঠাইয়াছিলেন।

হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতর সুসংবাদ

যেই জাতির মধ্যে আল্লাহ তা'আলা কোন নবী পাঠান, পূর্ব হইতেই আগের নবীগণ তাঁহার আগমনের সুসংবাদ দিতে থাকেন, যাহাতে তাঁহার দাওয়াতের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। হযরত ঈসা (আ) সেই সকল রাসূল-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই কারণে বনূ ইসরাঈলের নবীগণের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক নবী তাঁহার আগমনের পূর্ব হইতে তাঁহার সম্পর্কে সুসংবাদ দিতে থাকেন। এই সুসংবাদের কারণেই বনূ ইসরাঈলের লোকেরা দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

বাইবেলে নানা ধরনের বিকৃতি সত্ত্বেও তাহাতে এই ধরনের কতিপয় সুসংবাদ বাণী এখনও বর্তমান রহিয়াছে, যাহা হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের সহিত সম্পৃক্ত। হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের পূর্বে কয়েক জন নবীর ভবিষ্যদ্বাণী ও সুসংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ

(১) হযরত মূসার ভবিষ্যদ্বাণী ঃ Old Tastament-এর দ্বিতীয় বিবরণে আছে, "তিনি (মূসা) বলিলেন, সদাপ্রভু সিনাই হইতে আসিলেন এবং সেয়ীর হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন" (৩৩ ঃ ২)।

এই সুসংবাদের মধ্যে "সিনাই হইতে সদাপ্রভুর আগমন" হযরত মূসা (আ)-এর নবুওয়তের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে এবং সেয়ীর হইতে উদিত হওয়া বাক্যাংশ দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত বুঝানো হইয়াছে। কেননা এই পাহাড়ের বেথেলহাম নামক স্থানেই তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

(২) হযরত যিশাইয় ও মীখা-এর ভবিষ্যদ্বাণী ঃ তাঁহারা উভয়ে বনূ ইসরাঈলের শেষ যুগ সম্পর্কে উল্লেখ করেন, "সিয়োন হইতে ব্যবস্থা ও যিরুশালেম হইতে সদাপ্রভুর বাক্য নির্গত হইবে "(যিশাইয়, ২ ঃ ৩; মীখা, ৪ ঃ ২)। এইখানে উল্লেখ্য যে, ফেরেশতা যখন হযরত মারয়াম (আ)-এর নিকট ঈসা (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছিলেন তখন তাহাতে হযরত ঈসা (আ)-কে কালিমাতুল্লাহ বা আল্লাহ্‌র বাণী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছিল। এই মর্মে আল-কুরআনেও ইরশাদ হইয়াছে ঃ "হে মারয়াম! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে তাহার কলেমার সুসংবাদ দিতেছেন" (৩ ঃ ৪৫)।

হযরত যিশাইয় আরও স্পষ্ট করিয়া অন্য স্থানে বলিয়াছেন, "একজনের রব, সে ঘোষণা করিতেছে, তোমরা প্রান্তরে সদা প্রভুর পথপ্রস্তুত কর, মরুভূমিতে আমাদের ঈশ্বরের জন্য রাজপথ সরল কর। প্রত্যেক উপত্যকা উচ্চীকৃত হইবে, প্রত্যেক পর্বত ও উপপর্বত নিম্ন করা যাইবে, বক্রস্থান সরল হইবে, উচ্চ নীচ ভূমি সমস্থলী হইবে। আর সদাপ্রভুর প্রতাপ প্রকাশ পাইবে। আর সমস্ত মর্ত্য একসঙ্গে তাহা দেখিবে, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে" (যিশাইয়, ৪০ ঃ ৩-৫)।

উপরে 'একজনের রব ঘোষণা করিতেছে' যাহা বলা হইয়াছে, সেই সরব ঘোষণাকারী দ্বারা উদ্দেশ্যে হযরত ইয়াহইয়া (আ), আর সদাপ্রভুর পথ বলিতে ঈসা (আ)-এর দাওয়াতে হককে বুঝানো হইয়াছে (মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, এম, এ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ, পৃ. ৩০১)। আর "উচ্চ নীচ ভূমি সমস্থলী হইবে"এই কথা দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর সাম্যের বাণীর প্রতি ঈঙ্গিত করা হইয়াছে। কারণ বনূ ইসরাঈল সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে প্রচণ্ড শ্রেণীপ্রথা ও দলাদলি শুরু হইয়াছিল। ঈসা (আ) আসিয়া তাহার অপনোদন ঘটাইবেন।

যিরমিয় কর্তৃক ভবিষ্যদ্বাণী ঃ হযরত যিরমিয় হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "সদাপ্রভু বলেন, দেখ এমন সময় আসিতেছে যে সময়ে আমি ইস্রায়েল কুলের ও যিহুদা কুলের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিবে। মিসর দেশ হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্ত গ্রহণ করিবার দিনে আমি তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম সেই নিয়মানুসারে নয়; আমি তাহাদের স্বামী হইলেও তাহারা আমার সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু সেই সকল দিনের পর আমি ইস্রায়েল কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব ও তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব ও তাহারা আমার প্রজা হইবে" (যিরমিয়, ৩১ ঃ ৩১-৩৩)।

উপরিউক্ত ভবিষ্যতদ্বাণীটির ভাবার্থ সুস্পষ্ট। উহাতে বর্ণিত নূতন নিয়ম দ্বারা ইঞ্জীলকেই বুঝান হইয়াছে। বনূ ইসরাঈলের প্রথম প্রতিশ্রুত নিয়ম বা Old Testament শুরু হয় হযরত ইবরাহীম (আ) হইতে (আদিপুস্তক ১৩ ঃ ১৫)।

আল্লাহ বলিলেন, "আমার প্রতিশ্রুতি জালিমদের প্রতি প্রযোজ্য নহে" (সূরা বাকারা ঃ ১২৪)।

সেই 'আহ্‌দ' বা চুক্তিবদ্ধ নিয়মের নবায়ন হযরত ইসহাক ও ইয়াকূব হইতে চলিয়া আসিতেছিল আর মূসা ও হারূন (আ)-এর যুগে তাহা পূর্ণতা লাভ করে। মূসা (আ)-এর পর সেই নিয়ম চলিতে থাকে, তাঁহার পর হযরত ঈসা (আ) আসিয়া নূতন নিয়ম চালু করেন। আর তাহার মাধ্যমেই বনূ ইসরাঈল নূতন চুক্তিবদ্ধ নিয়ম বা নিউ টেস্টামেন্ট (New Testament) লাভ করে। আর এই কারণে পরবর্তীতে ঈসা (আ)-এর পূর্ববর্তী তাওরাত ও তাহার সংশ্লিষ্ট কিতাবগুলি লইয়া সংকলিত হয় পুরাতন নিয়ম (Old Testament)। আর চার ইঞ্জীল ও তাহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিতাব নিয়া সংকলিত হয় নূতন নিয়ম (New Testament)। আর ইহার সমষ্টিই হইল বর্তমান বাইবেল।

উপরিউক্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে ইসরাঈল কুল ও যিহুদা কুল বলিয়া আলাদা আলাদা উল্লেখ করা হয় এবং তাহাদের জন্য এক নূতন নিয়ম স্থির করিবার সুসংবাদ দেওয়া হয়। একথা সত্য যে, হযরত

মূসা (আ)-এর পরে বনূ ইসরাঈল জাতি মূলত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ঃ (১) যিহূদা কুল ও (২) ইসরাঈল কুল।

হযরত সুলায়মান (আ)-এর পুত্র রাহবিয়ামের সময়ে বনূ ইসরাঈল জাতির ঐ দুই দল আলাদা আলাদা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক লেনদেনের ক্ষেত্রেও তাহাদের মধ্যে আরও দূরত্ব বাড়িয়া যায়। হযরত ঈসা (আ) আসিয়া এই দলাদলির অবসান ঘটান এবং তাহার শিক্ষা বনূ ইসরাঈলের বিশেষ গোত্রের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না, বরং তাঁহার সম্বোধন ছিল গোটা ইসরাঈল জাতির প্রতি।

(৫) হযরত যোয়লে ও মালাখির ভবিষ্যদ্বাণী ঃ হযরত যোয়লে ও মালাখিও ঈসা (আ) সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন।

(৬) ভবিষ্যদ্বাণী ঃ মথি সুসমাচারে আসিয়াছে, বনূ ইসরাঈলদের মাঝে এক ভাববাদী তথা নবী লিখিয়া গিয়াছেন যে, মাসীহ যিহুদার বেথেলহামে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি নিম্নরূপ লিখিয়া গিয়াছিলেন ঃ "আর তুমি, হে যিহুদা দেশের বৈৎলেহম, তুমি যিহূদার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোনমতে ক্ষুদ্রতম নও, কারণ তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন্ন হইবেন যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন" (মথি সুসমাচার, ২ ঃ ৬)।

(৭) হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক ঈসা-এর আগমন ঘোষণা ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আ) স্বীয় দাওয়াত প্রচারকাজে হযরত ঈসা (আ)-এর আগমনের বিশেষ ঘোষক ছিলেন, যাহা এমনকি আল-কুরআনেও বর্ণিত হইয়াছে। হযরত ইয়াহ্ইয়ার পিতা যাকারিয়্যা (আ)-কে যখন ইয়াহ্ইয়ার জন্ম সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তখন আল্লাহর কলেমার সমর্থক বলিয়া তাঁহার একটি বিশেষণ উল্লেখ করা হইয়াছিল। বলা হইয়াছে ঃ

فَنَادَتْهُ الْمَلٰئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُّصَلِّىْ فِى الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيٰى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَّحَصُوْرًا وَّنَبِيًّا مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ ٠

"যখন যাকারিয়্যা কক্ষে সালাতে দাঁড়াইয়াছিল তখন ফেরেশতাগণ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, আল্লাহ তোমাকে ইয়াহ্ইয়ার সুসংবাদ দিতেছেন, সে হইবে আল্লাহ্র বাণীর সমর্থক, নেতা, স্ত্রী বিরাগী এবং পুণ্যবানদের মধ্যে একজন" (৩ ঃ ৩৯)

বর্তমান খৃস্টান সমাজে প্রচলিত বাইবেলেও ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর সেই গুণের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। যেমন ঃ আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান। আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি ; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন" (মথি, ৩ ঃ ১১; লুক, ৩ ঃ ১৬; মার্ক, ১ ঃ ৭)

এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর জন্মের পূর্বে হযরত মারয়াম (আ)-কে সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, ঈসা (আ) বনূ ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসাবে আগমন করিবেন। এই বিষয়টি আল-কুরআনেও স্পষ্ট বলা হইয়াছে ঃ

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ۝ وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ ۝

"আর তিনি তাহাকে শিক্ষা দিবেন কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল এবং তাহাকে বনূ ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিবেন" (৩ ঃ ৪৮-৪৯)।

হযরত ঈসা (আ) নবুওয়াত কখন কিভাবে লাভ করেন সেই ব্যাপারে আল-কুরআন স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নাই। আল-কুরআনে আসিয়াছে, মাতৃক্রোড়ে দোলনায় থাকাকালে তিনি ঘোষণা করেন ঃ

قَالَ اِنِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِىَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِىْ نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِىْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝

"সে বলিল, আমি তো আল্লাহ্‌র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন, আমাকে নবী করিয়াছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন, যত দিন জীবিত থাকি তত দিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে" (১৯ ঃ ৩০-৩১)।

উক্ত আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, তিনি শিশুকালেই তাঁহাকে নবুওয়ত দেওয়া হইয়াছিল। এই ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি মত প্রধান ঃ

(ক) এক মতে তিনি যখন দোলনায় কথা বলিয়াছেন তখনও তিনি নবী ছিলেন। যেইজন্য শিশু কালে কথা বলাটা ছিল তাঁহার জন্য একটি মু'জিযা। ইহাই হাসান বসরীর মত (তাফসীরুল মাওয়ারদী ৩খ, পৃ. ৩৭০)। শায়খ ইসমাঈল হাককী উল্লেখ করেন যে, জমহূরের মতে হযরত ঈসা (আ)-এর সেই শিশু কালেই আল্লাহ পাক তাঁহাকে ইঞ্জীল ও নবুওয়ত দান করিয়াছিলেন। তিনি প্রাপ্তবয়স্কদের ন্যায় বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন (ইসমাঈল হাককী, তাফসীর রূহুল বায়ান, ৫খ, পৃ. ৩৩১)। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীও উপরিউক্ত মত পোষণ করিতেন। তাঁহার বড় দলীল হইল, শিশু অবস্থায় তাঁহার উক্তি ঃ আমাকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে ও নবী বানানো হইয়াছে (দ্র. ১৯ ঃ ৩০)। রাযীর মতে, তিনি শুধু নবীই ছিলেন না, বরং রাসূলও ছিলেন। কারণ তাঁহার মতে, রাসূল হইতে হইলে শরীয়ত থাকা প্রয়োজন। আর ঈসা (আ)-এর সেই উক্তিতে রহিয়াছে, "তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন সালাত ও যাকাতের ব্যাপারে আমরণ পর্যন্ত" (৩১; রাযী, আত-তাফসীরুল কাবীর, ১১খ, পৃ. ২১৪)।

(খ) অন্যদের মতে তাঁহাকে পরিণত বয়সে নবুওয়ত দান করা হয়। তাঁহার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, আল্লাহ পাক তাঁহার উপর ইঞ্জীল শরীফ নাযিল করেন। তখন হইতেই তিনি নবী। প্রখ্যাত তাবিঈ ইকরিমা হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, ঈসা (আ)-এর ত্রিশ বৎসর বয়সে আল্লাহ পাক তাঁহাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করেন। আর "আমাকে নবী করিয়াছেন" ইহার ব্যাখ্যায় বলেন, ইহার অর্থ আল্লাহর দরবারে ফয়সালা হইয়া গিয়াছে যে, পরবর্তীতে তিনি আমাকে নবী হিসাবে প্রেরণ করিবেন। একথা বলার পর তিনি চুপ হইয়া যান এবং শিশু সুলভ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া যান (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩)। এই মতের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। (১) নবী হইতে হইলে সর্বাঙ্গীন পূর্ণাঙ্গতা থাকা দরকার। শিশু সৃষ্টিগত দিক দিয়া

অপূর্ণ। এই অপূর্ণ অবস্থায় নবুওয়াতের দাবি উত্থাপিত হইলে লোকদের পক্ষ হইতে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হইতে পারে। (২) তিনি যদি শিশু অবস্থায় নবী হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই শরীআতের বিধিবিধান ব্যাখ্যা করিতেন, আর এইরূপ করিলে অবশ্যই তাহা প্রসিদ্ধি লাভ করিত। আর ইহা প্রমাণিত নহে (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩)। শিশু অবস্থায় কথা বলিবার বিষয়টি নবুওয়াতের পূর্বাভাষ স্বরূপ ছিল (মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত)। শায়খ ইসমাঈল হাককী বলেন, ভবিষ্যতে ঘটিবে এমন বিষয় অবহিত করিতে অতীত ক্রিয়ামূলক শব্দ ব্যবহার করা অসম্ভব কিছু নহে। তবে প্রসিদ্ধ কথা হইল, আল্লাহ পাক তাঁহাকে ওহী প্রেরণ করিয়াছিলেন ত্রিশ বৎসর পর। অতএব তাঁহার রিসালাত ছিল নবুওয়াতের পরে (ইসমাঈল হাককী, প্রাগুক্ত)।

সাইয়েদ সিদ্দীক হাসান কানূজী বলেন, ঈসা (আ)-এর এই উক্তির উদ্দেশ্য ছিল যে, সৃষ্টির আদিকালে তাঁহাকে কিতাব ও নবুওয়াত দেওয়ার বিষয়টি ফয়সালা করা হইয়াছে, যদিও শিশু অবস্থায় তাঁহার উপর ওহী অবতীর্ণ হয় নাই, আর তখন তিনি নবীও হইয়া যান নাই (নওয়াব সিদ্দীক হাসান কানূজী, ফাতহুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন, ৪খ, পৃ. ২৮৮)। ইকরিমা (র) বলেন, উহার অর্থ ফয়সালা করা হইয়াছে যে, আমি এইরূপ হইব। আর এই কথাটি মহানবী (স)-এর ঐ বাণীর মত, যখন তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

كنت نبيا وادم بين الروح والجسد

"আদম যখন তাঁহার আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী পর্যায়ে ছিলেন তখন হইতেই আমি নবী ছিলাম' (তিরমিযী, মানাকিব, অধ্যায় ১; মুসনাদে আহমাদ, ৪খ, পৃ. ৬৬, ৫খ, পৃ. ৫৯. ৩৭৯)।

মোটকথা শিশুকালে হযরত ঈসা (আ)-এর মাধ্যমে কিছু কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইয়াছে। ইবন জারীর তাবারীসহ অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে হযরত ঈসা (আ) তাঁহার ত্রিশ বৎসর বয়সেই নবুওয়াত লাভ করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২)। বাইবেলসমূহেও উল্লেখ করা হয় যে, তিনি হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক বাপ্তিস্ম লাভ করিবার পর ত্রিশ বৎসর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন (লূক সুসমাচার, ৩ ঃ ২৩)। এমনকি বার্ণাবাসের বাইবেলেও উল্লেখ করা হয় যে, তাঁহার বয়স যখন ত্রিশ বৎসর তখন জেরুসালেমের পার্শ্বে যয়তুন পাহাড়ে নবুওয়াত ও ইন্জীল লাভ করেন (বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ৮)।

বাইবেলে ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির বর্ণনা

খৃস্টানদের বাইবেলের বর্ণনামতে যোহন তথা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন যাকারিয়া ইয়াহূদীয়ার মরু এলাকায় আসিয়া প্রচারকাজ করিতেছিলেন এবং মানুষদেরকে বাপ্তিস্ম দিতেছিলেন (মথি, ৩ ঃ ৪-৬)।

তিনি যীশুকে আপনার নিকট আসিতে দেখিলেন, আর কহিলেন, এই দেখ, ঈশ্বরের মেষ শাবক উনি সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয় আমি বলিয়াছিলাম, আমার পশ্চাৎ এমন এক ব্যক্তি আসিতেছেন যিনি আমার অগ্রগণ্য হইলেন। কেননা তিনি আমার পূর্বে ছিলেন। আর আমি তাঁহাকে চিনিতাম না। কিন্তু তিনি যেন ইস্রায়েলের নিকট প্রকাশিত হন, এইজন্য আমি আসিয়া জলে বাপ্তাইজ করিতেছি (যোহন, ১ ঃ ১৯-৩৭)।

হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াত ও ইন্‌জীল লাভের ঘটনাটি বার্নাবাসের বাইবেলে নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে ঃ "স্বয়ং তিনি আমাকে (বার্ণাবাসকে) বলিয়াছেন যে, যখন তিরিশ বছর বয়স তাঁহার পূর্ণ হইয়াছিল তখন একদা যয়তুন সংগ্রহের জন্যে মাকে সাথে লইয়া তিনি ঐ পাহাড়ে আরোহণ করিয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকালীন প্রার্থনার সময় তিনি নামাযে রত, সহসা গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইলেন ঃ "প্রভু দয়াময়"। পর মুহূর্তে অতীব উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইলেন। অসংখ্য ফেরেশতা যাহাদের কণ্ঠে 'সালাম সালাম আল্লাহর পক্ষ হইতে' এই রব ধ্বনিত হইতে লাগিল, দীপ্ত আর্শির মত উজ্জ্বল একখানা কিতাব জিবরাঈল তাঁহাকে উপহার দিলেন। ঈসার সিনা মুবারকে কিতাবখানা অবতীর্ণ হইল" (বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ৮)।

লূক লিখিত বাইবেলে বলা হইয়াছে, "যে সমস্ত লোক ইয়াহইয়ার নিকট আসিয়াছিল তাহারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিবার সময় ঈসাও বাপ্তিস্ম গ্রহণ করিলেন। বাপ্তিস্মের পরে ঈসা যখন মুনাজাত করিতেছিলেন, তখন আসমান খুলিয়া গেল এবং পাক রূহ কবুতরের মত হইয়া তাঁহার উপর নামিয়া আসিলেন; প্রায় তিরিশ বৎসর বয়সে ঈসা তাঁহার কাজে নামিলেন" (আরও দ্র. মার্ক, ১ ঃ ১০-১৩; লূক, ৩ ঃ ২১-২৩)। বার্নাবাসের বাইবেলে দেখা যায়, তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণের পর যয়তুন পাহাড়ে দুপুর বেলায় নবুওয়াত ও ইন্‌জীল লাভ করেন। লূক লিখিত প্রেরিত অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে যে, জেরুসালেম শহর হইতে এই পাহাড়টি প্রায় আধা মাইল দূরে ছিল (প্রেরিত, ১ ঃ ১২)। যয়তুন পাহাড়কে ইন্‌জীল অবতরণের স্থল ধরিলে আল-কুরআনের একটি ইঙ্গিতের সাথেও সেই তথ্য মিলিয়া যায়। সূরা আত-তীনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ـ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ـ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ـ

"শপথ তীন ও যায়তূন-এর, শপথ সিনাই পর্বতের এবং শপথ এই নিরাপদ নগরীর" (সূরা তীন, ১-৩)।

উপরিউক্ত আয়াতে আল্লাহপাক সম্ভবত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাবলী অবতরণ স্থলের মর্যাদা প্রদানে সেইগুলির নামে শপথ করিয়াছেন। কেননা স্থানগুলি আসমান ও দুনিয়ার মিলন স্থল, তূরে সীনায় হযরত মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত নাযিল হয়। তেমনিভাবে নিরাপদ নগরী বলিতে মক্কা নগরীকে বুঝানো হইয়াছে যাহার হেরা পর্বতে আল-কুরআন নাযিল হয়। তাই ইন্‌জীল যেহেতু যয়তূন পর্বতে নাযিল হয়, আল্লাহ পাক সেই পর্বতেরও শপথ করেন। আল্লামা ইবন কাছীর প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু যুরআ আদ-দিমাশকী-এর সূত্রে উল্লেখ করেন যে, রমযানের আঠারো তারিখ রাত্রে হযরত ঈসা ইব্‌ন মারয়ামের উপর ইন্‌জীল নাযিল করা হয়। আর তাওরাত নাযিল হওয়ার ৪৮২ বছর পরে যাবূর নাযিল করা হয় এবং যাবূর নাযিল হওয়ার ১০৫০ বছর পর ইন্‌জীল নাযিল করা হয় অর্থাৎ তাওরাত নাযিল হওয়ার ১৫৩২ বৎসর ইন্‌জীল নাযিল করা হয় (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২)।

ইন্‌জীলের পরিচয় ঃ ইন্‌জীল আসমানী গ্রন্থ যাহা আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-এর উপর একসঙ্গে নাযিল করিয়াছিলেন। ইন্‌জীল শব্দটি আরবী না অনারবী তাহা লইয়া ভাষাতাত্ত্বিক ও

পণ্ডিতগণের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে । তাহাদের কেহ কেহ ইন্‌জীল শব্দটিকে আরবী শব্দ ধরিয়া উহার মূল ধাতুর অর্থ ও তাহার সঙ্গে ইন্‌জীল গ্রন্থের নামকরণের সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের অধিকাংশের মতে আরবী ইন্‌জীল (إنجيل) শব্দটি নাজ্‌ল (نَجْلٌ) মূল ধাতু হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। ইহার ভিত্তিতে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হইয়াছে।

(১) ভাষাবিদ যাজ্জাজের মতে, নাজ্‌ল অর্থ আসল বা মূল (আবু হাইয়ান, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৬; রাযী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ১৭১)। ফখরুদ্দীন রাযী বলেন, ঐ কিতাবকে ইন্‌জীল নামকরণ করা হইয়াছে। কারণ ঐ ধর্মের ব্যাপারে ঐ গ্রন্থটিই মূল প্রত্যাবর্তন স্থল (রাযী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২)। কুরতুবীর মতে ইন্‌জীল হইল বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রয়োগ রীতিসমূহের মূল (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৫)।

(২) আরবীতে নাজ্‌ল ঐ পানিকে বলা হয় যাহা ভূমি হইতে নির্গত হয়। যেহেতু এই কিতাবের মাধ্যমে হক বা সত্য বাহির করা হয় তাই ইহাকে ইন্‌জীল নামকরণ করা হয় (রাযী, প্রাগুক্ত)। অথবা যেহেতু লওহে মাহফূজ বা তাওরাত হইতে তাহা বাহির করা হইয়াছে তাই তাহাকে ইন্‌জীল বলা হয় (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৭৬)।

অপরদিকে অন্যান্য মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন যে, ইন্‌জীল শব্দটি অনারবী শব্দ। তাই ইহার আরবী উৎসমূল খোঁজা নিরর্থক (যামাখশারী, কাশশাফ, ১খ. পৃ., ৩৩৫-৩৩৬)। যাহারা এই শব্দটিকে আরবী বলিয়া আরবীর আভিধানিক পরিভাষা বিশ্লেষণ করিয়াছেন তাহাদের ব্যাপারে ইমাম রাযী কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। আবার যাহারা ইহাকে অনারবী শব্দ বলিয়াছেন তাহাদের মধ্যেও মতবিরোধ আছে। ছা'লাবী, রাযী, আলূসী প্রমুখের মতে শব্দটি সুরয়ানী (রাযী, প্রাগুক্ত; কুরতুবী, প্রাগুক্ত; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৭৭)।

আবু হাইয়ান প্রমুখের মতে শব্দটি ইবরানী (আবু হাইয়ান, প্রাগুক্ত)। বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়, ইন্‌জীল শব্দটিকে সাধারণভাবে একটি গ্রীক শব্দরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, ৩খ. পৃ. ৪১২) যাহার আসল রূপ Euahgellioh (দ্র. Oxford Dictionary, Evangel শীর্ষক নিবন্ধ অথবা Evangelism (দ্র. Chambers Dictionary. উল্লিখিত নিবন্ধ Encyclo. Brit. ১৯৫০ খৃ. ১০খ. ৫৩৬. Gospel শীর্ষক নিবন্ধ)। গ্রীক ভাষায় শব্দটির অর্থ সুসংবাদ। Oxford Dictionary- তে ইহাও ইংগিত করা হইয়াছে যে, ইন্‌জীল শব্দটি গ্রীক শব্দ Anggelos হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহার অর্থ পয়গাম্বর।

আরবী ভাষায় 'ইন্‌জীল' শব্দের একটি পাঠ আনজীলও রহিয়াছে, যাহা হাসান বসরী (র) কর্তৃক বর্ণিত (আলূসী, প্রাগুক্ত)। আনজীল শব্দের অর্থ ব্যাপক ও প্রশস্ত। ইহার ভিত্তিতে আল-আসমাঈ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আনজীল শব্দ আফঈল-এর সমরূপী এবং আনজীল সেই গ্রন্থকে বলা হয়, যাহাতে বহু ছত্র রহিয়াছে (তাজুল আরূস, ৮খ., ১৩৮)। ইহাও শব্দটি অনারবী হওয়ার একটি দলীল। কেননা আফঈল আরবী ভাষার শব্দরূপসমূহের অন্তর্ভুক্ত নহে (আল-কাশশাফ, ১খ., ৩৩৫, ৩৩৬, মিসর, ১৩৬৫/ ১৯৪৬)।

হাদীছ শরীফেও শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবীগণ সম্পর্কে বর্ণনা করেন ঃ اناجيلهم جمدر هم অর্থাৎ সাহাবীগণ গ্রন্থের সাহায্য ব্যতিরেকেই কুরআন মুখস্ত পাঠ করিতে পারেন; কিন্তু আহলে কিতাব পাণ্ডুলিপির সাহায্যে তাঁহাদের কিতাব পাঠ করে (লিসান, نجل শীর্ষক প্রবন্ধ)।

যামাখশারী শব্দটিকে আনরবী বলিয়াই ব্যক্ত করিয়াছেন (আল-কাশশাফ, ১খ., ৩৩৬)। আল্লামা বায়দাবী (মৃ. ৬৮৫/১২৮), আনওয়ারুত তানযীল (পৃ. ৬২) এবং উপরে উল্লিখিত মুফতী মুহাম্মাদ আবদুহু ও (মৃ. ১৩২৩/ ১৯০৫) তাফসীর (সম্পা. সায়্যিদ রাশীদ রিদা, ৩খ., ১৫৮৬) একই মত পোষণ করেন। যেহেতু ইন্‌জীল এবং ইহার বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রাচীন অনুবাদ সুরয়ানী ভাষা হইতে আরবী ভাষায় করা হইয়াছে (Encyclope. Britt., ৩খ., ৫১৭, Bible শীর্ষক প্রবন্ধ; Ency. of Islam, Leiden, প্রথম সংস্করণ, ইন্‌জীল শীর্ষক নিবন্ধ)। সুতরাং মূল গ্রীক শব্দটি সুরয়ানী ভাষার মাধ্যমে আরবী ভাষায় প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই অধিকতর যুক্তিসংগত। সুরয়ানী ভাষায় লিখিত ইন্‌জীলসমূহও Evangelion নামেই প্রকাশিত হইয়াছে (তু. F. C. Burvitt সং. লণ্ডন ১৯০৪ খৃ.)।

আবিসিনীয় ভাষায় Wangel শব্দটি ইন্‌জীলের জন্য ব্যবহৃত হয়। ইবন মানজূর-এর মতে 'ইন্‌জীল' শব্দটি হিব্রু অথবা সুরয়ানী ভাষার একটি বিশেষ্য (লিসান, নিবন্ধ)।

হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁহার শিষ্যগণ ধর্মীয় ও বংশগত দিক দিয়া ইসরাঈলী ছিলেন। তাহাদের ধর্মীয় ও মাতৃভাষা ছিল হিব্রু এবং আরামী তথা সুরিয়ানী বলিয়া বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে মন্তব্য করা হয় (Enchy. Britt., ৩খ., ৫২২, ২য় স্তম্ভ)।

তাহা সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগের খৃস্টানগণ স্বীয় ধর্মগ্রন্থের নাম হিব্রু ভাষার পরিবর্তে গ্রীক ভাষায় কেন রাখিল ইহার সঠিক উত্তর তখনই জানা যাইবে যখন আমরা ইন্‌জীল মূলত কোন ভাষায় ছিল ইহা নিশ্চিত জানিতে পারিব। মূল ভাষা যদি হিব্রু হইয়া থাকে এবং পরবর্তী কালে যদি গ্রীক ভাষায় ইহা অনুবাদ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট যে, গ্রন্থটির নাম ইন্‌জীল হইবে না। কেননা ইহা একটি গ্রীক শব্দ। কিন্তু যেহেতু হিব্রু এনজিল আমাদের নিকট বিদ্যমন নাই, সেইজন্য ইহার মূল নামটিও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩)।

মোটকথা, বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা হওয়ার জন্য এমন শর্ত নাই যে, তাহার সকল শব্দই স্বতন্ত্র হইতে হইবে এবং অন্য ভাষার শব্দের সাথে কোন মিল থাকা যাইবে না। সুতরাং হইতে পারে ইন্‌জীল শব্দটি ঈসা (আ) যে সমাজে বাস করিতেন সেখানে প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, সেখানে হিব্রু, সুরিয়ানি ও গ্রীক এই ত্রিবিধ ভাষাই প্রচলিত ছিল। তাই হইতে পারে উক্ত শব্দটি এই তিন ভাষাভাষীই রপ্ত করিয়া নেয়, ইন্‌জীল অর্থ গ্রীক মূলে সুসংবাদ, ইংরেজী মূলেও গসপেল অর্থে সুসংবাদ। ইন্‌জীলের মূল ভাষ্য সুসংবাদ নির্ভর। তাহা ছাড়া শেষ ঐশী গ্রন্থ আল-কুরআনেও এই নাম গ্রহণ করা হয়। অতএব ইহা গ্রন্থের আসল নাম; ইহা বিলুপ্ত হয় নাই। ইন্‌জীলকে এইজন্য

সুসংবাদ বলা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) সর্বশেষ আহমাদ-এর আগমনের সুসংবাদ লইয়া আসিয়াছেন বলিয়া কুরআন মজীদে উল্লেখ আছে ঃ

وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ.

"আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসিবে, আমি তাঁহার সুসংবাদ দাতা"(৬১ ঃ ৬)।

আর হযরত ঈসা (আ)-ও বানূ ইসরাঈলদেরকে সুসংবাদ প্রদান করিতেন আর ঐ কিতাব দুনিয়া ও আখিরাতে তাহাদের জন্য ছিল কল্যাণের বার্তাবাহক। ইন্‌জীলকে ইংরেজীতে Gospel বলা হয় (The Hans Wehr, Dictionary of Modern Written Arabic-English, Edited by. J.M. Cowan P., New York/, P. 30)। ওল ডুরান্ট উল্লেখ করেন যে, প্রাচীন ইংরেজীতে Gospel-কে বলা হইত Gospel অর্থাৎ ভাল সংবাদ (উইল ডুরান্ট, কিসসাতুল হাজারা, ১১ vol., পৃ. ২০৬-২০৭)।

ঈসা (আ)-এর ইন্‌জীল সম্পর্কে আল্‌-কুরআন

যুগে যুগে মানব সমাজে যে সমস্ত আসমানী গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে তন্মধ্যে ইন্‌জীলের প্রসঙ্গটি আল-কুরআনে অত্যন্ত গুরুত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। খোদ ইন্‌জীল শব্দটি ৬টি সূরার ১২টি আয়াতে বারটি স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী, আল-মু'জাম আল-মুফাহ্‌রিস লি আলফাজিল কুরআনিল কারীম, পৃ. ৬৮৮)। সেই স্থানগুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) ৩ ঃ ৩, ৪৮, ৬৫; (২) ৫ ঃ ৪৬, ৪৭, ৬৬, ৬৮, ১১০; (৩) ৭ ঃ ১৫৭; (৪) ৯ ঃ ১১১; (৫) ৪৮ ঃ ২৯; (৬) ৫৭ ঃ ২৭।

উপরিউক্ত আয়াতগুলিতে হযরত ঈসা (আ)-কে প্রদত্ত ইন্‌জীল সম্পর্কেও যথাযথ মর্যাদা প্রদর্শনমূলক মৌলিক তথ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং ইন্‌জীল নাযিল হওয়ার পর এই গ্রন্থের ব্যাপারে খৃস্টানদের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোকপাত করা হইয়াছে। আল-কুরআনে এই গ্রন্থ সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য উপস্থাপন করা হইয়াছে।

(১) ইন্‌জীল আল্লাহ প্রদত্ত আসমানী গ্রন্থ ঃ আল-কুরআনে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয় যে, তাওরাত ও আল-কুরআনুল কারীমের মত ইন্‌জীলও আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নাযিলকৃত একটি আসমানী গ্রন্থের নাম। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ. نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ. مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ. اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ. وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامٍ.

"আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই, তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তিনি সত্যসহ তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছেন, যাহা উহার পূর্বের কিতাবের সমর্থক। আর তিনি অবতীর্ণ করিয়াছিলেন তাওরাত ও ইন্‌জীল, ইতোপূর্বে মানবজাতির সৎপথ প্রদর্শনের জন্য; এবং তিনি ফুরকানও অবতীর্ণ করিয়াছেন। যাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে তাহাদের জন্য কঠোর শাস্তি আছে। আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, দণ্ডদাতা"(৩ ঃ ২-৪)।

উল্লেখ্য, উক্ত আয়াতে ফুরকান দ্বারা শেষ আসমানী গ্রন্থ আল-কুরআনকে বুঝাইয়াছে, যাহার পূর্বেই তাওরাত ও ইন্‌জীল নাযিল করা হইয়াছিল।

(২) ইন্‌জীল গ্রন্থ হযরত ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ ঃ ইন্‌জীল গ্রন্থটি যে ঈসা (আ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয় ইহা স্পষ্টভাবে বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰىٓ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ـ

"অতঃপর আমি তাহাদের পশ্চাতে অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম তনয় ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইন্‌জীল" (৫৭ ঃ ২৭)।

(৩) ইন্‌জীল ছিল পথনির্দেশ ও আলোর উৎস ঃ ইহা ছিল মানব জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনায় ভরপুর, যাহার অনুসরণ করিলে সেই সময়ে মানব জীবনে অন্ধকার দুরীভূত হইয়া জীবন চলার পথ আলোকিত হইত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَفَّيْنَا عَلٰىٓ اٰثَارِهِمْ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ ـ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ـ

"মারয়াম তনয় ঈসাকে তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে উহাদের পশ্চাতে প্রেরণ করিয়াছিলাম এবং তাহার পূর্বে অবতীর্ণ তাওরাতের সমর্থকরূপে এবং মুত্তাকীদের জন্য পথের নির্দেশ ও উপদেশরূপে তাহাকে ইন্‌জীল দিয়াছিলাম, উহাতে ছিল পথের নির্দেশ ও আলো" (৫ ঃ ৪৬)।

(৪) ইন্‌জীল কিতাব তাওরাতের সত্যায়নকারী ঃ মূসা (আ)-এর উপর নাযিলকৃত তাওরাতের মৌলিক শিক্ষার মধ্যে ঈসা (আ)-এর জীবনকালে যাহা কিছু সুরক্ষিত ছিল হযরত ঈসা (আ) তাহা নিজে মানিতেন এবং ইন্‌জীল কিতাবও উহার সত্যতা প্রমাণ করিত (দ্র. মথি, ৫ ঃ ১৭-১৮)। ইন্‌জীলের শরীআত ছিল তাওরাতেরই পরিপূরক ও সমর্থক। ইন্‌জীল দ্বারা তাওরাতের বিধান খুব অল্পই রহিত করা হয়। তাওরাতের শিক্ষার সমর্থনকারী ইন্‌জীলের এই ভূমিকার কথা আল-কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدًى وَّنُوْرٌ ـ وَّمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرٰةِ ـ

"আর আমি তাহাকে ইন্জীল প্রদান করিয়াছিলাম যাহার মধ্যে রহিয়াছে হিদায়াত ও আলো, আর উহা সত্যতা নিরূপণকারী পশ্চাতের বিষয়াদির তাওরাতের" (৫ ঃ ৪৬)।

(৫) ইন্জীল ছিল মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত ও উপদেশ বাণীতে সমৃদ্ধ ঃ আল-কুরআনে আরও ঘোষণা করা হয় যে, জীবনে যারা তাকওয়া অবলম্বন করিতে চায়, তাহাদের জন্য ইন্জীলে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। এমন নসীহত ও হৃদয়গ্রাহী কথাবার্তা রহিয়াছে যাহা দ্বারা তাহারা উপকৃত হইবে। তাহাদের হৃদয় মনে আলোড়ন সৃষ্টি করিবে। তাই উপরিউক্ত আয়াতে ইন্জীল সম্পর্কে আর ও বলা হয় ঃ

وَهُدًى وَّمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِيْنَ

"আর আল্লাহ্ভীরু লোকদের জন্য পূর্ণাঙ্গ হেদায়াত ও নসীহত ছিল" (৫ ঃ ৪৬)।

(৬) ইন্জীল ছিল ঈসা (আ)-এর উপর আল্লাহ্ পাকের স্মরণীয় নি'মত ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ ·

"আল্লাহ বলিবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর। পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় এবং পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে; তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইন্জীল শিক্ষা দিয়াছিলাম" (৫ ঃ ১১০)।

(৭) ইন্জীল ছিল খৃস্ট সমাজের জন্য বিশেষ বিধান ঃ আল-কুরআনে উল্লেখ আছে যে, ইন্জীলে আল্লাহ্র নাযিল করা এমন আইন-কানুন ছিল যাহার দ্বারা তাহারা বিতর্কিত ও মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে ফয়সালা ও বিচার করিত। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلْيَحْكُمْ اَهْلُ الْاِنْجِيْلِ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فِيْهِ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ·

"ইন্জীল বিশ্বাসিগণ উহাতে আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী যেন ফয়সালা ও বিচার করে। আর যাহারাই আল্লাহ্র নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করিবে না, তাহারাই ফাসেক" (৫ ঃ ৪৭)।

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِاُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ.

" ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল, আমি তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর" (৪৩ ঃ ৬৩)।

(৮) ইন্‌জীল বানূ ইসরাঈলের উন্নতি ও সমৃদ্ধির চাবিকাঠি ঃ

وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ.

"তাহারা যদি তাওরাত, ইন্‌জীল ও তাহাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তাহাদের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিত তাহা হইলে তাহারা তাহাদের উপর ও পদতল হইতে আহার্য লাভ করিত। তাহাদের মধ্যে একদল রহিয়াছে যাহারা মধ্যপন্থী, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ যাহা করে তাহা নিকৃষ্ট" (৫ ঃ ৬৬)।

(৯) আল-কুরআন ইন্‌জীল গ্রন্থের সত্যায়নকারী ঃ অতীত আসমানী গ্রন্থাবলীর মধ্য হইতে যাহা কিছু অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে আল-কুরআন উহার সত্যতা স্বীকার করে এবং যাহা বিকৃত ও পরিবর্তিত তাহা সংশোধন করিয়াছে। এখন যাহা কিছু কুরআনের অনুরূপ ও উহার সহিত সংগতিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হইবে তাহাই আল্লাহ্‌র কালাম মনে করিতে হইবে। এই মর্মে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَا اٰتٰكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ.

"তোমাদের প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করিয়াছি ইহার পূর্বে অবতীর্ণ কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষকরূপে। সুতরাং আল্লাহ যাহা অবতীর্ণ করিয়াছেন তদনুসারে তুমি তাহাদের বিচার নিষ্পত্তি করিও এবং যে সত্য তোমার নিকট আসিয়াছে তাহা ত্যাগ করিয়া তাহাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করিও না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আইন ও স্পষ্ট পথ নির্ধারণ করিয়াছি। ইচ্ছা করিলে আল্লাহ তোমাদিগকে এক জাতি করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তোমাদিগকে যাহা দিয়াছেন তদ্দ্বারা তোমাদিগকে পরীক্ষা করিতে চাহেন। সুতরাং সৎকর্মে তোমরা প্রতিযোগিতা কর। আল্লাহ্‌র দিকেই তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতে সে সম্বন্ধে তিনি তোমাদিগকে অবহিত করিবেন" (৫ ঃ ৪৮)।

(১০) ইন্‌জীলের কিছু কিছু বিষয় আল-কুরআনের সহিত সাদৃশ্যপূর্ণ ঃ

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

"আল্লাহ্ মু'মিনদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগের জন্য জান্নাত আছে ইহার বিনিময়ে। তাহারা আল্লাহ্র পথে সংগ্রাম করে, নিধন করে ও নিহত হয়। তাওরাত, ইন্জীল ও কুরআনে এই সম্পর্কে তাহাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। নিজ প্রতিজ্ঞা পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কে আছে? তোমরা যে সওদা করিয়াছ সেই সওদার জন্য আনন্দ কর এবং উহাই মহা সাফল্য" (৯ ঃ ১১১)।

উপরিউক্ত বাণীটির কিছু ইঙ্গিত বর্তমানে প্রচলিত বাইবেলে পাওয়া যায়। যেমন ঃ "ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই" (মথি সুসমাচার, ৫ ঃ ১০)।

এই গ্রন্থের অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে ঃ "আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটি, কি ভ্রাতা, কি ভাগিনা, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি গোত্র পরিত্যাগ করিয়াছে সে তাহার মত গুণ পাইবে; এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে" (মথি সুসমাচার, ১৯ ঃ ২৯)।

(১১) ইন্জীল হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়তের দলীল ঃ ইন্জীলকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নবুওয়তের দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। কেননা সেই ইন্জীলে মহানবী (স)-এর শুভাগমনের সুসংবাদ ছিল, তাঁহার পরিচিতিমূলক গুণাবলী আলোচনা করা হইয়াছিল। এই মর্মে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الرَّسُوْلَ النَّبِىَّ الْاُمِّىَّ الَّذِىْ يَجِدُوْنَهُ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهٰهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبٰتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبٰٓئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْاَغْلٰلَ الَّتِىْ كَانَتْ عَلَيْهِمْ.

"যাহারা অনুসরণ করে বার্তাবাহক উম্মী নবীর, যাহার উল্লেখ তাহারা লিপিবদ্ধ আকারে তাহাদের নিকট পাইবে তাওরাত ও ইন্জীলে। এইভাবে যে, সে তাহাদের নেক কাজের আদেশ করে, বদ কাজ হইতে বিরত রাখে, তাহাদের জন্য পাক জিনিসসমূহ হালাল ও নাপাক জিনিসগুলিকে হারাম করে। আর তাহাদের উপর হইতে সেই বোঝা সরাইয়া দেয় যাহা তাহাদের উপর চাপানো ছিল এবং সেই বাধা ও বন্ধনসমূহ খুলিয়া দেয়, যাহাতে তাহারা বন্দী ছিল" (৭ ঃ ১৫৭)।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বর্তমান বাইবেলের পূরাতন ও নূতন নিয়মের নিম্নলিখিত স্থানসমূহ দেখা যাইতে পারে ঃ দ্বিতীয় বিবরণ, ১৮ ঃ ১৫-১৯, মথি, ২১ ঃ ২৩-৪৬, যোহন ১ ঃ ১৯-২১, ১৪ ঃ ১৫-১৭, ১৫ ঃ ২৫-২৬, ১৬ ঃ ৭-১৫। এইসব স্থানে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমন সম্পর্কে সুস্পষ্ট ইংগিত রহিয়াছে। এমনিভাবে বার্নাবাসের বাইবেলে আরও স্পষ্ট করিয়া মহানবী (স)-এর নামসহ তাঁহার শুভাগমনের সংবাদ উদ্ধৃত হইয়াছে (বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ২০৪)।

(১২) ইন্জীলে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর সাহাবীগণের উল্লেখ ঃ আল-কুরআনে এই মর্মে ইরশাদ হইয়াছেঃ

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ . وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا .

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল; তাহার সহচরগণ কাফিরদিগের প্রতি কঠোর এবং নিজদিগের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি তাহাদিগকে রুকূ ও সিজ্‌দায় অবনত দেখিবে। তাহাদিগের মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন থাকিবে, তাওরাতে তাহাদিগের বর্ণনা এইরূপ এবং ইন্‌জীলেও এইরূপ। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যাহা হইতে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর ইহা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে যাহা চাষীর জন্য আনন্দদায়ক। এইভাবে আল্লাহ্ মু'মিনদিগের সমৃদ্ধি দ্বারা কাফিরদিগের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের" (৪৮ ঃ ২৯)।

এই দৃষ্টান্তটি ইন্‌জীলে হযরত ঈসা (আ)-এর একটি ওয়াজ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে যাহা সুসমাচারেও উদ্ধৃত হইয়াছে নিম্নরূপ ঃ "তিনি আরও কহিলেন, ঈশ্বরের রাজ্য এইরূপ। কোন ব্যক্তি যেন ভূমিতে বীজ বুনে; পরে রাত দিন নিদ্রা যায় ও উঠে। ইতোমধ্যে ঐ বীজ অংকুরিত হইয়া বাড়িয়া উঠে, কিরূপে আপনি ফল উৎপন্ন করে; প্রথমে অংকুর, পরে শীষ, তাহার পর শীষের মধ্যে পূর্ণ শষ্য। কিন্তু ফল পাকিলে সে তৎক্ষণাৎ কাস্তে লাগায়। কেননা শষ্য কাটিবার সময় উপস্থিত। তাহা একটি সরিষার দানার তুল্য। সেই বীজ ভূমিতে বুনিবার সময় ভূমির সকল বীজের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বটে; কিন্তু বুনা হইলে তাহা অংকুরিত হইয়া সকল শাক হইতে বড় হইয়া উঠে, এবং বড় বড় ডাল ফেলে। তাহাতে আকাশের পক্ষিগণ তাহার ছায়ার নীচে বাস করিতে পারে" (মার্ক সুসমাচার, ৪ ঃ ২৬-৩২; আরো দ্র. মথি, ১৩ ঃ ৩১-৩২)।

(১৩) ইসলাম গ্রহণের পথে ইন্‌জীল খৃস্টানদের জন্য আলোকবর্তিকা ঃ খৃস্ট সমাজকে দীনের দাওয়াত প্রসঙ্গে আল-কুরআনে ইন্‌জীলকেই দলীল হিসাবে পেশ করা হইয়াছে। কেননা ইন্‌জীলের আহবান ছিল পরবর্তীতে আল-কুরআনের আহবানকে মানিয়া লওয়া। এইজন্যই আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

قُلْ يٰاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ .

"বলল, হে কিতাবীগণ! তোমরা কোনক্রমেই কোন মৌলিক জিনিসের উপর দণ্ডায়মান নও যতক্ষণ পর্যন্ত তাওরাত ও ইন্‌জীল এবং তোমাদের রব-এর নিকট হইতে তোমাদের প্রতি যাহা নাযিল করা হইয়াছে তাহা প্রতিষ্ঠিত না করিবে" (৫ ঃ ৬৮)।

প্রকৃত কথা এই যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ যদি এইসব কিতাবে উল্লিখিত আল্লাহ ও নবীগণের প্রদত্ত শিক্ষার উপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইত তাহা হইলে হযরত নবী করীম (স)-এর আগমন কালে তাহারা একটি সত্যপন্থী জাতিরূপে গণ্য হইতে পারিত।

(১৪) ইন্‌জীলের কারণে নাসারাদের সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শন ঃ তাওরাত, যাবূর, ইন্‌জীলে আংশিক পরিবর্তিত হইলেও দীনের মূল বিষয় সংরক্ষিত ছিল। যেই কারণে তাওরাত, যাবূর ও ইন্‌জীলের অনুসারীদেরকে আল-কুরআন 'আহলে কিতাব' বলিয়া বারবার সম্বোধন করিয়াছে। ইয়াহূদী ও নাসারাগণকে ৩১ বার আহলে কিতাব বা কিতাবীগণ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে এবং ২৩ বার তাহাদেরকে ঐ ব্যক্তিবর্গ বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে "যাহাদেরকে কিতাব দেওয়া হইয়াছে" কিংবা "কিতাবের উত্তরাধিকারী বানানো হইয়াছে"। যাহারা কিতাবের অধিকারী তাহারা জ্ঞানের অধিকারী ও রক্ষক। অতএব খৃস্টানরা ইন্‌জীল কিতাবের সাথে নিজেদেরকে সম্পর্কিত করিবার কারণে আহলে কিতাব বলিয়া তাহাদেরকে জগৎবাসীর মধ্যে বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে। তাহাদের কন্যা সন্তান মুসলমানদের জন্য বিবাহ করা হালাল এবং তাহাদের তৈরী হালাল খাবার গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে।

قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّٰهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ .

"তুমি বল, হে কিতাবীগণ! আইস সে কথায় যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই; যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কাহারও ইবাদত না করি, কোন কিছুকেই তাঁহার শরীক না করি এবং আমাদের কেহ কাহাকেও আল্লাহ ব্যতীত রব হিসাবে গ্রহণ না করে। যদি তাহারা মুখে ফিরাইয়া লয় তবে বল, তোমরা সাক্ষী থাক, আমরা মুসলমান" (৩ ঃ ৬৪-৬৫)।

(১৫) ইন্‌জীলের প্রতি ঈমান মুসলিম আকীদার অংশ ঃ ইন্‌জীলসহ সকল আসমানী কিতাবের উপর ঈমান আনার জন্য মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ . كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ .

"রাসূল, তাহার প্রতি তাহার প্রতিপালকের পক্ষ হইতে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ঈমান আনিয়াছে এবং মুমিনগণও। তাহাদের সকলে আল্লাহে, তাঁহার ফেরেশতাগণে, তাঁহার কিতাবসমূহে এবং তাঁহার রাসূলগণে ঈমান আনয়ন করিয়াছে। তাহারা বলে, আমরা তাঁহার রাসূলগণের মধ্যে কোন তারতম্য করি না; আর তাহারা বলে, আমরা শুনিয়াছি এবং পালন করিয়াছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই আর প্রত্যাবর্তন তোমারই নিকট" (২ ঃ ২৮৫)।

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْ نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَالْكِتَابِ الَّذِىْ اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ٠

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহে, তাঁহার রাসূলে, তিনি যে কিতাব তাঁহার রাসূলের প্রতি অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে এবং যে কিতাব তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করিয়াছেন তাহাতে ঈমান আন" (৪ঃ ১৩৬)।

ইব্ন কাছীর বলেন যে, রাসূলের উপর অবতীর্ণ কিতাব বলিতে আল-কুরআনুল কারীমকে বুঝানো হইয়াছে, আর উহার পূর্বে নাযিল করা কিতাব বলিতে পূর্ববর্তী সকল কিতাব বুঝানো হইয়াছে (ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, ১০ খ., পৃ. ৫৬৬)।

উপরিউক্ত আয়াতের দ্বারা বুঝা যায়, একজন মুসলমান তাহার ঈমানের ক্ষেত্রে যদি কোন রাসূলকে বাদ দিয়া অন্য রাসূলকে গ্রহণ করে কিংবা কোন কিতাবকে বাদ দিয়া অন্য কিতাব গ্রহণ করে তাহা হইলে সে মুমিন হইবে না। এইজন্য আল-কুরআনে ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً بَعِيْدًا ٠

"কেহ আল্লাহ, তাঁহার ফেরেশতা, তাঁহার কিতাব, তাঁহার রাসূল এবং পরকালকে প্রত্যাখ্যান করিলে সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে" (৪ ঃ ১৩৬)।

ইন্জীল সংরক্ষিত না থাকার কারণ ঃ ঈসা (আ)-এর উর্ধ্বগমনের পর তাঁহার অনুসারীরা ইন্জীলকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে সক্ষম হয় নাই। উহার কারণ নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত ঃ অনুসারীদের আত্মগোপন অবস্থা। ইয়াহূদী ও রোমানদের সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে ঈসা (আ)-এর উর্ধ্ব গমনের পরেও তাঁহার অনুসারীরা আত্মগোপন করিয়াই থাকিতেন, পাহাড়-পর্বতের গুহায়, বনে-জংগলে বাস করিতেন। আর গোপনে ইন্জীলের বাণী প্রচার করিতেন, এমনকি কাহাকেও সনাক্ত করা হইলেও তিনি ঈসা (আ)-এর অনুসারী নহেন বলিয়া দাবি করিতেন এবং নিজ পরিচয় গোপন করিতেন। অধিকন্তু যদি তাহার কাছে ইন্জীলের কোন অংশবিশেষ থাকিত তাহাও ঈসা (আ)-এর নহে বলিয়া দাবি করিতেন। বর্ণিত আছে যে, "The Shepherd" নামে একটি গ্রন্থ ছিল যাহা হারমাস (Hermas) নামে এক ব্যক্তির গ্রন্থের শিক্ষার সাথে ঈসা (আ)-এর শিক্ষার অনেক সাদৃশ্য ছিল। তাই প্রাথমিক যুগের খৃস্টানরা এই গ্রন্থের গুরুত্ব দিত ও তাহা নিজেই বহন করিত (Md. Ataur Rahim, Ibid, p. 48-53)। ধারণা করা হয় যে, ইহাও তাওহীদপন্থী খৃষ্টানদের এক ধর্মীয় উৎস ছিল, যাহাতে ঈসা (আ)-এরও শিক্ষার সংকলন ছিল, যাহা অন্য নামে প্রচলিত ছিল। আর তাহা নির্যাতন হইতে বাঁচার জন্যই।

দ্বিতীয়ত ঃ হাওয়ারীদের বিচ্ছিন্ন অবস্থান ও শাহাদাত বরণ ঃ বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর পর তাঁহার অনুসারী হাওয়ারীগণ তৎকালীন বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় ছড়াইয়া পড়েন। তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকার কারণে তাহারা পরস্পর ছিলেন বিচ্ছিন্ন। তাই লিখিত

ইন্‌জীলটি কাহার কাছে ছিল, তাহা জানা যায় নাই। তবে তাহারা যতটুকু স্মৃতিতে ছিল ততটুকুই মানুষের নিকট বর্ণনা করিতেন। কিন্তু পরবর্তীতে তাহারা একে একে শাহাদাত বরণ করেন (ইব্‌ন হাযম, আল-ফিসাল ফিল মিলাম ওয়াল আহ্‌ওয়ায়ে ওয়ান নিহাল, ১খ, পৃ. ২৫৩)।

এইভাবে সময় যতই অতিবাহিত হইতে থাকে ভুলিয়া যাওয়ার মাত্রাও তত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাওরাত যেমনি ইউশা ইব্‌ন নূন, দাঊদ (আ), সুলায়মান (আ) প্রমুখ রাষ্ট্রনায়কের পৃষ্ঠপোষকতা পাইয়াছিল, কিন্তু ইন্‌জীল গ্রন্থটি সংরক্ষণে ও সংকলনে সেই ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা পায় নাই। সেই জন্য তাহা বিস্মৃত হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক।

তৃতীয়ত ঃ ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র কার্যকর ছিল, বিশেষত ধর্মীয় নেতাদের বিভিন্ন পাপাচার তথা ধর্ম ব্যবসার বিরুদ্ধে ঈসা (আ)-এর নূতন দাওয়াতের যে ধরনের প্রসার ঘটিতেছিল তাহা বন্ধ করিবার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তাহাদের কেহ কেহ পরিকল্পিতভাবে খৃস্ট ধর্মে প্রবেশ করিয়া ইয়াহূদী ধর্মনেতাদের নিকট হইতে ঘুষ লইয়া এবং ঈসার অনুসারীদের সহিত অবস্থান করে। ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে তাহাদের কেহ খৃস্ট ধর্মে প্রবেশ করিয়া ইন্‌জীল গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আত্মস্থ করে এবং তাহার যে অংশ তৎকালীন ইয়াহূদী সমাজের সাথে বিরোধপূর্ণ ছিল তাহা গোপন করে। অবশেষে তাহা ধ্বংসই করিয়া ফেলে। এইভাবে ইন্‌জীলের বিভিন্ন অংশ হারাইয়া যায়। শুধু ততটুকুই বাকী থাকে, যতটুকু অনুসারীদের স্মৃতিতে ছিল।

চতুর্থত ঃ ইয়াহূদীদের ভিতর হইতে যাহারা খৃস্ট ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল তাহারা খৃস্ট ধর্মের অপব্যাখ্যা দেওয়া শুরু করিয়াছিল। গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, সেন্ট পলও তাহাদের মধ্যে একজন। ইন্‌জীলের অনেক বাণী বিকৃত হইয়া যায়, যাহাকে আল-কুরআনের পরিভাষায় 'তাহরীফ' (বিকৃতি) বলা হইয়াছে। তাহারা ইন্‌জীলের বিভিন্ন বাণীতে টিকামূলক বিভিন্ন ব্যাখ্যা সংযোজন করিতেন এবং পরবর্তীতে যাহারা শুনিতেন তাহারা মূল বক্তব্য ও ব্যাখ্যার মধ্যে খুব কমই পার্থক্য করিতে পারিতেন। সে কারণে স্মৃতিতে যতটুকু ছিল তাহারও অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটে। বলা হয় যে, ইন্‌জীলের মূল ভাষ্য বিলুপ্ত হওয়ার পিছনে তাহাদের ভূমিকাই বেশী।

পঞ্চমত ঃ ঈসা (আ)-এর নবুওয়ত কাল ছিল সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ মাত্র তিন বৎসর। এই সময়ে যথেষ্ট সংখ্যক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার বিষয়টি ছিল কঠিন। তাহা ছাড়া এই স্বল্প সময়ে ঈসা (আ) দাওয়াতী কাজ ও বিরোধীদের ষড়যন্ত্র মুকাবিলায়েই বেশী ব্যস্ত থাকেন। তাই বেশী পরিমাণে পাণ্ডুলিপি না থাকায় তাহা হারাইয়া যাওয়া বা বিলুপ্ত হওয়া আরো সহজ হয়। মোটকথা, মূল ইন্‌জীলের বিরাট অংশ বিলুপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ ছিল চারটি ঃ

(১) অনুসারীদের বিস্মৃতি,

(২) ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করা,

(৩) অনুসারীদের নিজস্ব মতামত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কিছু কিছু ভাষ্য পরিবর্তন এবং নিজেরা তাহা লিখিয়া আল্লাহ্‌র বাণী বা ইন্‌জীলের অংশ বলিয়া দাবি করা,

(৪) ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে বা ভাষান্তরিত করিতে গিয়া মূল ভাষ্যের বিকৃতি সাধন।

এই চারটি ধরনকে আল-কুরআন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছে। প্রথমত ভুলিয়া যাওয়া সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّا نَصَارٰى اَخَذْنَا مِيْثَاقَهُمْ فَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللّٰهُ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۔

"যাহারা বলে, আমরা খৃস্টান, তাহাদেরও অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা যাহা উপদিষ্ট হইয়াছিল তাহার এক অংশ ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি তাহাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ জাগরুক রাখিয়াছি। তাহারা যাহা করিত আল্লাহ তাহাদিগকে তাহা জানাইয়া দিবেন" (৫ ঃ ১৪)।

দ্বিতীয়ত, কিছু কিছু অংশ লুকাইয়া ফেলা হয়। এই মর্মে বলা হইয়াছে ঃ

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُوْنَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ ۔

"হে কিতাবীগণ! আমার রাসূল তোমাদের নিকট আসিয়াছে, তোমরা কিতাবের যাহা গোপন করিতে সে উহার অনেক তোমাদের নিকট প্রকাশ করে এবং অনেক উপেক্ষা করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র নিকট হইতে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব তোমাদের নিকট আসিয়াছে" (৫ ঃ ১৫)।

তৃতীয়ত, অর্থের লোভে নিজেরা লিখে দাবি করিত ইহা ইন্‌জীলের অংশ অর্থাৎ পরিবর্তন সাধন করিত। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ۔

"সুতরাং দুর্ভোগ তাহাদের জন্য যাহারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে, ইহা আল্লাহ্‌র নিকট হইতে। তাহাদের হাত যাহা রচনা করিয়াছে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের এবং যাহা তাহারা উপার্জন করে তাহার জন্য শাস্তি তাহাদের" (২ ঃ ৭৯)।

চতুর্থত, মূল ভাষ্যে বিকৃতি সাধন করা। এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ "তাহারা শব্দগুলির আমল অর্থের বিকৃতি ঘটাইত" (৫ ঃ ১৩)।

يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُوْنَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

"হে কিতাবীগণ! তোমরা কেন সত্যকে মিথ্যার সহিত মিশ্রিত কর এবং সত্য গোপন কর যখন তোমরা জান" (৩ ঃ ৭১)?

মোটকথা, উপরিউক্ত কারণে মূল ইন্‌জীল বিলুপ্ত হয়। স্মৃতিকথা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাহা সংকলিত হইয়াছে তাহাতে বিক্ষিপ্ত এক ইন্‌জীলের কিছু কিছু রহিয়াছে, যাহা সনাক্ত করাও কঠিন।

ঈসা (আ) সম্পর্কিত স্মৃতিকথার সংকলন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের হাতে আসল ইন্‌জীলের কপি না থাকার কারণে তাহারা যতটুকু মুখস্ত করিয়াছিল, তাহার উপরই নির্ভর করিতে থাকে এবং পরস্পরের নিকট বর্ণনা করিতে থাকে। এক পর্যায়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির মুকাবিলায় বিভিন্ন ব্যক্তিদের কাছে বর্ণিত বিষয়ের কিছু অংশ স্মৃতি হইতে ক্ষয় হইয়া যায়। কিছু নির্যাতনের আশংকায় কোন কোন বর্ণনাকারী সম্পূর্ণ বর্ণনা করিতে সাহস পায় নাই। সেই সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাস ও আশেপাশের সিরীয় অঞ্চলসমূহে হিব্রু, সুরিয়ানী, এরামিক, গ্রীকসহ অনেক ভাষা প্রচলিত ছিল। তাই সেই মৌখিক বর্ণনাগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হওয়ার ফলেও মূল ভাষ্যে পরিবর্তন আসে। এইভাবে ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা স্মৃতিকথার উপর নির্ভর করিয়া ঈসা (আ)-এর বাণী প্রচার শুরু করে। মূল ইন্‌জীলের অনুপস্থিতিতে কেহ কেহ লোকজনের চাহিদার মুখে, আবার কেহ কেহ স্বউদ্যোগে ঈসা (আ) সম্পর্কিত বিভিন্ন ঘটনা ও কার্যাবলী সংকলন করিতে শুরু করে। খৃষ্ট ধর্ম যতই প্রসার লাভ করিতে থাকে, ততই এই ধরনের সংকলনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। তখন এই স্মৃতিকথা সংকলনের এক জোয়ার সৃষ্টি হয়, রচিত হয় শত শত স্মৃতিকথা সংকলন।

মূল ইন্‌জীলের অনুপস্থিতিতে পরবর্তীতে দাওয়াতী কাজের স্বার্থে জনগণকে বুঝানোর জন্য সেইগুলিকেই ইন্‌জীল নামকরণ করা হয়, যাহা ইংরেজীতে গসপেল (Gospel), বাংলায় সুসমাচার, আরবীতে ইন্‌জীল (انجيل) নামে অভিহিত করা হয়। এইগুলির সংখ্যা ছিল প্রচুর। নিম্নে কয়েকটি সংকলনের নাম উল্লেখ করা হইল ঃ

(১) গসপেল অব বয়হুড (Gospel of Boyhood).

(২) গসপেল অব পিটার (Gospel of Peter).

(৩) গসপেল অব যোহন ১ (Gospel of John 1).

(৪) গসপেল অব যোহন ২ (Gospel of John 2).

(৫) গসপেল অব এনড্রিউ (Gospel of Andrew).

(৬) গসপেল অব ফিলিপ (Gospel of Philip).

(৭) গসপেল অব বারথোলস (Gospel of Bartholos).

(৮) থমাস রচিত গসপেল অব বয়হুড ১ (Gospel of Boyhood 1).

(৯) থমাস রচিত গসপেল অব বয়হুড ২ (Gospel of Boyhood 2).

(১০) গসপেল অব জ্যাকব (Gospel of Jacob).

(১১) গসপেল অব ম্যাথিউ (Gospel of Mathew).

(১২) গসপেল অব মার্ক ফর ইজিপশিয়ান্স (Gospel of Mark for Egyptians).

(১৩) গসপেল অব মার্ক (Gospel of Mark).

(১৪) গসপেল অব পৌল (Gospel of Paul).

(১৫) গসপেল অব বেসিলিডিস (Gospel of Besilidis).

(১৬) গসপেল অব বার্ণাবাস (Gospel of Barnabash.

(১৭) গসপেল অব মথি (Gospel of Matthi).

(১৮) গসপেল অব জুডাস (Gospel of Judus).

(১৯) গসপেল অব মারকিওন (Gospel of Marcion).

(২০) গসপেল অব পারফেকশান (Gospel of Perfection).

(২১) গসপেল অব ট্রুথ (Gospel of Truth).

(২২) গসপেল অব নেজারিয়ান (Gospel of Nesserian).

(২৩) গসপেল অব যোহন্স (Gospel of Jhonns).

(২৪) গসপেল অব য়াডাইউস (Gospel of Yhaddaeus).

(২৫) গসপেল অব ভারজিন মেরী (Gospel of Virgin Mary).

আরও অনেক (দ্র. Encyclopedia Americana, Article-Bible; আহমাদ আবদুল ওয়াহ্হাব, আল-মাসীহ ফী মাসাদিরিল আকায়েদ আল-মাসীহিয়্যা, ১৩৯৮হি/১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৩৭; ড: মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, বঙ্গানুবাদ, আখতার উল-আলম, পৃ.১২৪; ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ , ৩খ., পৃ. ৪১৩; আরো দ্র. মুতওয়াল্লী ইউসুফ শালাভী, আদওয়া আলাল মাসীহিয়্যা, পৃ. ৩৮)।

৩২৫ খৃষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ও পোলিও খৃস্টান ধর্মযাজকদের নিকীয়া সম্মেলনে চারটি গসপেলকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সেইগুলি হইল মথি, মার্ক, লূক ও যোহন। সেই সম্মেলনে অবশিষ্ট সব কয়টি গসপেলকে বাতিল ঘোষণা করা হয়, যাহাকে খৃস্টানদের পরিভাষায় অপ্রামাণ্য বা এ্যাপোক্রাইফা (Apocrypha) বলা হয়।

শায়খ আবু বকর উমার আত-তামামী আদ-দারী প্রটেস্টান্ট খৃস্টান পণ্ডিত এ্যাডাম ক্লার্ক-এর বরাতে উল্লেখ করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, সত্তরটির চেয়েও বেশী গসপেলকে মিথ্যা বলিয়া পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় (আস-সায়ফুস সাকীল, পৃ. ২৪৪)। তিনি আরো মিথ্যা বলিয়া ঘোষিত ঐ গসপেলগুলিকে বিশাল তিন ভলিউমে মুদ্রণ করেন (প্রাগুক্ত)।

ডঃ মরিস বুকাইলি উল্লেখ করেন যে, গির্জা তখন প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছিল, সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছিল। এ ধরনের আজগুবি ও হাস্যকর রচনার প্রাচুর্যই তখন সত্য কথা বলিতে কি গির্জা সংস্থার দ্বারা ঐ সব পুস্তকের উচ্ছেদ ঘটাইবার ক্ষেত্রেও অবকাশ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবেই গির্জা সংস্থার দ্বারা সেই কালে সম্ভবত শতখানেক গস্পেল বা সুসমাচারের প্রচার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। শেষ পর্যন্ত মাত্র চারখানা সুসমাচার টিকিয়া থাকে এবং বাইবেলের নতুন নিয়ম তথা ইন্‌জীল শরীফ সংকলনের কালে এই চারটি পুস্তককে কানুনী বা প্রামাণ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিয়া নেওয়া হয় (ডঃ মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪)।

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, দ্বিতীয় খৃস্ট শতকের মাঝামাঝি সময়ে সিনোপের মার্কিওন সুসমাচারসমূহ যাচাই-বাছাই করার ব্যাপারে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গির্জার পুরোহিতবর্গের উপর বিশেষ চাপ সৃষ্টি করেন। মার্কিওন ছিলেন ইয়াহূদীদের ঘোর বিরোধী। সেকালে তাহার উদ্যোগেই বাইবেলের পুরাতন নিয়মের সব কয়টি এবং এমনকি যীশুর পরেও যে সকল রচনা ওল্ড টেষ্টামেন্টের খুব কাছাকাছি ছিল এবং যে সকল রচনা জুডিও ক্রিশ্চিয়ান ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল, তাহার সবগুলিই বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। মার্কিওন কেবল লূকের সুসমাচারকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। কেননা তাঁহার মতে, লূক ছিলেন পৌলের প্রতিনিধি এবং তাহার রচনার মুখপাত্র।

পরবর্তী কালে গির্জা সংস্থা মার্কিওনকে ধর্মদ্রোহী ঘোষণা করে। তবে তাহারা পৌলের সমস্ত পত্রকে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং সেই সাথে গির্জা সংস্থা মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের সুসমাচারকে বাইবেলের নতুন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়।

খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত এই সকল পুস্তকের সংখ্যা প্রায়ই কমবেশী হইতে দেখা গিয়াছে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, পরবর্তীকালে প্রমাণ্য হিসাবে গৃহীত রচনাও সেকালে অপ্রামাণ্য হিসাবে বাইবেল হইতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, ঠিক যেমন সেকালের প্রামাণ্য হিসাবে গৃহীত রচনাও পরবর্তীকালে অপ্রামাণ্য (এ্যাপোক্রাইফা) হিসাবে হইয়াছিল বর্জিত। প্রামাণ্য ধর্মগ্রন্থের তালিকা প্রণয়নের ব্যাপারে এই দ্বিধাদ্বন্দ্ব ৩৯৩ সালে অনুষ্ঠিত হিপ্পো রিগাস কাউন্সিল এবং ৩৭৯ সালে অনুষ্ঠিত কার্থেজ কাউন্সিল অধিবেশন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

অবশ্য উপরিউক্ত চারটি সুসমাচার সব সময়ই প্রামাণ্য পুস্তকের তালিকায় ছিল (প্রাগুক্ত)।

ডঃ মরিস বুকাইলি বলেন, এই যে বিপুলায়তন রচনাকীর্তি, যেসব রচনা চার্চ কর্তৃক এ্যাপোক্রাইফা বা পরিত্যক্ত বলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর অবলুপ্ত হইল, সেই বিষয়ে ফাদার বয়িসমার্ড (Father Boismard)-এর মত অনেকের মনেই বেদনার সঞ্চার হইতে পারে। ইতিহাসের স্বার্থেও এই সকল পুস্তক আলোচনার দাবি রাখে (প্রাগুক্ত)।

বর্ণিত আছে যে, ৩২৫ খৃস্টাব্দে খৃস্টীয় সম্মেলনে পঞ্চাশ ধরনের গসপেল পেশ করা হইয়াছিল। কিন্তু কনসট্যান্টিনের নির্দেশে উপরিউক্ত চারটি গসপেল রাখিয়া বাকী সবগুলিই পোড়াইয়া ফেলা হয়।

উল্লেখ্য যে, ফাদার বয়িসমার্ড 'সিনোপসিস অব দা ফোর গসপেলস' পুস্তকে সরকারীভাবে স্বীকৃত সুসমাচারগুলির আলোচনার পাশাপাশি ওইসব লুপ্ত ও পরিত্যক্ত পুস্তকগুলিরও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, খৃস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষ দিকেও বিভিন্ন লাইব্রেরীতে অবলুপ্ত ওই সকল গ্রন্থ মজুদ ছিল (ডঃ মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫)।

খৃস্টান গবেষকগণই প্রকাশ করিয়াছেন যে, ঐ সকল গসপেল বিশেষ পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে লেখা হয়। হযরত ঈসা (আ)-এর অন্তর্ধানের অনেক পর কিছু লেখক মূলত ঈসা (আ) সম্পর্কে শোনা কথা ও কাহিনীর উপর ভিত্তি করিয়া এবং সেই সময়ে প্রচলিত অন্যান্য গল্প ও গল্প-কাহিনীতে মিশাইয়া ঐ ধরনের গসপেলসমূহ রচনা করেন।

ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি বাইবেল-এর মতে, সুসমাচারসমূহ হইতেছে সেই সকল রচনার সমাহার যেই সকল রচনার দ্বারা বিভিন্ন মহলকে সন্তুষ্ট করা হইয়াছে, গির্জার প্রয়োজন মিটানো হইয়াছে এবং ধর্ম শাস্ত্র সংক্রান্ত নানা বক্তব্যের জওয়াব দেওয়া গিয়াছে। প্রচলিত ধর্মীয় ভুল-ত্রুটিসমূহ সংশোধন করা হইয়াছে এবং এমনকি প্রয়োজনে বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের উত্থাপিত নানা অভিযোগের দাতভাঙ্গা জওয়াবও এইসব পুস্তকের মাধ্যমে দেওয়ার প্রয়াস দেখা গিয়াছে। সুসমাচারের লেখকগণ এইভাবে স্ব-স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে লোককাহিনী হিসাবে যে সকল রচনা হাতের কাছে পাইয়াছেন তাহা থেকে উপাদান লইয়া নিজ নিজ পুস্তক সংকলন ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫)।

অতএব এইগুলি ঐশী গ্রন্থ হওয়া তো দূরের কথা, ঈসা (আ)-এর নির্যাস বাণী সংকলন বা তাঁহার জীবনের সঠিক ইতিবৃত্ত বর্ণনামূলক গ্রন্থ হওয়াও সংশয়ের ব্যাপার।

অবশ্য খৃস্টানদের মধ্যে কেহ কেহ ঈসা (আ)-এর ইন্জীল ছিল কিনা তাহা লইয়া সংশয় প্রকাশ করেন, অথচ তাহা যথাযথ নয়। কেননা বর্তমান খৃস্টানদের কাছে নিউ টেস্টামেন্ট নামে যে সুসমাচার ও পত্রাবলী রহিয়াছে তাহাতেও ঈসা (আ)-এর একটি ইন্জীল গ্রন্থের উপস্থিতির ইংগিত পাওয়া যায়। পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি যে, ইন্জীল শব্দের অর্থ সুসংবাদ। ঐতিহাসিকভাবে আরও প্রমাণিত যে, বর্তমান সুসমাচারগুলি প্রাথমিক যুগ হইতেই বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করা হয়। নিম্নে বর্তমান ওল্ড টেস্টামেন্টের কয়েকটি উক্তিতে দেখা যাইবে যে, যখনই ইন্জীল গ্রন্থটির প্রসঙ্গ আসিয়াছে তখনই কৌশলে তাহাকে সুসমাচার বলিয়া অনুবাদ করা হইয়াছে। আর তাহা নিম্নরূপ : (১) মথি সুসমাচারে আসিয়াছে : পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন" (মথি সুসমাচার, ৪ : ২৩)।

(২) মার্ক সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে, "আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া সদাপ্রভুর সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, কাল সম্পূর্ণ হইল, সদাপ্রভুর রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও ও সুসমাচারে বিশ্বাস কর" (মার্ক, ১ : ১৪-১৫)।

(৩) রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রে বলা হইয়াছে : "পৌল যীশু খৃস্টের দাস আহূত প্রেরিত সদাপ্রভুর সুসমাচারের জন্য পৃথককৃত-যে সুসমাচার সদাপ্রভু পবিত্র শাস্ত্রে আপন ভাববাদিদিগের দ্বারা পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন" (রোমীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্র, ১ : ১-২; করিন্থীয়দের প্রতি প্রেরিত পৌলের প্রথম পত্র, ৯ : ২১-২৩)।

সুতরাং পৌল যে সুসমাচারের জন্য নিবেদিত ছিলেন তাহার কথামতে উহা যীশু খৃস্ট তথা ঈসা (আ)-এর আনীত এই সুসমাচার তথা ইন্‌জীলটি নিশ্চয় বর্তমান খৃস্টানদের হাতে চার ইন্‌জীলের কোন একটিও নহে। মরিস বুকাইলি উল্লেখ করেন, "৭০ খ্রীস্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া ১১০ খৃস্টাব্দের কিছু আগে মার্ক মথি, লূক ও যোহন লিখিত বাইবেলের সুসমাচারসমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু এইগুলি কোনক্রমেই খৃস্ট ধর্মের লিখিত প্রথম দলীল বা পুস্তক ছিল না, এমনকি পৌলের লিখিত পত্রাবলীও এসবের অনেক আগের রচনা" (মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮)।

অতএব আল-কুরআন যেমনিভাবে ঈসা (আ)-এর ইন্‌জীল গ্রন্থের কথা উল্লেখ করিয়াছে তেমনিভাবে খৃস্ট সমাজের কাছে স্বীকৃত গ্রন্থাবলীতেও ঈসা (আ)-এর আলাদা সুসমাচার গ্রন্থের কথা উল্লেখ করা হয়, যাহার প্রচার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। মুক্ত মনের অধিকারিগণ অকপটে স্বীকার করিয়াছেন যে, এমন একটি ইন্‌জীল ছিল যাহা মাসীহিয়্যাতের হৃদপিণ্ডস্বরূপ, কিন্তু তাহা আর বিদ্যমান নাই। অতএব আমরা কি বলিতে পারি না যে, মথি, মার্ক, পৌল এবং উপরিউক্ত বক্তব্যে যে ইন্‌জীলের দাবি করা হইয়াছে তাহাই সম্ভবত ঈসা (আ)-এর ইন্‌জীল ছিল? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত চিন্তাবিদ ও গবেষক তাহার জন্য খুব আফসোস করিয়াছেন যে, আজ যদি সেই ইন্‌জীল থাকিত তাহা হইলে অনেক মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের সমাধান হইয়া যাইত এবং অনেক মতবিরোধ ও দলাদলির অবসান ঘটিত (শায়খ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত)।

ঈসা (আ)-এর ইন্‌জীল বনাম খৃস্টানদের সুসমাচার চতুষ্টয় : খৃস্টান সমাজে চারটি সুসমাচর বা ইন্‌জীল প্রচলিত আছে, সেইগুলি হইল :

১. মথি সুসমাচার

২. মার্ক সুসমাচার

৩. লূক সুসমাচার

৪. যোহন সুসমাচার

এইগুলিকে তাহারা তাহাদের বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট তথা নূতন নিয়মে সংযোজিত করিয়াছেন। তবে তাহারা একমত যে, এইগুলি ঈসা (আ) কর্তৃক লিখিত নহে বা তাঁহার উপর

আসমানী গ্রন্থরূপে নাযিল করা হয় নাই। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত উক্ত সুসমাচারের বঙ্গনুবাদে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হইয়াছে। একদিকে গোটা নিউ টেষ্টামেন্টকে ইন্‌জীল বলা হইয়াছে, অন্যদিকে ইহার পরিচয় দিতে গিয়া বলা হইয়াছে, ইহা ইন্‌জীল শরীফ। ইহা একটি কিতাব। ইহা জীবন্ত খোদার কালাম। পরক্ষণে আবার বলা হয়, ইন্‌জীল শরীফের এই ২৭টি খণ্ডকে বিষয় অনুসারে ৫ ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম চারটি খণ্ড খোদাবন্দ ঈসা মসীহের জীবনী (ইন্‌জীল শরীফ বি, বি, এস, ঢাকা ১৯৮০, পৃ. ৭)। আবার ৪টি খণ্ডের পরিচয়ে ৪জন লেখকের নাম উল্লেখ করা হয় মথি, মার্ক, লূক, ইউহান্না (প্রগুক্ত, পৃ. ৯)।

এই ধরনের বৈপরীত্য ও প্রতারণা সর্বজনবিদিত। কারণ এমনকি খৃস্টান জনগণও জানে যে, গসপেল বা ইন্‌জীলগুলিতে এই চারটি গ্রন্থকেই খৃস্টানরা মানিয়া থাকে। নিউ টেষ্টামেন্টের বাকীগুলিকে তাহারা প্রেরিতদের কার্যাবলী, পত্রাবলী ও প্রকাশিত কালাম বলিয়াই গণ্য করে। গোটা নিউ টেষ্টামেন্টকে তাহারা ইন্‌জীল শরীফ মনে করে না। উল্লেখ্য যে, খৃস্টানদের ধারণামতে তাহাদের বাইবেল মানুষের হাতে লেখা হইলেও তাহার প্রেরণা আসিয়াছে পবিত্র আত্মা (Holy Ghost) হইতেই। সুতরাং বিধাতাই এই পুস্তকের রচয়িতা (ড. মরিস বুকাইলি, প্রগুক্ত, পৃ. ১৫)।

খৃস্টানদের আরও বিশ্বাস, উপরিউক্ত চার গসপেল লেখা হয় ঈসা (আ)-এর জীবনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদের দ্বারা (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩)।

অতএব এই চারটি ইন্‌জীল সম্পর্কে আলোচনা করিলেই উপরিউক্ত বক্তব্যের সার্থকতা কতটুকু তাহা প্রকাশিত হইয়া যাইবে, তাহা পবিত্র আত্মা তথা ঈসা (আ) বা জিবরাঈলের প্রেরণায় না অন্য কাহারও প্রেরণায় তাহাও স্পষ্ট হইয়া যাইবে। সুতরাং এইগুলিকে কখন কোথায় কোন ভাষায় কিজন্য কে লিখিয়াছেন সে সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে এই চারটি সুসমাচার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।

মথি সুসমাচার

(ক) লেখক পরিচিতি

উক্ত সুসমাচারের লেখক মথি বলিতে কোন্ মথি ও তিনি কোথায় বাস করিতেন, ইহার লেখক মথি না অন্য কেহ তাহা লইয়া খৃস্ট সমাজে প্রচুর মতানৈক্য রহিয়াছে। অধিকাংশ খৃস্টান লেখকের মতে মথি ছিলেন (মথি ৯ ঃ ৯)। ইহার দ্বারা খৃস্টান লেখকগণ প্রমাণ করিতে চাহেন যে, তিনি ১২জন হাওয়ারীর একজন ছিলেন। মার্কের সুসমাচারে ঈসার সহিত যে ব্যক্তিটির সাক্ষাত হয় তাহার নাম আল্‌কের পুত্র লেবি বলিয়া উল্লেখ করা হয়। প্রেরিত কার্যাবলীতে লূক উল্লেখ করেন যে, যীশু খৃস্টের পরে লটারীর মাধ্যমে ইয়াহুদার পরিবর্তে মথিকে ১২জন সহচরের একজন বলিয়া গ্রহণ করা হয় (প্রেরিত ১ ঃ ১৬)। ড. মরিস বুকাইলি বলেন যে, মথিকে যীশুর সহচর হিসাবে পরিচয় দেওয়ার অভিমতটি বর্তমানে পরিত্যক্ত হইয়াছে (ড. মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯)।

অনেকের মতে তিনি ইয়াহুদী ছিলেন, পরে খৃস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। মথি জুডিও-ক্রিশ্চিয়ান সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। শায়খ আবু যাহরার মতে মথি ২৩ বৎসর হারশায় ছিলেন। সেখানে তিনি ৭০ খৃস্টাব্দে নিহত হন (শায়খ আবু যাহরা, প্রগুক্ত, পৃ. ৪২)।

মাওলানা মওদূদী (র) উল্লেখ করেন যে, প্রথম গ্রন্থটি হযরত মসীহের হাওয়ারী মথির প্রতি আরোপ করা হইয়াছে এবং ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত যে, তাহা মথি কর্তৃক লিখিত নহে । মথির প্রকৃত গ্রন্থ লুজিয়া (Logia) বিলুপ্ত হইয়াছে । যে গ্রন্থ মথির প্রতি আরোপ করা হয় তাহার গ্রন্থকার একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি (মথি, ৯ ঃ ৯)। এই গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, তাহার অধিকাংশ বিষয়বস্তু মার্কের ইন্জীল হইতে গৃহীত হইয়াছে । তাহার ১০৬৮ স্তোত্রের মধ্যে ৪৭০টি স্তোত্র মার্কের ইন্জীলে আছে (মাওলানা মওদূদী, সীরাতে সরোয়ারে আলম, ২খ, পৃ. ১৫৭; আরও দ্র. ড. মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত)।

রচনার সময়কাল

এই গ্রন্থটি কখন সংকলন করা হইয়াছিল তাহা লইয়া যথেষ্ট মতভেদ রহিয়াছে। ইব্ন বিথরিকের মতে ইহা রোমান সম্রাট কালদায়স-এর সময় রচিত। কিন্তু তিনি সন নির্ধারণ করেন নাই। সম্ভবত তাহা ঈসা (আ)-এর জন্মের চতুর্থ দশকের শেষের দিকে (শায়খ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত)। জারজিস যেবীন লেবাননীর মতে ৩৯ খৃ.। ড. পুস্তের মতে ইহা রোমানদের দ্বারা জেরুসালেম বিধ্বংসের পূর্বে লিখিত। ইবন হায্ম-এর মতে ঈসা (আ)-এর উর্ধ্ব গমনের নয় বৎসর পর (ইবন হায্ম, প্রগুক্ত, পৃ. ২৫১; শায়েখ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫)।

যে ভাষায় রচিত

মথির ইনজীল কোন ভাষায় রচিত হয় তাহা লইয়াও প্রচুর মতভেদ রহিয়াছে। ইবন হাযমের মতে, ইহা হিব্রু ভাষায়, আলূসীর মতে সুরিয়ানী ভাষায় (আলূসী, ইবন হায্ম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১ ; প্রাগুক্ত, ২৮খ, পৃ. ৮৬), ডাঃ পোস্ট-এর মতে গ্রীক ভাষায় লিখিত (ডঃ পোসট, কামুসুল কিতাব আল-মুকাদ্দাস, শায়খ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪)।

রচনার স্থান

রচনাকাল ও ভাষ্য সম্পর্কে যেমনি মতানৈক্য রহিয়াছে তেমনিভাবে ইহা কোথায় রচিত হইয়াছিল সেই স্থান নির্ধারণেও প্রচুর মতানৈক্য পাওয়া যায়। ইবন হাযমের মতে, (১) সিরিয়ার ইয়াহূদীয়া অঞ্চলের কোন এক স্থানে তাহা লিখা হয়। (২) আলূসীর মতে ইহা ফিলিস্তীন এলাকায় রচিত। এই মতটি অন্যভাবে ইবন বিতরীক ও যারযিস যোবিন বলেন, ইহা বায়তুল মুকাদ্দাসে রচিত (আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৩-৪৪)। আর যাহারা বলেন যে, ইহা একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত তাহারা নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করেন না। তবে আলেকজান্দ্রিয়া হওয়ার পক্ষেই তাহাদের ধারণা প্রবল। কারণ সেখানেই জুডিও খৃস্টানগণ বাস করিতেন (ড. মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯)।

একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক রচনা হওয়ার বিষয়টি আধুনিক গবেষকদের ভিতর অনেকেই সমর্থন করিয়াছেন। ইনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানার মতে, As a result we can not even be certain that Mathew was the author of the first Gospel. এসব কারণেই অমেরা এই বিষায়ে নিশ্চিত হতে পারি না যে, প্রথম সুসমাচার মথিই লিখিয়াছেন। কোন কোন আধুনিক সমালোচক দাবি করেন যে, এই সুসমাচারটি একদল লেখকের রচনা, কোন একক লেখকের নয়। তবু আধুনিক পণ্ডিতেরা এ বিষয়ে একমত যে, মথি তাহার লেখার উৎসরূপে ব্যবহার করিয়াছেন মার্ক-এর সুসমাচার বিক্ত দলিল এবং বিশেষ ধরনের জনশ্রুতি (The Ency. Americana, vol. 18, 1983, p. 514)। উপরিউক্ত বক্তব্যের আলোকে আলোচনা করিলে কয়েকটি দিক স্পষ্ট হইয়া উঠে।

প্রথমত, এই সুসমাচারের রচনাকাল অজ্ঞাত। এই ব্যাপারে খৃস্টান জগতও প্রায় একমত। দ্বিতীয়ত, ইহার লেখকও অজ্ঞাত। অন্ততপক্ষে লেখক সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে।

তৃতীয়ত, ইহা হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থার প্রত্যক্ষদর্শীদের মাধ্যমে লেখা নয়। কারণ ইহার লেখক মথি হিস্যাবে ধরিয়া লইলেও সেই মথি হাওয়ারী ছিলেন কি না বা অন্য কোন মথি, এই ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় নাই। পঞ্চমত, ইহা কোন ভাষায় রচিত তাহা লইয়াও ঐতিহাসিকগণের মাঝে মতনৈক্য রহিয়াছে। তাহারা একমত যে, ন্যূনতমপক্ষে ইহার অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব হয় নাই। ইহার আসল পাণ্ডুলিপি না থাকায় অনুবাদকৃত পাণ্ডুলিপির সাথে ইহার তুলনা করা সম্ভব হয় নাই। মোটকথা, ইহা ঈসা (আ)-এর জীবনের প্রকৃত ঘটনা ও বাণী সম্বলিত কি না সেই ব্যাপারে সন্দেহ রহিয়াছে।

মার্ক সুসমাচার ঃ চারটি সুসমাচারের মধ্যে মার্ক লিখিত সুসমাচারটি সবচাইতে ছোট। খৃস্টানদের দাবিমতে এই সুসমাচারটি সবচাইতে প্রাচীনও বটে।

লেখক পরিচিতি ঃ এই সুসমাচারের লেখক কে ছিলেন, তাহা লইয়া বিভিন্ন রকম বর্ণনা রহিয়াছে। (১) অধিকাংশ খৃস্টান পণ্ডিতের মতে ইহার লেখকের নাম ইউহান্না বা জন, যাহার উপাধি মার্ক। তিনি ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী বা সহচর ছিলেন না, তবে জনৈক হাওয়ারীর শিষ্য ছিলেন। কাহারো কাহারো মতে সেই হাওয়ারীর নাম পিতর মার্ক ছিলেন জেরুসালেমের এক ইয়াহূদী পরিবারের সন্তান। বলা হয় যে, তিনি ঈসা (আ)-এর সত্তরজন শিষ্যের অন্যতম ছিলেন।

ইহা ছাড়া কথিত আছে যে, পিতর যখন রোমে (এশিয়া মাইনর) ছিলেন তখন মার্ক ছিলেন তাহার শিষ্য। পিতরের লেখা চিঠির শেষ অনুচ্ছেদে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫০ সালের দিকে হেরালেপিস-এর বিশপ পাপিয়াস এই সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছিলেন যে, সুসমাচার লেখক মার্ক ছিলেন "পিতরের দোভাষী" এবং সম্ভবত পলের সহযোগী (ড. মরিস বুকাইলি, প্রগুক্ত, পৃ. ১০৪)।

প্রেরিতদের কার্যাবলীতে আসিয়াছে যে, ঈসার অন্তর্ধানের পর মার্কের বাড়িতেই তাহার শিষ্যগণ একত্র হইতেন। শায়খ আবু যাহরা উল্লেখ করেন যে, বার্নবা ছিল মার্কের মামা। তিনি বার্নবা ও

পৌলের সাথে বর্তমান তুরস্কের এ্যান্টিয়ক শহরে খৃস্টবাদ প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিলেন। ইহার পর জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর সাইপ্রাসে চলিয়া যান, পরে মিসরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে খৃস্টবাদ প্রচার করেন। তাহার প্রচারে অনেক মিসরী খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি কখনও রোমে আবার কখনও উত্তর আফ্রিকায় আসা-যাওয়া করিতেন, কিন্তু মিসরই ছিল তাহার আসল আবাসস্থল। আর এখানেই মূর্তি পূজকরা তাহাকে ৬২ খৃস্টাব্দে হত্যা করে (শায়খ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬)।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের থিওলজী ইন্সটিটিউট-এর প্রফেসর ডঃ নিনহাম মার্ক সুসমাচারের ব্যাখ্যায় (১৯৬৩) বলেন যে, মার্ক নামে এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যায় না, যাহার সহিত ঈসার দৃঢ় সম্পর্ক ছিল কিংবা প্রাথমিক খৃস্টান মণ্ডলিতে এই নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

প্রেরিতদের কার্যাবলী (প্রেরিত, ১২ঃ ১২, ২৫) অথবা পিটারের প্রথম পত্রে ৫ ঃ ১৩ অথবা পল-এর গালাতিও পত্রে ৪ ঃ ১০ যে ইউহান্নাকে মার্ক বলা হইয়াছে তিনিই মার্ক সুসমাচারের লেখক কিনা তাহা বিশুদ্ধতার ব্যাপারে জোর দিয়া বলা যায় না (Dr. Nenham, Saint Matk, Penguin books, England 1963, p. 39)।

ইবনুল বিতরীক মার্ক সুসমাচারের লেখক সম্পর্কে বলেন যে, হাওয়ারীগণের প্রধান পিটার মূলত মার্ক সুসমাচারটি লিখেন রোম শহরে এবং তাহার শিষ্য মার্কের নামে তাহা চালাইয়া দেন। কাহারো কাহারো মতে পিটারের পরিকল্পনা অনুসারে মার্ক এই গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন (শায়খ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭)।

ডঃ মরিস বুকাইলি বলেন যে, বিশপ পাপিয়াসের দেওয়া তথ্যের দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মার্কের সুসমাচারের লেখার সময়কাল ছিল, পিতরের মৃত্যুর পর (ডঃ মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪)। অতএব উহা গ্রন্থটি দ্বারা বুঝা যায় যে, গ্রন্থটি পিটারের লিখা নহে, বরং মার্কের দ্বারাই লিখিত। তবে সেই মার্ক-এর পরিচয় অস্পষ্ট।

ডঃ এফ গ্রান্টের মতে, কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, অগাস্টিন এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন যে, মার্ক সেই অনুসারীদের অন্তর্গত যাহারা সেই মথির ইনজীলকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছে (F. Grant, The Gpspels, Their Origins and Their Growth, London 1957, p. 74)।

রচনার ভাষা ঃ ইবন হাযমের মতে ইহা গ্রীক ভাষায় লিখিত ছিল, ইহা ছাড়া ফরাসী ভাষায় রচিত বলিয়াও মতামত পাওয়া যায়। কিন্তু তাহার পুরাতন পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় না।

রচনার সময়কাল ঃ (১) ইবন হাযমের মতে, ঈসা (আ)-এর উর্ধ্ব গমনের ২২ বৎসর পর তাহা রচিত হয় (ইবন হাযম, প্রাগুক্ত)। (২) আলূসীর মতে, ইহা ঈসা (আ)-এর উর্ধ্ব গমনের ১২ বৎসর পর রচিত (আলূসী, প্রাগুক্ত)। (৩) ডঃ মরিস বুকাইলির মতে, ইহা রচিত হইয়াছে ৬৬ খৃ. হইতে ৭০ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে। এই হিসাব সমর্থন করিয়াছেন 'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশনে'র ভাষ্যকারগণ।

রচনার স্থান ঃ (১) ইবন হাযমের মতে, তৎকালীন রোম সাম্রাজ্যাধীন এনটিওক শহরে মার্কের সুসমাচার সংকলন করা হয় (ইবন হাযম, প্রাগুক্ত)। (২) আলূসীর মতে ইহা রোম শহরে সংকলন করা হইয়াছিল (আলুসী, প্রাগুক্ত) ও ক্যালম্যান-এর মতও তাহাই (বুকাইলি, প্রাগুক্ত)।

যাহাদের উপলক্ষে লেখা ঃ 'মুরূজুল আখবার ফী তারাজিমিল আবরার' নামক গ্রন্থের বরাতে শায়খ আবূ যাহরা উল্লেখ করেন যে, উক্ত গ্রন্থটি রোমান অধিবাসীদের চাহিদার আলোকে লিখিত। আর এই গ্রন্থের লেখক মার্ক মসীহকে ইলাহ বলিয়া মানিতেন না (শায়খ আবু যাহ্‌রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬)।

"এই সুসমাচারে ব্যবহৃত বহু শব্দগুচ্ছ এই ধারণা দেয় যে, লেখক ইয়াহূদী সন্তান। তবে তাহার সুসমাচারে ল্যাটিন বাকভঙ্গির বহুল ব্যবহারে মনে করা হয় যে, তিনি ইহা রচনা করিয়াছিলেন রোমে বসিয়া। কেননা মার্ক তাহার এই সুসমাচারে ফিলিস্তীনের বাসিন্দা নয় এমন খৃষ্টানদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখিয়াছেন এবং আরামিক শব্দাবলী ব্যবহার করিয়া সঙ্গে সেইগুলির অর্থও বলিয়া দিয়েছেন (ডঃ মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪)।

সুতরাং নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ হইতে বিবেচনা করিলে বলিতে হয়, মথির সুসমাচারের মত মার্কের নামে প্রচলিত সুসমাচারটির লেখক, ভাষা, রচনাকাল ও স্থান সম্পর্কে মতানৈক্য ও অস্পষ্টতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

লূক সুসমাচার

লূক সুসমাচারটি সর্ববৃহৎ সুসমাচার। ইহার দুইটি অংশ ছিল; প্রথমাংশ লূক সুসমাচার হিসাবে সংকলিত হয়, অপর অংশ প্রেরিতদের কার্যাবলী অংশ নামে সংকলিত হয়।

লেখক পরিচিতি ঃ অন্যান্য সুসমাচারের লেখক সম্পর্কে যে ধরনের মতবিরোধ রহিয়াছে, লূক সম্পর্কেও সেই ধরনের মতানৈক্য না থাকিলেও লূক ব্যক্তিটি কে ছিলেন তাহা নির্ধারণে যথেষ্ট মতপার্থক্য লক্ষণীয়।

(১) কাহারো মতে, তিনি ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত ডাক্তার ছিলেন। তিনি পলের সদাসংগী ছিলেন, নিজ এলাকায় বা বিদেশ ভ্রমণে সর্বাবস্থায় তাহার সঙ্গে থাকিতেন। পলের পত্রাদিতেও এই ধরনের ইশারা আসিয়াছে (তীমথিয়দের প্রতি পত্র, ফিলীমনীয়দের প্রতি পত্র, ১ ঃ ২৪, এবং কলসীয়দের প্রতি, ৪ ঃ ১৪-তে উল্লেখ আছে, কলসীয় পত্রে পল বলেন,"লূক, সেই প্রিয় চিকিৎসক এবং দীমা, তোমাদিগকে মঙ্গলবাদ করিতেছেন (কলসীয়, ৪ ঃ ১৪)। এইগুলি প্রমাণ করে যে, তিনি ডাক্তার ছিলেন এবং এ্যান্টিওক অধিবাসী ছিলেন (মুতাওয়াল্লী ইউসুফ ছালাফী, আছওয়া আলাল মাসীহিয়্যাহ, পৃ. ৪৪)।

(২) ডঃ পোস্ট-এর মতে, তিনি এ্যান্টিওকের অধিবাসী ছিলেন না, বরং রোমানিয়ার অধিবাসী ছিলেন, যিনি ইটালিতে লালিত-পালিত হন। তাহার মতে, যাহারা দাবী করেন, লূক এ্যান্টিওকের অধিবাসী ছিলেন, তাহারা লূকিউস এ্যান্টিওকী নামে আরেক ব্যক্তির সাথে তাহাকে গুলাইয়া ফেলিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪-৪৫)।

(৩) অন্য দিকে খৃস্টীয় ইতিহাস লেখকদের মতে, তিনি ছিলেন চিত্রশিল্পী (শায়খ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮)। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, গবেষকগণ লূক সুসমাচারের লেখকদের জন্ম ও পেশা নিরূপণে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে পারেন নাই। কিন্তু সকলেই একমত যে, তিনি পলের শিষ্য, প্রিয়পাত্র ও সহযোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু মসীহ শিষ্য কিংবা হাওয়ারীগণেরও শিষ্য ছিলেন না।

ডঃ মরিস বুকাইলি বলেন যে, "লূক ছিলেন ভিন-ধর্মের এক শিক্ষিত ব্যক্তি। সেই অবস্থায় তিনি খৃস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ইয়াহূদীদের প্রতি তাহার বিরূপ মনোভাব প্রথম থেকেই সুস্পষ্ট। ও. ক্যালম্যান তাহার গবেষণায় প্রকাশ করিয়াছেন, লূক কিভাবে মার্ক লিখিত সুসমাচারের ইয়াহূদীপন্থী বাণীসমূহ এড়াইয়া গিয়াছেন, যীশুর বাণীর প্রতি ইয়াহূদীদের অবিশ্বাস ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহা ছাড়া যে শমীরীদের প্রতি ইয়াহূদীগণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিত এবং যীশুর মুখ দিয়া মথি যাহাদের থেকে প্রেরিতদের দূরে থাকিতে বলিতেন, সেই শমীরীদের সঙ্গে যীশুর সুসম্পর্ক বর্ণনা করিয়া লূক স্বস্তি পাইতে চাহিয়াছেন।

রচনার ভাষা ঃ ঐতিহাসিকগণ একমত যে, এই সুসমাচারটি গ্রীক ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। রচনাকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে ঃ (১) ডঃ পোস্ট-এর মতে, ৫৮ থেকে ৬০ সালের মাঝে অর্থাৎ জেরুসালেম ধ্বংসের পূর্বেই ঐ গ্রন্থটি সংকলন করা হয়। (২) প্রফেসর লারুনের মতে, পিটার ও পলের মৃত্যুর পর তাহা লিখিত। (৩) ডঃ হওরন বলেন, এই তৃতীয় ইনজীলটি রচিত হয় ৫৩ সালে অথবা ৬৩ বা ৬৪ সালে (শায়খ আবু যাহ্রা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯)। (৪) ইবন হাযমের মতে, ইহা মার্ক সুসমাচারের পরে সংকলিত (ইবন হাযম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২)। (৫) ডঃ মরিস বুকাইলি বলেন, আধুনিক যুগের গবেষক ও সমালোচকগণ মনে করেন, ইহা রচিত হয় ৮০ থেকে ৯০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। ২০০ খৃস্টাব্দের দিকে লূক ও এ্যাক্টস-এর লেখকরূপে লূককে পরিচয় দেওয়ার ধারা চালু হয় (The Ency. Americana, vol. 17, p. 84)।

রচনার স্থান ঃ (১) ইবন হাযমের মতে, উহা ইকায়াহ (সিরিয়ার ইফামিয়া বা তুরস্কের ইকনীয় নামে পুরাতন শহর)-এ সংকলন করা হয় (ইবন হায্ম, প্রাগুক্ত)।

(২) আলূসীর মতে, উহা আলেকজান্দ্রিয়াতে সংকলন করা হয় (আলূসী, প্রাগুক্ত)।

(৩) ডঃ শায়খ পোস্ট-এর মতে, খুব সম্ভব পল যখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন (৫৮-৬০ খৃ.), সেই সময়ে লূক ফিলিস্তীনের কৈসরিয়াতে ইহা সংকলন করেন (শায়খ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯)।

রচনার উপলক্ষ্য ঃ (১) শায়খ আবু যাহরা উল্লেখ করেন যে, লূক তাহার ইনজীলকে গ্রীকদের জন্য লিখিয়াছিলেন (প্রাগুক্ত)।

(২) ড. সরকারী বলেন যে, লূক নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণায় তাহা লেখেন। তিনি মূলত থিয়ফিল নামে এক ব্যক্তিকে তথ্য সরবরাহের জন্য তাহা সম্পাদন করেন। ইহা ইলহামের দ্বারা নহে কিংবা পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ও তাহা লেখেননি বরং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে তাহা করিয়াছেন (শাবকাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২)।

(২) ড. শারকাবী বলেন যে, লূক নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণায় তাহা লেখেন। তিনি মূলত থিওফিল নামে এক ব্যক্তিকে তথ্য সরবরাহের জন্য তাহা সম্পাদন করেন। ইহা ইলহামের দ্বারা নহে কিংবা তিনি পবিত্র আত্মার প্রেরণায়ও তাহা লেখেননি, বরং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উদ্যোগে তাহা করিয়াছেন (শারকাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২)।

কিন্তু থিওফিল নামে ঐ ব্যক্তিটি যাহাকে লূক মহামহিম ও মাননীয় বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন (লূক; ১ ঃ ৩) তিনি কে তাহা উল্লেখ করেন নাই। ইবন বিতরিকের মতে, তিনি রোমান বড় কোন কর্মকর্তা। আবার কাহারো মতে তিনি ছিলেন মিসরীয় (শায়খ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত)।

সম্ভবত থিওফিলের মত অভিজাত উচ্চ শ্রেণীর কিছু লোকের খৃস্টবাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে যাইয়া লূক তাহার সুসমাচারটি সম্পাদন করিয়াছিলেন। গবেষকগণের মতে, তাহার বর্ণনাভঙ্গিতে অনেকটা সাহিত্যিকতার ছাপ পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য ফাদার কানেন গিয়েসার মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "লূক হইতেছেন ইনজীলের চারজন লেখকের মধ্যে সবচাইতে বেশী আবেগধর্মী এবং সাহিত্যিক প্রতিভার অধিকারী। তাহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল একজন সত্যিকারের ঔপন্যাসিকের সকল গুণ" (ডঃ মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০)।

অতএব মথি এবং মার্কের মত লূকের ইনজীলটিও কখন কিভাবে কাহার মাধ্যমে রচিত তাহা ঐতিহাসিক ও গবেষকদের কাছে বিতর্কিত ও অস্পষ্ট। তাহা ছাড়া লূক ঈসা (আ)-এর শিষ্য তো ছিলেনই না, বরং তাঁহার শিষ্যেরও শিষ্য নহেন। অধিকন্তু নূতন খৃস্টবাদের প্রবক্তা পলের ছিলেন তিনি সহযাত্রী। তাই তাহার ইনজীলে পলের চিন্তা-চেতনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

যোহন সুসমাচার

যোহনের লিখিত সুসমাচারটি অপর তিন সুসমাচার হইতে অনেকটা ভিন্নধর্মী। খৃস্টানদের মতে সর্বপ্রথম রচিত গসপেলটি হইল মার্কের। আর সবচেয়ে যথাযথ মানের গসপেল হইল যোহনের গসপেলটি (Ency. Britannica. vol. 13., P.14)। এইজন্য তাহারা ইহাকে খুবই গুরুত্ব দিয়া থাকে।

লেখক পরিচিতি ঃ এই সুসমাচারের লেখক যোহন কি যেবেদীর পুত্র ইউহান্না হাওয়ারী, যাহাকে হযরত মসীহ (আ) ভালবাসিতেন, না অন্য কোন যোহন উহা লইয়া গবেষকগণের মাঝে প্রচণ্ড মতবিরোধ রহিয়াছে। (১) খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর খৃস্টান পণ্ডিতগণ উক্ত সুসমাচারকে হাওয়ারী যোহনের বলিয়া স্বীকার করেন না। (২) স্টাডলিন বলেন, গোটা সুসমাচারটি আলেকেজান্দ্রীয় খৃস্টমণ্ডলী বা জনৈক ছাত্রের রচিত (শায়খ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০; মুতাওয়াল্লী ইউসুফ শালাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭)।

এই সম্পর্কে ইকুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দা বাইবেলের ভাষ্যকারবৃন্দ বলেন, বেশির ভাগ সমালোচকই মনে করেন, এই সুসমাচারটি যে যোহনের লেখা সে ধারণা গ্রহণযোগ্য নহে, যদিও যোহনের রচনার সম্ভাবনা একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে সব কিছু বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া

দেখিলে একটা বিষয় সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আজ যোহনের নামে যে সুসমাচারটি আমরা পাইতেছি তাহার লেখক ছিলেন একাধিক ব্যক্তি। "খুব সম্ভব যীশুর সঙ্গী যোহন কতৃক লিখিত এই সুসমাচারটি (ইনজীলের চতুর্থ খণ্ড) তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারা সাধারণ্যে সম্প্রচারিত হইয়াছিল। সেই শিষ্যরাই খুব সম্ভব এই সমাচারে ২১নং অধ্যায়টি সংযুক্ত করিয়াছিলেন; এবং সেই সঙ্গে বেশ কিছু বর্ণনাও তাহারা একসাথে জুড়িয়া দিয়া থাকিবেন, যেমন ৪ঃ২ এবং সম্ভবত ৪ ঃ ১; ৪ ঃ ৪৪; ৭ ঃ ৩৭ (খ) ; ১১ ঃ ২ ও ১৯ ঃ ৩৫)। ব্যভিচারী স্ত্রীলোক সংক্রান্ত বর্ণনাটি সম্পর্কে সকলেই স্বীকার করেন যে, ইহা অজ্ঞাতনামা লেখকের রচনা, পরে ইহার সাথে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কিন্তু এই রচনাটি আসমানী কিতাব বলিয়া পরিচিত ইন্‌জীলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াই আছে"। ১৯ অধ্যায়ের ৩৫ নং বাণীতে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্যের উল্লেখ রহিয়াছে (ও. ক্যালম্যান)। যোহনের গোটা সুসমাচারে ইহাই একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য; কিন্তু ভাষ্যকারদের বিশ্বাস, এই বক্তব্যটিও পরে সংযুক্ত করা হইয়াছে। ক্যালম্যানের মতে, যোহন লিখিত সুসমাচারে এ ধরনের পরবর্তী সংযোজন খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। যেমন ২১ নম্বর অধ্যায়টি সম্ভবত যোহনের কোন শিষ্যের রচনা, যিনি গোটা সুসমাচারের মূল বর্ণনায়ও কিছু কিছু রদবদল সাধন করিয়া থাকিবেন। উপরে যেসব অভিমত তুলিয়া ধরা হইল সেসব অভিমত অন্য কাহারও নহে, বরং বাইবেল সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বজন স্বীকৃত খৃস্টধর্ম তত্ত্ববিদগণের। বলা অনাবশ্যক যে, এই ধরনের সুবিখ্যাত খৃস্টধর্মীয় গবেষকদের অভিমতই এই সুসমাচারটির আসল লেখক যে কে সেই সম্পর্কে সন্দেহ জাগিবার জন্য যথেষ্ট (ড. মরিস বুকাইলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২-১১৩)।

Encyclopaedia Britannica-এর মতে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, যোহনের সুসমাচারটি একটি জাল কিতাব। ইহার দ্বারা লেখক দুইজন হাওয়ারীর পরস্পর বিরোধ দেখানো হইয়াছে। সেই দুইজন হইলেন যোহন ও মথি। আর এই জাল লেখক মূল কিতাবে দাবি করিয়াছেন যে, তিনি সেই সহচর যাহাকে ঈসা (আ) ভালবাসিতেন। অতঃপর গীর্জা এই বাক্যটিকেই শিরোধার্য করিয়া লয় (Encyclopaedia Britannica)।

অতএব চতুর্থ ইনজীলের লেখক এই যোহন কে ছিলেন তাহা এমনকি খৃস্টান ঐতিহাসিকগণও জানেন না। যোহন নামে তো অনেকেই ছিল। সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে যে, মার্ক নামীয় ব্যক্তিকেও যোহন নামে অভিহিত করা হইত। নিউয়র্কের ট্রিনিটি কলেজের অধ্যাপক ডঃ গ্রান্ট-এর মতে যোহন খৃস্টান ছিলেন। আর ইহার পাশাপাশি তিনি হেলেনিক দার্শনিকও ছিলেন, আর সম্ভবত তিনি ইয়াহূদী, ছিলেন না, কিন্তু পূর্বদেশীয় বা গ্রীসের অধিবাসী ছিলেন (F. Grant, Ibid, P. 174)। ইব্‌ন হাযম-এর মতে ইহা গ্রীক ভাষায় লিখিত ছিল।

রচনার কালঃ এই সুসমাচারের সংকলনের তারিখ লইয়া খৃস্টান গবেষকগণ মতানৈক্য করিয়াছেন । ড. পোস্টের মতে, খুব সম্ভব ইহা ৯৫, ৯৮, ৯৬ খৃস্টাব্দে সংকলিত হয় । এই ব্যাপারে ইউরোন বলেন, ৪র্থ ইনজীলটি ৬৮ অথবা ৬৯ অথবা ৭০ অথবা ৭৯ অথবা ৯৮ খৃস্টাব্দে সংকলন করা হয় (শায়খ আবূ যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৩)। যারজিস জেবিনের মতে, ইহা ৯৬ খৃস্টাব্দে

রচিত হয় । আলূসীর মতে, ইহা ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্ব গমনের ৩০ বৎসর পর রচিত হয় (আলূসী, প্রাগুক্ত)।

সংকলনের স্থান ঃ এই ব্যাপারেও ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের মধ্যে মতবিরোধ রহিয়াছে। ইবন হাযমের মতে ইহা আন্তিয়া নামক শহরে সংকলিত হয় (ইবন হাযম, প্রাগুক্ত)। ইহা হিরাত ও গজনীর পার্বত্য অঞ্চলের ঘোরীয় একটি শহরের নাম (প্রাগুক্ত)। আলূসীর মতে ইহা পেসিস নামে একটি রোমান শহর যেখানে ঐ সুসমাচার সংকলিত হয়। ড. গ্রান্ট বলেন, যোহনের সুসমাচারটি এক হেলিনিক দার্শনিক কর্তৃক এন্টিয়ক শহরে কিংবা ইকসিনে নতুবা আলেকজান্দ্রীয়া। এমনকি রোমেও সংকলিত হইতে পারে। কেননা ঐ সমস্ত শহর প্রথম ও দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীতে বিশ্বজনীন কেন্দ্র ছিল এবং পরস্পরের সাথে যোগাযোগ ছিল (ড. গ্রান্ট, প্রাগুক্ত)।

রচনার উপলক্ষ ঃ এই ব্যাপারে সকলে একমত যে, লেখক বিশেষ একটি মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য গ্রন্থটি রচনা করেন। আর তাহা হইল মসীহের প্রতি দেবত্ব আরোপ। উপরিউক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্ট যে, এই ইনজীলটির লেখকও অজ্ঞাত। ইহার সংকলনের স্থান-কাল সম্পর্কেও মতভেদ রহিয়াছে। ইহাকে হযরত ঈসা (আ)-এর একজন সহচরের সাথে সম্পর্কিত করিয়া রচনা করিলেও লেখক দাবি করেন নাই যে, তিনি ঈসা (আ)-এর বিভিন্ন বাণী নিজ কানে শুনিয়াছেন বা ঘটনা সরাসরি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইহা গ্রীক দর্শনের আলোকে সাজানো হইয়াছে।

খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতেই এই সুসমাচারের বিরুদ্ধে খৃস্ট জগতে বিরাট ঝড় উঠে। খৃস্টানদের এক বৃহৎ গোষ্ঠী এই ইনজীলকে ইউহান্নার ইনজীল মানিয়া লইতে অস্বীকার করে এবং পরবর্তী যুগে এই সুসমাচার খৃস্ট জগতের পক্ষে এক নিদারুন দুরারোগ্য মাথাব্যথায় পরিণত হইয়া যায় (প্রাগুক্ত)।

বস্তুত এই চারটি ইনজীল বা সুসমাচার, যেইগুলিকে খৃস্ট সমাজ তাহাদের ধর্মের মূল উৎস হিসাবে ধারণ করিয়াছে, উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে সেইগুলি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করা যায়ঃ (১) এইগুলি হযরত ঈসা (আ)-এর তত্ত্বাবধানে লেখা নহে, এমনকি তাঁহার অনুসারীদের মাধ্যমেও লিখিত নহে। যাহারা লিখিয়াছেন তাহারা কাহার নিকট হইতে কখন কিভাবে শুনিয়া লিখিয়াছেন তাহা উল্লেখ করেন নাই। অতএব ঐগুলিতে ধারণকৃত ঈসা (আ)-এর বাণীগুলি নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত নহে, বরং সূত্র পরম্পরায় বিচ্ছিন্নতা ঘটিয়াছে।

(২) ইহার লেখকগণ এমন যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন না যাহারা ধর্মীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হইয়াছিলেন। কেননা তাহারা ছিলেন অজ্ঞাত। (৩) এইগুলি বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে লিখিত। (৪) এইগুলির মূল পাণ্ডুলিপি বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরবর্তীতে কাহারা সংকলন করেন বা কাহারা তাহা অনুবাদ করেন, তাহাও অজ্ঞাত।

(৫) অধিকাংশ ইনজীল গ্রীক ভাষায় লিখিত। একমাত্র মথি লিখিত সুসমাচারটি হিব্রু ভাষায় লিখিত বলিয়া অধিকাংশ গবেষক দাবি করিয়াছেন। তাহাও আবার হারাইয়া যায়। গ্রন্থটির একটি অজ্ঞাত অনুবাদের মাধ্যমে গ্রীক অনুবাদ প্রচলিত। অথচ হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁহার সকল হাওয়ারীর ভাষা ছিল হিব্রু ও সুরিয়ানি।

(৬) ইনজীলগুলি লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা দ্বিতীয় খৃস্টীয় শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। ১৫০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সাধারণ ধারণা এই ছিল যে, মৌখিক বর্ণনা লিখিত বর্ণনা হইতে অধিকতর উপযোগী। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু এই সময়ের লিখিত জিনিস নির্ভরযোগ্য মনে করা হয় না। নিউ টেস্টামেন্টের প্রথম নির্ভরযোগ্য মূল বচন ৩৯৭ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত কার্থেজের কাউন্সিলে অনুমোদিত হয়।

(৭) বর্তমানে ইনজীলের সে সকল প্রাচীন সংস্করণ পাওয়া যায় তাহা চতুর্থ খৃস্টীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের। দ্বিতীয় সংস্করণ পঞ্চম শতাব্দীর এবং তৃতীয় অপূর্ণ সংস্করণ যাহা রোমীয় পোপের লাইব্রেরীতে আছে তাহাও চতুর্থ শতাব্দীর অধিক পুরাতন নহে। অতএব বলা মুশকিল যে, প্রথম তিন শতাব্দীতে যেসব ইনজীল প্রচলিত ছিল তাহার সহিত বর্তমানের ইনজীলের কতটুকু সামঞ্জস্য রহিয়াছে।

(৮) কুরআনের ন্যায় ইনজীল গ্রন্থগুলি হিফ্য করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এই সবের প্রকাশনা অর্থগত বর্ণনার উপর নির্ভর করিত। স্মৃতিশক্তি ও বর্ণনাকারীদের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার প্রভাব হইতে স্বাভাবিকভাবেই এইসব মুক্ত হইতে পারে না। পরে যখন লেখার কাজ শুরু হয় তখন তাহা নকলনবীশদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিত। প্রত্যেকেই যাহা কিছু তাহার চিন্তাধারার পরিপন্থী মনে করিত তাহা সহজেই বাদ দিতে পারিত এবং তাহার মনঃপূত কোন কিছুর অভাব দেখিলে তাহা সংযোজন করিতে পারিত (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯)।

ঐ সকল সুসমাচারে মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়াও বিভিন্ন রকম ভুল-ভ্রান্তি, বৈপরীত্য, বিকৃতি ও সংযোজন-বিয়োজনের ধারা অব্যাহত রহিয়াছে। সুতরাং সেইগুলি ঈসা (আ)-এর তত্ত্বাবধানে সংকলিত ইনজীল হওয়া তো দূরের কথা, সাধারণ লেখকের সংকলিত একটি বিশুদ্ধ গ্রন্থ হওয়ারও যোগ্যতা প্রশ্নের সম্মুখীন। আর এই কথা সকলেরই জানা যে, হযরত ঈসা (আ)-এর ইনজীল ছিল একটি, কিন্তু খৃস্ট সমাজ গ্রহণ করিয়াছে চারটি। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ঈসা (আ)-এর আসল ইনজীল তাহাদের হাতে নাই। তাঁহার ইনজীলের বিলুপ্তির ইহাও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।

চার সুসমাচারের মূল বক্তব্য ও বিষয়বস্তু

চারটি সুসমাচার যে বিষয়ে একমত হইয়াছে তাহা হইল হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) কর্তৃক তাঁহার সম্পর্কে আগাম বাণী ও ঈসা (আ)-কে বাপ্তিস্ম দান, ঈসা (আ)-এর দ্বারা সংঘটিত বিভিন্ন আশ্চর্যজনক ও অলৌকিক কার্যাবলীর বর্ণনা, তাঁহার বিভিন্ন বাণী, বক্তৃতা, উপমা, নসিহত ইত্যাদি। এইগুলিতে বিবাহ, তালাক সংক্রান্ত কিছু কিছু শরিয়তী আইনের ব্যাখ্যা এবং চারিত্রিক কিছু দিক-নির্দেশনা ও সাথী নির্বাচন সম্পর্কেও কিছু বর্ণনা রহিয়াছে। এমনিভাবে ঈসা (আ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আগাম বাণী, তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ, গ্রেফতার ও বিচারকার্য এবং তথাকথিত শূলিবিদ্ধ করিয়া হত্যার বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তেমনিভাবে তাঁহাকে কবরস্থ করিবার

পর কবর হইতে উত্থান এবং শিষ্যদের সঙ্গে সাক্ষাত, পরিশেষে উর্ধ্ব গমনের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। মার্ক ও লূক সুসমাচারে হযরত ঈসা (আ)-এর বংশপরিচয়, জন্ম বাল্যকালের কিছু কিছু অবস্থার বর্ণনা আসিয়াছে। কিন্তু মার্ক ও যোহনের সুসমাচারে সেই ধরনের বিষয়বস্তু পাওয়া যায় নাই।

একমাত্র যোহনের সুসমাচারে ঈসা (আ)-কে ইলাহ বলা হইয়াছে এবং ত্রিত্ববাদের একটি পরোক্ষ আভাষ দেওয়া হইয়াছে যাহা অন্য কোন সুসমাচারে নাই। মূল বক্তব্যের দিক দিয়া সুসমাচার সম্পর্কে গবেষকগণ প্রচুর বৈপরীত্য, বিচ্যুতি ও সংযোজন-বিয়োজন আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা মুসলিম গবেষক ইবন হাযম ও রহমাতুল্লাহ কিরানবী হিন্দীসহ অনেকের গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এই সম্পর্কে এমনকি খৃস্টান গবেষকগণও পিছাইয়া নাই। তাহারাও উপরিউক্ত সুসমাচারের বিভিন্ন অসংগতি স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন।

(১) মথি সুসমাচার প্রথম দুই অধ্যায়।

(২) যিহুদা আসখার য়ুতীর ঘটনা যাহা মথি সুসমাচারে (২৭ঃ ৩-১০) বর্ণিত।

(৩) মথি সুসমাচারের ২৭ ঃ ৫২-৫৩।

(৪) মার্ক সুসমাচারের ১৬তম অধ্যায়ে ৯-২০ পর্যন্ত ১২টি বাক্য।

(৫) লূক সুসমাচারে ২২তম অধ্যায়ের ৪৩ থেকে ৪৪ নং বাক্য।

(৬) যোহন সুসমাচারের ৫ নং অধ্যায়ের ৩-৪ নং বাক্য।

(৭) যোহন সুসমাচারের ২১তম অধ্যায়ের ২৪-২৫ নং বাক্য (রহমতুল্লাহ হিন্দী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩৮৪-৩৮৫)।

ঈসা (আ)-এর মিশন ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার নিজের ঘোষণা আর প্রচলিত বাইবেল নূতন নিয়ম সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী। ঈসা (আ) দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন ঃ মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদী গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পুণ্য করিতে আসিয়াছি (৫ ঃ ১৭)।

এই সেই উনবিংশ শতাব্দীতে আসিয়াও এই নিয়মে ঘটানো হইয়াছে মারাত্মক ধরনের সব জালিয়াতি যাহার জলন্ত প্রমাণ প্রচলিত বাইবেলের নানা সংস্করণে বিদ্যমান। দুই একটি উদাহরণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেছি। হলি বাইবেল এন আই ভি-তে পাদটীকায় বলা হইয়াছে যে,

"7-8 Late manuscripts of the vulgate testify in heaven. The father, the word and the holy spirit and these three are one 8 and there are three that testify; On earth. The (not found in any Greek manuscript before the sixteenth century)".

অর্থাৎ কমন যৌহান্নিয়াম বা তিন ঐশী সাক্ষী নামের এই পংক্তিটি সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ল্যাটিন ভালগেট-এ (চতুর্থ শতাব্দীর) এবং ১৬শ শতাব্দীর আগে নূতন নিয়মের কোন গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে ইহা

ছিল না। খুব সম্ভব কোন দুর্বোধ্য শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যখ্যা হিসেবে ইহা পাতার অমুদ্রিত অংশে ছিল যাহা পরে মূল পর্বের সাথে মিশিয়া যায়।

মথি ১৭ঃ ১৪-২১ বাণীতে ঘটানো হয়েছে আরও মারাত্মক ধরনের জালিয়াতি। বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি প্রকাশিত বাংলা বাইবেলে মথি ১৭ ঃ ২১ বাণীটি হইল "আর ইহা সরিয়া যাইবে; এবং তোমাদের অসাধ্য কিছুই থাকিবে না।" কিন্তু থম্পসন চেইন রেফারেন্স বাইবেলে এই বাণীটি হইল, "Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

হলি বাইবেল, এন,আই,ভি-তেও পাদটীকায় স্বীকার করা হইয়াছে যে,

Some manuscripts you, 21 but this kind does not go out cxcept by prayer and fasting.

উল্লেখ্য যে, বাংলা বাইবেলের প্রচলিত ২১ বাণীটি হইল আসলে ২০ বাণীরই অংশবিশেষ। বাণীর সংখ্যা ঠিক রাখার জন্য এই কারচুপির আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃত ২১ বাণীটি রিভাইজড ভারশানের অনুকরণে বাদ দেওয়া হইয়াছে, যাহা অথরাইজড ভারশানে রক্ষিত আছে। তবে এই বাংলা বাইবেলের পাদটিকায় স্বীকার করা হইয়াছে যে, "কোন কোন অনুলিপিতে এই কথাগুলি পাওয়া যায় ঃ কিন্তু প্রার্থনা ও উপবাস ভিন্ন আর কিছুতেই এ জাতি বাহির হয় না।"

প্রকৃত ঘটনা এই যে, ইয়াহূদী ধর্ম শাস্ত্রের মত ইনজীল শরীফেও নামায কায়েম করা আর রোযা রাখা অনুসারীদের জন্য ফরয করা হইয়াছিল যাহা সর্বশেষ ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনেও বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে মুসলমানদের জন্য। ইহা অত্যাবশ্যকীয় বিধান, শাস্ত্রে থাকা সত্ত্বেও খৃস্টানরা তাহা পালন করিত না বরং অস্বীকার করিত। মুসলমানদের তীব্র সমালোচনা হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার প্রয়াসেই খৃস্টান নেতারা শেষ হাতিয়ার হিসাবে ১৮৮১ সালে নূতন নিয়ম সংশোধন করে। সেই সংশোধিত রিভাইজড ভারশানে নামায রোযার বিধান সম্বলিত এই বাণীটি বাদ দিয়া দেয়। এ ধরনের জালিয়াতি ঘটানো হইয়াছে মার্ক ৯ ঃ ২৯ বাণীটিতেও।

সুসমাচার চতুষ্টয়ের পরস্পর বিরোধিতার কতিপয় নমুনা

১. যীশুর জন্ম ও জন্মসূত্র সম্পর্কিত তিনটি আলাদা আলাদা বিবরণ এইগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি হইল, মথি ১ ঃ ১-২২; লূক ১ ঃ ৩২-৩৩ এবং যোহন ১ ঃ ১। মার্ক সুসমাচার এই বিষয়ে নির্লিপ্ত। মথি আর লূক-এর মতে যীশু একজন সাধারণ মানুষপুত্র, আবার তাহাকে ঈশ্বর পুত্রও বলা হইয়াছে। কিন্তু যোহনের মতে, যীশু "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন" (যোহন ঃ ১১)। আর সব কিছু তাহার থেকেই সৃষ্টি। এক কথায় যীশু ছিলেন একই সাথে ত্রিত্ববাদ মতবাদের ত্রিত্ব এবং পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বর।

(২) যীশুর ব্যাপ্তিস্ম সম্পর্কে মথি ৩ঃ১৩-১৭, মার্ক ১ ঃ ৯-১২, লূক ৩ ঃ ২১-২২ ও ৪ ঃ ১ বাণীতে পৃথক পৃথক বিবরণ রহিয়াছে। এইসব বিবরণ মতে যীশু যোহন ব্যাপ্টাইজকের হাতে

বাপ্তাইজ হন এবং ইহার পরপরই কিংবা একই দিনে তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যান। কিন্তু যোহনের সুসমাচারে এই ব্যাপ্তিস্ম বিষয়ে কোন বিবরণ নাই এবং যীশু আর যোহন ব্যাপ্তাইজকের মধ্যকার দেখা-সাক্ষাৎ দুই দিন স্থায়ী হয় বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

(৩) মথি ১৩ ঃ ৫৪-৫৮, মার্ক ৬ ঃ ৪ ও লূক ৪ ঃ ২৪ বাণী মতে যীশুর স্বদেশ (Native land) হইল গালীল। কিন্তু যোহন ৪ ঃ ৩, ৪৩-৪৪ বাণীতে বলিতে চাওয়া হইয়াছে যে, তাঁহার স্বদেশ হইল যিওদিয়া এবং সেইখান হইতে তিনি গালীলে গমন করেন।

(৪) লূক ২৪ ঃ ৫০-৫১ মতে যীশু বৈথনিয়া হইতেই উর্ধ্বে নীত হন। কিন্তু প্রেরিত ১ ঃ ১২ মতে যীশু উর্ধ্বে নীত হন জৈতন পর্বত হইতে। অথচ এই দুইটি পুস্তকই লূক-এর রচনা বলিয়া দাবি করা হইয়া থাকে।

(৫) লূক ২৪ ঃ ২১-২৯, ৩৬ ও ৫১ বাণী মতে যীশু যেদিন পুনরুত্থিত হন সেই দিনই কিংবা পরবর্তী রজনীতেই উর্ধ্বে নীত হন। কিন্তু প্রেরিত ১ ঃ ৩ বাণী সাক্ষ্য দেয়, যীশু উর্ধ্বে নীত হন পুনরুত্থানের চল্লিশ দিন পরে। প্রকৃতপক্ষে যীশুর মৃত্যু, কবরস্থ হওয়া, পুনরুত্থান কোনটিই ঘটে নাই।

মথি ১৫ ঃ ২১-২৮ ও মার্ক ৭ ঃ ২৪-২৭ বাণীতে দেখা যায় যে, জনৈকা কনানীয়া স্ত্রীলোক যীশুর নিকট আসিয়া তাহার ভূতগ্রস্থা কন্যার প্রতি যীশুর দয়া প্রার্থনা করে। পরে দেখা যায় যে, দয়া দেখানোর পরিবর্তে যীশু বরং উল্টা "উত্তর করিয়া কহিলেন, ইস্রায়েল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই।" স্ত্রীলোকটি আবারও যীশুর 'উপকার' প্রার্থনা করিলে তিনি বলেন যে, সন্তানদের খাদ্য লইয়া কুকুরদের কাছে ফেলিয়া দেওয়া ভাল নহে।" অর্থাৎ কনানীয় স্ত্রীলোকটিকে যীশু কুকুর আখ্যায়িত করিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন। যোহন ২ ঃ ৩-৪ বাণীতে দেখা যায় যে, পরে দ্রাক্ষারসের অকুলান হইলে যীশুর মাতা তাহাকে কহিলেন, "উহাদের দ্রাক্ষারস নাই।" যীশু তাঁহাকে কহিলেন, "হে নারী! আমার কাছে তোমার বিষয় কি? আমার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই।"

আবার মথি ১২ ঃ ৪৭-৪৮ বাণীতে দেখা যায় যে, তখন এক ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে কহিল, "দেখুন আপনার মাতা ও ভ্রাতারা কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। কিন্তু যে এই কথা বলিল, তাহাকে তিনি উত্তর করিলেন, "আমার মাতা কে? আবার ভ্রাতারাই বা কাহারা"? নিজের মা ও ভাইদের প্রতি এই ধরনের উক্তি ও ব্যবহার একজন নবীর পক্ষে সম্ভব নহে। আর এই ধরনের বাণীকে আসমানী কিতাব বলা যায় না (প্রাগুক্ত)।

মোটকথা, উপরিউক্ত সুসমাচারসমূহে শুধু সনদ তথা সূত্রগত দিক দিয়া অনির্ভরযোগ্যই নহে, বরং মূল বক্তব্যের দিক দিয়াও অনেকাংশে অগ্রহণযোগ্য। মূল বক্তব্যেও অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তি ও

(বিপরীত) এবং অসংগতি রহিয়াছে বলিয়া খৃস্টান গবেষকগণও স্বীকার করিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। খৃস্টান পণ্ডিতগণ নূতন নিয়মের পাঠ সংশোধনের জন্য বিগত শতাব্দীগুলিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছেন। তাহাদের আশা ছিল যে, এই সকল চেষ্টা-গবেষণার ফলে ইনজীলের যে কোন পাঠের উপর তাহারা সর্বকালের জন্য ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। প্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ডঃ মিল নূতন নিয়মের কয়েকটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পরস্পর পরীক্ষা করিলে ত্রিশ হাজার পার্থক্য গণনা করেন। জন জেম্স এবং বাতাসতীন বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া পূর্ববর্তীদের তুলনায় আরও অধিক পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া পরস্পর তুলনা করিলে দশ লক্ষ পার্থক্য দেখিতে পান। এই সকল পার্থক্যের অধিকাংশই ছিল পঠন এবং লিখন সংক্রান্ত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে এমন কিছু উল্লেখযোগ্য পার্থক্যও ছিল যাহার ফলে সত্য ও মিথ্যা এবং আসল ও নকল পাঠ ও বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান থাকে না। Encyclopaedia Britannica-এর Bible শীর্ষক নিবন্ধকার F.C. Burkih লিখিয়াছেন যে, মিল এবং Wetstein সর্বকালের জন্য প্রমাণ করেন যে, নূতন নিয়মে যে সকল বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়, তাহাদের মধ্যে কোন কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এইগুলি প্রথম দিকেই সৃষ্টি হইয়াছিল। Marcion এবং Tatien বাইবেলের রদবদলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। ইনজীলের রদবদল সম্পর্কে ইয়াহূদী দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, খৃস্টানদের প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল চালচলন ও রীতিনীতি লেখকগণকে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রভাবিত করিয়াছে (Jewish Ency., ix, 947)। নিবন্ধকার ইহার আলোচনা প্রসঙ্গে ইনজীলসমূহের পরস্পর বিরোধী বর্ণনার বহু উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে এমন কিছু পার্থক্য রহিয়াছে, যাহার নিশ্চিত কোন কারণ জানা যায় না (ইসলামী বিশ্বকোষ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩খ, পৃ. ৪১৪)।

বাইবেল সম্পর্কে আধুনিক মুক্ত মনের খৃস্টান গবেষকদের সাথে সুর মিলাইয়া বিশ্বখ্যাত আহমাদ দিদাতও প্রমাণ করিয়াছেন যে, বর্তমান খৃস্টানদের বাইবেলে ৫০ হাজারেরও বেশি ভুল রহিয়াছে (দ্র. আহমাদ দীদাত, ফিফটি থাউজেণ্ড এ্যরারস)।

আহমাদ দিদাত তাঁহার বিখ্যাত The choice নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, রেড লেটার বাইবেল বলিয়া একটা বাইবেলের প্রচলন আছে। বাইবেলের যেসব বক্তব্য বা বাণী যীশুর কথিত বলিয়া উল্লেখ আছে, এই "রেড লেটার বাইবেলে" যীশুর কথিত সেই বাণী লাল কালিতে মুদ্রিত, বাকি অংশ কালো কালিতে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, এই রেড লেটার বাইবেলের ৯০ ভাগই কালো কালিতে ছাপা (আহমাদ দিদাত, দি চয়েস, অনুবাদ আখতার-উল-আলম; আরও দ্র. The Holy Bible, Cambridge University press, Great Britain.)।

আসলে যুগে যুগে ঐ সকল সুসমাচার মুদ্রণে গীর্জা সংস্থাই দায়িত্ব পালন করিত, সর্বসাধারণের কোন ভূমিকাই ইহাতে ছিল না। অনন্তর প্রটেস্টান্টদের বিপ্লবের মুখে ঐগুলি গবেষকগণের হাত পৌঁছিলে সেইগুলির অসংখ্য ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িতে থাকে।

বার্ণাবাসের গসপেল

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, খৃস্টানদের প্রাথমিক যুগে প্রচলিত গসপেলসমূহের মধ্যে বার্ণাবাসের গসপেল ছিল অন্যতম। পরবর্তীতে এক শ্রেণীর খৃস্টানদের দ্বারা তাহা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল। আরও মজার ব্যাপার এই যে, উক্ত গ্রন্থটি খৃস্টান সমাজে প্রচলিত সুসমাচারের অনেক তথ্যকে সমর্থন করে না। উক্ত গ্রন্থে ত্রিত্ববাদের পরিবর্তে তাওহীদি ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থটির লেখক বার্ণাবাস কে ছিলেন, কখন কিভাবে তাহা রচনা করেন এবং তাহার পাণ্ডুলিপি খৃস্ট সমাজের প্রাচীন গ্রন্থাগার হইতে কিভাবে উদ্ধার করা হয় তাহা লইয়া গবেষকগণ অনুসন্ধান চালাইয়া আসিতেছেন। এই সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা হইল।

লেখক পরিচিতি ঃ ঐতিহাসিকগণের মতে বার্ণাবাস ছিলেন একজন ইয়াহূদী, যিনি সাইপ্রাসে জন্মগ্রহণ করেন (Md. Ataur Rahim, Ibid, P. 54)। তিনি যুসেস (ইসু) বা যুসেফ (ইউসুফ) নামেও পরিচিত ছিলেন। তাহার সম্পর্কে উপরিউক্ত চারটি সুসমাচার- এ খুব কমই আলোচনা আসিয়াছে। চারটি গসপেলের উল্লেখকৃত তথ্যে জানা যায়, ইউসুফ নামে এক ব্যক্তি কথিত ক্রুশবিদ্ধ যীশুর লাশ দাফন করিয়াছিল। অনেকের ধারণামতে সেই ইউসুফই হইলেন বার্ণাবাস। তাহার সম্পর্কে মথি সুসমাচারে বলা হয় ঃ "পরে সন্ধ্যা হইলে আরিমাথিয়ার একজন ধনবান লোক আসিলেন, তাহার নাম যোষেফ, তিনি নিজেও যীশুর শিষ্য হইয়াছিলেন, পীলাতের নিকেট গিয়া যীশুর দেহ যাচ্ঞা করিলেন" (মথি ২৭ ঃ ৫৭-৫৮)। মার্ক, লূক ও যোহন সুসমাচারেও অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে (দ্র. মার্ক সুসমাচার ১৫ ঃ ৪২-৪৩; লূক সুসমাচার, ২৩ ঃ ৫০-৫২)।

(১) চার সুমাচারের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি অরিমাতিয়া জনপল্লীর অধিবাসি ছিলেন।

(২) চারটি সুমাচারের মতে তিনি ঈসা (আ)-এর কমপক্ষে অনুসারী ছিলেন। তবে যোহনের মতে তিনি তাহার পরিচয় গোপন রাখিতেন।

(৩) তিনি ধনবান ছিলেন (মথি)।

(৪) তিনি মন্ত্রী পরিষদের সম্ভ্রান্ত সদস্য ছিলেন (মার্ক ও লূক)।

(৫) তিনি ইয়াহূদী ছিলেন (মথি)।

(৬) স্বর্গরাজ্যের অপেক্ষায় ছিলেন (মার্ক)।

(৭) তিনি একজন সৎ ও ধার্মিক লোক ছিলেন (লূক)।

(৮) তিনি ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্র ও কার্যকলাপ সমর্থন করিতেন না (লূক)।

(৯) ইয়াহূদীদের ভয়ে নিজের পরিচয় গুপ্ত রাখিলেও (যোহনের বর্ণনামতে) প্রকৃতপক্ষে তিনি সাহসী লোক ছিলেন (মার্ক)।

তবে বার্ণাবাস নিজেই নিকোডেমাস ও আবাবি মাথিয়ার ইউসুফ বলিয়া ঐ ব্যক্তির পরিচয় দেন (বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ২৬০)। তাই এই ইউসুফ নামের ব্যক্তিটি তিনি নিজেই কিনা তাহা লইয়া সংশয় আছে। তবে প্রেরিতের কার্যাবলীতে বার্ণাবাসের পরিচয় স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়। প্রেরিতদের

কার্যবিবরণে অনেকবার তাহার প্রসঙ্গ আসিয়াছে। যেমন ঃ "আর যোষেফ, যাঁহাকে প্রেরিতেরা বার্নবা নাম দিয়াছিলেন— অনুবাদ করিলে, এই নামের অর্থ প্রবোধের সন্তান— যিনি লেবীয় এবং জাতিতে কুপ্রীয়, তাঁহার এক খণ্ড ভূমি থাকাতে তিনি তাহা বিক্রয় করিয়া তাহার মূল্য আনিয়া প্ররিতদের চরণে রাখিলেন" (প্রেরিত ৪ ঃ ৩৬-৩৭)।

এইভাবে কলসীয়দের পত্রে পৌল উল্লেখ করিয়াছেন, "আমার সহবন্দি আরিস্টার্খ এবং বার্নবার কুটুম্ব, মার্ক যাঁহার বিষয়ে তোমরা আজ্ঞা পাইয়াছ; তিনি যদি তোমাদের কাছে উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে গ্রহণ করিও" (পলের কলসীয় পত্র, ৪ ঃ ১০)।

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিসমূহ পর্যালোচনা করিলে বার্ণাবাসের নিম্নোক্ত পরিচয় পাওয়া যায় ঃ

(১) তিনি সাইপ্রাসের অধিবাসী ছিলেন।

(২) তাহার নাম ছিল ইউসুফ, যাহাকে তাহার সাথীবর্গ বার্ণবা উপাধিতে ভূষিত করেন। আর বার্ণবা অর্থ নসীহতের সন্তান। অর্থাৎ তিনি হৃদয় নিড়ানো বক্তব্যের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ওয়াজ নসীহত করিতে পারিতেন, যেইজন্য তাহাকে উপরিউক্ত উপাধি প্রদান করা হয়।

(৩) তিনি দাওয়াতের জন্য অন্যান্য প্রেরিতদের সহায়তায় নিজস্ব সম্পদ দান করার ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই উন্মুক্ত হস্ত।

(৪) তিনি ছিলেন পূতঃ পবিত্র ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলিয়ান। সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

(৫) আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনায় তিনি দাওয়াত প্রচারে পৌলকে সাথে লইয়াছিলেন।

(৬) প্রাথমিক গির্জামণ্ডলী তাহাকে এন্টিওক ও তারতুস নগরীতে পঠাইয়াছিলেন।

(৭) কথিত দ্বিতীয় সুসমাচারের লেখক মার্কের সাথে তাহার আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল।

(৮) তিনি পৌলকে হেদায়াত দানে চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই পৌল যে ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের উপর হত্যা নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাইয়াছিল।

(৯) সম্ভবত মার্কের সাথে তাহার আত্মীয়তার সূত্রে বলা যায়, বার্ণবাই মার্ককে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাই বলা হয় যে, মাসীহ ইলাহ হওয়ার বিষয়টি মার্ক অস্বীকার করিতেন (ইউসুফ সালাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯-৬০)।

বার্ণাবাসের ধর্মীয় মর্যাদা ঃ উপরিউক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, বার্ণাবাস অত্যন্ত ধার্মিক, সম্ভ্রান্ত ও খৃস্টীয় মণ্ডলীর বড় ধরনের নেতা ছিলেন যিনি মাসীহীর ধর্ম প্রচারে স্বীয় ধন-সম্পদ সময়-সুযোগ সকলই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি ছিলেন খৃস্টবাদের এক স্তম্ভস্বরূপ। এইজন্য গোটা খৃস্ট সমাজ একমত যে, তিনি ছিলেন একজন ধর্ম প্রচারক ও প্রেরিত পুরুষ যিনি পবিত্র আত্মার বরকতে মহীয়ান ছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহাকে বার শিষ্য তথা হাওয়ারীগণের অন্তর্ভুক্ত করে নাই। যদিও বার্ণাবাসের বাইবেল হইতে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন ঈসা (আ)-এর একনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ হাওয়ারী। আর তিনি ছিলেন নিখুঁত তাওহীদপন্থী। যেইজন্য ত্রিত্ববাদে আবিষ্ট পৌলিয়দের দ্বারা লিখিত সুসমাচারসমূহে হাওয়ারীগণের তালিকায় বার্ণাবাসের আর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল।

লূক প্রেরিতদের কার্যাবলীতে উল্লেখ করেন, "পরে তিনি (পল, গ্রীক ভাষায় তাহার নাম পল) জেরূসালেমে উপস্থিত হইয়া শিষ্যবর্গের সহিত যোগ দিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলে তাহাকে ভয় করিল, তিনি যে শিষ্য ইহা বিশ্বাস করিল না। তখন বার্ণাবা তাহার হাত ধরিয়া প্রেরিতদের নিকট লইয়া গেলেন এবং পথের মধ্যে তিনি যেরূপে প্রভুকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ও প্রভু যে তাহার সহিত কথা বলিয়াছিলেন এবং কিরূপে তিনি দামেশকে যীশুর নাম সাহসপূর্বক প্রচার করিয়াছিলেন এ সকল তাহাদের নিকট বর্ণনা করিলেন" (প্রেরিত, ৯ ঃ ২৬-২৭)।

বার্ণাবাস ও পল সুদীর্ঘ কাল একই সঙ্গে রহিয়াছিলেন এবং খৃস্ট ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে পলের সাথে বার্ণাবাসের বিচ্ছেদ ঘটে। লূকের বর্ণনামতে বিভিন্ন স্থানে প্রচারকাজে বার্ণাবাস তাহার আত্মীয় মার্ককে সংগে রাখিতে চাহিলে পল কোন কারণে আপত্তি করেন। ইহাতেই মতান্তর হয় এবং উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, পরবর্তীতে পল স্বয়ং মার্ককে সহযাত্রী করিয়া লইলেন কিন্তু বার্ণাবাসের সংগে তাহার মিলন হইল না। প্রকৃতপক্ষে বিরোধ মার্ককে সঙ্গে নেওয়ার কারণে নহে, বরং তাহা ছিল ধর্মীয় মতবিরোধ কেন্দ্রিক। কেননা ভিন্ন জাতীয় লোকদের মধ্য হইতে নবদীক্ষিত খৃস্টানদের বিভিন্ন আচার-আচরণের ব্যাপারে পল ছিল সমর্থক। এমনিভাবে হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের অনুষ্ঠানাদি এবং খৎনা ইত্যাদি রহিত করাই ছিল তাহার বৈপ্লবিক মতবাদের অন্যতম অঙ্গ। ইহার সমর্থনে তাহার পত্রাবলীতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যুক্তি দেখাইতেও পল দ্বিধাবোধ করেন নই (রোমীয়, ১ ঃ ২৫, ৩ ঃ ৩০)।

সুতরাং পল তাহার নূতন অনুসারীদের পক্ষে খৎনা এবং হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি অবশ্য পালনীয় বলিয়া মনে না করিতে শুরু করেন। অপরদিকে বার্ণাবাস কোন মতেই এই সমস্ত পরিত্যাগ করিতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ ইবরাহীম (আ) ও মূসা (আ)-এর শরীআতে তাহা স্পষ্টভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে (আদিপুস্তক, ১৭ ঃ ১০-১৪; লেবীয় পুস্তক, ১২ ঃ ৩)।

বার্ণাবাস প্রথমদিকে সরল বিশ্বাসে পলের সমর্থন এবং তাহার সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখিলেও ক্রমেই তাহার কাছে পলের আসল স্বরূপ প্রকাশ পাইতে থাকে। এমন এক পর্যায় বার্ণাবাস পলের খৃস্ট ধর্ম বিরোধী সকল আকীদা ও মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন এবং তখনই উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। আর সেই প্রেক্ষাপটেই বার্ণাবাস তাহার গসপেলটি রচনা করেন, যাহাতে ঈসা (আ)–এর শিক্ষা এবং খৃস্ট ধর্মের প্রকৃত চিত্র পরিবেশন করিয়া পৌলীয় চিন্তাধারার প্রতিবাদ করেন।

বার্ণাবাসের গসপেলের পরিচয়

ঐতিহাসিকগণের মতে ৩২৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এন্টিওক ও আলেকজান্দ্রিয়ার খৃস্টান গির্জাসমূহে বার্ণাবাসের বাইবেল আইন সম্মত গ্রন্থ হিসাবে আচরিত ছিল। ইরানীয়াস (Iranacus, 130-200) (A.D) বিশুদ্ধ একত্ববাদের সপক্ষে প্রচুর লেখালেখি করিয়াছিলেন এবং সন্তু পলের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এই কারণে যে, পল প্লেটোর দর্শন এবং রোমক পৌত্তলিকতা খৃস্টধর্মে প্রক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়াছেন। ইরানীয়াস বার্ণাবাসের গসপেল করায় ১ম ও ২য় খৃস্টীয় শতকে এই গ্রন্থের যে বহুল প্রচলন ছিল তাহা অনুধাবন করা যায়।

নিকাইয় কাউন্সিল (Nicen council)-এর অধিবেশন বসে ৩২৫ খৃ. তখনই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, মূল হিব্রু (ইবরানী) গসপেলগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে এবং কেহ তাহা সংরক্ষণ করিলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইবে। সম্রাট জেনোর রাজত্বকালের চতুর্থ বৎসর (৪৭৮ খৃ.) বার্ণাবাসের অক্ষত লাশ পুনঃসমাধিস্থ করা হয় এবং তাহারই স্বহস্ত লিখিত এক কপি গসপেল তাহার বুকের উপর রক্ষিত অবস্থায় পাওয়া যায় (Acia Sanctorum, Boland Junni, Tom II pages, 422 and 450, Antwerp 1698). প্রসিদ্ধ একত্ববাদী বাইবেল (Uniterian Bible) ভালগেট গসপেলের উৎস যে এই গসপেলই তাহা স্পষ্ট।

পোপ সিক্সটাস (Pope Sixtus-1585-90)-এর বন্ধু ছিলেন ফ্রামারনো। তিনি পোপের ব্যক্তিগত গ্রন্থশালায় এক খণ্ড ইভানজেলিয়ান বার্ণারি-র সন্ধান পান। ফ্রামারিনো ইরানীয়াসের রচনায় বার্ণাবাসের প্রচুর উদ্ধৃতি পাঠ করিয়া এই বিষয়ে আগ্রহী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমস্টারডামের একজন বিদগ্ধ ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি এই গ্রন্থের মহা ভক্ত ছিলেন, তাহার মৃতুর পর এই ইতালীয় পাণ্ডুলিপিখানি ১৭০৯ সালে প্রোশিয়া রাজের উপদেষ্টা জে.ই ক্রেমারের হাতে পৌঁছায়। ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে সেভয়ের প্রিন্স ইউজিন, যিনি ছিলেন বিখ্যাত তাত্ত্বিক, ক্রেমার পাণ্ডুলিপিটি তাহাকে উপহার দেন। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রিন্সের সংগ্রহশালাটি ভিয়েনার হফবিব লিয়েথেক-এ স্থানান্তরিত হয়। সেইখানেই পাণ্ডুলিপিটি এখনও বিদ্যমান আছে।

Miscellaneous work (মৃতুর পরে ১৭৪৭ সালে প্রকাশিত)-এর ১ম ভল্যুমের ৩৮০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'গসপেল অব বার্ণাবাস এখনও অবলুপ্ত। পঞ্চদশ অধ্যায়ে তিনি উল্লেখ করেন যে, ৪৯৬ খৃ. গ্লাসিয়ান (Glesion Decvce of 496) ডিক্রিতে নিষিদ্ধ পুস্তকমালার তালিকায় ইভানজেলিয়ান বার্ণাবাসের নাম আছে। ইহার আগে পোপ ইনোসেন্ট ৪৬৫ খৃ. বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, পাশ্চাত্য গির্জাসমূহের ৩৮২ খৃষ্টাব্দের ডিক্রিবলে। তাহারও আগে ইহার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হইয়াছিল।

স্টিফোমেট্রি অব নিসেফেরাস, ক্রমিক নং ৩, এপিসল অব বার্ণাবাস .... পংক্তি ১৩০০ তে বার্ণাবাসের উল্লেখ আছে। তাহা ছাড়া আরও উল্লেখ আছে, ক্রমিক নং ১৭ : ট্রাভেলস এণ্ড টিচিংস অব এপেন্সিলস্ ১৮ : এপিসল অব বার্ণাবাস ২৪ : গসপেল একর্ডিং টু বার্ণাবাস কিছু বিচ্ছিন্ন পাতার অগ্নিদগ্ধ 'গসপেল অব বার্ণাবাস'-এর গ্রীক সংস্করণেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

মিঃ ও মিসেস র‍্যাগ ল্যাটিন টেক্সট-এরই অনুবাদ করিয়াছিলেন এবং অক্সফোর্ডের ক্লোরেন ডেন প্রেসে উহা মুদ্রিত। ইহা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। অত্যন্ত রহস্যজনকভাবে বাজার হইতে ইহার সকল কপি উধাও হইয়া যায়। এই ইংরেজী সংস্করণের মাত্র দুই কপি এখন আছে; একটি বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং অপরটি ওয়াশিংটন ডিসির লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে। দ্বিতীয় দফায় যে সংস্করণ হয় সেইটা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের মাইক্রো ফিল্মের কপি হইতে গৃহীত (বেগম আয়েশা বাওয়ানী ওয়াকফ করাচী থেকে প্রকাশিত— গসপেল অব বার্ণাবাস-এর অবশিষ্টাংশের দ্রষ্টব্য; আরো দ্র. শায়খ আবু যাহরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২; ইউসুফ মুতাওয়াল্লী শালাবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৬৩)।

বার্ণাবাসের বাইবেলের বিষয়বস্তু ও তাহার তাৎপর্য ঃ বার্ণাবাসের সুসমাচারে অন্যান্য সুসমাচারের মতই হযরত ঈসা (আ)-এর জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলী ও বাণী সংকলিত হইয়াছে। তবে বিষয়বস্তুগত দিক দিয়া বার্ণাবাসের গ্রন্থটি কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

(১) ঈসা (আ) যে ইলাহ ছিলেন না, তাহা বার্ণাবাসের সুসমাচারে বারবার ব্যক্ত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থের মতে ঈসা আল্লাহ্র পুত্র নহেন, বরং তিনি ছিলেন আল্লাহর বান্দাও রাসূল।

(২) এই গ্রন্থের মতে ইবরাহীমের সন্তানগণের মাঝে যাহাকে কুরবানী দেওয়া হইয়াছিল তিনি ইসহাক নহেন, বরং তিনি হইলেন ইসমাঈল (আ)।

(৩) এই গ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের সুসংবাদটি বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে।

(৪) এই সুসমাচারে মসীহকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া হত্যা করিবার ঘটনাকে অস্বীকার করা হইয়াছে। বরং যাহারা দাবি করেন যে, ঈসা (আ)-কে ক্রুশে বিদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহাদেরকে মূর্খ বলা হইয়াছে।

(৫) এই সুসমাচারে ত্রিত্ববাদকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে।

(৬) সুসমাচারে তাকওয়া, তওবা, তথা অনুতাপ ও গোনাহ্র জন্য ক্রন্দন পদ্ধতি, নামায, রোযা, আল্লাহ্র স্মরণের প্রকৃতি, ঈসা (আ) ও বার্ণাবাসের মধ্যে সরাসরি কথোপকথন, পাপ মোচন তত্ত্বকে কর্মনির্ভরকরণ ইত্যাদি বিষয় আসিয়াছে, যাহা অন্যান্য গ্রন্থে এইভাবে আসে নাই।

(৭) অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় বার্ণাবাসের বাইবেলে ঈসা (আ)-এর বাণী বেশী আসিয়াছে এবং সেই বাণীগুলি সংযত ও যুক্তিসংগত শৈলীতে পরিবেশিত।

(৮) আদম ও হাওয়া (আ)-এর ঘটনা, ইবরাহীম (আ)-এর ঘটনাসহ উপমাস্বরূপ অতীত কাহিনীও উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে বিভিন্ন নসীহতমূলক কথাবার্তা রহিয়াছে।

বার্ণাবাসের বাইবেল সম্পর্কে একটি সংশয়ের অপনোদন ঃ উল্লেখ, বার্ণাবাসের গসপেলে বর্ণিত বিভিন্ন আকীদা-বিশ্বাস ও দিকনির্দেশনার মত কিছু কিছু বিষয় ইসলামী আকীদা মোতাবেক হওয়ার কারণে পৌলীয় খৃস্টানগণ ধারণা করে যে, এই গ্রন্থটি মুসলমানদের দ্বারা রচিত। তাহারা এই গ্রন্থটি সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করিয়া ইহার গুরুত্বকে খাটো করিবার চেষ্টা অব্যাহত রাখিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনায় তাহাদের এই সংশয় অমূলক বলিয়া স্পষ্ট হইয়া যায়।

(১) বার্ণাবাসের বাইবেলটি তাওহীদপন্থী আকীদা-বিশ্বাস ও ধ্যানধারণায় না হইলে খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে তাওহীদপন্থী ইরানিয়াস যুক্তি প্রদর্শনে কেন বার্ণাবাসের বাইবেল ব্যবহার করিতেন ? মুহাম্মাদ (আ)-এর নেতৃত্বে দাওয়াত শুরু হয় সপ্তম শতাব্দীতে। আর তাওহীদের সমর্থনে যুক্তি প্রয়োগে ইরানিয়াস উক্ত গ্রন্থটি ব্যবহার করেন দ্বিতীয় শতাব্দীতে। অতএব ইহা মুসলমানদের রচিত বলিয়া ধারণা অমূলক।

(২) বার্ণাবাসের বাইবেল ত্রিত্ববাদের বিরুদ্ধে এবং তাওহীদের পক্ষে না হইলে, চতুর্থ শতাব্দীতে পৌলিয় খৃস্টানগণ উহা নিষিদ্ধ করিল কেন?

(৩) বর্তমান বার্ণাবাসের গ্রন্থটি মুসলিম সমাজ বা মুসলমানদের নিয়ন্ত্রিত কোন লাইব্রেরী হইতে উদ্ধার করা হয় নাই, বরং জগৎশ্রেষ্ঠ খৃস্টান পৌলদের লাইব্রেরী হইতে খৃস্টান নেতৃবৃন্দই ইহা উদ্ধার

করেন এবং ইহার ইংরাজী অনুবাদকও ছিলেন একজন খৃস্টান। তাহার নাম সাইল। মোটকথা, উদ্ধার সম্পর্কিত ঘটনাবলী খৃস্টীয় পরিমণ্ডলে তাহাদের কর্তৃত্বাধীনে সংঘটিত হইয়াছে বরং খৃস্টানদের হেফাজতেই তাহা সংরক্ষিত হইয়াছে। তাহার পরও কোন মুসলমানকে উহার সহিত জড়াইয়া দেওয়া অবান্তর।

(৪) ইসলামী ভাবধারার সাথে উক্ত গ্রন্থটির সব কথার মিল নাই। যেমন, ঈসা (আ)-কে আকাশে উত্থিত করিবার পর তাঁহার মাতা ও শিষ্যদের সঙ্গে পুনঃসাক্ষাতের ঘটনাটি কুরআন-হাদীছে বর্ণিত নাই।

বার্ণাবাসের সুসমাচারে ৩১ নং অধ্যায়ে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "সিজারের যাহা প্রাপ্য সিজারকে দাও আর আল্লাহর যাহা প্রাপ্য আল্লাহকে দাও" (মথি ঃ ২২ ঃ ২১)। আর ইহা ঈসা (আ)-এর বাণী (পৃ. ৩৬)। কিন্তু এই ধারণাটি ইসলামী ভাবধারা বিরুদ্ধ। কেননা ধর্ম ও রাজনীতির এই ধরনের ব্যবচ্ছেদ ইসলাম সমর্থন করে না (অধ্যায়, ২৪, পৃ. ২৫)। তেমনিভাবে আসমানের সংখ্যা ৯ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (অধ্যায় ১০৫, পৃ. ১২৬), কিন্তু কুরআন-হাদীছের বর্ণনা অনুযায়ী আসমানের সংখ্যা ৭টি। এইভাবে প্রচুর অমিল রহিয়াছে।

(৫) আল কুরআন সত্য, তাই বার্ণাবাসে কোন সত্য আসিলে তাহা মিলিয়া যাইতেই পারে। যেমনিভাবে বর্তমান প্রচলিত সুসমাচারসমূহে আসা কিছু কিছু তথ্যের সাথে কুরআনের বর্ণিত তথ্যের কিছু কিছু মিল রহিয়াছে। যেমন, ইনজীল তথা ঈসা (আ)-এর মিশনকে মূসা (আ)-এর মিশনের পরিপূরক ও সত্যায়নকারী হিসাবে ঘোষণা, তাহার প্রদত্ত বক্তৃতার কিছু কিছু বাণী ইত্যাদি। তাই বলিয়া এই সুসমাচারগুলিও মুসলমানগণ লিখিয়াছেন, তাহা কোন খৃস্টান দাবি করিতে পারেন না।

(৬) বাইবেলের পুরাতন নিয়মে ঈসা (আ)-এর আগমনের অনেক সুসংবাদ আসিয়াছে, যাহা পূর্বেই আমরা দেখিয়াছি। এমনকি মথির সুসমাচারে ও ইয়াসাআ নবী কর্তৃক সুসংবাদেও ঈসা (আ) মসীহ্‌র নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, এমনিভাবে তাঁহার জন্মস্থান পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ঈসা (আ)-এর পরে আগত মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদানে ঈসা (আ) নবী মুহাম্মাদ (স)-এর নাম নেওয়া অবাস্তব কিছু নহে। এই ধরনের নাম উল্লেখ করিলেই তাহা মুসলমানদের দ্বারা লিখিত হইবে এই ধারণা যথাযথ নহে।

(৭) গসপেলটি অনেক দিন গোপনীয় অবস্থায় ছিল। তাই প্রামাণ্য সূত্রগত দিক দিয়া ইহা বিচ্ছিন্ন। তবে এই দিক দিয়া অন্যান্য সুসমাচারের চাইতে ইহার মর্যাদা কম নহে। কারণ সেগুলির এই একই অবস্থা বরং সেইগুলি কোন প্রত্যক্ষদর্শী কর্তৃক রচিত নহে। কিন্তু বার্ণাবাসে আসা ঈসা (আ)-এর বাণীগুলি প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা। গ্রন্থটি এই দিক দিয়া অনন্য।

এই সকল কারণে অন্যান্য সুসমাচারের তুলনায় বার্ণাবাসের সুসমাচারের প্রতি মুসলমানদের আগ্রহ ও কৌতুহল অধিক। তাই বলিয়া তাহা মুসলমানদের রচনা বলা অযৌক্তিক ও বাস্তবতার পরিপন্থী। খৃস্ট সমাজের তাওহীদী ধারার অস্তিত্ব সম্পর্কে খৃস্টান গবেষকগণও দ্বিমত পোষণ করেন নাই। অতএব নির্দ্বিধায় বলা যায়, গ্রন্থটি হয় বার্ণাবাসের স্বহস্তে লিখিত বা নূন্যপক্ষে তাহার চিন্তাধারা ও বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া তাহার কোন অনুসারী কর্তৃক রচিত।

বর্তমান চার সুসমাচার ব্যতীত আরও কয়েকটি সুসমাচারের পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। যেমন ঃ তমাসের সুসমাচার। সুতরাং নিরপেক্ষ গবেষকদের কাছে বর্তমান সকল সুসমাচারের মধ্যে বার্ণাবাসের সুসমাচারটি অধিক গ্রহণযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য বলিয়া সমাদৃত হইয়া আসিতেছে; বরং আধুনিক চিন্তাধারার খৃস্ট সমাজ বার্ণাবাসের বাইবেলের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখাইতে শুরু করিয়াছেন। গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। সম্প্রতি ইটালীয় মূল কপি হইতে ডাঃ মিনকুহুস ইহার ইংরাজী অনুবাদ করেন; অতঃপর মিসরের জনৈক খৃস্টান পণ্ডিত ডঃ খলীল সাদাত ইংরাজী অনুবাদ হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। অতঃপর মিসরের যুগ প্রসিদ্ধ আলিম আল্লামা রশীদ রিদা ১৯০৮ খৃ. নিজের ভূমিকাসহ ইহা প্রকাশ করেন, উদূর্তে ভাষান্তর করেন মৌলবী মুহাম্মদ হালিম আনসারী রাদীলা। ইংরাজী হইতে বঙ্গানুবাদ করেন আফজাল চৌধুরী ১৯৯৬ সালে ইহা কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতী কার্যক্রমের সূচনা

হযরত ঈসা (আ) ওহীর মাধ্যমে যখন ইনজীল লাভ করিলেন, তখন তাহা বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রচার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু কখন, কিভাবে, কোথা হইতে তাঁহার দাওয়াতী কার্যক্রম সূর্চনা করিয়াছিলেন, তাহা সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় নাই। প্রচলিত সুসমাচারসমূহে এই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়।

মথি সুসমাচারের বর্ণনায় জানা যায় যে, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) যত দিন সর্বসাধারণের মধ্যে দাওয়াতী কার্যক্রম চালাইয়া যাইতেছিলেন ততদিন হযরত ঈসা (আ) নীরব থাকেন। কিন্তু ইতোমধ্যে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ) গ্রেফতার হইয়া জেলখানায় বন্দী হইয়া যান। হযরত ঈসা (আ) তাহা জানিতে পারিয়া গালীলে চলিয়া যান এবং স্বীয় নাসরত গ্রাম ছাড়িয়া সবূলুন ও নপ্তালি এলাকার মধ্যে মগের পাড়ের কফরনাহুর শহরে তাঁহার প্রচার কার্যক্রমের সূচনা করিয়া ঘোষণা করিলেন ঃ "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি, ৪ ঃ ১৭)।

অর্থাৎ "তওবা কর, কেননা আসমানী বাদশাহী সন্নিকটে আসিয়াছে"। অতঃপর ঈসা (আ) গালীল শহরের তীরবর্তী এলাকায় দাওয়াতী কাজ করিতে লাগিলেন এবং সাগরে মাছ ধরা অবস্থায় সিবাদিয়ের দুই পুত্র ইয়া'কুব ও ইউহান্নাকে তাহার দাওয়াতের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সক্ষম হন। অবশ্যই তাহারা দুইজন ঈসা (আ)-এর সাথী হইয়া যান। অতঃপর ঈসা (আ) তাহার সাথীদ্বয়কে লইয়া গালীল প্রদেশের সমস্ত জায়গায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া ইয়াহূদীদের ভিন্ন ভিন্ন মজলিসখানায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ইহা ছাড়া তিনি বেহেশতী রাজ্যের সুখবর প্রচার করিতে এবং লোকদের সমস্ত রকম রোগ ভাল করিতে লাগিলেন। সমস্ত সিরিয়া প্রদেশে তাঁহার কথা ছড়াইয়া পড়িল। যে সমস্ত লোক নানা রকম রোগে ও ভীষণ যন্ত্রণায় কষ্ট পাইতেছিল, যাহাদের ভূতে ধরিয়াছিল এবং যাহারা মৃগী ও পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছিল, লোকেরা তাহাদিগকে ঈসা (আ)-এর নিকট আনিল। তিনি তাহাদের সকলকে সুস্থ করিলেন। গালীল, দিকাপালি, জেরুসালেম এহুদিয়া এবং জর্দানের অন্য পার হইতে অনেক লোক ঈসার পিছনে চলিল (মথি, ৪ ঃ ২১-২৫; আরও দ্র. মার্ক, ১ ঃ ১৪)।

লূক সুসমাচারের বর্ণনা অনুযায়ি প্রায় ৩০ বৎসর বয়সে ঈসা (আ) তাঁহার কার্য আরম্ভ করেন (লূক ৩ ঃ ২৩)। যোহন সুসমাচারে আরও বলা হইয়াছে, দিবসে ঈসা (আ) প্রকাশ্য কার্যের আরম্ভ

করিলেন। আর তাহা ছিল কান্না নগরে এক বিবাহ অনুষ্ঠানে, যেখানে তিনি পানিকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেন। সেই অনুষ্ঠানে তাঁহার মা জননী মারয়ামের সঙ্গেও সাক্ষাত হয়। এইভাবে কিছু দিন পর ইয়াহূদীদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সন্নিকটে হইলে ঈসা জেরুসালেমে চলিয়া যান। অতঃপর তিনি ইবাদতখানায় দেখিতে পাইলেন যে, লোকেরা ইবাদতখানার মধ্যে গরু, ভেড়া আর কবুতর বিক্রী করিতেছে এবং টাকা বদল করিয়া দিবার লোকেরাও বসিয়া আছে। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি দড়ি দিয়া একটা চাবুক তৈরী করিলেন আর তাহা দিয়া সমস্ত গরু, ভেড়া এবং লোকদেরও সেই জায়গা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। টাকা বদল করিয়া দিবার লোকদের টাকা-পয়সা ছড়াইয়া দিয়া তিনি তাহাদের টেবিলগুলি উল্টাইয়া ফেলিলেন (যোহন ২ ঃ ১-১৫)। উপরিউক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, ঈসা (আ) তাঁহার প্রকাশ্যে দাওয়াতী কাজের সূচনা করিয়াছিলেন গালীল প্রদেশে। মথির বর্ণনামতে, তাহা শুরু করেন তিনি কফরনাহূম শহরে এবং পরবর্তীতে গালীল সাগরের পাড়ে।

যোহন সুসমাচারের মতে বেথানিয়া গ্রামে তাঁহার সঙ্গী-সাথী গ্রহণ কাজের সূচনা করেন এবং কান্না গ্রামের বিবাহভোজ অনুষ্ঠান হইতেই প্রকাশ্য প্রচারকার্য শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি জেরুসালেমে বায়তুল মুকাদ্দাসে গমন করেন। বার্ণাবাসের বাইবেলে আছে যে, ফেরেশতা জিবরাঈল কর্তৃক ইনজীল কিতাব লাভের পর ঈসা (আ) তাঁহার মাতাকে সবকিছু অবগত করিয়া তাঁহার খেদমত হইতে অব্যাহতি চাহিলেন। মারয়াম এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "পুত্র! তোমার জন্মের আগেই আমাকে এই সকল বলা হইয়াছে। নুবুওয়াতের কাজে যোগদানের উদ্দেশ্যে জন্মদাত্রীর খেদমত হইতে পূর্ব দিন হইতে তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। আর জেরুসালেমে প্রবেশ করিলেন। জেরুসালেমের প্রবেশপথে একজন কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত ব্যক্তির সাক্ষাত পাইলেন। সে ঈসার নিকট আবেদন করিল যেন তিনি তাহার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেন। অবশেষে ঈসা (আ)-এর দু'আর বরকতে যখন ঐ লোকটি রোগমুক্তি লাভ করিল তখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া চিৎকার করিতে শুরু করিল যে, তোমরা আসিয়া দেখ, ইনি আল্লাহ্‌র নবী। আর তখন তাঁহাকে ঘিরিয়া লোকজন একত্র হইতে শুরু করে। এই কথা জেরুসালেম শহরে প্রচারিত হওয়ার পর এমনভাবে লোকের সমাগম হয় যে, মসজিদ প্রাঙ্গণে তিল ধারণের ঠাঁই পর্যন্ত রহিল না। কর্তব্যরত খাদেমগণ হযরত ঈসার নিকট আরয করিলেন, জনাব! সমবেত জনতা আপনাকে দেখিতে চায়। আপনার কথা শুনিতে চায়। ঐ মিনারায় আরোহণ করিয়া তাহাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলুন। ঈসা (আ) তখন সেই মিনারায় দাঁড়াইয়া জনতার উদ্দেশ্যে ওয়াজ করিলেন। সেই ওয়াজে আল্লাহ্‌র অনন্ত মহিমা বর্ণনা, প্রথম মানব আদম (আ)-কে শয়তানের প্ররোচনা, তৎপরবর্তীতে হাবিল-কাবিলের ঘটনা, মহাপ্লাবন ও লোহিত সাগরে ফেরাউনকে ডুবাইয়া ধ্বংস করা ইত্যাদি বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং ইবরাহীম (আ) ও তাঁহার সন্তানদের প্রতি সনাতন ওয়াদা ও মূসা (আ)-এর মাধ্যমে পবিত্র শরীআত জারী করার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। সাথে সাথে আল্লাহ্‌র বাণী ভুলিয়া যাওয়া এবং মিথ্যা অহমিকায় মত্ত হওয়ার ব্যাপারে জনতাকে সতর্ক করেন এবং ইয়াহূদী রিববীদেরও সমালোচনা করেন। অবশেষে জনতা পাপ মোচনের জন্য দু'আ করিতে ঈসার নিকট আবেদন জানাইল। কিন্তু রিববী ও ধর্মীয় নেতারা নিজেদের প্রতি নিন্দা, তিরস্কার ও ধিককারের কারণে ঈসা (আ)-এর প্রতি মনে মনে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিল। এমনকি উপস্থিত রিববী, কাতিব ও ধর্মবেত্তারা ঈসার মৃত্যুদণ্ড দাবি করে।

ঈসা (আ)-এর দাওয়াতী এলাকা

মথি

১. কফরনাহুম (৪ ঃ ১৩)
২. গালীল প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে (৪ ঃ ২৩)
৩. কফরনাহুম (৮ ঃ ৫)
৪. গাদারীয় (৮ ঃ ২৮)
৫. নাসেরত (৯ ঃ ১)
৬. গিনেষরৎ (১৪ ঃ ৩৪)
৭. সের ও সীদোন (১৫ ঃ ২১)
৮. গালীল সাগর থেকে হ্যারাল পর্বত (১৪ ঃ ২৯)
৯. মগদন এলাকা (১৫ ঃ ৩৯)
১০. কৈসরিয়া মিসিপি (১৬ ঃ ১৩)
১১. গালীল প্রদেশ (১৭ ঃ ২২)
১২. কফরনাহুম (১৭ ঃ ২৪)
১৩. এহুদিয়া প্রদেশ (১৯ ঃ ১)
১৪. যিরীহো (২০ ঃ ২৯)
১৫. জেরুসালেম (রাত্রে বৈথানিয়া গ্রামে ২১ ঃ ১৭ ও দিনে বায়তুল মুকাদ্দাসে শিক্ষাদান ২১ ঃ ২৩)

মার্ক

১. কফরনাহুম (১ ঃ ২১)
২. গালীল প্রদেশের সকল জায়গা (১ ঃ ৩৯)
৩. কফরনাহূম (২ ঃ ১)
৪. গালীল সাগর পার (২ ঃ১৩)
৫. গেরাসেনীয় এলাকা (৫ ঃ ২)
৬. দেকাপলি (৫ ঃ ২০)
৭. গালীল সাগর পার (৫ ঃ ২১)
৮. নাসরত (৬ ঃ ১)
৯. বৈৎসৈদা (৬ ঃ ৪৫)
১০. গিনেষরৎ (৬ ঃ ৫৩)
১১. সোর (৭ ঃ ২৪)
১২. সীদোন (৭ ঃ ৩১)
১৩. দলমনুথা (৮ ঃ ১০)
১৪. গালীল সাগরের অন্যপার (৮ ঃ ১৩)
১৫. বৈৎসৈদা (৮ ঃ ১২)
১৬. কৈসরিয়া-ফিলিপী (৮ ঃ ২৭)
১৭. গালীল প্রদেশীয় অঞ্চল (৯ ঃ ৩০)
১৮. কফরনাহুম (৯ ঃ ৩৩)
১৯. এহুদীয়া প্রদেশ (১০ ঃ ১)
২০. যিরীহো (১০ ঃ ৪৬)
২১. জেরুসালেম জৈতুন পাহাড়ে বৈৎফগী ও বৈথানিয়ায় রাত্রি যাপন ও দিনে বায়তুল মুকাদ্দাসে (১১ ঃ ২, ১৫)

লূক

১. জর্দান নদীর পার (৪ ঃ ১)
২. জেরুসালেম (৪ ঃ ৯)
৩. গালীল প্রদেশ (৪ ঃ ১৪)
৪. নাসরত (৪ ঃ ১৬)
৫. কফরনাহূম (৪ ঃ ৩১)
৬. এহুদীয়া প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মজলিস (৪ ঃ ৪৪)
৭. গিনেষরৎ (৫ ঃ ১)
৮. কফরনাহূম (৫ ঃ ১২-৭)
৯. নায়িন (৭ ঃ ১১)
১০. গেরাসেনী (৮ ঃ ২৭)
১১. বৈৎসৈদা (৯ ঃ ১১)
১২. যিরীহ শহর (১৮ ঃ ৩৫)
১৩. জেরুসালেম (রাত্রে বেথানিয়া গ্রামে যয়তুন পাহাড়ে এবং দিনে বায়তুল মুকাদ্দাসে) (১৯ ঃ ২৯, ৪৫)

বার্নাবাস

১. জেরুসালেমের যয়তুন পাহাড়ে (পৃ. ৮)
২. জেরুসালেমের প্রবেশ পথে (পৃ. ৮)
৩. বায়তুল মুকাদ্দাসে গণজমায়েতে ভাষণ (পৃ. ৯)
৪. যয়তুন পাহাড়ে মুনাজাতে (পৃ. ১১)
৫. জর্দান দেশের সীমান্তে (পৃ. ২২)
৬. জেরুসালেম অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন (পৃ. ১২)
৭. গালীলের বান্না গ্রামে (পৃ. ১৩)
৮. চল্লিশ দিন নিকটবর্তী পাহাড়ে (পৃ. ১৯)
৯. নাসরত (পৃ. ২০)
১০. কাফুর নাহুম (পৃ. ২১)
১১. টায়ার ও সীদোন (পৃ. ২২)
১২. জেরুযালেম (পৃ. ৩৪)
১৩. জর্দানের মরু অঞ্চল (পৃ. ৪১)
১৪. তূর পর্বত (পৃ. ৫১)
১৫. জেরুসালেম (পৃ. ৫৫)
১৬. নায়িন (পৃ. ৫৮)
১৭. কফার নাহূমে নায়তোর (পৃ. ৫৯)
১৮. সামেরীয় নগরে (পৃ. ৭৬)
১৯. জেরুসালেম (পৃ. ৭৮)
২০. কৈসরিয়া, ফিলিপ (পৃ. ৮৪)
২১. নাসরত (পৃ. ৮৫)
২২. সুমেরীয় পাহাড়ী অঞ্চল (পৃ. ৯৮)
২৩. সিনাই পর্বত জর্দান নদীর তীর (পৃ. ১১০)
২৪. জেরুসালেম
২৫. গালীল সাগর উপকূলীয় অঞ্চল (পৃ. ১৫৯)
২৬. নায়িন শহর (পৃ. ১৬১)
২৭. দামেশক (পৃ. ১৭১)
২৮. গালীলের নাসরতে (পৃ. ১৭৫)
২৯. এহুদিয়া প্রদেশে (পৃ. ১৮১)
৩০. জেরুসালেমে (পৃ. ১৮৭)
৩১. জর্দানের মরু অঞ্চল গমন (পৃ. ২০৩)
৩২. বৈথনিয়া (বিথ্যান) (পৃ. ৩২১)
৩৩. জেরুসালেম (পৃ. ২৩৯)
৩৪. সীদোনের মিযেগেমাসের বাগানে আত্মগোপন ও উর্ধ্বগমন (পৃ. ২৪৮)

হযরত ঈসার (আ) আমলে ফিলিস্তিন
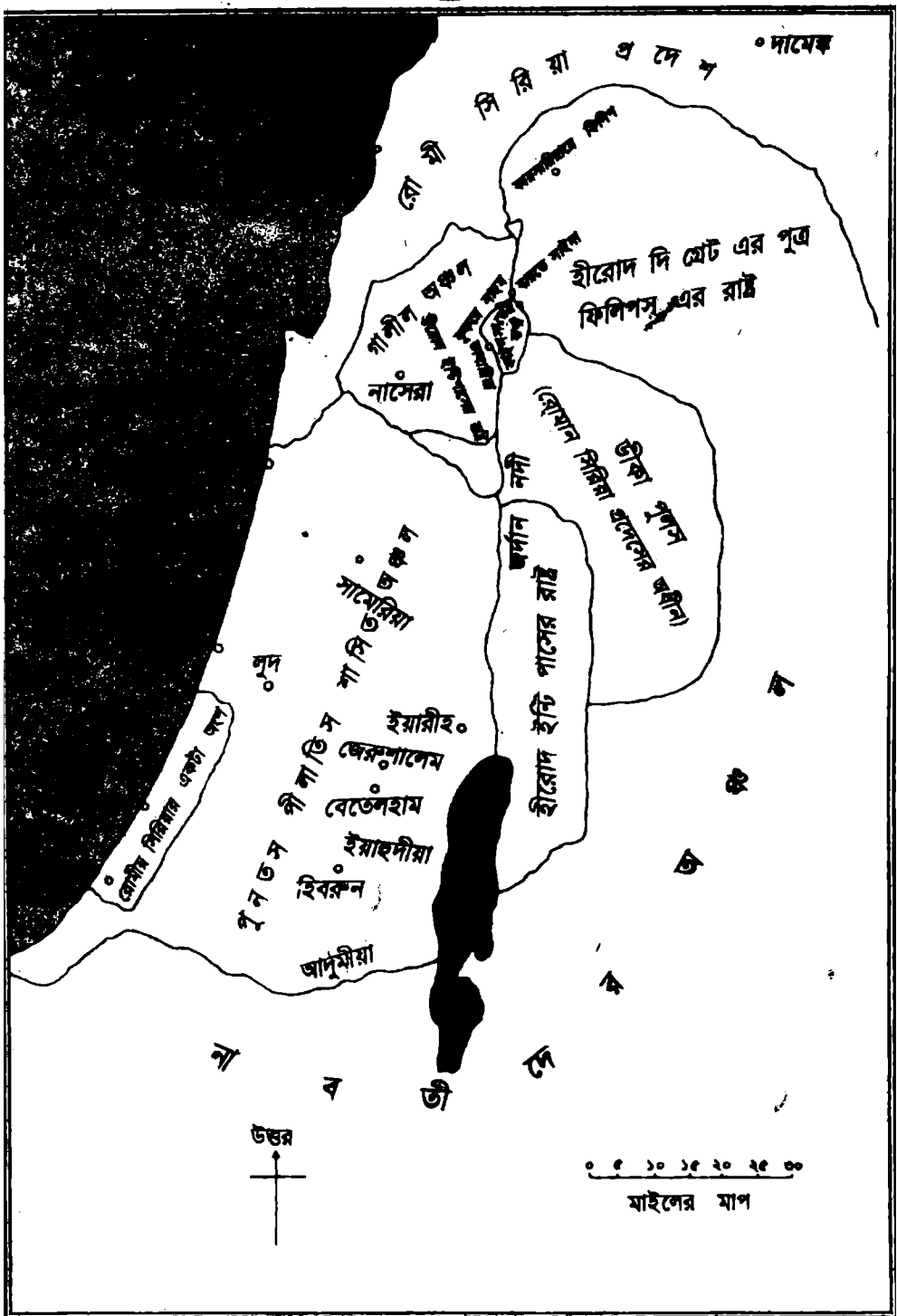
উক্ত তালিকা হইতে বুঝা যায়, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার স্বল্প সময়ের দাওয়াতী কার্যক্রম ইয়াহূদী অধ্যুষিত বিভিন্ন এলাকা পরিভ্রমণ করিয়াছেন। তৎকালীন সময়ে তাহাদের তিনটি প্রদেশ ছিল যাহা হেরোদের তিন পুত্রের মধ্যে বিভক্ত ছিল। আরকে লাউসের ইয়াহূদীরা এনটি পাসের গালীল, দিকাপলি এবং ফিলিপের কৈসরিয়া ফিলিপের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ইয়াহূদী আলেমসহ সাধারণ মানুষকে দাওয়াত দিয়াছেন। সাথে সাথে সমাজকল্যাণে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে অলৌকিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে গোটা ইয়াহূদী অঞ্চলে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিলেন। যেখানেই যাইতেন হাজার হাজার মানুষ তাঁহার পেছনে ছুটিয়া যাইত। মথি ও মার্ক সুসমাচার হইতে জানা যায় যে, তিনি প্রথমে গালীল প্রদেশে প্রচার কাজ চালাইয়া যান, অতঃপর ফিলিপের কৈসরীয়ার কিছু অংশ তথা গালীল সাগরের অপর তীরের অঞ্চলসমূহে দাওয়াতী কাজ করেন, অতঃপর ইয়াহূদীয়া প্রদেশে আগমন করেন এবং যিরীহো ও জেরুসালেমে দাওয়াতী কাজ সমাপ্ত করেন। জেরুসালেম আসার পর আর ফিরিয়া যান নাই। এখানেই ইয়াহূদী ধর্মীয় নেতারা তাঁহার বিরুদ্ধে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং তিনি বিভিন্ন পাহাড়-পর্বতে আত্মগোপন করিয়া আর মাঝে মধ্যে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসিয়া দাওয়াতী কাজ করেন। লূক সুসমাচারে বর্ণিত তথ্যে দেখা যায়, নবুওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি জর্ডান নদীর তীর হইতে জেরুসালেম পর্যন্ত সফর করিয়াছিলেন, অতঃপর গালীল প্রদেশে চলিয়া গিয়াছিলেন। জেরুসালেমে শয়তানের বিভিন্ন প্ররোচণা প্রত্যাখ্যান করার ঘটনার কথা উল্লেখ করা হইলেও দাওয়াতী কাজের ব্যাপারে তেমন পদক্ষেপের কথা উল্লেখ নাই। তাই সেই সুসমাচারেও দাওয়াতী কার্যক্রমের তৎপরতা গালীল প্রদেশ হইতে শুরু করার বিষয়টি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। আর শেষ সময়ে জেরুসালেম আগমনের কথা বলা হইয়াছে। অপর দিকে বার্নাবাসের বাইবেল হইতে জানা যায়, তাঁহার দাওয়াতী কাজের মূল কেন্দ্রভূমি ছিল জেরুসালেম। এখান হইতেই তিনি দাওয়াতী কাজের সূচনা করিয়াছিলেন এবং বারবার এখানে ফিরিয়া আসিতেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত যয়তুন পাহাড়ে তিনি রাত্রে ইবাদতে মশগুল থাকিতেন এবং জেরুসালেম হইতে জর্ডান সীমান্তবর্তী মরু অঞ্চল পর্যন্ত দাওয়াতী কাজ করেন। অতঃপর গালীল প্রদেশের কান্না গ্রাম, নাসরত, কাফুরনাহূম, নায়ানে দাওয়াতী কাজ করেন অতঃপর সঙ্গীগণসহ তিনি আবার জেরুসালেম ও জর্ডানের মরু অঞ্চলে আসিয়াছিলেন এমনকি তিনি সিনাই পর্বত পর্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। অতঃপর জেরুসালেমে নায়িন, কাফুর নাহূম অঞ্চলে ফিরিয়া গিয়াছিলেন এবং আবার জেরুসালেমে আসিয়া সেইখানে দাওয়াতী কাজ করিয়া কৈসরীয়া ফিলিপী গালীলের নাসরত, সুমিরীয় পাহাড়ী অঞ্চল, এমনকি সিনাই পর্বত ও জর্ডান নদীর তীরবর্তী অঞ্চলসহ মরু অঞ্চলে গমন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। বার্নাবাসের বাইবেল থেকে আরও জানা যায় যে, হযরত ঈসা (আ) সিরিয়ার দামেশ্‌ক পর্যন্ত গিয়াছিলেন এবং ইয়াহূদী বসতিগুলিতে দাওয়াতী কাজ করিয়াছিলেন। তবে যেখানেই যান বারবারই তিনি জেরুসালেমে ফিরিয়া আসিয়াছেন। বার্নাবাসের বাইবেলে হযরত ঈসার আটবার জেরুসালেমে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ রহিয়াছে। আসলে এই তথ্যটিই অধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয়। কারণ জেরুসালেম ছিল সেই পবিত্র ভূমি যেখানে রহিয়াছে প্রধান ইবাদতখানা বায়তুল মুকাদ্দাস এবং বনী ইসরাঈলে আসা

নবীগণের পদচারণকৃত অঞ্চল। তেমনি সেইখানে রহিয়াছে ইয়াহূদীদের বড় বড় ধর্মীয় নেতাদের আবাসস্থল ও সাধারণ জনগণের তীর্থ যাত্রার কেন্দ্রভূমি। তাই ঈসা (আ) জেরুসালেম আগমনকে প্রাধান্য দিয়াছেন, যদিও তিনটি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামে-গঞ্জে যাওয়াকে তিনি উপেক্ষা করেন নাই। দাওয়াতের স্বার্থে তিনি নির্দিষ্ট কোন ঠিকানা গ্রহণ করেন নাই। দাওয়াতী সফরই ছিল তাঁহার তৎপরতার মৌলিক অংশ। ইয়াহূদী আহবার ও রিব্বিদের চরম বিরোধিতা ও নিজের জীবনের ঝুঁকিকে উপেক্ষা করিয়া দাওয়াতী কাজকে বেগবান করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ছুটিয়া বেড়াইয়াছেন।

প্রচারের কাজকে আরও দ্রুত, বেগবান ও প্রসারিত করিবার জন্য নিজে যেমনি বিভিন্ন এলাকায় গমন করিয়াছেন তেমনিভাবে তাঁহার প্রধান বারজন সাথীসহ আরও অন্যান্য অনুসারীদের বিভিন্ন অঞ্চলে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। বার্নাবাসের সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে যে, লোকজন এতই আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে প্রায়ই নিজেদের রাজা হিসাবে ঘোষণা দেওয়ার চেষ্টা করিত। কিন্তু ঈসা (আ) নিজেই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতেন (বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ১৭০, ১৭৪)।

হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতী মিশন

হযরত ঈসা (আ) বানূ ইসরাঈলের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বানূ ইসরাঈল তাহাদের আসল শিক্ষ প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। মূসা (আ)-এর শরীআত পরিবর্তন পরিবর্ধনের মাধ্যমে তাহা হইতে তাহারা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছিল। ধর্মীয় পণ্ডিত হইতে শুরু করিয়া সাধারণ মানুষ সকলেই চরম গোমরাহিতে লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। কালক্রমে মূসা (আ)-এর শরীআত বিস্মৃত ও বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। তাহা ছাড়া দলাদলি এবং দীন ও শরীআতের ব্যাপারে বিভিন্ন রকম মতানৈক্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে হযরত ঈসা (আ) তাঁহার মিশন বা পয়গামে দুইটি বিষয়কে প্রাধান্য দান করেন।

(ক) তাওরাত এবং তাহার শিক্ষাকে তাসদীক বা সত্যায়িতকরণ।

(খ) মূসা (আ)-এর শরীআতকে পূর্ণাঙ্গতায় পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং ইয়াহূদীদের মধ্যে মতানৈক্যের অবসান ঘটানো (জামীল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৫২-৩৫৩)।

কুরআন কারীমেও হযরত ঈসা (আ)-এর সেই মৌলিক পয়গামের কথা স্পষ্টভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলিতেন ঃ

وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ - اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ -

"আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা রহিয়াছে উহার সমর্থকরূপে ও তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতক গুলিকে বৈধ করিতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে অনুসরণ কর। আল্লাহ আমার প্রতিপালক এবং তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তোমরা তাহার ইবাদত করিবে। তাহাই সরল পথ।" আল-কুরআনের অন্য স্থানে আরও উল্লেখ করা হয় যে,

وَلَمَّا جَاءَ عِيْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِيْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ. اِنَّ اللّٰهَ هُوَ رَبِّىْ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

"ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল সে বলিয়াছিল,আমি তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি হেকমত তথা প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর। আল্লাহই তো আমার প্রতিপালক এবং তোমাদিগেরও প্রতিপালক। অতএব তোমরা তাঁহার ইবাদত কর; ইহাই সরল পথ" (৪৩ ঃ ৬৩-৬৪)।

প্রচলিত সুসমাচারসমূহেও হযরত ঈসা (আ)-এর পয়গামের উপরিউক্ত দুইটি দিক দিয়া বিষয়টি খুব জোরালোভাবেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

মথি সুসমাচারে হযরত ঈসার বাণীরূপে নিম্নোক্ত কথাটি উল্লেখ আছে। তিনি বলিয়াছেন, "মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না। সমস্তই সফল হইবে" (মথি, ৫ ঃ ১৭-১৮)।

মথি সুসমাচারের অন্যত্র আরও বলা হইয়াছে, তিনি তাহাকে বলিয়াছিলেন ঃ "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে। এইটি মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টি ইহার তুল্য; তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুইটি আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদি গ্রন্থও ঝুলিতেছে" (মথি, ২২ ঃ ৩৭-৪০)।

মথি সুসমাচারের অন্য জায়গায় আরও বলা হয়, "অধ্যাপক ও ফরীশীরা মোশির আসনে বসে। অতএব তাহারা তোমাদিগকে যাহা কিছু বলে তাহা পালন করিও, মানিও, কিন্তু তাহাদের কর্ম্মের মত কর্ম্ম করিও না; কেননা, তাহারা বলে, কিন্তু করে না" (মথি, ২৩ ঃ ২-৩)।

ইহা ছাড়াও হযরত ঈসা (আ) ঘোষণা দিতেন যে, তাঁহার পয়গাম ইসরাঈল জাতির জন্যই সীমাবদ্ধ। আর পরবর্তী পয়গাম্বর হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আগমনের সুসংবাদ দেওয়াও তাঁহার পয়গামের লক্ষ্য ছিল।

হযরত ঈসা (আ)-এর পয়গাম ইসরাঈল জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন বানূ ইসরাঈলের শেষ নবী ও রাসূল। তাঁহার পয়গাম ইসরাঈল জাতির জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কুরআন কারীমের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) কেবল বানূ ইসরাঈলের জন্য নবীরূপে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নহে। বলা হইয়াছে ঃ

وَرَسُولاً اِلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ

"ঈসাকে বানূ ইসরাঈলের জন্য রাসূল করিয়া প্রেরণ করা হইয়াছিল"।

অনত্র বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ.

"স্মরণ কর যখন মারয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, হে বানূ ইসরাঈল! আমি তোমাদের জন্য রাসূল রূপে প্রেরিত হইয়াছি" (৬১ ঃ ৬)।

উল্লেখ্য যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার দাওয়াতী কার্যক্রম বানূ ইসরাঈলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিলেও পরবর্তীতে তাঁহার অনুসারী হিসাবে দাবিদার কিছু কিছু ব্যক্তি, যেমন পৌল, ঈসা (আ)-এর সেই দাওয়াতী কার্যক্রম ইসরাঈল বহির্ভূতদের মধ্যেও প্রসারিত করেন। ইহা ছিল খৃষ্টানদের প্রাথমিক যুগে ইয়াহূদীদের একটি ষড়যন্ত্রের অংশবিশেষ। তাই যাহারা ইসরাঈলী সমাজের বাহিরে খৃষ্ট ধর্ম প্রচারে আগ্রহী ছিল তাহাদেরকে ঐ ইয়াহূদী ষড়যন্ত্রকারীরা বিভিন্নভাবে সমর্থন ও সহযোগিতাও করিয়াছে। ঐ ধরনের ষড়যন্ত্রকারীরা হযরত ঈসার বাণীর অপব্যাখ্যা দিতেও কুণ্ঠা বোধ করে নাই, এমনকি তাঁহার বাণী বিকৃত করিয়া খৃষ্টানদিগের কাছে প্রচলিত সুসমাচারে সংযুক্ত করিতেও সক্ষম হয়। এই প্রেক্ষিতে মথি সুসমাচারে আসিয়াছে, ঈসা নাকি বলিয়াছেন, "স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমার গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর" (মথি, ২৮ ঃ ১৮-১৯)।

স্মর্তব্য, সম্ভবত সমুদয় জাতি বলিতে বানূ ইসরাঈলের সকল গোত্র বুঝানো হইয়াছে। কিন্তু খৃষ্টানগণ ইহাকে সারা বিশ্বের মানুষ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া থাকে (আরো দ্র. মার্ক, ১৬ ঃ ১৫)।

মথি সুসমাচারে সমুদয় জাতির কাছে ঈসা (আ)-এর বাণী প্রচারের কথা বলা হইলেও সেই একই সুসমচারে আসিয়াছে যে, তিনি তাঁহার ১২ জন প্রেরিতকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতেছেন, "তোমরা পর জাতিগণের পথে যাইও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ করিও না, বরং ইস্রায়েল কুলের হারান মেষগণের কাছে যাও। আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল" (মথি ১০ ঃ ৬-৭)। একই সুসমাচারে অন্যত্র বলা হয় ঃ "ইসরাঈল কুলের হারান মেষ ছাড়া আর কাহারও নিকটে আমি প্রেরিত হই নাই" (প্রাগুক্ত, ১৫ ঃ ২৪)।

অতএব একই গ্রন্থের উভয় তথ্যের মধ্যে বৈপরীত্য বিদ্যমান। কিন্তু শেষোক্ত তথ্যের সহিত আল-কুরআনের মিল রহিয়াছে (দ্র. ৩ ঃ ৪৯ ও ৬১ ঃ ৬)। তিনি ছিলেন শুধু বানূ ইসরাঈলের জন্য

প্রেরিত। এই কথাটি এমনকি বার্নাবাসের বাইবেলেও স্পষ্টভাবে আসিয়াছে। ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন, আমি বানূ ইসরাঈল ছাড়া আর কোনো সম্প্রদায়ের জন্য প্রেরিত নাই (বার্নাবাসের বাইবেল, পৃ. ২২)। অতঃএব ঈসা (আ)-এর পয়গামকে বিশ্বজনীন করার প্রচেষ্টা হযরত ঈসা (আ)-এর পরবর্তী সময়ের।

ঈসা (আ) কর্তৃক শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা)-এর আগমনের সুসংবাদ ঘোষণা

হযরত ঈসা (আ)-এর পয়গামের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক এই যে, তিনি তাঁহার অনুসারীদেরকে তাঁহার পরবর্তী পয়গাম্বরের শুভাগমন সম্পর্কে সুসংবাদ প্রদান করিতেন। আর সেই পরবর্তী পয়গাম্বর বলিতে তিনি আখেরী নবী হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা (স)-কে বুঝাইয়াছিলেন। আল-কুরআনে এই সম্পর্কে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ.

"স্মরণ কর, মারয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, হে বানূ ইসরাঈল! আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ্র রাসূল, আমার পূর্ব হইতে তোমাদের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাঁহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসিবেন আমি তাহার সুসংবাদদাতা" (৬১ ঃ ৬)।

হযরত ঈসা (আ)-এর ঐ ঘোষণায় হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নাম আহমাদ বলা হইয়াছে। আহমাদ শব্দের দুইটি অর্থ রহিয়াছে ঃ (১) সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রশংসাকারী। (২) সেই ব্যক্তি যাহার সর্বাধিক প্রশংসা করা হইয়াছে অথবা বান্দাদের মধ্যে যে লোক সর্বাধিক প্রশংসাযোগ্য।

কুরতুবী উল্লেখ করেন যে, তিনি দুনিয়াতে প্রশংসিত, কারণ তাঁহার মাধ্যমে হেদায়াত দেওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকে ইলম ও হিকমতসহ পাঠাইয়া দুনিয়াবাসীকে উপকৃত করা হইয়াছে। এমনিভাবে তিনি অখিরাতেও শাফাআতের জন্য প্রশংসিত। তিনি প্রশংসাকারী তথা আহমাদ যেইজন্য তিনি প্রশংসিত তথা মুহাম্মাদ। আহমাদ বলিয়াই তিনি মুহাম্মাদ হইলেন (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ১৮খ, পৃ. ৮৪)।

উল্লেখ্য, একাধিক সহীহ হাদীছ হইতে প্রমাণিত যে, আহমাদ হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর অপর এক নাম। মহানবী (স) বলিয়াছেন ঃ

اسمى فى التوراة احيد لانى احيد امتى عن النار واسمى فى الزبور الماحي محا الله لى عبدة الأوثان واسمى فى الانجيل احمد واسمى فى القران محمد لأنى محمود فى اهل السماء والارض.

"তাওরাতে আমার নাম আহইয়াদ (রক্ষাকারী), কারণ আমার উম্মতকে আমি জাহান্নামের আগুন হইতে রক্ষা করিব, যাবুরে আমার নাম মাহী (বিলুপ্তকারী), কারণ আল্লাহ পাক আমার দ্বারা মূর্তি

পূজা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন। "ইনজীলে আমার নাম আহমাদ এবং আল-কুরআনে আমার নাম মুহাম্মাদ। কেননা আমি আসমান ও দুনিয়াবাসীর মধ্যে প্রশংসিত"(প্রাগুক্ত)।

হযরত জুবায়র ইবন মুতইম হইতে ইমাম মালেক, বুখারী, মুসলিম, দারিমী, তিরমিযী ও নাসায়ী এই অর্থেরই একাধিক হাদীছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও রাসূলে করীম (স)-এর এই নাম সুপরিচিত ছিল। হযরত হাসসান ইবন ছাবিতের কবিতার একটি ছত্র উহার প্রমাণ ঃ

صلى الاله ومن تحت بعرشه

والطيبون على المبارك احمد

"আল্লাহ এবং তাঁহার আরশের চতুস্পার্শ্বে সমবেত অসংখ্য ফেরেশতা ও সকল পবিত্র আত্মা মহান বরকতওয়ালা আহমাদ-এর প্রতি সালাত পেশ করেন"।

রাসূলে করীম (স)-এর নাম কেবল মুহাম্মাদ ছিল না, আহমদও তাঁহার একটি নাম ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি হইতেও ইহার সত্যতা প্রমাণিত। তাঁহার পূর্বে অন্য কাহারও নাম 'আহমাদ' ছিল বলিয়া আরব সাহিত্যে কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। আর এক কথায় রাসূলের সময় হইতে আজ পর্যন্ত সমস্ত মুসলিম উম্মাতের মধ্যে তাঁহার এই নাম সুপরিচিত ও সর্বজনবিদিত।

খৃস্টানদের হাতে বর্তমানে সুসমাচারগুলিতে প্রচুর রদবদল হওয়া সত্ত্বেও সেই সকল গ্রন্থে ঈসা (আ)-এর বাণী বলিয়া যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহাতেও মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স)–এর আগমনের সুসংবাদ রহিয়াছে।

প্রথমত, ঈসা (আ) স্বর্গরাজ্য তথা আল্লাহর দেওয়া বিধানে পরিচালিত একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা আসন্ন বলিয়া তাঁহার একাধিক বাণীতে উল্লেখ করিয়াছেন (মথি, ৬ ঃ ১০)। লূক সুসমাচারে আরও আসিয়াছে, ঈসা (আ) তাঁহার ১২ জন অনুসারীকে ডাকিয়া সেই স্বর্গ- রাজ্যের সুসংবাদ দানের কথা বলিয়াছিলেন (লুক; ১–৪)। আর একথা সর্বজনবিদিত যে, সেই ধরনের আসমানী কর্তৃত্ব ঈসা (আ)-এর শরীআতের মাধ্যমে তাঁহার সূত্রে কিংবা তাঁহার অনুসারীদের যুগেও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শরীআতের মাধ্যমেই উহা যমীনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (রহমতুল্লাহ হিন্দী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১১৭৪-১১৭৫)।

দ্বিতীয়ত, মথি সুসমাচারে অন্য স্থানে আসিয়াছে, হযরত ঈসা (আ) মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার উম্মত সম্পর্কে একটি উদাহরণের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ ঃ

"কিন্তু যাহারা প্রথম এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে এবং যাহারা শেষের এমন অনেক লোক প্রথম হইবে। কেননা স্বর্গরাজ্য এমন একজন গৃহকর্তার তুল্য যিনি প্রভাতকালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। তিনি মজুরদের সহিত দিন এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরণ করিলেন। পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া

দেখিলেন অন্য কয়েকজন বাজারে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য তোমাদিগকে দেব; তাহাতে তাহারা গেল। আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার সময়েও বাহিরে গিয়া আর কয়েকজনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কিজন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্মে দাঁড়াইয়া আছ ? তাহারা তাহাকে বলিল, কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই। তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও। পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দাও। শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্যন্ত দাও। তাহাতে তাহাদের এগার ঘটিকা পর্যন্ত লাগিয়াছিল। তাহারা আসিয়া এক একজন এক এক সিকি পাইল। পরে যাহারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তাহারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তাহারাও এক এক সিকি পাইল। তাহারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া কহিতে লাগিল, শেষের ইহারা ত এক ঘন্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পুড়িয়াছি। আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন। তিনি উত্তর করিয়া তাহাদের একজনকে কহিলেন, বন্ধু হে! আমি তোমার প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই? তোমার যাহা পাওনা তাহা লইয়া চলিয়া যাও। আমার ইচ্ছা তোমাকে যাহা ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। আমার নিজের যাহা তাহা আপনার ইচ্ছা মতে ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমার নাই ? না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চোখ টাটাইতেছে ? এইরূপে যাহারা শেষের তাহারা প্রথম হইবে এবং যাহারা প্রথম তাহারা শেষে পড়িবে" (মথি ১৯ ঃ ৩০; ২০ ঃ ১০১৬)।

এই সুসংবাদে হযরত ঈসা (আ) দৃষ্টান্তের আকারে দুনিয়ার জাতিসমূহের কর্মময় জীবন এবং আল্লাহ্র পথ হইতে তাহাদের লওয়ার ও প্রতিদানের তুলনা করিয়াছেন। প্রথমের শ্রমিকরা হইলেন হযরত মূসা (আ)-এর পূর্বেকার জাতিসমূহ, দ্বিতীয় দল হযরত মূসা (আ)-এর নিজের উম্মত বানূ ইসরাঈল, তৃতীয় দল হযরত ঈসা (আ)-এর উম্মত খৃস্টানগণ এবং নূতন ও সর্বশেষ দল সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতগণ।

পৃথিবীর বয়সের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দলের তুলনায় মুহাম্মাদ (স)-এর উম্মতের জীবনকাল যেন দিনের শেষ প্রহর এবং সওয়াব ও প্রতিদানের ক্ষেত্রে এই সর্বশেষ উম্মতকে তাহাদের পূর্বেকার উম্মতদের সম পরিমাণ দেওয়ার অর্থ হইল ইহাই। আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে অন্য সকল উম্মতের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অধিক। এখানে শেষে যাহারা আসিবে তাহাদের দ্বারা উদ্দেশ্য উম্মতে মুহাম্মাদী। এই মর্মে হযরত মুহাম্মদ (স)-ও বলিয়াছেনঃ

نحن الاخرون السابقون.

"আমরাই শেষে আসা অগ্রগামী লোক" (বুখারী, কিতাবুল উদূ, দ্রষ্টব্য ফতহুল বারী, ১খ, পৃ. ৩৪৫)।

উপরিউক্ত তিন দলের প্রতিদানের বিষয়টি মহানবী (স) এক উপমায় নিম্নরূপ বর্ণনা করেন ঃ

مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر اجراء فقال من يعمل لى من غدوة الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لى من نصف النهار الى صلوة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لى من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فانتم هم فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا اكثر عملا واقل عطاء قال هل نقصتكم من حقكم قالوا لا قال فذلك فضلى أوتي من اشاء.

"তোমরা ও আহলে কিতাবদের উপমা সেই ব্যক্তির সাথে হইতে পারে যে অনেক মজুর নিয়োগ করে এবং বলে, সকাল হইতে দুপুর পর্যন্ত এক কীরাত মজুরীতে কে আছ যে আমার জন্য কাজ করিবে ? অতঃপর ইয়াহূদীরা কাজ করিল। এমনিভাবে তিনি আরও বলিলেন, দুপুর হইতে আসর পর্যন্ত এক কীরাত মজুরীতে কে আছ আমার জন্য কাজ করিবে? তখন নাসারাগণ কাজ করিল। অতঃপর তিনি আরও বলিলেন, আসর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুই কীরাত মজুরীতে কে আছ আমার জন্য কাজ করিবে। আর তোমরাই (মুসলমানরা) সেই দল। অতঃপর ইয়াহূদী ও নাসারাগণ রাগান্বিত হইল এবং বলিল, আমাদের কি হইল যে আমরা বেশী কাজ করিলাম এবং কম মজুরী পাইলাম? তখন কর্তা বলেন, তোমাদের হক বা নির্ধারিত পাওনার কম দিয়াছি কি ? তাহারা বলিল, না। তিনি বলিলেন, ইহা আমার অনুগ্রহ যাহাকে ইচ্ছা আমি বেশী দিব" (বুখারী, কিতাবুল ইজারা, বাবু আল-ইজারাত ইলা নিসফিন নাহার; দ্র. ফাতহুল বারী, পৃ. ৪৪৫-৪৪৭)।

তৃতীয়ত ঃ হযরত ঈসা (আ) আর একটি উপমায় মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (স) ও তাঁহার উম্মতের আগমন সম্পর্কে সুসংবাদ দিয়াছিলেন ঃ আমার পুত্রকে সমাদর করিবে। কিন্তু কৃষকেরা পুত্রকে দেখিয়া পরস্পর বলিল, এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী। আইস, আমরা ইহাকে বধ করিয়া ইহার অধিকার হস্তগত করি। আর যোহনের [হযরত ইয়াহইয়া (আ)-এর] সাক্ষ্য এইঃ যখন ইয়াহূদীগণ কয়েকজন যাজক ও লেবীয়কে দিয়া যিরুসালেম হইতে তাহার কাছে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল, আপনি কে ? তখন তিনি স্বীকার করিলেন, অস্বীকার করিলেন না। তিনি স্বীকার করিলেন যে, আমি সেই খৃস্ট নই। তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তবে কি ? আপনি কি এলিয় ? তিনি বলিলেন, আমি এলিয় নই। আপনি কি সেই ভাববাদী? তিনি উত্তর করিলেন, না। তখন তাহারা তাহাকে কহিল, আপনি কে? যাহারা আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন তাহাদিগকে যেন উত্তর দিতে পারি। আপনার বিষয়ে আপনি কি বলেন ? তিনি কহিলেন, আমি প্রান্তরে একজনের রব, যে ঘোষণা করিতেছে, তোমার প্রভুর পথ স্মরণ কর, যেমন যিশাইয় ভাববাদী বলিয়াছিলেন। তাহারা ফরিশীগণের নিকট হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। আর তাহারা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি যদি সেই খৃস্টও নহেন এলিয়ও নহেন, সেই ভাববাদীও নহেন, তবে বাপ্তাইজ করিতেছেন কেন (১ ঃ ১০-২৫)?

এই বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, বানূ ইসরাঈলরা হযরত ঈসা মসীহ ও হযরত ইলয়াস (আ) ছাড়া আরও একজন নবীর জন্য প্রতীক্ষমাণ ছিল। তিনি হযরত ইয়াহইয়াও নহেন। এই ভাবাবাদী নবীর আগমন সংক্রান্ত বিশ্বাস— বানূ ইসরাঈলীদের মধ্যে এমন সর্বজনবিদিত ছিল যে,

সেই নবী বলাই তাহাকে বুঝানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু ইহা হইতে এই কথাও জানা গেল যে, যে নবীর প্রতি তাহারা ইংগিত করিত, তাহার আগমন অকাট্যভাবে প্রমাণিত ছিল। কেননা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-কে যখন এই প্রশ্ন করা হইল, তখন তিনি এই কথা বলেন নাই যে, তোমরা কোন নবীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ, আর তো কোন নবীর আগমন হইবার নহে।

বস্তুত উক্ত বাণীতে তৃতীয় আর একজন নবী আগমনের সুসংবাদটি এতই পরিষ্কার যে , খৃস্টানরা অযৌক্তিকভাবে অস্বীকার করা ব্যতীত ইতিহাসের এই প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ থাকিয়াই গিয়াছে যে, হযরত মুহাম্মাদ (স) যদি সেই নবী না হন তবে কে সেই নবী ? কারণ ঈসা (আ)-এর পরে আর কোন নবী আসিয়াছেন বলিয়া তাহারা দাবি করে না। আর ইয়াহূদীরা যেমনিভাবে হযরত মসীহ (আ)-এর আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় ছিল কিন্তু তাঁহার আগমনের পর বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া তাঁহাকে প্রত্যাখান করিল, অনুরূপভাবে ইয়াহূদী খৃস্টান উভয়ে সেই নবী-এর আত্মপ্রকাশের জন্য চরমভাবে অপেক্ষা করিতেছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সেই নবীর আগমনের পর গোষ্ঠীগত ও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তাহারা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া বসিল। এই বিষয়টি আল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও বর্ণিত হইয়াছে

اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ·

"আমি যাহাদিগকে কিতাব দিয়াছি, তাহারা তাহাকে সেইরূপ জানে যেইরূপ তাহারা নিজেদের সন্তানগণকে চিনে এবং তাহাদের এক দল জানিয়া শুনিয়া সত্য গোপন করিয়া থাকে" (২ ঃ ১৪৬)।

পঞ্চমত, যোহন সুসমাচারে একজন নবীর আগমনের কথা বারবার ভবিষ্যদ্বাণীরূপে ঘোষিত হইয়াছে। তাহাতে ভবিষ্যতে আগমনকারী নবীর যেই সকল গুণ উল্লেখ করা হয়, তাহা হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর গুণাবলীর সাথে অনেকটা মিলিয়া যায়। যোহন সুসমাচারে আসা ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নরূপ ঃ

(১) "তোমাদের নিকট থাকিতে থাকিতেই আমি তোমাদের নিকট এই কথা কহিলাম। কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা, যাহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি, সে সকল স্মরণ করাইয়া দিবেন" (১৪ ঃ ২৫-২৭)।

(২) "তথাপি আমি তোমাদেরকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে, সেই সহায় (ফোরকালীত) তোমাদের নিকট আসিবে না, কিন্তু আমি যদি যাই তবে তোমাদের নিকট তাহাকে পাঠাইয়া দিব" (১৬ ঃ ৭; আরও দ্র. ১৬ ঃ ১২-১৫)।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উক্ত প্রতিশ্রুত নবীই ছিলেন হযরত মুহাম্মাদ (স)।

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা

হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ স্বরূপ ও দাওয়াতী কাজে সহায়তার নিমিত্ত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁহাকে বিভিন্ন রকম মু'জিযা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার সংখ্যা ছিল প্রচুর (ডঃ মুস্তফা সিবাঈ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যাহ, পৃ. ২২)। আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ঈসা (আ)-এর সেইসব মুজিযার কথা আলোচিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে হযরত ঈসা (আ)-এর উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে ঃ

اَنِّىْ قَدْ جِئْتُكُمْ بِاٰيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ اَنِّىْ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَاَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَاُحْىِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَاْكُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِىْ بُيُوْتِكُمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

"আমি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি। আমি তোমাদের জন্য কর্দম দ্বারা একটি পক্ষী সদৃশ আকৃতি গঠন করিব; অতঃপর আমি উহাকে ফুৎকার দিব; ফলে আল্লাহ্র হুকুমে উহা পক্ষী হইয়া যাইবে। আমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করিব এবং আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করিব। তোমরা তোমাদের গৃহে যাহা আহার কর এবং মওজুদ কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া দিব। তোমরা যদি মু'মিন হও তবে ইহাতে তোমাদের জন্য নিদর্শন রহিয়াছে" (৩ ঃ ৪৯)।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰاةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِىْ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ .

"আল্লাহ বলিবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর ঃ পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে। তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়াছিলাম। তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখীসদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখি হইয়া যাইত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্তকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে মৃতকে জীবিত করিতে" (৫ ঃ ১১০)।

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ হইতে ঈসা (আ)-এর নিম্নোক্ত মু'জিযার বর্ণনা পাওয়া যায়।

(১) মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করিয়া ফুৎকার দিয়া আকাশে উড়াইয়া দেওয়া।

(২) জন্মান্ধ এবং শ্বেত কুষ্ঠ রোগীকে কেবল হাত বুলাইয়া সুস্থ করিয়া দেওয়া ।

(৩) কোন কোন মৃতকে জীবিত করিয়া দেওয়া।

(৪) লোকের গৃহে কি কি জিনিস মওজুদ রহিয়াছে এবং তাহারা কি ভক্ষণ করিয়াছে সেই সম্পর্কে সংবাদ দেওয়া।

এইগুলি ছাড়াও পঞ্চম আরেকটি মু'জিযার কথা সূরা মাইদাতে আলোচনা করা হইয়াছে। তাহা হইল খাদ্য পরিপূর্ণ আসমানী খাঞ্চা নাযিল হওয়া। এই সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ. قَالُوْا نُرِيْدُ اَنْ نَّاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُوْنَ عَلَيْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ. قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لِّاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ. قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْۤ اُعَذِّبُهٗ عَذَابًا لَّاۤ اُعَذِّبُهٗۤ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ.

"স্মরণ কর, হাওয়ারীগণ বলিয়াছিল, হে মারয়াম তনয় ঈসা! আপনার প্রতিপালক কি আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য পরিপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ করিত সক্ষম ? সে বলিয়াছিল, আল্লাহ্কে ভয় কর যদি তোমরা মু'মিন হও। তাহারা বলিয়াছিল, আমরা চাহি যে, উহা হইতে কিছু খাইব ও আমাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করিবে। আর আমরা জানিতে চাহি যে, আপনি আমাদিগকে সত্য বলিয়াছেন এবং উহাতে সাক্ষী থাকিতে চাহি। মারয়াম তনয় ঈসা বলিল, হে আল্লাহ, আমাদিগের প্রতিপালক! আমাদিগের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর। ইহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসবস্বরূপ ও তোমার নিকট হইতে নিদর্শন এবং আমাদিগকে জীবিকা দান কর। আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। আল্লাহ বলিলেন, নিশ্চয় আমি তোমাদিগের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদিগের মধ্যে কেহ কুফরী করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না" (৫ ঃ ১১২-১১৫)।

এই মু'জিযাগুলির ধরন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহা নিম্নরূপ ঃ

(ক) মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করা

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযার মধ্যে অন্যতম হইল, তিনি মাটি দ্বারা পাখি তৈরি করিয়া তাহাতে ফুৎকার দিলে তাহা উড়িয়া যাইত। আল-কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি উহা আল্লাহরই অনুমোদন ক্রমে সম্পাদন করিতেন (তাফসীরে মাযহারী, ২খ., পৃ. ২৯৪)।

ইমাম বাগাবী (র) বলিয়াছেন, ঈসা (আ) শুধু বাদুড় পাখিই বানাইতেন, ইহা ছাড়া আর কোন পাখি বানাইতেন না। কেননা উহাই একমাত্র পাখি যাহা গঠনগত দিক হইতে পূর্ণাঙ্গ চতুষ্পদ প্রাণীর মত এবং স্তন্যপায়ী (আরো দ্র. ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ৩৩৩)।

ইব্‌ন জারীর তাবারী উল্লেখ করিয়াছেন, ইবন ইসহাক হইতে বর্ণিত। মকতবের কয়েকজন বালকের সাথে একবার হযরত ঈসা (আ) বসিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি এক মুঠি কাদা হাতে নিয়া বলিলেন, এই কাদা দিয়া আমি তোমাদের জন্য একটি পাখি বানাইয়া দিব। তাহারা বলিল, সত্যিই তুমি তাহা পারিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, আমার প্রতিপালকের অনুমতিতে আমি তাহা পারিব। তাহার পর মাটি দিয়া তিনি একটি পাখির আকৃতি বানাইলেন, তাহাতে ফুৎকার দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্‌র অনুমতিতে পাখি হইয়া যাও, ফলে সেইটি পাখি হইয়া তাহার হাত হইতে উড়িয়া যায়। এই কাণ্ড দেখিয়া বালকগণ সেই স্থান হইতে বাহির হইয়া গিয়া তাহাদের শিক্ষকদের নিকট ঘটনাটি জানাইল। তাহারা ব্যাপারটি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ করিয়া দিল। ঈসা (আ) তাঁহাতে চিন্তাযুক্ত হইলেন। এইদিকে বানূ ইসরাঈল তাঁহার ক্ষতি করার ইচ্ছা করিয়াছিল। তাঁহার ব্যাপারে শংকাগ্রস্ত হইবার পর তাঁহার মাতা তাঁহাকে নিয়া একটি গাধায় চড়িয়া দ্রুত সরিয়া পড়িলেন। বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কাদা-মাটি হইতে পাখি বানাইতে মনস্থ করিলেন, তখন তাহাদেরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কোন পাখি বানানো বেশী কঠিন? উত্তরে বলা হইল, বাদুড় (তাফসীরে তাবারী, ৫খ., পৃ, ৩৯৯)।

বাইবেলের চার খণ্ডের কোথাও হযরত ঈসা (আ)-এর এই মু'জিযার উল্লেখ নাই। একমাত্র মিসরীয় কিবতীদের নিকট (COPTIC CHURCH) রক্ষিত এবং বার্নাবাসের বাইবেলে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, এক শ্রেণীর প্রকৃতিবাদী এবং তাহাদের সাথে ইসলামের দাবিদার কিছু ব্যক্তি ঈসা (আ)-এর মু'জিযাগুলিকে এমনভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা সেইগুলিকে অস্বীকার করারই নামান্তর (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫-৬৬)।

উহার খণ্ডনের নিমিত্ত বলিতে হয় যে, পাখি তৈরি করার উপরিউক্ত মু'জিযাটির আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা রহিয়াছে। সাথে সাথে আল্লাহর অনুমোদনক্রমে কিভাবে তাহা তৈরি করা হইয়াছিল তাহাও বলা হইয়াছে। বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট, তাই ইহা অস্বীকার করা বা অপব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা আল-কুরআনের একটি স্পষ্ট ভাষ্যকেই অস্বীকার করা বা অপব্যাখ্যা দেওয়ার নামান্তর, যাহা কোন মুসলমান করিতে পারে না।

(খ) জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীর অলৌকিকভাবে সুস্থ করা

ঈসা (আ) তাঁহার দাওয়াতী কাজের পরিক্রমায় সেই যুগে এমন কিছু রোগীকে সুস্থ করিয়া তোলেন যাহা করিতে সেই যুগের ডাক্তারগণ অপারগ ছিলেন। আল-কুরআনে প্রথম সে রোগটির বর্ণনায় اكمه শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা)-এর মতে اكمه অর্থ জন্ম হইতেই যাহার চোখ নাই বা যাহার চক্ষুস্থল সমতল। হাসান ও সুদ্দী (র) বলেন, অন্ধ। হযরত ইকরিমা (র) বলেন, যাহার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল, চোখ হইতে সব সময় পানি ঝরে। মুজাহিদের মতে আকমাহ ঐ ব্যক্তি যে রাতকানা (তাফসীরে মাযহারী, পৃ. ২৯৪; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৬৯)।

তবে প্রকৃতপক্ষে আকমাহ বলিতে জন্মান্ধ ব্যক্তিকে বুঝায়।কেননা রাতকানা রোগ ডাক্তাররাও চিকিৎসা করিতে পারে। তখন নবী হিসাবে ইহা ঈসা (আ)-এর মু'জিযা হইবে না। এইজন্য ইবন জারীর তাবারী আকমাহার অর্থে জন্মান্ধ হওয়াকে প্রাধান্য দিয়াছেন (তাফসীর তাবারী শরীফ, ৫খ, পৃ. ৪০১)। হযরত ঈসা (আ)-এর এই রোগ নিরাময় করার ঘটনাটি এমনকি বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হইয়াছে যেমন, মথি ৯ ঃ ২৭-৩০, মার্ক ৮ ঃ ২২-২৫, লূক ১৮ ঃ ৩৫-৪৩)। তবে সর্বাধিক বিস্তারিত বিবরণ যোহন সুসমাচার ৯ ঃ ১-৭-এ রহিয়াছে। এই সুসমাচারে জন্মান্ধ ও মাতৃগর্ভ হইতে প্রসবকালীন সময়েও অন্ধ হইয়া যে শিশু জন্ম নেয় তাহারও বিবরণ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

আল-কুরআনে বর্ণিত দ্বিতীয় দূরারোগ্য ব্যাধিটি শ্বেতকুষ্ঠ রোগ। খৃস্টানদের হাতে প্রচলিত সুসমাচারসমূহে এই রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে একাধিক ঘটনা উল্লেখ করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে এক জায়গায় একজন কুষ্ঠরোগী এবং অপর স্থানে ১০ জন কুষ্ঠরোগী নিরাময়ের ঘটনার বিবরণ রহিয়াছে (মথি ৮ ঃ ১-৩)।

আরেক দিনের ঘটনা। তিনি জেরুসালেম যাত্রাকালে সামিবিয়া হইয়া গালীলের ভিতর দিয়া পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। পথিমধ্যে এক গায়ে ১০ জন কুষ্ঠরোগীকে দেখিতে পাইলেন। কুষ্ঠরোগিগণ তাহাকে দেখিয়াই দূরে দাঁড়াইয়া উচ্চঃস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, হে প্রভু! আমাদের প্রতি মেহেরবানী করুন। তিনি তাহাদেরকে, বলিলেন, যাও নিজ নিজ দেহগণকে দেখাইয়া নিও- তাহারা সামনের দিকে আগাইয়া যাইতেই সম্পূর্ণ সুস্থ, পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল।

প্রচলিত সুসমাচারসমূহে উপরিউক্ত দুইটি রোগসহ আরও কয়েকটি রোগের কথা উল্লেখ আছে যাহা হযরত ঈসা (আ) অলৌকিক ভাবে নিরাময় করিতেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে

(১) তিনি অবশ রোগীকে সুস্থ করেন (মথি ৯ ঃ ২, ৮ ঃ ৫, ১২ ঃ ৯)।

(২) বোবা রোগীকে সুস্থ করেন (মথি ৯ ঃ ২৭)।

(৩) তোতলার তোতলামী অপসারণ করেন (মথি ৭ ঃ ৩১, লূক ১৮ ঃ ৩৫-৪৩)।

(৪) ভূতে পাওয়া তথা জিনে ধরা রোগীকে সুস্থ করেন (মথি ৮ ঃ ২৮, ১৪, ১৭ ঃ ১৪, মার্ক ৫ ঃ ২-১৯, ৯ ঃ ১৪-২৭)।

(৫) নপুংসক ব্যক্তিকে সুস্থ করেন (বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ৭৮)।

(৬) কুজকে সুস্থ করেন (লূক ১৩ ঃ ১০) ইত্যাদি।

আল্লামা সুয়ূতী বলেন, এই দুই ধরনের এমন রোগ যাহার নিরাময়ে ডাক্তারগণ অপারগ হইয়া গিয়াছিল। হযরত ঈসা (আ)-কে চিকিৎসার জয়জয়কারের যুগেই প্রেরণ করা হইয়াছিল। আর তিনি এক দিনে ৫০ হাজার রোগীকে দু'আর মাধ্যমে সুস্থ করিয়াছিলেন। তবে শর্ত ছিল ঈমান আনিতে হইবে (প্রাগুক্ত)। হযরত ওয়াহ্‌ব ইবন মুনাবিবহ (র) বলেন, ঈসা (আ)-এর কাছে এক এক দিন ৫০ হাজার রোগীর সমাবেশ ঘটিত। যে তাঁহার নিকট আসিতে সক্ষম হইত সে তো নিজেই আসিয়া

যাইত। আর যাহারা পারিত না, ঈসা (আ)-ই তাহাদের কাছে চলিয়া যাইতেন। রুগ্ন, পঙ্গু, অন্ধ ইত্যাদির জন্য তিনি দু'আ করিতেন ঃ

اللهم انت إله من فى السماء واله من فى الارض لا إله فيهما غيرك وأنت جبار من فى السموات وجبار من فى الأرض لا جبار فيهما غيرك وانت ملك من فى السماء وملك من فى الأرض لاملك فيهما غيرك قدرتك فى الأرض كقدرتك فى السماء سلطانك فى الارض كسلطانك فى السماء اسئلك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شئ قدير.

"হে আল্লাহ! তুমি আকাশবাসীর ইলাহ্, ইলাহ্ পৃথিবীবাসীর। এই দুইয়ের মাঝে তুমি ছাড়া কোনো ইলাহ্ নেই। তুমি আকাশমণ্ডলীর অধিবাসীর মাঝে প্রবল, প্রবল তুমি যমীনবাসীদের মাঝে। এই দুইয়ের মাঝে তুমি ছাড়া কেউ প্রবল নহে। তুমি আকাশবাসীর অধিকর্তা, অধিকর্তা যমীনবাসীর। এই দুইয়ের মাঝে তুমি ছাড়া আর কোন অধিকর্তা নেই। আকাশে যেমন তোমার শক্তি যমীনেও তেমন তোমার শক্তি। আকাশে যেমন তোমার ক্ষমতা, যমীনেও তেমন তোমার ক্ষমতা। তোমার কাছে চাই তোমার নামের উসিলায়, তোমার সমুজ্জ্বল চেহারার উসিলায়, চাই তোমার অনাদি সার্বভৌমত্বের উসিলায়। তুমি সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান" (তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৬৯)।

ইবন জরীর তাবারী বলেন, ঐ ধরনের রোগ নিরাময় দ্বারা আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে নিদর্শন দিয়াছেন যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল। ইহা তো মু'জিযাসমূহের অন্যতম যাহা আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দান করিয়াছেন (তাফসীরে তাবারী শরীফ, ৫খ, পৃ. ৪০১)।

(গ) আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করা ঃ আল-কুরআনের ভাষ্যমতে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র হুকুমে মৃতকে জীবিত করিতেন যেন লোকজন তাঁহার প্রতি ঈমান আনয়ন করে। বাগাবী (র) বর্ণনা করিয়াছেন, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, ঈসা (আ) চার ব্যক্তিকে জীবিত করিয়াছিলেন ঃ (১) আযির, (২) জনৈক বৃদ্ধার ছেলে, (৩) কর আদায়কারীর মেয়ে এবং (৪) নূহ (আ)-এর ছেলে সাম।

(১) আযির ঈসা (আ)-এর বন্ধু ছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাহার বোন ঈসা (আ)-এর কাছে লোক পাঠাইয়া দেয় যে, আপনার ভাই ইনতিকাল করিয়াছেন। তিনি তিন দিনের পথ পাড়ি দিয়া সঙ্গীদের নিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু আসিয়া দেখিলেন তিন দিন আগেই তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি তাহার বোনকে বলিলেন ঃ আমাদের নিয়া তাহার কবরের কাছে চল। সে তাহাদের নিয়া ভাইয়ের কবরের নিকট পৌঁছিল। ঈসা (আ) আল্লাহ্র কাছে দু'আ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আযির উঠিয়া দাঁড়াইলেন আর তাহার শরীর হইতে চর্বি গলিয়া গলিয়া পড়িতেছিল। কবর হইতে উঠার পর সে বেশ কিছুদিন জীবিত ছিল।

(২) এক বৃদ্ধার ছেলে ইন্তিকাল করিলে ঈসা (আ)-এর নিকট দিয়া তাহার জানাযা নিয়া যাওয়া হইতেছিল। তিনি তাহার জন্য দু'আ করিলেন, তৎক্ষণাৎ সে খাটের উপর উঠিয়া বসিল। ইহার পর

সকলের সামনে নিচে আসিয়া জামা-কাপড় পরিধান করিল এবং খাটটি কাঁধে নিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সেও বেশ কিছু দিন বাঁচিয়াছিল। তাহার সন্তানও জন্ম নিয়াছিল।

(৩) কর আদায়কারীর তনয়ার ঘটনা হইল, তাহার বাপ ছিল একজন কর আদায়কারী। কন্যার মৃত্যুর একদিন পর সে বিষয়টি ঈসা (আ)-কে অবহিত করিল। ঈসা (আ) তাহার জন্য দু'আ করিলেন। ফলে আল্লাহ তাহাকে জীবিত করিয়া দেন। সেও দীর্ঘায়ু পাইয়াছিল এবং সন্তান জন্ম দিয়াছিল।

(৪) নূহ (আ)-এর পুত্র সাম। ঈসা (আ) তাহার কবরের কাছে আসিলেন এবং ইসমে আ'জম দ্বারা দু'আ করিলেন। সাথে সাথে তিনি কবরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

কিয়ামতের ভয়ে তাহার অর্ধেক চুল পাকিয়া গিয়াছিল। অথচ সেকালে কাহারও চুল পাকিত না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ কিয়ামত হইয়া গেল কি ? 'ঈসা (আ) বলিলেন, না! তবে আমি ইসমে আ'জম পড়িয়া দু'আ করিয়াছি। ইহার পর বলিলেন, মরিয়া যান। তিনি বললেন ঃ প্রস্তুত, তবে শর্ত হইল মৃত্যুকষ্ট হইতে যেন আল্লাহ রেহাই দেন। ঈসা (আ) এই জন্য দু'আ করিলেন। দু'আ কবূল হইল (তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫-২৯৬; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৬৯-১৭০)।

ইব্ন কাছীর উল্লেখ করেন যে, ইসহাক ইব্ন বিশর, কা'ব আল আহবার, ওয়াহব ইব্ন মুনাব্বিহ, ইব্ন আব্বাস ও সালমান ফারসী (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন যে, মৃতকে জীবিত করণে সর্বপ্রথম যাহা ঘটিয়াছিল তাহা হইল, একদা তিনি এক কবরের পার্শ্বে ক্রন্দনরত মহিলার পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি হইল? তখন সেই মেয়ে লোকটি বলিল, আমার মেয়েটি মৃত্যুবরণ করিয়াছে অথচ সে ছাড়া আমার আর কোন সন্তান নাই। আমি আমার রবের কাছে ওয়াদা করিয়াছি যে, আমার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আমি এই স্থান ত্যাগ করিব না অথবা আল্লাহ তা'আলা আমার মেয়েটিকে জীবিত করিয়া দিবেন। তুমি তাহার প্রতি দৃষ্টি দাও। 'ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমি যদি উহার প্রতি দৃষ্টি দেই, তাহা হইলে তুমি কি ফিরিয়া যাইবে। সেই মেয়ে লোকটি বলিল, হাঁ। বর্ণনাকারিগণ বলেন, তখন ঈসা (আ) দুই রাক'আত নামায পড়িলেন এবং কবরের নিকটে আসিয়া বসিলেন। অতঃপর সেই মৃত মেয়েটিকে ডাক দিলেন, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নির্দেশে দাঁড়াইয়া যাও এবং কবর হইতে বাহির হইয়া আস। কবরটি কাঁপিয়া উঠিল। অতঃপর ঈসা আবার ডাক দিলেন, তখন কবরটি ফাটিয়া গেল। অনন্তর তিনি তৃতীয়বারের মত ডাক দিলেন, তখন ঐ মেয়েটি মাথা হইতে মাটি ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাহির হইয়া আসিল। হযরত ঈসা (আ) তাহাকে বলিলেন, আমার ডাকার পর তোমার দেরী হইল কেন ? সে বলিল, প্রথম ডাক দেওয়ার পর আল্লাহ পাক এক ফেরেশ্‌তা পাঠাইলেন যিনি আমার শরীরের অবয়ব পুনর্গঠন করিলেন। দ্বিতীয় ডাকের সময় আমার কাছে আমার আত্মা ফিরিয়া আসিল। আর যখন আমার কাছে তৃতীয় ডাক আসিল তখন আমি মনে করি যে, ইহা কিয়ামতের আহবান। তখন কিয়ামতের ভয়ে আমার মাথার চুল শুভ্র হইয়া যায়। অতঃপর সে তাহার মায়ের কাছে গেল এবং বলিল, হে আম্মা! আপনার কি হইল যে, আমাকে দুইবার মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করার পর্যায়ে লইয়া

গেলেন। হে আম্মা! আপনি সবর করুন এবং আল্লাহ্‌র নিকট ইহার প্রতিদান কামনা করুন। অতঃপর সে ঈসা (আ)-কে লক্ষ্য করিয়া বলিল, হে আল্লাহ্‌র রূহ ও কলেমা ঈসা! আপনার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করুন তিনি যেন আমাকে পরকালীন জীবনে ফিরাইয়া নেন এবং মৃত্যুযন্ত্রণাকে হাল্কা করিয়া দেন। অতঃপর ঈসা (আ) দু'আ করিলেন। আল্লাহ তাঁহার দু'আ কবূল করিলেন (ইব্‌ন কাছীর, পৃ. ৭৬)। বার্ণাবাসের বাইবেলেও অনুরূপ একটি ঘটনা বর্ণিত আছে (অধ্যায় নং ৪৭, পৃ. ৫৮-৫৯)।

আল্লামা আলূসী বলেন যে, আল-কুরআনে ঈসা (আ)-এর মু'জিযার আলোচনায় মৃত (الموتى) শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক, সবকিছু ইহার অন্তর্ভুক্ত। যুহরী হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, আমি অবহিত হইয়াছি, ঈসা (আ) ও তাঁহার সাথী পথ চলিতে চলিতে একেবারে স্পেন (আনদালূস) পর্যন্ত চলিয়া যান। সেখানে মৃতকে জীবিত করিয়াছিলেন। সাথীবর্গ এই ধরনের জীবিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিবার পর জানিতে পারিলেন যে, তিনি আদ জাতিভুক্ত (আবূ হায়্যান, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৬৬)। আরও বর্ণিত আছে যে, ঈসা (আ) যখন কাহাকেও জীবিত করার জন্য দু'আ করিতেন তখন তিনি সেই দু'আয় বলিতেন, ইয়া হায়্যু, ইয়া কায়্যুম। আর বর্ণিত আছে যে, তিনি দুই রাক'আত নামায পড়িতেন। আরও বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোন মৃতকে জীবিত করার ইচ্ছা পোষণ করিতেন তখন তাঁহার লাঠি দ্বারা সেই মৃতকে আঘাত করিতেন অথবা কবরে আঘাত করিতেন অথবা মাথার খুলি বাহির করিয়া আঘাত করিতেন। তখন তাহা আল্লাহ্‌র নির্দেশে জীবিত হইয়া যাইত এবং ঈসা (আ)-এর সঙ্গে কথা বলিত, অতঃপর দ্রুত মৃত্যুবরণ করিত (আবূ হায়্যান, প্রাগুক্ত, আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৬৯)।

উল্লেখ্য, বর্তমান যুগে আধুনিকতার দাবিদার স্যার সৈয়দ আহমদ এবং মৌলভী চেরাগআলীসহ মিথ্যা নবুওয়াতের দাবিদার গোলাম আহমদ কাদিয়ানী এবং মৌঃ মুহাম্মদ আলী লাহোরী ধর্মকে অতি প্রাকৃতিক বিষয় হইতে মুক্ত করিবার অভিলাষে ইয়াহূদীদের ন্যায় ঈসা (আ)-এর ঐ মু'জিযাকে অস্বীকার করিয়া বসিয়াছেন। ইহার পক্ষে তাহাদের দাবি হইল, কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের পূর্বে কাহাকেও এই দুনিয়াতে পুনর্বার জীবিত করিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু গোটা কুরআন মজীদের কোন একটি আয়াতেও এই দাবি প্রমাণিত হয় না বরং প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু দান করার পর এই পৃথিবীতে পুনরায় জীবিত করিয়াছেন। যেমন সূরা বাকারার গাভী যবাহ করা সম্পর্কিত আয়াতে আছে ঃ

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ اللّٰهُ الْمَوْتٰى.

"তখন আমরা এই নির্দেশ দিয়াছিলাম যে, নিহত ব্যক্তির লাশের উপর ইহার কোন অংশ দ্বারা আঘাত কর। বস্তুত এইভাবেই আল্লাহ তা'আলা মৃতদের জীবন দান করেন" (২ ঃ ৭৩)।

এই সূরায় ২৫৯ নং আয়াতে উল্লেখ আছে ঃ

فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ.

"অতঃপর আল্লাহ তাহার প্রাণ হরণ করিয়া নিলেন এবং সে একশত বৎসর মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিল। অতঃপর আল্লাহ তাহাকে পুনর্জীবিত করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, বল কত কাল

এইভাবে পড়িয়া রহিয়াছিলে ? সে বলিল, এক দিন অথবা কয়েক ঘন্টা মাত্র। আল্লাহ বলিলেন, তোমার উপর দিয়া এমনি অবস্থায় এক শতটি বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে"।

এই সূরায় (২৬০ নং আয়াত) উল্লেখ আছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ رَبِّ اَرِنِى كَيْفَ تُحْىِ الْمَوْتٰى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلٰى وَلٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِىْ قَالَ فَخُذْ اَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ اِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلٰى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَاْتِيْنَكَ سَعْيًا .

"সেই ঘটনাও স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম বলিল, প্রভু! আমাকে দেখাও তো তুমি কিভাবে মৃতকে পুনর্জীবিত কর। আল্লাহ বলিলেন, তুমি কি বিশ্বাস কর না ? ইবরাহীম বলিল, বিশ্বাস করি, কিন্তু শুধু মনের সান্ত্বনার জন্য। আল্লাহ বলিলেন, তাহা হইলে তুমি চারটি পাখি ধর এবং সেগুলি নিজের সাথে সুপরিচিত করিয়া নাও। অতঃপর ইহাদের এক একটি অংশ এক একটি পাহাড়ের উপর রাখিয়া দাও। অতঃপর ইহাদেরকে ডাক দাও। দেখিবে ইহারা তোমার কাছে দৌড়াইয়া ছুটিয়া আসিতেছে"।

অতএব এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে মৃতকে জীবিত করিবার পরিষ্কার অর্থ বর্তমানে রহিয়াছে। মোটকথা, কুরআনের দৃষ্টিতে দুনিয়ায় পুনর্জীবিত হওয়া নিষিদ্ধ— এইরূপ চিন্তা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও মুহাম্মদ আলী লাহোরী প্রমুখের মস্তিষ্ক প্রসূত যাহা চূড়ান্তরূপেই ভ্রান্ত। ইহার পিছনে কোন যুক্তি বর্তমান নাই (সিউহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭-৬৮)।

(ঘ) আসমান হইতে মাইদা অবতীর্ণ হওয়া ঃ তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে আছে, 'আল্লামা আলূসী বলেন, প্রচলিত অর্থে মাইদা হইল, ঐ পাত্র যাহাতে খাদ্যবস্তু রাখা হয়। ইহা ছাড়া কেবল খাদ্যকেও মাইদা বলা হইয়া থাকে (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ৫৯)। মুফাসসিরগণের মতে ঐ আয়াতে খাদ্যসহ পাত্রকে বুঝানো হইয়াছে। কেননা ঈসা (আ)-এর অনুসারীরা পাত্র নহে, বরং খাদ্যই চাহিয়াছিল। রাগিব এই মতের প্রবক্তা (তাফসীরে মাজেদী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬১)।

আল-কুরআনে বর্ণিত ঈসা (আ)-এর মু'জিযা হিসাবে আসমানী মাইদা এক গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা। আল-কুরআনের একটি সূরার নামকরণ করা হয় 'মাইদা'। আল-কুরআনে সরাসরি মাইদার প্রসঙ্গটি আসিলেও ঈসা (আ) ও তাঁহার অনুসারীদের কাছে আসমান হইতে কখন ও কিভাবে কি বস্তু খাদ্য হিসাবে আসিয়াছিল তাহা বিস্তারিত আলোচনা করা হয় নাই। ফলে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে মাইদা সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করা হইয়াছে।

আল্লামা ইবন কাছীর (র) ইব্ন আব্বাস, সালমান আল-ফারসী, আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা) প্রমুখের বরাতে উল্লেখ্য করেন যে, হযরত ঈসা (আ) ত্রিশ দিন রোযা রাখার আদেশ দিয়াছিলেন। অতঃপর তাহারা যখন ত্রিশ রোযা পূর্ণ করিল তখন তাহারা ঈসা (আ)-এর নিকট আসমান হইতে মাইদা নাযিল করিবার জন্য আবেদন করিল যাহাতে তাহারা উহা হইতে আহার করিতে পারে এবং তাহাদের অন্তর পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারে যে, আল্লাহ পাক তাহাদের সিয়াম কবূল করিয়াছেন

এবং তাহাদের আবেদন মঞ্জুর করিয়াছেন। আর এইভাবে যেন ইহা এক ঈদ উৎসবে পরিণত হয়। পূর্বাপর ধনী-গরীব সকলের জন্য ইহা যথেষ্ট। অতঃপর ঈসা (আ) তাহাদেরকে এই ব্যাপারে ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে সতর্ক করিলেন এবং তাহারা এই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করিতে ও শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন করিতে পারে কি না সেই ব্যাপারে সংশয়বোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা বারবার ঈসা (আ)-কে তাঁহার প্রভুর নিকট ঐ ব্যাপারে আবেদন করিতে তাকীদ দিতে লাগিল। ইহা হইতে যখন তাহারা বিরত হইল না তখন ঈসা (আ) সালাতের মুসল্লায় দাঁড়াইয়া গেলেন এবং একটি পশমের পোশাক দ্বারা আবৃত হইয়া মাথা নিম্নদিকে ঝুলাইয়া দিলেন। দুই চোখ কান্নায় ভাসাইয়া দিয়া তিনি আল্লাহর কাছে কাকুতি-মিনতি করিয়া দু'আ করিলেন, যেন তাহারা যাহা চাহিতেছে তাহা তাহাদিগকে দেওয়া হয়। তখন আল্লাহ্ তা'আলা আসমান হইতে মাইদা নাযিল করেন (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮০)।

'আল্লামা সিউহারবী বিষয়টিকে অন্য আঙ্গিকে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ন্যায়নিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ হাওয়ারীগণ যদিও সত্যিকার ঈমানদার ও অবিচল আকীদার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাহারা সরল প্রকৃতির এবং গরীব ও সম্বলহীন ছিলেন। এজন্য তাহারা সরল মনে হযরত ঈসা (আ)-এর নিকট আবেদন করিলেন যে, যে মহান সত্তার অসীম ক্ষমতার একটি নির্দেশন হইতেছে আপনার অলৌকিক জন্ম এবং আপনাকে দেয়া সেইসব মু'জিযা যাহা আপনার নবুওয়াত ও রিসালাতের সত্যতার সমর্থনে আপনার হাতে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই মহান সত্তা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্য খাঞ্চা পাঠাইতেও সক্ষম। তাহা হইলে আমরা জীবন ধারণের জন্য খাদ্য-সামগ্রী সংগ্রহের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহকে স্মরণ করিতে পারিব এবং সব সময় তাঁহার দীনের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিতে পারিব। এই কথা শুনিয়া হযরত ঈসা (আ) তাহাদের উপদেশ দিয়া বলিলেন, মহামহিম আল্লাহ্র শক্তি ও ক্ষমতা যদিও অসীম কিন্তু তাঁহাকে এইভাবে পরীক্ষা করা কোন সত্যিকার বান্দার পক্ষে শোভনীয় নহে। অতএব আল্লাহকে ভয় কর এবং এই জাতীয় চিন্তা পরিত্যাগ কর। হাওয়ারীগণ বলিল, আমরা আল্লাহ্কে পরীক্ষা করিব, এই দুঃসাহস আমাদের নাই এবং আমাদের উদ্দেশ্য মোটেই তাহা নহে। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, খাদ্য অন্বেষণের চিন্তা হইতে মুক্ত হইয়া আল্লাহ্র এই দানকে নিজেদের জন্য নির্ভর বানাইয়া নেওয়া এবং আপনাকে সত্য নবী হিসাবে মানিয়া নেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল করিয়া নেওয়া। ইহার মাধ্যমে আমরা গোটা বিশ্বের উপর আল্লাহর প্রভুত্বের পক্ষে ন্যায়নিষ্ঠ সাক্ষীতে পরিণত হইতে পারিব (সিউহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২)। মাইদা নাযিল সংক্রান্ত ঈসা (আ)-এর দু'আ ও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে উহার প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কুরআন কারীমে বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا لاَوَّلِنَا وَاٰخِرِنَا وَاٰيَةً مِّنْكَ وَارْزُقْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ. قَالَ اللّٰهُ اِنِّيْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّيْ اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ.

"মার্‌য়াম-তনয় 'ঈসা বলিল, হে আল্লাহ্ আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা প্রেরণ কর; ইহা আমাদের ও আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলের জন্য হইবে আনন্দোৎসব স্বরূপ এবং তোমার নিকট হইতে নিদর্শন। আর আমাদিগকে জীবিকা দান কর; তুমিই তো শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা। আল্লাহ্ বলিলেন, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব; কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফরী করিলে তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না" (৫ ঃ ১১৪-১১৫)।

উল্লেখ্য, খাবারে পূর্ণ পাত্র নাযিল হইয়াছিল কিনা তাহা আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয় নাই। এমনকি এই ব্যাপারে কোন মরফূ হাদীছও পাওয়া যায় না। অবশ্য সাহাবী ও তাবিঈগণ হইতে উহার বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ইব্‌ন জরীর তাবারীসহ অনেকেই মুজাহিদ ও হাসান বসরী (র) হইতে বর্ণনা করেন যে, আসমানী খাবারের জন্য আবেদনকারিগণকে যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কঠিন শর্তারোপ করা হয় তখন তাহারা ভয় পাইয়া যায় এবং তাহাদের আবেদন প্রত্যাহার করিয়া লয়, ফলে মাইদা নাযিল হয় নাই (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২)।

কিন্তু আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস এবং আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-সহ অনেকের বর্ণনামতে, মাইদা নাযিল হওয়ার ঘটনা ঘটিয়াছে এবং খাঞ্চা নাযিল হইয়াছিল। জমহুর-এর ইহাই মত এবং এই মতটি প্রসিদ্ধ (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২; ইব্‌ন কাছীর, ২খ, পৃ. ৮০; তাফসীরে নাসাফী, ১খ, পৃ. ৩৫১)।

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর দু'আর পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন লাল রং-এর এক খাঞ্চাতে খাবার নাযিল করেন, যাহা দুইটি মেঘের মাঝামাঝিতে ছিল, একটি উপরে অপরটি নিচে। ঐ ধরনের খাবারের আবেদনকারীরা আসমান হইতে মহাশূণ্যে নাযিলের অবস্থায় তাহা প্রত্যাশা করিতেছিলেন। হযরত ঈসা (আ) পূর্বোল্লেখিত শর্তের কারণে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় কান্নাকাটি করিতেছিল। ঐ খাঞ্চাটি তাঁহার সামনে আসার আগে তিনি অনুনয়-বিনয়ে প্রার্থনা করিতেছিলেন। ইহা তাঁহার সামনে হাজির হইবার পর তাহার আশেপাশে থাকা হাওয়ারীগণ ইহার সুগন্ধে মোহিত হইয়া যান। ঈসা (আ) ও হাওয়ারীগণ শুকরানা সিজদায় লুটাইয়া পড়িলেন। ইয়াহূদীরা দেখিতে আসিয়াও ফিরিয়া গেল। ঈসা ও তাঁহার সাথীবর্গ উহাকে রুমালে আবৃত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তখন ঈসা (আ) উহা উন্মুক্ত করিয়া বলিলেন— بِسْمِ اللهِ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ

(সেই আল্লাহর নামে শুরু করিতেছি যিনি সর্বোত্তকৃষ্ট রিযিকদাতা)। বিস্ময়ের সাথে তিনি দেখিতে পাইলেন, উহাতে ভাজা মাছ, রুটি ও তাজা ফল বিদ্যমান। ইব্‌ন কাছীরের বর্ণনামতে উহাতে সাতটি মাছ ও সাতটি রুটি ছিল। বলা হয় ইহাতে সিরকা ছিল। আরও বলা হয় উহাতে ডালিম ছিল। আরও অন্যান্য সুঘ্রাণযুক্ত ফল-ফলাদি ছিল (ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, প্রাগুক্ত)।

আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ আসমান হইতে অবতীর্ণ ঐ মাইদাতে রুটি ও গোশত ছিল (ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৮-৩৪২; তাফসীরুল মাওয়ারদী, ২খ, পৃ. ৮৫)। সালমান ফারসীর বর্ণনামতে, উহাতে ভাজা মাছ, পাঁচটি রুটি, খেজুর,

যয়তুন ও ডালিম ছিল। কাতাদা (র)-এর মতে বেহেশতী ফল-ফলাদি ও খাবার ছিল। দাহহাক ইব্ন আব্বাস (র) হইতে আরেক বর্ণনায় উল্লেখ করেন, উহাতে ছারীদও ছিল (প্রাগুক্ত)। সাঈদ ইব্ন জুবায়রের মতে, ইহাতে গোশত ছাড়া সব কিছুই ছিল। 'আতিয়া আওফীর মতে, উহাতে মাছ ছিল তবে তাহাতে সব ধরনের খাদ্যের স্বাদ ছিল। ইবনুস সাইব-এর মতে, উহাতে চাউলের রুটি ও সব্জি ছিল (ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত)। কাহারও মতে, উহাতে দুইটি রুটি ও দুইটি বড় মাছ ছিল। তাহারা খাঞ্চা হইতে চল্লিশ দিন আহার করিয়াছিল (তাফসীরে মাওয়ারদী, প্রাগুক্ত)। মোটকথা, তাহাতে উপাদেয় সুস্বাদু বৈচিত্র্যময় খাদ্যের সমাহার ঘটানো হইয়াছিল। কেননা তাহারা ছিল আল্লাহ্‌র মেহমান।

বর্ণিত আছে যে, হাওয়ারী শামউন তাহা দেখিয়া বলিয়াছিল, হে রূহুল্লাহ! ইহা কি দুনিয়ায় তৈয়ারী করা খাবার, না বেহেশতী খাবার ? ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন, না, ইহা আল্লাহর কুদরতে বিশেষভাবে তৈরী করা (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩)। বর্ণিত আছে যে, মাইদা ঈসা-এর কাছে উপস্থিত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তিনি দুই রাক'আত সালাত আদায় করিয়াছিলেন। অতঃপর হযরত ঈসা (আ) তাহা আহারের জন্য লোকদের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে প্রথমে খাওয়া শুরু করিবার জন্য বারবার অনুরোধ করিল। তিনি বলিলেন, তাহা আমার জন্য নহে, বরং তোমাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতেই নাযিল হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া সবাই আতংকিত হইল যে, না জানি ইহার পরিণাম কি দাঁড়ায়। তিনি তাহাদের এই অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তাহা হইলে ফকীর-মিসকীন, অক্ষম এবং রুগ্নদের ডাক। ইহা তাহাদের প্রাপ্য। অতঃপর আল্লাহ্‌র হাজারো বান্দা উহা তৃপ্তি সহকারে খাইল, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণে মোটেই ঘাটতি দেখা দিল না (সিওহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫)। এক বর্ণনামতে ১ হাজার তিন শত ফকীর-মিসকীন ও রোগগ্রস্থ লোক উহা আহার করিয়াছিল।

কাতাদার মতে, হাওয়ারীগণ যেখানেই থাকিতেন সেখানেই সকাল-সন্ধ্যা তাহা অবতীর্ণ হইত। কাহারো মতে, রবিবার দিনে দুই বার উহা নাযিল হইত। এই কারণে রবিবারকে উৎসব দিবস হিসাবে গণ্য করে (ইবনুল জাওযী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৩৪২)।

আর এমনিভাবে তাহারা অভাব-অনটন ও রোগ-বালাই হইতে মুক্তি লাভ করিল। অতঃপর যাহারা উহা ভক্ষণ করা হইতে বিরত ছিল, তাহারা উহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া অনুতপ্ত হইল। অতঃপর বলা হয় যে, ইহা দিনে একবার অবতীর্ণ হইত। এমনকি বলা হয় যে, প্রায় সাত হাজার লোক উহা ভক্ষণ করিত। ইহার পর যেমনিভাবে সালেহ (আ)-এর উটনী হইতে একদিন পরপর দুধ পান করিত, তেমনিভাবে মাইদাও একদিন পরপর অবতীর্ণ হইতে শুরু করে। তখন ঈসা (আ) মাইদাকে গরীব ও অভাবীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দেন। আর এই বিষয়টি অনেকের কাছে কষ্টদায়ক বলিয়া মনে হয় এবং মুনাফিক শ্রেণীর লোকজন বির্তকের সৃষ্টি করিল। তখন তাহা নাযিল হওয়া বন্ধ হইয়া গেল। আর যাহারা বিতর্ক সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারা শূকরে রূপান্তরিত হইয়া গেল (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ৮০)। তবে শাহ আবদুল কাদির (র) বলেন, শূকরে রূপান্তরিত হওয়ার ঘটনাটি বিশুদ্ধ নহে (সিউহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮, টীকা দ্র.)।

ইব্‌ন আবী হাতেম ইব্‌ন জরীর তাবারী, আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা) হইতে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলেন, আসমান হইতে মাইদা নাযিল হইয়াছিল তাহাতে রুটি ও গোশত ছিল। তাহাদেরকে আদেশ করা হইয়াছিল তাহারা যেন খিয়ানত না করে এবং আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া না রাখে। অথচ তাহারা খিয়ানত করিল এবং আগামী দিনের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল, ফলে তাহারা বানর ও শূকরে রূপান্তরিত হইয়া গেল।

ইব্‌ন কাছীর এই হাদীছটি মহানবী (সা) হইতে বর্ণিত কিনা সেই ব্যাপারে মন্তব্য করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, ইব্‌ন জারীর এই হাদীছটি অন্য সূত্রে শুধু আম্মার (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, রাসূলুল্লাহ (স) হইতে নহে। ইহাই বিশুদ্ধতর (প্রাগুক্ত)।

উল্লেখ্য যে, মাইদা অবতীর্ণের ঘটনাটি খৃস্টানদের কাছে প্রচলিত সুসমাচারসমূহে সরাসরি উল্লেখ্য করা হয় নাই। তবে যোহন সুসমাচারে স্বর্গ হইতে নাযিল হওয়া রুটির কথা উল্লেখ আছে (৬ ঃ ৬১)। তবে আল-কুরআন বর্ণিত উক্ত মাইদার কথা সরাসরি উল্লেখ না থাকিলেও মথি সুসমাচারের মতে একবার চার হাজার লোককে সাতখানা রুটি ও কয়েকটি মাছ দ্বারা আলৌকিকভাবে খাওয়ানোর ঘটনা উল্লেখ আছে (মথি, ১৫ ঃ ৩৩-৩৮)। এমনিভাবে লূকের অন্য এক বর্ণনায় দেখা যায়, ঈসা (আ) পাঁচটি রুটি ও দুইটি মাছ দ্বারা পাঁচ হাজার লোককে খাওয়াইয়াছিলেন (লূক ৯ ঃ ১০-১৭)।

(ঙ) গায়বী খবর প্রদান ঃ অদৃশ্য জগতের কিংবা বস্তুগত কার্যকারণের সংযোগ ব্যতীতই কোন কিছু জানার সম্ভাব্যতাকে প্রমাণের জন্য আল্লাহ পাক তাঁহার নবীগণকে অদৃশ্য বিভিন্ন বিষয় অবহিত করেন। ফলে তাঁহারা সেইসব বিষয় জানিতে পারেন যেগুলি সাধারণ মানুষ জানিতে পারে না। এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ পাক এক অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার মাধ্যমে তিনি কিছু কিছু অদৃশ্য বিষয় অবহিত হইতে পারিতেন। আল-কুরআনের বর্ণনা মতে, লোকজন যাহা তাহাদের ঘরে আহার করিত এবং যাহা মওজুদ রাখিত তাহা সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ) অবহিত করিতে পারিতেন। উহাতে লোকজন আশ্চর্য হইয়া যাইত।

অপরদিকে কাতাদা (র) বলেন, উল্লিখিত ঘটনাটি মাইদা সম্পর্কিত। বানূ ইসরাঈল যেখানেই থাকিত, তাহাদের নিকট আকাশ হইতে মাইদা নামিয়া আসিত। অনেকটা মান্ন ও সালওয়ার ন্যায় (তাফসীরে তাবারী শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫; তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৯৭)। তবে গায়বী খবর দানের বিষয়টি মাইদার সহিত নির্দিষ্ট করার কোন প্রমাণ নাই।

ইমাম ইব্‌ন জারীর তাবারী উল্লেখ করেন, লোকজন ঘরে কি খাইয়া আসিল, কি মওজুদ করিল ইহা সম্পর্কে যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, উহাতে হযরত ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতের প্রমাণ হয় না, কেননা অনেক জ্যোতিষী ও গণকও এই জাতীয় খবর দিয়া থাকে। আর ক্ষেত্রবিশেষে তাহা সত্যও হইয়া যায়। উত্তরে বলা যায়, জ্যোতিষী ও গণক ব্যক্তিরা এতদসম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা ও কৌশলের মাধ্যমে দিয়া থাকে। পক্ষান্তরে হযরত ঈসা (আ) তথা নবী-রাসূলগণের ব্যাপারটি তেমন নহে, বরং

হযরত ঈসা (আ) চিন্তা-গবেষণা ও কৌশল ব্যতিরেকে সরাসরি আল্লাহ্ কর্তৃক অবহিত হইয়া এইসব সংবাদ দিতেন। এইভাবেই অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আম্বিয়া কিরামের জ্ঞান আর জ্যোতিষী ও গণকদের জ্ঞান এক নহে (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২-৪০৩)।

উল্লেখ্য, আল-কুরআনের বর্ণনানুসারে হযরত ঈসা (আ)-এর উপরিউক্ত পাঁচটি মু'জিযা প্রধান। কিন্তু বাংলা ইসলামী বিশ্বকোষে ইহার সংখ্যা নয়টি বলিয়া উল্লেখ্য করা হইয়াছে। উপরিউক্ত পাঁচটিসহ বাকী চারটি নিম্নরূপ ঃ

(১) কোন পিতার মাধ্যম ছাড়াই জন্মগ্রহণ (৩ ঃ ৪৫-৪৬)।

(২) দোলনায় কথা বলা (প্রাগুক্ত)।

(৩) জন্মগতভাবেই অন্য নবীগণের কিতাব সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া ৩ ঃ ৪৮, ৫ ঃ ১১০)।

(৪) আত্মা ও শরীরসহ জীবিতাবস্থায় আসমানে উত্তোলন (৪ ঃ ১৫৮)।

ইসলামী বিশ্বকোষ (৫খ, পৃ. ৫০৯)-এ বর্ণিত উপরিউক্ত চারটি বিষয়কে ঈসা (আ)-এর মু'জিযা না বলাই যথাযথ। কেননা মু'জিযা হইল নবুওয়াতের প্রমাণস্বরূপ এবং নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জস্বরূপ। নবুওয়াতের দাবিদার ব্যক্তির মাধ্যমে অলৌকিক কিছু সংঘটিত হওয়া যাহা আল্লাহ পাকের ফয়সালা ও কুদরতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএব উপরিউক্ত চারটি বিষয়ই অলৌকিক ঘটনা নিঃসন্দেহে। আল-কুরআনেও ঈসা (আ)-কে সৃষ্টির নিদর্শন বলিয়া অবহিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রথমোক্ত তিনটি তাঁহার নবুওয়াতের পূর্ববর্তী জীবনের ঘটনা এবং শেষোক্তটি নবুওয়াতের সর্বশেষ ঘটনা। অতএব চারটি বিষয়ই ঈসা (আ)-এর নবুওয়াতী জীবনে তাঁহার মু'জিযা ছিল না, বরং তাহার সৃষ্টির নিদর্শন।

বাইবেলেও হযরত ঈসা (আ)-এর আরও কয়েকটি মু'জিযার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি গালীল সাগরের পানির উপর দিয়া হাঁটিয়া ছিলেন (মথি ১৪ ঃ ২২; মার্ক ৬ ঃ ৪৫; যোহন ৮ ঃ ১৬-২১; আরও দ্র. মথি ৮ ঃ ২৩-২৭; মার্ক ৪ ঃ ৩৫-৪১; লূক ৮ ঃ ২২-২৫; বার্ণাবাসের বাইবেল, অধ্যায় নং ২০, পৃ. ২০-২১)।

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযার ধরন

হযরত ঈসা (আ)-এর উক্ত মু'জিযাগুলির ধরন সম্পর্কে সমসাময়িক যুগ প্রেক্ষাপটে কতটুকু সামঞ্জস্য ছিল এবং সেই সামঞ্জস্য কোন ধরনের তাহা চিহ্নিত করিতে মুফাসসিরীনে কেরাম বিভিন্নরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। অনেকের মতে হযরত ঈসা (আ)-এর যুগে চিকিৎসা শাস্ত্র উন্নতির চরম শিখরে আরোহন করিয়াছিল। গ্রীক চিকিৎসাবিদদের বিবিধ গবেষণাধর্মী বক্তব্য আশ্চর্যজনক চিকিৎসামূলক উৎকর্ষ তৎকালীন রোমান সাম্রাজ্যে ফিলিস্তীনের ইয়াহূদীদেরকে ভীষণভাবে সন্মোহিত করিয়াছিল। তাই হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযাগুলির অধিকাংশই রোগ নিরাময় সংক্রান্ত অলৌকিক কর্মতৎপরতায় ভরপুর। এই দিক দিয়া তাঁহার মু'জিযাগুলি যুগ প্রেক্ষাপটে সামঞ্জস্যশীল। এই মতের

প্রবক্তাগণের মধ্যে আল্লামা কুরতুবী, ইব্‌ন কাছীর, জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শায়খ ইমমাঈল হাক্কী, ছানাউল্লাহ পানিপথী, আলূসী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ পৃ. ৯৪; শায়খ ইসমাঈল হাক্কী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৩৭; ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৭৮; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ১৬৯, তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৯৪ নবাব সিদ্দীক হাসান খান, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৪৬৯)।

কুরতুবী উল্লেখ করেন যে, ঈসা (আ)-এর যমানায় চিকিৎসা বিদ্যাই প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। তাই আল্লাহ্ পাক তাহাদের সামনে ঐ জাতীয় মু'জিযাই প্রদর্শন করাইয়াছিলেন (কুরতুবী ,প্রাগুক্ত)। শায়খ আলূসী মন্তব্য করেন, অর্থাৎ চিকিৎসকগণ চরম নৈপুণ্যের অধিকারী ছিল। বিশেষ করিয়া ঈসা (আ)-এর যুগে তাহাদের সেই নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। আর এইজন্য আল্লাহ্ পাক চিকিৎসা জাতীয় মু'জিযা প্রদর্শন করাইয়াছিলেন (আলূসী, প্রাগুক্ত)।

শায়খ ইসমাঈল হাক্কীও ঐরূপ মন্তব্য করিয়া বলেন যে, ঈসা (আ)-এর জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগী দু'আর মাধ্যমে আলৌকিকভাবে নিরাময়ের পর ইহার প্রত্যক্ষদর্শীরা তখন ঐ ব্যাপারে চিকিৎসকগণকে জিজ্ঞাসা করে। তখন বিশিষ্ট চিকিৎসক বলেন, জন্মান্ধ চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় লাভ করে না, তেমনিভাবে কুষ্ঠ রোগীও। অতএব তাহারা ঈসা (আ)-এর নিকট জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে লইয়া আসে। তখন ঈসা (আ) তাহাদের জন্য দু'আ করিয়া স্বীয় হাত বুলাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ দেখিতে পাইল এবং কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করিল। তখন তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ঈমান আনিল, অন্যরা তাহার দাওয়াত প্রত্যাখান করিয়া বলিল, ইহা যাদু (শায়খ ইসমাঈল হাক্কী , প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮)।

ছানাউল্লাহ পানিপথী ও আল্লামা আলূসীর মতে যুগের সামঞ্জস্যশীল মু'জিযা প্রদান করা আল্লাহর একটি নিয়ম যাহা পূর্বাপর সকল নবীর যুগে কার্যকর ছিল। যেমন মূসা (আ)-এর যুগে যাদু বিদ্যার প্রাধান্য ছিল। সুতরাং তাঁহাকে এমন মু'জিযা দেওয়া হইল, যাহার সামনে সকল সুদক্ষ যাদুকর হার মানিল। আর রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগ ছিল সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্বের যুগ আল-কুরআন, যাহার নিকট সমস্ত সাহিত্য ভাণ্ডার হার মানিয়া যায় (তাফসীরে মাযহারী, প্রগুক্ত , পৃ. ২৯৪; আলুসী প্রাগুক্ত)।

সিউহারবী বলেন, কুরআন মজীদ এই মু'জিযা যে ভংগিতে বর্ণনা করিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, এই নিদর্শন (মুজিযা) পেশ করিবার কারণ তাফসীরকারগণের বর্ণিত কারণের চেয়ে অধিক সুক্ষ্ম এবং ব্যাপক। হযরত ঈসা (আ) হিদায়াতের বাণী এবং হকের দাওয়াত দেওয়ার কাজ করার সময় অধিকাংশ লোককে পার্থিব কাজকর্মে মশগুল, ধন-দৌলতের লালসা এবং ভোগ-বিলাসের মধ্যে জীবন যাপনের আকাংক্ষা হইতে বিরত থাকিবার জন্য বিভিন্নভাবে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। উন্নত ও স্বচ্ছ আত্মার অধিকারী লোকেরা হকের সামনে মাথা নত করিয়া দিত। পক্ষান্তরে নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকেরা তাঁহার উত্তম নসীহতের প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার অনুসরণ করিতে থাকিত। অতএব এই মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করার জন্য হযরত ঈসা

(আ)-কে এমন নিদর্শন দান করা হইল যাহার সাহায্যে হক ও বাতিলের পার্থক্য প্রতিভাত হইয়া উঠে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪)।

অপরদিকে মিসরীয় প্রখ্যাত আলেম শায়খ মুহাম্মাদ আবু যাহরা ইবন কাছীরসহ পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের উপরিউক্ত মতামতের সাথে দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, তৎকালীন ইয়াহূদী সমাজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে অবহিত ছিল না। তাই তাঁহার মু'জিযাগুলি সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত সামাঞ্জস্যশীল করিয়া প্রদান করা হয়। এই ধরনের মত যথাযথ নহে (শায়খ আবু যাহরা, মুহাদিরাতু ফিন নাসরানিয়া, পৃ. ২১)। তিনি ফ্রান্স দেশীয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক দার্শনিক রায়নান-এর একটি উক্তি তাহার মতের স্বপক্ষে উল্লেখ করেন। রায়নান বলিয়াছেন, প্রাচ্যে চিকিৎসা শিল্প অতীতে ঐ সম্বন্ধে যেমন ছিল আজও তেমন আছে। অতঃপর শায়খ আবু যাহরা বলেন, প্রকৃতপক্ষে মাসীহ (আ)-এর মু'জিযাগুলি ঐরূপে আসার মূল কারণ হইল, তাঁহার সমসাময়িক কেহ কেহ আত্মাকে অস্বীকার করিত। অর্থাৎ তাহাদের কাজগুলি প্রমাণ করিত যে, আত্মা বলিতে কিছু নাই। অতঃপর ঈসা (আ) এমন মু'জিযা লইয়া আসিলেন যাহা ছিল অলৌকিক এই মুজিয়াগুলি রূহের ঘোষণা ও অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ। আর মুক্ত ব্যক্তি যাহার হাড্ডি গুলি বিলীন হইয়া যাইতেছে, মাসীহ (আ) আসিলেন, আর তাহাকে ডাক দিলেন সেই ডাকে সাড়া দিয়া জীবিত হইয়া উঠিল। আর ইহাতো একমাত্র এইজন্য যে, ঐ দেহে রূহ আছে যাহা ঐ ডাকে প্রবিষ্ট হইয়াছে সেই দেহে। অন্যান্য মু'জিযার অবস্থাও ছিল অনুরূপ। মৃতকে জীবিত করা ছিল একটি শক্তিশালী আওয়াজ যাহা তাহাদের ঈমানের দিকেই লইয়া যাইত। কিন্তু তাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহে অবিশ্বাস করিতেছিল (প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২২)।

শায়খ আবু যাহরার উপরিউক্ত বক্তব্য একটি চমৎকার বিশ্লেষণ। তবে তিনি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কারণ ফিলিস্তীনসহ সিরিয়া অঞ্চল রোমান শাসনাধীন ছিল। আর রোমানরা ছিল বস্তুবাদী গ্রীক দর্শন ও জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, প্রচারক ও ধারক। এমনিভাবে ঈসা (আ)-এর যুগের ইয়াহূদীরা স্বভাবত গ্রীক বস্তুবাদী চেতনা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবে সম্মোহিত ছিল। এমনকি বস্তুবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া কেহ কেহ আখিরাতকে অস্বীকার করিয়া বসিত। যেমন সাদুকীরা। অতএব নূতন দাওয়াত বা সংস্কারের ডাক দিতে হইলে সেই সম্মোহনী শক্তির মূলে আঘাত হানার প্রয়োজন ছিল। প্রমাণ করিতে হইত যে, বস্তুগত উপায়-উপকরণই সবকিছু নহে, রূহানী জগত বলিতেও একটি জগত আছে। তাই শায়খ আবু যাহরার মতের সমর্থনে বলা যায়, ঈসা (আ) বস্তুগত ঔষধ ব্যতীত শুধু দু'আর মাধ্যমে রোগ নিরাময় করিয়া সেই রূহানী জগতের প্রমাণ করিয়া দিলেন। তবে এই কথাও সত্য যে, ঈসা (আ)-এর আগমনের সন্ধিক্ষণে গ্রীক দার্শনিক ও চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসাশাস্ত্রের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়া ছিল। আর তখন তাহার জোয়ার ইয়াহূদী অঞ্চলে পৌঁছাই ছিল স্বাভাবিক যেখানে রোমান সম্রাটদের তল্পীবাহক কিছু ইয়াহূদী পণ্ডিত গ্রীক সংস্কৃতিতে মোহিত ছিল এবং সাধারণ জনগণকে উহা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিত।

অতএব সঠিক মত হইল, পূর্ববর্তী মুফাসসিরগণের মতটিও সত্য এবং তাহা আবু যাহ্রার ব্যাখ্যার সহিত সাংঘর্ষিক নহে, বরং পরস্পর পরিপূরক। কেননা মুফাসসিরগণ মু'জিযাসমূহের ঐতিহাসিক কার্যগত দিক বিবেচনা করিয়াছেন। আর আবু যাহ্রা ফলাফলের দিক বিবেচনা করিয়াছেন। মোটকথা, ঈসা (আ) কর্তৃক রূহানী জগতের প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে বস্তুগত চেতনার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিলোপ সাধন করা হয়। তাহা ছাড়া দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্তদের মধ্যে দাওয়াতী কাজে কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি সব কিছুর সমন্বয়ে তাঁহার মু'জিযাগুলি প্রদর্শিত হয়।

উল্লেখ্য যে, এইসব মু'জিযার কারণে কিছু কিছু লোকের মনে ঈসা (আ)-এর ইলাহ হওয়া সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল। সেইহেতু এইসব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, এইসব ঘটনার প্রকাশ হযরত ঈসা (আ)-এর স্বীয় শক্তিতে হয় নাই, বরং ইহা তো আল্লাহ তাআলার কুদরতেই হইয়াছে (দ্র. আয- যামাখশারী, আল-কাশশাফ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৪; আবু হায়্যান, আল-বাহরুল-মুহীত, ২খ, পৃ. ২৬৭; আল কুরতুবী, ৪খ, ৯৪-৯৫; রাযী, ৭ ঃ ৬১)।

হযরত ঈসা (আ) তাঁহার স্বজাতি বনূ ইসরাঈলকে সত্য দীন শিক্ষাদান করিতেন। তাঁহার শিক্ষার কয়েকটি দিক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(ক) তাওহীদে দৃঢ়তা

বনূ ইসরাঈলের শেষ নবী হিসাবে তিনি তাহাদিগকে নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাওহীদের মূল প্রেরণায় তাহাদেরকে উজ্জীবিত করিয়া এক আল্লাহকে রব ও মা'বুদ হিসাবে মানিয়া লইতে আহবান জানাইয়াছিলেন এবং তাওহীদের অমান্যকারী মুশরিকদের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিয়াছেন। আল-কুরআনে তাহা এইভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَاءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

"মসীহ বলিল, হে বনূ ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন ও তাহার আবাস জাহান্নাম; জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই" (৫ঃ ৭২)।

বার্ণাবাসের বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ঈসা (আ)-এর সময়-কালেই কিছু কিছু রোমান সৈন্য শয়তানের প্ররোচনায় ইয়াহূদীদেরকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতেছিল যে, ঈসা (আ)-ই ঈশ্বর যিনি ইয়াহূদীয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছেন ।বার্ণাবাসের মতে, এইগুলি ঈসার মহান মু'জিযাসমূহ প্রদর্শনের ফলেই সৃষ্টি হইয়াছে। ঈসা (আ) উহাদের মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিবার পর মহারবে আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন এবং তাহাদেরকে নিন্দা করিয়া বলিলেন, হট আমার সম্মুখ হইতে রে পাগলের দল! কেননা আমি আতঙ্কিত হইতেছি যে, এই যমিন না দুই ভাগ হইয়া তোমাদের নিয়া আমাকে গ্রাস করে এই ঘৃণিত বাক্যের জন্য। এই কথা শুনিয়া লোকজন কাঁপিয়া উঠিল এবং রোদন শুরু করিল।

"তিনি তাৎক্ষণিকভাবে আরো বলিয়াছিলেন, আমি আসমানের নীচে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিতেছি, পৃথিবীতে বসবাসরত যাবতীয় সত্তাকে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমরা যাহা বলিতেছ তাহার সাথে আমি সম্পর্কশূন্য। দৃশ্যত আমি মানুষ মাত্র, মরণশীলা নারীর গর্ভজাত, আল্লাহ্‌র বিচারের মুখাপেক্ষী, খাওয়া ও নিদ্রার দুর্ভোগ সহ্যকারী ঠিক অন্য মানুষের মতই" (বার্নাবাসের বাইবেল, অধ্যায় নং ৯১-৯৩, পৃ. ১০৯, ১১১, ১১২)।

ঐ ধরনের বক্তব্যের ইঙ্গিত আল-কুরআনেও আসিয়াছে ঃ

ذٰلِكَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِىْ فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ. مَاكَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ. . . . .

"এই-ই মারয়াম তনয় ঈসা। আমি বলিলাম সত্য কথা, যে বিষয়ে উহারা বিতর্ক করে। সন্তান গ্রহণ করা আল্লাহ্‌র কাজ নহে, তিনি পবিত্র মহিমময়। তিনি যখন কিছু স্থির করেন তখন বলেন, 'হও' এবং উহা হইয়া যায়। আল্লাহ আমার প্রতিপালক ও তোমাদিগের প্রতিপালক। সুতরাং তাঁহার ইবাদত কর; ইহাই সরল পথ" (১৯ঃ ৩৪-৩৫; আরও দ্র. ১৯ঃ ৮৮-৯৫)।

তাওহীদের বিপরীতপন্থী মতবাদ খণ্ডনে হযরত ঈসা (আ)-এর পদক্ষেপ ও সাক্ষ্য আল-কুরআনের অন্যত্রও আসিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَا اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَآ اَمَرْتَنِىْ بِهٖ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ.

"আল্লাহ যখন বলিবেন, হে মারয়াম-তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে দুই ইলাহ্‌রূপে গ্রহণ কর? সে বলিবে, তুমি মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তাহা বলিতাম, তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ। কিন্তু আমি তোমার অন্তরের কথা অবগত নহি। তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যাহা আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই। তাহা এই যে, তোমরা আমার ও তোমাদের রব আল্লাহ্‌র ইবাদত কর" ৫ ঃ ১১৬-১১৭)।

উল্লেখ্য যে, উলামায়ে কিরাম তাওহীদকে তিনভাগে বিভক্ত করেন।

(১) তাওহীদুর রুবুবিয়্যা বা রব এক ;

(২) তাওহীদুল উলুহিয়্যা বা ইবাদত পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ তা'আলা।

(৩) তাওহীদুল আসমা ওয়াস-সিফাত বা আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তিনি একক।

এই প্রকারের আলোচনা উপরিউক্ত ঈসা (আ)-এর বাণীতে নিহিত রহিয়াছে।

পরম বিস্ময়ের ব্যাপার হইল, বর্তমানে যে সকল খৃস্টান ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী তাহাদের স্বীকৃত সুসমাচারসমূহে ঈসাকে 'খোদার পুত্র' বা 'খোদা' অভিধাটি বারবার সংযুক্ত করা হইয়াছে। ফলে হযরত ঈসা (আ)-এর প্রকৃত শিক্ষাকে অনেক পরিবর্তন করা হইয়াছে। অর্থাৎ সেই সুসমাচার-সমূহেও তাওহীদের বাণী অনুরণিত হইয়াছে।

মথি সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে, তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে। কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে (মথি, ৪ ঃ ১০)।

এমনিভাবে মার্ক সুসমাচারে বলা হইয়াছে, যীশু উক্তি করিলেন, হে ইসরাঈল! শুন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু; আর তুমি তোমার সমস্ত অন্তকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার সমস্ত মন ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে (মার্ক সুসমাচার, ১২ঃ ২৯-৩০)।

উপরিউক্ত বাণীসমূহে তাওহীদের কথা স্পষ্টভাবে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। তাই ঈসা (আ)-এর শিক্ষা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত, ত্রিত্ববাদের উপর নহে। এক আয়াতে উক্ত হইয়াছে যে, ঈসা (আ)-কে আল্লাহ পাক নামায আদায় ও যাকাত প্রদান করার নির্দেশ দিয়াছেন (দ্র. ১৯ ঃ ৩১)। আর ইহা স্বাভাবিক যে, তিনি নামায আদায় করিতেন এবং অন্যদেরকেও তাহা আদায় করার আদেশ করিতেন।

(খ) তাকওয়া ও রাসূলের অনুসরণ শিক্ষা

হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল তাকওয়া অবলম্বন। তিনি যেমনিভাবে নিজে কাকুতি-মিনতি করিয়া আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি করিতেন তেমনিভাবে তাঁহার স্ব-জাতির লোকজনকেও নির্দেশ দিতেন আল্লাহকে ভয় করিবার জন্য। সাথে সাথে ইসরাঈল জাতিকে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে তাঁহার অনুসরণের আদেশ করিতেন। আল-কুরআনে ঈসা (আ)-এর এই শিক্ষাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই আসিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ .

"সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর" (৩ ঃ ৫০)।

সূরা যুখরুফ-এ আরো উল্লেখ আছে ঃ "ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল, আমি তো তোমাদিগের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর" (সূরা যুখরুফ ঃ ৬৩)।

উল্লেখ্য যে, অধিকাংশ মুফাসসির-এর মতে হিকমত শব্দের অর্থ বাস্তবায়ন রীতি যাহাকে সুন্নাতও বলা হয়। তাই উপরিউক্ত আয়াতে ঈসা (আ)-এর হিকমত অর্থ তাঁহার সুন্নাত। তাই উক্ত আয়াতে কারীমায় আল্লাহভীতি তথা তাকওয়ার পাশাপাশি তাঁহার প্রেরিত নবীর সুন্নাত অনুসরণের

জন্য আহবান জানাইয়াছিলেন। উল্লেখ্য যে, বার্নাবাসের বাইবেলে বারবার তাকওয়ার প্রসঙ্গটি আসিয়াছে (দ্র. বার্ণাবাসের বাইবেল, অধ্যায় নং ৩৩, পৃ. ৩৯, অধ্যায় নং ১০৮, পৃ. ১৩০, অধ্যায় নং ১১১, পৃ. ১৩৩)।

(গ) আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন

হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযাগুলি রূহানী জগতের সন্ধান দেয়। এইগুলির মাধ্যমে তিনি বস্তুবাদী ইয়াহূদীদেরকে আধ্যাত্মিকতার উৎকর্ষ সাধনের আহবান জানান। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-কে রূহানী শক্তিতে বলিয়ান করা হইয়াছিল। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ.

"আল্লাহ বলিবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর, পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম" (৫ ঃ ১১০)।

বার্নাবাসের বাইবেলে একাধিকবার ঈসা (আ) কর্তৃক তওবা ও অনুতাপের শিক্ষা এবং ইহার প্রতি তাকীদ দানেরও উল্লেখ রহিয়াছে (বার্ণাবাসের বাইবেল, অধ্যায় নং ১০১, পৃষ্ঠা নং ১২০-১২, অধ্যায় নং ১০৭, পৃ. ১২৮, অধ্যায় নং ১৬৬, পৃ. ২০৬; মার্ক, ১ ঃ ১৫; লূক, ১৩ ঃ ৩)।

(ঘ) তাওরাতের সত্যায়ন ও উহার শিক্ষা পুনর্জীবিত করা

হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) ছিলেন তাওরাতের সত্যায়নকারী। যেমন আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرٰةِ.

"আমি আসিয়াছি আমার সম্মুখে তাওরাতের যাহা আসিয়াছে উহার সমর্থকরূপে" (৩ ঃ ৫০)।

ইহার অর্থ আমার পূর্বে যাহা ছিল আমি তাহার সমর্থক। শায়খ আলূসী বলেন যে, তাওরাতের সত্যায়ন অর্থ হইল উহাতে হিকমত ও সঠিক কথা যাহা আছে সবগুলি সম্পর্কে ঈমান আনা (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৭১)।

মোটকথা, ঈসা (আ)-এর পয়গামের গোটা লক্ষ্যসমূহের মধ্যে ছিল তাওরাতের স্বীকৃতি দান, অস্বীকারকারীদের বিভিন্ন সন্দেহ নিরসন এবং বিভিন্ন বিকৃতির অপসারণ। তাওরাতকে সত্যায়নের অর্থ তাহাই (রাযী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ৬২)।

ঈসা (আ) কর্তৃক সত্যায়ন ও সমর্থনের বিষয়টি মথি সুসমাচারেও আসিয়াছে (৫ ঃ ১৭-১৮)। তিনি তাওরাতের শরীআত রহিত করিতে আসেন নাই, বরং তাহার তাসদীক ও পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে আসিয়াছেন। লূক সুসমাচারে আসিয়াছে, তুমি আজ্ঞা সকল জান, ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, তোমার পিতা-মাতাকে সমাদর করিও (লূক, ১৮ ঃ ১৯-২১)।

(ঙ) কোন কোন বিধান সহজীকরণ

হযরত ঈসা (আ) তাওরাতের শরীআতকে নূতনভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সত্যায়ন করিয়াছিলেন। ইয়াহূদীদের অবাধ্যতা ও সীমালংঘনের শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ পাক কিছু কিছু বস্তু তাহাদের উপর হারাম করিয়াছিলেন এবং ইয়াহূদী আহবাররাও নিজেদের মনগড়া বিধিবিধান প্রচলন করিয়াছিল। ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র নির্দেশে এসব হারাম বিধিবিধানের মধ্য হইতে কিছু কিছু বিধান হালাল ঘোষণা দিয়াছিলেন। তাই আল-কুরআনে উল্লিখিত আছে ঃ

وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ.

"তোমাদের জন্য যাহা নিষিদ্ধ ছিল উহার কতকগুলিকে বৈধ করিতে এবং আমি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হইতে তোমাদের নিকট নিদর্শন লইয়া আসিয়াছি" (৩ ঃ ৫০)।

কাতাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর শরীআত হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতের তুলনায় সহজতর ছিল। হযরত মূসা (আ)-এর শরীআতে তাহাদের জন্য উটের গোশত, চর্বি ও কিছু পাখির গোশত হারাম ছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর শরীআতে তাহা হালাল করা হয় (তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৪০৭)। হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা ও আদর্শে হযরত মূসা (আ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শরীআতের কোন কোন বিধানকে সহজতর করার উল্লেখ সুসমাচারেও পাওয়া যায় (দ্র. মথি, ১১ঃ ২৮-৩০)।

(চ) চারিত্রিক ও সামাজিক সংস্কার

হযরত ঈসা (আ) দুনিয়াদারিতে কৃচ্ছ্রতাসাধন, বিনয়, নম্রতা, ন্যায়নিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্য, সততা ইত্যাদির শিক্ষা দিতেন। বর্তমানে প্রচলিত সুসমাচারসমূহে এইসব শিক্ষার বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। যেমন বিনয় ও নম্রতার শিক্ষায় তিনি বলিয়াছিলেনঃ যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে, কিন্তু যে আপনাকে নত করে তাহাকে উচ্চ করা যাইবে (লূক, ১৮ ঃ ১৪)।

লোভ-লালসা হইতে বিরত থাকিবার জন্য শিক্ষা দিতে গিয়া তিনি বলেন ঃ "সাবধান আপনাদিগকে সর্বপ্রকার লোভ হইতে রক্ষা করিও। কেননা উপচিয়া পড়িলে ও মনুষ্য সম্পত্তিতে তাহার জীবন হয় না" (লূক, ১২ ঃ ১৫-১৬)।

"হে অধ্যাপক ও ফরীশীগণ, কপটীরা! ধিক তোমাদিগকে। কারণ তোমরা চুনকাম করা কবরের তুল্য, যাহা বাহিরে সুন্দর বটে, ভিতরে মরা মানুষের অস্থি ও সর্বপ্রকার অশুচিতা ভরা। তদ্রূপ তোমরাও বাহিরে লোকদের কাছে ধার্মিক বলিয়া দেখাইয়া থাক, কিন্তু ভিতরে তোমরা কাপট্য ও অধর্মে পরিপূর্ণ।"

সামাজিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন সম্পর্কে তিনি বলিয়াছিলেন, "সুতরাং তাহারা আর দুই নয় কিন্তু একাঙ্গ। অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন, মনুষ্য তাহার নিয়োগ না করুক" (মথি, ১৯ ঃ ৬)।

তিনি তালাক সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "ব্যভিচারের দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যভিচার করে" (মথি, ১৯ঃ ৯)।

লূক সুসমাচারে আসিয়াছে যে, তিনি বলেন, "তোমরা যে শুনিতেছ, আমি তোমাদিগকে বলি, তোমরা আপন শত্রুদিগকে প্রেম করিও, যাহারা তোমাদিগকে দ্বেষ করে, তাহাদের মঙ্গল করিও, যাহারা তোমাদিগকে শাপ দেয় তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিও, যাহারা তোমাদিগকে নিন্দা করে, তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিও, যে তোমার এক গালে চড় মারে, তাহার দিকে অন্য গালও পাতিয়া দিও এবং যে তোমার চোপা তুলিয়া লয়, তাহাকে আঙরাখাটিও (জামা) লইতে বারণ করিও না। যে কেহ তোমার কাছে যাঞ্চা করে, তাহাকে দিও এবং যে তোমার দ্রব্য তুলিয়া লয়, তাহার কাছে তাহা আর চাহিও না, আর তোমরা যেরূপ ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও" (লূক, ৬ ঃ ২৭-৩২)।

মোটকথা, হযরত ঈসা (আ) ছিলেন মানব দরদী। মানুষের দুঃখ-কষ্ট তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করিতেন। মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি, সৌহার্দমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তাহা রক্ষার জন্য তিনি প্রয়াস চালাইতেন। সাথে সাথে তাহার শিষ্যদেরকে এই সকল বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার মত তাহার সাথীগণ এই ক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে প্রতিভাত হন। তাই আল-কুরআনেও তাহাদের গুণসমূহ উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের প্রশংসা বিবৃত হইয়াছে। আল্লাহপাক বলেন ঃ

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ·

"অতঃপর আমি তাহাদিগের অনুগামী করিয়াছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং অনুগামী করিয়াছিলাম মারয়াম-তনয় ঈসাকে, আর তাহাকে দিয়াছিলাম ইঞ্জীল এবং তাহার অনুসারীদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া। কিন্তু সন্ন্যাসবাদ, ইহা তো উহারা নিজেরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করিয়াছিল, আমি উহাদিগকে ইহার বিধান দেই নাই, অথচ ইহাও উহারা যথাযথভাবে পালন করে নাই" (৫৭ ঃ ২৭)।

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রচারকাজে দেখা যায়, তিনি অপরাধীদেরকে ঘৃণা করিতেন না, এমনকি তাহাদের সাথে আহার করিতেন। ইহা ইয়াহুদী নেতারা পছন্দ করিত না। তাঁহার সাথীদের মধ্যেও কেহ কেহ তাহা পছন্দ করিত না। তাই তিনি তাহাদেরকে এই বলিয়া সতর্ক করিতেন, অপরাধীকে ঘৃণা করিয়া দূরে সরাইয়া দিলে সে হেদায়াত পাইবে কোথা হইতে? তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া দীনের প্রতি তাহাকে আকৃষ্ট করাই ছিল হযরত ঈসা (আ)-এর হিকমত।

মোটকথা, হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষার মধ্যে ক্ষমা, দয়া ও মানবপ্রেম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষের প্রতি ঐকান্তিক দয়া ও ভালবাসার প্রেরণায় স্বজাতির লোকজনের সকল স্তরের ব্যক্তিদের নিকট তিনি গমন করিতেন এবং যথাসম্ভব তাহাদেরকে আপন করিয়া লইয়া হেদায়াত

করিবার চেষ্টা চালাইতেন। তাহাদের বল্যাণে নসীহত করিতেন। যুগে যুগে সকল নবীই এই ধরনের দরদী মন লইয়া মানবতার সেবা করিয়াছেন। এইজন্যই তাঁহারা মানবজাতির জন্য শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও শিক্ষা উপহার দিয়া গিয়াছেন। তাহারা ছিলেন কল্যাণময়ী সকল শিক্ষার বিমূর্ত প্রতীক বা উস্ওয়ায়ে হাসানা। তাই ঈসা (আ) ছিলেন মানুষের জন্য নিদর্শন ও রহমতস্বরূপ। আল-কুরআনেও বলা হইয়াছে ঃ

وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ـ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ـ

"তাহাকে যেন মানুষের জন্য নিদর্শন ও আমার পক্ষ হইতে তাহাদের জন্য রহমতস্বরূপ বানাইতে পারি। আর ইহা তো এক স্থিরীকৃত ব্যাপার" (১৯ ঃ ২২)।

পাহাড়ে ঈসা (আ) প্রদত্ত উপদেশ

হযরত ঈসা (আ) ছিলেন অনলবর্ষী বাগ্মী। তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষায় উপমা ও উদাহরণের মাধ্যমে ওয়াজ-নসীহত করিতেন। তিনি যেখানেই যাইতেন লোকদের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যাইত। লোকেরা তাহার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়া যাইত (আনওয়ারে আম্বিয়া, পৃ. ২৮৭)।

এইভাবে যখন তিনি গালীল প্রদেশে ঘুরিয়া ফিরিয়া শিক্ষা দিতেছিলেন এবং নানারকম রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে সুস্থ করিতেছিলেন তখন তাঁহার পিছনে অনেক লোকজন চলিতে শুরু করিল। মথি সুসমাচারের বর্ণনামতে, সেখানে গালীল, দিকাপলি, জেরুসালেম, এহুদিয়া ও জর্ডানের অন্য পার হইতে আগত অনেক লোক ছিল। তাহারা কফরনাহুম-এর রাস্তার এক পাহাড়ের পাদদেশে আসিলে ঈসা (আ) এক দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন (মথি, ৪ঃ ২৩-২৫)। উহা ঈসা (আ)-এর ঐতিহাসিক পাহাড়ী খুতবা (Sarmon on the mount) হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। হযরত ঈসা (আ) সুযোগ বুঝিয়া প্রায়ই খুৎবা দিতেন, যাহা সুসমাচারসমূহে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়াইয়া ছিটাইয়া আছে। কিন্তু ঐ খুৎবাটি দীর্ঘ যাহা মথি সুসমাচারে ৫-৭ পর্যন্ত তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। বাইবেলের নানা বিকৃতি সত্ত্বেও উক্ত পাহাড়ী খুৎবাটিতে একসংগে ঈসা (আ)-এর অনেক শিক্ষা সন্নিবেশিত হইয়াছে বলিয়া গবেষকগণ মনে করেন। ইহার বিশেষ কয়েকটি অংশ নিম্নরূপ ঃ

"ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।

ধন্য যাহারা শোক করে, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।

ধন্য যাহারা মৃদুশীল, কারণ তাহারা দেশের অধিকারী হইবে।

ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।

ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।

ধন্য যাহারা নির্মলান্তঃকরণ, কারণ তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।

"তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না, এখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে, চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর। সেখানে কীটে ও মর্চ্চ্যায় ক্ষয় করে না। সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না।

"তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। কেননা যেরূপ বিচারে তোমরা বিচার কর সেই রূপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে এবং যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাণ করা যাইবে। আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ? কিন্তু তোমার চক্ষে যে কড়িকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?

"অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন একজন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপর আপন গৃহ নির্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না। কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল। আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন একজন নির্বোধ তুল্য বলিতে হইবে, যে বালুকার উপর আপন গৃহ নির্মাণ করিল। পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল এবং সেই গৃহে আঘাত করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল ও তাহার পতন ঘোরতর হইল" (দ্র. মথি, ৫ ঃ ৩-৪৮, ৬ ঃ ১-৩৪, ৭ ঃ ১-২৭)।

উক্ত ভাষণের বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ কয়েকটি দিক হইল ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে রোযা রাখিবার বিষয়ে শিক্ষা (৬ ঃ ১৬-১৮), দান করিবার বিষয়ে শিক্ষা (৬ ঃ ৫-৭), ইখলাসের বিষয়ে শিক্ষা (৬ ঃ ১-৫, ১৬-১৮), এক আল্লাহর ইবাদত করিবার শিক্ষা (৬ ঃ ২৪), বেহেশ্‌তের পাথেয় সংক্রান্ত শিক্ষা (৬ ঃ ১৯-২১), ইবাদতে মধ্য পন্থা অবলম্বন ও বাহুল্য পরিহারের শিক্ষা (৫ ঃ ৭), কপটতা পরিহারের শিক্ষা (৬ ঃ ১৬-১৮), প্রচার কাজে ঘর হইতে বহির হওয়ার শিক্ষা (৬ ঃ ২৬-২৯), হেকমত ও দীনের তত্ত্বকথা যথাস্থানে ব্যবহারের শিক্ষা (৭ ঃ ৬)।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ তাহার তরজমানুল কুরআন নামক গ্রন্থে এবং মুহাম্মদ জামীল আহমাদ তাঁহার আম্বিয়ায়ে কুরআন নামক গ্রন্থে হযরত ঈসা (আ)-এর শিক্ষা, বিশেষ করিয়া পাহাড়ী খুৎবার শিক্ষা ও বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন? কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্যের বিষয়টি রহিয়াছে।

হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের পদ্ধতি

হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে তাহার সমকালীন প্রেক্ষাপট পর্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহার দাওয়াতী পদ্ধতি গ্রহণ করেন।

তাঁহার সেই দা'ওয়াতের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নিম্নে আলোচনা করা হইল. (দ্র. নিবন্ধকারের মানহাজুদ দাওয়াহ ওয়াদ দু'আত ফিল-কুরআনিল কারীম, ১৯৯৭ খৃ., পৃ. ২৩১-২৩৯)।

দা'ওয়াতকে দীনের মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর কেন্দ্রীভূত করণ

তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলগণের মত আকীদা, ইবাদত ও আখলাকের উপর তাঁহার দা'ওয়াতকে কেন্দ্রীভূত করেন। 'আকীদার ক্ষেত্রে হযরত ঈসা (আ) তাওহীদ ভিত্তিক দাওয়াত দান করিয়াছেন। তাওহীদ হইল একত্ববাদ। আল্লাহ্ সত্তাগত দিক, গুণগত দিক এবং সমস্ত কার্যক্রমের দিক হইতে এক ও অদ্বিতীয়। হযরত ঈসা (আ) এই আহবান ইসরাঈলী জনগণকে দিয়াছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছেঃ

وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِىْ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰهُ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ.

"আর মসীহ বলিয়াছিল, হে বনূ ইসরাঈল! তোমরা আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত কর। কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ তাহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন এবং তাহার আবাস জাহান্নাম। জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই" (৫ঃ ৭২)।

হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ পাকের সত্তা, গুণাবলী ও কার্যাবলীতে একত্ব তথা তাওহীদের প্রতি আহবান করিয়ছিলেন। ঈসা (আ)-এর দাওয়াতে আল্লাহ পাক এমন সত্তা যাহা বিভাজ্য নহে, নশ্বর কোন কিছুর তিনি তুল্য নহেন। তাঁহার মধ্যে কোন ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা নাই। হযরত ঈসা (আ)-এর সেই সুস্পষ্ট তাওহীদের দাওয়াত সম্পর্কে আল-কুরআনে আরও বলা হয় ঃ

وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُوْنِىْ وَاُمِّىَ اِلٰهَيْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اَقُوْلَ مَا لَيْسَ لِىْ بِحَقٍّ اِنْ كُنْتُ قُلْتُهٗ فَقَدْ عَلِمْتَهٗ تَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِىْ وَلَاۤ اَعْلَمُ مَا فِىْ نَفْسِكَ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ. مَا قُلْتُ لَهُمْ اِلَّا مَاۤ اَمَرْتَنِىْ بِهٖۤ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّىْ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَّا دُمْتُ فِيْهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِىْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

"আর আল্লাহ যখন বলিবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তুমি কি লোকদিগকে বলিয়াছিলে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত আমাকে ও আমার জননীকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর ? সে বলিবে, তুমিই মহিমান্বিত! যাহা বলার অধিকার আমার নাই, তাহা বলা আমার পক্ষে শোভন নহে। যদি আমি তাহা বলিতাম তবে তুমি তো তাহা জানিতে। আমার অন্তরের কথা তো তুমি অবগত আছ, কিন্তু তোমার অন্তরের কথা আমি অবগত নহি! তুমি তো অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তুমি আমাকে যে আদেশ করিয়াছ তাহা ব্যতীত তাহাদিগকে আমি কিছুই বলি নাই; তাহা এই ঃ তোমরা আমার ও তোমাদিগের প্রতিপালক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং যত দিন আমি তাহাদিগের মধ্যে ছিলাম তত দিন আমি ছিলাম তাহাদিগের কার্যকলাপের সাক্ষী। কিন্তু যখন তুমি আমাকে তুলিয়া লইলে তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদিগের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক এবং তুমিই সর্ব বিষয়ে সাক্ষী। তুমি যদি

তাহাদিগকে শাস্তি দাও তবে তাহারা তো তোমারই বান্দা, আর যদি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়" (৫ ঃ ১১৬-১১৮)।

উপরিউক্ত আয়াতগুলি পর্যালোচনা করিলে তাওহীদের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতা মা'বুদ ছিলেন না, বরং তাঁহারা ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, খৃস্টানগণ পরবর্তীতে ত্রিত্ববাদ (Trinity)-এর মাধ্যমে এক আল্লাহ্কে বিভাজিত করিয়া তিন খোদা বানাইয়াছে। আকীদা বিষয়ে হযরত ঈসা (আ) রেসালতের আকীদাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি দাবি করেন নাই যে, তিনি আল্লাহর পুত্র বা মানুষের প্রভু, বরং ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমি তোমাদের প্রতি প্রেরিত আল্লাহ্র রাসূল ও নবী। যেমন- আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

وَاِذْ قَالَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلٍ يَّأْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهُ اَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ .

"আর স্মরণ কর, মারয়াম তনয় ঈসা বলিয়াছিল, হে বনূ ইসরাঈল! আমি তোমাদিগের নিকট আল্লাহ্র রাসূল এবং আমার পূর্ব হইতে তোমাদিগের নিকট যে তাওরাত রহিয়াছে আমি তাহার সমর্থক এবং আমার পরে আহমাদ নামে যে রাসূল আসিবে আমি তাহার সুসংবাদদাতা। পরে সে যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ ইহাদিগের নিকট আসিল উহারা বলিতে লাগিল, ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু" (৬১ ঃ ৬)।

এমনিভাবে আখেরাতের 'আকীদা-বিশ্বাসের দিকেও তিনি বনূ ইসরাঈলকে দাওয়াত দিয়াছেন। আল-কুরআনে এই সম্পর্কে তাঁহার উক্তি উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَالسَّلٰمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا .

"আমার প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব" (১৯ ঃ ৩৩)।

এমনিভাবে তিনি তাঁহার অনুসারীদেরকে বেহেশত-দোযখের কথা বর্ণনা করিয়াছেন। যেমন আয়াতে কুরআনে আসিয়াছে, ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন—

اِنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ .

"কেহ আল্লাহ্র শরীক করিলে আল্লাহ্ তাঁহার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করিবেন" (৫ ঃ ৭২)।

আর ইবাদতের ক্ষেত্রেও তাঁহার দিকনির্দেশনা ছিল। তিনি লোকজনকে সালাত ও যাকাত আদায়ের জন্য আদেশ করিতেন। আল-কুরআনে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

وَاَوْصٰنِىْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا .

"তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে" (১৯ ঃ ৩১)।

সুতরাং সেই ইবাদতগুলি তিনি নিজে পালন করিতেন এবং অপরকে পালন করিতে আদেশ দিতেন। সুসমাচারসমূহেও ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় (দ্র. মথি সুসমাচার ঃ ১৬-১৮)।

আখলাক তথা চারিত্রিক গুণাবলীর ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন দিকনির্দেশনা দিয়াছেন। যেমন মাতা-পিতার প্রতি সদাচরণ, দয়া, প্রেম, ভালবাসা, সহমমির্তা ইত্যাদি উত্তম চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করিয়াছেন। এই ব্যাপারে আল-কুরআনেও দিকনির্দেশনা রহিয়াছে। যেমন ঈসা (আ)-এর ভাষায় ঃ

وَبَرًّا بِوَالِدَتِىْ وَلَمْ يَجْعَلْنِىْ جَبَّارًا شَقِيًّا ـ

"আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য" (১৯ ঃ ৩২)।

দ্বিতীয়ত, দাওয়াতের প্রস্তুতি গ্রহণ ও সাহায্যকারী দল গঠন ঃ হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জ্ঞানগত ও আধ্যাত্মিক বিভিন্ন শক্তি ও সামর্থে পরিপূর্ণতা দান করিয়া মহিমান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশেষ মর্যাদার কথা বারবার আলোচিত হইয়াছে।

اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِىْ عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِىْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِىْ وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ـ

"আল্লাহ বলিবেন, হে মারয়াম তনয় ঈসা! তোমার প্রতি ও তোমার জননীর প্রতি আমার অনুগ্রহ স্মরণ কর। পবিত্র আত্মা দ্বারা আমি তোমাকে শক্তিশালী করিয়াছিলাম এবং তুমি দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিতে। তোমাকে কিতাব, হিকমত, তাওরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়াছিলাম। তুমি কর্দম দ্বারা আমার অনুমতিক্রমে পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করিতে এবং উহাতে ফুৎকার দিতে, ফলে আমার অনুমতিক্রমে উহা পাখি হইয়া যাইত। জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্থকে তুমি আমার অনুমতিক্রমে নিরাময় করিতে এবং আমার অনুমতিক্রমে তুমি মৃতকে জীবিত করিতে। আমি তোমা হইতে বনূ ইসরাঈলকে নিবৃত রাখিয়াছিলাম। তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে, তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু" (৫ ঃ ১১০)।

ঈসা (আ) দাওয়াতী কার্যক্রমে সহযাত্রী ও সাহায্যকারী হিসাবে এক দল লোক তৈরি করেন, যাহাদেরকে হাওয়ারী বলা হয়। কুরআন পাকে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ اِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ رَبَّنَا اٰمَنَّا بِمَا اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ـ

"যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন বলিল, আল্লাহ্‌র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী? শিষ্যগণ বলিল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক। হে আমার প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর" (৩ ঃ ৫২-৫৩)।

আয়াতে উল্লিখিত শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রত্যয়টির অনেক অর্থ রহিয়াছে। সেইগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হইল সত্যের সাক্ষ্য দেওয়া, আর এই সাক্ষ্য কথা ও কাজ উভয়ের মাধ্যমে হইতে পারে। বাস্তবে তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর সাথে সত্যের সাক্ষ্য দিতে এবং সেই দিকে দাওয়াত দিতে মনোনিবেশ করেন।

দাওয়াত উপস্থাপনের বৈচিত্র্য

তিনি অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ন্যায় আল্লাহ্‌র দিকে দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তাহা নিম্নরূপ ঃ উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শন-এর পন্থায় দাওয়াত প্রদান। যেমন কুরআন কারীমে আসিয়াছে ঃ

فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّصِرِيْنَ ·

"আর যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে আমি তাহাদিগকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি প্রদান করিব এবং তাহাদের কোন সাহায্যকারী নাই" (৩ ঃ ৫৬)।

وَاَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَيُوَفِّيْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَاللّٰهُ لَايُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ ·

"আর যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকার্য করিয়াছে তিনি তাহাদের প্রতিফল পুরাপুরিভাবে প্রদান করিবেন। আল্লাহ্ জালিমদিগকে পছন্দ করেন না" (৩ ঃ ৫৭; আরও দ্র. ৫ ঃ ৭২)।

বর্তমান ইনজীল গ্রন্থেও অনেক ইংগিত পাওয়া যায় যে, ঈসা (আ) লোকদিগকে স্বর্গ ও আসমানী রাজ্যের সুসংবাদ প্রদান করিতেন (দ্র. মথি ২৪ ঃ ১৩-৪৪)।

তিনি দুইভাবে দাওয়াত প্রদান করিতেন ঃ উৎসাহ ও ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে। তবে তাঁহার দাওয়াতে সুসংবাদ প্রাধান্য পাইত। এইজন্যই তাঁহার কিতাবের নামকরণ করা হইয়াছে ইনজীল অর্থাৎ সুসংবাদ। সম্ভবত এই কারণেই বর্তমান নাসারাগণ তাহাদের দাওয়াতকে সুসমাচার হিসাবে অভিহিত করে।

ঈসা (আ)-এর বয়স যখন ১২ বৎসর তখন জেরুসালেমে যান এবং সেখানে বায়তুল মুকাদ্দাসে ইয়াহূদী পণ্ডিতদের সাথে যুক্তিতর্কে লিপ্ত হইয়াছিলেন। আর তাহারা বালক ঈসা (আ)-এর বুদ্ধিমত্তা ও বিচার-বিশ্লেষণে আশ্চর্য বোধ করে (দ্র. লূক সুসমাচার, ৪-৪৭)। মুসলিম ঐতিহাসিকগণও ইহা উল্লেখ করিয়াছেন (মুহাম্মাদ আলী সাবূনী, সাফওয়াতুত তাফাসীর, পৃ. ১৯৭)।

আল-কুরআনের বর্ণনামতে পরিণত বয়সেও তিনি কথা বলিবেন, ইহার তাৎপর্য হইল, তিনি নবুওয়াত লাভ করার পরও যুক্তিতর্কের সেই ধারা অব্যাহত থাকিবে। এইজন্য বর্তমান সুসমাচার-সমূহে ঈসা (আ)-এর দাওয়াত কথোপকথন পদ্ধতিতে ভরপুর। তিনি তাঁহার সাথীদের প্রশ্ন করিতেন এবং পরে নিজেই উহার উত্তর দিতেন। এমনিভাবে তাঁহার সাথীগণও তাঁহাকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন, তিনি তাহার উত্তর দিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার দাওয়াত উপস্থাপনের প্রধান কৌশল তথা হিকমত।

অলৌকিক নিদর্শন উপস্থাপন ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত ঈসা (আ)-কে বৈচিত্র্যময় অলৌকিক নিদর্শন দান করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ) সেই নিদর্শনগুলিকে দাওয়াতকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তুলিবার ক্ষেত্রে ব্যবহার করিতেন। মানুষ হযরত ঈসা (আ)-এর মু'জিযাসমূহ দেখিয়া তাঁহার প্রতি ঈমান আনিত।

উত্তম আদর্শ উপস্থাপন ঃ হযরত ঈসা (আ) ছিলেন তাঁহার সমাজে একজন আদর্শ মানুষের প্রতিচ্ছবি। তিনি ছিলেন জনদরদী, তিনি ছিলেন আর্কষণীয় ব্যক্তিত্ব। কথাবার্তায় ও আচার-আচরণে, তিনি মানুষের হৃদয়ে স্থান করিয়া লইতেন। সুসমাচারসমূহে এই ব্যাপারে প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কাহিনী ও উপমা-উদাহরণের মাধ্যম দাওয়াত ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত উপস্থাপনের আরেকটি কৌশল ছিল, তিনি লোকজনকে বুঝাইবার জন্য রূপকার্থে বিভিন্ন কিসসা-কাহিনী, উপমা-উদাহরণ ব্যবহার করিতেন। মথি সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঈসা (আ)-এর হাওয়ারীগণ তাঁহাকে ইহার রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তিনি উহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি তাহাদের জন্য দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা বলিতেছি। কারণ তাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝিয়াও বুঝেও না (দ্র. মথি, ১৩ ঃ ১৩)।

অর্থাৎ খোদায়ী রাজ্যের বিভিন্ন রহস্য ও নিগুঢ় তত্ত্ব বুঝাইবার জন্য তিনি উপমা-উদাহরণ, কিসসা-কাহিনীর ব্যবহার করিয়াছেন, যাহাতে তাহাদের অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া যায় এবং বিষয়গুলি সম্পর্কে গভীর পাণ্ডিত্য অর্জনসহ স্মৃতিতে ধরিয়া রাখা সহজতর হয়। মথি সুসমাচারে বিভিন্ন উদাহরণের অবতারণা করা হইয়াছে। যেমন ফল দ্বারাই গাছ চেনা যায় (১২ ঃ ৩৩-৩৬)।

এক চাষীর দৃষ্টান্ত (১৩ ঃ ১-৮), গমের মধ্যে শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত (১৩ ঃ ২৪-৩০); সরিষা দানা ও খামির দৃষ্টান্ত (১৩ ঃ ৩১-৩৪), আঙুরক্ষেতের মজুরদের গল্প (২০ ঃ ১-১৬), আঙুর ক্ষেতে চাষীদের দৃষ্টান্ত (২১ ঃ ৩৩-৪৪), বিবাহভোজের দৃষ্টান্ত (২২ ঃ ১-১৩), দশ মেয়ের গল্প (২৫ ঃ ১-১৩), তিনজন গোলামের গল্প (২৫ ঃ ১৪-৩০) ইত্যাদি।

মার্ক, লূক ও যোহন সুসমাচারে কয়েকটি গল্প উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. ৪ ঃ ১-৯; ৪ ঃ ২৬-২৯; ৪ ঃ ৩০-৩৪; ১২ ঃ ১-১২; ৮ ঃ ৪-৮; ১০ ঃ ৩০-৩৭; ১২ ঃ ১৩-২৫; ১৩ ঃ ১৮০২১; ১৪ ঃ ১৫-২৫; ১৫ ঃ ১-৭; ১৬ ঃ ৮-১০; ১৫ ঃ ১১-৩২; ১৬ ঃ ১-১৮; ১৬ ঃ ১৯-৩১; ১০ ঃ ১২-২৭; ২০ ঃ ৯-১৮; ৪ ঃ ৩৫-৩৮; ১০ ঃ ১-১৫; ১৫ ঃ ১-১৭।

হযরত ঈসা (আ)-এর অনেক উপমা-উদাহরণ অনেক মুসলিম লেখকও তাহাদের কিতাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কেননা তাহারা দাওয়াতের ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য ঈসা (আ)-এর উপমাযুক্ত শিক্ষাগুলি গ্রহণ করা দূষণীয় মনে করেন নাই (আদম আবদুল্লাহ আলুরী, তারীখুদ দাওয়াত, পৃ. ২৯)। রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن انى وجدها فهو احق بها .

"হিকমতপূর্ণ বাণী মু'মিনের হারানো সম্পদ, যেখানেই সে তাহা পাইবে সেই উহার বেশী হকদার" (সুনানু ইবন মাজাহ্, কিতাবুয যুহ্দ, বাবুল হিকমাহ, ২খ, পৃ. ১৩৯৫)।

হযরত ঈসা (আ) কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত বানূ ইসরাঈল জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বানূ ইসরাঈলের এলাকা ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত হিকমতের সহিত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। যোহন সুসমাচারে উল্লেখ করা হইয়াছে, ঈসা (আ) সমিরীয় প্রদেশে আসিয়াছিলেন। সেইখানে তাহার দাওয়াত দেওয়ার পর ঈসা (আ)-এর উপর তাহারা ঈমান আনিয়াছিল (দ্র. যোহন, ১ ঃ ৪০)।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে ঈসা (আ)-এর ঐক্যের আহবানে ও তাহাদের মুক্তির জন্য হিকমতের বিষয়টি আল-কুরআনেও স্পষ্টভাবে আসিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنٰتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُونِ .

"ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ আসিল, সে বলিয়াছিল, আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ, তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর" (৪৩ ঃ ৬৩)।

ইয়াহূদীদের দণ্ড হ্রাসের প্রচেষ্টা চালানো ঃ বানূ ইসরাঈল আল্লাহ্র কিছু কিছু বাণী বিকৃত করিয়া দাবি করিতেছিল যে, সৃষ্টিকর্তা একমাত্র তাহাদের কল্যাণেই কাজ করেন। তাহারাই আল্লাহ্র নির্বাচিত জাতি। গোটা দুনিয়ার মালিক তাহারাই। এসকল কথা তাহাদের মৌখিক বাণী। তালমুদে আরো ব্যাপকভাবে আসিয়াছে যাহার মূল উৎস পুরাতন নিয়মেও আছে বলিয়া তাহারা ধারণা করিতে থাকে। যেমন লেবীয় পুস্তকে আসিয়াছে, আমি সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বর! আমি অন্য জাতি সকল হইতে তোমাদিগকে পৃথক করিয়াছি (লেবীয় পুস্তক, ২০ ঃ ২৪)।

এই সমস্ত তত্ত্বকথা হইতে ইয়াহূদীদের মাঝে প্রচণ্ড জাতীয় দম্ভ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র প্রতি তাহাদের জাতীয় ভ্রান্ত চেতনা হইতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন বিভ্রান্তিমূলক চিন্তা-চেতনা। শত পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার পরও তাহারা নিজেদেরকে দোষী মনে করিত না। এই ধারণার কথা আল-কুরআনেও বর্ণিত হইয়াছে ঃ

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ .

"এইহেতু যে, তাহারা বলিয়া থাকে, দিন কতক ব্যতীত আমাদিগকে অগ্নি স্পর্শ করিবে না। তাহাদের নিজেদের দীন সম্বন্ধে তাহাদের মিথ্যা উদ্ভাবন তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছে" (৩ ঃ ২৪)।

সুতরাং তাহাদের জীবন চলার পথ বক্র হইয়া গিয়াছিল। তাই হযরত ঈসা (আ) তাহাদেরকে সিরাতুল মুসতাকীম অবলম্বনের দাওয়াত দিয়াছিলেন। তেমনিভাবে তাকওয়া তথা আল্লাহভীতি ও পরহেজগারীর দাওয়াতকেও উহার সহিত যুক্ত করিয়াছেন। এইজন্য আল-কুরআনে সূরা যুখরুফে হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত উল্লেখ করিতে গিয়া তাকওয়া ও সিরাতুল মুসতাকীমের দাওয়াত-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (দ্র. সূরা যুখরুফ ঃ ৬৩-৬৪)। কেননা তাহাদের এই দম্ভ নিরসন করিতে হইলে যেমনি দরকার ইবাদত-এর তেমনিভাবে প্রায়োজন তাকওয়ার। হযরত ঈসা (আ) তাহাদের আমল না করিয়াই আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হওয়ার দাবিকে বিভিন্নভাবে খণ্ডন করিয়াছিলেন, যাহা প্রচলিত সুসমাচারসমূহেও উল্লিখিত হইয়াছে (দ্র. যোহন, ৮ ঃ ৩৮-৪৭)।

এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ) ব্যাখ্যা করেন যে, তাহাদের এই রাজ্য এবং আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচন যাহা তাহারা দাবি করিতেছে অচিরেই তাহা হস্তচ্যুত হইবে তাহাদেরই কর্মফল স্বরূপ। ঈসা (আ) বলিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, তোমাদের নিকট হইতে ঈশ্বরের রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হইবে, যে জাতি তাহার ফল দিবে (মথি, ২১ ঃ ৪৩)।

এইভাবে তিনি তাহাদের দম্ভ হ্রাস করিয়া সঠিক পথের সন্ধান দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত উপস্থাপনার আরও কয়েকটি কৌশলগত দিক রহিয়াছে যাহা তাহার শিক্ষার মূলে নিহিত। তন্মধ্যে ঃ

(১) বাহ্যিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার উপর নির্ভর না করিয়া শরীআতের মূল চেতনা আকড়াইয়া ধরা এবং তাহার বিধিবিধান নিষ্ঠার সহিত পালন করা।

(২) আখেরাতের জিন্দিগীর পুনরুজ্জীবিত করা।

(৩) তাকওয়ার অনুভূতি হৃদয়মূলে সুদৃঢ় করিয়া দেওয়া।

(৪) ইয়াহূদীদিগকে বস্তুবাদী হইতে ফিরাইয়া বেহেশ্তী জিন্দেগীরমুখী করা।

(৫) ইসরাঈলী সামাজে অবহেলিত ও নির্যাতিত ব্যক্তিদের গুরুত্ব পুনরুদ্ধার করা।

(৬) হতাশাগ্রস্ত, বিপদগ্রস্ত এবং পীড়িতদের সাহায্য করা।

(৭) তাহার দাওয়াতকে পূর্ববর্তী দাওয়াতের সহিত সম্পর্কিত করা এবং সত্যায়ন করা।

(৮) আধ্যাত্মিক আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা।

(১০) দাওয়াত দানকারীর জন্য নিজেকে সমস্ত সন্দেহের উর্ধ্বে রাখা।

(১১) তাঁহার অবর্তমানে অনুসারিগণ যাহাতে হতাশ ও নিরাশ হইয়া না পড়ে, সেইজন্য পরবর্তী পয়গম্বরের সুসংবাদ দান।

মোটকথা, হযরত ঈস্া (আ) তাঁহার দাওয়াত উপস্থাপনে উপরিউক্ত কৌশলগত নীতিসমূহ অবলম্বন করিতেন। তাঁহার দাওয়াতের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল ভ্রাম্যমাণতা। তিনি নির্দিষ্ট কোন স্থানে বাস না করিয়া গ্রাম গঞ্জে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লোকজনকে নসীহত করিতেন, শিক্ষা দিতেন, আসমানী রাজ্যের সুসংবাদ দিতেন। তিনি তাঁহার স্বল্পকালীন নবুওয়াতী জীবনে সুদূরপ্রসারী

পরিকল্পনায় এমন এক দল সহচর বা হাওয়ারী তৈয়ারি করিয়া গিয়াছিলেন যাহারা তাঁহার শিক্ষা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ইয়াহূদী ষড়যন্ত্র ও রোমানদের অত্যাচারের মুখেও তাহার দাওয়াত থামিয়া থাকে নাই, যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোপনীয়ভাবে চলমান ছিল। হযরত ঈসা (আ)-এর পক্ষ হইতে যে দৃঢ়তা তাঁহার সাথীরা লাভ করিয়াছিলেন, শত বাধার মুখেও তাহা পরিত্যাগ করেন নাই। অতএব হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত স্বল্পকালীন হইলেও তাহার প্রভাব ছিল সুগভীর ও সুদূর প্রসারী।

ঈসা (আ)-এর দা'ওয়াতের পথে নানাবিধ বাধা

হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতে সাধারণ লোক আকৃষ্ট হইয়া গিয়াছিল, যেজন্য তিনি যেখানেই যাইতেন তাঁহার পিছনে অনুসারীদের ঢল নামিত। কিন্তু ইহাতে ধর্ম ব্যবসায়ী কায়েমী স্বার্থবাদী ইয়াহূদী পণ্ডিত ও নেতাদের গাত্রদাহ আরম্ভ হয়। হযরত ঈসা (আ)-ও তাহাদের সেই ভণ্ডামীর জোর সমালোচনা করিতেন। ফলে তাহারা ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করে। হযরত ঈসা (আ) তাহাদেরকে শুধু যুক্তি ও নৈতিকভাবেই নহে, বরং কাজের মাধ্যমেও তাহাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীদের কোন এক ঈদুল ফেসাখের সময় তিনি জেরুসালেম গিয়াছিলেন। তিনি সেখানে দেখিলেন, লোকেরা ইবাদতখানার মধ্যে গরু ভেড়া আর কবুতর বিক্রী করিতেছে এবং টাকা বদল করিয়া দিবার লোকেরাও বসিয়া আছে। এই সমস্ত দেখিয়া তিনি দড়ি দিয়া একটা চাবুক তৈরি করিলেন, আর তাহা দিয়া সমস্ত গরু ভেড়া এবং লোকদেরও সেই জায়গা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, এই জায়গা হইতে সমস্ত কিছু লইয়া যাও। কারণ ইহা আল্লাহর ঘর। আল্লাহর ঘরকে ব্যবসার ঘর করিও না (দ্র. যোহন, ২ ঃ ১৩-১৬)।

উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ব্যবসায় যাহারা জড়িত ছিল তাহাদেরকে ছানদারিন বলা হইত। ইহারা ছিল ইয়াহূদী সমাজে একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা যাহার প্রধান সদস্য ছিল ৭০ জন ধর্মযাজক। যাহারা বানূ ইসরাঈলের মধ্যে তাহাদের আইনগত কর্তৃত্ব ছিল (আহমদ আবদুল ওয়াহাব, আল মাসীহ ফী মাসাদিরিল আকাঈদিল মাসীহিয়্যা, কায়রো, মাকতাবাহ ওয়াহবাহ, মিসর ১৯৭৮ ১৩৯৮ হি., পৃ. ১৫০)।

হযরত ঈসা (আ) যেন ভিমরুলের চাকে হাত দিয়াছিলেন। তাই এই স্বার্থান্বেষী মহল প্রথম হইতেই তাঁহাকে শেষ করিয়া দিয়া তাঁহার তৎপরতা হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। আর তখন হইতেই সৃষ্টি হয় তাঁহার দাওয়াতে নানা ধরনের বাধা। আলূসী উল্লেখ করেন, সহীহ বর্ণনায় আসিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) ইয়াহূদীদের পক্ষ থেকে অনেক ধরনের কষ্ট তথা বিপত্তির সম্মুখীন হইয়াছিলেন (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৭৪)। এই গুলির মধ্যে নিম্নে কয়েকটির দিক আলোচনা করা হইল।

(১) ঈসা (আ)-এর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে রটনা ঃ হযরত ঈসা (আ) জনগণের মাঝে যে সাড়া জাগাইয়াছিলেন এবং প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন উহা নষ্ট করিবার জন্য প্রথমে তাহারা তাঁহার ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে। এই লক্ষ্যে তাহারা কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

(ক) ঈসা (আ)-এর জন্ম সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন ঃ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে, হযরত ঈসা (আ)-এর অলৌকিক জন্মকে প্রথমত ইয়াহূদীরা স্বাভাবিক ভাবে মানিয়া লইতে পারে নাই। তাই তাহারা তাঁহার মাতা সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। কিন্তু ঈসা (আ) মায়ের কোলে শিশু অবস্থায়ই অলৌকিকভাবে কথা বলিয়া মায়ের পবিত্রতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া ইয়াহূদীরা প্রাথমিক অবস্থায় নীরব হইয়া যায়। কিন্তু তাঁহার নবুওয়াত লাভের পর ইয়াহূদী নেতাদের ভণ্ডামীর সমালোচনা করায় জন্মের প্রসঙ্গটি পুনরুজ্জীবিত করে। তাহারা লোকমুখে প্রচার করিতে থাকে যে, ঈসা অবৈধ পন্থায় জন্মলাভ করিয়াছেন (নাউযুবিল্লাহ)। এই প্রসঙ্গে আল-কুরআনেও বলা হয় ঃ

وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ـ

"এবং তাহারা অভিশপ্ত হইয়াছিল তাহাদের কুফরীর জন্য ও মারয়ামের বিরুদ্ধে গুরুতর অপবাদের জন্য" (৪ ঃ ১৫৬)।

(খ) যাদুকর হওয়ার অপবাদ ঃ ঈসা (আ)-এর মু'জিযা দেখিয়া ইয়াহূদীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে যে, তিনি একজন যাদুকর। এ বিষয়টি আল-কুরআনে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে ঃ "পরে সে (ঈসা) যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ উহাদিগের নিকট আসিল উহারা বলিতে লাগিল ইহা তো এক স্পষ্ট যাদু" (৬১ ঃ ৬)। তালমুদসহ ইয়াহূদীদের প্রাচীন গ্রন্থাবলীতেও ঈসা (আ)-এর পরিচয়ে লেখা হইয়াছে যে, তিনি ছিলেন একজন যাদুকর (দি নিউ ইনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, প্রাগুক্ত, তাফসীরে মাজেদী, ২খ, পৃ. ৬৬০)।

(গ) পাগল আখ্যায়িত করা ঃ মার্ক সুসমাচারে আসিয়াছে যে, নাসরতের যাহারা তাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ঈসা (আ)-এর নিকটআত্মীয় কয়েকজনও ছিল। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে পাগল বলিয়া আখ্যা দিয়াছিল। তাহাদের ধারণামতে ঈসা পাগল হইয়া গিয়াছেন (দ্র. মার্ক সুসমাচার, ৩ ঃ ২১)।

(ঘ) ঈসা (আ)-কে ভূতের আছরগ্রস্ত আখ্যায়িত করা ঃ ইয়াহূদীদের ধর্মীয় নেতারা তাঁহার নামে প্রচার করিতে থাকে যে, ঈসার উপর ভূত সওয়ার হইয়াছে (দ্র. মার্ক, ৩ ঃ ২৪-৩০)।

(ঙ) পৌত্তলিক ও মুরতাদ আখ্যায়িত করা ঃ ইয়াহূদীদের ধর্মগ্রন্থ তালমুদে আসিয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) ইয়াহূদী ধর্ম পরিত্যাগ করায় মুরতাদ হইয়া যান এবং মূর্তিপূজা করেন (ডঃ রূহাঞ্জ, আল-কানজুল মারসূদ ফি কাওয়ায়িদিত তালমুদ, পৃ. ৬৯)।

(২) অসদুদ্দেশ্যে মু'জিযা প্রদর্শনের আবদার ঃ অধিকাংশ মুফাসসিরীনের মতে হযরত ঈসা (আ) যখন নবুওয়াত দাবি করিলেন এবং বিভিন্ন অলৌকিক নিদর্শন প্রকাশ করিতে লাগিলেন

তখন বনূ ইসরাঈলীরা একগুয়েমী প্রদর্শন করিতে শুরু করিল। সাথে সাথে কিভাবে তাঁহাকে অপছন্দ করা যায় তাহার ফন্দি ফিকির করিতে থাকে। যাহাই হউক, একবার তাহারা ঈসা (আ)-কে অপ্রস্তুত করিবার জন্য বলিল, আপনি আমাদেরকে একটি বাঁদুড় পাখি তৈরি করিয়া দেন। তখন ঈসা (আ) তাহাদের জন্য সেই পাখি আল্লাহ্র অনুমোদনক্রমে সৃষ্টি করিয়াছিলেন (রাযী, প্রাগুক্ত, ৭খ, পৃ. ৫৯; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৬৮)।

বর্তমান প্রচলিত সুসমাচারসমূহেও দেখা যায়, ইয়াহূদীরা বিশেষত ফরীশীরা হযরত ঈসা (আ)-এর অনেক মু'জিযা দেখার পরও মু'জিযা তলব করিত, যেজন্য তিনি তাহাদের উদ্দেশে বলিয়াছিলেনঃ "তোমরা আকাশের লক্ষণ বুঝিতে পার, কিন্তু কালের চিহ্ন সকল বুঝিতে পার না। এই কালের দুষ্ট ও ব্যভিচারী লোকেরা চিহ্নের অন্বেষণ করে" (মথি, ১৬ ঃ ৩-৪)।

(৩) ঠাট্টা-বিদ্রূপ ঃ ইবন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত যে, ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে একত্র হইত এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করিত। তাহারা তাঁহাকে বলিত, হে ঈসা! অমুক গত রাত্রে কি ভক্ষণ করিয়াছে আর তাহার বাড়িতে আগামী দিনের জন্য কি সঞ্চয় করিয়াছে? তখন হযরত ঈসা (আ) তাহাদেরকে সেই ব্যাপারে সংবাদ প্রদান করিতেন। আর উহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপে মত্ত হইত। এইভাবে অনেকক্ষণ চলিত (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪)।

(৪) দম্ভ প্রদর্শন ঃ এমনিভাবে হযরত ঈসা (আ) কোন মু'জিযা বা কোন যুক্তি প্রদর্শন করিলে মূল বিষয়ে না যাইয়া ফরিশীরা শুধু ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়াই ক্ষান্ত হইত না, বরং তাহারা দম্ভ প্রদর্শন ও গালিগালাজ করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিত না। যেমন বার্ণাবাসের বাইবেলে উল্লেখ আছে যে, ইয়াহূদীদের প্রধান রাব্বির সঙ্গে ঈসা (আ)-এর এক বিতর্ক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ইহাতে পরাজয় বরণ করে। তখন প্রধান রাব্বি বলিল, "এখন আমরা বুঝতে পারিয়াছি আপনার কাঁধের ওপর শয়তান সওয়ার হইয়াছে; আর আপনি একজন সুমেরীয়, আল্লাহর মনোনীত প্রধান রাব্বির প্রতি আপনার কোনো সম্ভ্রমবোধ নাই" (বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ২৪৬)।

(৫) প্রকাশ্যে কুফুরী ঘোষণা ঃ হযরত ঈসা (আ) যখন তাঁহার দাওয়াত পেশ করেন তখন ইয়াহূদীরা সদম্ভে উহা প্রত্যাখ্যান করে এবং প্রকাশ্যে কুফুরী ঘোষণা করে। আল-কুরআনে এই ধরনের একটি তথ্য স্পষ্টভাবেই আসিয়াছে ঃ

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِيْ إِلَى اللّٰهِ .

"যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন বলিল, আল্লাহ্র পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী" (৩ ঃ ৫২)?

আল্লামা তাবারী বলেন, এই আয়াতের অর্থ হইল, আল্লাহ তা'আলা যাহাদের নিকট হযরত ঈসা (আ)-কে পাঠাইয়াছিলেন, সেই বনূ ইসরাঈলের পক্ষ হইতে যখন নবুওয়াতের অস্বীকৃতি, তাঁহার বক্তব্য প্রত্যাখ্যানের মনোভাব দেখিতে পাইলেন এবং আল্লাহ্র পথে আহবানে তাহাদের পক্ষ হইতে বাধার সম্মুখীন হইলেন তখন তিনি বলিলেন, আল্লাহ্র পথে আমার সাহায্যকারী কে আছ? অর্থাৎ

আল্লাহ্র প্রমাণ প্রত্যাখ্যানকারী ও তাঁহার নবীর নবুওয়াতের অস্বীকারকারী লোকদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাথে আমার সাহায্যকারী কে আছে (তাফসীরে তাবারী, ৫খ , পৃ. ৪১০)।

উহা হইতে বুঝা যায় যে, ইয়াহূদীদের দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতকে মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করার পন্থাটি ছিল গুরুতর। তাহারা প্রকাশ্যে কুফুরীর ঘোষণা দিয়া বেড়াইত।

(৬) পাথর নিক্ষেপ ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত প্রত্যাখ্যানকারীরা বিভিন্ন শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে ও পাথরের আঘাতে ঈসা (আ)-কে রক্ত রঞ্জিত করিয়া দেওয়ার চেষ্ট করিত। বার্ণাবাসের বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রধান রাব্বী পরাজয় বরণ করার পর হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি গোস্বায় ফাটিয়া পড়িল এবং বিকট চিৎকার করিয়া বলিল, "পাথর মারো এই বেঈমান লোকটিকে। সে আসলে একটা ইসমাঈলী, আর সে মূসার নিন্দা করে এবং আল্লাহ্র আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে (বার্ণাবাসের বাইবেল, পৃ. ২৪৮)।

তাফসীরে মাজেদীতে উল্লেখ আছে যে, তখন তাঁহার উপর ছুড়িয়া মারার জন্য পাথর তুলিয়া লইল, কিন্তু যীশু অন্তর্হিত হইলেন ও ধর্মধাম হইতে বাহিরে গেলেন" (যোহন, ৮ ঃ ৫৯)। আরও বলা হয়, "তাহারা আবার তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তাহাদের হাত এড়াইয়া বাহির হইয়া গেলেন" (যোহন, ১০ ঃ ৩৯; তাফসীরে, মাজেদী, খ. ২, পৃ. ৬৫৯)।

(৭) জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত করা ঃ ইবন জারীর তাবারী সূদ্দী হইতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর নিদের্শমত দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করিলে তাঁহার প্রতি ইসরাঈলীরা বিক্ষুব্ধ হইল এবং তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিল। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার মাতা স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়া দেশে দেশে ঘুরিতে থাকেন (তাফসীরে তাবারী , ৫খ, পৃ. ৪১০)। হযরত ঈসা (আ) দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, নিজের গ্রাম ও নিজের বাড়ি ছাড়া সমস্ত জায়গাতেই নবীরা সম্মান পান (মথি, ১৩ ঃ ৫৭)।

(৮) শয়তান কর্তৃক প্ররোচনা ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের ক্ষেত্রে আরেকটি বাঁধা ছিল শয়তান কর্তৃক প্ররোচনা। ইবন কাছীর বর্ণনা করেন যে, হযরত ঈসা (আ) বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করেন। সেখানে হইতে ফিরিবার পথে যখন তিনি এক গিরিপথে ছিলেন তখন শয়তান তাঁহাকে আটকাইয়া বিভিন্ন প্রস্তাব দেওয়া শুরু করিল এবং বলিল, হে ঈসা! আপনার খোদার বান্দা হওয়া উচিত নহে। শয়তান এই বক্তব্য দ্বারা বারবার পীড়াপীড়ি করিবার পর আল্লাহর কাছে সাহায্য চাহিলেন। তখন জিবরাঈল ও মীকাঈল আসিলেন আর দেখিলেন, ইবলীস তাহাকে পথে আটকাইয়া রাখিয়াছে। তখন জিবরাঈল (আ) তাহার দুই ডানা দ্বারা ইবলীসকে এক উপত্যকায় নিক্ষেপ করিলেন। তখন আবার শয়তান তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিল এবং ঈসাকে বলিতে লাগিল, আমি একটু আগেই আপনাকে সংবাদ দিলাম যে, আপনি একজন বান্দা হওয়া সমীচীন নহে, আর আপনি ক্রোধান্বিত হইলেন। আর এই ক্রোধ কোন বান্দার ক্রোধ হইতে পারে না। কারণ আপনি রাগ করার সময় কি অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল তাহা তো আপনি দেখিলেন। তাই আমি আপনাকে একটি বিষয়ে আহ্বান করিব। তাহা হইল, আপনার জন্য আমি শয়তানদেরকে আদেশ করিব এবং তাহারা

আপনার অনুসরণ করিবে। অতঃপর লোকজন যখন দেখিবে শয়তানরা আপনার অনুসরণ করিতেছে তখন তাহারা আপনার ইবাদত করিবে। আর আমি ইহা বলিতেছি না যে, আপনি একাই ইলাহ, আপনার সাথে আর কোন ইলাহ নাই; বরং আল্লাহ হইবেন আসমানে ইলাহ, আপনি হইবেন যমীনে ইলাহ। ঈসা (আ) আল্লাহর সাহায্য চাহিলেন। তখন ঈসরাফীল (আ), জিবরাঈল ও মীকাঈল (আ) তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। আর ইবলীসও ঐ প্ররোচনা হইতে বিরত হইল (ইব্‌ন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৭৪-৭৫)। মথি সুসমাচারেও এই মর্মের একটি ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. মথি, ৩ ঃ ৬-১২)।

(৯) অনুসারীদেরকে বাধা দেওয়া ঃ যখন হাজার হাজার লোক হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসরণ করিতে শুরু করিল তখন ইয়াহূদী ধর্মীয় নেতারা হিংসা-বিদ্বেষে, ক্ষোভে-ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া গেল। তাহারা তখন শুধু হযরত ঈসা (আ)-কেই বাধা দেয় নাই, বরং তাঁহার অনুসারীদেরকেও বাধা দিয়াছিল। যোহন সুসমাচারে আসিয়াছে যে, ইয়াহূদী নেতারা আগেই ঠিক করিয়াছিল যে, কেহ যদি ঈসাকে মসীহ্ বলিয়া স্বীকার করে তবে তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে (যোহন, ৯ ঃ ২২)।

এই তথ্য প্রমাণ করে যে, ইয়াহূদী সন্ত্রাসীরা জনমনে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল, যেন তাহারা ঈসা (আ)-এর অনুসরণ করিতে সাহস না পায়। তাহারা আল্লাহ্‌র রাস্তায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছিল। তাই ইয়াহূদীদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۔

"ভাল ভাল যাহা ইয়াহূদীদের জন্য বৈধ ছিল তাহা উহাদের জন্য অবৈধ করিয়াছি— তাহাদের সীমালংঘনের জন্য এবং আল্লাহ্‌র পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য" (৪ ঃ ১৬০)।

(১০) হত্যার ষড়যন্ত্র ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াত চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইয়াহূদীরা দেখিল যে, কোনভাবেই ঈসা (আ)-কে দাওয়াতী কাজ হইতে বিরত করা যাইতেছে না। তখন তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলার ষড়যন্ত্র করে। এই লক্ষ্যে প্রথমে তাহারা গোপন বৈঠক করে। মথি সুসমাচারে আসিয়াছে, সেই সময় মহা ইমাম কাইয়াফার বাড়ীতে প্রধান ইমামেরা ও ইয়াহূদীদের বৃদ্ধ নেতারা একত্র হইল এবং ঈসা (আ)-কে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিবার ষড়যন্ত্র করিল (দ্র. মথি, ২৬ ঃ ৩-৪)।

এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে তাহারা গোয়েন্দা নিয়োগ করে, তাঁহাকে বিভিন্ন লোভ দেখাইয়া আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। মথি সুসমাচারে আসিয়াছে ঃ তখন সেই বারজন হাওয়ারীর মধ্যে এহুদা ইস্কারিয়োৎ নামের ব্যক্তিটি প্রধান ইমামের নিকট গিয়া বলিল, 'ঈসাকে আপনাদের হাতে ধরাইয়া দিলে আপনারা আমাকে দিবেন। প্রধান ইমামেরা তিরিশটা রূপার টাকা গুনিয়া দিল তাহাকে। তাহার পর হইতেই এহুদা ঈসাকে ধরাইয়া দিবার জন্য সুযোগ খুঁজিতে লাগিল (দ্র. মথি, ২৬ ঃ ২৪-১৬)।

এই ক্ষেত্রে তৃতীয় পদক্ষেপ হিসাবে তাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে গ্রেফতার করার জন্য চেষ্টা চালায়। বারবার এই প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। হযরত ঈসা (আ) এই বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হইতে অবহিত হইয়াছিলেন, যেজন্য বারবার তিনি তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে ঐ ব্যাপারে আগাম খবর বলিয়াছিলেন। যাহাই হউক, এই দুনিয়ায় তাঁহার নবুওয়াতের শেষ সময়ে তিনি গৎসেমানি বাগানে একটা জায়গায় তাঁহার সাথীবৃন্দসহ রাত্রে আশ্রয় লইলেন। সেই সময়ে পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে ইয়াহূদা আসখারিয়ুতী রোমান সৈন্যদেরকে লইয়া ছোরা ও লাঠিসহ হযরত ঈসা (আ)-এর অবস্থান স্থলে পৌঁছিয়া গেল। সুসমাচারের বর্ণনানুসারে তাহাদের আগমন সম্পর্কে হযরত ঈসা (আ) আগেই টের পাইয়া গিয়াছিলেন। তাই তাঁহার সাথীবর্গ ঘুমাইয়া গেলেও তিনি তাহাদের মধ্যে পিতর, জেমস ও যোহনকে লইয়া কিছুটা জাগ্রত ছিলেন। পরে তিনি কিছু দূরে গিয়া মাটিতে সিজদায় পড়িয়া আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন এবং আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষার জন্য আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চাহিলেন (দ্র. মথি, ২৬ ঃ ৩৬-৩৯)।

পরে তিনি তাঁহার সাথীবর্গের কাছে ফিরিয়া আসিলেন। আবার মুনাজাত করিতে লাগিলেন। ইয়াহূদা পূর্বেই সৈনিকদেরকে বুঝাইয়া আনিয়াছিল যে, আমি সেখানে গিয়া যাহাকে চুম্বন দিব তিনিই ঈসা। আর ইয়াহূদা সেখানে আসিয়া তাহাই করিল। বাইবেলের বর্ণনামতে সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকরা আসিয়া তাহাকে ধরিল।

এই ক্ষেত্রে চতুর্থ পদক্ষেপ হিসাবে ঈসাকে গ্রেফতার করার পর ইয়াহূদী মহাসভার সামনে তাঁহার বিচার নাটকের আয়োজন করা হয় এবং এক পর্যায়ে তাহারা ঈসার বিচারের জন্য তথা হত্যা করার সিদ্ধান্ত লইয়াই রোমীয় শাসনকর্তা পীলাতের হাতে তাঁহাকে সমর্পণ করে। বার্ণাবাসের বাইবেলের বর্ণনা অনুসারে, জুদানসহ সেনাবাহিনী যখন হযরত ঈসা (আ)-এর আস্তানায় পৌঁছিল তখন লোকের সমাগম অনুভব করিয়া ঈসা (আ) ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢুকিলেন। তখনি আল্লাহ পাক তাঁহাকে ফেরেশতাদের মাধ্যমে সেই ঘর হইতে আসমানে তুলিয়া নেন এবং ঈসা (আ)-এর চেহারায় বিশ্বাসঘাতক জুদাস তথা ইয়াহূদার রূপান্তর ঘটে। আর সৈন্যরা তাহাকে গ্রেফতার করে (বার্ণাবাসের বাইবেল, অধ্যায় নং ২১৫-২১৬, পৃ. ২৫৪-২৫৫)। যাহাই হউক, সৈন্যদের কর্তৃক গ্রেফতার নাটক হইতে ইয়াহূদী মহাসভার সামনে বিচারকার্য এবং পরবর্তীতে পিলাতের হাতে হস্তান্তর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে হযরত ঈসা (আ)-কে উত্তোলন করা হইতে পারে। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

হাওয়ারীগণের বিবরণ

হযরত ঈসা (আ) তাঁহার স্বল্পকালীন দাওয়াতী পরিক্রমার এক ক্রান্তিলগ্নে তাঁহার কিছু সার্বক্ষণিক সহযাত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিবর্গই ঈসা (আ)-এর হাওয়ারী। এই হাওয়ারীগণ সম্পর্কে আল-কুরআনেও প্রচুর প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহাদের ঈমানের দৃঢ়তা, সাহায্য-সহযোগিতা ও স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের নাম-ধামসহ সার্বিক পরিচয় বর্ণিত হয় নাই। তবে তাফসীর গ্রন্থসমূহে আয়াত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাঁহাদের

কিছু কিছু পরিচয় তুলিয়া ধরা হয়। বাইবেলেও এই সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। নিম্নে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলিয়া ধরা হইল ঃ

হাওয়ারীগণের নামকরণ ও পরিচয় ঃ حوارى শব্দটি আরবী حور ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। একবচনে حوارى এবং বহুবচনে حواريون ব্যবহৃত হয়। আল্লামা কুরতুবীর মতে حور শব্দের অর্থ হইল ধবধবে সাদা। احوار। অর্থাৎ أبيض বা অধিক স্বচ্ছ (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৯৮)। কোন কোন অভিধান প্রণেতা বলিয়াছেন যে, حوارى শব্দটি حار শব্দ হতে নিষ্পন্ন। ইহার শাব্দিক অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। এই অর্থে আল-কুরআনে আসিয়াছে ঃ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ "সে তো ভাবিত যে, সে কখনও ফিরিয়া যাইবে না" (৮৪ঃ ১৪) (রূহুল মা'আনী, প্রাগুক্ত, খ., ৩, পৃ. ১৭৬)।

মুফাস্সির কালবী বলেন, হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর সাথী বা اصحاب ছিলেন (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, খ., ৪, পৃ. ৯৮; রূহুল মা'আনী, প্রাগুক্ত, খ., ৩, পৃ. ১৭৫)। কামূসে বলা হইয়াছে ঃ হাওয়ারী অর্থ সাহায্যকারী বা নবীদের সাহায্যকারী ও খাঁটি বন্ধু। ঈসা (আ)-এর সঙ্গীদের এজন্য হাওয়ারী বলা হয় যে, তাহাদের নিয়ত ছিল খাঁটি। তাহারা ছিলেন তাঁহার সাহায্যকারী। হাসান ও সুফয়ান (র) এইরূপই বলিয়াছেন। ইব্ন জারীর বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা ছিলেন রজক, কাপড় ধুইয়া সাদা করিতেন। দাহ্হাকের মতে, তাহাদের অন্তর গুনাহ হইতে পরিচ্ছন্ন ছিল বিধায় তাহাদেরকে এই নামে অভিহিত করা হইত। ইব্ন মুবারক (র) বলেন ঃ তাহাদের এই নামের কারণ হইল, অত্যধিক ইবাদতের ফলে তাহাদের চেহারা রৌশন এবং নূরানী হইয়া গিয়াছিল; উজ্জ্বল সাদাকে আরবগণ 'হাওর' বলিয়া থাকে।

ইকরিমা (র) বলিয়াছেন যে, হাওয়ারী অর্থ খাঁটি বন্ধু। তাঁহাদের সংখ্যা ছিল বারজন। কাতাদা (র) বলিয়াছেন, হাওয়ারী বলা হয়, যাহারা খিলাফতের যোগ্য। কাতাদা (র) অন্যত্র বলেন, হাওয়ারী অর্থ উযীরবৃন্দ। মুজাহিদ ও সুদ্দী (র) বলিয়াছেন, তাহারা ছিলেন জেলে, মাছ শিকার করিতেন। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহারা ছিলেন মাঝি (তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৩০০)। ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলিয়াছেন, হাওয়ারীদের পরিচিতিমূলক যেসব অভিমত আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তন্মধ্যে তাহাদের অভিমত যথার্থ যাহারা বলেন, হাওয়ারীর অর্থ রজক বা ধোপা, যেহেতু তাহারা কাপড় ধৌত করিতেন। তারপর হযরত ঈসা (আ)-এর সংগীরূপে থাকা এবং তাঁহার বন্ধু ও সাহায্যকারী মনোনীত হওয়ায় তাহারা এই নামেই পরিচিত হন (তাফসীরে তাবারী, প্রাগুক্ত, খ., ৫, পৃ. ৪১৫-৪১৬)।

কাফফাল-এর মতে, ১২ জন হাওয়ারীর কেহ বাদশাহ ছিলেন, কেহ মৎস্যজীবী, কেহ বা ধোপা, আবার কেহ বা রঙ-এর কাজ করিতেন। প্রত্যেককেই হাওয়ারী বলা হয়। কেননা তাহারা সকলেই হযরত ঈসা (আ)-কে একনিষ্ঠভাবে ভালোবাসিতেন এবং আনুগত্য সহকারে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন (হাশিয়া জালালায়ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২)।

প্রকৃত অর্থে হাওয়ারী মানে সাহায্যকারী। তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর সাহায্যকারী ছিলেন। এই সম্পর্কে সহীহায়নের হাদীছে আসিয়াছে — জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) বলিয়াছেন, খন্দকের

যুদ্ধে হুজুর পাক (স) লোকদেরকে ডাকেন। তখন একমাত্র যুবায়র (রা)-ই তাঁহার ডাকে সাড়া দেন। এইরূপে তিনবারই তিনি তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। অতঃপর হুযুর পাক (স) বলেন, প্রত্যেক নবীর জন্যই হাওয়ারী (সাহায্যকারী) রহিয়াছে আর আমার হাওয়ারী (সাহায্যকারী) হইল যুবায়র (আল্লামা আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৫; দ্র. মাআরেফুল কুরআন, (সংক্ষিপ্ত) পৃ. ১৭৬; বুখারী, কিতাবুল জিহাদ, পৃ. ২০৪)।

ইবন সায়্যিদ বলেন, যে সকল ব্যক্তি কাহাকেও অধিক মাত্রায় সাহায্য করে, তাহাকেও ঐ ব্যক্তির হাওয়ারী বলা হইয়া থাকে (ইব্ন মানজূর, লিসানুল আরাব, মাদ্দাহ حور)। কেহ কেহ উল্লেখ করেন যে, হাওয়ারী হিব্রু শব্দ 'হাবারী' (حبارى) হইতে উদ্ভূত যাহার অর্থ পণ্ডিত, জ্ঞানগরিমায় মহিমান্বিত (ইব্ন আশূর, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ৩৫৩)। কোন কোন মুফাস্সির মনে করেন যে, حوارى অর্থ মুজাহিদ, যেহেতু পবিত্র কুরআনে তাহাদের উল্লেখের পরপরই বিজয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হইয়াছে —

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ ٠

"শিষ্যগণ বলিয়াছিল, আমরাই তো আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানূ ইস্রাঈলদিগের একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফরী করিল। পরে আমি মুমিনদিগকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদিগের শত্রুদের মুকাবিলায়; ফলে তাহারা বিজয়ী হইল" (৬১ : ১৪)।

ইবন কাছীর উল্লেখ করেন যে, মুজাহিদ অর্থ নেওয়া সঠিক নহে, বরং এখানে আল্লাহ্র সাহায্য বলিতে দলীল-প্রমাণ ও আল্লাহর কলেমাকে বুলন্দ করার দ্বারা সাহায্য বুঝানো হইয়াছে। তবে উপরিউক্ত জিহাদ বলিতে যদি নফসের সাথে জিহাদ অর্থ লওয়া হয় তাহা হইলে আর কোন প্রশ্ন থাকে না। কারণ হাওয়ারীগণ এই ধরনের জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিয়াছিলেন।

হাওয়ারীদের সংখ্যা : অধিকাংশ আলিমের মতে হাওয়ারীদের সংখ্যা ছিল ১২ জন (বায়দাবী, ২খ, পৃ. ৩৬৫; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ., ১৭৫)। প্রচলিত চারটি সুসমাচারসহ বার্ণাবাসের সুসমাচারেও একই সংখ্যার উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র. মথি, ১০ : ৫-৯; মার্ক, ৬ : ৭-১৬; লূক, ৯ : ১-৬; বার্ণাবাসের বাইবেল, অধ্যায় নং ১৪, পৃ. ১৩)। অপর এক বর্ণনায় এই সংখ্যা উনিশ ছিল বলিয়াও উল্লেখ আছে (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৭৬; তাবারী, তাফসীর, ৫খ, পৃ. ৪১৮)। তবে প্রথমোক্ত মতটিই প্রসিদ্ধ।

হাওয়ারীগণের নাম : মথি সুসমাচারের বর্ণনামতে, তাহাদের নামে ছিল নিম্নরূপ—প্রথম শিমান, যাহাকে পিতর বলে, এবং তাহার ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিবদিয়ে পুত্র যাকোব এবং তাহার ভ্রাতা যোহন, ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও করগ্রাহী মথি, আলফেয়ার পুত্র যাকোব ও যদ্দেয়, কানানী শিমোন এবং ঈষ্কারিয়োতীয় যিহুদা (মথি, ১০ : ২-৫; মার্ক ৩ : ১৬-১৯; লূক, ৬ : ১৪-১৬)। মার্কে সামান্য শাব্দিক পরিবর্তনসহ নামগুলির উল্লেখ রহিয়াছে।

আল্লামা ইবন হাযম উল্লেখ করেন যে, খৃস্টানগণ যাহাদেরকে হাওয়ারী বলে তাহারা ঈমানদার ছিল না, বরং তাহারা ছিল মিথ্যাবাদী কাফির। কেননা তাহারা মসীহকে ইলাহ বলিয়া বিশ্বাস করিত। কোন কোন মুফাসসির বলেন যে, ঈসা (আ)-এর পর হাওয়ারীগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল তাহাদের ঈমানের উপর টিকিয়া থাকে এবং আরেকদল তাহাদের ঈমান হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। তাহারা আল-কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি উল্লেখ করেন ঃ

قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّائِفَةٌ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظَاهِرِيْنَ .

"শিষ্যগণ বলিয়াছিল, আমরাই তো আল্লাহ্র পথে সাহায্যকারী। অতঃপর বানূ ইসরাঈলদিগের মধ্যে একদল ঈমান আনিল এবং একদল কুফুরী করিল। পরে আমি মুমিনদেরকে শক্তিশালী করিলাম তাহাদিগের শত্রুদিগের মুকাবিলায়, ফলে তাহারা বিজয়ী হইল" (৬১ ঃ ১৪)।

পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে যে, বর্তমান সুসমাচারগুলির মধ্যে যেইগুলিকে হাওয়ারীদের নামে সম্পর্কিত করা হয়, সেইগুলি তাহাদের রচিত নয় বরং পরবর্তীতে অন্যরা লিখিয়া তাহাদের নাম ব্যবহার করে মাত্র। তাই যোহন ও মথি সুসমাচারে কোন ভুল থাকিলে যোহন ও মথি দুই হাওয়ারীকে দোষারোপ করা যথাযথ হইবে না। তবে তাহাদের সুসমাচারে আসা নামগুলিতে কিছু অস্পষ্টতা বিদ্যমান। লূক লিখিত প্রেরিতদের কার্যাবলী বিবরণীতে দেখা যায় যে, ১২ জন হাওয়ারীর মধ্যে এহুদা বিশ্বাসঘাতক হিসাবে মারা যাওয়ার পর ১২ জন পূর্ণ করিতে ঈসা (আ)-এর উত্তোলনের পর হাওয়ারীগণ মত্তথীয় ও যোসেফ (বার্ণাবাস)-এর মধ্যে লটারী করেন, সেইখানে মত্তথিয়ের নাম উঠিল। তখন তিনি হাওয়ারী হইয়া যান, আর বার্ণাবাস বাদ পড়িয়া যান (প্রেরিত, ১ ঃ ২৩-২৬)।

১. হযরত ঈসা (আ)-এর জীবদ্দশায়

হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ) পৃথিবীতে থাকা অবস্থায় নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করিয়াছিলেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী ও মুহাল্লী জালালায়ন শরীফে লিখিয়াছেন, তাঁহারা ছিলেন ঈসা (আ)-এর প্রতি সর্বপ্রথম ঈমান আনয়নকারী (তাফসীরে জালালায়ন, সূরা আল ইমরান, পৃ. ৫২)।

(খ) ঈসা (আ)-কে সহযোগিতা প্রদান ঃ তাঁহারা অধিকাংশ সময় ঈসা (আ)-এর সঙ্গে আল্লাহ্র দীনের প্রচারকার্য চালাইয়া যাইতেন (কাসাসুল কুরআন, হিফজুর রহমান, ৪খ, পৃ. ৭৬)।

(গ) ঈসা (আ)-এর জন্য আত্মোৎসর্গ ঃ হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর হুকুম পালন করিতে গিয়া নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাফসীরে রূহুল মাআনীতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহূদীরা যখন হযরত ঈসা (আ)-কে হত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিল তখন তিনি হাওয়ারীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছে যে বেহেশতে আমার বন্ধু হইবে? তবে শর্ত হইল তাহাকে দুনিয়ায় আমার আকৃতি ধারণ করিয়া শত্রুদের সামনে উপস্থিত হইতে হইবে, অতঃপর

আমার পরিবর্তে তাহাকে হত্যা করা হইবে। হাওয়ারীদের মধ্য হইতে একজন তাঁহার ডাকে সাড়া দিয়াছিলেন। তারপর তাহাকে হত্যা করা হয় এবং ঈসাকে আকাশে উত্তোলন করা হইয়াছিল (আলূসী, ৩ ঃ ৫-এর তাফসীর, পৃ. ১৭৫)।

২. হযরত ঈসা (আ)-এর উর্ধারোহণের পর

হাওয়ারীগণ হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানে উত্তোলনের পরও দীনের প্রচারে লিপ্ত ছিলেন। পবিত্র কুরআনে তাহাদের দাওয়াতী কাজের বর্ণনা বিস্তারিত পাওয়া যায় না, তবে তাহাদের কতিপয় গুণাবলী সম্পর্কে আলোকপাত করা হইয়াছে। যেমন বিনয়-নম্রতা ও দয়ার্দ্রতা ইত্যাদি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً ·

"তাহার অনুসারীদিগের অন্তরে দিয়াছিলাম করুণা ও দয়া" (৫৭ ঃ ২৭)।

তবে খৃস্টানদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা এই দাওয়াতী কাজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট চিঠি পাঠাইয়াছেন, মানুষের সামনে আশ্চর্যজনকভাবে বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন মৃতকে জীবিতকরণ, অন্ধকে চক্ষুদান এবং কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থকরণ (ডঃ আবদুর রহমান আনওয়ারী, প্রাগুক্ত)।

বারজন হাওয়ারীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও কার্যকলাপ

(১) সায়মন (Simon) তিনি নিষ্ঠাবান হাওয়ারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এইজন্য তাহাকে Simon the Zealote-ও বলা হয়। তাঁহার জন্ম গ্রীসের এডসা নামক স্থানে। পশ্চিমাদের নিকট তাঁহার স্মরণ দিবস (Feast day) ২৮ অক্টোবর এবং প্রাচ্যদের নিকট ১৯ জুন। Gospels-এর Mark এবং Matthew পর্বে তাঁহার নাম Kananajos অথবা Cananaean পাওয়া যায়। Luke পর্বে তাঁহাকে The zealot বলা হইয়াছে।

তিনি সম্ভবত মিসরে ধর্ম প্রচার করেন। তারপর পারস্যে Saint judas-দের সাথে মিলিত হন (The new Encyclopaedia Britannica, vil. 10, P. 821)।

নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে যে, Simon এবং Juda পারস্যে ধর্ম প্রচার করিতে গিয়া শহীদ হন। Catholic church-এ ২৮ অক্টোবর এবং Orthodox church-এ ১০ মে তাঁহার ধর্মীয় উৎসব (Feast day) ধার্য করা হইয়াছে (The world book of Encyclopaedia. vol-17, p. 567)।

(২) বার্থলময় (Bartholomew) ঃ মথি, মার্ক ও লূকে শিষ্যদের তালিকায় তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। John-এর Gospel-এ তাঁহাকে যীশুর অনুসারী হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। খৃস্টানদের পরবর্তী ঐতিহ্য অনুসারে বার্থলময় ইন্ডিয়া, ইথিওপিয়া, পারস্য, এশিয়া মাইনর এবং

আর্মেনিয়ায় ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি একটি Gospel লিখিয়াছেন। একটি তথ্য অনুযায়ী তিনি আর্মেনিয়ায় শহীদ হইয়াছিলেন (The world book of Encyclopaedia vol. 2, P. 120)।

Britannica-তে পাওয়া যায় যে, তিনি বর্তমান Dagestan-এর Derbent Albanoplis নামক স্থানে প্রথম খৃস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পারস্য, এশিয়া মাইনর, মেসোপটেমিয়া, তুরস্ক ও আরমেনিয়ায় ধর্ম প্রচার করেন। Babylonian King Aslygcs-এর নির্দেশে চামড়া তুলিয়া তাঁহাকে শহীদ করা হয়। Latin church-এ তাঁহার Feast day ২৪ আগস্ট এবং Greek-দের নিকট ১২ জুন (The new Encyclopaedia Britannica, vol. 1, P. 844)।

(৩) আন্দ্রিয় (Andrew Saint) ঃ তাঁহার জন্ম সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই, তবে মৃত্যু সম্পর্কে উল্লেখ আছে যে, বর্তমান গ্রীসের Patrai নামক স্থানে ৬০/৭০ খৃস্টাব্দে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি র‍্যাশিয়া এবং স্কটল্যান্ডে নিযুক্ত Saint Peter-এর ভাই ছিলেন। মার্ক, ১৩ ঃ ৩-এ বলা হইয়াছে Peter, James, John এবং Andrew ঈসাকে পৃথিবীর শেষ প্রান্তের চিহ্ন রূপ Olives নামক পর্বতে নিয়া যান। তিনি কৃষ্ণ সাগরের নিকটবর্তী স্থানে ধর্ম প্রচার করেন (The new Encyclopaedia Britannica, vol. 1, P. 360)।

The world book of Encyclopaedia-তে আসিয়াছে, Andrew গালীল সাগরের উপকূলীয় গ্রাম Bethsaida-র একজন জেলে ছিলেন। ঈসার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে তিনি Saint John- এর অনুসারী ছিলেন। এশিয়া মাইনর ও গ্রীসে তিনি ধর্ম প্রচার করেন (প্রাগুক্ত vol. 1, P. 457)। পরবর্তীতে তাহার কার্যাবলী কৃষ্ণসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছায়। S.T. Jerame-এর বর্ণনামতে আন্দ্রিয়কে ৩৫৭ খৃ. কনস্টান্টিপোলের রাজার নির্দেশে হত্যা করা হয়। পরবর্তীতে পনের শতাব্দীতে ক্যাথলিক ধর্মগুরুরা তাহার নিদর্শন হিসাবে গ্রীসে একটি স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করেন।

(৪) জেমস (James) ঃ তিনি Zebedee-এর পুত্র ছিলেন। তিনি মহান জেমস নামে পরিচিত। তাঁহার জন্ম সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, তবে তিনি ৪৪ খৃ. ফিলিস্তীনের গ্যালিলিতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ঈসা (আ)-এর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন। বারজন শিষ্যের মধ্যে একমাত্র তাঁহার শাহাদাতের ঘটনা বাইবেলে বর্ণিত হইয়েছে। Judaea-এর রাজা Herod Agrippa-এর নির্দেশে তাঁহার শিরশ্ছেদ করা হয়। তাঁহার স্মরণ দিবস (Feast day) ২৫ জুলাই (The new Encyclopaedia Britannica, vol. 6, P. 485)।

The world book of Encyclopaedia-তে বলা হইয়াছে, খৃস্টীয় ৪০-এর দশকে তাঁহাকে শহীদ করা হয়। পরবর্তী ঐতিহ্য অনুসারে James-এর হাড়গুলি স্পেনের Santiago de compostela তে লইয়া যাওয়া হয়। ফলে শহরটি মধ্যযুগে একটি গুরুত্বপূর্ণ তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হয় (প্রাগুক্ত, vol. 11, P. 27-28)।

(৫) জেমস (James) ঃ তিনি ছিলেন Alpeus- এর পুত্র। তাঁহাকে James of Less-ও বলা হয়। বাইবেলে অন্য এক Mary নামক মহিলার নাম উল্লেখ রহিয়াছে, তিনি James-এর মা

ছিলেন। তিনি পারস্যে মৃত্যুবরণ করেন। পশ্চিমাদের নিকট তাঁহার স্মরণ দিবস ১ মে এবং প্রাচ্যদের নিকট ৯ অক্টোবর (The new Encyclopaedia Britannica, vol. 6, P. 485)।

তাঁহার পরিচয় বর্ণনায় আল-মাওআতুল বারীতানিয়্যাই, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪৮৫-তে উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি ছোট ইয়া'কূব, ইয়াহূদীরা তাঁহার বিষয়ে ষড়যন্ত্র করে এবং তাহাদের মজলিসে ডাকাইয়া নেয়। অতঃপর ৬৩ খৃ. প্রস্তর নিক্ষেপের মাধ্যমে তাঁহাকে হত্যা করা হয় (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬)।

(৬) যোহন (John) : প্রাচীন কালে তাঁহাকে Three letters, the Fourth Gospel and Revelation in the New testament-এর লেখক মনে করা হইত। তিনি Galilean fisherman zebedee-এর পুত্র ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ভাই James ঈসা (আ)-এর প্রথম শিষ্য ছিলেন। তাঁহার মা Salome যীশু খৃষ্টের শিষ্যদের সেবা করিতেন। ২য় শতাব্দীতে Poly crates -এর Ephesus-এর বিশপ দাবি করেন যে, John -এর সমাধিস্থান Ephesus-এ (Ency Britannica, প্রাগুক্ত, vol. 1, P. 241)।

(৭) মথি (Mathew) : মথি যিশুর ১২ জন শিষ্যের অন্যতম। Gospel-এর বর্ণনা মতে মথিকে যখন যীশুর অনুসরণের জন্য ডাকা হয় তখন তিনি একজন কর আদায়কারী ছিলেন। মার্ক এবং লূকে বর্ণিত আছে যে, কর আদায়কারীর নাম ছিল Levi. ঐতিহ্যগতভাবে মথিকে প্রথম Gospel-এর লেখক ধরা হয়, যাহা হিব্রু ভাষায় লিখিত ছিল। অনেক আধুনিক পণ্ডিতের মতে এই Gospel-এর লেখক মথি ছিলেন না এবং তাহা গ্রীক ভাষায় লিখা ছিল। তিনি আফ্রিকা এবং পারস্যে ধর্ম প্রচার করেন। রোমান ক্যাথলিক গীর্জায় মথির স্মরণ দিবস ২১ সেপ্টেম্বর এবং প্রাচ্যের অর্থোডক্স গীর্জায় ১৬ নভেম্বর (প্রাগুক্ত, Encyclopaedia, vol. 13, P. 312)।

(৮) ফিলিপ (Philip) : জেরুসালেমে শীর্ষ খৃস্টান গীর্জায় বাস্তব কার্যাবলী সম্পাদনে সহায়তা করার জন্য তাঁহাকে সাতজন উপ-পুরোহিতের তালিকাভুক্ত করা হয়। ঐতিহ্য অনুসারে তিনি জাদিয়া ও সামিরায় দাওয়াতী কাজ করিয়াছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তুরস্কের ট্রার্লস গীর্জার বিশপ ছিলেন। পশ্চিমা দেশগুলিতে ফিলিপের স্মরণ দিবস ৬ জুন এবং প্রাচ্যের দেশগুলিতে ১১ অক্টোবর (প্রাগুক্ত, Encyclopaedia, vol. 15, P. 371)।

(৯) থমাস (Thomas) : তিনি ১২ জনের অন্যতম। তাঁহাকে প্রায়ই John- এর বেদবাক্যতে উল্লেখ করা হয়। উৎপীড়নের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও থমাস ধর্মদূতদেরকে ঈসার সাথে Judea-তে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ঐতিহ্য অনুযায়ী থমাস পার্থিয়া ও ভারতে ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহাকে ভারতে শহীদ করা হয়। রোমান Catholic Church অনুযায়ী তাঁহার স্মরণীয় দিন ৩ জুলাই এবং প্রাচ্যের গীর্জা অনুযায়ী ২১ মার্চের প্রথম রবিবার (প্রাগুক্ত, Encyclopaedia, vol.

(১০) যিহুদা (Judas) ঃ ৩০ খৃস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। প্রথম যুগে তিনি ঈসা (আ)-এর বিরোধিতার কারণে কুখ্যাত ছিলেন। Judas নামটি সম্ভবত লেটিন Sicarius হইতে আসিয়াছে যাহার অর্থ হত্যাকারী। তাহার পরিবার সন্ত্রাসী ইয়াহূদীদের অন্তর্ভুক্ত। সর্বদাই তিনি ছিলেন ১২ জন হাওয়ারীর অন্যতম। তিনি কোষাধ্যক্ষ ছিলেন (প্রাগুক্ত, Britannica, vol. 6, P. 639)।

(১১) পিটার (Peter) ঃ যীশুর ১২জন শিষ্যের মধ্যে পিটার ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তিনি জেরুসালেমের খৃস্টান সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম Simon, যীশু তাঁহার নাম রাখেন পিটার। তিনি ফিলিস্তীনের Bethsaida নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ স্থানটি জর্ডান নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পিটার গ্যালিলি শহরের নিকটবর্তী শহর কাফার নাউম (Caper naum) চলিয়া যান। সেখানে তিনি মৎস শিকার পেশা গ্রহণ করেন। New testament-এর বর্ণনানুযায়ী পিটার খৃস্টান সম্প্রদায়ের নিকট যীশুর একান্ত বন্ধু এবং অনুসারী হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। খৃস্টানদের ঐতিহ্য অনুসারে পিটার সর্বপ্রথম সিরিয়ায় এবং রোমে বিশপ ছিলেন। সম্ভবত তিনি রোমে ৬৪ থেকে ৬৮ খৃস্টাব্দের মধ্যে শাহাদত বরণ করেন (প্রাগুক্ত, Encyclopaedia, vol-15)।

(১২) বার্ণাবাস ঃ

হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উত্তোলন

হযরত ঈসা (আ)-এর চরম কন্টকাকীর্ণ পরিস্থিতিতে আল্লাহ পাক তাঁহাকে আকাশে উঠাইয়া নেন। হযরত ঈসা (আ)-এর দাওয়াতের মুকাবিলায় বিভিন্ন প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার পরেও যখন সেই দাওয়াতকে ইয়াহূদী সম্প্রদায় স্তব্ধ করিতে পারিল না, তখন হযরত ঈসা (আ)-এর জীবননাশ করিবার জন্যই তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাহারা এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথ অবলম্বন করে। এই লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ধর্মীয় আদালতে তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার ভূয়া অভিযোগ উত্থাপন করিয়া হত্যাযোগ্য অপরাধী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। সেই সময়ে ফিলিস্তীন ও সিরিয়া অঞ্চল রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই ইয়াহূদীরা রোমানদেরকে উত্তেজিত করিয়া ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারী করায়। ইয়াহূদীরা যদিও এই পৌত্তলিক বাদশাহর কর্তৃত্বকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক মনে করিত। কিন্তু হযরত ঈসা মসীহ (আ)-এর বিরুদ্ধে তাহাদের অন্তরে হিংসার আগুন এবং শত শত বৎসরের গোলামীর ফলে সৃষ্ট নীচ মানসিকতা তাহাদিগকে এতটা অন্ধ করিয়াছিল যে, পরিণাম চিন্তা করিয়া পিলাতের দরবারে গিয়া উপস্থিত হইল এবং আরয করিল, "হে রাজন! এই ব্যক্তি কেবল আমাদের জন্যই নহে, বরং রাষ্ট্রের জন্যও একটি বিপদ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে যাইতেছে। যদি অবিলম্বে তাহার মূলোচ্ছেদ না করা হয়, তাহা হইলে আমাদের ধর্মও সঠিক অবস্থায় টিকিয়া থাকিতে পারিবে না এবং আপনার হাত হইতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব চলিয়া যাওয়ারও আশংকা রহিয়াছে। কেননা সে আশ্চর্যজনক ভোজবাজি দেখাইয়া লোকদেরকে নিজের অনুসারী বানাইয়া লইতেছে। জনগণের এই সম্মিলিত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া সে কাইজার এবং আপনাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নিজে বানূ ইসরাঈলের রাজা বনিয়া যাওয়ার জন্য ওঁৎ পাতিয়া আছে। এই ব্যক্তি জনগণকে কেবল বস্তুগত দিক হইতেই পথভ্রষ্ট করে নাই, বরং আমাদের ধর্মকেও পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে। অতএব যত দ্রুত সম্ভব এই ফিতনার মূলোচ্ছেদ করিতে হইবে।

দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর পিলাত হযরত ঈসা (আ)-কে গ্রেফতার করিয়া অপরাধী হিসাবে দরবারে হাযির করিবার জন্য তাহাদের অনুমতি প্রদান করে। বানূ ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ, আলেম ও যাদুকররা এই ফরমান লাভ করিতে পারিয়া যারপরনাই আনন্দিত হয়। তাহারা বলিতে লাগিল, এখন সুযোগের অপেক্ষায় থাকিতে হইবে এবং তাহাকে একাকী ও নিঃসংগ অবস্থায় গ্রেফতার করিতে হইবে যাহাতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হইতে না পারে। যোহন ও মার্ক সুসমাচারে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে (যোহন, ১১ ঃ ৪৭-৫১)। এমনিভাবে মথি ও লূক সুসমাচারেও উক্ত বিষয়টি বর্ণিত হইয়াছে (মথি, ২৬ ঃ ২-৫; লূক, ২২ ঃ ১-২)। হযরত ঈসা (আ) ও তাঁহার হাওয়ারীদের মধ্যে সেই সময়ে যে কথোপকথন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা আল-কুরআনেও উক্ত হইয়াছে ঃ

فَلَمَّا اَحَسَّ عِيْسٰى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ اَنْصَارِىْ إِلَى اللّٰهِ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُوْنَ .....

"যখন ঈসা তাহাদের অবিশ্বাস উপলব্ধি করিল তখন সে বলিল, আল্লাহর পথে কাহারা আমার সাহায্যকারী ? শিষ্যগণ বলিল, আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহে ঈমান আনিয়াছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, তুমি ইহার সাক্ষী থাক। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যাহা অবতীর্ণ করিয়াছ তাহাতে আমরা ঈমান আনিয়াছি এবং আমরা এই রাসূলের অনুসরণ করিয়াছি। সুতরাং আমাদিগকে সাক্ষ্য বহনকারীদের তালিকাভুক্ত কর" (৩ ঃ ৫২-৫৩)।

মাওলানা সিওহারবী উল্লেখ করেন, হযরত ঈসা (আ) এবং তাঁহার দাওয়াত ও তাবলীগের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের হঠকারী তৎপরতা সম্পর্কে বর্ণনার মধ্যে নীতিগতভাবে কোন মতবিরোধ নাই। কিন্তু উহার পরের সমস্ত ঘটনার বিবরণে কুরআন ও বাইবেল সম্পূর্ণরূপে দুই স্বতন্ত্র পথে অগ্রসর হইয়াছে। অবশ্য ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের বর্ণনা একই ধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। শুধু পার্থক্য এতটুকু যে, ইয়াহূদীরা এই ঘটনাকে নিজেদের কীর্তি এবং গৌরবের কারণ মনে করে। আর খৃস্টানরা উহাকে ইয়াহূদীদের একটি ঘৃণ্য ও অভিসম্পাতযোগ্য তৎপরতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে (সিওহারবী, প্রাগুক্ত)।

ইয়াহূদী-খৃস্টান উভয়ের অভিন্ন বর্ণনা এই যে, ইয়াহূদী নেতৃবৃন্দ ও গণৎকাররা জানিতে পারিল যে, এখন যীশুখৃস্ট লোকদের ভীড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিজের সঙ্গিগণকে লইয়া একটি নির্জন বন্ধ ঘরে অবস্থান করিতেছেন। আর উহাই উপযুক্ত সময়। অনতিবিলম্বে ইয়াহূদীরা আস্তানায় পৌছিয়া গেল। তাহারা চতুর্দিক হইতে ঘরটি অবরোধ করিল। ইহার পর কুরআন ও বাইবেলের বর্ণনার সাথে বৈপরীত্য দেখা দেয়। আল-কুরআনের ভাষ্যমতে তখন হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ পাক আকাশে উঠাইয়া নেন। বাইবেলের বর্ণনামতে ইয়াহূদীরা যীশুকে গ্রেফতার করিল এবং অপমান ও তিরস্কার করিতে করিতে রোমান শাসক পিলাতের দরবারে নিয়া হাযির করিল, যাহাতে সে তাহাকে শূলিতে চড়াইতে পারে। পিলাত যদিও তাহাকে নিরপরাধী মনে করিয়া ছাড়িয়া দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু

ইয়াহূদীগের উত্তেজনা ও চাপের মুখে তাহাকে সেনাবাহিনীর লোকদের হাতে সোপর্দ করিতে বাধ্য হইল। সিপাহীরা তাহাকে কন্টকের টুপি পরিধান করাইল, মুখে থুথু নিক্ষেপ করিল, বেত্রাঘাত করিল এবং যাবতীয় উপায়ে তিরস্কার ও অপমান করিল। অতঃপর অপরাধীদের মত শূলীতে লটকাইয়া দিল, উভয় হাতে পেরেক মারিয়া দিল, বর্শার তীক্ষ্ণাগ্র বুকের মধ্যে বিদ্ধ করিল। এই নিরুপায় অবস্থায় তিনি এই বলিতে বলিতে জীবন দিলেন ঃ "এলী এলী লামা সাবাক্তানী" "(ঈশ্বর আমার, ঈশ্বর আমার ঃ তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ)" (মথি, ২৭ ঃ ৪৬)। এইরূপ বর্ণনা মার্ক সুসমাচারেও পেশ করা হইয়াছে (মার্ক, ১৫ ঃ ৩৪)।

মাওলানা সিওহারবী বলেন, কম বেশী সামান্য পার্থক্য সহকারে নূতন নিয়মের অবশিষ্ট তিনটি গ্রন্থেও (মার্ক, লূক, যোহন) এই কল্পিত কাহিনী একইভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। নূতন নিয়মের চারটি বাইবেলের সম্মিলিতভাবে বর্ণিত এই কল্পিত কাহিনী অধ্যয়ন করার পর তাহা মানসপটে স্বাভাবিকভাবেই এই চিত্র অংকন করে যে, চরম অসহায় অবস্থায় এবং নির্মম পন্থায় হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু হইয়াছে। যদিও ইহা আল্লাহ্র প্রিয় এবং পবিত্র বান্দাদের ক্ষেত্রে কোনও আশ্চর্যজনক ব্যাপার ছিল না, বরং আল্লাহ্র নৈকট্য লাভকারী বান্দাদের জন্য অধিকাংশ সময় এই প্রকারের কঠিন পরীক্ষা হইয়া থাকে; কিন্তু ঘটনার আর একটি দিক বাইবেলের বর্ণনাকে দিবালোকের মত কল্পিত এবং মনগড়া বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। তাহা এই যে, হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে যে হতাশা ও অভিযোগের চিত্র ফুটিয়া উঠে তাহা তাঁহার মহান ব্যক্তিত্বের পক্ষে শোভনীয় হইতে পারে না। উপরন্তু ঘটনার আরেকটি দিকও কম আশ্চর্যজনক নহে। তাহা এই যে, নূতন নিয়মের বর্ণনা অনুযায়ী এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ তা'আলার কাছে আবেদন করেন, "হে পিত! যদি সম্ভব হয় তাহা হইলে এই (মৃত্যুর) পিয়ালা আমা হইতে সরাইয়া দেওয়া হউক। যখন এই দোআ কোনক্রমেই কবুল হইল না, তখন নিরাশ হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, যদি উহা পান করা ছাড়া কোন গত্যন্তর না থাকে তাহা হইলে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক" (আল্লামা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃষ্ঠা ৯৩)।

আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, "প্রায়শ্চিত্ত" করার আকীদা অনুযায়ী যখন হযরত ঈসা (আ)-এর এই ঘটনা আল্লাহ এবং তাঁহার পুত্রের (নাউযুবিল্লাহ) মধ্যে চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত ছিল, তখন তাঁহার কাছে আবার নিবেদন করার কি অর্থ হইতে পারে? যদি তাহা সাধারণ প্রকৃতির উপাদানগত কারণে হইয়া থাকে তবে আল্লাহ্র ইচ্ছা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর এবং তাহাতে তুষ্ট হওয়ার পরও অধৈর্য ও হতাশ লোকের মত জীবন দেওয়ারই বা কী কারণ থাকিতে পারে (প্রাগুক্ত)?

খৃস্টানরা যেহেতু ইয়াহূদীদের এই মনগড়া উপাখ্যান গ্রহণ করিয়া লইয়াছে, তাই ইয়াহূদীরা যারপরনাই খুশি হইয়া বলে, যীশুখৃষ্ট যদি "প্রতিশ্রুত মসীহ" হইতেন, তাহা হইলে আল্লাহ তাহাকে অসহায় অবস্থায় আমাদের হাতে তুলিয়া দিতেন না। মোটকথা, খৃস্টানদের হাতে যখন এই মনগড়া অভিযোগের কোন জবাব ছিল না এবং কাহিনীর এই বর্ণনা মানিয়া নেওয়ার পর "প্রায়শ্চিত" করার আকীদারও কোন মূল্য অবশিষ্ট থাকিল না, তখন তাহারা আরও একটি অংশ যুক্ত করিয়া দিল।

যাহাতে ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হওয়া এবং আকাশে উত্তোলিত হওয়ার বর্ণনা রহিয়াছে (দ্র. যোহন, ২০ ঃ ১২-২২)।

"সপ্তাহের প্রথম দিন প্রত্যূষে অন্ধকার থাকিতে থাকিতে মগ্দলীনী মরিয়ম কবরের নিকটে যান, আর দেখেন, কবর হইতে পাথরখানা সরান হইয়াছে। তখন তিনি দৌড়িয়া শিমোন পিতরের নিকট এবং যীশু যাঁহাকে ভালবাসিতেন, সেই অন্য শিষ্যের নিকটে আসিলেন, আর তাঁহাদিগকে বলিলেন, লোকে প্রভুকে কবর হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে কোথায় রাখিয়াছে আমরা জানি না। অতএব পিতর ও সেই অন্য শিষ্য বাহির হইয়া কবরের নিকট যাইতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজন একসঙ্গে দৌড়িলেন, আর সেই অন্য শিষ্য পিতরকে পশ্চাৎ ফেলিয়া অগ্রে কবরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হেঁট হইয়া ভিতরে চাহিয়া দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, তথাপি ভিতরে প্রবেশ করিলেন না। শিমোন পিতরও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন, আর তিনি কবরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন, কাপড়গুলি পড়িয়া রহিয়াছে, আর যে রুমালখানি তাঁহার মস্তকের উপরে ছিল তাহা সেই কাপড়ের সহিত নাই, স্বতন্ত্র এক স্থানে গুটাইয়া রাখা হইয়াছে। পরে সেই অন্য শিষ্য, যিনি কবরের নিকটে প্রথমে আসিয়াছিলেন তিনিও ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং দেখিলেন ও বিশ্বাস করিলেন"।

প্রতিটি ব্যক্তি সামান্য চিন্তা-ভাবনা করিলেই সহজে বুঝিতে পারিবে যে, এই বর্ণনা পূর্ববর্তী বর্ণনার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একেবারেই সম্পর্কহীন। কেননা বর্ণনার প্রথমাংশ এমন এক ব্যক্তির অভিব্যক্তি যাহাকে অসহায়, নিরুপায় ও হতাশ এবং আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হিসাবে দেখা যাইতেছে। আর দ্বিতীয় অংশের বর্ণনায় এমন এক মহান ব্যক্তির সমুজ্জ্বল চেহারা তুলিয়া ধরা হইয়াছে যাহা আল্লাহ্ প্রদত্ত গুণাবলী মণ্ডিত, মহামহিম প্রভুর নৈকট্য লাভকারী এবং আগত ঘটনাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণ শান্ত ও আশ্বস্ত (আল্লামা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃষ্ঠ. ৯৬)।

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, খৃস্টানদের মতে হযরত ঈসা (আ)-কে ইয়াহূদীরা গ্রেপ্তার করে এবং শূলে চড়াইয়া হত্যা করে। আর ঈসা (আ) শত্রুর কবল হইতে মুক্ত না হইতে পারিয়া নিরাশ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু একই সূত্রের বর্ণায় আরও দেখা যায় যে, তিনি পরবর্তীতে আবার জীবিত হইয়া উঠেন এবং সাথীদেরকে সাক্ষাৎ দেন। এমনকি মার্ক ও লূক সুসমাচারে বলা হইয়াছে যে, তাঁহার সাথীদের সাক্ষাতের পর তিনি স্বর্গারোহণ করেন। যেমন ঃ মার্ক সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে, "প্রভু যীশু উর্ধ্বে স্বর্গে গৃহীত হইলেন এবং ঈশ্বরের দক্ষিণে বসিলেন" (মার্ক, ১৬ ঃ ১৯)। লূক সুসমাচারে বর্ণিত হইয়াছে, পরে এইরূপ হইল, তিনি আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তাঁহাদের হইতে পৃথক হইলেন, এবং উর্ধ্বে স্বর্গে নীত হইতে লাগিলেন (লূক, ২৪ ঃ ৫১)।

উপরিউক্ত বর্ণনায় দেখা যায় যে, ঈসা (আ)-কে জীবন্ত অবস্থায় উর্ধ্বে উঠাইয়া নেওয়া হয়। এই ক্ষেত্রে ইসলামও তাহা সমর্থন করে। তবে তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করার পর জীবিত করিয়া উত্তোলনের বিষয়টি ইসলাম সমর্থন করে না। আল-কুরআনে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-কে ইয়াহূদীরা শূলে চড়াইতেও পারে নাই এবং হত্যাও করিতে পারে নাই বরং আল্লাহ

তা'আলা তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়াছেন এবং যাহারা ফাঁসী দেওয়ার দাবি করে, তাহাদের এই দাবিকে আল-কুরআন মিথ্যা ও কল্পনাপ্রসূত বলিয়া আখ্যা দেয়। এই মর্মে বলা হইয়াছে ঃ

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا.

"আর আমরা আল্লাহ্‌র রাসূল মারয়াম তনয় ঈসা মসীহকে হত্যা করিয়াছি, তাহাদের এই উক্তির জন্য (তাহারা অভিশপ্ত)। অথচ তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, ক্রুশবিদ্ধও করে নাই, কিন্তু তাহাদের এইরূপ বিভ্রম হইয়াছিল। যাহারা তাহার সম্বন্ধে মতভেদ করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয় এই সম্বন্ধে সংশয়যুক্ত ছিল; এই সম্পর্কে অনুমানের অনুসরণ ব্যতীত তাহাদের কোন জ্ঞানই ছিল না। ইহা নিশ্চিত যে, তাহারা তাহাকে হত্যা করে নাই, শূলেও চড়ায় নাই, বরং আল্লাহ তাহাকে তাঁহার নিকট তুলিয়া লইয়াছেন এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়" (৪ ঃ ১৫৭-১৫৮)।

আল-কুরআনের বর্ণনামতে বানূ ইসরাঈল আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। কিন্তু মহান আল্লাহর অমোঘ বিধান ছিল এই যে, কোন বিরোধী শক্তিই হযরত ঈসা (আ)-এর নাগাল পাইবে না এবং তিনি তাঁহাকে শত্রুদের যে কোন ষড়যন্ত্র হইতে নিরাপদ রাখিবেন। ফল হইল এই যে, বানূ ইসরাঈল যখন তাঁহাকে অবরোধ করিল তখন তাহারা আল্লাহ্‌র রাসূল হযরত ঈসা (আ)-কে ধরিতে পারিল না এবং পূর্ণ নিরাপত্তা সহকারে তাঁহাকে আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইল। অতঃপর বানূ ইসরাঈলরা যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল তখন পরিস্থিতি তাহাদের কাছে সন্দেহজনক হইয়া দাঁড়াইল। তাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিতে চরমভাবে ব্যর্থ হইল। আর আল্লাহ তা'আলা এইভাবে নিজের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিলেন, যা হযরত ঈসা (আ)-কে রক্ষার জন্য করিয়াছিলেন।

ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, হযরত ঈসা (আ) যখন অনুভব করিলেন, বানূ ইসরাঈলের শত্রুতার মাত্রা এতটা বেশি হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছে, তখন তিনি বিশেষভাবে একটি ঘরে নিজের হাওয়ারীগণকে একত্র করিলেন এবং তাহাদের সামনে পরিস্থিতির চিত্র তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, পরীক্ষার কঠিন মুহূর্ত সমাগত। সময় আসিয়া গিয়াছে, সত্যকে বিলীন করিয়া দেওয়ার ষড়যন্ত্র পূর্ণ শক্তি লাভ করিয়াছে। এখন আমি তোমাদের মধ্যে আর বেশীক্ষণ থাকিব না। এইজন্য আমার পরে সত্য দীনের উপর অবিচল থাকা ও তাহার প্রচার-প্রসার ও সাহায্য-সহযোগিতার ব্যাপারটি কেবল তোমাদের সাথে সংশ্লিষ্ট হইতে যাইতেছে। অতএব আমাকে বল, কে কে আল্লাহ্‌র রাস্তায় সত্যিকার সাহায্যকারী হইত প্রস্তুত আছ ? হাওয়ারীগণ এই আহবান শোনার পর বলিলেন, আমরা সবাই আল্লাহ্‌র দীনের সাহায্যকারী, আমরা সত্যিকারভাবে মনে-প্রাণে আল্লাহর উপর ঈমান আনিয়াছি এবং আমাদের ঈমানের সত্যতার পক্ষে আপনাকে সাক্ষী রাখিলাম। তাঁহারা এই কথা বলিবার পর মানবিক দুর্বলতার দিকে লক্ষ্য রখিয়া নিজেদের দাবির

উপরই বক্তব্য শেষ করেন নাই, বরং আল্লাহ্র দরবারে হাত তুলিয়া মুনাজাত করিলেন, হে আল্লাহ! আমরা যাহা কিছু বলিলাম তাহার উপর অবিচল থাকার শক্তি দান কর এবং আমাদেরকে তোমার দীনের সাহায্যকারীদের তালিকাভুক্ত করিয়া নাও।

এইদিক হইতে হযরত ঈসা (আ) নিশ্চিত হইয়া নিজের দাওয়াতের দায়িত্ব পালন করার সাথে সাথে অপেক্ষা করিতে থাকিলেন যে, দেখা যাক আল্লাহ্র দীনের শত্রুদের তৎপরতা কোন দিকে মোড় নেয় এবং আল্লাহ্র কি ফয়সালা প্রকাশ পায়? এই প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদের মাধ্যমে ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ভ্রান্ত ধারণার বিপরীতে "নির্ভুল জ্ঞানের আলো" দান করিয়া বলিলেন যে, শত্রুরা যখন নিজেদের গোপন ষড়যন্ত্রে তৎপর ছিল, সেই সময় আমরাও আমাদের পরিপূর্ণ কুদরতের অদৃশ্য পরিকল্পনার সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলাম যে, হযরত ঈসা (আ)-এর বিরুদ্ধে শত্রুদের কোন ষড়যন্ত্রই সফল হইতে দেওয়া হইবে না, আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার পরিপূর্ণ কুদরতে গোপন কার্যক্রমের মুকাবিলায় কাহারও পরিকল্পনা সফল হইতে পারে না। কেননা তাঁহার পরিকল্পনার তুলনায় উত্তম কাহারও পরিকল্পনা হইতে পারে না। বলা হইয়াছে ঃ

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ·

"আর তাহারা (ইয়াহূদীরা ঈসার বিরুদ্ধে) গোপন ষড়যন্ত্র করিল। আল্লাহও (ইয়াহূদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে) গোপন ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করিলেন। আর আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট গোপন ব্যবস্থাপনার অধিকারী" (৩ ঃ ৫৪; আল্লামা সিওহারবী, ৪খ, পৃ. ৯৭-৯৮)।

আল্লামা মাজেদী উল্লেখ করেন যে, "আরবী মকর শব্দটি আবশ্যিকভাবে কোন দোষ বলে করে না। মকর শব্দটি প্রয়োগজনিত কারণে নিন্দনীয় ও প্রশংসনীয় উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে। মূল অর্থ, গোপন পরিকল্পনা, গভীর চক্রান্ত, ইংরেজী প্লান (Plan) বলিতে যাহা বুঝায় আরবী উর্দূ 'তদবীর' বলিতে তাহাই বুঝায়" (তাফসীরে মাজেদী, ২খ, পৃষ্ঠা ৮৩০)।

সর্বশেষে সেই সময় আসিয়া উপস্থিত হইল যখন বানূ ইসরাঈলের নেতৃবৃন্দ, মহাযাজক এবং ধর্মবেত্তাগণ হযরত ঈসা (আ)-কে একটি বদ্ধ ঘরের মধ্যে অবরোধ করিল। হযরত ঈসা (আ) এবং হাওয়ারীগণ ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন আর শত্রুরা চারিদিক হইতে বেষ্টনী রচনা করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিল, এমন কি পন্থা হইতে পারে যাহার ফলে শত্রুদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে এবং তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না? আর কিভাবে আল্লাহ তা'আলার হেফাজতের ওয়াদা পূর্ণ হইতে পারে?

এই সম্পর্কে কুরআন মজীদের বক্তব্য এই যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা পূর্ণ হইয়াছে এবং তাঁহার পরিপক্ক ব্যবস্থাপনা হযরত ঈসা (আ)-কে দুশমনদের হাত হইতে সর্বপ্রকারে নিরাপদ রাখিয়াছে। এই নাযুক মুহূর্তে তাঁহার নিকট ওহী আসিল এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সুসংবাদ দিলেনঃ ঈসা! ভীত হইও না, তোমাকে পূর্ণরূপে সাহায্য করা হইবে (অর্থাৎ শত্রুরা তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না এবং তুমিও এখন মৃত্যুর কোলে ঢলিয়া পড়িবে না)। আমি

তোমাকে আমার নিকটে (উর্ধ্ব জগতে) তুলিয়া লইয়া আসিব এবং কাফিরদের যে কোন ষড়যন্ত্র হইতে তোমাকে রক্ষা করিব। এই ওয়াদা প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

إِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسٰى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيْمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ·

"স্মরণ কর যখন আল্লাহ বলিলেন, হে ঈসা! আমি তোমার কাল পূর্ণ করিতেছি এবং আমার নিকট তোমাকে তুলিয়া লইতেছি এবং যাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে তোমাকে মুক্ত করিতেছি। আর তোমার অনুসারিগণকে কিয়ামত পর্যন্ত কাফিরদের উপর প্রাধান্য দিতেছি, অতঃপর আমার কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর যে বিষয়ে তোমাদের মতান্তর ঘটিতেছে আমি উহা মীমাংসা করিয়া দিব" (৩ ঃ ৫৫)।

উল্লেখ্য যে, হাসান বসরী, কালবী ও ইবন জুরায়জ (র) বলিয়াছেন ঃ আয়াতের মর্ম হইল, আমি তোমাকে মৃত্যু ছাড়াই গ্রহণ করিব এবং দুনিয়া হইতে আমার কাছে তুলিয়া লইব। বাগাবী (র) বলেন, ইহার দুইটি ব্যাখ্যা হইতে পারে ঃ (১) আমি তোমাকে পুরোপুরি ভাবে আমার কাছে উঠাইয়া লইব। তাহারা তোমার কোন ক্ষতি সাধন করিতে পারিবে না । বলা হইয়া থাকে, توفيت كذا। অর্থাৎ استوفيته। মানে পরিপূর্ণভাবে উসূল করিয়াছি। (২) আমি তোমাকে স্বীয় আশ্রয়াধীন করিব। বলা হইয়া থাকে, توفيت منه كذا। মানে تسلمته অর্থাৎ আমি তাহাকে স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছি।

ইবন জারীর (র) ইব্‌ন আনাস হইতে বর্ণনা করেন التوفى। দ্বারা নিদ্রা বুঝান হইয়াছে। ঈসা (আ)-কে যখন আসমানে তুলিয়া নেওয়া হয় তখন তিনি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তখন আয়াতের অর্থ হইবে, আমি তোমাকে নিদ্রিত করিব, ইহার পর আমার কাছে তুলিয়া নিব। যেমন, আল্লাহ বলেন ঃ وَهُوَ الَّذِيْ يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ "তিনিই রাত্রে তোমাদের (নিদ্রারূপ) মৃত্যু ঘটান" (৬ ঃ ৬০)।

কেহ কেহ বলেন, التوفى। অর্থ মৃত্যু। আলী ইবন আবূ তাল্‌হা, ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করেন, আয়াতের অর্থ ঃ আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব। ইহার ব্যাখ্যায় দাহ্‌হাক বলিয়াছেন, ইহার অর্থ, আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব এবং তাহা আকাশ হইতে দুনিয়ায় পুনরাগমনের পর। তখন আমি তোমাকে ইয়াহূদীদের হাত হইতে রক্ষা করিব এবং তোমার নির্দিষ্ট আয়ু পূর্ণ করিব। اِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ-এর সংযোজক অব্যয় 'ওয়াও' শুধু সংযোগ সাধনের জন্যই, ধারাবহিকতা বুঝাইবার জন্য নহে। কিন্তু সূরা মাইদার আয়াতটি সামনে রাখিলে এই ব্যাখ্যা টিকে না।

সেখানে ঈসা (আ) বলিয়াছেন ঃ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِيْ كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ

"যখন তুমি আমাকে তুলিয়া নিলে, তখন তুমিই তো ছিলে তাহাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক"। উহার দ্বারা বুঝা যায়, তাঁহার কওম তাঁহার توفى -এর পরেই তাহারা নাসারা

হইয়াছিল। সুতরাং تـوفـى-এর অর্থ আকাশে উত্তোলন কিংবা ইহার আগে তাঁহার মৃত্যুবরণ (তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ৩০৩-৩০৪)।

আল্লামা কাযী মুহাম্মাদ ছানাউল্লাহ পানীপথী (র) বলেন, আমার মতে التوفى অর্থ মৃত্যু ছাড়াই আকাশে উত্তোলন। একটু চিন্তা করিলেই একথা বুঝা যায়। কেননা এক আয়াতে বলা হইয়াছে, وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ "তাহারা তাহাকে হত্যাও করে নাই, শূলেও চড়ায় নাই"। যদি মৃত্যুই হইবে তাহা হইলে তাঁহাকে হত্যা করে নাই বলিবার সার্থকতা কি, যখন হত্যার উদ্দেশ্য মৃত্যুই হইয়া থাকে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪)?

মোটকথা, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ)-কে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে শত্রুদের হাত হইতে পবিত্র রাখিবেন এবং তাহাদের কবল হইবে উদ্ধার করিবেন। তাই তিনি হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায়ই উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে শত্রুদের ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে রখিয়াই ফেরেশতাগণের মাধ্যমে জীবন্ত অবস্থায় সশরীরে আসমানে উঠাইয়া লইয়াছিলেন। শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার বিষয়টি হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি এক বিশেষ নেয়ামত ছিল। এই মর্মে আল-কুরআনে আরও বলা হইয়াছে ঃ

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ إِنْ هٰذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ·

"আমি তোমা হইতে বানূ ইসরাঈলকে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম, তুমি যখন তাহাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আনিয়াছিলে তখন তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছিল তাহারা বলিয়াছিল, ইহা তো স্পষ্ট যাদু" (৫ ঃ ১১০)।

হযরত ঈসা (আ)-কে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেওয়া হইল যে, এই দুর্ভেদ্য অবরোধ সত্ত্বেও শত্রুরা তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না এবং অদৃশ্য হাত তোমাকে উর্ধ্ব জগতে তুলিয়া নিয়া আসিবে, এমনিভাবে দুশমনের নাপাক হাতের স্পর্শ হইতে তোমাকে নিরাপদ রাখা হইবে (আল্লামা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১০০)।

কুরআন মজীদ ইয়াহূদী-খৃস্টানদের মনগড়া কল্পকাহিনীর বিরুদ্ধে মসীহ ইবন মারয়াম (আ) সম্পর্কে এই বর্ণনা প্রদান করিয়াছে। এখন দুইটি বর্ণনাই আমাদের সামনে রহিয়াছে এবং ন্যায়-ইনসাফের নিক্তিও আমাদের হাতে রহিয়াছে। প্রথমে হযরত মসীহ্ (আ)-এর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁহার দাওয়াত ও আন্দোলনের মিশনকে ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে উপলব্ধি করা দরকার। অতঃপর যে বিস্তারিত বর্ণনা একজন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নবী, আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী রসূল এবং খৃস্টানদের ভ্রান্ত বিশ্বাস অনুযায়ী আল্লাহর পুত্রকে তাহার ফয়সালার সামনে হতাশ, কিংকর্তব্যবিমূঢ়, অসহায় এবং আল্লাহ্র নিকট অভিযোগকারী হিসাবে তুলিয়া ধরে তাঁহার উপর আরেকবার দৃষ্টিপাত করা হউক। সাথে সাথে এই বর্ণনার মধ্যে যে বৈপরীত্য রহিয়াছে সে সম্পর্কেও চিন্তা করা হউক। একদিকে বলা হইতেছে, হযরত মসীহ্ (আ) আল্লাহর পুত্র হইয়া এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন যে, তিনি শূলাবিদ্ধ হইয়া দুনিয়ার সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবেন (ইহাই হইতেছে, প্রায়শ্চিত্তের আকীদার

একমাত্র ভিত্তি), অপরদিকে ক্রুশ এবং হত্যার কল্পিত কাহিনী এই ভিত্তির উপর দাঁড় করানো হইয়াছে যে, সেই নির্দিষ্ট সময় যখন আসিয়া গেল তখন আল্লাহ্র এই কল্পিত পুত্রকে নিজের মাহাত্ম্য এবং পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্বকে একেবারে ভুলিয়া গিয়া "প্রভো আমার, প্রভো আমার, কেন আমায় পরিত্যাগ করিলে' এই ধরনের হতাশাজনক বাক্য মুখ দিয়া বাহির করিতে এবং আল্লাহর ইচ্ছার উপর নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতে দেখা যায়। কোন ব্যক্তির এই প্রশ্ন উত্থাপন করার কি অধিকার নাই যে, খ্রীষ্টানদের বিবৃত কাহিনীর উভয় অংশ যদি সঠিক এবং নির্ভুল হইয়া থাকে তাহা হইলে এই বৈপরীত্য কেন এবং এই অসামঞ্জস্যতারই বা অর্থ কি (আল্লামা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১০১)?

অতএব যদি কোন বাস্তববাদী এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি এই সমস্ত দিক সামনে রাখিয়া এবং ঘটনা ও পরিস্থিতির এই সার্বিক দিককে পরস্পর সংযুক্ত করিয়া বিষয়টি অধ্যয়ন করে তবে সে সত্যকে মানিয়া নেওয়ার তাগিদে নিঃসংকোচে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিবে যে, বাইবেলের এই কাহিনী পরস্পর বিরোধী এবং মনগড়া। আর কুরআন মজীদ ঐ প্রসংগে যে সিদ্ধান্ত দিয়াছে তাহাই সত্য।

ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত মসীহ (আ)-এর পর হইতে সেন্ট পলের পূর্ব পর্যন্ত খৃস্টান জগত ইয়াহূদীদের এই মনগড়া কাহিনীর সাথে সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেন্ট পল যখন "ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তের" ধারণার উপর আধুনিক খৃস্টবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন তখন প্রায়শ্চিত্তের ধারণাকে সুদৃঢ় করার জন্য ইয়াহূদীদের এই মনগড়া উপাখ্যানকেও ধর্মের অংশে পরিণত করিয়া নেওয়া হয়।

কুরআন মজীদ চৌদ্দ শত বৎসর ধরিয়া হযরত ঈসা (আ)-এর মহান মর্যাদা শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমার কথা ঘোষণা করিয়া তাঁহার উর্ধ্ব জগতে উত্তোলিত হওয়ার রহস্যকে ইয়াহূদী-খৃস্টানদের মনগড়া কাহিনীর বিপরীতে নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে (আল্লামা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১০২)।

হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উত্তোলন প্রসঙ্গে ইয়াহূদী-খৃস্টানদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন

ইয়াহূদী ও ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের মতে, হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে বিদ্ধ করা হয়। তবে পার্থক্য হইল, ইয়াহূদীদের মতে, বনী ইসরাঈলকে বিভ্রান্ত করার ও ইয়াহূদী ধর্ম ত্যাগ করার কারণে তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়। আর ত্রিত্ববাদী খৃস্টানদের মতে মানবতাকে পাপের অপরাধ হইতে মুক্ত করার জন্য প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তিনি নিজেই তাঁহার বিরোধী শিবিরের হাতে ধরা দেন এবং নিজেই ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া দেহত্যাগ করেন।

অপরদিকে একত্ববাদী খৃস্টান এবং মুসলমানদের দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হয় নাই। আল্লাহ পাক স্বীয় কুদরতে ঈসা (আ)-কে শত্রুদের কবল হইতে মুক্ত করিয়া আকাশে উঠাইয়া নেন। উলামায়ে কেরাম এই বক্তব্যের সমর্থনে ইয়াহূদী খৃস্টানদের ধারণা খণ্ডনের নিমিত্ত বিভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছেন ঃ

প্রথমত, খৃস্টানরা যে মৌখিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, তাহা কতটুকু যথার্থ উহা সম্পর্কে সংশয় রহিয়াছে।

দ্বিতীয়ত, তাহারা যাহাকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করিয়াছিল, তাহার সম্পর্কে সংশয়ে ছিল। ঐ শূলে বিদ্ধ ব্যক্তিটিই যে ঈসা এই ধরনের দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া উক্ত ব্যক্তিটিকে হত্যা করিতে পারে নাই। তাহাদের মাঝে মতানৈক্য ছিল, কারণ ঈসা (আ)-কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য তাঁহার অবস্থান স্থলের কামরাটিতে তাহারা যাহাকে পাঠাইয়াছিল পরবর্তীতে তাহাকে তাহারা খুঁজিয়া পায় নাই (প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ১১)।

ইবন জারীর তাবারী এই ক্ষেত্রে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করেন। সুদ্দীর এক বর্ণনায় দেখা যায়, আল্লাহ তা'আলা এই ক্ষেত্রে যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা এই যে, হযরত ঈসা -এর অনুসারীদের একজনকে হযরত ঈসার আকৃতি দান করেন, যাহাকে তাহারা হযরত ঈসা বলিয়া ধারণা করিয়া হত্যা করিয়াছিল। অথচ ইহার পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠাইয়া নিয়াছেন।

সুদ্দী হইতে অপর এক বর্ণনায় ইব্ন জারীর তাবারী উল্লেখ করেন, ইসরাঈলীরা হযরত ঈসা (আ)-কে ও তাঁহার সঙ্গী উনিশজন হাওয়ারীকে একটি ঘরে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সঙ্গীদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে আমার আকৃতি ধারণ করিবে? তারপর তাহাকে হত্যা করা হইবে? আর তাহার জন্য থাকিবে জান্নাত। তাহাদের একজন হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতি গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় এবং সে রূপান্তরিত হয়। অতঃপর হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে উঠাইয়া লওয়া হয়। আর একথাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করিয়াছেন এই আয়াতে ঃ

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ・

"তাহারা কৌশল অবলম্বন করিয়াছে ,আল্লাহও কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, আল্লাহই কৌশল অবলম্বনকারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ"।

তারপর যখন হাওয়ারীগণ ঘর হইতে বাহির হইলেন, দেখা গেল সংখ্যায় তাহারা উনিশজন। তখন তাহারা খবর দিলেন যে, হযরত ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। শত্রুপক্ষ তাহাদেরকে গণনা করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল যে, নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে একজন কম। তাহাদের মধ্যে একজনকে তাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর আকৃতিতে দেখিতে পাইল। তাহার ব্যাপারে তাহারা সন্দিহান হইল। এই ভিত্তিতে তাহারা তাহাকে হযরত ঈসা (আ) মনে করিয়া শূলিতে চড়াইয়া দিয়াছিল (তাফসীরে তাবারী, ৫খ, পৃ. ৪১৮-৪১৯)। এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুফাসসিরীনে কিরাম একাধিক বর্ণনা দিয়াছেন।

(১) ইয়াহূদীগণ যখন জানিতে পারিল যে, ঈসা তাঁহার সাথীবর্গসহ অমুক বাড়িতে অবস্থান করিতেছেন, ইয়াহূদী নেতা ইয়াহুয়া তখন ঈসারই এক সাথী তিতায়ূসকে আদেশ করিল যে, সে যেন

ঈসা (আ)-এর কামরায় প্রবেশ করে এবং তাঁহাকে বাহির করিয়া আনে যাহাতে তাঁহাকে হত্যা করা যায়। ঐ ব্যক্তি যখন ঈসা (আ)-এর ঘরে প্রবশে করিল, তখন আল্লাহ তা'আলা 'ঈসা (আ)-কে ঘরের ছাদ ভেদ করিয়া বাহির করিয়া আনিলেন। আর ঐ ব্যক্তির চেহারা-সুরতকে ঈসা (আ)-এর চেহারায় রূপান্তরিত করিলেন। অতঃপর তাহারা ধারণা করিল, ঐ ব্যক্তিই ঈসা এবং তাহাকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করিল।

(২) ঈসা (আ)-এর ব্যাপারে তাহারা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করিয়াছিল যে তাহাকে পাহারা দিত। আর ঈসা (আ) পাহাড়ে আরোহণ করিলেন এবং আসমানে উত্থিত হইলেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা ঈসা (আ)-এর চেহারাকে ঐ পাহারাদারের উপর ঢালিয়া দিলেন। অতঃপর তাহারা তাহাকে হত্যা করিল, অথচ সে বলিতেছিল, আমি ত ঈসা নহি, আমি ত ঈসা নহি।

(৩) এক ব্যক্তি যে নিজেকে ঈসার (আ) সাথী বলিয়া দাবি করিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ছিল মুনাফিক। সে ইয়াহূদীদের কাছে গেল এবং ঈসা (আ)-কে গ্রেপ্তার করার নির্দেশদান করিল। সে যখন ইয়াহূদীদেরসহ ঈসা (আ)-এর আবাসস্থলে গেল আল্লাহ পাক তখন তাহার চেহারাকে ঈসা (আ)-এর চেহারায় রূপান্তর করিয়া দিলেন। অতঃপর সে শূলে নিহত হইল (রাযী, প্রাগুক্ত, ১১খ, পৃ. ১০০)। বাইবেলের বর্ণনা মতে ঐ ব্যক্তিটির নাম যিহুদা ইসখারায়ূতী।

উপরিউক্ত বর্ণনাগুলি পরস্পর বিরোধী। কেননা কোনটায় দেখা যায় ঈসার চেহারায় রূপান্তরিত ব্যক্তিটি ঈসার সাহায্যকারী হিসাবে আগাইয়া আসিয়াছিল। অপর বর্ণনামতে ঐ ব্যক্তিটি ছিল বিশ্বাসঘাতক। সে ঈসা (আ)-এর প্রতি শত্রুতাবশত তাঁহাকে ধরাইয়া দিতে চাহিয়াছিল। যাহা হউক, শেষোক্ত মতটি অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ এবং রূপান্তরিত হওয়ার শাস্তিতে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। বস্তুত উপরিউক্ত বর্ণনায় দেখা যায়, ইয়াহূদীরা হযরত ঈসা (আ)-কে শূলে চড়াইতে পারে নাই বরং তাঁহার চেহারায় রূপান্তরিত আরেক ব্যক্তিকে তাহারা শূলে চড়ায়।

এই পর্যন্ত যাহা কিছু আলোচনা করা হইল তাহার উপর আর একবার নযর বুলাইয়া নিচের বিষয়গুলি প্রণিধান করুন। (১) যেদিন মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয় সেদিন ছিল শুক্রবার। দিন শেষ হইয়া আসিতেছিল আর ইয়াহূদীরা সকল কাজ সারিয়া সন্ধ্যার আগে আগে ঘরে ফিরিয়া যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়া করিতেছিল। জুমুআর দিন সন্ধ্যা হইতেই তাহাদের শনিবার শুরু হইয়া যায়। আর শনিবারের সীমার মধ্যে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। আর ইয়াহূদীদের একটা বিশেষ উৎসবের অনুষ্ঠানও শুরু হইতেছিল। মোটকথা ইয়াহূদীদের বেশ তাড়া ছিল। যাহাতে এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধৃত ব্যক্তিটি যদি ঈসা না হইবে তাহা হইলে সে তাহা বলিল না কেন যে, আমি ঈসা নহি? ইহার বিভিন্ন জওয়াব রহিয়াছে ঃ

(১) আল্লাহ পাকই তাহার যবান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার নবীকে রক্ষার জন্য।

(২) সম্ভবত ঐ লোকটি ঈসা (আ)-এর-ই ভক্ত শিষ্য ছিল, যে ঈসার পরিবর্তে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছিল শাহাদাৎ লাভের আকাংক্ষায় (আলূসী, প্রাগুক্ত)।

(৩) হয়ত সে ব্যক্তিটি ঘটনার আকস্মিকতায় হতবিহ্বল হইয়া গিয়াছিল, তাই সে নির্বাক হইয়া গিয়াছিল।

ঈসা (আ)-কে শূলে চড়ানো হয় নাই বা শূলে চড়ানো ব্যক্তি ঈসা ছিলেন না। ইহার পিছনে আরও কয়েকটি যুক্তি পেশ করা যায়। ঈসা (আ) ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ মহান নবী, আল্লাহর সাহায্য ও ফয়সালা সম্পর্কে দৃঢ় আস্থাবান। তাই তিনি বিপদের মুহূর্তে নিরাশ হইতে পারেন না যাহার প্রমাণ এমনকি সুসমাচারসমূহেও রহিয়াছে। তাই দেখা যায় সৈনিকরা যখন তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল তখন তিনি সিজদায় গিয়া মুনাজাত করিয়াছিলেন।

আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী উল্লেখ করেন যে, একজন প্রসিদ্ধ ইউরোপীয় পণ্ডিত "ডি বেনসন" (De Benson) বিগত শতাব্দীতে ইসলাম অথবা প্রকৃত খৃস্টবাদ (ISLAM OR TRUE CHRISTIANTY) নামক গবেষণাভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠার টীকায় খৃস্টানদের বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মীয় ফেরকার নাম উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ঐসব সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ)-কে সশরীরে আকাশে উঠাইয়া নেওয়ার আকীদায় বিশ্বাসী ছিল, কেহ বর্তমান খৃস্টানদের মত তাঁহার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় বিশ্বাসী ছিল না, যে বিশ্বাস বিগত কয়েক শতাব্দী যাবত তথাকথিত খৃস্ট মতবাদের অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। সেল নামক জনৈক পণ্ডিতও তাহার অনূদিত কুরআনের টীকায় প্রাচীন খৃস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করিয়া হযরত ঈসা (আ)-এর সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়ার আকীদা-বিশ্বাসের বর্ণনা দিয়াছেন (আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৮৭)।

ইহা ছাড়া শূলে চড়ানোর ঘটনাকে বার্ণাবাস অস্বীকার করিয়াছেন। বালম্যান স্ট্রাকের গ্রন্থ The four Gospels (New York, Macmillan 196- p. 5)-এর বরাতে মাওলানা তকী উসমানী উল্লেখ করেন, ঈসা (আ)-এর অনুসারী পিটারও বলিয়াছেন, ঈসা শূলে বিদ্ধ হন নাই, তাঁহাকে আকাশে উত্তোলিত করা হয় (তকী উসমানী, মাহেয়া আন-নাসরানিয়া, পৃ. ৭৩)।

ঈসা (আ)-এর আকাশে উত্তোলন প্রসঙ্গে কাদিয়ানীদের বিভ্রান্তি

হিন্দুস্তানে নূতন ধর্মমত আহমাদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী নিজেকে "প্রতিশ্রুত মাসীহ" দাবি করার প্রেক্ষাপটে মত ব্যক্ত করে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার কবর হইতে জীবিত হইয়া হিন্দুস্তানের কাশ্মীরে হিজরত করেন এবং সেখানে ১২০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। তাঁহার কবর কাশ্মীরের শ্রীনগরে রহিয়াছে যাহা সর্বস্তরের জনগণের কাছে প্রসিদ্ধ। ইহাকে মানুষ যিয়ারত করিতে আসে এবং বরকত কামনা করে (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, আর-রিসালাতুল আরাবিয়্যাহ, পরিশিষ্ট আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, ২য় সংস্করণ, জুলাই ১৯২৪, পৃ. ২২; আরও দ্র. আবুল হাসান আলী-নদভী, আল-কাদিয়ানী ওয়াল কাদিয়ানিয়্যাহ, জেদ্দা আদ-দারুস সাউদিয়্যাহ লিন্নাশরি, ৩খ সং, ১৩৮৭ হি, / ১৯৬৭ খৃ, পৃ. ৬৩ ৬৬; আখতার-উল-আলম, শেষ নবী, পৃ. ১৭৮-১৮০)।

মির্যা কাদিয়ানী আরো উল্লেখ করে যে, শ্রীনগরের খান ইয়ার মহল্লায় রাজকুমার ইউস আসফের কবর নামে যাহা প্রসিদ্ধ, তাহাই ঈসা মাসীহের কবর, যিনি দুই হাজার বৎসর পূর্বে কাশ্মীরে হিজরত করেন এবং রাজকুমার নবী হিসাবে পরিচিত ছিলেন (গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, বারাহীনে আহমাদীয়া, ৪খ, পৃ. ২২৮)।

এই বিভ্রান্তির নিরসন

আধুনিক যুগের পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত উপরিউক্ত কয়েকজন আলিমের বক্তব্যের বিপরীতে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত যে, হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ পাক সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন। কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াহূদীরা তাঁহাকে শূলেও চড়াইতে পারে নাই এবং হত্যাও করিতে পারে নাই। আল্লাহ পাকের মহা পরিকল্পনা ও কৌশলের সামনে তাহাদের ক্ষুদ্র পরিকল্পনা কুটার মত ভাসিয়া যায়। কাদিয়ানীসহ উপরিউক্ত চিন্তাবিদগণ ঈসা (আ)-এর মৃত্যু সম্পর্কে যে সকল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করিয়াছেন অন্যান্য উলামায়ে কেরাম তাহার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়াছেন। নিম্নে ইহার গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি দিক উল্লেখ করা হইল। প্রথমত, আয়াতে উক্ত ওফাত শব্দটিকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলিয়া দাবি করা যথার্থ নহে। কারণ ওফাত শব্দটির প্রত্যক্ষ অর্থ হইল পূর্ণ করা। তবে পরোক্ষ বা রূপকভাবে কোন কোন সময় মৃত্যু অর্থে ও ব্যবহৃত হয়। আর উপরিউক্ত আয়াতে ওফাত দ্বারা 'মৃত্যু' বুঝানো হইয়াছে এমন কোন প্রমাণ নাই।

আল্লামা সিওহারবী এই বিষয়টি বিভিন্ন আঙ্গিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) জমহুর তাফসীরকারদের মতে توفى শব্দের অর্থ "নির্ধারিত সময় পূর্ণ করা"। আরবী অভিধানে توفى শব্দের মূল হচ্ছে وفى - يفى - وفاء তাহা পূর্ণ করা অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর তাহা যখন باب تفعل-এর ওজনে توفى হয় তখন ইহার অর্থ হয় "কোন জিনিসকে পূর্ণরূপে নেওয়া" অথবা কোন জিনিসকে অক্ষত ও নিরাপদ অবস্থায় আয়ত্তে নেওয়া। আর যেহেতু ইসলামী আকীদা অনুযায়ী রূহকে পূর্ণরূপে নিয়া নেওয়া হয়, এজন্য পরোক্ষভাবে توفى মৃত্যু অর্থেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে সাধারণভাবে নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নের আয়াত উল্লেখ করা যায় ঃ

وَهُوَ الَّذِى يَتَوَفّٰكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ـ

"তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের ওফাত দেন এবং দিবসে তোমরা যাহা কর তাহা তিনি জানেন" (৬ ঃ ৬০)।

এই আয়াতে توفى শব্দের অর্থ কোনক্রমেই "মৃত্যু" হইতে পারে না। অথচ توفى -এর কর্তা হইতেছেন আল্লাহ এবং কর্ম হইতেছে মানুষের রূহ। আরও একটি আয়াত ঃ

حَتّٰى اِذَا جَاءَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا ـ

"অবশেষে যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন আমার প্রেরিতরা তাহার মৃত্যু ঘটায়" (৬ ঃ ৬১)।

এই আয়াতেও মৃত্যুর কথা বলা হইয়াছে, কিন্তু তারপরও توفته শব্দের মধ্যে توفى -র অর্থ "মৃত্যু" হইতে পারে না। অর্থাৎ احدكم الموت -এ যখন موت শব্দের উল্লেখ আছে তখন আবার توفته-র অর্থও যদি "মৃত্যু" গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় ঃ "এমনকি যখন কাহারও মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, আমাদের প্রেরিত (ফেরেশতা) মৃত্যু নিয়া আসে।" আর ইহা সুস্পষ্ট যে, موت শব্দের পুনর্ব্যবহার নিরর্থক হইয়া দাঁড়ায় এবং বক্তব্যের মধ্যে বাগ্মিতা ও মু'জিযা-সুলভ ভাবধারা থাকা তো দূরের কথা, সাধারণ কথোপকথনের বিচারেও তাহা নিম্ন মানের হইয়া যায়। অবশ্য যদি توفى-শব্দের প্রত্যক্ষ অর্থ "কোন জিনিস পূর্ণ মাত্রায় নিয়া নেওয়া" গ্রহণ করা হয়, তবে কুরআন মজীদের উদ্দেশ্য সঠিকভাবে পরিস্ফুট হইবে এবং মু'জিযাসুলভ বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

মোটকথা, موت এবং توفى সমার্থবোধক শব্দ নহে, বরং উভয়ের প্রকৃত ও প্রত্যক্ষ অর্থের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আরও একটি আয়াত হইতে ইহা প্রমাণিত হয় ঃ

فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ.

"তবে তাহাদিগকে গৃহে অবরুদ্ধ করিবে, যে পর্যন্ত না তাহাদের মৃত্যু হয়" (৪ ঃ ১৫)।

এখানে موت শব্দকে توفى ক্রিয়ার কর্তা হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। আর কর্তা এবং ক্রিয়া এক হইতে পারে না (এই প্রসঙ্গে আরও দ্র. ২ ঃ ২৮১ এবং ১৬ ঃ ১১১)।

(৪) توفى এবং موت নিশ্চিতই সমার্থবোধক শব্দ নহে। ইহার আর একটি প্রমাণ হইল, গোটা কুরআন মজীদে মৃত্যু শব্দের কর্তা একমাত্র আল্লাহ্ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে توفى শব্দের কর্তারূপে ফেরেশতাগণের উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِىْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ .

"যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করে তাহাদের প্রাণ গ্রহণের সময় ফেরেশতাগণ বলে, তোমরা কী অবস্থায় ছিলে" (৪ ঃ ৯৭)? আরও বর্ণিত হইয়াছে تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا (যখন তোমাদিগের কাহারও মৃত্যুকাল উপস্থিত হয় তখন) "আমার প্রেরিতরা তাহারা মৃত্যু ঘটায়" (৬ ঃ ৬১)। আরও উল্লিখিত হইয়াছে قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ "বল, তোমাদিগের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফেরেশ্তা তোমাদিগের প্রাণ হরণ করিবে" (৩২ ঃ ১১)।

وَلَوْتَرٰى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ.

"তুমি যদি দেখিতে পাইতে ফেরেশতাগণ কাফিরদিগের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিয়া তাহাদিগের প্রাণ হরণ করিতেছে" (৮ ঃ ৫০)।

(৫) কুরআন মজীদে موت এবং توفى শব্দের ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ হইতে আর একটি বড় পার্থক্য এই যে, কুরআন মজীদের স্থানে স্থানে জীবন (حيات) এবং মৃত্যুকে (موت) পরস্পর

বিপরীতার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু توفى শব্দকে কোনও একটি স্থানেও حيات শব্দের বিপরীতার্থক শব্দরূপে ব্যবহার করা হয় নাই। যেমন বর্ণিত হইয়াছে ঃ

الَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ.

"যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন মৃত্যু এবং জীবন" (৬৭ ঃ ২)।

আরও আসিয়াছে, وَلاَ يَمْلِكُوْنَ مَوْتًا وَّلاَ حَيٰوةً "তাহারা না মৃত্যুর মালিক আর না জীবনের" (সূরা ফুরকান, ৩)।

দ্বিতীয়ত, হযরত ঈসা (আ)-কে সশরীরে আসমানে উঠাইয়া নেওয়ার ব্যাপারে কুরআনুল কারীমে স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে ঃ بَلْ رَّفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ "বরং আল্লাহ্ নিজের কাছে তাহাকে উঠাইয়া নিয়াছেন" (৪ ঃ ১৫৮)। অন্য আয়াত ও হাদীছ দ্বারা আরও সুস্পষ্ট হইয়া যায়। (১) আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهٖ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ

"কিতাবীদের মধ্যে প্রত্যেকে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তাহাকে বিশ্বাস করিবেই এবং কিয়ামতের দিন সে তাহাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে (৪ ঃ ১৫৯)।

এইখানে আহলে কিতাব কর্তৃক ঈমান আনার অর্থ হইল, ঈসা (আ) যখন পুন আগমন করিবেন তখন খৃস্টানরা জানিবে তিনি ইবনুল্লাহ ছিলেন না, মানুষ ছিলেন। ইয়াহূদী ও খৃস্টান উভয়ে জানিবে, তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া হত্যা করা হয় নাই। কারণ তাহাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার জন্য তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন আর ঘোষণা দিবেন। তিনি বিবাহ-শাদী করিবেন। এইভাবে তাহাদের ধারণার অপনোদন হইবে এবং সকলেই তখন একযোগে ঈসা (আ)-এর মৃত্যুর পূর্বেই তাঁহার উপর ঈমান আনিবে। আয়াতের ইহাই সঠিক ব্যাখ্যা। (২) আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَاِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

"ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ" (৪৩ ঃ ৬১)।

এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, হযরত ঈসা (আ) কিয়ামতের আলামতসমূহের অন্যতম। আর কিয়ামত যখন আসন্ন হইবে এবং উহার বিভিন্ন আলামতরূপে দাজ্জালের আগমন হইবে তখন তাহাকে হত্যা করার জন্য আল্লাহ্ পাকের কুদরতে হযরত ঈসা (আ) আসমান হইতে অবতরণ করিবেন। (৩) আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ .

"সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন" (৩ ঃ ৪৬)।

উক্ত আয়াতে كهلا শব্দের অর্থ পরিণত বয়সে। 'কাহলান' শব্দটি পৌঢ়ত্বের একটি বিশেষ স্তরকে বুঝায়। সাধারণত চল্লিশ বৎসর হইতে পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত সময়কে কাহল বা পরিণত বয়স বলা হয় (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৯১; আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৬৩)।

ছানাউল্লাহ পানিপথী ও আলূসীসহ অনেক মুফাস্‌সির বলেন, এই আয়াতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঈসা (আ) পূর্ণ বয়সে পৌঁছিবেন। ইহার আগে তাঁহার ইন্তিকাল হইবে না। হাসান ইব্‌ন ফাদল বলেন ঃ كهلا দ্বারা বুঝা যায় যে, আসমান হইতে অবতরণের পর তিনি কথা বলিবেন। কেননা এই বয়সে পৌঁছার পূর্বেই তাঁহাকে আসমানে তুলিয়া নেওয়া হইয়াছে (আলূসী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪; তাফসীরে মাযহারী, ২খ, পৃ. ২৯১)।

(৪) ইমাম আবূ জাফর তাবারী (র) বলিয়াছেন, যদি আল্লাহ্ পাক হযরত ঈসা (আ)-কে একবার মৃত্যু দিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহাকে মৃত্যু দিবেন না। আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاۤئِكُمْ مَنْ يَّفْعَلُ مِنْ ذٰلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ.

"আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার পর তোমাদের রিযিক দিয়াছেন, তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাইবেন ও পরে তোমাদেরকে জীবিত করিবেন। তোমাদের দেব-দেবীগুলির এমন কেহ আছে কি, যে এ সমস্ত কোন একটিও করিতে পারে" (৩০ ঃ ৪০)? অর্থাৎ মানুষের মৃত্যু একবারই হয়।

সর্বোপরি যে আয়াতে বলা হইয়াছে, "তাহাকে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে" তাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্ পাক সশরীরে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠাইয়া লইয়াছেন। কেননা স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে এমনিতেই তাঁহার রূহকে উপরে উঠানো হইত যেমনিভাবে অন্যান্য নেককার লোকদের রূহ উপরে উঠানো হইয়া থাকে, আলাদাভাবে উঠাইবার কথা বলা হইত না।

দ্বিতীয়, তাফসীরে রূহুল বয়ানে উল্লেখ আছে যে, হযরত ঈসা (আ) উম্মাতে মুহাম্মাদীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দু'আ করিয়াছিলেন (শায়খ ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীরে রূহুল বয়ান, ৩খ, পৃ. ৪১)।

তৃতীয়, হযরত ঈসা (আ)-এর আসমান হইতে শেষ যমানায় পুন আগমন সম্পর্কে প্রচুর বিশুদ্ধ মারফূ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে। ইব্‌ন জারীর তাবারী, ইব্‌ন কাছীর প্রমুখ মুফাস্‌সিরীনে কিরাম ও মুহাদ্দিছীনে ইজাম সেইগুলিকে মুতাওয়াতির স্তরের বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদীছগুলির বর্ণনায় কিছু শাব্দিক পার্থক্য থাকিলেও এই বিষয়ে সকলেই একমত যে, তিনি আসমান হইতে শেষ যমানায় আগমন করিবেন। অতএব হাদীছগুলি ভাবার্থের দিক হইতে মুতাওয়াতির। হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) উপরিউক্ত হাদীছগুলি মুতাওয়াতির প্রমাণ করিয়াছেন।

চতুর্থ, যদি তর্কের খাতিরে ধরিয়া নেওয়া হয় যে, ঐ হাদীছগুলি খবরে ওয়াহেদ তাহা হইলেও ঐ হাদীছগুলির বিপরীতে কোন বিশুদ্ধ হাদীছ নাই।

পঞ্চম, হাদীছ শরীফে স্পষ্ট আসিয়াছে মহানবী (স) বলিয়াছেন—

ان عيسى لم يمت وانه راجع اليكم قبل يوم القيامة.

"নিশ্চয়ই ঈসা মৃত্যুবরণ করেন নাই। তিনি কিয়ামতের দিবসের পূর্বে তোমাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করিবেন" (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৭৯)।

ষষ্ঠ, হযরত ঈসা (আ)-এর পুনঃ আগমনের বিষয়টি অস্বীকার করিলে কিয়ামত সংক্রান্ত হাদীছসমূহের এক বিরাট অংশ অস্বীকার করিতে হইবে। আর আকীদার বিষয় শুধু কুরআন কারীম দ্বারাই প্রমাণিত হয় না, অনেক আকীদা মহানবী (স) হইতে বর্ণিত হাদীছ দ্বারা ও প্রমাণিত হয়। যথা কিয়ামতের আলামত সংক্রান্ত বিষয়াদি।

সপ্তম, আল্লাহ্‌র কুদরতে ঈসা (আ)-কে আসমানে উত্তোলন করানো সম্ভব। হযরত মুহাম্মাদ (স)-কে মি'রাজের রাত্রে আল্লাহ্ তা'আলা যখন সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত উঠাইয়াছিলেন তখন হযরত ঈসা (আ)-কে আসমান পর্যন্ত উত্তোলন করা অসম্ভব হইবে কেন ? উপরিউক্ত আলোচনায় আল-কুরআন ও হাদীছের আলোকে স্পষ্টতই প্রমাণিত যে, আল্লাহ পাক হযরত ঈসা (আ)-কে সশরীরে জীবন্ত অবস্থায় আসমানে উঠাইয়া নিয়াছেন।

উত্তোলনের স্থান ঃ বার্ণাবাসের বর্ণনা মতে, ছোট নদী সিদ্রনের পাশে নিকোকোমাসের বাগান বাড়িতে অবস্থানরত ঈসা (আ)-এর নিকট যখন জুদাসসহ সেনাবাহিনী পৌছিল তখন ঈসা (আ) বহু লোকের আগমনের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। ফলে আতঙ্কিত হইয়া তিনি ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিলেন। এগারজন তখন নিদ্রাভিভূত। আল্লাহ তাঁহার বান্দার বিপদ দেখিয়া তখন তাঁহার দূতবৃন্দ জিবরাঈল, মীকাঈল, আযরাঈল ও ইসরাফীলকে হুকুম করিলেন, ঈসাকে দুনিয়ার মধ্য হইতে তুলিয়া নিয়া আসার জন্য। পবিত্র ফেরেশতাগণ আবির্ভূত হইয়া ঘরের দক্ষিণমুখী জানালা দিয়া ঈসা (আ)-কে বাহির করিয়া নিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা তাঁহাকে নিয়া তৃতীয় আসমানে ফেরেশতাদের মাঝে রাখিলেন যাহারা সারাক্ষণ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ধ্বনি গাওয়ায় নিমগ্ন রহিয়াছেন।

ইবনুল জাওযী এক বর্ণনায় উল্লেখ করেন যে, তাঁহাকে বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে উত্তোলন করা হয়। অপর এক বর্ণনায় উল্লেখ করা হয় যে, তাঁহাকে যয়তুন পাহাড়ে হাওয়ারীদের সম্মুখ হইতে উত্তোলন করা হয় (ইবনুল জাওযী, যাদুল মাছীর, ১খ, পৃ. ৩৩৭)। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

উত্তোলনের সময়কাল ঃ এক বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহাকে রমযান মাসের লায়লাতুল কদরে উত্তোলন করা হয় (প্রাগুক্ত)। অপর এক বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহাকে হিব্রু মাস নিসানের ১৩ তারিখ শুক্রবারে উত্তোলন করা হয় (আলূসী, প্রাগুক্ত, ১খ, পৃ. ৭৯)। আল্লাহ তা'আলাই অধিক জ্ঞাত।

বর্তমানে ঈসা (আ)-এর অবস্থান ও অবস্থা ঃ বর্তমানে হযরত ঈসা (আ) আসমানে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু কোন্ আসমানে সেই সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রহিয়াছে। বর্ণনায় আছে যে, হযরত ঈসা (আ) দ্বিতীয় আসমানে অবস্থান করিতেছেন। মি'রাজের রাত্রিতে হযরত মুহাম্মাদ (স) তাঁহার সহিত দ্বিতীয় আসমানে সাক্ষাত করেন (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৬খ, পৃ. ১২)। অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি চতুর্থ আসমানে আছেন (প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৮২)। হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি দুনিয়ার আসমানে আছেন (প্রাগুক্ত)। তবে মি'রাজের হাদীছের বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য।

উল্লেখ্য যে, তাঁহার অবস্থা সম্পর্কে আলূসী উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন যখন হযরত ঈসা (আ)-কে আসমানে উঠাইয়া নিলেন তখন তিনি তাঁহাকে পাখাযুক্ত করিয়া নূরের

আবরণে আচ্ছাদিত করিলেন। এইভাবে তাঁহার পানাহারের চাহিদা প্রশমিত হইয়া যায়। অতঃপর তিনি ফেরেশতাদের সাথে উড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সাথেই আরশের চতুষ্পার্শ্বে চক্কর দিতে লাগিলেন। এইভাবে তিনি এমন মানুষ হইয়া গেলেন যাহার মধ্যে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যাবলী পরিলক্ষিত হয় (প্রাগুক্ত)।

পৃথিবীতে হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাগমন ও কার্যক্রম

ইসলামী আকীদামতে যেহেতু ঈসা (আ) নিহতও হন নাই এবং স্বাভাবিক মৃত্যুবরণও করেন নাই, বরং জীবিতাবস্থায় তাঁহাকে আকাশে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, তাই শেষ যমানায় পুনরায় তাঁহাকে দুনিয়াতে অবতরণ করান হইবে।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর অবতরণ কিয়ামতের একটি আলামত। তিনি এই পৃথিবীতে পুনরাগমন করিবার পর দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। তাহা ছাড়া তাঁহার পুনরাগমনের মাধ্যমে ইয়াহূদী-নাসারাদের অনেক বিভ্রান্তি দূর হইবে। আর তাহারা সকলে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে। উহার পর কিয়ামত সংঘটিত হইবে। এই সব কয়টি কিয়ামতের আলামত। কেননা ঐ ঘটনাগুলি পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ সহীহ হাদীছ গ্রন্থ বুখারী ও মুসলিমসহ অনেক হাদীছ গ্রন্থে نزول عيسى তথা ঈসা (আ)-এর অবতরণ শিরোনামে অধ্যায় রহিয়াছে। নিম্নে সেইগুলির মধ্যে হইতে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করা হইল ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احدأ و حتى تكون السجدة الواحدة خيرا له من الدنيا وما فيها ثم قال أبو هريرة إقرء واما شئتم وإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا " (بخارى كتاب احاديث الانبياء باب نزول عيسى بن مريم مسلم باب بيان نزول عيسى ترمذى ابواب الفتن باب فى نزول عيسى مسند احمد مرويات ابى هريرة)

“রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই মহান সত্তার শপথ যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে ইবন মারয়াম (আ) পুনর্বার আগমন করিবেন ন্যায়বিচারক শাসকরূপে। অতঃপর তিনি ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন, শূকর হত্যা করিবেন ও জিযিয়া বিলোপ করিবেন। তখন ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য দেখা দিবে যে, তাহা গ্রহণ করার মত লোক পাওয়া যাইবে না। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিবে যে, মানুষ আল্লাহ্র জন্য একটি সিজদা করিয়া নেওয়াকে দুনিয়া ও তাহার মধ্যেকার যাবতীয় বস্তুর চাইতে অধিক মূল্যবান মনে করিবে (অর্থাৎ সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে দান-খয়রাতের তুলনায় নফল ইবাদতের গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে)। অতঃপর আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমরা (কুরআন হইতে ইহার প্রমাণ) চাও তবে এই আয়াত পাঠ কর, “আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেউ অবশিষ্ট থাকিবে না, যে তাহার (ঈসা) মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার প্রতি ঈমান আনিবে না। আর সে কিয়ামতের দিন তাহাদের (আহলে কিতাব) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবে” (৪ ঃ ১৫৯)।

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم.

"রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ "তোমাদের অবস্থা কেমন হইবে যখন তোমাদের মাঝে ইব্ন মারয়াম নাযিল হইবেন এবং তোমাদের ইমাম তোমাদের নিজেদের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হইবেন ?" (বুখারী ঃ কিতাবুল আম্বিয়া, বাব ঃ নুযূলি ঈসা; মুসলিম, বায়ানু নুযূলি ঈসা; মুসনাদে আহ্মাদ ঃ আবু হুরায়রা সূত্রে)।

হযরত আবু হুরায়রা (রা) হইতে বিভিন্ন সূত্রে আরও অনেক হাদীছ বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহ্মাদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইব্ন মাজা গ্রন্থে সংকলিত হইয়াছে যাহাতে একই মর্মের বক্তব্য রহিয়াছে। মুসনাদে আহ্মাদ্ গ্রন্থে আছে ঃ

ان النبى صلى الله عليه وسلم قال الانبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى دينهم واحد وإنى اولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن نبى بينى وبينه وإنه نازل وإذا رأيتموه فأعرفوه رجل مربوع الى الحمرة والبياض عليه ثوبان ممصران كان رأسه يقطرو ان لم يصبه بلل فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الاسلام ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجأل ثم تقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الاسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم فيمكث اربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون.

"নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিয়াছেন ঃ সমস্ত নবী (দীনের মূল নীতিতে) পরস্পর বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মত, যদিও তাঁহাদের মাতা বিভিন্ন জন। তাঁহাদের সকলের দীন মূলত একই। আমি অপরাপর নবীগণের তুলনায় ঈসা ইব্ন মারয়ামের অধিক নিকটবর্তী। কেননা তাঁহার ও আমার মধ্যবর্তী সময়ে কোন নবী আসেন নাই। নিঃসন্দেহে তিনি পুনর্বার পৃথিবীতে নাযিল হইবেন। তোমরা তাঁহার দেহের গঠন দেখিয়া চিনিয়া লইও। তিনি হইবেন মাঝারি ধরনের। তাঁহার দেহের বর্ণ লাল-সাদা মিশ্রিত হইবে এবং তাঁহার পরিধানে হলুদ রং-এর দুইটি কাপড় থাকিবে। তাঁহার মাথার চুল হইতে মনে হইবে এই বুঝি পানি টপকাইতেছে, অথচ তাহা মোটেই সিক্ত হইবে না। তিনি ক্রুশ ধ্বংস করিবেন, শূকর হত্যা করিবেন, জিযিয়া বিলুপ্ত করিবেন এবং লোকদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহবান করিবেন। তাঁহার যমানায় আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত ধর্ম নির্মূল করিবেন এবং কেবল ইসলামই বিজয়ীর বেশে টিকিয়া থাকিবে। তাঁহার যুগেই আল্লাহ্ তা'আলা মাসীহ্ দাজ্জালকে ধ্বংস করিবেন। অতঃপর দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এমনকি বাঘকে উটের সাথে, চিতা বাঘকে গরুর সাথে এবং নেকড়ে বাঘকে মেষপালের সাথে বিচরণ করিতে দেখা যাইবে। শিশুরা সাপের সাথে খেলাধুলা করিবে, কিন্তু সাপ তাহাদের কোন ক্ষতি করিবে না। তিনি দুনিয়ায় চল্লিশ বৎসর অবস্থান করিবেন। অতঃপর তাঁহার মৃত্যু হইবে এবং মুসলমানরা তাঁহার জানাযা পড়িবে"।

(৪) সহীহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীও উল্লিখিত হইয়াছে ঃ

فإذا جاءوا الشام خرج فبيناهم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ اقيمت الصلوة فينزل عيسى بن مريم فأمهم الخ ·

"মুসলমানরা যখন সিরিয়া পৌছিবে তখন দাজ্জাল বাহির হইয়া আসিবে। তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তাহারা প্রস্তুতি লইতে থাকিবে, তখন নামাযের কাতারসমূহ ঠিক করিবে এবং নামাযের ইকামত হইবে। এমন সময় ঈসা ইবন মারয়াম (আ) উর্ধ্ব জগত হইতে নাযিল হইবেন এবং তিনি মুসলমানদের ইমামতের দায়িত্ব পালন করিবেন।"

(৫) বিভিন্ন সূত্রে ইমাম আহমাদ ও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন, নবী করীম (স) বলিয়াছেন ঃ

يقتل ابن مريم الدجال بباب لد ·

ইমাম তিরমিযী এই হাদীছ উল্লেখ করার পর বলেন, هذا احديث صحيح ইহা সহীহ হাদীছ। অতঃপর তিনি সেইসব সাহাবীর নাম উল্লেখ করেন যাহাদের সূত্রে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর পুনরাগমন এবং তাঁহার হাতে দাজ্জালের নিহত হওয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, এই অনুচ্ছেদে (باب) হযরত ইমরান ইব্ন হুসায়ন, নাফি ইবন উয়ায়না, আবু বাযযা আসলামী, হুযায়ফা ইবন উসায়দ, আবু হুরায়রা, কায়সান, আবু উমামা আল-বাহিলী, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসঊদ, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনিল আস, সামুরা ইবন জুনদুব, নাওয়াস ইব্ন সামআন, আমর ইব্ন আওফ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) হইতে হাদীছ বর্ণিত আছে (তিরমিযী, আবওয়াবুল ফিতান, বাব নুযূলি ঈসা ইবন মারয়াম)।

(৬) হযরত হুযায়ফা ইবন উসায়েদ আল-গিফারী (রা)-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিম্নোক্ত হাদীছ বর্ণিত আছে ঃ

قال اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة ونحن نتزكر الساعة فقال لا تقوم الساعة حتى ترروا عشر ايات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة وخروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم والدجال وثلثة خسوف حسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تخرج من قعر عدن تسوق وتحشر الناس تبيت معهم خيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا (مسلم : كتاب الفتن واشراط الساعة ابوداود : كتاب الملاحم باب امارات الساعة) ·

"হুযায়ফা (রা) বলেন, "আমরা এক মজলিসে বসিয়া কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ (স) তাঁহার প্রকোষ্ঠ হইতে নিকট আসিয়া বলিলেন ঃ তোমরা দশটি আলামত না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হইবে না। পশ্চিম দিক হইতে সূর্যোদয়, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, ইয়াজুজ-মাজুজের আত্মপ্রকাশ, ঈসা ইব্ন মারয়ামের অবতরণ, দাজ্জালের আবির্ভাব, তিনটি ভূমি ধ্বস—একটি প্রাচ্যে, একটি পাশ্চাত্যে এবং অপরটি আরব উপদ্বীপে এবং সর্বশেষে এডেনের গুহা হইতে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের প্রকাশ যাহা লোকদিগকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইবে। রাতের বেলা লোকেরা যখন আরাম করিবে, তখন তাহাও তাহাদের পার্শ্বে থামিয়া থাকিবে এবং দুপুরে যখন আরাম করিবে তখন তাহাও তাহাদের পার্শ্বে থামিয়া থাকিবে"।
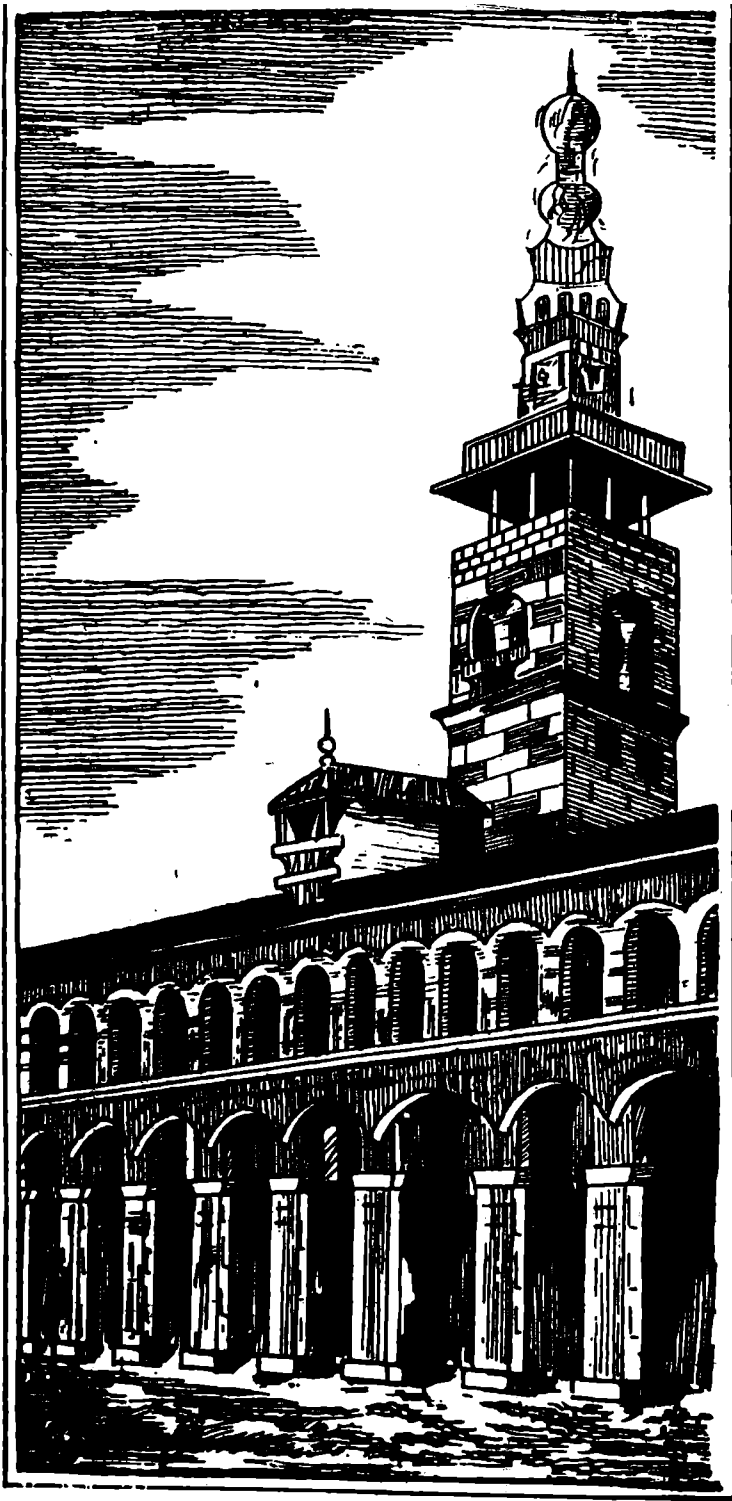
দামিশকের উমায়্যা মসজিদ ও উহার মিনারা, যাহার
উপর হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করিবেন।

(৭) অনুরূপভাবে ইব্ন আবী হাতিম এবং ইব্ন জারীর (র) নাজরানের খৃষ্টান প্রতিনিধি দলের সাথে সংশ্লিষ্ট সূরা নিসার আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া উত্তম সনদ সহকারে রুবাই ইব্ন আনাস (রা)-এর সূত্রে একটি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতেও পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে ঃ

فقال لهم النبی صلی الله علیه وسلم الستم تعلمون أن ربنا حی لا یموت وإن عیسی یأتی علیه الفناء.

"নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিলেন, তোমরা কি জান না যে, আমাদের রব চিরঞ্জীব, তাঁহার কখনও মৃত্যু নাই, অথচ ঈসা (আ)-এর মৃত্যু অনিবার্য" (তাফসীরে ইব্ন জারীর, ৫ম খণ্ড)। নবী (স) এখানে ভবিষ্যত সূচক یاتی (আসিবে) শব্দ বলিয়াছেন।

(৮) ইমাম বায়হাকী তাঁহার 'কিতাবুল আসমা ওয়াস্-সিফাত" গ্রন্থে (পৃ. ৩০১) এবং মুহাদ্দিছ আলী মুত্তাকী তাঁহার কানযুল উম্মাল গ্রন্থে (৭ম খণ্ড, পৃ. ২৬৮) হাসান এবং সহীহ সনদ সূত্রে এই সম্পর্কে যে রিওয়ায়াত বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ঈসা (আ)-এর পুনরাগমনের কথা উল্লেখের সাথে সাথে من السماء (আসমান হইতে) শব্দ পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে।

(৯) ইব্ন জাওযী তাঁহার কিতাবুল ওয়াফা গ্রন্থে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমার (রা) হইতে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলিয়াছেন ঃ

ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له ويمكث خمسا واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى فى قبرى فاقوم أنا وعيسى بن مريم فى قبر واحد بين أبى بكر وعمر.

"ঈসা ইব্ন মারয়াম পৃথিবীতে অবতরণ করিবেন, বিবাহ-শাদী করিবেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততিও হইবে। তিনি এখানে ৪৫ বৎসর অবস্থান করিবেন। অতঃপর তাঁহার ইন্তিকাল হইবে। আমার সঙ্গে, আমারই কবরের পার্শ্বে তাঁহাকে দাফন করা হইবে, আবূ বকর ও উমরের মাঝখানে"।

(১০) জাবির (রা) হইতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ

لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فقال لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة.

"আমার উম্মাতের একদল সত্য দীনের পক্ষে লড়াই করিতে থাকিবে, কিয়ামত পর্যন্ত তাহারা বিজয়ী থাকিবে ইহার পর 'ঈসা ইব্ন মারয়াম অবতরণ করিবেন। মুসলিম নেতা বলিবেন ঃ আসুন, আমাদের ইমামতি করুন। তিনি বলিবেন ঃ না, তোমরাই একে অন্যের আমীর। এ উম্মতের প্রতি আল্লাহ্ প্রদত্ত সম্মানের দিকে খেয়াল রাখিয়া তিনি এইরূপ বলিবেন" (সহীহ মুসলিম)।

মাওলানা সিউহারবী উল্লেখ করেন, বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বর হযরত ঈসা (আ)-এর পুনরাবির্ভাব এবং এখনও তাঁহার জীবন্ত থাকা সম্পর্কে হাদীছ ও তাফসীরের গ্রন্থসমূহে বহু হাদীছ উল্লেখ আছে। সনদের বিচারে তাহা মুতাওয়াতির হাদীছের পর্যায়ের। ইমাম তিরমিযী, ইব্ন কাছীর, ইব্ন হাজার আসকালানী এবং হাদীছের অপরাপর ইমামদের বক্তব্য অনুযায়ী ষোলজন প্রসিদ্ধ সাহাবী এসব হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কতিপয় সাহাবীর দাবি হইতেছে, মহানবী

(স) শত শত সাহাবীর সমাবেশে তাঁহার ভাষণে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে এই বিস্তারিত তথ্য পেশ করিয়াছেন। সাহাবায়ে কিরাম খোলাফায়ে রাশেদার আমলে কোনরূপ সংশয়-সন্দেহ ছাড়াই জনসমাবেশে এইসব হাদীছ বর্ণনা করিতেন। অতএব এইসব বিশিষ্ট সাহাবীর নিকট হইতে যে হাজার হাজার ছাত্র এইসব হাদীছ শুনিয়াছেন তাহাদের মধ্যে এমন সব ব্যক্তিত্ব রহিয়াছেন, যাহারা হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে স্মৃতিশক্তি (ضبط وحفظ), নির্ভরযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ হইতে ইমামত ও নেতৃত্বের মর্যাদা রাখেন। যেমন সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, ইব্ন শিহাব যুহরী, সুফয়ান ইব্ন উয়ায়না, আওযাঈ প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মোটকথা, সাহাবা, তাবিঈন, তাবিউ-তাবিঈন অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগের লোকদের মধ্যে এসব রিওয়ায়াত ও সহীহ হাদিছসমূহ এতটা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং কোনরূপ প্রত্যাখ্যান ছাড়াই এতটা গৃহীত হইয়াছিল যে, হাদীছের ইমামদের কাছে ঈসা (আ)-এর জীবিত থাকা ও তাঁহার পুনরাগমন সম্পর্কিত এসব হাদীছ অর্থ ও ভাবের দিক হইতে মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এই প্রসঙ্গে ইব্ন কাছীর মন্তব্য করিয়াছেন ঃ

فهذه احاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية ابى هريرة وابن مسعود وعثمان بن العاص وابى امامة والنواس بن سمعان وعبد الله بن عمرو بن العاص ومجمع بن حارثة وابى شريح وحذيفة بن أسيد رضى الله عنهم وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه الخ

"অতএব এই সকল হাদীছ যাহা রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট হইতে মুতাওয়াতির পর্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে (তাঁহার সাহাবী) আবু হুরায়রা, ইব্ন মাসউদ, উছমান ইবনুল আস, আবু উমামা, আন-নাওয়াস ইব্ন সাম'আন্, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আমর ইবনুল আস, মুজাম্মি ইব্ন হারিছা, আবূ শুরায়হ্ এবং হুযায়ফা ইব্ন উসায়দ রাদিয়াল্লাহু আনহুম হইতে তাহা বর্ণিত। এসব হাদীছে ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ)-এর অবতরণ পদ্ধতি এবং অবতরণের স্থান সম্পর্কে নির্দেশনা রহিয়াছে (তাফসীর ইব্ন কাছীর, ১ম খ, ৫৭৮, ৫৮৩)।

অবস্থা এই যে, হযরত ঈসা (আ)-এর আসমানী জগতে উত্তোলন, বর্তমানেও তাঁহার জীবিত থাকা এবং উর্ধ্বলোক হইতে তাঁহার পুনরাগমনের উপর উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আকায়েদের প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ আকীদায়ে সাফারীনী (عقيدة سفارينى) -তে বলা হইয়াছে ঃ

ومنها اى من علامات الساعة العظمى العلامة الثالثة ان ينزل من السماء سيد (المسيح) عيسى ابن مريم (عليهما السلام) ونزوله ثابت بالكتاب والسنة واجماع الامة- واما الإجماع فقد اجمعت الامة على نزوله ولم يخالف فيه أحد من احد الشريعة وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة مما لا يعتد بخلافه.

"কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে তৃতীয় নিদর্শন হইল, হযরত (মসীহ) ঈসা ইব্ন মারয়াম (আ) আসমানী জগত হইতে নামিয়া আসিবেন। তাঁহার এই পুনরাগমনের ব্যাপারটি কিতাব (কুরআন), সুন্নাত (হাদীছ) এবং উম্মাতের ইজমা দ্বারা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত।

নিঃসন্দেহে হযরত ঈসা (আ)-এর উর্ধ্ব জগত হইতে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিষয়ে ইসলামী শরী'আতের অনুসারীদের মধ্যে কোন ভিন্নমত নাই। অবশ্য কতিপয় দার্শনিক ও ধর্মদ্রোহী তাঁহার পুনরাগমনের ব্যাপারটি অস্বীকার করিয়াছে। আর ইসলামের দৃষ্টিতে তাহাদের অস্বীকৃতির কোন মূল্য নাই" (মাওলানা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১৪৪-১৪৮)।

পুনরাগমনের পর ঈসা (আ)-এর ভূমিকা

(১) তাজদীদে শরী'আতে মুহাম্মাদী ঃ তিনি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর শরী'আতের বিলুপ্ত অংশ পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কাজ করিবেন। ইমাম কুরতুবী বলেন ঃ "হযরত ঈসা (আ) নূতন শরী'আত নিয়া পুনরাগমন করিবেন না যাহার দ্বারা শরী'আতে মুহাম্মাদী মানসূখ হইয়া যায়, বরং এই শরী'আতের অনুসারীরা যাহা হারাইয়া ফেলিয়াছে তাহা নূতনভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যই পুনরাগমন করিবেন" (তাফসীরে কুরতুবী, প্রগুক্ত, ৪খ, পৃ. ১০১)।

(২) দাজ্জাল হত্যা ঃ হাদীছে বর্ণিত আছে যে, তিনি বাবে লুদের নিকট দাজ্জালকে হত্যা করিবেন। আর লুদ্দ (Lydda) ফিলিস্তীনের অন্তর্গত বর্তমান ইসরাঈল রাষ্ট্রের রাজধানী তেলআবীব হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। ইয়াহূদীরা এখানে একটি বিরাট বিমান বন্দর নির্মাণ করিয়াছে।

(৩) কাফির হত্যা ঃ হাদীছে আরও বর্ণিত আছে যে, তাঁহার দৃষ্টি যতদূর যাইবে নিঃশ্বাসও ততদূর যাইবে এবং উহাতে কাফেরকুল নিধন হইয়া যাইবে (কুরতুবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ৯০)।

(৪) ক্রুশ ভাঙ্গিয়া ফেলাঃ হাদীছে আরও বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ) খৃস্টানদের ক্রুশবিদ্ধ করার মনগড়া ঘটনার প্রতীক ক্রুশকে ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। এভাবে তিনি ইসলামের বিজয়ের ঘোষণা করিবেন।

(৫) তিনি শূকর হত্যা করিবেন। শূকরের মাংস ভক্ষণ প্রতিটি শরী'আতে হারাম (দ্র. লেবীয় পুস্তক, ১১ ঃ ৭-৮)। অথচ খৃস্টানরা নিজেদের মনগড়া মত অনুযায়ী উহার মাংস ভক্ষণকে হালাল করিয়াছে। তাই হযরত ঈসা (আ) শূকর হত্যা করিয়া প্রকাশ করিবেন যে, ইহা খৃস্টানদের ভ্রান্ত নীতি।

(৬) আদল ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ঃ তিনি আদল ও ইনসাফের নীতি অনুযায়ী সমাজ শাসন করিবেন। তাঁহার সময়ে সমাজে শান্তি বিরাজ করিবে। প্রভাবশালী ও শক্তিশালীদের সাথে দুর্বলরা নির্বিঘ্নে জীবন যাপন করিবে। কেহ কাহারো অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবে না। তাঁহার সময়ে সমাজে সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে। সম্পদের কোন অভাব থাকিবে না।

(৭) তিনি এখনও বিবাহ করেন নাই। তাই পুনরাগমনের পর তিনি বিবাহ করিবেন এবং তাঁহার সন্তান-সন্তুতিও হইবে।

অবস্থান কাল ঃ কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি পৃথিবীতে ৪০ বৎসর অবস্থান করিবেন। আবার কোন কোন বর্ণনায় আসিয়াছে, তিনি ৪৫ বৎসর অবস্থান করিবেন। আলূসীর এক বর্ণনায়

দেখা যায় যে, তিনি ২৪ বৎসর থাকিবেন (আলূসী, প্রাগুক্ত, ৩খ, পৃ. ১৬৪)। কিন্তু প্রথমোক্ত বর্ণনাটি অধিক প্রসিদ্ধ।

ইনতিকাল ও দাফন ঃ হযরত ঈসা (আ) দীর্ঘ ৪০ বৎসর জীবন যাপনের পর স্বাভাবিকভাবে ইনতিকাল করিবেন। পূর্বোক্ত হাদীছসমূহের বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁহাকে হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর পার্শ্বে দাফন করা হইবে (মিশকাত শরীফ, ফাসলুছ ছালিছ, বাব নুযূলে ঈসা; কাদিয়ানী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ, পৃ. ১৫৭ হইতে উদ্ধৃত)।

হযরত ঈসা (আ)-এর দেহাবয়ব ঃ বুখারী শরীফে মি'রাজ সম্পর্কিত হাদীছে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলিয়াছেন ঃ ঈসা (আ)-এর সহিত আমার সাক্ষাত হয়। তাঁহার দেহ মধ্যমাকৃতির এবং গায়ের রং লাল-সাদা, পরিচ্ছন্ন দেহ, মনে হইতেছিল এইমাত্র গোসল করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন। কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাঁহার কেশগুচ্ছ কাঁধ পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। কোন কোন হাদীছে তাঁহার দেহের রং গৌরবর্ণ বলিয়া উল্লেখ আছে।

প্রাচীন রোমান রেকর্ড প্রণয়নকারী লেন্টুলাস (Lentulus)-এর বিবরণ হযরত ঈসা সম্পর্কে যাহা আসিয়াছে তাহা সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ "হযরত ঈসা (আ) কর্ণলতিকা পর্যন্ত চুল ছিল, মাথার মধ্য দিয়ে সিঁথি কাটা ছিল এবং তাঁহার দাড়িও মধ্যখানে বিভক্ত ছিল যাহা দেখিতে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বেশ ভূষণ ছিল। তাঁহার ভ্রূ ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট এবং চেহারা ছিল লালচে ধরনের দাগহীন, অকুঞ্চিত, ভাঁজহীন। চক্ষুযুগল ছিল নীলাভ, উচ্চতা মধ্যম ধরনের"।

হযরত ঈসা (আ)-এর স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলী

বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা (আ) যাযাবর জীবন যাপন করিতেন। ইসরাঈলী সমাজে দাওয়াতী কাজ করিতে গিয়া যেখানেই রাত্র হইত সেখানেই তিনি রাত্রি যাপন করিতেন। তবে অধিকাংশ সময় নিরাপত্তার জন্য রাত্রিতে পাহাড়, জঙ্গল ও বাগবাগিচায় অবস্থান করাকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার নির্দিষ্ট কোন ঘরবাড়ি ছিল না। তিনি নগ্নপদে চলাফেরা করিতেন। তিনি নিজের জন্য কোন সম্পদ সঞ্চয় করিতেন না। পানাহারে দৈনিক ব্যবস্থাকেই যথেষ্ট মনে করিতেন। মানবতার দুঃখ-দুর্দশায় তাঁহার অন্তর ছিল সদা বিগলিত। তিনি যেখানেই যাইতেন মনে হইত যেন স্বস্তি ও শান্তির সুবাতাস বহিতেছে। আল-কুরআনে হযরত ঈসা (আ)-এর স্বভাব-চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের কয়েকটি দিক তুলিয়া ধরা হইয়াছে ঃ

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِى الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَّمِنَ الصّٰلِحِيْنَ.

"স্মরণ কর যখন ফেরেশতাগণ বলিল, হে মারয়াম! আল্লাহ্ তোমাকে তাঁহার পক্ষ হইতে একটি কলেমার সুসংবাদ দিতেছেন। তাহার নাম মসীহ, মারয়াম তনয় ঈসা। সে ইহলোক ও পরলোকে

সম্মানিত এবং সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম হইবে। সে দোলনায় থাকা অবস্থায় ও পরিণত বয়সে মানুষের সহিত কথা বলিবে এবং সে হইবে পুণ্যবানদের একজন" (৩ ঃ ৪৫)।

উপরিউক্ত আয়াত পর্যালোচনায় দেখা যায়, হযরত ঈসা (আ)-এর নিম্নবর্ণিত গুণ ও বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ (১) পিতাবিহীন জন্মলাভকারী মানুষ, যেই জন্য আল-কুরআনের একাধিক স্থানে ইবন মারয়াম বলা হইয়াছে। জগতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাহাকে মায়ের নামের সাথে যুক্ত করিয়া এইভাবে ডাকা হয়।

(২) মাতৃক্রোড়ে কথোপকথনকারী শিশু, এমনকি বর্ণিত আছে যে, মায়ের গর্ভে থাকাকালীন মায়ের সঙ্গে কথা বলিয়াছেন (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., পৃ. ৬০)।

(৩) যুক্তিতর্কে পারদর্শী ঃ শৈশব অবস্থা হইতেই তিনি বড় বড় পণ্ডিতদের সাথে যুক্তিতর্কে বিজয় লাভ করিতেন। তখন হইতেই তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার যশ ও খ্যাতি বুদ্ধিজীবী মহলে ছড়াইয়া গিয়াছিল।

(৪) তিনি কালিমাতুল্লাহ, কেননা কোন পুরুষের সংগ ও স্পর্শ ব্যতীত বিনা বাপে একমাত্র আল্লাহ্র নির্দেশে তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাই তিনি কালিমাতুল্লাহ উপাধিতে ভূষিত হন।

(৫) তিনি ছিলেন মসীহ তথা ত্রাণকর্তা ঃ কারণ ইয়াহূদী ধর্ম ব্যবসায়ী ও রোমান শাসকদের তল্পীবাহকদের নিষ্পেষণ হইতে ইসরাঈলী জাতিকে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছিলেন। সেই সমাজের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

(৬) দুনিয়া ও আখেরাতে মহাসম্মানিত ব্যক্তিত্ব, আল-কুরআনের ভাষায় ওয়াজীহ (وجيه)।

(৭) সালিহ্ তথা নেককার ঃ তিনি সদা সৎ ও নেক কাজ করিতেন। যাহা কল্যাণকর তাহাই তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইত। মানবতার কল্যাণে তিনি ছিলেন নিবেদিত।

(৮) মুকাররিব তথা সান্নিধ্যপ্রাপ্তগণের অন্যতম ছিলেন (তাফসীরে মাযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১)। সূরা মারয়ামের অন্য এক আয়াতে হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা উল্লেখ করা হয়। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ اِنِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ اٰتٰنِيَ الْكِتٰبَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا - وَجَعَلَنِيْ مُبٰرَكًا اَيْنَ مَا كُنْتُ وَاَوْصٰنِيْ بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِيْ وَلَمْ يَجْعَلْنِيْ جَبَّارًا شَقِيًّا ۔ وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا ۔

"তিনি বলিলেন, "আমি তো আল্লাহ্র বান্দা, তিনি আমাকে কিতাব দিয়াছেন এবং আমাকে নবী করিয়াছেন। যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করিয়াছেন। তিনি আমাকে নির্দেশনা দিয়াছেন যতদিন জীবিত থাকি ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করিতে। আর আমাকে আমার মাতার প্রতি অনুগত করিয়াছেন এবং তিনি আমাকে করেন নাই উদ্ধত ও হতভাগ্য। আমার

প্রতি শান্তি যেদিন আমি জন্মলাভ করিয়াছি, যেদিন আমার মৃত্যু হইবে এবং যেদিন জীবিত অবস্থায় আমি পুনরুত্থিত হইব" (১৯ ঃ ৩০-৩৩)।

উপরিউক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, (১) তিনি আবদুল্লাহ তথা আল্লাহ্র বান্দা। আল্লাহ্র ইবাদতেই তিনি তৃপ্তি লাভ করিতেন। তিনি কোন ইলাহ বা প্রভু নহেন। এই পরিচয় দিতেই তিনি গর্ববোধ করিতেন। আল-কুরআনে এই ব্যাপারে উল্লেখ করা হয় ঃ

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۔ وَمَنْ يَّسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهٖ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ اِلَيْهِ جَمِيْعًا ۔

"মসীহ আল্লাহ্র বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করে না এবং ঘনিষ্ঠ ফেরেশতাগণও নহে এবং কেহ তাঁহার বান্দা হওয়াকে হেয় জ্ঞান করিলে এবং অহংকার করিলে তিনি তাহাদের সকলকে তাঁহার নিকট একত্র করিবেন" (৪ ঃ ১৭২)।

(২) তিনি ছিলেন আল্লাহর নবী, যাহাকে আল্লাহ্ পাক একক আসমানী কিতাব দিয়াছেন তাহা হইল ইনজীল শরীফ।

(৩) তিনি ছিলেন বরকতময়। যেখানেই তিনি যাইতেন আর্তমানবতার সেবা করিতেন। সেখানে আল্লাহ পাক বরকত নাযিল করিতেন। মানুষ সুখ সমৃদ্ধি লাভ করিত।

(৪) তিনি ছিলেন মায়ের প্রতি সদাচারী। তিনি মায়ের আদেশ-নিষেধ ও আশা-আকাংক্ষার প্রতি ছিলেন শ্রদ্ধাশীল ও সদানুগত। মায়ের শোক-দুঃখ ও ইজ্জত-সম্মান রক্ষায় তিনি ছিলেন সদা সচেষ্ট। এই হইল আল-কুরআনে হযরত ঈসা (আ)-এর মায়ের প্রতি আচার-আচরণের বিবরণ। পক্ষান্তরে খৃস্টানদের লিখিত সুসমাচারে দেখা যায়, তিনি মায়ের প্রতি কোন এক সময় যথাযথ শ্রদ্ধা দেখান নাই (দ্র. লূক, ৮ ঃ ১৯-২১)।

(৪) তিনি ছিলেন বিনয়ী (আলূসী, ১৬খ, পৃ. ৯০) ও সৌভাগ্যবান। তিনি উদ্ধত স্বভাবের লোক ছিলেন না এবং দম্ভভরে চলিতেন না। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য ও সম্মান দান করিয়াছেন। তাই সকল দিক দিয়া তিনি একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি।

(৫) তিনি ছিলেন শান্তির বার্তাবাহক ঃ তাঁহার জন্ম মৃত্যু জীবন সকল অবস্থায় শান্তির প্রতীক হিসাবে গণ্য হইয়াছে। আল-কুরআনের অন্য কয়েকটি আয়াতে তাঁহাকে আরও অনেকগুলি গুণে গুণান্বিত ও বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হয়। যেমন ঃ

(১) তিনি ছিলেন রূহুল কুদুস (روح القدس) তথা পবিত্র আত্মার দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত। পবিত্র আত্মা বলিতে জিবরাঈল আমীনকে বুঝানো হইয়াছে (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৭৪-৭৫, ৭৭)। আল্লাহর বাণী ঃ

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجٰتٍ وَاٰتَيْنَا عِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنٰتِ وَاَيَّدْنٰهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۔

"এই রাসূলগণ! তাহাদের মধ্যে কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছি। তাহাদের মধ্যে এমন কেহ রহিয়াছে যাহার সহিত আল্লাহ্ কথা বলিয়াছেন। আবার কাহাকেও উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছেন। মারয়াম তনয় ঈসাকে স্পষ্ট প্রমাণ প্রদান করিয়াছি ও পবিত্র আত্মা তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছি" (২ ঃ ২৫৩)।

(২) তিনি ছিলেন ফায়সাল তথা মানুষের মাঝে বিভিন্ন মতানৈক্য ও বিবাদ মীমাংসাকারী। যেমন, আল-কুরআনে আসিয়াছে ঃ

قَدْ جِئْتُكَ بِالْحِكْمَةِ وَلأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِىْ تَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ ـ

"আমি তো তোমাদের নিকট আসিয়াছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করিতেছ তাহা স্পষ্ট করিয়া দিবার জন্য" (৪৩ ঃ ৬৩)।

(৩) তিনি ছিলেন মানব দরদী ও নরম হৃদয়ের অধিকারী (ইবন কাছীর, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৭৩)। আল-কুরআনে তাঁহার অনুসারীদের সম্পর্কে বলা হয়ঃ

وَجَعَلْنَا فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ـ

"আর আমি তাহার অনুসারীদের অন্তরে দিয়াছিলাম করুনা ও দয়া" (৫৭ ঃ ২৭)।

অতএব এই আয়াত দ্বারা বুঝা যাইতেছে তিনি যেইরূপ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, তাঁহার অনুসারিগণকেও সেইভাবেই তৈরি করিয়াছিলেন।

(৪) সর্বোপরি তিনি ছিলেন উলুল আযম (দৃঢ় প্রতিজ্ঞ) রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত। এই মর্মে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْحٍ وَّاِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ـ

"স্মরণ কর যখন আমি নবীদিগের নিকট হইতে অংগীকার গ্রহণ করিয়াছিলাম এবং তোমার নিকট হইতেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা, মারয়াম তনয় 'ঈসার নিকট হইতেও। তাহাদের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম দৃঢ় অংগীকার" (সূরা আহযাব ঃ ৭)।

হযরত ঈসা (আ) বৈষয়িক কোন স্বার্থ বা ভোগ-বিলাসে মত্ত ছিলেন না, বরং এই সবের প্রতি তাঁহার কোন আগ্রহ ছিলনা। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। আল্লাহর একজন মহান রাসূল হিসাবে দাওয়াতী কাজেই তাঁহার সকল চিন্তা-চেতনা ও কাজকর্ম নিষ্ঠার সাথে নিয়োগ করিয়াছিলেন। আল্লাহর রাসূল হিসাবে যাহাদের প্রতি তিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন সেই ইসরাঈল জাতির মধ্যে থাকিয়াই গ্রামে গঞ্জে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার রিসালাতের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। তিনি সমাজমুখী দাঈগণের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে বর্তমান খৃস্টবাদ

উল্লেখ্য, হযরত ঈসা (আ) ছিলেন যুগে যুগে আসা নবীগণের অন্যতম। তাঁহার দাওয়াতের মূল কথা ছিল, জীবনবিধান হিসাবে আল্লাহ্ প্রদত্ত বিধিবিধান মানিয়া লওয়া। তাঁহার একনিষ্ঠ ও

সার্বক্ষণিক সহচর হাওয়ারীগণ আল-কুরআনের বর্ণনামতে নিজেদেরকে মুসলিম বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইরশাদ হইয়াছে ঃ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ (৩ ঃ ৫২)। তবে তাহারা পরবর্তী সময়ে নিজদিগকে নাসারা বলিয়া পরিচয় দিত। আল-কুরআনে ইরশাদ হইয়াছে ঃ وَمِنَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصَارٰى (৫ ঃ ১৪)। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারীদিগকে নাসরাতী বলা হইত। নাসরাত সেই গ্রামের নাম যেখানে হযরত ঈসা (আ) তাঁহার শৈশবের কিছুদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন (দ্র. মথি, ২ ঃ ২৩, ৪ ঃ ১৩)। সম্ভবত এই সম্পর্কের কারণেই ঈসাকেও মাসীহ নাসিরী (Jesus of Nazareth) এবং তাঁহার অনুসারিগণকে নাসারা (Nazarasenes) নামে অভিহিত করা হয় (দ্র. মূল ধাতু, Encyclopaedia of Religion and Ethics, Christian শীর্ষক প্রবন্ধ)।

আল-কুরআনে খৃস্টান সম্প্রদায় বুঝাইতে নাসারা (نصارى) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আর তাহাদের মতবাদকে আরবীতে বলা হয় نصرانى নাস্রানিয়্যাহ (نصرانية)। কিন্তু আল-কুরআনে কখনও হযরত ঈসার অনুসারিগণকে মাসীহী (مسيحى) কিংবা তাহাদের মতবাদকে মাসীহিয়্যাত (مسيحية) তথা খৃস্টবাদ বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। হযরত ঈসা (আ) কোন মতবাদকে খৃস্টবাদ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন—এই ধরনের কোন প্রমাণ নাই। ইহা হইতেই বুঝা যায় উক্ত শব্দটি তাহাদের দ্বারা পরবর্তীতে উদ্ভাবিত হইয়াছে। যাহা হউক, এই খৃস্টবাদের অনুসারীরা হযরত ঈসা (আ)-এর অনুসারী বলিয়া দাবি করে। হযরত ঈসা (আ) সম্পর্কে তাহারা বিভিন্ন রকম আকীদা পোষণ করিয়া থাকে, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন ধরনের আচার অনুষ্ঠান প্রতিপালন করে ও বিধিবদ্ধ আইন রচনা করে। আর এইসব আকীদা-বিশ্বাস, উৎসব, বিধিবিধান একদিনে গড়িয়া উঠে নাই। বরং দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সেইগুলি জন্ম ও বিকাশ লাভ করে। নিম্নে সংক্ষেপে কিছু বিবরণ পেশ করা হইল ঃ

খৃস্টবাদ ও খৃস্টসমাজের ইতিহাস

হযরত ঈসা (আ)-এর যুগ হইতে আধুনিক যুগ পর্যন্ত খৃস্টবাদের ইতিহাসকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। (ক) হাওয়ারীগণের যুগ; (খ) বিশ্বব্যাপী খৃস্টধর্ম প্রচারের যুগ; (গ) কাউন্সিল যুগ; (ঘ) অন্ধকার যুগ; (ঙ) মধ্যযুগ; (চ) সংস্কার যুগ বা আধুনিক যুগ।

(ক) হাওয়ারীগণের যুগ ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্ব গমনের পরে হাওয়ারীদের যুগ শুরু হয়। এই সময়ের ঘটনাবলীর ইতিহাস অনেকটা অজ্ঞাত। এক বর্ণনায় দেখা যায় যে, হযরত ঈসা (আ)-এর ঊর্ধ্বারোহণের সময় তাঁহার অনুসারীদের সংখ্যা ছিল ১২০ জন (প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, ১ ঃ ১৪)। তন্মধ্যে এগারজন শাগরিদ এমন ছিলেন যাহারা হযরত ঈসা (আ)-এর সহিত অপেক্ষাকৃত বেশি সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই এগারজন শাগরিদ ও তাহাদের কর্ম প্রচেষ্টার উপরই খৃস্ট ধর্মের ভবিষ্যৎ নির্ভশীল ছিল।

ঈসা (আ)-এর ধর্ম প্রচারে ভীত হইয়া তাহার বিরোধীরা যে অত্যাচার ও নির্যাতনের সুচনা করিয়াছিল তাহা ঈসা (আ)-কে উঠাইয়া লইবার পরও অব্যাহত থাকে। ঈসা (আ)-এর পর তাঁহার

শাগরিদগণকে ক্রুশবিদ্ধ হইতে হইয়াছিল (দ্র. প্রেরিতদের কার্যবিবরণী, ইব্ন হাযম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৩)। হযরত ঈসা (আ)-এর পরও তাঁহার অনুসারীদের প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তাহাদের ধর্ম প্রচারের পক্ষে অনুকূল জনমত সৃষ্টি হয়। ফলে তাহাদের ধর্মের উত্তরোত্তর প্রসার হইতে থাকে। তখন শাউল (Saul) নামক এক ইয়াহূদী পণ্ডিত তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করে। এই ব্যক্তি প্রথম খৃস্টধর্মের ঘোর বিরোধী ছিল এবং ঈসা (আ)-এর অনুসারীদের উপর নির্যাতনও চালাইয়াছিল (প্রেরিত, ১৩ ঃ ২)।

বার্ণাবাসের সুপারিশক্রমে অন্য এগারজন হাওয়ারীও তাহাকে তাহাদের সহযোগী বলিয়া গ্রহণ করিয়া নিলেন। তাহার পূর্বনাম পরিবর্তন করিয়া "পৌলস" নামকরণ করিলেন। তাহার পর হইতে পৌলস এবং হাওয়ারীগণ মিলিয়া খৃস্ট ধর্মের প্রচার প্রসার-এর কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে খৃস্ট ধর্ম এতটুকু সফলতা লাভ করিল যে, ইয়াহূদী সম্প্রদায় ছাড়া বাকী প্রায় সকলেই খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হইল। এই মহান দাওয়াতের অন্তরালে পৌল অত্যন্ত সুকৌশলে খৃস্ট সমাজে নিজের প্রভাব-প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। এমনকি তিনি ক্রমান্বয়ে খৃস্ট সমাজে "যীশুর মহান আত্মত্যাগ" এবং "খোদার পুত্র যীশুর মানবরূপে আগমন" ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণা কৌশলে প্রচার করা শুরু করিলেন।

যাহাই হউক, হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্ম গ্রহণের পর পৌল বা 'পল' আরব (দামিশকের দক্ষিণাঞ্চলে) পরিভ্রমণে বাহির হন। এইখানে তিনি তিন বৎসর যাবত নিজের নূতন বিশ্বাসের উপর চিন্তাভাবনা করিতে থাকেন (Mackinon Yames, From Christ to Constantine, লন্ডন ১৯৩৬ খৃ., পৃ. ৯১) অথবা নিজ পদমর্যাদার সুযোগ গ্রহণ করিয়া নূতন অভিজ্ঞতার আলোকে ধর্মের নূতন ব্যাখ্যা দানের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে সময় অতিবাহিত করেন (দ্র. Ency. Britannica, ১৭খ, ৩৮৯, Paul শীর্ষক প্রবন্ধ)। ইহা খৃস্ট ধর্মের ভবিষ্যতের জন্য নূতন কর্মপন্থা গ্রহণের প্রস্তুতি পর্ব ছিল। এইজন্যই প্রায় সকল প্রাচীন ও আধুনিক বিশেষজ্ঞ এই ব্যাপারে একমত যে, "পল" ঈসা (আ)-এর খৃস্টধর্মের স্থলে স্বীয় "মাসীহিয়াত" সৃষ্টি করিয়া ঈসা (আ)-এর ধর্মে ইহার অনুপ্রবশ ঘটান। এইভাবে ঈসা (আ)-এর পরিবর্তে পল-ই হইলেন খৃস্টধর্মের প্রবর্তক (বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্র. ইবন তায়মিয়া, আল-জাওয়াবুস সাহীহ লিমান বাদদালা দীনা'ল-মাসীহ (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح), কায়রো ১৩২২-২৩ হি.; Ency. Britannica, Christianity Paul: (খ. ৪) ও Paul (খ. ১৭) প্রবন্ধ দুইটি; Loewnich, his life and works, অনু. G. H. Herir, The wazarene Gospel Restored, Cassal ১৯৫ ম, ১৯ ঃ ২১; তাকী উসমানী, ঈসা'ইয়াত কা বানী কেনি হায়? 'বাইবেল সে কুরআন তক' গ্রন্থের ভূমিকায়, পৃ. ১০৩-১৭৭)।

ঈসা (আ)-এর শাগরিদগণ প্রথমে সরল বিশ্বাসে পৌল-এর প্রতি সমর্থন দান করেন। কিন্তু পরে যখন তাহার আসল রূপ বুঝিতে পারেন, তখন তাহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকেন (বাইবেল সে কুরআন তক, পৃ. ১৪০-১৭৪)।

তাহার প্রভাব খাটাইয়া "জেরুসালেম কাউন্সিলের মাধ্যমে ঈসা (আ)-এর অনুশাসনের বিপরীতে অন্য সম্প্রদায়ের ঈসাঈগণকে ইয়াহূদী শরীআত ও খতনা অনুশাসনের পাবন্দী হইতে মুক্ত করিয়া দেন। জেরুসালেমের কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্ত পরবর্তী কাউন্সিলসমূহের জন্য নজীর হইয়া রহিল। আর এইভাবে পৌলের মতবাদ কাউন্সিলসমূহের মাধ্যমে ঈসা (আ)-এর ধর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এই শতাব্দীতে মোটের উপর খৃস্ট ধর্মের যথেষ্ট উন্নতি ও সাফল্য অর্জিত হয়। এই সময়ই ইনজীল চতুষ্টয় এবং অন্য কয়েকটি ইনজীলও (দ্র. ইনজীল) লিখিত হয়।

(খ) বিশ্বব্যাপী খৃস্ট ধর্ম প্রচারের যুগ ঃ ঈসা (স)-এর হাওয়ারীগণ-যেখানে খৃস্টধর্মকে শুধু বানূ ইসরাঈলের মধ্যে প্রচার করিতেছিলেন সেখানে পল এই ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাহা বানূ ইসরাঈলের বাহিরেও প্রচারের চেষ্টা চালায়। তাহার অনুসারীদের মাধ্যমে তখন এই ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যে ছড়াইয়া যায় এবং আফ্রিকা, আরব ও গ্রীকবাসিগণ এই ধর্মে প্রবেশ করিতে থাকে।

কাউন্সিল যুগ (১০১-৫৯০) ঃ খৃস্টধর্ম বিস্তারের এই যুগটিও অত্যন্ত গুরুত্বের অধিকারী। এই যুগে খৃস্টধর্ম রোম সাম্রাজ্যে, বিশেষত ফিলিস্তীন ও এশিয়া মাইনরে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পৌল মতবাদের খোলামেলা নীতির ফলে এই যুগে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক চিন্তাধারা এবং আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচ্য-আধ্যাত্মিক প্রভাব খৃস্টধর্মে অনুপ্রবেশ করে এবং এইভাবে সহজ সরল খৃস্টধর্মকে দার্শনিক তত্ত্বের পোশাক পরিধান করাইয়া ত্রিত্ববাদের ঘূর্ণায়মান আবর্তে চিরদিনের জন্যে নিক্ষেপ করে (Ency. Religion and Ethics, Christianity শীর্ষক প্রবন্ধ, ৩খ, ৮৮৯)।

অতঃপর কনস্টানন্টাইন (৩০৬-৩৩৭) কর্তৃক খৃস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে স্বীকৃতি প্রদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে খৃস্টানদের উপর অত্যাচার নিপীড়ন চলিত, কিন্তু ইহার পর অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। এই যুগে খৃস্টধর্ম অনেক দেশে প্রসার লাভ করে (Ency. Britannica, ৪খ, পৃ. ৪৬০)। কনসটানটাইন কনস্টান্টিনোপলের ভিত্তি স্থাপন করেন যাহা পরবর্তী কালে প্রাচ্য গির্জার সদর দফতর-এ পরিণত হয় এবং কনস্টান্টিনোপল সূ'র, বায়তুল মুকাদ্দাস, রোম প্রভৃতি স্থানে গির্জা নির্মাণ করে এবং খৃস্টান ধর্মযাজকদের বড় বড় সম্মান ও বৃত্তি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে ধর্মের সেবায় নিয়োজিত করে।

কন্‌স্‌টান্‌টাইনের সময় হইতে এক নূতন প্রথার সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় বিষয়ে ব্যাখ্যা দানের জন্য কাউন্সিল বা অনুষ্ঠানের প্রথা তখন হইতে শুরু হয়। এইজন্য এই যুগকে পর্ষদ যুগ (age of councils) বলা হইয়া থাকে। কন্‌স্‌টান্‌টাইনের আমলে সর্বপ্রথম কাউন্সিল ৩২৫ খৃস্টাব্দে নেকিয়া (Necaea) নামক স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। এই কাউন্সিলেই প্রথমবাবের মত ত্রিত্ববাদকে ধর্মের মূল বিশ্বাসরূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় এবং উহার বিরোধীকে (যথা আরিয়ূস-Arius প্রমুখকে) ধর্মচ্যুত বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। এই উপলক্ষেই প্রথমবারের মত খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাস ও চিন্তাধারা সংকলিত হয়, যাহা "আথানসীয় বিশ্বাস" (Athanasiwn Creed) নামে খ্যাত। এই বিশ্বাসসমূহ এত অস্পষ্ট ও জটিল ছিল যে, ইহা আরও অধিক মতবিরোধ ও বিবাদের সৃষ্টি করে যাহার মীমাংসার

জন্য আরও বহু কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (দ্র. Ency. Britannica, From Christ to Constantine)। এইভাবে খৃস্ট ধর্মে ঈসা (আ)-এর শিক্ষা ও ইনজীলের বাণীর প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং এতদস্থলে পৌলীয় চেতনা বা প্রভাবশালী শ্রেণীর আধিপত্য চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কারণেই কুরআন মাজীদে তাহাদিগকে নিজেদের "ধর্মগুরুদের" (احبار و رهبان) প্রভুত্বের প্রবক্তা হইবার জন্য বারবার অভিযুক্ত করা হইয়াছে (দ্র. ৯ ঃ ৩১)।

এই যুগের অপর বৈশিষ্ট্য ছিল বৈরাগ্যবাদ। বৈরাগ্যবাদের প্রকৃতি এই ছিল যে, দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম বাদ দিয়াই শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি সম্ভব। আত্মাকে যত বেশী কষ্ট দেওয়া হইবে, তত বেশী আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব হইবে। বৈরাগ্যবাদের এই প্রবণতা চতুর্থ শতাব্দীতে শুরু হইলেও বৃটেন এবং ফ্রান্সে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইহার বিস্তৃতি ঘটে এবং সংসার বিরাগীদের অনেকগুলি ধর্মীয় আস্তানা গড়িয়া উঠে। চতুর্থ শতাব্দীর 'পাকাম মিশরী' ইয়াকম, বাসিলিয়ূস ও জেরোমি (gerome) এই পদ্ধতির বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই সন্ন্যাসব্রত পার্থিব উদ্দেশ্য ও লোভ-লালসা চরিতার্থের মাধ্যমে পরিণত হয় (দ্র. ৫ ঃ ২৬)।

রাষ্ট্র ও গির্জার মধ্যকার প্রাথমিক বিরোধের সূচনাও এই সময়ই ঘটে। তবুও মোটের উপর এই সময় তদানীন্তন রাষ্ট্রক্ষমতার প্রভাব ও প্রতিপত্তি ধর্মীয় সম্প্রদায় ও তাহাদের জীবনের উপর অক্ষুণ্ন ছিল। পরবর্তী যুগে এই বিরোধ আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করে।

(ঘ) অন্ধকার যুগ ঃ ৫৯০ খৃস্টাব্দে গ্রেগরী পোপ-এর মার্যদায় অভিষিক্ত হন। গ্রেগরী (Gregory) হইতে শার্লামেন (Charlamagne) পর্যন্ত (৮০০ খৃস্টাব্দ / ১৮৪ হিজরী) এই দীর্ঘ সময়কালকে খৃস্টীয় ঐতিহাসিকগণ অন্ধকার যুগ (Dark age) নামে আখ্যায়িত করিয়া থাকেন। এক কথায় বলিতে গেলে খৃস্টধর্মের ইতিহাসে এই সময়টি ছিল সার্বিক দেউলিয়াত্বের যুগ। কারণ রাজনৈতিক সামাজিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রসহ সকল দিক ও বিভাগে অধঃপতন ঘটে এবং তাহারা পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত ছিল। এই আমলে প্রাচ্য জগত মুসলমানদের অধীনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগত খৃস্ট ধর্মের প্রভাবাধীন জ্ঞান-বিজ্ঞান বর্জিত গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল।

এই যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, খৃস্টানগণ পাশ্চাত্যে উহার প্রচার ও প্রসারে এক বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে এবং ইউরোপের শহর, নগর ও পল্লীসমূহে খৃস্টধর্মের ব্যাপক প্রচারের সূচনা করে। এই আন্দোলনের ফলে প্রথম বারের মত জার্মানী, বৃটেন ইত্যাদি দেশগুলিতে রোমক খৃস্টানদের সাফল্য সূচিত হয় এবং সর্বপ্রথম খৃস্টধর্ম প্রভাবশালী হয়। চতুর্থ শতাব্দীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক শত্রুতার ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও চার শতাব্দীর অবিরাম প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র ইউরোপ খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, এই যুগে খৃস্ট ধর্মকে প্রাচ্যে এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী 'ইসলাম'-এর সহিত মুকাবিলা করিতে হয়। এই সময় ইসলামের জ্যোতি দেখিতে দেখিতে প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়ে। খৃস্টান জনসাধারণ খৃস্টান শাসক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অত্যাচারে নিষ্পেষিত ছিল।

এই কারণে এতদঞ্চলে ইসলাম অত্যন্ত বিস্ময়কর দ্রুততার সহিত বিস্তৃত হইতে থাকে এবং শীঘ্রই ইসলাম আরব উপদ্বীপ হইতে মিসর, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, পশ্চিম আফ্রিকা, স্পেন ও যুগোশ্লাভিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিলে ইসলামী আদর্শের প্রবল দৃঢ়তা ও প্রতিপত্তির মুকাবিলায় পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রে খৃস্ট ধর্মের কর্তৃত্বে ভাঙ্গনের সূচনা হয় (Enc. of Relg. and Ethics. ৩খ, ৫৮৯)।

(ঙ) মধ্যযুগ ঃ ৮০০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৫১৭ খৃস্টাব্দ (হিজরী ১৮৪-৯২৩) পর্যন্ত সময়কে খৃস্টধর্মের ইতিহাসে মধ্যযুগ (Mediaeval era) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, সম্রাট বনাম পোপের বিরোধ গৃহযুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করে। আলফ্রেড এ গাওয়ার এই যুগকে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করিয়াছেন ঃ

(১) শার্লামেন (Charlemagne) হইতে সপ্তম গ্রেগরী (Gregory) পর্যন্ত সময় (৮০০ খৃ/ ১৮৪ হি. থেকে ১০৭৩ খৃ./ ৪৬৬ হি.) ঃ এই সময় পোপতন্ত্রের উন্নতি সাধিত হয় এবং তাহার বিপরীতে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে।

(২) সপ্তম গ্রেগরী হইতে অষ্টম বনিফেস (Boniface)-এর সময়কাল পর্যন্ত (১০৭৩ খৃ./ ৪৬৬ হি. হইতে ১২৭৪ খৃ./ ৬৯৩ হি.)ঃ এই যুগে পশ্চিম ইউরোপে পোপের পূর্ণ আধিপত্য বিস্তারিত হয়।

(৩) অষ্টম বনিফেস হইতে সংস্কার যুগ পর্যন্ত সময় (১২৯৪ খৃ. ৬৩৯ হি./ হইতে ১৫১৭ খৃ./ ৯২৩ হি.)ঃ এই সময় পোপতন্ত্রের পতন হয় এবং উহার বিরুদ্ধে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয় (Encyclopaedia of Religion and Ethics, Cristianity, vol. 3, P. 589-596)।

(ক) প্রচণ্ড মতবিরোধের (Great Schism) যুগঃ Great Schism খৃস্ট সংস্কৃতির এক ঐতিহাসিক পরিভাষা। পূর্ব এবং পশিমের গির্জা সংস্থাসমূহের মধ্যকার প্রচণ্ড মতবিরোধকে বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ঐ মতবিরোধকে কেন্দ্র করিয়া গিয়া সংস্থাসমূহ সর্বকালের জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এমনকি তাহা নিজেদের জন্য পৃথকভাবে (The holy orthodox Church) "সনাতন গির্জা" নামও নির্ধারণ করিয়া নেয়। কন্‌সটানটিনোপলে ইহার কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং ইহার প্রধানকে প্যাট্রিয়াক (Patriach) বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়। অন্যদিকে রোমে (ইটালি) স্থাপিত হয় পাশ্চাত্য গির্জার সদর দফ্‌তর এবং উহার প্রধান "পোপ" (Pope) নামে অভিহিত হন। এই বিভেদ শুধু আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং ইহা হইতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও ভাবধারাতেও অনেক বিরোধের সৃষ্টি হয় (নিম্নে দ্র.) মুসলমানদের কন্‌স্‌টান্টিনোপল বিজয়ের পর প্রাচ্য গির্জার পতন ঘটে। (Adenry : The Greek and Eastern Churches, p. 241, as quoted by the Ency. of Religion and Ethics, vol. ৩ P. 590)।

(খ) ধর্মযুদ্ধ (Crusade ক্রুসেড) ঃ খৃস্টধর্মের ইতিহাসের মধ্যবর্তী যুগের অন্যতম ঘটনা ছিল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। খৃস্টান ইতিহাসবেত্তাগণ ধর্মযুদ্ধসমূহকে গুরুত্বের সহিত স্মরণ করিয়া থাকেন। হযরত ওমর (রা)-এর সময় বায়তুল মুকাদ্দাস, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি অঞ্চল ইসলামের অধিকারে

আসে। এই সময় খৃস্টান দুনিয়া অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত ছিল। পরবর্তীতে মুসলমানদের শক্তি ও ইসলামের বিস্তৃতিতে কিঞ্চিৎ ভাটা পড়িলে এবং মুসলমানদের ঐক্যে কিছুটা দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইলে খৃস্টান নৃপতিবর্গ ধর্মীয় নেতাদের উস্কানিতে পুনরায় বায়তুল মুকাদ্দাস দখলে অগ্রসর হয়। পোপ 'আরবান দ্বিতীয়' কেলমোন্টে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে স্পষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, "এই যুদ্ধ ধর্মযুদ্ধ"। সি. পি. এইচ. কেলর্ক তাঁহার লিখিত গির্জার ইতিহাসে বলেন, "সাধারণ খৃস্টানদের উস্কাইয়া দেওয়ার জন্য আরবান ঘোষণা দিলেন যে, এই যুদ্ধে যাহারা অংশগ্রহণ করিবে তাহারা কোন বাধা-বিপত্তি ব্যতিরেকে জান্নাতে প্রবেশ করিবে"।

এইভাবে খৃস্টানরা একে একে সাতটি ক্রুসেডে লিপ্ত হয়। শেষ পর্যন্ত মুসলিম সেনাপতি সালাহুদ্দীন আইয়ূবীর হাতে খৃস্টান সাম্রাজ্যের শোচনীয় পরাজয় ঘটে (মুহাম্মাদ আকবর খাঁন, ক্রুসেড ওর জিহাদ, একাডেমী সিনদ সাগর, লাহোর ১৯৬১ খৃ.; মুহাম্মদ তকী উসমানী, প্রাগুক্ত)।

(গ) ধর্মীয় নেতাদের অনৈতিক আচরণ ঃ ক্রুসেডসমূহে গ্লানিকর পরাজয়ের পর পোপের কর্তৃত্বে ধ্বস নামে। পবিত্র পদমর্যাদাকে রাজনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার শুরু হয়।

(ঘ) মীমাংসার ব্যর্থ প্রয়াস ঃ পোপদের এসব ধর্মবিরোধী কার্যকলাপ সংশোধনের মানসে অনেক মনীষী আগাইয়া আসেন। তাহাদের মধ্যে উয়াই ক্লিফ (Wye klife-মৃত্যু ১৩৮৪ খৃ. ৭৮৬ হি.)-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি সৎ ও খোদাভীরু পোপ মনোনয়নের দাবি জানান এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন, যাহা ১৩৮৫ খৃ. (৭৮৭ হি.) প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতোপূর্বে অন্য ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ অমার্জনীয় অপরাধ বলিয়া গণ্য হইত। পরবর্তীতে জন হার্স (John hurse) এবং যেরন (Geromn) এইসব বিরোধ মীমাংসার জন্য আগাইয়া আসেন। কিন্তু বেদনাদায়ক হইলেও সত্যি যে, খৃস্ট সমাজ মনীষীবর্গের মূল্যায়ন করিতে প্রস্তুত ছিল না। এই দ্বন্দ্ব নিরসনের উদ্দেশ্যে ১৪০৯ সালে (৮১২ হিজরী) কাউন্সিল অব পীসা (Council of Pisa)-এর আয়োজন করা হয়। কিন্তু কুসংস্কার পূর্বাবস্থায় বহাল থাকিয়া গেল।

(চ) সংস্কার যুগ বা আধুনিক যুগ (১৫১৮ খৃস্টাব্দ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত) ঃ জার্মানীতে মার্টিন লুথার (Martin Luther ১৪৮৩ খৃ. /৮৮৮ হি. হইতে ১৫৫৩ খৃ./ ৯৫০ হি.) উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। লুথার পোপদের আধিপত্য, অনৈতিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলেন। ক্রমে তাঁহার সংস্কার আন্দোলন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। সংস্কারপন্থীরা প্রোটেস্ট্যান্ট (Protestants) নামে অভিহিত হয়। অন্যদিকে ফরাসী সুইজারল্যান্ডে ১৫৪৬ খৃ. এই আন্দোলন শুরু হয় এবং জন ক্যালভিনের (John Calvin; ১৫০৯ খৃ. হইতে ১৫৬০ খৃ.) জেনেভা পৌঁছানোর (১৫৩৬ খৃ.) সঙ্গে সঙ্গে উহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। শীঘ্রই ইহাদের সমর্থনে ফ্রান্স, ইটালী ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে আন্দোলন দানা বাঁধিয়া উঠে। বৃটেনের রাজা অষ্টম হেনরী ও চতুর্থ এডওয়ার্ড ইহাতে প্রভাবিত হইয়া পড়েন। এইভাবে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় ক্যাথলিক গির্জার বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী জোট গঠনে সাফল্য অর্জন করে (ইসলামী বিশ্বকোষ, নাসারা, ১৪শ খ, পৃ. ৪৬)।

যুক্তির (Rationalism) যুগ ঃ প্রথম দিকে খৃষ্ট ধর্মের সংস্কারকগণ কেবল পোপতন্ত্রের ক্ষমতা ও তৎকর্তৃক প্রবর্তিত অবৈধ নিয়ম-কানুনকেই আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু আন্দোলনে ক্রমে ক্রমে যেই গতি সঞ্চারিত হইতে থাকে অমনি উহার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময়ে ইউরোপ পূর্ণ মাত্রায় রাজনৈতিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সচেতনতার স্তরে পৌঁছায়। সুতরাং মানুষের মনে খৃষ্ট ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসসমূহ সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এখন জনগণ দাবি করিতে থাকে, যাহা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নীতিমালার আলোকে উত্তীর্ণ হইবে না তাহা আমরা মানিব না। এই আন্দোলনকে যুক্তির (Rationalism) আন্দোলন এবং আন্দোলনকারীদের যুক্তিবাদী (Rationalist) নামে অভিহিত করা হয়। যুক্তির এই আন্দোলন বৃটেন ও আমেরিকাতে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে সীমিত সংখ্যক ধর্মীয় শ্রেণী ব্যতীত ইউরোপের অধিকাংশ খৃস্টানই নামে মাত্র খৃস্টান।

পুনর্জাগরণ ঃ যুক্তিবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রয়াস ধর্মীয় শ্রেণীর তরফ হইতে আসে। তাহারা উক্ত আন্দোলনের জওয়াবে প্রাচীন ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন আন্দোলন (Catholic Revival Movement) শুরু করে। পুনরুজ্জীবনের এই আন্দোলন সামগ্রিকভাবে বড় রকমের কোন প্রভাব বিস্তারে সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই।

খৃ. ১৮শ, ১৯শ ও ২০শ শতাব্দীতে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টট্যান্ট উভয় সম্প্রদায় ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সহিত মিলিত হইয়া যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে। এই কারণে Encyclopaedia Britannica-তে উক্ত শতাব্দীগুলিকে খৃস্টধর্ম প্রচারের শতাব্দীরূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছে। বর্তমানে খৃস্টানগণ নিজেদের সম্পদ ও সমৃদ্ধির সহায়তায় উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বকে নিজেদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রে পরিণত করিয়াছে এবং সেইখানে মিশনারী স্কুল ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল দেশে অসংখ্য মিশনারী প্রতিষ্ঠান তাহাদের কর্মকাণ্ড চালাইয়া যাইতেছে (ইসলামী বিশ্বকোষ, নাসারা, ১৪খ., পৃ. ৪৬)।

খৃস্টবাদের উৎস

উৎসকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) বাইবেল; (২) চার্চের রায় ও (৩) ধর্মীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত।

(ক) বাইবেল (Bible) ঃ পুরাতন নিয়ম

(খ) বাইবেল (Bible) ঃ নূতন নিয়ম

(২) চার্চের রায় ঃ খৃস্ট সমাজের প্রাথমিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত তাহাদের প্রতিষ্ঠিত চার্চের মতামতকে তাহাদের ধর্মীয় মতামত হিসাবেই গ্রহণ করিয়া আসিতেছে। যেমন ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর প্রচারকার্য বানূ ইসরাঈল সমাজে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে সেন্ট পৌলের প্রভাবাধীন চার্চের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে খৃস্ট ধর্ম ইসরাঈলী সমাজেও প্রচার করা হয়। বর্তমান কালে খৃস্ট সমাজে পোপের মতামতকেও ধর্মীয় মতামত হিসাবে গণ্য করা হয়।

(৩) কাউন্সিলসমূহ ঃ ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেন যে, ১ম খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৬৯ খৃ. পর্যন্ত প্রায় ২০টি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এইগুলিতে যে সমস্ত প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা ধর্মীয়ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে।

খৃস্টীয় আকীদা

হযরত ঈসা মসীহ (আ) প্রচারিত আকীদা তাওহীদ ভিত্তিক হইলেও পরবর্তীতে পৌলীয় চেতনায় তাহাদের আকীদাকে দুইটি ভিত্তির উপর প্রতিস্থাপন করা হয়ঃ (ক) ত্রিত্ববাদ (খ) প্রায়শ্চিত্ত মতবাদ।

ত্রিত্ববাদের ভ্রান্ত ধারণা ও ইহার খণ্ডন

খৃস্টধর্মের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত, জটিলতম ও প্রধানতম আকীদা হইল ত্রিত্ববাদ নীতি (Trinitarian Doctrine)। ত্রিত্ববাদ শব্দটি ত্রিত্ব (Trinity) হইতে উদ্ভূত। ইহার উল্লেখ ইনজীল ও তৎসংশ্লিষ্ট গ্রন্থাবলীতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সর্বপ্রথম এই শব্দটি "প্রেরিতদের যুগে" পলের প্রভাবে ব্যবহৃত হয় (দ্র. আল-বুস্তানী, দা'ইরাতুল-মা'আরিফ, আরবী, ৬খ, ৩০৬, বৈরূত; তকী উছমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬)।

এই আকীদা অনুযায়ী আল্লাহ তিন ব্যক্তিত্বের সমষ্টি। কিন্তু পরবর্তী কালে ইহার ব্যাখ্যায় অনেক মতপার্থক্য ও পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন মতে, পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা গড (প্রভু)-এর তিন ব্যক্তিত্ব (Ency. Britannica, ২২খ., পৃ. ৪৭৯, Trinity শীর্ষক নিবন্ধ)। একশ্রেণী তৃতীয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে পবিত্র আত্মার স্থলে "কুমারী মারয়াম"-কে মনে করে। অপর এক শ্রেণীর আকীদা ছিল, তাহাদের প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবে এবং সমষ্টিগতভাবেও গড [প্রভু] (Ency. Britannica, ২২খ., ৪৭১, ১৯৫০ খৃ.)। অন্য আরেক দলের ধারণায় তাহারা পৃথক পৃথকভাবে গড (God) অপেক্ষা কিছুটা কম কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পূর্ণাঙ্গ গড (প্রাগুক্ত)। মারকুলিয়া নামের প্রাচীন এক সম্প্রদায়ের ধারণা ছিল যে, তাহারা পৃথক পৃথকভাবে গড নহেন, বরং সমষ্টিগতভাবেই গড (আল-মাকরীযী, আল-খিতাত, ৩খ, ৪০৮)। এই আকীদা-এর ব্যাখ্যায় সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক খৃস্টান দার্শনিক অনেক উচ্চবাচ্য করিলেও আসলে ইহা এমন এক গোলকধাঁধাঁ যাহা বড় বড় খৃস্টান পণ্ডিতদের পক্ষেও অন্যদের বুঝানো তো দূরের কথা, নিজেরাও সঠিকভাবে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় নাই (দ্র. তকী উছমানী, প্রাগুক্ত।)

"সেন্ট-পল"-এর প্রভাবেই খৃস্টধর্মে তৎকালীন রোমান পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। হযরত ঈসা (আ)-এর একত্ববাদের পরিবর্তে পৌত্তলিকদের ত্রিত্ববাদ প্রচারিত হয়। দ্বিতীয় শতাব্দীতে সর্বপ্রথম পাদ্রী থিয়োফীলুস গ্রীক ভাষায় এই সম্পর্কে "ছরয়াস" (ثرياس) শব্দ ব্যবহার করেন। তাহার পর পাদ্রী তারতলিয়ানুছ ইহার প্রায় সমার্থক শব্দ তারনতিয়াস (تير نتياس) শব্দটি আবিষ্কার করেন। ইহারই সমার্থবোধক শব্দ হইতেছে বর্তমান তাছলীছ বা ছালূছ (ত্রিত্ব)। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করিলে দেখা যায় যে, এই মতবাদ খৃস্টধর্ম ও পৌত্তলিকতা সংমিশ্রিত একটি মতবাদ। বিশেষত মিসরীয়

পৌত্তলিকতা যখন খৃস্টধর্ম গ্রহণ করিল তখন তাহারাই এই ত্রিত্ববাদকে অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রকাশ ও প্রচার শুরু করিল। বস্তুত ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল, তাহাদের পূর্বেকার পৌত্তলিকতার ধ্যান-ধারণা ও নূতন খৃস্টধর্মের মধ্যে একটা গোজামিল দেওয়া (সিওহারবী, ৪খ, পৃ. ২০০)।

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন যে, আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌত্তলিক দার্শনিক মতবাদ ত্রিত্ববাদে রূপান্তরিত হয়। অর্থাৎ 'সেরাফিজ' (Serafis) শব্দ হইতে ত্রিত্ববাদের উৎপত্তি এবং আইসিস (ISIS)-এর স্থানে মারয়াম ও হর্স (Hors) -র স্থলে যীশু খৃস্ট ব্যবহার করিয়া গ্রীক ও মিসরীয় দর্শনিক পৌত্তলিকতার সংযোগ স্থাপন করিয়া বর্তমান খৃস্টবাদ আবিষ্কার করা হয়। ইহার পর হইতেই এই ভ্রান্ত মতবাদ নির্ভরযোগ্য বিশ্বাস ও আকীদা বলিয়া গীর্জায় স্থান পাইয়া যায়। তথাপি এই মতবাদের গ্রহণ ও বর্জন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক চলিতে থাকে (মাও. আযাদ, তাফসীরে তরজমানুল কুরআন)।

ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ৩২৫ খৃস্টাব্দে 'নেকিয়া কাউন্সিল' অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে খৃস্ট জগতের সকল পাদ্রী সমবেত হইয়া একত্ববাদ ও ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে পরস্পর তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরিশেষে উক্ত কাউন্সিল ত্রিত্ববাদকে খৃস্টধর্মের মূল আকীদা বলিয়া সমর্থন করিয়া নেয়। আর ইহার বিরোধী সকল মতবাদকে 'ইল্হাদ' (ধর্মদ্রোহিতা) বলিয়া ঘোষণা দেয়। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ পাদ্রীরা ইহাকে মানিয়া নিলে কতক ধর্মযাজক ভিন্ন মত প্রচার করিতে লাগিল। যেমন, আবইউনীরা যীশুখৃস্টকে কোনক্রমেই আল্লাহরূপে স্বীকার করে নাই, তাহাকে একমাত্র মানুষ বলিয়া স্বীকার করিত। আর একদল বলিত, মূলত 'গড' একই সত্তা। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। অবস্থাভেদে একই সত্তার উপর বিভিন্ন নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে। আরইউছবির অনুসারীরা বলিত যে, তিনি যদিও গড-এর পুত্র, তিনি অনাদি নহেন, বরং আল্লাহ সৃষ্ট। মেসিডোনীয়দের মতে পিতা ও পুত্র মূলত গড-এর দুইটি অংশ, পবিত্র আত্মা কোন অংশ নহে (সিউহারবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০২)।

এই বিরোধী দলগুলি ত্রিত্ববাদের বিরোধী হওয়ায় নিকিয়া কাউন্সিলের ঘোষণামতে তাহারা মুলহিদ অর্থাৎ ধর্মদ্রোহী ভ্রান্ত দল। কিন্তু 'আরইউছ' আলেকজান্দ্রিয়ার মধ্যে একজন খ্যাতনামা পাদ্রী ছিলেন এবং তিনি ত্রিত্ববাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। পরিশেষে ৩৮১ খৃস্টাব্দে 'নাইসা' শহরে রাজা কনস্টান্টাইন-এর উপস্থিতিতে এক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে 'আরইউস' অত্যন্ত স্পষ্ট ও জোরদারভাবে একত্ববাদের উপর বক্তব্য রাখেন। তবে অধিকাংশ পাদ্রীর মতে ত্রিত্ববাদই সমর্থিত হয়। আর সরকারীভাবে আইন প্রয়োগ করিয়া ঘোষণা করিয়া দেওয়া হয় যে, যাহারা ত্রিত্ববাদের বিরোধী হইবে তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাহাদেরকে দেশান্তরিত করা হইবে। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে অধিকাংশ লোক ত্রিত্ববাদকে গ্রহণ করিয়া নেয়। তবে ত্রিত্ববাদের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তাহাদের পরস্পরে বিরাট মতবিরোধ থাকিয়া যায়। নিকিয়া কমিটি যীশু খৃস্টকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করিলেও পুত্র ও পবিত্র আত্মা উভয়কে পিতা কর্তৃক অনাদি কাল হইতে সৃষ্ট বলিয়া বিশ্বাস করিত। ইহার পর ৫৮৯ খৃস্টাব্দে অনুষ্ঠিত 'তলিতলা' কাউন্সিলে এই সংশোধনী গৃহীত হয় যে, পবিত্র আত্মা শুধু পিতা কর্তৃক সৃষ্ট নয় বরং পিতা ও পুত্র উভয় কর্তৃক সৃষ্ট। এই সংশোধনী প্রস্তাব

ল্যাটিন গীর্জার সমর্থন লাভ করিলেও গ্রীক গীর্জার পাদ্রীরা ইহাকে গ্রহণ করিল না। ইহার ফলে রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক পাদ্রীদের মধ্যে কোন প্রকার সমঝোতা সম্ভব হয় নাই (প্রাগুক্ত)।

অপরদিকে দেখা যায় যে, ৩২৫ খৃস্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিল যীশুখৃস্টকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া ঘোষণা দিলেও কি অর্থে যীশু খৃস্টকে প্রভু বা আল্লাহর পুত্র বলা হইয়াছে হইতে মতভেদ সৃষ্টি হয়। পরিশেষে ৪৫১ খৃস্টাব্দে 'কালসিডেন' কাউন্সিল এই বিষয়ে একটি ব্যাখ্যা দেয়ঃ যীশুখৃস্ট দুইটি গুণের সমষ্টি; তাঁহার মধ্যে প্রভুত্ব ও মানবত্ব এই দুইটি গুণের একত্র সমাবেশ ঘটিয়াছে। ইহার পর ৬৮০ খৃস্টাব্দে আরেকটি কাউন্সিল বলে যে, যীশুখৃস্ট দুইটি গুণের সমষ্টি হওয়ার ফলে একই সময় দুই প্রকার শক্তি ও ইচ্ছা কার্যকর করিতে পারেন (ইনসাই. ব্রিটানিকা, ৫খ, চার্চ হিস্টোরী)।

এই ত্রিত্ববাদ মূলত 'সেন্ট পল' কর্তৃক সৃষ্ট মতবাদ। কিন্তু খৃস্টানরা ইহাকে মুক্তি ও পরিত্রানের একমাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া নিয়াছে। প্রোটেস্টান্ট ও রোমান ক্যাথলিকরা পরস্পর মতবিরোধ থাকার পরও ত্রিত্ববাদকে একবাক্যে মানিয়া নিয়াছে। তবে ইহাকে বোধগম্য করার জন্য তাহারা যতই চেষ্টা চালাইয়াছে ততই ইহা আরো জটিল ও দুর্বোধ্য হইয়াছে। তিনে এক এবং একে তিন হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

এই ত্রিত্ববাদের শুরু হইতে আজ পর্যন্ত ইহার গোলকধাঁধাঁ হইতে খৃস্টান জগৎ মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। ফলে "তিনে এক এবং একে তিন" এই হেয়ালী এখনও দুর্বোধ্যই রহিয়া গিয়াছে। প্রফেসর মরিস বিলেটন তাঁহার Studies of chirstian doctrin গ্রন্থে ইহার বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন (৬ খৃ,৭৬)। এই জন্যই খৃস্টানদের এবিউনী সম্প্রদায় শুরুতে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিয়াছে, যাহাই বলুন না কেন, "হযরত মসীহ (আ)-কে খোদা মানিয়া নিয়া আমরা কিছুতেই তাওহীদ রক্ষা করিতে পারিব না"।

খৃস্টানদেরকে অনেকেই যেমন Paul Samasota এবং লুসিয়ান (Locian) প্রমুখ খৃস্টান পণ্ডিত বলিয়া দিয়াছেন, হযরত মসীহকে খোদা মানাই ভুল; তিনি শুধুই একজন মানুষ বই কিছুই নন" (Britannica, vol. 17, P. ও 97)।

বস্তুত তিন কখনও এক হইতে পারে না; তিন এবং এক দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ সংখ্যা বা সত্তা; আগুন ও পানির সম্পর্কের মতই উভয়ের সম্পর্ক। তবুও যদি খৃস্টানগণ উভয়ের একটিকে আসল এবং অন্যটিকে গৌণ বলিত তবুও না হয় ভাবিয়া দেখা যাইত। কিন্তু স্বয়ং খৃস্টানরাই এই পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহারা একত্বকেও মৌলিক এবং ত্রিত্ববাদকেও মৌলিক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই জন্যই প্রোটেস্টান্ট সম্প্রদায় তাহাদের অতীত মনীষীদের অভিমত পরিত্যাগ করত নীরবতাকেই নিজেদের নিরাপদ আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে।

অতীত উম্মতের কেহই ত্রিত্ববাদের প্রবক্তা ছিলেন না। হযরত আদম (আ) হইতে হযরত মূসা (আ) পর্যন্ত কেহই ত্রিত্ববাদের আকীদা গ্রহণ করেন নাই; বাইবেল হইতেও এই উক্তির সত্যতা প্রকাশ পায় (প্রাগুক্ত, পৃ.৭)।

ত্রিত্ববাদ খণ্ডনে আল-কুরআন

কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার যুগে অধিকাংশ খৃস্টান যেসব বড় বড় দলে বিভক্ত ছিল ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে তাহাদের আকীদা ভিন্ন তিনটি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। একদল বলিত যে, মসীহ-ই প্রকৃত খোদা এবং খোদাই মসীহ্-এর রূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবতরণ করেন। দ্বিতীয় দল বলিত যে, মসীহ খোদার পুত্র। তৃতীয় দলটি বলিত যে, একত্বের রহস্য তিনের মধ্যে লুকাইয়া আছে, পিতা-পুত্র-মারয়াম। এই দলটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয় দলের লোকেরা মারয়ামের পরিবর্তে পবিত্র আত্মাকে তৃতীয় আকনূম (আসল) বলিত। মোটকথা, তাহারা হযরত মসীহ (আ)-কে ثالث ثلاثة (তিনের মধ্যে তৃতীয়) বলিত।

এজন্য কুরআন মজীদ এই তিন দলকে পৃথক পৃথকভাবে এবং একত্রেও উল্লেখ করিয়াছে। অতঃপর যুক্তি-প্রমাণের আলোকে খৃস্টান বিশ্বের সামনে একথাও বলিয়া দিয়াছে যে, এ সম্পর্কে সত্য পথ মাত্র একটি। আর তাহা হইল হযরত মসীহ (আ) মারয়ামের পেটে জন্মগ্রহণ করা মানুষ এবং আল্লাহর সত্য নবী ও রাসূল। আর ইহার পরিবর্তে যাহা বলা হইতেছে তাহা বাতিল। যেমন ইয়াহূদীদের আকীদা (নাউযুবিল্লাহ্) যে, তিনি ধোঁকাবাজ, প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী ছিলেন (নাঊযুবিল্লাহ্) অথবা খৃস্টানদের বিশ্বাস তিনি খোদা, খোদার পুত্র অথবা তিনজনের মধ্যে তৃতীয় (আল্লামা সিওহারবী, প্রাগুক্ত, ৪খ, পৃ. ২১০-২১১)। আল-কুরআনে ত্রিত্ববাদের খণ্ডনে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। যেমনঃ (১) ত্রিত্ববাদকে কুফুরী ও শিরক আখ্যায়িত করিয়া বলা হইয়াছে ঃ

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ وَمَا مِنْ إِلٰهٍ إِلاَّ الٰهٌ وَّاحِدَةٌ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ. اَفَلاَ يَتُوْبُوْنَ إِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ.

"যাহারা বলে, আল্লাহ্ তো তিনের মধ্যে একজন, তাহারা তো কুফরী করিয়াছেই, যদিও এক ইলাহ্ ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ্ নাই। তাহারা যাহা বলে তাহা হইতে নিবৃত্ত না হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কুফরী করিয়াছে তাহদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি আপতিত হইবেই। তবে কি তাহারা আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিবে না ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে না? আল্লাহ্ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু" (৫ ঃ ৭৩-৭৪)।

يَا اَهْلَ الْكِتٰبِ لاَ تَغْلُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ وَلاَ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ إِلاَّ الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهُ اَلْقٰهَا الِىٰ مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ إِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا اللّٰهُ الٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهُ اَنْ يَّكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلاً .

"হে কিতাবীগণ! তোমরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করিও না ও আল্লাহ্ সম্বন্ধে সত্য ব্যতীত বলিও না। মারয়াম-তনয় 'ঈসা মসীহ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁহার বাণী যাহা তিনি মারয়ামের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তাঁহার আদেশ। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আন

এবং বলিও না, "তিন"। নিবৃত্ত হও, ইহা তোমাদের জন্য কল্যাণকর হইবে। আল্লাহ্ তো একমাত্র ইলাহ্, তাঁহার সন্তান হইতে তিনি ইহার অনেক ঊর্ধ্বে। আস্‌মান ও যমীনে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। কর্মবিধানে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" (৪ : ১৭১; আরও দ্র. ৫ : ১৭, ৭২)।

(২) কখনও বলা হয়, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র আব্‌দ বা বান্দা। অন্যান্য মানুষের মত তাঁহারও মানবিক চাহিদা আছে, তাঁহার জীবন ও মৃত্যু আছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

اِنْ هُوَ اِلاَّ عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلاً لِّبَنِىْٓ اِسْرَائِيْلَ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰئِكَةً فِى الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ ـ وَاِنَّهٗ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلاَ تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُوْنِ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ.

"সে তো ছিল আমারই এক বান্দা, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করিয়াছিলাম এবং করিয়াছিলাম বানূ ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের মধ্য হইতে ফেরেশ্‌তা সৃষ্টি করিতে পারিতাম, যাহারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হইত। ঈসা তো কিয়ামতের নিদর্শন। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করিও না এবং আমাকে অনুসরণ কর। ইহাই সরল পথ" (৪৩ : ৫৯-৬১; আরও দ্র. ১৯ : ৩০-৩৩; ৪: ১৭২)।

(৩) এমনিভাবে যাহারা হযরত ঈসা (আ)-কে আল্লাহ্‌র পুত্র বলে আল-কুরআনে তাহাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হইয়াছে। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ وَقَالَتِ النَّصٰرَى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ ذٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِاَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُوْنَ قَوْلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

"ইয়াহূদী বলে, উযায়র আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খৃস্টানরা বলে, মসীহ আল্লাহ্‌র পুত্র।। উহা তাহাদিগের মুখের কথা। পূর্বে যাহারা কুফ্‌রী করিয়াছিল উহারা তাহাদিগের মত কথা বলে। আল্লাহ্ উহাদিগকে ধ্বংস করুন। উহারা কেমন করিয়া সত্যবিমুখ হয়" (৯ : ৩০)।

(৪) কুরআন করীমে স্পটভাবে বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ পাকের কোন সন্তান নাই। তাই ঈসা (আ)-ও আল্লাহ্ পাকের সন্তান নহেন। বলা হইয়াছে :

وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ بَلْ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهٗ قَانِتُوْنَ ـ

"তাহারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতি পবিত্র; বরং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব আল্লাহ্‌রই। সব কিছু তাঁহারই একান্ত অনুগত" (২ : ১১৬; আরও দ্র. ৬ : ১০১; ১১২: ১-৪)।

আবার কোথায়ও বলা হইয়াছে, হযরত ঈসা (আ) মানব স্বভাবের অধিকারী রাসূলগণের অন্তর্গত, যাঁহারা যুগে যুগে মানুষের হিদায়াতের জন্য কাজ করিয়া গিয়াছেন। যেমন আল্লাহ্‌র বাণী :

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلاَّ رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ـ

"মারয়াম-তনয় মসীহ তো কেবল একজন রাসূল, তাহার পূর্বে বহু রাসূল গত হইয়াছে এবং তাহার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। তাহারা উভয়ে খাদ্যাহার করিত। দেখ, উহাদের জন্য আয়াত কিরূপ বিশদভাবে বর্ণনা করি; আরও দেখ; উহারা কিভাবে সত্যবিমুখ হয়" (সূরা মায়িদা-৭৫)।

এইভাবে আল-কুরআনের বর্ণনা দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয় যে, হযরত ঈসা (আ) ছিলেন একজন মানুষ, আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি কোন ইলাহ ছিলেন না বা আল্লাহর পুত্রও ছিলেন না কিংবা আল্লাহর অংশও ছিলেন না। আর খৃষ্টানদের ত্রিত্ববাদের আকীদাটি স্পষ্ট কুফরী ও শিরক যাহার সহিত আল্লাহর নবী ঈসা (আ) এর কোন সম্পর্ক নাই [যিশাইয় (৪৩-১১) (যাত্রা পুস্তক, ৪৬ ঃ ১১]।

হে সদা প্রভু ঈশ্বর তুমি মহান, কারণ তোমার তুল্য কেহই নাই ও তুমি ব্যতীত কোন ঈশ্বর নাই (২য় শমুয়েল (৭:২২), ১ম রাজাবলী (৮:২৩), (যিশাইয় (৪০:২৮), তিরমিয় (১০:৬)।

একত্ববাদ সম্পর্কে খোদ বাইবেলে প্রাপ্ত তথ্য

উল্লেখ্য, খৃস্টানগণ ত্রিত্ববাদের দাবিদার হইলেও তাহাদের কাছে স্বীকৃত বর্তমান বাইবেলেই এমন কিছু উক্তি লক্ষণীয় যেইগুলি তাওহীদের প্রমাণ বহন করে। উহার কতিপয় উক্তি উল্লেখ করা হইল। যেমন ঃ "সদাপ্রভুই ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত আর কেহ নাই। ইহা যেন তুমি জ্ঞাত হও (দ্বিতীয় বিবরণ, ৪ ঃ ৫; আর দ্র. ৬ ঃ ৪)। "কারণ তুমি মহান এবং আশ্চর্য কার্যকারী, তুমিই একমাত্র ঈশ্বর" (গীতসংহিতা, ৮৬ ঃ ১০; আরও দ্র. ১ম রাজাবলী, ৮ ঃ ৬০)।

বাইবেল নূতন নিয়ম যেমন ঃ

(১) যোহন সুসমাচারে উক্ত হইয়াছে (২০ ঃ ১৭), "যিনি আমাদের পিতা ও তোমাদের পিতা এবং আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, তাঁহার নিকটে আমি উর্ধ্বে যাই"। ইহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যীশু খৃস্টসহ সকলের প্রভু একমাত্র আল্লাহ। যীশু প্রভু নহেন।

(২) মার্ক (১২ ঃ ২৯) বাক্যে আছে, "হে ইস্রায়েল শোন, আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু"। (আরও দ্র. মার্ক, ১২ ঃ ৩২)।

(৩) মথি (২৩ ঃ ৮-৯) "আর পৃথিবীতে কাহাকেও পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না, কারণ তোমাদের পিতা একজন, তিনি সেই স্বর্গীয় (আসমানী)"।

(৪) লূক (৪ ঃ ৮) বাক্যে আছে, "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে। কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে"। ইহাতে বুঝা যায় যে, ইবাদত ও বন্দেগী পাওয়ার যোগ্য একমাত্র আল্লাহই, যীশু নহেন।

ঈসা (আ) প্রভু বা ইলাহ্ না হওয়ার পক্ষে যুক্তি

হযরত ঈসা (আ) যে প্রভু কিংবা ইলাহ ছিলেন না উহার পক্ষে অসংখ্য যুক্তি রহিয়াছে। উহার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ (১) তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী। আল্লাহ তাঁহাকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন।

(২) পূর্বের অনেক নবী যীশু নবী হিসাবেই পৃথিবীতে আগমন করিবেন বলিয়া সুসংবাদ দিয়েছেন।

(৩) তিনি মানবসন্তান মারয়ামের গর্ভে মানবরূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(৪) অন্য মানুষের ন্যায় তিনিও আহার-বিহার করিতেন এবং সুখ-দুঃখ অনুভব করিতেন।

(৫) তিনি আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা ও তাঁহার ইবাদত করিয়াছেন।

এই সব বিষয়ের উপর সামান্য চিন্তা করিলেও পরিষ্কারভাবে প্রতিভাত হয় যে, তিনি কোনক্রমেই প্রভু ছিলেন না (মাওলানা ইমদাদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩)। হযরত ঈসা যদি প্রভু হইতেন, ত্রিত্ববাদ যদি সত্য হইত তবে হযরত মূসা (আ) এবং অন্যান্য পয়গাম্বর এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্বন্ধে নীরব না থাকিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া যাইতেন।

মোটকথা, ত্রিত্ববাদ এমন একটি মতবাদ যাহা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অবান্তর। খৃস্টানরা মানুষকে ইহাই বুঝাইতে চায় যে, ত্রিত্ববাদ কেবল বিশ্বাসের বিষয়, বোধগম্য হওয়ার বিষয় নহে। তাহাতে অন্তরে বিশ্বাস করিলেই পরিত্রাণ ও মুক্তি সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে তাহা অযৌক্তিক নহে।

আল্লাহ প্রদত্ত একত্ববাদের ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য মূলত ইহা একটি ষড়যন্ত্র। সেন্ট পলই ইহার আবিষ্কারক। ত্রিত্ববাদীরা বাইবেল হইতে ত্রিত্ববাদের সপক্ষে কোনও প্রকারের প্রমাণ না পাইয়া সেন্ট পলের পত্রাবলী হইতে উহার প্রমাণ পেশ করিয়াছে। আর সেন্ট পলের যুগ প্রেরিতদের যুগের পরের যুগ। তবে কিছু লোক চার ইনজীল হইতেও প্রমাণ পেশ করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছে। বাইবেল হইতে উদ্ধৃত ত্রিত্ববাদের প্রমাণাদি ও তাহার জবাব ঃ

১ম প্রমাণ ঃ যোহন সুসমাচার ২০ ঃ ২৮ বাক্যে বলা হইয়াছে যে, থোমা উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, প্রভু আমার ঈশ্বর! আমার এইখানে যীশুর সামনে তাহাকে প্রভু ও ঈশ্বর ব্যক্ত করিয়া ডাক দেওয়া হইয়াছে এবং তিনি তাহাকে নিষেধ করেন নাই। অতএব যদি তিনি প্রভু না হইতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি নিষেধ করিতেন।

জবাবঃ (১) থোমা যে যীশু খৃস্টকে প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন উহার সত্যতা সংশয়যুক্ত। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বাইবেলে বহু বিকৃতি ঘটিয়াছে। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে "ঈশ্বর" ও "প্রভু" শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

যেমন ঃ (ক) 'প্রভু' অর্থ প্রদর্শক ও দিশারী। যথা— যাত্রা পুস্তক ৭ ঃ ১ বাক্যে বলা হইয়াছে, "তখন সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, দেখ আমি ফরৌনের কাছে তোমাকে ঈশ্বর স্বরূপ করিয়া নিযুক্ত করিলাম"। এইখানে পথপ্রদর্শক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, নিশ্চয়ই প্রভু হিসাবে নয়। খৃস্টানরাও মূসা (আ)-কে প্রভু হিসাবে বিশ্বাস করে না।

(খ) স্বর্গীয় দূত ও ফেরেশতা বুঝাইতেও ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। আদিপুস্তকের ১৭ ঃ ২২ বাক্যে আছে যে, "পরে কথোপকথন সাঙ্গ করিয়া ঈশ্বর আব্রামের নিকট হইতে উর্দ্ধগমন

করিলেন"। এইখানে ঈশ্বর ফেরেশতার অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কেননা ইসহাক (আ)-এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়ার জন্য ফেরেশতাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

(গ) সৎলোক, নেতা ও মুরুব্বী অর্থেও ঈশ্বর শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। যথা গীতসংহিতা, ৮২ ঃ ৬ বাক্যে আছে, "আমিই বলিয়াছি, তোমরা ঈশ্বর, তোমরা সকলে পরাৎপরের সন্তান", এবং যোহন ১০ ঃ ৩৪ বাক্যে আছে, "যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, তোমাদের ব্যবস্থায় কি লিখিত নাই, আমি বলিলাম তোমরা ঈশ্বর"। এই সকল স্থানে 'ঈশ্বর' দ্বারা সৎলোককে বুঝানো হইয়াছে।

২য় প্রমাণ ঃ মথি ৩ ঃ ১৭ বাক্যে আছে, "আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত"। এইখানে যীশু খৃষ্ট আল্লাহর পুত্র বলে পরিষ্কার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও আরও বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

জবাব ঃ বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে পুত্র শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হইয়াছে। সাধারণ মানুষকেও আল্লাহর বান্দা হিসাবে পুত্র বলা হইয়াছে। যেমন যাত্রাপুস্তক ৪ ঃ ২২ বাক্যে আছে"। সদা প্রভু এই কথা কহেন "ইস্রায়েল আমার পুত্র আমার প্রথম জাত"।

৩য় প্রমাণ ঃ যোহন ১০ ঃ ৩০ বাক্যে আছে, "আমি ও পিতা আমরা এক"। ইহা হইতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, যীশু খৃষ্ট আল্লাহর ন্যায় আল্লাহ।

জবাব ঃ এইরূপ বাক্য যীশু প্রেরিতদের সম্পর্কেও বলিয়াছেন। যেমন ঃ যোহন ১৭ ঃ ২১ বাক্যে আছে, "পিতা ঃ যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগতে থাকে"।

১ম বংশবলী ২৮ ঃ ৬ বাক্যে আছে, "কেননা আমি তাহাকেই (শলোমনকে) আমার পুত্র বলিয়া মনোনীত করিয়াছি। আমিই তাহার পিতা হইব" (আরও দ্র. ২২ ঃ ১০) গীতসংহিতা, ৬৮ ঃ ৫ বাক্যে আছে, "ঈশ্বর আপন পবিত্র বাসস্থানে পিতৃহীনদের পিতা ও বিবাদের বিচারকর্তা"। লূক, ৩ ঃ ৩৮ বাক্যে আছে, "ইনি আদমের পুত্র, ইনিই ঈশ্বরের পুত্র"। ইত্যাকার বাক্যসমূহে পুত্র শব্দ আদম, ইস্রায়েল, মূসা, সুলায়মান (আ) প্রমুখ নবীগণের জন্য ব্যবহার করা হইয়াছে। অথচ কাহারও মতেই তাহারা না আল্লাহ ছিলেন এবং না আল্লাহর পুত্র ছিলেন। অতএব যীশু খৃষ্টকে পুত্র বলা হইলেও সেই একই অর্থ বুঝানো হইয়াছে। এইসব বাক্যে বিশেষ সম্পর্ক বুঝানো হইয়াছে। যদি "আল্লাহ" অর্থ নেওয়া হয় তাহা হইলে প্রেরিতদেরকেও আল্লাহ বলিতে হইবে।

৪র্থ প্রমাণ ঃ সুসমাচারসমূহে খৃষ্ট কর্তৃক মৃতদিগকে জীবিত করার বিভিন্ন ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন ঃ মার্ক, ৫ ঃ ৪১, মথি, ৯ ঃ ২৫, লূক, ৮ঃ ৫৫ এবং যোহন, ১১ ঃ ৪৩। যেহেতু মৃতকে জীবনদান একমাত্র আল্লাহর বিশেষ গুণ, কোন মানুষের পক্ষে এই কাজ সম্ভব নয়। অতএব যীশু খৃষ্টই আল্লাহ।

জবাব ঃ আল্লাহর চিরন্তন বিধান এই যে, যাহাকে তিনি নবী হিসাবে প্রেরণ করেন, তাঁহাকে এমন কিছু প্রর্দশনের ক্ষমতা দান করেন যাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয়। নবুওয়াত প্রাপ্তির

প্রমাণস্বরূপ আলৌকিক কিছু কার্যাবলী প্রকাশিত হয়। এই স্থলে মূলত কার্য আল্লাহরই হইয়া থাকে, যদিও নবীর হাতে তাহা প্রকাশ পায়। এইজন্য নবী এই সকল কাজে আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করেন। আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করাই প্রমাণ করে যে, তিনি আল্লাহ নন। যেমন যোহন; ১১ ঃ ৪১ বাক্যে আছে, "পরে যীশু উপরের দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিলেন, পিত! তোমার ধন্যবাদ করি যে, তুমি আমার কথা শুনিয়াছ"।

এইসব বাক্য দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তিনি আল্লাহর প্রেরিত নবী ছিলেন, আল্লাহ ছিলেন না। মৃতকে জীবন দান করা যদি আল্লাহ হওয়ার প্রমাণ বহন করে তাহা হইলে যীশু খৃস্ট ছাড়া অন্যান্য যে সকল নবীর মাধ্যমে উক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহাদেরকেও আল্লাহ বলিতে হইবে। যেমন যিহিষ্কেল, ৩৭ ঃ ১০ বাক্যে আছে, "তাহাতে আত্মা তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং তাহারা জীবিত হইল" (আরও দ্র. রাজাবলী, ১৭ ঃ ২১-২২; রাজাবলী ৪ ঃ ৩২-৩৩-৪৪-৪৫ বাক্যও আছে।

মোটকথায় খৃস্টানগণ ঈসা (আ)-কে আল্লাহ বা তাঁহার পুত্র প্রমাণ করিতে যে সকল যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছে তাহা সম্পূর্ণরূপে অসার ও ভ্রান্ত। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা ও রাসূল।

(খ) প্রায়শ্চিত্তের আকীদা

"পাপ মোচন-এর বিশ্বাস" খৃস্ট ধর্মে মৌলিক আকীদা হিসাবে গণ্য। ইহার অর্থ হইল, পাপ হইতে মানবজাতির মুক্তি ও পরিত্রাণের জন্য যীশু খৃস্ট ক্রুশবিদ্ধ হইয়া মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে হযরত আদম (আ) পাপ করিয়াছিলেন এবং বংশানুক্রমে তাহা সমগ্র মানবজাতির মধ্যে চলিয়া আসে। তাই সকল মানবজাতিই পাপী। প্রভু আপন পুত্র যীশু খৃস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া জগতবাসীকে ক্ষমা করিয়াছেন। অতএব যীশু খৃস্টকে বিশ্বাস করিলেই পাপমোচন হয়, ইহা ছাড়া কোন বিকল্প ব্যবস্থা নাই। বর্তমান খৃস্ট জগতে পাপ মোচন বিশ্বোসকে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। খৃস্ট ধর্মে এই বিশ্বাস অনুপ্রবেশ ঘটিবার ঐতিহাসিক পটভূমি ইহা ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

(১) যেই সময়ে খৃস্ট ধর্মে ত্রিত্ববাদ প্রবেশ করিয়াছে তখন হইতে এই বিশ্বাসও প্রবেশ করিয়াছে। ইহা সেন্ট পলের ষড়যন্ত্রের ফসল। সেন্ট পল নূতনভাবে প্রচার করেন যে, মানবজাতির পাপের কাফফারা হিসাবে যীশু ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছেন। ত্রিত্ববাদকে সুদৃঢ় করিবার জন্য পাপ মোচন বিশ্বাসকে গুরুত্ব সহকারে প্রচার করিতে লাগিলেন। সেন্টপলই কেবল এই আকীদার প্রবক্তা। হযরত ঈসা (আ) নিজে কোন দিন এই কথা বলেন নাই, বরং তাঁহার সমাজে এই কথা কেহ শুনে নাই। তাই এই বিশ্বাস যীশু খৃস্টের ধর্মভুক্ত হইতে পারে না।

(২) এই বিশ্বাস বাইবেলের শিক্ষার পরিপন্থী। যিহিষ্কেল, ১৮ ঃ ২০ বাক্যে আছে, "পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না" (আরও দ্র. হিতোপদেশ,

ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পাপী ও দুষ্টদের গুনাহের বদলে অন্যকে শাস্তি দেওয়া যায় না। একজনের পাপে অন্যকে প্রাণদণ্ড দেয়া যায় না। অতএব মানবজাতির পাপের জন্য যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াকে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হওয়ার বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য নহে।

(৩) এই বিশ্বাস ন্যায় ও ইনসাফের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেননা ধারণা জন্মায় যে, আল্লাহর জন্য পাপীকে ক্ষমা করা ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী এবং নির্দোষ ও নিষ্পাপ ব্যক্তিকে ক্রুশবিদ্ধ করা ন্যায় ও ইনসাফের পরিপন্থী নহে। অথচ বাইবেলের শিক্ষা এই যে, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। গীতসংহিতা, ১০৩ঃ ৩, অন্যত্র ১০৩ ঃ ৮, লূক ৬ ঃ ৩৬, অনুরূপ মথি ৬ ঃ ১৪ ও ১৮ পরিচ্ছেদ হইতে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ক্ষমা করেন এবং ক্ষমা ভালবাসেন।

সুতরাং আদম (আ) হইতে যীশুখৃষ্ট পর্যন্ত কোন মানব সন্তানকে আল্লাহ ক্ষমা করেন নাই এমনকি কোন নবীকেও না। ইহা কত বড় ধৃষ্টতা! অতএব এরূপ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ কোন পাপীকে ক্ষমা করেন না, আর নির্দোষ ও নিষ্পাপ যীশু খৃষ্টকে অকারণে শাস্তি দিয়াছেন, ইহা খুবই অন্যায় ও অযৌক্তিক।

(৪) তাহাদের পাপ মোচন বিশ্বাস যদি সকলের হইত তাহা হইলে তাহাদের এই পৃথিবীতে কোন উপাসনা করার প্রায়াজন ছিল না। অথচ দেখা যায়, তাহারা প্রতি রবিবার গীর্জায় গমন করে। অপর দিকে গালাতীয়, ৩ ঃ ১৩ বাক্যে আছে, "খৃষ্টই মূল্য দিয়া আমাদিগকে ব্যবস্থার শাপ হইতে মুক্ত করিয়াছেন"। ইহাতে দেখা যায় যে, ব্যবস্থা (শরীয়াত)-কে শাপস্বরূপ বলা হইয়াছে এবং এই শাপ হইতেই তিনি মুক্তি দিলেন। তাহা হইলে যীশু খৃষ্ট সারা জীবন কি অভিসম্পাতের শিক্ষা দিয়াছেন? ইহা কত বড় জঘন্য অপবাদ।

(৫) তাহারা বলে, যীশু খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করিয়া পাপ মোচন করা হইয়াছে। এই বিশ্বাস সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাইতে পারেঃ যখন তিনি তাহাদের মতে প্রভু ছিলেন তাহা হইলে কি প্রভুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হইল? মানুষের কাছে তাহার অক্ষমতা প্রমাণিত হইল? এইসব প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। আর যদি তাহারা মনে করে, তিনি মানব সন্তান হিসাবে ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছেন তাহা হইলে প্রশ্ন হইবে যে, তিনি মানব সন্তান হিসাবে নিজেও পাপী। তাহা হইলে তিনি কাফফারা হইবেন কি করিয়া!

(৬) পাপ মোচনের জন্য শুধুমাত্র যীশু খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই কি যথেষ্ট, না ইহার সাথে পাপীরও তওবা করার প্রয়োজন আছে? যদি তাহারা বলে যে, ক্রুশবিদ্ধই যথেষ্ট তাহা হইলে সমস্ত কাফিরের পাপ মোচন হইয়াছে বিশ্বাস করিতে হইবে। অথচ তাহারা কাফির ও ইয়াহূদীদের ক্ষমার কথা স্বীকার করে না। আর যদি তাহারা বলে, তওবার প্রয়োজন আছে তাহা হইলে বুঝা গেল যে, পাপীদের ক্ষমার জন্য তওবা করিতে হইবে। অতএব প্রায়শ্চিত্তের আকীদা ঠিক নহে। মার্ক, ১৬ ঃ ১৬ বাক্যে আছে, "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজ হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে"। তাহা হইলে শুধু যীশু খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার উপর যুক্তি নির্ভর করে না।

(৭) আল্লাহ তাআলা পৃথিবীতে বহু নবী ও রাসূল প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহারা মানবজাতিকে ঈমান ও হিদায়াতের শিক্ষা দান করিয়াছেন যাহাতে মানুষ শাস্তি হইতে মুক্তি পায়। সুতরাং যদি যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়াই সকলের মুক্তির জন্য যথেষ্ট হইত, তবে হাজার হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না।

(৮) যীশু খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া যদি আল্লাহর অনুগ্রহ হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাদের উচিত, ইয়াহূদীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং যেভাবে তাহারা শূলিকাষ্ঠকে চুম্বন করিয়া থাকে, তাহাদের জন্য ইয়াহূদীদের হাতকেও সেভাবে চুম্বন করা উচিত। কেননা তাহাদের দ্বারাই তাহারা পাপ থেকে মুক্তি পাইয়াছে।

(৯) যীশু খৃস্টের পূর্বে যাহারা পৃথিবী হইতে বিদায় নিয়াছেন তাহারা কি মুমিন ও নাজাতপ্রাপ্ত ছিলেন, না তাহারা কাফির ও শাপগ্রস্ত! যদি তাহারা নাজাতপ্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা ঈমানের কারণে মুক্তি পাইয়াছেন, যীশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার কারণে নহে।

(১০) আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-এর পুত্র ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানী করা হইতে রক্ষা করিয়া ইহার পরিবর্তে একটি প্রাণী কুরবানী করাইলেন। তেমনি তাহাদের ধারণামত নিজ পুত্র যীশুকে রক্ষা করিলেন না কেন? অন্যের পুত্রকে বাঁচাইলেন আর নিজের পুত্রকে শূলে চড়াইলেন, তাহা কোনক্রমেই যুক্তিসংগত নহে। শত্রুর হাতে সৎকর্মশীল পুত্রকে লাঞ্ছিত করা কি পিতার কাজ?

(১১) আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদের শত্রুদেরকে ধ্বংস করিয়াছেন। যেমন নূহ (আ)-এর শত্রু তাঁহার সম্প্রদায়কে, ইবরাহীম (আ)-এর শত্রু নমরূদকে, মূসা (আ)-এর শত্রু ফিরআওনকে ধ্বংস করিয়াছেন। কিন্তু তিনি ঈসা (আ)-কে তাহাদের ধারণামতে ইয়াহূদী শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিলেন না কেন?

(১২) যীশু খৃস্ট শিষ্যদেরকে নির্দেশ দিলেন, "তোমরা কতজন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ। পুনঃ সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্য পুত্র আপন প্রতাপে সিংহাসনে বসিবেন তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করিবে" (মথি ১৯ঃ২৮)। যদি যীশু খৃস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়ায় সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়া থাকে তবে বানূ ইসরাঈলের দ্বাদশ বংশের মধ্যে বিচার করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। কেননা তাহাদের সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। বিচার তো পাপীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, যীশু খৃস্ট সকল পাপীকে পরিত্রাণ করেন নাই।

পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ)-কে ইয়াহূদীগণ ক্রুশবিদ্ধ করিতে সক্ষম হয় নাই। অতএব ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া প্রায়শ্চিত্ত করার প্রসংগটি অবান্তর, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন (তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬-৮৮; ইমদাদুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯৬)।

মোটকথা, প্রায়শ্চিত্ত তথ্যটি অমানবিক ও মানব সভ্যতার জন্য হুমকিস্বরূপ। কারণ ইহার দ্বারা পাপীকে কোন শাস্তি ছাড়াই মুক্ত করিয়া দেওয়া হয় একমাত্র ঈসাকে মৌখিক স্বীকৃতি দ্বারা। ঐ মতবাদের দৃষ্টিতে পাপ করিবে গোটা মানবজাতি, আর তাহার শাস্তি ভোগ করিলেন একমাত্র ঈসা মসীহ (আ) (নাউযুবিল্লাহ)। উহা অবশ্যই একটি মারাত্মক জুলুম। অথচ যুগে যুগে আসা আল্লাহর বিধানের ঘোষণা ছিল প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার নিজের পাপের জন্য নিজেই দায়ী। আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে ঃ

اَمْ لَم يُنَبَّأْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى . وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى . اَلاَّ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى . وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلاَّ مَا سَعٰى . وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى . ثُمَّ يُجْزٰهُ الْجَزَاءَ الْاَوْفٰى . وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى .

"তাহাকে কি অবগত করা হয় নাই যাহা আছে মূসার কিতাবে এবং ইবরাহীমের কিতাবে, যে পালন করিয়াছে তাহার দায়িত্ব ? উহা এই যে, কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না। আর এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে, আরও এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখান হইবে, অতঃপর তাহাকে দেওয়া হইবে পূর্ণ প্রতিদান। আরও এই যে, সমস্ত কিছুর সমাপ্তি তো তোমার প্রতিপালকের নিকট" (৫৩ ঃ ৩৬-৪২)।

উল্লেখ্য, খৃস্টানদের ত্রিত্ববাদ ও প্রায়শ্চিত্তের আকীদাকে কেন্দ্র করিয়া আরও কয়েকটি আকীদার উদ্ভব ঘটিয়াছে যাহা নিম্নরূপ ঃ

এই আকীদার মর্মার্থ আল্লাহর বাণী বিষয়ক গুণ ঈসা (আ)-এর দেহ-এর রূপ ধারণ করিয়াছে। এই কারণেই ঈসা (আ) একই সময়ে আল্লাহও ছিলেন এবং মানুষও। ইহা একটি অবাস্তব ও হেয়ালীপূর্ণ ধারণা (Encyclopaedia of Religion and Ethics, ৩খ, ৫৮৬)। কিন্তু প্রশ্ন হইল একই ব্যক্তি আল্লাহ ও বান্দা এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টি, ইহা কি করিয়া সম্ভব ? এই কারণেই কুরআন মাজীদে এই আকীদাকে সরাসরি কুফর ও শিরকরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে (৫৩ ঃ ৫৬; ৪ ঃ ১৭১; দ্র. ১৪-১৭, ৪৭, ৭১)।

পুনরুজ্জীবন (Resurrection) আকীদা ঃ ঈসা (আ) সম্পর্কে নাসারাদের বিশ্বাস এই যে, ঈসা (আ) তিনবার জীবন লাভ করিয়াছেন (বিস্তারিত দ্র. Encyclopaedia of Religion and Ethics, সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ)। খৃস্টানদের এই বিশ্বাস, ভ্রান্ত ধারণা ও কুটতর্কের ফসল স্বরূপ। প্রকৃত অবস্থা এই যে, ঈসা (আ)-কে গ্রেফতার বা ক্রুশবিদ্ধ হইবার পূর্বেই উর্দ্ধ জগতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছিল (দ্র. ৪ ঃ ১৫৭-৮)।

খৃস্টবাদের ধর্মীয় বিধিবিধান

আল-কুরআনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত ঈসা (আ) নতূন কোন শরীআত বা ধর্মীয় বিধানের প্রবর্তক ছিলেন না, বরং তিনি তাওরাতেরই পূর্বতন বিধানের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু

পরবর্তী কালে পরিবর্তনের কারণে এই পদ্ধতি ও পাবন্দীকেও উঠাইয়া দেওয়া হয়। সর্বপ্রথম পল-এর আন্দোলনের কারণে "জেরুসালেম কাউন্সিল" এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, "অন্য জাতির খৃষ্টানদের জন্য তাওরাতের বিধান (Law) আবশ্যকীয় নহে"। পরবর্তী কালে খৃষ্টানরা শুধু ইয়াহূদীদের প্রথম নিজস্ব ধর্মীয় আইনই উপেক্ষা করে নাই, বরং ইয়াহূদী ধর্মমতকেও নিন্দা করিতে শুরু করে এবং বলিতে থাকে যে, আসলে ইয়াহূদীদের কোন ধর্মই নাই (দ্র. ২ঃ১১৩)।

সূরা মারয়াম (১৯ ঃ ২১) হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ধর্মীয় বিধানে বিশেষ করিয়া সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু এই সম্পর্কিত বিস্তারিত কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । দৈনন্দিন বিধিনিষেধ ও পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঈসা (আ) পূর্ববর্তী নবীগণের ধর্মীয় বিধানের উল্লেখ করিতেন এবং নিজে উহা পালন করিতেন (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪খ, পৃ. ৪৯)।

পৌলের মাধ্যমেই হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্মের অনেক বিধিবিধান পরিবর্তন করা হয়। যেমনঃ (১) বাইবেলের পুরাতন নিয়মে খৎনা করার নিয়মকে চিরকালের নিয়ম বলিয়া আখ্যায়িত করা হয় (আদিপুস্তক ১৭ ঃ ৭, ১০ ঃ ১৪), এমনকি হযরত ঈসা (আ)-এরও খৎনা করানো হয় (লূক, ২ ঃ ২১)। কিন্তু পৌল খৎনা করিবার চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করিলেন। তাহার গালাতীয় পত্রে উল্লেখ করেন, "আমি পৌল তোমাদিগকে কহিতেছি, যদি তোমরা ত্বকচ্ছেদ প্রাপ্ত হও, তবে খৃষ্ট হইতে তোমাদের কিছুই লাভ হইবে না" (গালাতীয় পত্র, ৪ ঃ ২)। এইভাবে তিনি হযরত মূসা (আ)-এর শরীআত বাতিল করিয়া নূতন ধর্মীয় বিধান চালু করার চেষ্টা করেন।

খৃস্টানরা নিজেদের জন্য শূকরের গোশত ভক্ষণ করা হালাল করে। অথচ বাইবেলে এমন কোন প্রমাণ নাই যে, হযরত ঈসা (আ) তাঁহার অনুসারীদেরকে শূকরের গোশত ভক্ষণ করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

অথচ লেবীয় ও দ্বিতীয় বিবরণীতে শূকরের গোশত ভক্ষণ হারাম ঘোষণা করা হইয়াছে। যেমন লেবীয়তে বলা হয়, "আর শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি" (লেবীয় ১১ ঃ ৭-৮)।

খৃস্টানবাদের ইবাদত পদ্ধতি ও উৎসবাদি

হযরত ঈসা (আ)-কে কেন্দ্র করিয়া বর্তমান খৃস্টান সমাজ নিজেদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবাদত তথা প্রার্থনা রীতি ও উৎসবের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। যেমনঃ

(১) ব্যাপটিজম (Baptism)

ইহা খৃস্ট ধর্মের প্রাচীনতম রীতির অন্যতম। ইহা এক প্রকার আনুষ্ঠানিক গোসল যাহা খৃস্ট 'ধর্মে' প্রবেশকারী ব্যক্তিকে করান হয় (দ্র. Encyclopaedia Britannica, Baptism শীর্ষক প্রবন্ধ ,৩খ, ৮৩; The Christian Religion, ৩খ, ১০০, ১৫২)।

(২) স্তুতিপাঠ

খৃস্টানদের দ্বিতীয় রীতি স্তুতি পাঠ যাহা সম্মিলিতভাবে গির্জায় পালিত হয়। সাধারণত ভোরবেলা লোকেরা গির্জায় একত্র হইয়া বাইবেল পাঠ করিতে থাকে এবং সেইসঙ্গে নেপথ্যে সঙ্গীতের সুর

বাজিতে থাকে (Encyclopaedia Britannica, ৫খ, ৫৪)। প্রবন্ধকারের মতে স্তুতি পাঠের সহিত সঙ্গীতের সুর বাজান খৃ. চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথমবারের মত শুরু হয়। এইজন্য কিছু লোক উহার বিরোধিতাও করিয়াছিল। স্তুতি পাঠের পর দাঁড়াইয়া হাঁটু ভাঙ্গিয়া দু'আ করা হয় (F.C. Burkitt. The Christian Religion, ক্যামব্রিজ , ৩খ, ১৫২-১৫৩)।

(৩) প্রভুর স্মরণে নৈশ ভোজোৎসব (Eucharisf)

খৃষ্ট ধর্মের ইহা এক বিশেষ উৎসব, যাহা ঈসা (আ)-এর প্রকাশ্য আত্মত্যাগের স্মরণে পালিত হয়। ইহার নিয়ম এই যে, রবিবার দিন গির্জায় প্রার্থনা ও সঙ্গীতের পর খাদ্য ও পানীয় আনা হয় এবং সভার প্রধান উহা হাতে লইয়া পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নিকট বরকতের জন্য প্রার্থনা করে, যাহার উপর উপস্থিত সকলে 'আমীন' বলিতে থাকে। অতঃপর উক্ত খাদ্য ও পানীয় উপস্থিত সকলের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। খৃস্টানদের বিশ্বাস, এই আনুষ্ঠানিকতার ফলে উক্ত খাদ্য ও পানীয় (যথাক্রমে) ঈসা (আ)-এর শরীর ও রক্তে রূপান্তরিত হয় (প্রাগুক্ত, ৩খ, ১৪৯)। ইহা অবশ্য সর্বদাই বিতর্কের বিষয় হইয়া রহিয়াছে যে, খাদ্য ও পানীয় কি করিয়া দেখিতে দেখিতে ঈসা (আ)-এর শরীর ও রক্তে রূপান্তরিত হইতে পারে। এই কারণে প্রটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায় ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অস্বীকার করিয়াছে (দ্র. Encyclopaedia Britannica, ৮খ., ৭৯৫, সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ)। ইসলামী শিক্ষ অনুসারে এই সকল রীতিনীতি ও আচরণ পাদ্রীদের নিজস্ব সৃষ্ট, ঈসা (আ)-এর শিক্ষা নহে। ইবাদত ও ইবাদতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে ঈসা (আ)-এর নিজস্ব ধারণা প্রাচীন পয়গাম্বরদের ধারণার অবিকল অনুরূপ ছিল (ইসলামী বিশ্বকোষ, ১৪খ, পৃ. ৫০)।

রবিবার ঃ সাপ্তাহিক সম্মিলিত প্রার্থনা দিবস

খৃস্টানগণ "রবিবারকে সাপ্তাহিক সম্মিলিত প্রার্থনা দিবস" হিসাবে পালন করিয়া থাকে এবং সমগ্র খৃস্টান বিশ্বে ও তাহার প্রভাবাধীন অখৃস্টান দেশসমূহে ঐ দিনটি সাপ্তাহিক ছুটি হিসাবে পালিত হয়। কিন্তু হযরত ঈসা (আ) এই দিবসটি নির্দিষ্ট করিয়া সাপ্তাহিক ইবাদত ও ছুটি দিবস হিসাবে পালনের কোন নির্দেশ দেন নাই, বরং মূসা (আ)-এর শরীআতের সত্যায়নকারী (দ্র. আল-কুরআন ৩ ঃ ৫০) হিসাবে তিনি ও তাঁহার অনুসারীগণ "শনিবারকেই সাপ্তাহিক বিশ্রাম দিবস" হিসাবে পালন করিয়া যান। হযরত ঈসা (আ) শনিবারকে বিশ্রাম দিবস হিসাবে পালনের ধর্মীয় রীতিনীতি বাতিল করিয়া যান নাই, তবে তাহা পালনে ইয়াহূদীদের কঠোরতাকে শিথিল করিয়াছেন বলা যায়। বর্তমান বাইবেলের নূতন নিয়মেও ইহার কিছু ইশারা-ইঙ্গিত আছে (দ্র. মথি, ১২ ঃ ১২; মার্ক, ২ ঃ ২৩-২৮, ৩ ঃ ২-৫; লূক, ৬ ঃ ১-২)। প্রাথমিক যুগের খৃস্টানগণ শনিবারকেই যে বিশ্রাম দিবস তথা সাব্বাথ (Sabbah) দিবস হিসাবে পালন করিতেন তাহা কেম্ব্রিজ হইতে প্রকাশিত রেড লেটার বাইবেলের (ইংরেজী) বাইবেল ডিকশনারী অংশে খৃস্টান পণ্ডিতগণ স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন (দ্র. বাইবেল ডিকশনারী, পৃ. ৮৮, শিরো. Sabbah)।

পরবর্তীতে খৃস্টান ধর্ম অ-ইসরাঈলীদের মাঝে প্রচারিত হইলে খৃস্টানগণ রবিবারকে প্রভু দিবস (The Lord's Day) হিসাবে গ্রহণ করে, যাহার প্রতি ঈসায়ী বাইবেলের কোন প্রমাণ বা সমর্থন নাই। বাইবেল সমর্থিত 'সাব্বাথ'-এর বিধান অমান্য করিয়া 'রবিবারে প্রার্থনা'র প্রচলন তাহাদের পথভ্রষ্টতার প্রমাণ বহন করে। মহানবী (স)-ও তাহাদের এই ভ্রষ্টতার প্রতি ইংগিত করিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ

فَهٰذَا يَوْمُهُمُ الَّذِى اخْتَلَفُوْا فِيهِ هدانا اللّٰهُ له قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى.

"তাহারা যে দিনটি সম্পর্কে মতভেদে লিপ্ত হইয়াছে সেই দিন সম্পর্কে আল্লাহ আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দিয়াছেন অর্থাৎ শুক্রবার। অতএব এই দিনটি আমাদের, তৎপরবর্তী দিন ইয়াহূদীদের এবং তৎপরবর্তী দিন খৃস্টানদের" (মুসলিম, জুমুআহ, বাব হিদায়াতু হাযিহিল উম্মাহ লি-ইয়াওমিল জুমুআহ, নং ১৯৮০ (২০)-১৯৮২ (২২); আরও দ্র. নাসাঈ, জুমুআহ, বাব ঈজাবিল জুমুআহ, নং ১৩৬৯; মুসনাদ আহ্‌মাদ, ২খ, পৃ. ২৪৩, নং ৭৩০৮, আরও বহু স্থা.; বুখারী, জুমুআহ, পৃ. ৬৯, নং ৮৭৬, পৃ. ৭০, নং ৮৯৬, রিয়াদ সং.)।

বস্তুত ঈসা (আ)-এর উর্দ্ধগমনের দুই শত বৎসরের মধ্যেই গোটা খৃস্টান জগত ঈসা (আ)-এর শরীআত হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়। তাহা মহানবী (স) এক হাদীছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন ঃ

عن ابى الدرداء عن النبى (ص) قال لقد قبض اللّٰهُ داود (ص) من اصحابه فما فتنوا وما بدلوا ولقد مكث اصحاب المسيح من بعده على سنته وهديه مائتى سنة.

"আবূ দারদা (রা) হইত বর্ণিত। নবী (স) বলেন ঃ দাঊদ (আ)-কে তাঁহার সাহাবীগণের উপস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা মৃত্যু দান করেন। ফলে তাহারা বিভ্রান্ত হয় নাই এবং পরিবর্তিতও হয় নাই। অপর দিকে ঈসা মাসীহ (আ)-এর সঙ্গীগণ তাঁহার পরে মাত্র দুই শত বৎসর তাঁহার রীতিনীতির উপর ও তাঁহার প্রদর্শিত পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল" (মুসনাদ আবূ ইয়ালা ও তাবারানীর আল-মুজামুল কাবীর-এর বরাতে কানযুল উম্মাল, ১১খ, নং ৩২৩২৮)।

ঈসা (আ) সান অফ গড না সান অফ ম্যান?

হযরত ঈসা (আ) ঈশ্বর পুত্র ছিলেন না মনুষ্য পুত্র, এই বিষয়টি সম্পর্কে খৃস্টান জগতেও কম বিতর্ক হয় নাই। ঈসা (আ) যে বাণী রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে কোথাও এমন কোন দাবি বা উক্তি নাই যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র (SON OF GOD) বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এমনকি খৃস্টানদের স্বীকৃত বর্তমান বাইবেলের কোথাও ঐ ধরনের উক্তি পাওয়া যায় না। যদিও বাইবেলে কিছু কিছু তথ্য এমন পাওয়া যায় যে, তাঁহার কোন কোন অনুসারী তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিয়াছে (দ্র. মথি, ১৪ ঃ ৩৩, ১৬ ঃ ১৬; লূক, ৪ ঃ ৪১; যোহন, ৩ ঃ ১৮, ২০ ঃ ৩১)। যদিও তিনি বলিয়াছেন, "আমার পিতা" (My Father) তোমাদের পিতা (Your Father), তাহাও

বিশেষ অর্থে। অর্থাৎ তিনি ও তাঁহার অনুসারীগণ আল্লাহ্র প্রিয় ও বিশেষ মর্যাদার পাত্র ছিলেন এই অর্থে। আর এই কথা সকলের জানা যে, প্রাথমিক যুগের বাইবেলসমূহ সুরিয়ানী ও ইবরানী ভাষা হইতে গ্রীক ভাষায় অনূদীত হয়। আর গ্রীকরা ছিল পৌত্তলিক। তাই 'আল্লাহ' নির্দেশক বাইবেলের মূল ভাষার বিশেষ শব্দটি গ্রীক অনুবাদে পৌত্তলিক প্রতিরূপ গ্রহণ করে। বর্তমান ইংরাজী বাইবেল ঐ গ্রীক অনুবাদের প্রতিরূপ। এক ভাষা হইতে অপর ভাষায় বারবার ভাষান্তর হওয়ায় ঈশ্বর এবং প্রিয়পাত্র হিসাবে সন (Son) বা পুত্র অর্থে রূপান্তরিত হয়। যেমন কুরআন মজীদের গিরীশ সেনের বঙ্গানুবাদে 'আল্লাহ' শব্দের বঙ্গানুবাদ করা হইয়াছে 'ঈশ্বর'। অথচ ঈশ্বর এমন এক সত্তা যাহার নিম্নতর ও উচ্চতর বংশধারা রহিয়াছে। আর এই ঈশ্বর শব্দটি আরবী আল্লাহ শব্দের বঙ্গানুবাদ মোটেই যথাযথ নহে, বরং মারাত্মক বিভ্রান্তিকর। কারণ আল্লাহ্র উর্ধ্বতন বা নিম্নতর কোন বংশধারা নেই, তিনি নিজ সত্তায় এক ও একক। এইভাবে ভাষান্তরে ভাবান্তর হয়। আর বাইবেলে ঈসা (আ) নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তো দাবি করেনই নাই, বরং ৮০টি স্থানে তিনি নিজেকে 'মনুষ্য পুত্র' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন (দ্র. বাইবেল ডিকশনারী, রেড লেটার বাইবেল-এর সংযুক্তি)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল করীম, বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেন বাংলাদেশ, ঢাকা; (২) The New Encyclopaedia Britannica, vol. 10 (Chicago, Encyclopaedia Britannica Inc., 1978); (৩) Encyclopedia Americana, vol. 16, Encyclopedia Americana Corporation, 1979; (৪) Encyclopaedia Britannica, vol. 13 (London : Encyclopaedia Britannica Ltd. 1962); (৫) ইমাম মুহাম্মাদ আবূ যুহরা, মুহাদারাত ফিন নাসরানিয়্যাহ (কায়রো ঃ দারুল ফিক্রিল আরাবী, তা.বি.); (৬) বাইবেল (পুরাতন ও নূতন নিয়ম), বঙ্গানুবাদ বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা; (৭) আবদুল ওয়াহিদ খান, ঈসাইয়্যাত, দিল্লী, মারকাযী মাক্তাবায়ে ইসলামী; (৮) ইসলামী বিশ্বকোষ, বাংলা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ৫খ; (৯) সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, বঙ্গানু. মাও. আবদুর রহীম (ঢাকা ঃ আধুনিক প্রকাশনী); (১০) মুতাওয়াল্লী ইউসুফ শালাবী, আদওয়া আলাল মাসীহিয়্যা (কুয়েত ঃ আদ্-দারুল কুওয়ায়তিয়্যাহ, ১৯৭৩ খৃ./১৩৯৩ হি.); (১৪) বার্নাবাসের বাইবেল, বঙ্গানুবাদ আফজাল চৌধুরী (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিমিটেড, ১৯৯৬); (১৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া (কায়রো, দারুদ দায়্যান লিত-তুরাছ, ১৪০৮ হি./১৯৮৮ খৃ.); (১৬) ইবনুল জাওযী, ইমাম আবুল ফারাজ জামালুদ্দীন আবদুর রহমান ইব্ন আলী, যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর (দামিশক ঃ আল-মাকতাবুল ইসলাম, ১ম সং., তা.বি.); (১৭) আল-মাওয়ারদী, তাফসীর আননুকাত ওয়াল 'উয়ূন, বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; (১৮) সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী, রূহুল মা'আনী (বৈরূত ঃ দারু ইহয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, তা.বি.); (১৯) মাওলানা হিফজুর রহমান সিওহারবী, কাসাসুল কুরআন, বঙ্গানুবাদ মুহাম্মাদ মূসা, ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ; (২০) মাও. আবুল কালাম আযাদ, তারজুমানুল কুরআন, ২খ., লাহোরঃ ইসলামী একাডেমী, তা.বি.; (২১) I Lehman, The Jews Report; (২২) Mohammad Ataur Rahim, Jesus A Prophet of Islam; (২৩) Syeed

Sajjad Hosain, A Young Muslim's guide to religions in the world, Dhaka : Bangladesh Institute of Islamic Thought, 1992; (২৪) ফীরোযাবাদী, তানবীরুল মিক্য়াস মিন তাফসীরি ইব্ন আব্বাস (বৈরূত, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১২ হি./১৯৯২ খৃ.); (২৫) আবূ হায়্যান, আল-বাহরুল মুহীত, বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ; (২৬) ইব্ন আশূর, তাফসীরুত্ তাহরীর ওয়াত্-তানবীর (আলজেরিয়া ঃ দার সাহনূন); (২৭) নাসাফী, ইমাম আবদুল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মাহমূদ, মাদারিকুত্ তানযীল ওয়া হাকায়িকুত্ তাবীল (করাচী, কাদমী কুতুবখানা, তা.বি.); (২৮) ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ কুরতুবী, আল জামি লি আহ্কামিল কুরআন (বৈরূত ঃ দারু ইহ্য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, তা.বি.); (২৯) সহীহ মুসলিম; (৩০) 'আল্লামা রহমাতুল্লাহ কীরানবী, ইযহারুল হক, রিয়াদ, আল-ইদারাতুল ইলমিয়্যা ওয়াল বুহূছ; (৩১) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরে মাযহারী, বঙ্গানুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮ ইং; (৩২) ইসলামী ইন্সাইক্লোপেডিয়া (উর্দূ), সম্পাদনা ঃ সায়্যিদ কাসিম মাহ্মূদ, করাচী; (৩৩) ইব্ন জারীর তাবারী, তাফসীরে তাবারী শরীফ, বঙ্গানুবাদ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯২; (৩৪) আলাউদ্দীন বাগদাদী, তাফসীরুল খাযিন (বৈরূত ঃ দারুল মারিফা, তা.বি.); (৩৫) শায়খ ইসমাঈল হাক্কী, তাফসীর রূহুল বায়ান (বৈরূত ঃ দার ইহ্য়ায়িত তুরাছিল আরাবী, ১৪০৫/১৯৮৫); (৩৬) জামি তিরমিযী (মানাকিব); (৩৭) আহ্মাদ ইব্ন হাম্বল, আল-মুসনাদ; (৩৮) নওয়াব সিদ্দীক হাসান কানূজী, ফাত্হুল বায়ান ফী মাকাসিদিল কুরআন; (৩৯) যামাখ্শারী, আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমূদ, আল-কাশশাফ (বৈরূত ঃ দারুল মারিফা); (৪০) মুহা. মুরতাদা আয্-যুবাইদী, তাজুল আরূস (বৈরূত ঃ দারু মাক্তাবাতিল হায়াত, তা.বি.); (৪১) বায়দাবী, আনওয়ারুত্ তানযীল (বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা); (৪২) Encyclopedia of Islam, Leiden, 1st, ed.; (৪৩) সায়্যিদ রশীদ রিদা, তাফসীরুল মানার (বৈরূত ঃ দারুল মারিফা, ২য় সং., তা.বি.); (৪৪) The Hans wehr Dictionary of Modern written Arabic-English, Edited by I.M. Cowan, New York; (৪৫) উইল ডুরান্ট, কিস্সাতুল হাদারা, বৈরূত; (৪৬) মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী, আল-মুজাম আল-মাফাহরিস লি-আলফাজিল কুরআনিল কারীম; (৪৭) ইব্ন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল্ আযীম,(বৈরূত ঃ দারুল মারিফা); (৪৮) ইব্ন হায্ম, আল-ফিসাল ফিল্ মিলাল ওয়াল আহওয়ায়ে ওয়ান নিহাল (বৈরূত ঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ); (৪৯) আহমাদ আবদুল ওয়াহাব, আল-মাসীহ ফী মাসাদিরিল আকায়িদিল মাসীহিয়্যাহ, কায়রো ১৩৯৮ হি./১৯৭৮ খৃ.; (৫০) ড. মরিস বুকাইলি, বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান, বঙ্গানুবাদ আখতার উল-আলম, ঢাকা ঃ রংপুর পাবলিকেশন্স লিমিটেড, ১৯৮৮; (৫১) মাও. সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সরোয়ারে আলম, ঢাকা, আধুনিক প্রকাশী; (৫২) Dr. Nenham, Saint Mark, England : Penguin books, 1963; (৫৩) F. Grant, The Gospels" Their origins and their growth (London 1957); (৫৪) ড. শারকাবী, মুকারানাতুল আদয়ান (কায়রো ১৪০৫ হি.); (৫৫) আহমদ দিদাত, দি চয়েস, অনু. আখতার উল আলম, ঢাকা ঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, ১৯৯৯ ইং; (৫৬) মুহাম্মাদ জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন (উর্দু), ৩য় খণ্ড; (৫৭) সহীহ

বুখারী; (৫৮) আসকালানী, আহ্মদ ইব্ন আলী, ফাতহুল বারী শারহি সহীহিল বুখারী (বৈরূত ঃ দারুল মারিফা, তা.বি); (৫৯) আহ্মাদ মুস্তাফা মারাগী তাফসীরুল মারাগী (দামিশক ঃ দারুল ফিক্র, তা.বি.); (৬০) আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, বঙ্গানুবাদ মাওলানা মুহাম্মদ ওবাইদুর রহমান মল্লিক (ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮); (৬১) ড. মুহা. আবদুর রহমান আনওয়ারী, মানহাজুদ দাওয়াত ওয়াদ-দু'আত ফিল কুরআনিল কারীম (পি এইচ ডি থিসিস), ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া ১৯৯৯; (৬২) The World Book of Encyclopaedia, vol. 17; (৬৩) Balman Struck, The four Gospels (New York : Macmillan 1960); (৬৪) তকী উছমানী, মা হিয়ান নাসরানিয়্যা (মক্কা ঃ রাবেতাতুল আলামিল ইসলামী, তা.বি.); (৬৫) আখতার উল আলম, শেষ নবী (ঢাকা ঃ কারামাতিয়া পাবলিকেশন্স ১৯৯১); (৬৭) আলী মুত্তাকী, কানযুল উম্মাল, (বৈরূত ঃ মুআসসাতুর রিসালা, ১৪০৯ হি./১৯৮৯ খৃ.); (৬৮) ইমাম বায়হাকী, কিতাবুল আস্মা ওয়াস্-সিফাত; (৬৯) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত্-তারীখ, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরূত ১৪০৭ হি./১৯৮৭ খৃ.; (৭০) মাওলানা মুহাম্মদ তাহের, খৃষ্টধর্ম ও বাইবেল (ঢাকা ঃ আল কাউসার প্রকাশনী, ২০০০); (৭১) মাও. ইমদাদুল হক, বাইবেলের স্বরূপ ও খৃষ্টধর্ম (ঢাকা ঃ শায়খুল হিন্দ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৯৭); (৭২) ফাখরুদ্দীন রাযী, আত্-তাফসীরুল কবীর (তেহরান ঃ দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ, তা.বি.); (৭৪) মুহা. সিরাজুল হক, বাইবেল কি ঐশী গ্রন্থ (ঢাকা ঃ জনতা প্রেস এন্ড পাবলিকেলন্স, ২০০০); (৭৫) শ্রী প্রমোদ সেন গুপ্ত, ধর্ম দর্শন, ঢাকা ঃ ব্যানার্জী পাবলিকেশন্স, ৩য় সং., ১৯৮৯; (৭৬) The Encyclopedia of Religion (New York : Macmillan Publishing Company, 1987); (৭৭) Encyclopedia of Religion and Ethics; (৭৮) ইব্ন তায়মিয়্যা, আল-জাওয়াবুস সাহীহ লিমান বাদ্দালা দীনাল মাসীহ, কায়রো ১৩২২-২৩ হি.; (৭৯) মুহাম্মদ আকবর খান, ক্রুসেড অর জিহাদ, লাহোর, সিনদ সাগর, ১৯৬১ খৃ.; (৮০) আল-বুস্তানী, দাইরাতুল-মাআরিফ, আলবী, ৬খ., বৈরূত; (৮১) আল্-মাকরীযী, আল্-খিতাত, বৈরূত ১৯৫৯ ইং; (৮২) F. C. Burkitt, The Christian Religion, Cambrige.; (৮৩) আবূ খালিদ, কাদিয়ানী মতবাদ একটি ভ্রান্ত মতবাদ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা ২০০১ খৃ.।

ড. মুহাম্মদ আবদুর রহমান আনওয়ারী

৩২

হযরত লুকমান (আ)

حضرت لقمان عليه السلام

হযরত লুকমান (আ)

পরিচিতি

লুকমান আরববাসীদের নিকট এবং প্রাচীন আরব ইতিহাসে এক অতি প্রসিদ্ধ নাম। জ্ঞান-বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন উপমাস্বরূপ এবং তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত কথামালা আরবের পণ্ডিত সমাজে মৌখিক উদ্ধৃতিরূপে বহুল প্রচলিত ছিল এবং সীমিত পর্যায়ে হইলেও লিখিত রূপেও বিদ্যমান ছিল। আরব জাহিল যুগের প্রখ্যাত কবি যথা ইমরুউল কায়স, লাবীদ, আ'শা তারাযা প্রমুখের কবিতায় লুকমান-এর উল্লেখ রহিয়াছে। ইব্ন হিশামের সীরাত গ্রন্থ (পৃ. ৬৭, ৬৯) এবং উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতি'স-সাহাবাহ কিতাবেও (২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৮, বরাত, ই. বিশ্বকোষ, ই,ফা,বা) তাঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এত খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি সত্ত্বেও তাঁহার প্রজ্ঞাবান (হাকীম) হওয়া এবং তাঁহার জ্ঞানের কথাগুলি 'সহীফায়ে লুকমান' বা 'লুকমান পুস্তিকা' নামে প্রচলিত থাকা ব্যতীত তাঁহার সম্পর্কে অন্যান্য বিষয়ে মতবিরোধ রহিয়াছে। তাঁহার গোত্র পরিচয়, বংশধারা, জন্ম-মৃত্যু ও অবস্থান কাল, গঠন-প্রকৃতি, একজন অনারব ইয়াহূদী কাফ্রী ক্রীতদাস অথবা প্রাচীন আরব বংশীয়, গোরা, স্বাধীন এমনকি রাজা হওয়ার ব্যাপারে বর্ণনা-বিরোধ ও মতভেদ রহিয়াছে। তদ্রূপ মতভেদ রহিয়াছে তাঁহার নবী-রাসূল অথবা ওয়ালীআল্লাহ ও জ্ঞানতাপস এবং বিচারপতি (কাযী) হওয়ার ব্যাপারে (দ্র. সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, ৩খ, ৩৪; দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৯ খ., ১২৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩ খ, শিরো.)।

লুকমান (আ)-এর জন্ম ও বংশধারা

লুকমান (রা)-এর জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারীখ সম্পর্কে কোন প্রকাশ্য প্রামাণ্য তথ্য পাওয়া যায় না। এই প্রসংগে ইতিহাস ও তাফসীর গ্রন্থসমূহের বর্ণনাকে তিনটি মৌলিক ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ (১) প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইব্ন ইসহাকের বর্ণনামতে লুকমান (আ)-এর বংশধারা নিম্নরূপ লুকমান ইব্ন বা'উর (না'উর), ইব্ন নাহূর/নাহর ইব্ন তারাহ/তারাখ (لقمان بن باعور/ناعور بن ناحور/ناحرين تارح/تارخ) আর অধিকাংশের বর্ণনামতে তারাহ ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযর-এর অপর নাম। সুতরাং এই বংশধারা মতে লুকমান (আ) হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্বগোত্রীয় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রস্থানীয় হইবেন (কালবী, মা'আলিমুত তানযীল— ৩খ, ৩৯০; ফতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; মুখতার তাফসীরুল কুরতুবী পৃ. ৬২১, দাইরা, ১৯খ., ১২৯)। তাফসীরে কুরতুবীতে যামাখশারীর বরাতে এবং রূহুল মা'আনীতে তাঁহার নাম লুকমান ইব্ন বাউরা

(باعوراء) বলা হইয়াছে। আল-মুবতাদা গ্রন্থে ওয়াহ্‌ব ইব্‌ন মুনাব্বিহের বর্ণনায় লুকমানকে আইয়ূব (আ)-এর ভাগিনা এবং মুকাতিলের উদ্ধৃতিতে তাঁহার খালাতো ভাই বলা হইয়াছে। অপরদিকে ওয়াকিদীর বর্ণনায় তাঁহাকে বনী ইসরাঈলের কাযী (বিচারপতি) বলা হইয়াছে। তদ্রূপ মুজাহিদসূত্রে তাবারী প্রমুখের বর্ণনায় তাঁহাকে দাউদ (আ)-এর সমকালীন এবং বানূ ইসরাঈলের কাযী বলা হইয়াছে। বাগাবী, বায়দাবী ও কুরতুবীর বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, লুকমান (আ) দাউদ (আ)-এর নবী হওয়ার পূর্বে ফত্ওয়া প্রদানের দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি দাউদ (আ)-এর নিকট হইতে ইল্‌ম আহরণ করেন। তিনি নবী হওয়ার পর লুকমান (আ) ফতওয়া প্রদান বন্ধ করিয়া দেন এবং দাউদ (আ)-এর 'উযীর'রূপে দায়িত্ব পালন করেন (বাগাবী, ৩খ., ৪৯০, ৪৯১; মুখতাসার তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২১; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮২; মাজহারী, উরদূ, ৯খ., ২৪৮)।

উল্লিখিত বর্ণনাসমূহে আপাত বিরোধ রহিয়াছে। কেননা উল্লিখিত বংশলতিকা অনুসারে লুকমান (আ) ছিলেন ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযরের ৩য়, অধস্তন পুরুষ। অথচ আইয়ূব (আ) ছিলেন আযরের ৭ম অধস্তন পুরুষ (দ্র. বিদায়া ১/২২০, আইয়ূব (আ)-এর বংশলতিকাস্থ এবং দাউদ (আ) ছিলেন আযরের ১৪তম অধস্তন পুরুষ (বিদায়া, ২খ., ৯, দাউদ আ.-এর বংশলতিকা) অথবা ১২তম অধস্তন পুরুষ (বাইবেল, ১ বংশাবলী, ২ ঃ ৩-১১৬ দ্র.)।

এই বিরোধ নিরসনের জন্য বায়দাবী প্রমুখ বলিয়াছেন যে, লুকমান (আ) এক হাযার বৎসরের দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া দাউদ (আ)-এর কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন (বায়যাবীর বরাতে তাফসীরে মাজহারী (উরদূ), ৯খ., ২৪৮; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৪; রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮২; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২১)। কিন্তু লুকমান (আ)-এর এই দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকা এবং বানূ ইসরাঈলের কাযী ও দাউদ (আ)-এর সমকালীন হওয়ার কথা মানিয়া নিলেও অপর একটি জটিল প্রশ্ন দেখা দেয় যে, বানূ ইসরাঈলের বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাওরিত-ইনজীলে তাঁহার উল্লেখ ও আলোচনা থাকা উচিত ছিল। অথচ ইনজীল অথবা Jewish Encyclopaedia-তে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। এই প্রসংগে আল-কামিলী তাঁহার তাফসীর গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, কোন কোন মুসলিম মনীষী তাওরাতে উল্লিখিত বাল'আম (بلعام بن باعوراء) ও লুকমানকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াছেন। কিন্তু ইনজীল ও দাইরা-ই মা'আরীফে য়াহূদে বাল'আমের চরিত্র যেরূপ ঘৃণ্যভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে উহার সহিত লুকমান চরিত্রের কোন প্রকার মিল না থাকায় এই দাবি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না (দ্র. দাইরা-ই মা'আরিফ, ১৮খ., ১২৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩খ., ২৯১)।

(২) লুকমান (আ)-এর বংশধারা ও গোত্র পরিচিতি সম্পর্কে দ্বিতীয় অভিমত এই যে, তিনি সূদানী হাবশী দাস ছিলেন। তাফসীরে রূহুল মা'আনীতে বলা হইয়াছে, লুকমান একটি অনারব (আ'জামী) নাম (রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮২)। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস, জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ, আবূ হুরায়রা (রা) প্রমুখ সাহাবী, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মুজাহিদ, খালিদ ইব্‌ন ছাবিত, রিব্'ঈ

(খালিদ ইব্‌নু রাবী'-মাজহারী), 'উমার ইব্‌ন কায়স ও আবদুর রহমান ইব্‌ন ইয়াযীদ প্রমুখ তাবি'ঈ হইতে প্রাপ্ত বর্ণনার ভিত্তিতে ইব্‌ন আবূ শায়বা, ইমাম আহমদ, ইব্‌ন আবিদ, ইব্‌ন জারীর, কুতায়বা, ইব্‌ন কাছীর, ইবনুল মুনযির, ইব্‌ন আবী হাতিম, আবদুর রহমান সুহায়লী প্রমুখ হাদীছ ও তাফসীর শাস্ত্রের ইমাম ও ইতিহাসবিদগণ লুকমানকে আফ্রিকার অন্তর্গত সুদানের নূবা গোত্রের লোক এবং হাবশী দাস বলিয়াছেন। এমনকি ইব্‌ন আব্বাস ও আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে বর্ণিত একটি মারফূ হাদীছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম লুকমানকে হাবশী দাস বলিয়াছেন। তবে হাদীছ বিশারদগণ এই মারফূ রিওয়ায়াতকে দুর্বল সাব্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণনায় লুকমান (আ)-এর বংশ পরিচিতি নিম্নরূপ ঃ লুকমান ইব্‌ন আনকা 'ইব্‌ন সুরূন। ফতহুল বারীতে সুরূন স্থলে শীরূন (شيرون) বলা হইয়াছে।

আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়াতে সুরূন স্থলে সুদূন (سدون) এবং মতান্তরে লুকমান ইব্‌ন ছারান (ثاران) ইব্‌ন সুদূন বলা হইয়াছে। তিনি ছিলেন মিসরের দক্ষিণ ও সূদানের উত্তরাঞ্চলে বসবাসকারী নূবা গোত্রের লোক এবং তিনি মাদয়ান ও আয়লা (বর্তমান আকাবা)-র বাসিন্দা ছিলেন।

মোটকথা, অধিকাংশ ইতিহাসবিদ, মুফাসসির, মনীষীদের মতে লুকমান একজন হাবশী দাস ছিলেন এবং মূল বংশের দিক দিয়া নূবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার বসবাস আরবী ভাষাভাষীদের অঞ্চলে হওয়ার কারণে তাঁহার জ্ঞানগত বাণী ও দৃষ্টান্তসমূহ আরবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উল্লিখিত মনীষিগণ তাহাদের অভিমতের স্বপক্ষে যে সকল বর্ণনা প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করিয়াছেন সেইগুলির কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হইল। সুফয়ান ছাওরী, 'ইকরিমা সূত্রে ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, লুকমান একজন হাবশী দাস ও সূত্রধর ছিলেন। কাতাদা আবদুল্লাহ ইব্‌ন যুবায়র (রা) হইতে বর্ণনা করেন ঃ আবদুল্লাহ বলেন, আমি জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, লুকমান সম্পর্কে আপনি কি জানেন? তিনি বলিলেন, كان قصيرا افطس من النوبة তিনি নূবা গোত্রের বেঁটে ও চ্যাপ্টা নাকবিশিষ্ট ছিলেন। ইয়াহ্ইয়া ইব্‌ন সা'ঈদ আনসারী সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিব হইতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন,

كان لقمان من سودان مصر ذو مشافر اعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة .

"লুকমান ছিলেন মিসরীয় সুদানের অধিবাসী, মোটা ওষ্ঠবিশিষ্ট; আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে নুবুওয়াত দান না করিলেও হিকমত ও প্রজ্ঞার ভাণ্ডার দান করিয়াছিলেন"।

আবদুর রহমান ইব্‌ন হারমালা হইতে আওযা'ঈর গৃহীত বর্ণনায় আছে, কালো বর্ণের এক ব্যক্তি সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যিবের নিকট আগমন করিল (সে তাহার গাত্রবর্ণ কালো হওয়ার কারণে দুঃখিত ছিল)। সা'ঈদ (রা) তাহাকে বলিলেন,

لا تحزن من اجل انك اسود فانه كان من اخير الناس ثلاثة من السودان بلال ومهجع مولي عمرولقمان الحكيم كان اسود نوبيا ذا مشافر .

"তোমার বর্ণ কালো এইজন্য তোমার দুঃখিত হওয়ার কোন কারণ নাই। কেননা সূদানের অধিবাসীদের মধ্যে তিনজন শ্রেষ্ঠ লোক হইয়াছেন— বিলাল (রা), উমার (রা)-র আযাদকৃত গোলাম মাহজা' এবং লুকমান হাকীম, যিনি নূবা গোত্রের কালো বর্ণের মোটা ওষ্ঠবিশিষ্ট লোক ছিলেন"। মুজাহিদ ও 'উমার ইব্ন কায়সের বর্ণনায় আছে,

كان عبدا اسود عظيم (غليظ) الشفتين مشقق (مصفح) القدمين ·

"লুকমান ছিলেন কালো, মোটা ও ভারী ওষ্ঠবিশিষ্ট এবং মাংসল ও স্থূল এবং ফাটলযুক্ত পা বিশিষ্ট" (ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ., ১২৩, ১২৪; মুখতাসার তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., ৬৪; রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮২, ৮৩; মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২১; তাফসীরুল বাগাবী, ৩খ., ৩৯১; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; তাফসীরে মাজহারী (উরদূ), ১খ., ২৪৮, ২৪৯; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৪; ইব্ন আবূ শায়বা, আহমদের কিতাবু'য-যুহ্দ, দা, মা, ই, ১৯খ., ১২৯; ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৬ খ, ২৯১; হিফযুর রহমান, কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৪, ৩৫; জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ৫১৮)।

লুকমান (আ)-কে গোলাম সাব্যস্তকারীদের কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি বানূ ইসরাঈলের এক ব্যক্তির গোলাম ছিলেন। তাঁহার মনিব তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য করার জন্য তাঁহাকে কিছু সম্পদ দিয়াছিল। শারহুল আমালীতে আবূ উবায়দ আল-বিকরী একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে লুকমান (আ)-কে ইয়ামানের আযদ গোত্রের শাখা বনূ হাসহাস (الحسحاس) (বনূ নাহহাস, বিদায়া, ২খ., ১২৪)-এর আযাদকৃত গোলাম বলা হইয়াছে। ইব্ন হাজার এই বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ইহাকে দুর্বল বলিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭)।

(৩) ইতিহাসবিদ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক-এর মতে, লুকমান হাকীম ছিলেন প্রাচীন আরবের প্রসিদ্ধ 'আদ (দ্বিতীয় 'আদ) গোত্রের বংশধর এবং তিনি বাদশাহ ছিলেন, দাস ছিলেন না। এই অভিমতের সমর্থনে কিতাবুত তীজানে ওয়াহ্ব ইব্ন মুনাব্বিহ বলেন,

فلما مات شداد بن عاد صار الملك الى اخيه لقمان بن عاد وكان اعطى الله لقمان ما لم يعط غيره من الناس فى زمانه اعطاه حاسة مائة رجل وكان طويلا لا يقاربه اهل زمانه ·

"শাদ্দাদ ইব্ন আদের মৃত্যুর পর রাজত্ব তাহার ভ্রাতা লুকমান ইব্ন 'আদের নিকট অর্পিত হইল। আল্লাহ তা'আলা লুকমানকে এমন কিছু দান করিয়াছিলেন যাহা তাঁহার সমকালীন অন্য কোন মানুষকে দান করেন নাই। আল্লাহ তাঁহাকে এক শত লোকের সমপরিমাণ অনুভূতি শক্তি দান করিয়াছিলেন এবং তিনি ছিলেন সমসাময়িক কালের সর্বাধিক দীর্ঘকায় ব্যক্তি।"

ওয়াহ্ব আরও বলেন, ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলিয়াছেন,

لقمان بن عاد بن الملطاط من السلك (السكسك) بن وائل بن حمير نبيا غير مرسل ·

"লুকমান ইব্ন আদ ইবনুল মুলতাত ইবনুস সিলক (ইবনুস্ সিক্সাক) ইব্ন ওয়াইল ইব্ন হিময়ার নবী ছিলেন, রাসূল ছিলেন না"।

এ বর্ণনা দ্বারা তাঁহার প্রাচীন আরব বংশীয় হওয়া বুঝা যায় এবং লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, লুকমান (আ)-কে হাবশী দাস হওয়ার প্রবক্তা ইব্ন জারীর ও ইব্ন কাছীর প্রমুখ যেরূপে তাহাদের দাবির সমর্থনে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন তদ্রূপ ইব্ন ইসহাকও লুকমান (আ)-এর বাদশাহ ও আরবী হওয়ার দাবির সমর্থনে ইব্ন আব্বাস (রা)-এর উক্তিই উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং এখানে ওয়াহ্বের বর্ণনায় লুকমানকে 'আদ-এর বংশধর বলা হইয়াছে, অথচ আল-মুবতাদা কিতাবে উদ্ধৃত ওয়াহ্বের বর্ণনায়ই তাঁহাকে আইয়ূব (আ)-এর ভাগিনা বলা হইয়াছে (দ্র. ইব্ন হিশাম, কিতাবুত তীজান, পৃ.৭০; কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৫, ৩৬; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ৫১৮; দামাই, ১৯খ., ১২৯, ১৩০)।

লুকমান (আ)-এর পেশা

অধিকাংশ মুফাস্সির ও ইতিহাসবিদের মতে, লুকমান (আ) পেশায় সূত্রধর (نجار) ছিলেন। সুফ্য়ান ছাওরীর তাফসীর গ্রন্থে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে ইকরিমা সূত্রের বর্ণনায় এবং খালিদ ইব্ন ছাবিত রিব্'ঈর বর্ণনায় তাঁহাকে সূত্রধর বলা হইয়াছে। ইবনুল মুনযির ও ইব্ন আবূ শায়বা ও আহমদের বর্ণনায় তাঁহাকে দর্জী (خياط) বলা হইয়াছে। যাজ্জাযের বর্ণনামতে তিনি ছিলেন বিছানার চাদর ও আনুষংগিক বস্ত্র-উপকরণ প্রস্তুতকারী। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তাঁহার কাজ ছিল তাঁহার মনিবের জন্য দৈনিক এক বোঝা জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা। ইব্ন আব্বাস (রা)-এর অপর এক বর্ণনায় এবং ইব্ন জারীরের ও ইব্ন আবূ হাতিমের এবং ওয়াহবের বর্ণনায় তাঁহাকে রাখাল (راعى) বলা হইয়াছে (আল-বিদায়া, ২খ., ১২৪; মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২১; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮৩)।

হযরত লুকমান (আ)-এর সময়কাল

লুকমান (আ)-এর যুগ ও অবস্থানকাল অস্পষ্ট ও বিতর্কিত। পূর্বোল্লিখিত অভিমতসমূহের বিচারে হযরত লুকমানের সময়কাল হইবে হয়ত হযরত ইবরাহীম (আ)-এর প্রায় সমসাময়িক অথবা অল্প কিছু কাল পরে। কেননা একটি অভিমতে তাঁহাকে ইবরাহীম (আ)-এর পিতা আযরের তৃতীয় অধস্তন পুরুষ বলা হইয়াছে। অথবা তাঁহার সময়কাল হইবে হযরত দাউদ (আ)-এর সময়কাল। কেননা তাঁহাকে দাউদ (আ)-এর খালাতো ভাই অথবা ভাগিনা এবং তাঁহার সহযোগী ও উযীর বলা হইয়াছে। ইতিহাসের হিসাব-নিকাশে দাউদ (আ)-এর যুগ ছিল খৃষ্টপূর্ব দশম শতাব্দী। সুতরাং এই মত অনুসারে হযরত লুকমানের সময়কালও একই হইবে। অপর দিকে তাঁহাকে প্রাচীন আরবের 'আদ বংশীয় লুকমান ইব্ন 'আদ সাব্যস্ত করা হইলে তাঁহার যুগ হইবে অতি সুপ্রাচীন। কেননা ইতিহাসে প্রথম 'আদ সম্প্রদায় ছিল নূহ (আ)-এর চতুর্থ অধঃস্তন পুরুষ এবং 'আদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত নবী হূদ (আ) ছিলেন নূহ (আ)-এর পঞ্চম অথবা নবম অধস্তন পুরুষ (দ্র. বিদায়া নিহায়া, ১খ., ১২০) এবং দ্বিতীয় 'আদ তথা ছামূদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত নবী সালিহ (আ) ছিলেন নূহ

(আ)-এর নবম অথবা দশম অধঃস্তন পুরুষ (বিদায় নিহায়া, ১খ., ১৩০)। সুতরাং দ্বিতীয় 'আদের বংশধর হইলে লুকমান (আ)-এর সময়কাল হইবে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বেশ পূর্বে। মাওলানা হিফযুর রহমান তাঁহার কাসাসুল কুরআনে লুকমান (আ)-এর সময়কাল ৩০০০ খৃস্টপূর্ব সন লিখিয়াছেন, যাহা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর যুগ হইতে বহু পূর্বে সাব্যস্ত হইবে (৩খ, ৩৭)। এই প্রসঙ্গে ওয়াকিদী লুকমান (রা)-এর সময়কাল হযরত ঈসা (আ) ও আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মধ্যবর্তী সময় বলিয়াছেন। আত্-তালকীহে ইব্নুল জাওযী লুকমান (আ)-কে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর পরে এবং হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক (আ)-এর পূর্বে হওয়ার দাবি করিয়াছেন। ইব্ন হাজার এই উক্তিদ্বয় উল্লেখ করিয়া ওয়াকিদীর মতকে 'অতীব বিরল' বলিয়াছেন এবং লুকমান (আ) দাঊদ (আ)-এর সমসাময়িক হওয়া সংক্রান্ত অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতকে সঠিক বলিয়াছেন (ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮২, ৮৩; কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৪-৩৭; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ৫১৯)। ইব্ন হাজার হাকিমের মুসতাদরাক কিতাবের বরাতে এতদসংক্রান্ত আরও একটি বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা প্রামাণ্য সনদে আনাস (রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে। আনাস (আ) বলেন, যখন লুকমান (আ) দাঊদ (আ)-এর নিকটে উপস্থিত ছিলেন তখন দাঊদ (আ) (লোহা গলাইয়া) বর্ম তৈরি করিতেছিলেন। তিনি অভিভূত হইয়া বর্মের কার্যকারিতা ও উপকারিতা সম্পর্কে দাঊদ (আ)কে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিকমত তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইতে বিরত রাখিতেছিল। এই বর্ণনা উল্লেখ করিয়া ইব্ন হাজার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহাতে স্পষ্টত বুঝা যায় যে, লুকমান (আ) দাঊদ (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন (ফাতহুল বারী, ৩খ., ৫৩৭)। এ প্রসঙ্গে সায়্যিদ সুলায়মান নদবী তাঁহার আরদুল কুরআন (ارض القران) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "লুকমান হাকীম ও বাদশাহ (গোত্রপতি) লুকমান অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং নিঃসন্দেহে তিনি দ্বিতীয় 'আদ সম্প্রদায়ের উত্তম শাসককুলের অন্যতম এবং অতি উঁচু স্তরের জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাবান। সহীফায় লুকমান নামে প্রসিদ্ধ পুস্তক এই 'আদ গোত্রীয় লুকমানেরই ছিল।" সায়্যিদ নদবী (র) তাঁহার এই দাবির অনুকূলে একাধিক প্রমাণ উপস্থাপন করিয়াছেন। যেমন, আরব জাহিলী যুগের অন্যতম শীর্ষ কবি সালমা ইব্ন রাবী'আর নিম্নোক্ত কবিতা পংক্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি স্পষ্ট আলোকপাত রহিয়াছে।

اهلكن طسما وبعده غذى بهم وذوجدون واهل جاش ومارب وحي لقمان والتقون .

"কালের দুর্বিপাক ও বিবর্তন তাসম গোত্র, অতঃপর বকরীর স্তন্যে লালিতদের এবং যূ-জাদুন ইয়ামানের শাসক, জাশ, মারিব গোত্র, লুকমানের গোত্র ও তাকূন প্রভৃতিকে বিলীন করিয়াছে"।

ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, লুকমান আরবী ভাষাভাষী ছিলেন, ইয়ামানের বাসিন্দা ছিলেন এবং গোত্রপতিও ছিলেন এবং জাঁকজমক ও প্রতিপত্তিতে উল্লেখযোগ্য এবং প্রসিদ্ধ সাবা গোত্রের সমপর্যায়ের ছিলেন। বস্তুত এইসব বিষয় 'আদ গোত্রের লুকমানের জন্যই প্রযোজ্য হইতে পারে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, আবরার-ই উবায়দ গ্রন্থেও এই লুকমানের উল্লেখ রহিয়াছে এবং উহাতে তাঁহাকে 'আদ আল-আখিরা (দ্বিতীয় 'আদ)-এর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মূলত প্রথম

'আদ ('আদ আল-উলা)-এর ধ্বংসের পর যে সকল লোক 'আদ সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরিত নবী হূদ (আ)-এর অনুসারীরূপে তাঁহার সহিত হাদরামাওত প্রভৃতি স্থানে গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল তাহাদিগকে 'আদ আল-আখিরা বলা হয়।

সায়্যিদ সুলায়মান নদবী তাঁহার দাবি প্রমাণে উল্লেখযোগ্য একটি প্রত্নতাত্ত্বিক শিলালিপির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। দক্ষিণ আরবের (ইয়ামানের) 'আদন (এডেন)-এর নিকটবর্তী হিসনে গুরাবের ধ্বংসাবশেষ হইতে ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে এই শিলালিপিটি পাওয়া গিয়াছে। উহাতে হযরত হূদ (আ)-এর শরী'আত অনুসারী সৎস্বভাবসম্পন্ন শাসকবর্গের প্রতি ইংগিত রহিয়াছে এবং তাহাদের উত্তম ফয়সালাসমূহ একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করার কথা বলা হইয়াছে। সায়্যিদ নদবী এই শিলালিপির বিষয়ে আরব ঐতিহাসিক ভূগোলের লেখক ফরেস্টারের বরাত উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, হযরত মু'আবিয়া (রা)-র সময়ও অনুরূপ শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং উভয় শিলালিপির বিষয়বস্তুতে হুবহু মিল রহিয়াছে (দ্র. আরদুল কুরআন, ১খ., পৃ. ১৮১, ১৮২-এর বরাতে কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৬,৩৭; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., যামীমা ৫১৮; দাইরাতুল মা'আরিফ, ১৯, ১২৯, ১৩০)।

হিজরী অষ্টাদশ সালে প্রাপ্ত 'আদ সম্প্রদায়ের শিলালিপির কয়েকটি বাক্যের অনুবাদ নিম্নরূপ ঃ "আমাদের উপরে শাসন পরিচালনা করেন এমন রাজাগণ যাহারা নীচতা সম্বন্ধে ধ্যানধারণা হইতে অতি দূরত্বে অবস্থান করেন, দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের শাস্তি বিধান করেন এবং (যাহারা) হূদ (আ)-এর শরী'আত অনুসরণ আমাদের জন্য 'জন্মলাভ' (?) করিতেন (তাহাদের) উত্তম ফয়সালাগুলি একটি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইত।" সায়্যিদ নদবী বলেন, এই শেষ বাক্যটি যাহা কাগজে নয়, পাথরে খোদাইরূপে পাওয়া গিয়াছে। ইহা দ্বারা আমরা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না যে, লুকমান (আ)-এর উত্তম ফয়সালাগুলির লিখিত ভাণ্ডারই সহীফা-ই লুকমানরূপে প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত ছিল (আরদুল কুরআন, ১খ., ১৮২-এর বরাতে কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৭)।

এই পর্যালোচনা দ্বারা লুকমান (আ) আরবের অধিবাসী হওয়া প্রমাণিত হয় এবং সেই সাথে ইয়াহূদী গ্রন্থসমূহে তাঁহার উল্লেখ না থাকিবার সূত্রও বোধগম্য হয়। সায়্যিদ সুলায়মান নদবী এই প্রসঙ্গে ইউরোপের পণ্ডিতদের হাকিম লুকমান ও দার্শনিক ঈশপ (৬১৯-৬৬৪ খৃ. পূ.)-কে (তাহাদের ঘটনাবলী ও দৃষ্টান্তের মাঝে মিল থাকিবার ভিত্তিতে) অভিন্ন ব্যক্তি সাব্যস্ত করিবার ধারাটিও যথার্থরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ঘটনাপঞ্জী ও বাণী দৃষ্টান্তে মিল থাকাই তাহাদের অভিন্ন ব্যক্তি হওয়ার জন্য যথেষ্ট নহে। কেননা, লুকমান হাকীম ছিলেন সার্বিক সদগুণে গুণান্বিত, আর ইতিহাসের বর্ণনামতে ঈশপ ছিল দাস ও অকর্মণ্য প্রকৃতির লোক (উল্লেখ্য যে, লুকমান (আ)-এর দাস হওয়া সম্পর্কিত বর্ণনাগুলি তেমন প্রামাণ্য নহে; দামাই, ১৯, খ., ১৩০)।

ইহা ছাড়া পবিত্র কুরআনে লুকমান (আ) কর্তৃক তাঁহার পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশের যে বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে (পরে দ্র.) উহাতে তিনি পুত্রকে গর্ব ও অহংকার বর্জন করিয়া বিনয়-নম্রতা ও

শিষ্টাচার এবং উঁচু মানের গুণাবলী আয়ত্ত করিবার উপদেশ দিয়াছেন যাহা এক দাসপুত্রের তুলনায় একজন রাজপুত্রের জন্যই অধিক সমীচীন। পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত উপদেশ বাণীর বিশ্লেষণে মাওলানা হিফজুর রহমান লিখিয়াছেন, "লুকমান হাকীম যদি দাস হইতেন, তাহা হইলে স্বীয় পুত্রকে এই ধরনের উপদেশ দান করিতেন না। কেননা, অহংকার ও আত্মম্ভরিতা, রূঢ়তা ও অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করা এমন সব স্বভাব যাহা রাজা ও রাজপুত্র, স্বচ্ছল ও প্রতিপত্তিতে মদমত্তদের মাঝেই অধিক হারে দেখা যায় এবং এইগুলি আল্লাহ্র প্রতি ভীতিহীন ও সম্পদের প্রাচুর্যে মত্ত বিলাসীদেরই আচরণ হইয়া থাকে। অহংকারী ও প্রতাপশালীদের এই সকল কু-স্বভাব কোন দাস বা দাস পুত্রের মধ্যে থাকিবার সুযোগ নাই। কেননা, তাহাদের শক্তি ও সময় তো অপরের বশ্যতা ও সেবা প্রদানে অতিবাহিত হয়। শেখ সাদীর ভাষায় ঃ

تواضع گردن فرازان نکوست گدا گر تواضع کند خوئ اوست

"বিনয় তো অহংকারীদের জন্য উত্তম সজ্জা; ভিখারীর বিনয় তো তার মজ্জাগত স্বভাব মাত্র"। মোটকথা, পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত লুকমান (আ)-এর উপদেশমালার প্রতি লক্ষ্য করিলে দৃঢ়ভাবে এই দাবি করা যায় যে, লুকমান হাকীম ও 'আদ সম্প্রদায়ের লুকমান অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি দ্বিতীয় 'আদের সদগুণসম্পন্ন বাদশাহ ও হযরত হূদ (আ)-এর অনুসারী ছিলেন। তিনি আফ্রিকার দাস ছিলেন না, বরং খাঁটি আরব ছিলেন। এই প্রসংগে সীরাতবিদ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের উদ্ধৃতি এবং জাহিলী কবি সালমা ইব্ন রাবী'আর কাব্যের সাক্ষ্য অগ্রাধিকারযোগ্য ও প্রামাণ্য এবং দ্বিতীয় 'আদ যুগের শিলালিপি দ্বারা আরবাসীদের নিকট প্রসিদ্ধ সহীফা-ই লুকমান-ই উদ্দেশ্য হইবে (ক্বাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৯, ৪০)।

এখন এই কথাও বলা যায় যে, লুকমান যেহেতু আরব বংশোদ্ভূত ছিলেন এবং ইয়াহূদী-খৃষ্টানদের ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ইতিহাসের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, সেইজন্য তাহাদের গ্রন্থসমূহে তাঁহার কোন উল্লেখ নাই। অপরদিকে আরবরা তাঁহাদের বংশোদ্ভূত লুকমানের জন্য যথার্থই গৌরব করিত, প্রাচীন কাল হইতে সম্মানের সহিত তাঁহার নাম উচ্চারণ করিত এবং তাঁহার উপদেশাবলীর চর্চা করিত। ইহার ভিত্তিতেই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে নামোল্লেখের মাধ্যমে লুকমান (আ)-এর ব্যক্তিত্ব অমরত্ব ও চিরন্তনতা লাভ করিয়াছে (দ্র. দা. মা. ই., ১৯খ., ১৩১)।

হযরত লুকমান (আ)-এর নবুওয়াত প্রসংগ

হযরত লুকমান নবী ছিলেন কিনা এই প্রসংগেও পূর্বসূরী মনীষীদের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। অধিকাংশের মতে তিনি নবী ছিলেন না। শুধু ইকরিমা ও শা'বী হইতে তাঁহার নবী হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে (ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; মুখতারুত তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২১; মাদারিক ও খাযিনের বরাতে মুফতী শফী, আহকামুল কুরআন, ৩খ., ৩৬২; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৪)। ইব্ন ওয়াহ্ব সূত্রে মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাকের একটি বর্ণনা পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যাহাতে ইব্ন আব্বাস (রা) হইতেও লুকমানের নবী হওয়ার কথা বলা হইয়াছে। كان نبيا غير مرسل "নবী ছিলেন,

রাসূল ছিলেন না" (কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৩৬; বরাত, কিতাবুত তীজান, পৃ. ৭০)। বাগাবী বলিয়াছেন, এই বিষয়ে আলিমগণের ঐক্যমত্য রহিয়াছে যে, লুকমান 'হাকীম' ছিলেন, নবী ছিলেন না। একাকী ইক্‌রিমা তাঁহাকে নবী বলিয়াছেন (মা'আলিমুত তানযীল, ৩খ., ৩৯১)। পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে তাঁহার সারগর্ভ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশমালার কথা বিশেষ গুরুত্বের সহিত বর্ণিত হইলেও উহার বর্ণনাভংগীতে এবং কোন আয়াত বা শব্দে এমন কোন ইংগিত পাওয়া যায় না যাহা দ্বারা লুকমানের নবী হওয়া বুঝা যাইতে পারে। এই কারণে অধিকাংশ মনীষী তাঁহার নবী না হওয়ার মত পোষণ করিয়াছেন। এমন কি ইব্‌ন আব্বাস (রা) হইতেও নবী না হওয়ার বর্ণনাও রহিয়াছে। এই প্রসংগে ইব্‌ন কাছীর সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

والمشهور من الجمهورانه كان حكيما وليا ولم يكن نبيا وقد ذكره الله تعالى فى القران فاثنى عليه وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذى هو احب الخلق اليه ·

"জমহূরের প্রসিদ্ধ উক্তি এই যে, তিনি হাকীম ও ওয়ালী ছিলেন, নবী ছিলেন না। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁহার প্রশংসা করিয়া তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়পাত্র স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত তাঁহার উপদেশগুলির বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন" (আল-বিদায়া, ২খ., ১২৫)। তদ্রূপ ولقد اتينا لقمان الحكمة (আমি লুকমানকে হিকমত দান করিয়াছিলাম.......) আয়াতের ব্যাখ্যায় কাতাদা হইতে বর্ণিত হইয়াছে,

قال يعنى الفقه والاسلام لم يكن نبيا ولم يوحى اليه وهكذا نص على هذا غير واحد من السلف منهم مجاهد وسعيد بن المسيب وابن عباس ·

"(হিকমাত অর্থ) ফিকহ ও ইসলাম; তিনি নবী ছিলেন না; তাঁহার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় নাই। পূর্বসূরীদের অনেকের বরাতে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন মুজাহিদ, সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাব এবং ইব্‌ন আব্বাস (রা) প্রমুখ" (প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৯; কাসাসুল কুরআন, ৩খ., ৪০, ৪১; আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ৫১৭; রূহুল মা'আনী ১১/১খ., ৮২, ৮৩; মাজহারী, ৯খ., ২৪৮; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ. ৩৪, ৩৫; মুখতারু তাফসীরুল কুরতুবী, পৃ. ৬২১; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭)।

সা'ঈদ ইবনুল মুসায়্যাবের বর্ণনা "আল্লাহ তাহাকে হিকমত দিয়াছেন, নবুওয়াত দেন নাই..... ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, জমহূরের মতে হিকমত অর্থ সুবুদ্ধি, বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষ্ণ মেধা, প্রজ্ঞা, ইল্‌ম ও ইল্‌ম অনুসারে আমল এবং এক কথায় কথা ও কাজে সুষ্ঠুতা সম্পন্ন হওয়া" (রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮৩; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৫, ৩৬; মুখতাসার ইব্‌ন কাছীর, ৩খ., ৬১)।

লুকমান (আ)-এর 'হাকীম হওয়ার উৎস ও প্রেক্ষাপট ঃ বাহ্যত লুকমান (আ)-এর মধ্যে নবীসুলভ গুণাবলীর সমাবেশ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তবুও তিনি নবী হইলেন না কেন এবং তাঁহার হাকীম হওয়া বা হিকমত লাভের প্রেক্ষাপট কি ছিল, এই প্রসংগে সাহাবী ও তাবি'ঈগণের বরাতে কতিপয়

বর্ণনা পাওয়া যায়। এমনকি হাকীম তিরমিযী 'নাওয়াদির' (বিরল হাদীছ)-এ একটি মারফূ' হাদীছ বর্ণনা করিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে যে, দাঊদ (আ)-এর পূর্বে লুকমান (আ)-এর নিকট খিলাফতের প্রস্তাব করা হইলে তিনি বলিলেন, "যদি ইহা (আল্লাহ্র পক্ষ হইতে) প্রত্যক্ষ আদেশ হয় তবে নির্দ্বিধায় সানন্দে; আর যদি আমাকে উহাতে এখতিয়ার দেওয়া হয় তবে আমি উহার ব্যাপারে অব্যাহতিপ্রার্থী" (আদ-দুররুল মানছুরের বরাতে, মুফতী শফী, আহকামুল কুরআন, ৩খ., ৩৬২)। ইব্ন উমার (রা) ও কাতাদার বরাতে এই প্রসংগে আরও চমকপ্রদ ও বিশদ বিরবণ পাওয়া যায়। 'আতিয়া সূত্রে বর্ণিত, ইব্ন 'উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ

لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كبير التفكر حسن اليقين احب الله تعال فاحبه فمن عليه بالحكمة وخيره في ان يجعله خليفة يحكم بالحق فقال رب ان خيرتنى قبلت العافيه وتركت البلاء وان عزمت على فسعا وطاعة فانك ستعصمنى .

"লুকমান নবী ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন অতি চিন্তাশীল ও দৃঢ় বিশ্বাসের অধিকারী এক বান্দা। তিনি আল্লাকে ভালবাসিলে আল্লাহও তাঁহাকে ভালবাসিলেন এবং হিকমাত দান করিয়া তাঁহার প্রতি অনুগ্রহ করিলেন এবং ন্যায়বিচার পরিচালনার জন্য তাঁহাকে খলীফা মনোনীত করিবার ব্যাপারে তাঁহাকে এখতিয়ার প্রদান করিলেন। লুকমান বলিলেন, হে প্রতিপালক! যদি আপনি আমাকে আমার ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া দেন তবে আমি নিরাপত্তাকে কবুল করিলাম এবং বিপদকে বর্জন করিলাম। আর যদি ইহা আপনার প্রত্যক্ষ আদেশ হয় তবে বিনাবাক্যে ও নির্দ্বিধায় গ্রহণ করিব। কেননা, সে ক্ষেত্রে আপনিই আমাকে হেফাজত করিবেন।"

ছা'লাবীর বর্ণনায় আরও আছে ঃ

فقالت له الملائكة بصوت لا يراهم لم يالقمان قال لان الحاكم باشد اعنازل واكدرها يغشاه المظلوم من كل مكان ان يعن فبالحرى ان ينجو وان اخطأ اخطأ طريق الجنة ومن يكن فى الدنيا ذليلا خير من ان يكون فيها شريف ومن يختر الدنيا على الاخرة نفته الدنيا ولا يصيب الاخرة فتعجبت الملائكة من حسن منطقه فنام نو مة فاعطى الحكمة فانتبه يتكلم بها ثم نودى داؤد بعده فقبلها يعنى الخلافة ولم يشترط ما اشترطه لقمان فهوى فى الخطيئة غير مرة كل ذلك يعفوعنه .

"ফেরেশতা তখন অদৃশ্য হইতে আওয়াজ দিয়া বলিল, এরূপ কেন, হে লুকমান! তিনি বলিলেন, কেননা বিচারপতি একটি কঠিন ও অন্ধকারাছন্ন পরিস্থিতিতে অবস্থান করে। নিপীড়িত লোকেরা সর্বত্র হইতে তাহার নিকট আগমন করে। যদি তাহাকে (আল্লাহ্র পক্ষ হইতে সঠিক বিচারের ব্যাপারে) সাহায্য করা হয়, তবে তো সে মুক্তি লাভ করে, আর বিচার ভুল করিলে জান্নাতের পথ হারাইয়া ফেলে। দুনিয়াতে নিচু থাকা তথায় নেতৃত্ব ও আভিজাত্যের চাইতে উত্তম। যে ব্যক্তি

আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় দুনিয়াকে, দুনিয়া তাহাকে বিমুখ করে এবং আখিরাতও তাহার হাতছাড়া হইয়া যায়। ফেরেশতারা লুকমানের এই সুন্দর কথনে বিস্মিত হইলেন। পরে লুকমান নিদ্রামগ্ন হইলে তাঁহাকে হিকমত দান করা হইল এবং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি হিকমতপূর্ণ কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। পরবর্তী সময়ে দাঊদ (আ)-কে (খিলাফতের জন্য) আহ্বান করা হইলে তিনি উহা কবূল করিলেন এবং লুকমান (আ)-এর কোন শর্ত আরোপ করিলেন না। ফলে তিনি (বিচারকার্যে) কয়েকবার বিচ্যুতির শিকার হইলেন। তবে প্রতি বারই আল্লাহ তাঁহাকে মাফ করিয়া দিলেন"।

এই বর্ণনায় আরও আছে, লুকমান (আ) তাঁহার হিকমত দ্বারা দাউদ (আ)-কে সহায়তা করিতেন। একবার দাউদ (আ) তাঁহাকে বলিলেন, লুকমান! তোমার সৌভাগ্য তোমাকে হিকমত দেওয়া হইয়াছে এবং বিপদ হইতে দূরে রাখা হইয়াছে। আর দাউদকে খিলাফত দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাকে সমস্যা ও বিপদের সম্মুখীন করা হইয়াছে (মুখতারু তাফসীরুল কুরতুবী, পৃ. ৬২১, ৬২২; তাফসীরে মাজহারী, উরদূ, ৯খ., ২৪৮, ২৪৯)।

ইব্ন আবূ হাতিম কাতাদা হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, কাতাদা বলেন, আল্লাহ তা'আলা লুকমান হাকীমকে নবুওয়াত ও হিকমতের মধ্যে এখতিয়ার প্রদান করিলে তিনি নবুওয়াতের বিপরীতে হিকমত গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার নিদ্রামগ্ন অবস্থায় জিবরীল (আ) আগমন করিয়া তাঁহার অন্তরে হিকমত ঢালিয়া দিলেন। ফলে সকালে তিনি হিকমতপূর্ণ কথা বলিতে লাগিলেন। কাতাদার বর্ণনায় আরও আছে, লুকমানকে প্রশ্ন করা হইল, আপনার প্রতিপালক আপনাকে এখতিয়ার দেওয়া সত্ত্বেও আপনি নবুওয়াত কবুল না করিয়া হিকমতকে পসন্দ করিলেন কেন? জবাবে লুকমান বলিলেন, আমাকে দৃঢ়রূপে নবুওয়াত প্রদান করা হইল উহাতে আমি সাফল্যের আশা করিতাম এবং উহার দায়িত্ব পালনে উত্তীর্ণ হওয়ার আশা করিতাম। কেননা তখন আল্লাহ তা'আলাই আমার তত্ত্বাবধান করিতেন। কিন্তু আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হইলে নবুওয়াতের দায়দায়িত্ব প্রতিপালনে আমি নিজেকে অপারগ মনে করিলাম। কেননা তখন ইহার দায় আমার নিজেকেই বহন করিতে হইত। এই কারণে আমি হিকমতকে পসন্দ করিয়াছি। এই রিওয়ায়াতটি সম্পর্কে ইব্ন কাছীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (বিদায়া, ২খ., ১২৯; মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, ৬২১, ৬২২; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৪, ৩৫; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৫৩৭; মা'আলিমুত তানযীল, ৩খ., ৩৯১; মুফতী শফী, আহকামুল কুরআন, ৩খ., ৩৬২; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৪, ৩৫)।

ইব্ন কাছীর (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ১২৪) প্রমুখ হযরত লুকমানের হিকমত প্রাপ্তির সূত্র সম্পর্কে আরও কতিপয় বর্ণনা উল্লেখ করিয়াছেন। যেমন ইব্ন জারীর উমার ইব্ন কায়স হইতে বর্ণনা করেন, একদিন লুকমান (আ) একটি বিশাল মাহফিলে হিকমতের কথা শুনাইতেছিলেন। তখন সেখানে এক ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি সেই লোকটি নও যে অমুক মাঠে আমার সহিত ছাগল চরাইত? লুকমান (আ) বলিলেন, হাঁ, আমি সেই ব্যক্তি।

লোকটি বলিল, তাহা হইলে এখন আমি তোমার প্রতি মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং তোমার যে মর্যাদা দেখিতেছি উহার উৎস কি? লুকমান বলিলেন, ইহার উৎস আমার দুইটি কাজ। এক ঃ সর্বদা সত্য কথা বলা; দুই ঃ অনর্থক কথা ও কাজ হইতে নিজেকে সংযত রাখা। ইব্ন আবী হাতিম আবদুর রহমান ইব্ন আবূ ইয়াযীদ হইতে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা লুকমান হাকীমকে তাঁহার হিকমতের কারণে উচ্চ মর্যাদায় অভিহিত করিলে তাঁহার পূর্ব-পরিচিত এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি অমুকের পুত্রের দাস নও যে সেদিনও আমার ছাগল চরাইত? লুকমান বলিলেন, হাঁ। লোকটি বলিল, তবে তোমার এই প্রভূত মর্যাদার কারণ কি? লুকমান বলিলেন, আল্লাহর তাকদীর, আমানত প্রত্যর্পণ, সত্য ভাষণ এবং অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন। ইব্ন ওয়াহবের বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি লুকমান হাকীমের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, তুমি বনূ নাহ্হাসের গোলাম লুকমানই তো? লুকমান বলিলেন, হাঁ। লোকটি বলিল, তুমি ছাগলের রাখাল সেই কালো মানুষটিই তো? লুকমান বলিলেন, (ভাই), আমার কালো বর্ণটি দৃশ্যমানই। কিন্তু আমার ব্যাপারে তোমার বিস্ময়ের কারণ কি? লোকটি বলিল, তোমার দুয়ারে মানুষের এই ভিড় এবং দলে দলে আগমন এবং তোমার বক্তব্য-ভাষণে তাহাদের আকর্ষণ ও তুষ্টিই বিস্ময়ের কারণ। লুকমান বলিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি তোমাকে যাহা বলিব তদনুসারে কাজ করিলে তুমিও আমার মত হইতে পারিবে। লোকটি বলিল, সে সব কি কাজ? লুকমান বলিলেন,

غضى بصرى وكفى لسانى وعفة مطعمى وحفظى فرجى وقيامى بعدتى ووفائى بعهدى وتكرمتى ضيفى وحفظى جارى وتركى ما لا يعنينى فذاك الذى صيرنى ما ترى .

"আমার দৃষ্টিকে অবনত রাখা, জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রাখা, আমার খাদ্যের নিষ্কলুষতা অর্থাৎ হালাল খাদ্যে তুষ্টি, আমার লজ্জাস্থানের হিফাজত করা, ওয়াদা প্রতিপালন করা এবং মেহমানকে সমাদর করা, প্রতিবেশীর রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং অনর্থক কথা ও কাজ পরিত্যাগ করা। এই কাজগুলি আমাকে ঐ অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে যাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ১২৪; মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২২; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ., ৩৫)।

একবার লুকমান (আ) এক ব্যক্তিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাইতে দেখিয়া তাহাকে বলিলেন, যদি তুমি আমার ওষ্ঠাধর ভারী দেখিয়া থাক তবে এই দুই ওষ্ঠের মধ্য হইতে কোমল কথা বাহির হয় এবং তুমি যদি আমাকে কালো দেখিয়া থাক, তবে আমার অন্তরটি সাদা (মুখতারু তাফসীরিল কুরতুবী, পৃ. ৬২২)।

ইব্ন আবী হাতিম আবু দারদা (রা) হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, লুকমান (আ)-এর আলোচনা প্রসংগে একদিন তিনি বলিলেন, লুকমান হাকীম ধনবল-জনবলে বলীয়ান ছিলেন না, উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন না, তবে তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির নিরবতাপ্রিয়, অতি চিন্তাশীল ও সুগভীর দৃষ্টিসম্পন্ন। তিনি দিনের বেলা কখনও ঘুমাইতেন না। কেহ তাঁহাকে জনসমক্ষে থুথু

ফেলিতে, গালি দিতে অথবা গলা পরিষ্কার করিতে, মানুষের দৃষ্টিসীমায় পেশাব-পায়খানা করিতে ও গোসল করিতে দেখে নাই। তিনি অহেতুক কথা বলিতেন না, হাসিতেন না, কোন কথার পুনরুক্তি করিতেন না। তবে কেহ কোঁন হিকমতের কথা পুনরায় শুনাইবার অনুরোধ করিলে বলিতেন। তিনি রাজদরবারে ও বিচারকদের এজলাসে দেখার জন্য গমনাগমন করিতেন, ভাবিতেন এবং সেখান হইতে শিক্ষার বিষয় আহরণ করিতেন। এইসব কারণেই তাঁহাকে হিকমত দান করা হইয়াছিল (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ১২৪)।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে লুকমান প্রসংগ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুরআন মজীদে লুকমান (আ)-এর উল্লেখ রহিয়াছে। কুরআন মজীদের ৩১নং সূরাটির নাম রাখা হইয়াছে 'লুকমান', যাহা এই ঐতিহাসিক মনীষীর নামকে চিরন্তন করিয়া রাখিয়াছে। এই সূরায় আল্লাহ তা'আলার একত্বের সমর্থনে এবং শিরক ও কুফরী বাতিল হওয়া প্রসংগে লুকমানের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ স্থান পাইয়াছে। সূরার ১২ হইতে ১৯তম আয়াতে লুকমান (আ)-কে হিকমত প্রদান এবং লুকমান কর্তৃক তাঁহার পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশের উল্লেখ রহিয়াছে। এই প্রসংগে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِىٌّ حَمِيْدٌ ٠

"আমি লুকমানকে জ্ঞান দান করিয়াছিলাম এবং বলিছিলাম, আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তাহা করে নিজেরই জন্য এবং কেহ অকৃতজ্ঞ হইলে আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ" (৩১ ঃ ১২)।

বস্তুত এই বর্ণনাধারা লুকমান (আ)-এর নবী না হইয়া 'হাকীম' হওয়ার স্পষ্ট ইংগিত বহন করে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) হইতে বর্ণিত একটি হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ٠

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাহাদের ঈমানকে জুলুম দ্বারা কলুষিত করে নাই, নিরাপত্তা তাহাদেরই জন্য এবং তাহারাই সৎপথপ্রাপ্ত" (৬ ঃ ৮২) শীর্ষক আয়াত নাযিল হইলে প্রতিভাত হয় যে, উহার প্রকাশ্য অর্থ অর্থাৎ ঈমান আনয়নের পরে কোনও প্রকার অন্যায় আচরণ করিলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ইহাতে সাহাবীগণ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে তাহার ঈমানকে কোন না কোন অন্যায় (জুলুম) দ্বারা কলুষিত করে নাই? (সুতরাং আমাদের মুক্তির উপায় কি?) তখন তাঁহাদের সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলিলেন,

انه ليس بذالك الا تسمع (الم تسمع) الى قول لقمان لابنه اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ·

"তোমরা যেইরূপ ধারণা করিয়াছ (আয়াতের মর্ম) সেইরূপ নহে। তোমরা কি লুকমানের সেই কথা শুন নাই যাহা তিনি তাহার পুত্রকে বলিয়াছিলেন যে, "শিরকই হইল বড় জুলুম" (বুখারী, ২খ., ৭০৪, কিতাবুত তাফসীর, মুসলিম, ১খ., ৭৭, কিতাবুল ঈমান) ? অর্থাৎ পূর্বোক্ত আয়াতে জুলুম দ্বারা উদ্দেশ্য শিরক যাহা দ্বারা আখেরাতে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়।

ইহা ছাড়া ইব্‌ন হিশামের সীরাত ও ইবনুল আছীরের উসদুল গাবা গ্রন্থে লুকমানের সহীফা সংক্রান্ত একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুওয়ায়দ ইব্‌ন সামিত ছিলেন মদীনার একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি, যিনি স্বীয় প্রজ্ঞা, বীরত্ব, কাব্যচর্চা ও বংশ মর্যাদার কারণে মদীনাবাসীদের নিকট 'কামিল' উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের হিজরতের কিছুকাল পূর্বে এই সুওয়ায়দ হজ্জ অথবা উমরা পালনের উদ্দেশে মক্কায় আগমন করিলেন। নবুওয়াত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হজ্জব্রত পালনে আগত লোকদিগকে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তিনি সুওয়ায়দকেও ইসলামের দাওয়াত প্রদান করিলে তিনি বলিলেন, 'সম্ভবত আপনার নিকট যাহা আছে তাহা আমার নিকট যাহা আছে উহারই অনুরূপ। নবী আলায়হিস সালাম বলিলেন, আপনার নিকট কি আছে? সুওয়ায়দ বলিলেন, সাহীফা-ই লুকমান অর্থাৎ লুকমানের হিকমতপূর্ণ বাণীমালা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের অনুরোধে সুওয়ায়দ উক্ত সাহীফার কিছু অংশ পাঠ করিয়া শুনাইলে নবী আলায়হিস সালাম বলিলেন, খুবই সুন্দর বক্তব্য; তবে আমার নিকট যাহা আছে উহা আরো উত্তম। সুওয়ায়দ উহা শুনিতে চাহিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাহাকে পবিত্র কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। সুওয়ায়দ অকপটে স্বীকার করিলেন যে, নিঃসন্দেহে ইহা সাহীফায়ে লুকমান হইতে উত্তম। মদীনা প্রত্যাবর্তনের কিছু কাল পরে সুওয়ায়দ বু'আছ যুদ্ধে নিহত হন (ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা, ২খ., ৩৭৮; দা. মা. ই., ১৯খ., ১২৯)।

পবিত্র কুরআনে উদ্ধৃত লুকমান (আ)-এর উপদেশসমূহ

পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে লুকমান (আ) কর্তৃক তাঁহার পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশমালার বর্ণনা নিম্নরূপ ঃ

وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لاِبْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَىَّ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ · وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ اِلَىَّ الْمَصِيْرُ · وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ ثُمَّ اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ · يٰبُنَىَّ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِىْ صَخْرَةٍ اَوْ فِى السَّمٰوٰتِ اَوْ فِى الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ · يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ . وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ . وَاقْصِدْ فِىْ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنَّ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ .

"স্মরণ কর, যখন লুকমান তাহার পুত্রকে উপদেশ দিতে গিয়া বলিয়াছিল, হে বৎস! আল্লাহ্‌র কোন শরীক করিও না। নিশ্চয় শিরক চরম জুলুম। আমি তো মানুষকে তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়াছি। জননী সন্তানকে কষ্টের পর কষ্ট বরণ করিয়া গর্ভে ধারণ করে এবং তাহার দুধ ছাড়ান হয় দুই বৎসরে। সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট। তোমার পিতা-মাতা যদি তোমাকে পীড়াপীড়ি করে আমার সমকক্ষ দাঁড় করাইতে, যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদের কথা মানিও না, তবে পৃথিবীতে তাহাদের সহিত বসবাস করিবে সদ্‌ভাবে এবং যে বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হইয়াছে তাহার পথ অবলম্বন কর, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট এবং তোমরা যাহা করিতে সে বিষয়ে আমি তোমাদিগকে অবহিত করিব। হে বৎস! ক্ষুদ্র বস্তুটি যদি সরিষার দানা পরিমাণও হয় এবং উহা যদি থাকে শিলাগর্ভে অথবা আকাশে কিংবা মৃত্তিকার নীচে, আল্লাহ্ তাহাও উপস্থিত করিবেন। আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত। হে বৎস! সালাত কায়েম করিও, সৎকর্মের নির্দেশ দিও, আর অসৎ কর্মে নিষেধ করিও এবং আপদে-বিপদে ধৈর্য ধারণ করিও। ইহা তো দৃঢ় সংকল্পের কাজ। অহংকার বশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করিও না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করিও না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন উদ্ধত, অহংকারীকে পসন্দ করেন না। তুমি পদক্ষেপ করিও সংযতভাবে এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু করিও; নিশ্চয় স্বরের মধ্যে গর্দভের স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর" (৩১ ঃ ১৩-১৯)।

লুকমান (আ)-এর উল্লিখিত উপদেশমালায় তাওহীদ অবলম্বন ও শিরক্ বর্জন, আল্লাহ্‌র পূর্ণাংগ ইলম ও কুদরতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, আদর্শ ব্যক্তি ও সুষ্ঠু সমাজ গঠনের দৃঢ় সংকল্পের কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং শিষ্টাচার অবলম্বনের উল্লেখ রহিয়াছে (দ্র., সীউহারবী, কাসাসুল কুরআন ৩খ., ৪১-৪৬; মুফতী শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ, ৩৬-৪০; জামীল আহমদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন, ৩খ., ৫২০-৫২৩)।

হযরত লুকমান (আ)-এর উপদেশাবলী

সাহীফায়ে লুকমান বা লুকমান (আ)-এর বাণী সম্বলিত পুস্তিকা বর্তমান কালে বিদ্যমান না থাকিলেও বহু তাফসীর ও ইতিহাস গ্রন্থে উহার বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ বলেন, 'আমি লুকমান (আ)-এর হিকমত ও জ্ঞানগর্ভ বাণী সংক্রান্ত দশ হাজারের অধিক অধ্যায় অধ্যয়ন করিয়াছি (মুখতাসার তাফসীরুল কুরতুবী, পৃ. ৬২৩; মা'আরিফুল কুরআন, ৭খ, ৩৫)। ইবন আবী হাতিমের আহরিত হাফ্‌স ইবন উমারের একটি বর্ণনায় আছে, একদিন লুকমান (আ) সরিষা ভর্তি একটি পৌটলা নিজের কাছে রাখিয়া স্বীয় পুত্রকে উপদেশ দিতে

লাগিলেন এবং একটি উপদেশ দেওয়ার পর একটি করিয়া সরিষার দানা বাহির করিতে লাগিলেন। এইভাবে উপদেশ দিতে দিতে সরিষার সকল দানা বাহির করিয়া নিঃশেষ করিলেন (আল বিদায়া, ২খ, ১২৭)।

ইবন কাছীর তাঁহার তাফসীরে ও ইতিহাস গ্রন্থে (ইবন কাছীর, ৩খ., সূরা লুকমান; বিদায়া, ২খ, ১২৭, ১২৮, ১২৯) ইমাম আহমাদ (র)-এর কিতাবু'য-যুহ্দ ও অন্যান্য গ্রন্থের বরাতে লুকমান (আ)-এর অনেক বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখানে উহার অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হইল। (১) ইবন উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, লুকমান হাকীম বলিতেন, আল্লাহ তা'আলা কাহাকেও কোন কিছুর আমানতদার বানাইলে তাহার কর্তব্য উহার হিফাজত করা। (২) কাসিম ইবন মুখায়মির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণনা করেন, লুকমান (আ) তাঁহার পুত্রকে উপদেশ দিয়া বলিলেন, তুমি মুখোশ লাগাইয়া মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিবে না; কেননা উহা রাত্রিকালে বিশ্বাসঘাতকতাতুল্য এবং দিনের বেলা নিন্দনীয়। (৩) সিররী ইবন ইয়াহইয়া হইতে বর্ণিত, লুকমান (আ) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! হিকমত ও প্রজ্ঞা ফকীরকে বাদশাহর মসনদে সমাসীন করে। (৪) আওন ইবন আবদুল্লাহ হইতে বর্ণিত, তুমি কোন মজলিসে গেলে প্রথমে মজলিসের লোকদিগকে সালাম করিয়া কোন এক প্রান্তে বসিয়া পড়িবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত মজলিসের আলোচনা শেষ না হইবে ততক্ষণ কোন কথা বলিবে না। যদি দেখ যে, তাহারা আল্লাহ্র স্মরণে মশগুল হয় তবে তুমিও তাহাদের সহিত অংশগ্রহণ করিবে। আর তাহারা বাজে কথায় লিপ্ত হইলে তুমি সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র উত্তম মজলিসের সন্ধান করিবে। (৫) উবায়দ ইবন উমায়র হইতে বর্ণিত, তুমি উত্তম মজলিসের সন্ধানে থাকিবে; যখন এমন কোন মজলিস পাইবে যাহাতে আল্লাহ্র কথা আলোচিত হয় তখন তাহাদের সহিত বসিয়া পড়িবে। কেননা তুমি আলিম হইলে তোমার ইল্ম উপকার সাধন করিবে, আর তুমি নির্বোধ হইলে তাহারা তোমাকে আলিম বানাইয়া দিবে এবং আল্লাহ তা'আলা তাহাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করিলে তুমিও উহাতে অংশীদার হইতে পারিবে। (৬) যে মজলিসে আল্লাহ্র কথা আলোচিত হয় না, সেখানে তুমি বসিবে না, কেননা তুমি আলিম হইলে তোমার ইল্ম কোন কাজে আসিবে না; আর তুমি নির্বোধ হইলে তাহারা তোমাকে আরো নির্বোধ বানাইবে এবং কখনও তাহাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হইলে তুমিও উহাতে আক্রান্ত হইবে। (৭) মু'মিনদের রক্ত ঝরায় এমন কোন শক্তিধরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে না; কেননা তাহার জন্য আল্লাহ্র নিকট এমন এক ঘাতক আছে যে কখনো মরে না। (৮) হে বৎস! আল্লাহ্র আনুগত্যকে তিজারতরূপে গ্রহণ কর, বিনা পুঁজিতে তোমার হাতে মুনাফা আসিতে থাকিবে। (৯) হে বৎস! আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর এবং লোকের সম্মান লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ ভীতির প্রদর্শনী করিও না, অথচ তোমার অন্তর পংকিলতায় পূর্ণ। (১০) হে বৎস! মূর্খ লোকের বন্ধুত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইও না; কেননা সে মনে করিবে যে, তুমি তাহার মূর্খতার কাজগুলি পসন্দ করিতেছ। জ্ঞানীর অসন্তুষ্টিকে বেপরোয়া হইয়া উড়াইয়া দিও না; কেননা তাহা হইলে সে তোমার প্রতি উদাসীন হইবে এবং তোমাকে বর্জন করিবে। (১১) জ্ঞানীদের মুখে আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে, আল্লাহ তাঁহার মর্যী অনুসারে যেইরূপ করিতে চাহেন, জ্ঞানীদের কথা ও

কাজের জন্য সেইরূপ উপকরণ সৃষ্টি করিয়া দেন। (১২) হে বৎস! নিরবতার পরিণতিতে কখনও অনুতপ্ত হইতে হয় না; কথা বলা রৌপ্য হইলে নিরবতা স্বর্ণতুল্য। (১৩) হে বৎস! সর্বদা মন্দ হইতে দূরে অবস্থান করিবে। তাহা হলে মন্দও তোমা হইতে দূরে থাকিবে। কেননা, মন্দ হইতেই মন্দের উৎপত্তি। (১৪) হে বৎস! কোন কিছুর প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহী ও কৌতুহলী হইবে না। কেননা, অতি আগ্রহ আপনজনকে আপনজন হইতে দূরে সরাইয়া দেয়। হে বৎস! মাত্রাতিরিক্ত ক্রোধ হইতে আত্মসংবরণ করিবে; কেননা প্রচণ্ড ক্রোধ জ্ঞানীর অন্তরকে মৃতপ্রায় বানাইয়া দেয়। (১৫) হে বৎস! মিষ্টভাষী হও, হাসিমুখ হও, তাহা হইলে তুমি মানুষের নিকট সেই ব্যক্তির চাইতেও প্রিয় হইবে, যে তাহাদিগকে সর্বদা দান-খয়রাত করিয়া থাকে।" (১৬) "কোমলতা প্রজ্ঞার মূল।" (১৭) "যেমন বীজ বপন করিবে, তেমন ফসল কর্তন করিবে।" (১৮) "নিজের বন্ধু ও পিতার বন্ধুর সহিত বন্ধুত্ব রক্ষা করিবে।" (১৯) আবূ কিলাবা হইতে বর্ণিত, "লোকেরা লুকমানকে জিজ্ঞাসা করিল, সর্বাধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, 'যাহার ধৈর্যের পশ্চাতে নির্যাতন থাকে না। লোকেরা বলিল, সবচাইতে বড় আলিম কে? লুকমান বলিলেন, যে ব্যক্তি অন্যের ইল্‌ম দ্বারা নিজের ইলমকে সমৃদ্ধ করিতে থাকে। লোকেরা বলিল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? লুকমান (রা) বলিলেন, ধনবান। লোকেরা বলিল, সম্পদে ধনবান? লুকমান (রা) বলিলেন, না, ধনবান সেই ব্যক্তি, যে নিজের অভ্যন্তরে কোন কল্যাণ সন্ধান করিলে উহা বিদ্যমান পায়, অন্যথায় নিজেকে অপর মানুষ হইতে অমুখাপেক্ষী রাখে।" (২০) সুলায়মান ইব্‌ন 'উয়ায়না হইতে বর্ণিত, "লুকমান (আ)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল, সর্বাধিক নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে? তিনি বলিলেন, যে মন্দ কাজ করে এবং মানুষ তাহাকে মন্দ কাজ করিতে দেখিয়া মন্দ মনে করিবে ইহার তোয়াক্কা করে না।" (২১) "যাহারা মানুষের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে কথা বলে, আল্লাহ তাহাদের অস্থিসমূহ বিচূর্ণ করিবেন।" (২২) তুমি তোমার জ্ঞাত বিষয়গুলিকে এখনও কার্যে বাস্তবায়িত কর নাই, এই অবস্থায় তোমার অজ্ঞাত বিষয়ের জ্ঞান আহরণে কোন কল্যাণ নাই। কেননা, ইহার দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে কাঠ কুড়াইয়া একটি গাট বাঁধিল এবং উহা তুলিয়া নিতে অক্ষম হইল। তারপরও সে কাঠ কুড়াইয়া গাটের সহিত বাধিতে লাগিল।" (২৩) আবূ সা'ঈদ হইতে বর্ণিত, লুকমান তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, নেককার মুত্তাকী লোকেরাই যেন তোমার দস্তরখানে খাবার গ্রহণ করে এবং বুদ্ধি পরামর্শ তুমি হক্কানী আলিমগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিবে" (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ১২৭, ১২৮, ১২৯; তাফসীরে ইব্‌ন কাছীর, ৩খ)। (২৪) বাগাবী হাসান হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, লুকমান (আ) তাঁহার পুত্রকে বলিলেন, হে বৎস! তুমি এই সাধারণ মোরগটির চাইতেও অপারগ হইও না, এইভাবে যে, সে তো শেষ রাত্রে ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া ডাকিতে থাকিল আর তুমি তখন তোমার আরামের শয্যায় সুখনিদ্রায় বিভোর রহিলে (তাফসীরে মাজহারী, ২খ., ২৫)। (২৫) "হে বৎস! দুনিয়া একটি গভীর সমুদ্র। ইহাতে অনেক মানুষের সলিল সমাধি হইয়াছে, এই সমুদ্রের বুকে আল্লাহভীতিকে তুমি জাহাজ বানাও এবং ঈমানের পণ্য দ্বারা উহা ভর্তি কর এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকে উহার পাল বানাও। তবে আশা করা যায় যে, তুমি মুক্তি পাইবে। (অন্যথায়) তুমি মুক্তি পাইবে বলিয়া মনে করি না। (২৬) যে ব্যক্তির অভ্যন্তরে তাহার উপদেশদাতা থাকে তাহার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হইতে একজন হিফাজতকারী নিযুক্ত

হন। যে ব্যক্তি মানুষের সহিত নিজের সম্পর্কে ইনসাফের আচরণ করে আল্লাহ তা'আলা তাহার ইজ্জত বৃদ্ধি করিয়া দেন। আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে অবনমিত হওয়া পাপাচারের দ্বারা মর্যাদাবান হওয়ার চাইতে শ্রেয়। (২৭) পিতা কর্তৃক সন্তানকে শাসন করা ফসলে সার প্রদানের ন্যায়। (২৮) হে বৎস! ঋণগ্রস্ত হইও না, কেননা উহা দিবসে লাঞ্ছনা ও রাত্রিতে দুশ্চিন্তার কারণ। (২৯) হে বৎস! আল্লাহ তা'আলার প্রতি এই পরিমাণ আশাবাদী হইবে যাহা তোমাকে তাঁহার অবাধ্যতায় দুঃসাহসী না করে। আর তাঁহাকে এই পরিমাণ ভয় করিবে যাহা তোমাকে তাঁহার রহমত হইতে নিরাশ করে না। (৩০) মানুষ মিথ্যাবাদী হইলে তাহার প্রভাব নিঃশেষ হইয়া যায় এবং বদ-স্বভাবী হইলে তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি পায়। অতি ভারী পাথর স্থানান্তর করা নির্বোধকে বুদ্ধিদানের চাইতে সহজ। (৩১) হে বৎস! আমি ভারী লোহা, পাথর ও অন্যান্য ভারী বস্তু বহন করিয়াছি, কিন্তু মন্দ প্রতিবেশীর চাইতে অধিক ভারী কিছু বহন করি নাই। আমি বহু তিক্ত বস্তুর স্বাদ আস্বাদন করিয়াছি, কিন্তু দারিদ্র্যের চাইতে অধিক তিক্ত কোন বস্তু দেখি নাই। (৩২) হে বৎস! তুমি কোন মূর্খকে তোমার দূতরূপে পাঠাইবে না; দূত হিসাবে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি না পাইলে নিজেই নিজের দূত হইবে। (৩৩) হে বৎস! মিথ্যা চূড়ান্তরূপে বর্জন করিবে। কেননা উহা চড়ুই পাখীর গোশতের ন্যায় অত্যন্ত আকর্ষণীয়, কিন্তু অনতিবিলম্বে উহা প্রতিপক্ষকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। (৩৪) হে বৎস! তুমি জানাযায় (শোক সভায়) অংশগ্রহণ করিবে, বিবাহের আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবে না। কেননা, জানাযা তোমাকে আখিরাত স্মরণ করাইয়া দিবে আর বিবাহের অনুষ্ঠান দুনিয়াকে তোমার নিকট আকর্ষণীয় করিয়া দিবে। (৩৫) হে বৎস! পরিতৃপ্ত উদরে পুনঃভক্ষণ করিওনা, কেননা, উহা ভক্ষণ করিবার চাইতে কুকুরের সম্মুখে রাখিয়া দেওয়া উত্তম। (৩৬) হে বৎস! মিষ্ট হইও না, তাহা হইলে লোকেরা তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে; তিক্ত হইও না, তাহা হইল লোকেরা তোমাকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে। (৩৭) হে বৎস! তুমি কাহারো সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা করিলে অগ্রে তাহাকে যাচাই করিবার জন্য কোন কিছু দ্বারা তাহাকে রাগাইয়া দিবে। রাগান্বিত অবস্থায়ও সে তোমার সহিত ন্যায়সংগত আচরণ করিলেই তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিবে; অন্যথায় তাহাকে বর্জন করিবে। (৩৮) তোমার সহকর্মী ও বন্ধুর সহিত তোমার আচরণ হইবে এমন যেন তোমার নিকট তাহার কোন প্রয়োজন নাই এবং তাহাকে ব্যতীত তোমার গত্যন্তর নাই। (৩৯) হে বৎস! এমন ব্যক্তির ন্যায় হও যে কাহারও প্রশংসার প্রত্যাশী নহে এবং তাহাদের নিন্দার পাত্রও নহে। এমন হইলে সে হইবে আত্মপ্রত্যয়ী এবং মানুষও তাহার ব্যবহারে খুশী থাকিবে। (৪০) হে বৎস! তোমার মুখ নিঃসৃত উক্তির ব্যাপারে তুমি সংযত থাকিবে। কেননা, তোমার নীরবতা পর্যন্তই তোমার নিরাপত্তা। কথা শুধু ততটুকুই বলিবে যতটু তোমার উপকারে আসিবে (তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮১, ৮২)।

লুকমান (আ)-এর হিকমত সংক্রান্ত দুইট ঘটনা

বিভিন্ন গ্রন্থে লুকমান (আ)-এর প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী ও কর্মের বহু বিবরণ রহিয়াছে। এইগুলির মধ্য হইতে অধিকাংশ গ্রন্থে উদ্ধৃত দুইটি ঘটনা দ্বারা লুকমান (আ)-এর প্রজ্ঞার গভীরতা অনুধাবন করা যায়। (১) বায়হাকীর শু'আবুল ঈমানে ও হাকিমের মুসতাদরাক গ্রন্থে প্রামাণ্য সনদে হযরত আনাস

(রা) হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত দাঊদ (আ) একদিন বর্ম তৈরী করিতেছিলেন এবং লুকমান উহা দেখিয়া অভিভূত হইতেছিলেন। তিনি দাউদ (আ)-কে উহার কার্যকারিতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রজ্ঞা তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইতে বিরত রাখিতেছিল। হযরত দাউদ (আ) বর্ম তৈরী সম্পন্ন করিলেন এবং উহা পরিধান করিয়া বলিলেন, যুদ্ধবস্ত্র কতই না উত্তম। তখন লুকমান (আ) বলিলেন, নীরবতা অবলম্বন হিকমত। তবে এই বিধান পালনকারীর সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল (অর্থাৎ প্রশ্নের জন্য মুখ না খুলিয়াও লুকমান বর্ম তৈরীর উদ্দেশ্য অবহিত হইলেন)। দাউদ (আ) তখন বলিলেন, যথার্থরূপে তোমার নাম 'হাকীম' হইয়াছে।

(২) ইব্ন আবূ শায়বা, ইমাম আহমাদ ও ইব্ন জারীর খালিদ রিব'ঈ হইতে বর্ণনা করেন, একবার লুকমান (আ)-এর মনিব তাঁহাকে বলিল, একটি ছাগল যবেহ করিয়া আমার জন্য উহার সর্বোত্তম দুইটি অংশ নিয়া আস। তখন লুকমান একটি ছাগল যবেহ করিয়া উহার জিহ্বা ও কলিজা (হৃৎপিণ্ড) আনিয়া মনিবের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। মনিব বলিল, এই দুই অংশের চেয়ে উত্তম কিছু ছিল না? লুকমান শুধু 'না' বলিয়া নীরব রহিলেন। এই ঘটনার পর কিছু দিন অতিবাহিত হইল। পরে অন্য একদিন মনিব তাহাকে বলিল, একটি ছাগল যবেহ কর এবং উহার সর্বাধিক নিকৃষ্ট দুইটি অংশ ফেলিয়া দাও (নিয়া আস)। লুকমান (আ) একটি ছাগল যবেহ করিয়া উহার জিহ্বা ও কলিজা ফেলিয়া দিলেন (নিয়া আসিলেন)। মনিব বলিল, তোমাকে ছাগল যবেহ করিয়া উত্তম দুই অংশ আনিতে বলিলে জিহ্বা ও কলিজা হাজির করিলে এবং নিকৃষ্ট দুই অংশ ফেলিয়া দিতে বলিলে সেই জিহ্বা ও কলিজাই ফেলিয়া দিলে? লুকমান (আ) বলিলেন,

انه ليس بشيئ اطيب منهما اذا طاب ولا اخبث منهما اذا خبثا .

"এই দুইটি জিনিস এমন যে, ইহারা উত্তম হইলেও ইহার চেয়ে নিকৃষ্টও আর কিছু নাই" (বিদায়া, ২খ., ১২৭; ফাতহুল বারী, ৬খ., ৪৬৬; মুখতাসার তাফসীর কুরতুবী, ৬২২, ৬২৩; তাফসীর মাজহারী, উরদূ, ৯খ., ২৫০ ও অন্যান্য)।

উপসংহার ঃ হযরত লুকমান (আ) সেই স্বল্প সংখ্যক অনন্যসাধারণ ও বিশিষ্ট ভাগ্যবানদের অন্যতম, পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ যাহাদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং নবী-রাসূল না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহার নামে একটি সূরার নামকরণ করিয়াছেন এবং মানবজাতির কল্যাণে তাঁহার উপদেশ ও বাণী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সত্তাকে অমরত্ব দান করিয়াছেন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) আল-কুরআনুল কারীম (সূরা লুকমান); (২) ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমাঈল আল-বুখারী, সহীহুল বুখারী, ২খ., ৭০৪ (কিতাবুত তাফসীর); (৩) ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম; ১খ., ৭৭ (কিতাবুল ঈমান); (৪) ইবনুল আছীর, উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস সাহাবা, ২খ., ৩৭৮; (৫) হুসায়ন ইব্ন মাস'ঊদ আল-ফারযা আল-বানাবী, মা'আলিমুত তানযীল (তাফসীরুল বাগাবী), ৩খ., ৩৯০, ৩৯১; (৬) মাহমূদ ইব্ন 'উমার আয্- যামাখশারী, আল-কাশশাফ, সূরা লুকমান; (৭) ইব্ন জারীর আত্-তাবারী, তাফসীরুত্ তাবারী, সূরা লুকমান; (৮) মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আল-আনসারী আল-কুরতুবী, আহকামুল কুরআন (তাফসীরুল কুরতুবী; মুখতাসার

তাফসীরুল কুরতুবী, পৃ. ৬২০-৬২৪); (৯) ইব্ন কাছীর, তাফসীরে ইব্ন কাছীর, ৩খ., পৃ. ৬১; (১০) মাহমূদ আল-আলূসী, তাফসীরে রূহুল মা'আনী, ১১/১খ., ৮২, ৮৩; (১১) আশরাফ আলী থানবী, তাফসীরে বয়ানুল কুরআন, সূরা লুকমান; (১২) আহমাদ মুসতাফা আল-মারাগী, তাফসীরুল মারাগী, সূরা লুকমান; (১৩) কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীরুল মাজহারী, আবরী, ২খ., ২৫; (১৪) আবদুল মাজিদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজিদী, সূরা লুকমান; (১৫) সায়্যিদ কুতব শহীদ, তাফসীর ফী জিলালিল কুরআন, সূরা লুকমান; (১৬) মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা'আরিফুল কুরআন; ৭খ., ৩৪; (১৭) জামালুদ্দীন আল-কাসিমী, তাফসীরুল কাসিমী, সূরা লুকমান; (১৮) আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান; (১৯) ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল, কিতাবুয্ যুহদ, স্থা.; (২০) ইমাম হাকিম, আল-মুসতাদরাক; (২১) ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা,... ১৯৩৬, ৬৭-৬৯; (২২) ইব্ন হাজ্যার আসকালানী, ফাতহুল বারী; (২৩) ইব্ন হিশাম, কিতাবুত তীজান মা'আ আখবারে উবায়দ, পৃ. ৬৯-৭৮, ৩৫৭-৩৭০; (২৪) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, আরদুল কুরআন, ১খ., ১৭৮-১৮৪; (২৫) ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ., ১২৪-১৯১; (২৬) হিফজুর রহমান সীউহারাবী, ক্বাসাসুল কুরআন; (২৭) মুফতী শফী, আহামুল কুরআন, ৩খ., ৩৬২; (২৮) সায়্যিদ আমীর আলী, মাওয়াহিবুর রহমান; (২৯) জামীল আহমাদ, আম্বিয়ায়ে কুরআন; (৩০) দাইরাতুল মা'আরিফিল ইসলামিয়া, ১৯খ., শিরো. (পৃ. ১২৯-১৩১); (৩১) ইসলামী বিশ্বকোষ (ই.ফা.বা) ১৯খ. শিরো.; (৩২) ওয়াজদী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৮২, ৩৭০; (৩৩) ইমাম মালিক, আল-মু'ওয়াত্তা, কিতাবু তালাবিল ইলম, হাদীছ নং ১; (৩৪) আদ-দারিমী, আস-সুনান-এ বাব ২৩।

মুহাম্মদ ইসমাইল

৩৩

হযরত যুলকারনায়ন

حضرت ذوالقرنين

হযরত যুলকারনায়ন

যুলকারনায়ন প্রাচীন আরবের একজন দীনদার, ন্যায়পরায়ণ,সাহসী ও শক্তিধর বাদশাহ। তিনি ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত সর্বপ্রকার সাহায্য, অস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম দ্বারা তিনি পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বহু দেশ, বহু নগর-প্রান্তর নিজের কর্তৃত্বাধীন লইয়া আসিতে সক্ষম হন। এইসব দেশের জালিম ও কাফিরদের তিনি কঠোর হস্তে দমন করিয়া তাওহীদের বাণী প্রচার করেন। দীনী হুকুম-আহকামের ভিত্তিতে তিনি ঐসব দেশে সুবিচার ও ইনসাফের শাসন কায়েম করেন। আল্লাহ পাক প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া তিনি দিগ্বিজয়ে বাহির হন। তিনি পৃথিবীর তিন প্রান্তে পৌঁছিয়াছিলেন ঃ পাশ্চাত্যে, প্রাচ্যের শেষ প্রান্তে এবং উত্তরের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত। এইখানে তিনি দুই পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে একটি বিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের লুটতরাজ হইতে এলাকর জনগণ নিরাপদ হইয়াছিল (ইব্ন জারীর তাবারী, জামি'উল বায়ান, ১৬ পারা, ৮খ, পৃ. ৭-১৪; ইবন কাছীর, আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ১০২-৩; তাফসীর জালালায়ন, পৃ. ২৫১-২; মুফতী মুহাম্মদ শফী, মাআরিফুল কুরআন, করাচী ১৯৮৩, ৫খ, পৃ. ৬১৬-৭)। যুলকারনায়ন সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنْ ذِى الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَاَتْلُوْا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اِنَّا مَكَّنَّا لَه فِى الْاَرْضِ وَاٰتَيْنٰهُ مِنْ كُلِّ شَيْئٍ سَبَبًا.

"উহারা তোমাকে যুলকারনায়ন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। আমি তোমাদের নিকট তাহার বিষয় বর্ণনা করিব। আমি তাহাকে পৃথিবীতে কর্তৃত্ব দিয়াছিলাম এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপায়-উপকরণ দান করিয়াছিলাম" (১৮ ঃ ৮৩)।

ইসরাঈলী বিবরণ অনুযায়ী ১৬০০ বৎসর দুনিয়াতে জীবিত থাকিয়া যুলকারনায়ন দীনের তাবলীগ ও রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন। সায়্যিদ মাহমূদ আলূসী বাগদাদী বলেন যে, যুলকারনায়ন ৫০০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন (রূহুল মা'আনী, কায়রো, ১৬খ, পৃ. ২৫; তাফসীর ইবন কাছীর, দিল্লী, ৩খ, পৃ. ৯)।

নামকরণ ঃ ইমাম কুরতুবীর মতে যুলকারনায়নের নাম মারযুবান। পিতার নাম মারদুবা। তাঁহার বংশধারা ইয়াফিছ ইবন নূহ (আ)-এর সহিত সম্পৃক্ত। আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী (র) বলেন ঃ

والاسكند رالمؤمن الذى ذكره الله فى القران اسمه عبد الله ابن الضحاك بن معد قال ابن عباس رض انه من حمير وامه رومية وانه كان يقال له ابن الفيلسوف لعقله.

"যে মু'মিন ইসকান্দারের প্রসঙ্গ আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র আল-কুরআনে উল্লেখ করিয়াছেন তাঁহার নাম আবদুল্লাহ ইবনুদ-দাহ্হাক। ইবন আব্বাস (রা) হইতে এই তথ্য বর্ণিত। যুলকারনায়ন হিময়ার গোত্রভুক্ত এবং তাঁহার মাতা রোম দেশীয়। বুদ্ধিবৃত্তির কারণে তাঁহাকে 'দার্শনিক তনয়' বলা হয়" (উমদাতুল কারী, ১০খ, পৃ. ৩৩৩)।

যুলকারনায়ন নামকরণের পশ্চাতে মুফাসসিরীন ও ইতিহাসবিদদের নানা অভিমত রহিয়াছে। কার্‌ন অর্থ শিঙ। যুলকারনায়নের অর্থ দাঁড়ায় দুই শিঙের মালিক অথবা ক্ষমতার অধিকারী। কেহ বলেন, তাঁহার মাথার চুলে দুইটি গুচ্ছ ছিল, তাই যুলকারনায়ন (দুই গুচ্ছওয়ালা) আখ্যায়িত হইয়াছেন। কেহ বলেন, রোম ও পারস্যের বাদশাহ্ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যুলকারনায়ন বলা হয়। কেহ এমনও বলিয়াছেন যে, তাঁহার মাথায় শিঙ-এর অনুরূপ দুইটি চিহ্ন ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহার মাথার দুই দিকে দুইটি ক্ষতচিহ্ন ছিল। হযরত আলী (রা) যুলকারনায়ন নামকরণের পটভূমি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার জাতিকে আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দান করেন কিন্তু লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে। অবাধ্য লোকেরা তাঁহার মাথার ডান পার্শ্বে এমন জোরে আঘাত করে যে, তাৎক্ষণিকভাবে তিনি প্রাণ হারান। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে দ্বিতীয়বার যিন্দা করেন। তাঁহার জাতির লোকেরা এইবার তাঁহার মাথার বাম পার্শ্বে আঘাত হানে। ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। আল্লাহ্ তাঁহার নাম রাখেন যুলকারনায়ন। অপর এক বর্ণনায় উল্লিখিত হইয়াছে যে, তিনি যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিমের প্রান্তসীমা পরিভ্রমণ করেন সেহেতু তাঁহাকে যুলকারনায়ন নামে অভিহিত করা হয় (যামাখশারী, কাশশাফ, বৈরূত, ২খ, পৃ. ৪৯৭; মুহাম্মদ আল-কুরতুবী, আল জামি লি-আহকামিল কুরআন, বৈরূত, ১১-১২খ., পৃ. ৪৫-৮; তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ৬; শায়খ আহমদ আলী সাহারানপূরী, হাশিয়া সহীহ আল-বুখারী, ১খ, পৃ. ৪৭২)।

কোন কোন গবেষক মনে করেন, যুলকারনায়ন মাতা-পিতা উভয় দিক দিয়া অভিজাত বংশের ছিলেন। কেহ বলেন, যুদ্ধ করিবার সময় তিনি দুই হাতে অস্ত্র চালনা করিতেন এবং যাহির ও বাতিন দুই ইলমের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে যুলকারনায়ন বলা হয় (বুস্তানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৮খ, পৃ. ৪১১)।

বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন ইমাম বাগাবী (র) ও সায়্যিদ মাহমুদ আলূসী বাগদাদী (র) এই প্রসঙ্গে কয়েকটি মতামত পেশ করেন ঃ যুলকারনায়ন স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি সূর্যের দুই প্রান্ত ধরিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর দুইটি যুলফী ছিল; তিনি আলোকময় দেশেও (শ্বেত বর্ণের জনগোষ্ঠী) গিয়াছেন, অন্ধকারময় দেশেও (কৃষ্ণ বর্ণের জনগোষ্ঠী) পরিভ্রমণ করিয়াছেন। এইসব কারণে তাঁহাকে যুলকারনায়ন বলা হয় (তাফসীর বাগাবী, ৩খ, পৃ. ১৭৮; রূহুল মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ২৪)।

যুলকারনায়ন কি নবী ছিলেন ?

হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সমসাময়িক যুলকারনায়ন পদব্রজে মক্কা মুকাররামা আগমন করিলে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহাকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। মুখোমুখী হইতেই তিনি হযরত ইবরাহীমকে সালাম দেন এবং তাঁহার সহিত করমর্দন করেন। বলা হইয়া থাকে, তিনিই সর্বপ্রথম করমর্দনকারী ব্যক্তি। হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁহার জন্য দোআ করেন এবং তাঁহাকে কিছু উপদেশ দান করেন। যুলকারনায়ন হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত তাওয়াফ ও কুরবানী সম্পন্ন করেন (ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ১০৮-১২)। ইমাম ইবন হাজার আসকালানী (র) বলেন ঃ

ان ذالقرين قدم مكة فوجدابراهيم واسماعيل يبنيان الكعبة فاستفهمهما عن ذلك فقال نحن عبدان اوران فقال من يشهد لكما فقامت خمسة كبش فشهدت فقال قد صدقتم.

"যুলকারনায়ন যখন মক্কায় আসিয়াছিলেন তখন তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত ইসমাঈলকে (আ)-কে পবিত্র কা'বা গৃহে নির্মাণ কাজে ব্যস্ত দেখিতে পাইলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার জবাবে বলিলেন, আমরা উভয়ই (এই ক্ষেত্রে আল্লাহর) নির্দেশপ্রাপ্ত বান্দা। তিনি জানিতে চাহিলেন, এই কথার প্রমাণ কি ? ইহাতে পাঁচটি দুম্বা জাতীয় পশু দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, আপনারা সত্য বলিয়াছেন" (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ৩২৮)।

শাব্বীর আহমাদ উছমানী (র) বলেন, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোআর বরকতে যুলকারনায়ন পৃথিবীর পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত পরিভ্রমণ ও দেশজয় করেন এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হন (তাফসীর উছমানী, মদীনা ১৪০৯ হি., পৃ. ৪০৪)। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবন তায়মিয়া ও হাফিজ ইবন কাছীর (র) যুলকারনায়ন নবী ছিলেন বলিয়া অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তারজুমানুল কুরআন, ২খ, পৃ. ৪৫৩)।

"আমি বলিলাম, হে যুলকারনায়ন " (قلنا يذا القرنين) আল্লাহ তা'আলার এই সম্বোধন দ্বারা যদি ধরিয়া লওয়া যায় তিনি নবী ছিলেন তাহা হইলে আপত্তির কিছু নাই। কারণ ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে ইহা বলা হইয়াছে। আর যদি তাঁহার নবুওয়াত স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে কোন পয়গাম্বরের মধ্যস্থতায় তাঁহাকে এই সম্বোধন করা হইয়াছে। যেমন বর্ণিত আছে, হযরত খিযির (আ) তাঁহার সাথী ছিলেন। অধিকন্তু ইহা নবুওয়াতের ওহী না হইয়া আভিধানিক অর্থে ওহী হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। যেমন হযরত "মূসা (আ)-এর মাতার নিকট ওহী পাঠাইয়াছি" (اوحينا الى ام موسى) শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে পবিত্র কুরআনে। অথচ তিনি নবী ও রাসূল ছিলেন না। আবূ হায়্যান আন্দালুসী 'বাহরুল মুহীত' নামক তাফসীর গ্রন্থে বলেন ঃ এইখানে যুলকারনায়নকে যেই আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতেছে হত্যা ও শাস্তির আদেশ। এই ধরনের আদেশ সাধারণত নবুওয়াতের ওহী ছাড়া দেওয়া যায় না। কাশফ, ইলহাম অথবা অন্য কোন উপায়ে

তাহা হইতে পারে না। সুতরাং যুলকারনায়নকে নবী মানিতে হইবে অথবা তাঁহার আমলে একজন নবীর উপস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে, যাহার মাধ্যমে তাঁহাকে সম্বোধন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া অন্য কোন ব্যাখ্যার সুযোগ নাই (বাহরুল মুহীত, ৬খ, পৃ. ১৫৭-১৬২; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬১৯)। মুজাহিদ (র) বলেন, আল্লাহ তা'আলা সরাসরি যুলকারনায়নকে সম্বোধন করেন ও ওহী প্রেরণ করেন। ইহার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নবী ছিলেন ও ওহীয়ে ইলাহীর বাহক ছিলেন (তাফসীরে মাযহারী, ৭খ, পৃ. ২৬৫)। ইমাম বাগাবী বলেন ঃ বিশুদ্ধতম অভিমত হইতেছে যে, যুলকারনায়ন নবী ছিলেন না। ওহীর অর্থ হইতেছে এইখানে ইলহাম যাহা আল্লাহর ওলীদের নিকট আসে (তাফসীর বাগাবী, ৩খ, পৃ. ১৭৮-১৮২)।

সানাউল্লাহ পানিপথী (র) এই প্রসঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেন যে, সম্ভবত কোন পয়গাম্বরের মাধ্যমে তিনি এই বাণী লাভ করিয়াছেন। বনূ ইসরাঈলের কোন পয়গাম্বরকে তাঁহার সহিত দেওয়া হইয়াছিল তাঁহাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে (তাফসীর মাযহারী, ৭খ, পৃ. ২৬৬)। ইব্‌ন হাজার আসকালানী অভিমত প্রকাশ করেন যে, الا ان يحمل البعث على غير سيالة النبوة

"যুলকারনায়ন আল্লাহর পক্ষ হইতে একটি জাতির নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন এই কথা সত্য, তবে তাঁহাকে নবুওয়াতের দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই" (ফাতহুল বারী, ৬খ, পৃ. ২৯৪)।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা) হইতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ لا ادرى ذوالقرنين نبيا او لا "যুলকারনায়ন নবী ছিলেন কিনা তাহা আমি জানি না" (ফাতহুল বারী, বৈরূত, ৬খ, পৃ. ৩৮৩)। যুলকারনায়ন সম্বন্ধে হযরত আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন, যুলকারনায়ন নবীও নহেন, বাদশাহও নহেন। তিনি এমন এক পুণ্যবান আল্লাহ্‌র বান্দা যিনি আল্লাহকে ভালবাসিতেন। আল্লাহও তাঁহাকে ভালবাসিতেন। তাঁহাকে অনেক অত্যাশ্চর্য বরকত দান করেন। মেঘ ও বাতাসকে তাঁহার হুকুমের অধীন করিয়া দেওয়া হয়, ফলে মুহূর্তের মধ্যে তিনি পূর্ব হইতে পশ্চিমে এবং পশ্চিম হইতে পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত পরিভ্রমণ করিতে পারিতেন। রাত্রি ও দিন ছিল তাঁহার জন্য সমান। অন্ধকার রাত্রিতেও তিনি আলোক রশ্মির সাহায্যে চলাফেরা করিতে পারিতেন। সমস্ত সড়ক ও জনপদ থাকিত তাঁহার জন্য উন্মুক্ত। মওসূমের পরিবর্তনের ফলে তাঁহার যাত্রাপথ বিঘ্নিত হইত না (ফাতহুল বারী, ৬খ., পৃ. ২৯৬, ৩৮৩; আল-বিদায়া, ২খ, পৃ. ১১৩; তাফসীর মাযহারী, ৭খ, পৃ. ২৬২-৩; কাশশাফ, ২খ, পৃ. ৪৯৬; তাফসীর কুরতুবী, ১১ -১২খ, পৃ. ৪৮)।

যুলকারনায়ন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা জানিতেন এবং প্রতিটি বস্তুর জ্ঞান ছিল তাঁহার নখদর্পণে। যমীনের সমস্ত ছোট বড় নিদর্শনসমূহের জ্ঞান আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন। যেই জনগোষ্ঠীর সহিত তিনি যুদ্ধ করিতেন তিনি তাঁহাদের ভাষাও জানিতেন এবং সেই ভাষায় তিনি কথোপকথন করিতেন (তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ০৬)।

ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যায় যে, সমগ্র দুনিয়ায় শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠাকারী চারজন সম্রাট অতিক্রান্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে দুই জন ছিলেন মু'মিন এবং দুইজন কাফির। মু'মিন দুইজন হইলেন,

হযরত সুলায়মান (আ) ও যুলকারনায়ন এবং কাফির দুইজন নমরূদ ও বুখতে নাসর। আশ্চর্যের বিষয় যে, যুলকারনায়ন নামে পৃথিবীতে একাধিক ব্যক্তি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং প্রতি যুগের যুলকারনায়নের সহিত সিকান্দার (ALEXANDER) উপাধিটিও যুক্ত রহিয়াছে (যামাখশারী, কাশশাফ, ২খ, পৃ. ৪৯৬; মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ৬১৭-৮)।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারকে অনেকে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন হিসাবে অভিহিত করেন। আবূ হায়্যান আন্দালুসী 'বাহরুল মুহীত'-এ এবং মাহমুদ আলূসী বাগদাদী 'রূহুল মা'আনী' নামক তাফসীরে মেসডোনিয়ার আলেকজাণ্ডারকে (সিকান্দার রুমী মাকদূনী) কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনায়ন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (বাহরুল মুহীত, ৬খ, পৃ. ১৫৭-১৬২; রূহুল মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ২৫-২৬)। কিন্তু ইতিহাসবিদ আবুল ফিদা হাফিজ ইবন কাছীর উপরিউক্ত অভিমত খণ্ডন করিয়া বলেন, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ও কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন পৃথক দুই ব্যক্তি। তাঁহার বিখ্যাত ইতিহাস গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'-তে গ্রীসের আলেকজাণ্ডারের বংশতালিকা উপস্থাপনা করেন, যাহা উপরে গিয়া হযরত ইবরাহীম (আ)-এর সহিত মিলিয়া যায়। ইবন কাছীর বলেনঃ

فاما ذوالقرنين الثانى فهو اسكندر بن فيلبس المقدونى اليونانى المصرى بانى الاسكندريه الذى يورخ بايامه الروم وكان متاخرا عن الاول بدهر طويل وكان هذا قبل مسيح بنحو من ثلاثة مائة سنة وكان ارطاطاليس الفيلسوف وزيرة وهو الربذى قبل داا واذل ملوك الفرس ووطاء ارضهم وانما نبهنا عليه لان كثيرا من الناس يعتقد انهما واحد وان المذكور فى القران هو الذى كان ارطاطاليس وزيرة خيقع بسبب ذلك خطاء كبير وفساد عريض طويل فان الاول كان عبدا يؤمنا صالحا وملكا عادلا وزيرة الخض وقدكان نبيا علي ما قررناه قبل هذا واما الثانى فكان مشركا كان وزيرة فيلسوفا. وقد كان بينهما ازيد من الفرسنة فاين هذا عن هذا لا يستويان ولا يشتبهان (البدايه والنهايه).

"দ্বিতীয় যুলকারনায়ন ছিলেন ফিলিপ-এর পুত্র সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার) যিনি মাকদূনী, ইউনানী ও মিসরী নামে পরিচিত। তিনি আলেকজান্দ্রিয়া শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং রোমের ইতিহাস তাঁহার যমানায় খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে। তিনি প্রথম সিকান্দার হইতে সুদীর্ঘ কাল পরে জন্মগ্রহণ করেন। হযরত ঈসা (আ)-এর ৩০০ বৎসর পূর্বে তিনি জন্মলাভ করেন। তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন দার্শনিক এরিস্টোটল। দারাকে তিনি হত্যা করেন এবং পারস্য সম্রাটদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিয়া বিপুল এলাকা করায়ত্ত করেন। অনেকের বিশ্বাস যে, উভয়ই এক ব্যক্তি এবং তিনিই পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন যাহার মন্ত্রী এরিস্টোটল। ইহাই মূলত বিরাট বিভ্রান্তি ও দীর্ঘ মেয়াদী বিতর্কের অন্যতম কারণ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ছিলেন নেককার, মু'মিন ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ যাহার মন্ত্রী ছিলেন খিযির (আ)। তিনি নবী ছিলেন বলিয়া পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিলেন মুশরিক যাহার মন্ত্রী এরিস্টোটল। দুইজনের মধ্যখানে দুই হাজার বৎসরের অধিক ব্যবধান। কোথায় ইনি আর কোথায় তিনি। সুতরাং উভয় সিকান্দার বা যুলকারনায়ন যে একই ব্যক্তি নহেন ইহাতে

সন্দেহের লেশ মাত্র নাই (আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ. পৃ., ১০৬; আহমদ আলী সাহারানপূরী, হাশিয়া বুখারী, ১খ, পৃ. ৪৭২)।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যুলকারনায়ন নামে পরিচিত সিকান্দার মাকদূনী (Alexander of Macidonea) মুশরিক ও যালিম ছিলেন। নিজকে খোদা দাবি করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই, এমন কি শত্রুর বক্ষে বর্শাবিদ্ধ করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। শরীরিক নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার বন্ধুগণ যখন আর্তচিৎকার করিত তখন তিনি তাচ্ছিল্যভরে মুচকি হাসিতেন। প্লুটারক (PLOTARK) বলেন, মানুষ শিকারের মাধ্যমে স্বস্তি ও সুখানুভূতি লাভ করিবার পুরাতন অভ্যাস ছিল তাঁহার। প্যাসার গ্যাডা (PASARGADAE) দখল করিবার পর এক কোটি ত্রিশ লাখ পাউণ্ডের সহায় সম্পত্তি তিনি লুট করেন এবং শহরের সমস্ত পুরুষ সদস্যকে হত্যা করিয়া নারীদের দাসীতে পরিণত করেন (The Encyclopaedia Britannica, v1, P. 493-5)।

পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন ছিলেন সত্যনিষ্ঠ, ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহওয়ালা ও প্রাজারঞ্জক বাদশাহ। মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী ও মাওলানা সায়্যিদ আবুল আ'লা মওদূদী পারস্য ও 'মিডিয়ার রাজা 'সাইরাস' (কায়খসরু, মৃত্যু খৃষ্টপূর্ব ৫৩৯) কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। সাইরাস প্রচীন কালের খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অভিযান পরিচালনায় যুলুম ও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল না, বরং তিনি ছিলেন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। আসমানী কিতাবসমূহে তাঁহার পূর্ণ বিবরণ রহিয়াছে (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৩৪)।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার নিবন্ধকার বলেন, ব্যাবিলনে যখন তিনি অভিযান পরিচালনা করিলেন, তখন ইয়াহূদীরা পারস্যবাসীদের মুক্তিদাতা ও একেশ্বরবাদী বলিয়া শ্লোগান দিতে থাকে। ইহাতে সন্দেহ নাই যে, সাইরাস জেরুসালেম ও ইয়াহূদীদের উপসনালয় হায়কাল ইয়াহূদীদের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন এবং তাহাদেরকে ফিলিস্তীন প্রত্যাবর্তনের অনুমতি প্রদান করেন (The Encyclopaedia Britannica, vol. vi, P. 752)

মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদুদী এই প্রসঙ্গে যেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ ইতিহাসের দৃষ্টিকোণে সাইরাসের রাজ্যসীমা উত্তরে ককেশাস পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দুশমন পর্যন্ত তাঁহার ন্যায়-ইনসাফের প্রশংসা করিয়াছেন। বাইবেলের বর্ণনা এই কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি অবশ্যই খোদাভীরু বাদশাহ ছিলেন, যিনি বনূ ইসরাঈলকে আল্লাহর ইবাদত করার শর্তে ব্যাবিলনের বন্দীদশা হইতে মুক্তি দান করেন এবং লা শারীক আল্লাহর ইবাদতের জন্য বায়তুল মাকদিসে দ্বিতীয় হায়কালে সুলায়মানী নির্মাণ করেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা নিশ্চয় স্বীকার করিতে পারি যে, পবিত্র কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে যত বিশ্ববিজেতা অতিবাহিত হইয়াছেন তাঁহাদের তুলনায় সাইরাসের মধ্যে যুলকারনায়নের অধিকাংশ নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে তাঁহাকে যুলকারনায়ন বলিবার জন্য আরও অধিকতর প্রমাণের প্রয়োজন রহিয়াছে। এতদসত্ত্বেও পবিত্র কুরআনে যত নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে তাহা অন্য কোন বিশ্ববিজেতার তুলনায় সাইরাসের মধ্যে অধিকতর পরিদৃষ্ট হয়।

সাইরাস প্রাচীন ইরানের শাসক ছিলেন। খৃস্টপূর্ব ৫৪৯ সালের কাছাকাছি তাঁহার উত্থান কাল। অল্প দিনের মধ্যে তিনি মিডিয়া ও লিডিয়ার (Asia Minor) রাজত্বসমূহ করায়ত্ব করিয়া খৃস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে ব্যাবিলন জয় করেন। ইহার পর কোন শক্তি তাঁহার যাত্রাপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে সাহস করে নাই। তাঁহার দেশ জয়ের ধারাবাহিকতা বর্তমান তুর্কিস্তান হইতে একদিকে মিসর ও লিবিয়া, অপর দিকে থ্রেস ও মেসিডোনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর দিকে তাঁহার রাজ্যসীমা কাফকাস (ককেশাস) রাজত্ব ও খাওয়ারিয্‌ম পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। কার্যত তৎকালীন পুরা সভ্য জগত তাঁহার প্রভাবাধীন ছিল (তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৪৪)। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ নিশ্চিতভাবে সাইরাসকে কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়ন হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন (তরজমানুল কুরআন, ২খ, পৃ. ৪৬৩)।

যুলকারনায়নের বিশ্ববিজয়

যুলকারনায়নের বিশ্ববিজয় সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

فَأَتْبَعَ سَبَبًا. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِىْ عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَّوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَاذَالْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ فِيْهِمْ حُسْنًا. قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهٗ ثُمَّ يُرَدُّ اِلٰى رَبِّهٖ فَيُعَذِّبُهٗ عَذَابًا نُكْرًا. وَاَمَّا مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءَ نِ الْحُسْنٰى. وَسَنَقُوْلُ لَهٗ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا.

"অতঃপর সে এক পথ অবলম্বন করিল। চলিতে চলিতে সে যখন সূর্যের অস্তগমন স্থানে পৌঁছিল তখন সে সূর্যকে পংকিল জলাশয়ে অস্তগমন করিতে দেখিল এবং সে তথায় এক সম্প্রদায়কে দেখিতে পাইল। আমি বলিলাম, হে যুলকারনায়ন! তুমি ইহাদিগকে শাস্তি দিতে পার অথবা ইহাদের ব্যাপার সদয়ভাবে গ্রহণ করিতে পার। সে বলিল, যে কেহ সীমালঙ্ঘন করিবে আমি তাহাকে শাস্তি দিব, অতএব সে তাহার প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হইবে এবং তিনি তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তবে যে ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাহার প্রতিদানস্বরূপ আছে কল্যাণ এবং তাহার প্রতি ব্যবহারে আমি নম্র কথা বলিব" (১৮ ঃ ৮৫ -৮৮)।

যুলকারনায়ন আল্লাহ্‌র শক্তিতে বলীয়ান হইয়া পশ্চিম প্রান্তের এমন এক সমুদ্র সৈকতে পৌঁছিলেন যেখানে সামনে কৃষ্ণ বর্ণের পানি ও কাদা ছাড়া অন্য কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। অথৈ জলাশয়ের ঐ পারে কোন জনমানব বা বনজঙ্গলের চিহ্ন নাই। শাহ ওয়ালিয়্যুল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (র) বলেন ঃ দুনিয়ার আবাদী কত দূর বিস্তৃত তাহা দেখিবার জন্য যুলকারনায়ন ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি পশ্চিমের ঐ প্রান্তে পৌঁছিলেন যেখানে কেবল জলাভূমি। মানুষ ও নৌযান সেইখানে চলাচল করিতে পারে না (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৪০৪)। যুলকারনায়ন পশ্চিম আটলান্টিক মহাসাগরের কিনারায় পৌঁছিলেন যেখানে প্রচুর দ্বীপ রহিয়াছে (রূহুল মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ৩১)।

জলাশয়ের নিকট যুলকারনায়ন একটি জনগোষ্ঠীর দেখা পাইলেন। পশুর চামড়ার পোশাক পরিহিত এইসব মানুষ ছিল কাফির। সমুদ্র তটে যেসব মৃত মাছ ও পশু ভাসিয়া আসিত সেইগুলিই

ছিল তাহাদের খাদ্য। ইবন কাছীর (র) বলেন, পংকিল জলাশয়ের সন্নিকটে একটি বড় শহর ছিল, যাহার প্রাচীরের দরজার সংখ্যা বার হাজার (তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ৮)।

আল্লাহ তা'আলা যুলকারনায়নকে ক্ষমতা দিলেন যে, তিনি জলাশয়ের সন্নিহিত জনগোষ্ঠীকে ইচ্ছা করিলে তাওবার মাধ্যমে ঈমান গ্রহণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে পারিবেন। যদি তাহারা ঈমানের দাওয়াত কবুল করে তাহা হইলে তাহাদের প্রতি সম্মান দেখাইবেন, তাহাদিগকে হিদায়াত করিবেন এবং ইসলামী শরীআতের বিধান অনুযায়ী তাহাদের পরিচালিত করিবেন। যদি তাহারা ঈমান কবুল করিতে সম্মত না হয় তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিতে পারিবেন, শাস্তি দিতে পারিবেন। যুলকারনায়ন প্রথমোক্ত পথ গ্রহণ করিয়া তাহাদেরকে ঈমানের দাওয়াত দিলেন। শরীআতের বিধিবিধান শিক্ষা দান করিয়া তিনি তাহাদিগকে আল্লাহর পথে পরিচালিত করেন (আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬১৯; তাফসীরে মাযহারী, ৭খ, পৃ. ২৬৪-৫; তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৪০৪)। যুলকারনায়ন দুর্বল ও নিরীহ মানুষদের রক্ষা করেন এবং উচ্ছৃঙ্খল, দূর্বিনীত ও অবাধ্যদের শাস্তি প্রদান করেন (Abdullah Yousuf Ali, The English Translation and Meanings of the Holy Quran, P. 754, note No. 2431)।

শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই, দেশ বিজয়, সুষ্ঠু রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, ন্যায়বিচার ও শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য যন্ত্রপাতি, বৈষয়িক উপকরণাদি, জ্ঞান-বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা সবই আল্লাহর পক্ষ হইতে তাঁহাকে দান করা হইয়াছিল। এক কথায় সেই যুগে যেইসব বিষয় একজন ধর্মপ্রচারক ও রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য প্রয়োজন ছিল সব কিছু ছিল তাঁহার নাগালের মধ্যে। সর্বপ্রথম তিনি পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছিবার উপকরণাদি কাজে লাগান (বাহরুল মুহীত, ৬খ, পৃ. ১৫৮-১৬০; মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ৬২১)।

সূর্যের উদয়াচলে যুলকারনায়ন

যুলকারনায়নের পূর্ব দিগন্ত সফর সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۔ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ نَّجْعَلْ لَّهُمْ مِّنْ دُوْنِهَا سِتْرًا ۔ كَذٰلِكَ وَقَدْ اَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا.

"আবার সে এক পথ ধরিল। চলিতে চলিতে যখন সূর্যোদয় স্থলে পৌঁছিল তখন সে দেখিল, উহা এমন এক সম্প্রদায়ের উপর উদিত হইতেছে যাহাদের জন্য সূর্যতাপ হইতে কোন অন্তরাল আমি সৃষ্টি করি নাই। প্রকৃত ঘটনা ইহাই; তাহার নিকট যাহা কিছু ছিল আমি সম্যক অবগত আছি" (১৮ ঃ ৮৯-৯১)।

অতএব যুলকারনায়ন অস্ত্রশস্ত্র ও সেনাবাহিনীর বিরাট বহর সহকারে পূর্ব দিগন্তে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলেন, পংকিল জলাশয় ভেদ করিয়া সূর্য উদিত হইতেছে। সেইখানে তিনি এমন এক জাতিকে দেখিলেন যাহারা উলঙ্গ, হিংস্র ও উন্মুক্ত প্রান্তরে যাযাবরের ন্যায় বসবাস করিতেছে। তাহাদের কোন পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহ ও তাঁবু ছিল না। সেইখানকার মাটি গৃহ নির্মাণের জন্য

উপযুক্ত নহে। তাহারা ছিল কাফির। যুলকারনায়ন তাহাদের সহিত এমন আচরণ করিলেন, যেমন পশ্চিম দিগন্তের লোকদের সহতি করিয়াছিলেন (কাশশাফ, ২খ, পৃ. ৪৯৮; তাফসীর কুরতুবী, ১১-১২খ, পৃ. ৫৩)।

ইবন কাছীর বলেন ঃ পশ্চিম প্রান্ত হইতে পূর্ব দিগন্তে যাওয়ার পথে যেইসব জাতির দেখা হইত তিনি তাহাদের তাওহীদের দাওয়াত দিতেন। যদি তাহারা দাওয়াত কবুল করিত তবে ভাল, অন্যথায় তিনি তাহাদের সহিত লড়াই করিতেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাহারা পরাজিত হইলে যুলকারনায়ন বিজিতদের সম্পত্তি, গবাদি পশু ও কর্মচারী নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন আনিয়া সম্মুখপানে অগ্রসর হইতেন। এইভাবে পথ চলিতে চলিতে তিনি সূর্যের উদয়াচলে পৌছিলেন। সেইখানে দেখা গেল এক বিরাট জনবসতি। গাছপালাবিহীন এই প্রান্তরে বসবাসকারী মানুষগুলি দিগম্বর ও জংলী। গায়ের বর্ণ লাল, আকারে খাটো। সামুদ্রিক মাছই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। হযরত হাসান বসরী (র) বলেন ঃ এইসব মানুষ সূর্যোদয়ের সময় মাটির গর্তে অথবা পানির মধ্যে সুড়ঙ্গে চলিয়া যাইত, সূর্যোদয়ের পর মাটির গর্ত অথবা পানি হইতে উঠিয়া এইদিক সেইদিক ঘুরাঘুরি করিত। এইসব লোকের কান ছিল বড় বড় এবং তাহাদের সহিত একটি করিয়া বাচ্চা ও বিছানা থাকিত। ইবন জারীর তাবারী বলেন ঃ এই এলাকায় কোন পাহাড়-পর্বত নাই। দূর অতীতে এক সময় একটি সেনাদল এইখানে আসিয়া হাযির হইলে স্থানীয় জনগণ তাহাদিগকে বলিল, সূর্যোদয়ের সময় তোমরা এইখানে থাকিও না। জবাবে তাহারা বলিল, আমরা আজ রাত্রির মধ্যেই এই এলাকা ত্যাগ করিব। কিন্তু বল ঐসব উজ্জ্বল হাড়ের স্তূপ কি করিয়া এইখানে আসিল ? তাহারা জবাব দিল, কিছু কাল পূর্বে এইখানে একটি সেনাদল আসে, সূর্যোদয়ের সময় তাহারা অবস্থান করিয়াছিল, ফলে সব লোকেরই মৃত্যু ঘটে। এইসব হাড়গোড় তাহাদেরই (তাফসীরে তাবারী, ৮খ, পৃ. ১৩; তাফসীরে ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ০৯)।

দুই পর্বত প্রাচীরে যুলকারনায়ন ঃ এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন ঃ

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا. حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا . لاَّيَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلاً. قَالُوْا يَاذَالْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ حَتّٰى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا حَتّٰى اِذَا جَعَلَه نَارًا . قَالَ اٰتُوْنِىْ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا . فَمَا اسْطَاعُوْا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَمَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا.

"আবার সে এক পথ ধরিল, চলিতে চলিতে সে যখন দুই পর্বত প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌছিল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পাইল যাহারা কোন কথা বুঝিবার মত ছিল না। উহারা বলিল, হে যুলকারনায়ন ! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও উহাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়িয়া দিবেন? সে বলিল, আমার প্রতিপালক

আমাকে যে ক্ষমতা দিয়াছেন তাহাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর, আমি তোমাদের ও উহাদের মধ্যস্থলে এক মযবুত প্রাচীর গড়িয়া দিব। তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন কর। অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হইয়া যখন লৌহস্তূপ দুই পর্বতের সমান হইল তখন সে বলিল, তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন ইহা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হইল তখন সে বলিল, তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন কর, আমি উহা ঢালিয়া দেই ইহার উপর। ইহার পর তাহারা (ইয়াজুজ ও মাজুজ) উহা অতিক্রম করিতে পারিল না এবং উহা ভেদও করিতে পারিল না" (১৮ ঃ ৯২-৯৭)।

যুলকারনায়ন উত্তর দিকে যাত্রা করিয়া যেই দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে পৌঁছিলেন তাহা ছিল আরমেনিয়া ও আযারবায়জানের সন্নিহিত মঙ্গোলীয় ভুখণ্ডের একেবারে শেষ প্রান্ত (বাহরুল মুহীত, ৬খ, পৃ. ১৬৩)। যুলকারনায়ন সেইখানে যেই জাতিগোষ্ঠীর দেখা পাইলেন তাহারা বিশেষ একটি ভাষায় কথা বলিত। ফলে তাহারা অন্য মানুষের ভাষা বুঝিতে পারিত না এবং অন্যরাও তাহাদের ভাষা বুঝিত না। আল্লামা যামাখশারী বলেন যে, তাহারা বোবার মত ইশারা-ইঙ্গিতে কথা বলিত (কাশশাফ, ২খ, পৃ. ৪৯৮)। কিন্তু আল্লাহ পাক প্রদত্ত শক্তিতে বলীয়ান হইয়া যুলকারনায়ন তাহাদের ভাষা ও বাকরীতি বুঝিতে পারয়াছিলেন। ইমাম বাগাবী বলেন, যুলকারনায়ন দোভাষীর মাধ্যমে তাহাদের সহিত কথোপকথন করেন (তাফসীরে বাগাবী, ৩খ, পৃ. ১৮০)।

স্থানীয় জনগণ পর্বতের মধ্যখানে একটি শক্ত দেওয়াল তৈয়ার করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে যুলকারনায়নকে বিপুল পরিমাণ লৌহখণ্ড, লাকড়ি এবং কয়লা যোগাড় করিয়া দিল। যুলকারনায়ন নীচে লাকড়ি ইহার উপর লৌহপিণ্ড, লৌহের উপর কয়লা, কয়লার উপর লাকড়ি, লাকড়ির উপর লৌহ খণ্ড এইভাবে স্তরের উপর স্তর তৈয়ার করিয়া হুকুম দিলেন আগুন ধরাইয়া ফুঁক দিতে থাক। প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার দহনে লৌহপিণ্ড যখন লোহিত অঙ্গারের বর্ণ ধারণ করিল তখন তিনি তাম্র আনিবার হুকুম দিলেন। জনগণ তাম্রখণ্ড আনিয়া দিলে তিনি তাম্র পিণ্ডগুলি জ্বলন্ত লৌহের উপর ঢালিয়া দিলেন। এইভাবে লৌহখণ্ড গলিত তাম্রের সংমিশ্রণে পর্বতশৃঙ্গ সম এক শক্তিশালী প্রাচীর রচিত হইয়া গেল। ইয়াজুজ-মাজুজ নামক দুর্ধর্ষ পার্বত্য জাতির পক্ষে এই সুকঠিন প্রাচীর অতিক্রম ও ভেদ করা অসম্ভব হইয়া গেল। ফলে তাহাদের ভীষণ অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে পার্শ্ববতী এলাকার জনগণ রেহাই পাইল। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী বলেন, যুলকারনায়নের সহিত প্রাচীর নির্মাণে পারদর্শী একদল বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী ছিলেন (তাফসীর কুরতুবী, ৮খ, পৃ. ৬২; তাফসীর মাযহারী, ৭খ, পৃ. ২৬৭-৮; তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১০; তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬২০-১)।

ইমাম বাগাবী লিখিয়াছেন, যুলকারনায়ন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১২০০ হাত, প্রস্থ ৫০ হাত এবং উচ্চতা ১০০ হাত (তাফসীর বাগাবী, ৩খ, পৃ. ১৮২)। প্রাচীর নির্মাণ সমাপ্ত হইবার পর যুলকারনায়ন আল্লাহ তা'আলার শোকার আদায় করেন এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা অনুযায়ী এই প্রাচীর যে একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে তাহারও ইঙ্গিত দেন। কারণ আল্লাহ পাকের অস্তিত্ব ছাড়া দুনিয়ার কোন সৃষ্টি চিরস্থায়ী নয়। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ۔

"সে (যুলকারনায়ন) বলিল, ইহা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে তখন তিনি উহাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য" (১৮ ঃ ৯৮)।

এইখানে 'প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি' তিন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। (এক) যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা এই প্রাচীর বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারেন অথবা (দুই) কিয়ামতের দিনই আল্লাহ এই প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিতে পারেন অথবা (তিন) ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাবের সময় ইহা ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন (মাআরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ৬৪১-২; তাফহীমুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৪৭)।

ঐতিহাসিক তাবারী, ইবন কাছীর ও ইয়াকূত বর্ণনা করেন যে, ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমার ইবন খাত্তাব (রা) আযারবায়জান জয় করার পর ২২ হিজরী সালে সুরাকা ইবন আমরকে বাবুল আবওয়াবে (দারবান্দ) অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। সুরাকা (রা) মূল অভিযান পরিচালনার পূর্বে আবদুর রহমান ইবন রাবীআকে অগ্রবর্তী সেনাদলের প্রধান নিযুক্ত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। আবদুর রহমান যখন আর্মেনীয় অঞ্চলে পৌঁছেন তখন এলাকার শাসনকর্তা শহরবরায যুদ্ধ ছাড়াই আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর তিনি বাবুল আবওয়াব অভিমুখে যাত্রা করিবার প্রস্তুতি নিলেন। এই মুহূর্তে শহরবরায তাঁহাকে বলিলেন, আমি যুলকারনায়নের প্রাচীর পর্যবেক্ষণের জন্য একজন লোক পাঠাইয়াছিলাম। সে আপনাকে বিস্তারিত তথ্য দিতে পারিবে। অতঃপর লোকটিকে সেনাপতি আবদুর রহমানের নিকট হযির করা হইল সে প্রাচীরের এবং ইহার সন্নিহিত এলাকার মানুষের অবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বর্ণনা দান করে (তাবারী, ৩খ, পৃ. ২৩৫-২৩৯; আল-বিদায়া, ৭খ, পৃ. ১২২-১২৫; মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব অধ্যায়)।

ইয়াজুজ-মাজুজ প্রসঙ্গ

ইয়াজুজ-মাজুজ মানব সম্প্রদায়ভুক্ত এবং ইয়াফিছ ইবন নূহ (আ)-এর বংশধর। ইউরোপীয় ভাষায় ইয়াজুজ Gog আর মাজুজ Magog নামে পরিচিত (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৮৪)। এশিয়ার উত্তরে তিব্বত-চীন হইয়া ককেশাস পর্বতমালার শেষপ্রান্ত পর্যন্ত তাহাদের অধিবাস। হিযকীলের সহীফা (অধ্যায়, ৩৮- ৩৯) অনুযায়ী রাশিয়া ও মস্কোর অধিবাসিগণই হইতেছে ইয়াজুজ ও মাজুজ। ইসরাঈলী ইতিহাসবিদ ইউসিফুস ইয়াজুজ-মাজুজ বলিতে 'সিনমিনিঈন' জাতি-গোষ্ঠীকে বুঝাইয়াছেন, যাহারা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে বসবাস করে (তাফহীমূল কুরআন, ৩খ, পৃ. ৪৬)। খৃস্টপূর্ব ৬৫০ সালে ইহাদের একটি বিশাল বাহিনী পর্বত চূড়া হইতে নামিয়া ইরানের পশ্চিমাঞ্চলীয় জনপদ লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয় (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৯০)। ধর্মবিশ্বাসের দিক দিয়া তাহারা উদীয়মান সূর্য ও নীল আকাশের পূজারী। তবে তাহাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এমনও রহিয়াছে যাহারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী, কিন্তু রিসালাত ও আখিরাত সম্বন্ধে তাহাদের

কোন ধারণা নাই (মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, ৫খ, পৃ. ৬৩৩)। তাহাদের মধ্যে মূল পার্বত্য অঞ্চলে যাহারা বাস করিত তাহারা ছিল বর্বর, অসভ্য, হিংস্র ও যালিম। কিন্তু যাহারা নৃতাত্ত্বিকভাবে একই জাতি-গোষ্ঠীভুক্ত হইয়াও সভ্যতার পরশে সমতলবাসীদের সহিত আধুনিক জীবন ধারায় অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে তাহারা এই নামের অন্তর্ভুক্ত নয়।

মোগল, তুর্কী, তাতার ও মঙ্গোলীয়রা হইতেছে ইয়াজুজ-মাজুজের অধস্তন পুরুষ। মঙ্গোলিয়া বা ককেশাসের ঐসব গোত্র যখন তাহাদের কেন্দ্রে থাকিত তখন তাহারা ইয়াজুজ-মাজুজ। ঐখান হইতে বাহির হইয়া শত শত বৎসর ব্যাপী সভ্য জগতে সমাজবদ্ধ জীবনে বসবাস করার পর তাহাদের হিংস্রতা ও বর্বরতা কিছুটা লোপ পায়। কেন্দ্রের সহিত তাহাদের আর যোগাযোগ থাকে নাই, এমনকি একে অপরের পরিচয় পর্যন্ত ভুলিয়া যায় (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৯৪)।

ইবনুল আছীর বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজ তাতারীদের সমগোত্রীয় হইলেও শক্তি, নিপীড়ন ও অরাজকতা সৃষ্টির যোগ্যতা তাতারীদের তুলনায় ইয়াজুজ-মাজুজের বেশী (আল-কামিল, ১খ, পৃ. ৪৮)।

ইয়াজুজ-মাজুজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি এশিয়া ও ইউরোপের বিশাল এলাকাব্যাপী বিস্তৃত ছিল। তিব্বত ও চীন হইতে ককেশাসের পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত ছিল তাহাদের আক্রমণস্থল (মাআরিফুল কুরআন, পৃ. ৮২৪)।

ইমাম কুরতুবী বলেন, ইয়াজুজ-মাজুজের বাইশটি গোত্রের মধ্যে একুশটি গোত্রকে যুলকারনায়ন প্রাচীর দ্বারা আবদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। যেই গোত্রটি প্রাচীরের বাহীরে রহিয়া গিয়াছে তাহারা হইল তুর্কী। এই তুর্কী-তাতারী ফিৎনা ষষ্ঠ হিজরীতে ইসলামী খিলাফতকে তছনছ করিয়া দেয়। চেঙ্গীয খানের আক্রমণে মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ ধ্বংস হইয়া যায় এবং ১২৫৮ খ্রস্টাব্দে হালাকু খান সভ্যতার লীলাভূমি বাগদাদ বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। বাগদাদের বিশ লক্ষ জনবসতির মধ্যে ষোল লক্ষ মোঙ্গলদের হস্তে প্রাণ হারায়। ইমাম কুরতুবীর মতে ইহারাই হইল ইয়াজুজ-মাজুজের অগ্রবর্তী সেনাদল; সরাসরি ইয়াজুজ-মাজুজ নহে। কারণ হযরত ঈসা (আ)-এর আবির্ভাবের পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজ আসিতে পারে না (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, ১১খ, পৃ. ৫৮)।

আল্লামা আলূসী বাগদাদী তাতারীগণ যে ইয়াজুজ-মাজুজ তাহা স্বীকার করেন না, তবে তাতারী ফিৎনা ও ধ্বংসযজ্ঞকে ইয়াজুজ-মাজুজের বর্বরতা ও হিংস্রতার সমতুল্য বলিয়া মনে করেন (রূহুল মা'আনী, ১৬খ, পৃ. ৪৪)।

ইয়াজুজ-মাজুজেরা দলবদ্ধভাবে পর্বত হইতে নামিয়া লোকালয়ে ঝাপাইয়া পড়ে এবং ধ্বংসলীলা চালায়। তাহাদের উৎপীড়ন ও বর্বরতা হইতে বাঁচিবার জন্য পৃথিবীর বহু জায়গায় বড় আকারের প্রাচীর নির্মিত হইয়াছে। যুলকারনায়ন ককেশাসের দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে লৌহ ও তাম্রের গলিত প্রাচীর তৈয়ার করিবার পূর্বে ইয়াজুজ-মাজুজ, যাহারা সংখ্যায় ছিল প্রায় চার লক্ষ, লোকালয়ে আক্রমণ চালাইয়া গাছপালা ধ্বংস করিয়া দিত, ফসল ও তরকারী সাবাড় করিয়া ফেলিত,

শুকনা দ্রব্য ও খাদ্যসামগ্রী লুণ্ঠন করিত। তাহাদের ধ্বংসযজ্ঞ হইতে শিশুরাও রেহাই পাইত না (তাফসীর মাযহারী, ৭খ, পৃ. ২৬৭-৮; তাফসীর ইবন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১০)।

যুলকারনায়নের প্রাচীর নির্মিত হইবার ফলে ইয়াজুজ-মাজুজের সেইসব সম্প্রদায় ঐপারে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, কিয়ামত দিবসের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহারা সেইখানে আবদ্ধ থাকিবে। হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করিয়া দাজ্জালকে যখন নিধন করিবেন, তখন ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব ঘটিবে। যুলকারনায়নের প্রাচীর বিধ্বস্ত হইয়া সমতল ভূমির সমান হইয়া যাইবে। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হইয়াছে ঃ

حَتّٰى اِذَا فُتِحَتْ يَاْجُوْجُ وَمَاْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ.

"যখন ইয়াজুজ-মাজুজকে মুক্তি দেওয়া হইবে, তাহারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হইতে দ্রুত ছুটিয়া আসিবে" (২১ ঃ ৯৬)।

ইয়াজুজ-মাজুজ মুক্ত পঙ্গপালের মত একযোগে পার্বত্য এলাকা হইতে বাহির হইয়া দ্রুত গতিতে সমতল ভূমিতে ছড়াইয়া পড়িবে। নিষ্ঠুর অত্যাচার ও ভয়ানক নিপীড়ন চালাইয়া মানুষের রক্ত লইয়া তাহারা হোলি খেলিবে। তাহাদিগকে বাধা দেওয়ার শক্তি কাহারও থাকিবে না (তাফসীরে উছমানী, পৃ. ৪৩৯)।

হযরত ঈসা (আ) আল্লাহ্র হুকুমে মুসলমানদের সঙ্গে লইয়া তূর পর্বতে সুরক্ষিত কেল্লায় আশ্রয় লইবেন। এই বর্বর জাতি নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী, আসবাবপত্র এবং নদীর পানি নিঃশেষ কিরয়া দিবে। তাহাদের আক্রমণ অভিযানে জনবসতি বিরান হইয়া যাইবে। অবশেষে হযরত ঈসা (আ)-এর দোআর বরকতে অত্যাচারী ইয়াজুজ-মাজুজের অগণিত লোক ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহাদের মৃতদেহের দুর্গন্ধে পৃথিবীতে বসবাস করা দুরূহ হইয়া পড়িবে। আল্লাহ পাক লাশগুলিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবেন অথবা অদৃশ্য করিয়া দিবেন এবং বৃষ্টির মাধ্যমে সমগ্র ভূপৃষ্ঠকে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিয়া দিবেন (মাআরিফুল কুরআন, বাংলা, পৃ. ৮২৪)। অতঃপর চল্লিশ বৎসর পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

যুলকারনায়নের প্রাচীর কোথায় অবস্থিত ?

আব্বাসী খলীফা ওয়াছিক বিল্লাহ ২২৭-২৩৩ হিজরী সালে যুলকারনায়ন কর্তৃক নির্মিত প্রাচীর পৃথিবীর কোথায় অবস্থিত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সাল্লাম আত্-তরজমান-এর নেতৃত্বে ৫০ সদস্যের একটি সেনাদল প্রেরণ করেন। দুই বৎসরের বেশী সময় তাহারা দেশের পর দেশ সফর করিয়া অবশেষে উক্ত প্রাচীরের নিকট পৌঁছিতে সক্ষম হন, যাহা লৌহ ও তাম্র দিয়া নির্মিত। তাহারা দেখিতে পান যে, নিচে বিশাল আকারের দরজা রহিয়াছে এবং দরজাটি বড় বড় তালা দ্বারা আবদ্ধ। প্রাচীরটি অত্যধিক উচুঁ, শত চেষ্টা করিয়াও উপরে উঠা সম্ভব নহে। উভয় দিক দিয়া বিশাল পর্বতশ্রেণী সমান্তরাল রেখায় বহুদূর চলিয়া গিয়াছে। প্রাচীরের সন্ধান পাইতে তাহাদের দুই

বৎসর সময় লাগিয়াছিল (ফখরুদ্দীন রাযী, তাফসীর কাবীর, ৫খ, পৃ. ৫১৩; তাফসীর ইব্ন কাছীর, ৩খ, পৃ. ১১)।

ইবন খালদূন যুলকারনায়নের প্রাচীর এবং ইহার অবস্থান স্থল সম্পর্কে ভৌগোলিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন ঃ সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে পশ্চিম দিকে তুর্কীদের কানজাক ও চর্কস নামে অভিহিত গোত্রসমূহ বসবাস করে এবং পূর্ব দিকে ইয়াজূজ-মাজূজের বসতি বিদ্যমান। তাহাদের উভয়ের মধ্যস্থলে ককেশাস পর্বতমালা অবস্থিত। এই পর্বতমালা চতুর্থ ভূখণ্ডের পূর্ব দিকে অবস্থিত, ভূমধ্য সাগর হইতে শুরু হইয়া এই ভূখণ্ডেরই শেষ উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পর ভূমধ্য সাগর হইতে পৃথক হইয়া উত্তর-পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হইয়া পশ্চিম খণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এই জায়গা হইতে তাহা আবার প্রথম দিকে মোড় লইয়াছে এবং সপ্তম ভূখণ্ডের নবম অংশে প্রবেশ করিয়াছে। এইখানে পৌছিয়া তাহা দক্ষিণ হইতে উত্তর-পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে। এই পর্বতমালার মধ্যস্থলে সিকান্দারী প্রাচীর অবস্থিত যাহার সংবাদ পবিত্র কুরআন প্রদান করিয়াছে (ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৭৯; মা'আরিফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা, পৃ. ৮২৬)।

আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (র) যুলকারনায়নের প্রাচীরের অবস্থানস্থল সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, দুষ্কৃতকারী ও বর্বর মানুষদের লুণ্ঠন হইতে আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীতে একটি নহে বরং বহু প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছে। এইগুলি বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নির্মাণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সর্বপ্রসিদ্ধ হইতেছে চীনের প্রাচীর। আবূ হায়্যান আন্দালুসীর মতে ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০০ মাইল এবং নির্মাতা হইতেছেন চীন সম্রাট ফাগফুর। হযরত আদম (আ) পৃথিবীতে অবতরণের ৩,৪৬০ বৎসর পর চীনের প্রাচীর নির্মিত হয়। এই প্রাচীরকে মোগলরা 'আনকুদাহ' ও তুর্কীরা 'বুরকুরকা' বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এমনি ধরনের আরও কয়েকটি প্রাচীর অনারব বাদশাহগণ নির্মাণ করিয়াছিলেন, যেইগুলি উত্তর দিকে অবস্থিত (আকীদাতুল ইসলাম ফী হায়াতি ঈসা আলায়হিস সালাম, পৃ. ১৯৮)।

হিফযুর রহমান সিউহারবী এই প্রসঙ্গে বলেন, ইয়াজূজ-মাজূজের লুণ্ঠন ও ধ্বংসযজ্ঞের পরিধি বিশাল এলাকা ব্যাপী বিস্তৃত ছিল। একদিকে ককেশিয়ার পাদদেশে বসবাসকরীরা এবং তিব্বত ও চীনের অধিবাসীরা ছিল তাহাদের সার্বক্ষণিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ইয়াজূজ-মাজূজের আগ্রাসন হইতে আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রাচার নির্মিত হইয়াছে। তম্মধ্যে সর্ববৃহৎ ও প্রসিদ্ধ হইতেছে 'চীনের প্রাচীর' (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৯৫-৬)।

দ্বিতীয় প্রাচীর মধ্য এশিয়ার বুখারা ও তিরমিযের নিকটে অবস্থিত। ইহার অবস্থান স্থলের নাম 'দারবান্দ'। এই প্রাচীরটি খ্যাতনামা মোঙ্গল বীর তৈমুর লঙ-এর আমলে বিদ্যমান ছিল। রোমান সম্রাটের বিশেষ সভাসদ সীলা বরজর জার্মানী তাঁহার গ্রন্থে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। স্পেনের সম্রাট ক্যাহাইলের দূত ক্ল্যামস্ তাহার ভ্রমণবৃত্তান্তে এই প্রাচীরের বর্ণনা দিয়াছেন। ১৪০৩ খৃস্টাব্দে যখন তিনি সম্রাটের দূত হিসাবে তৈমুর লঙ্গের দরবারে পৌছেন তখন এই স্থান অতিক্রম করেন। তিনি

লিখিয়াছেন, বাবুল হাদীদের প্রাচীর মাওসিলের ঐ পথে অবস্থিত যাহা সমরকন্দ ও ভারতের মধ্যস্থলে বিদ্যমান (শায়খ তানতাভী, তাফসীর জাওহারী, ৯খ, পৃ. ১৯৮)।

তৃতীয় প্রাচীর ঃ আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী মধ্য এশিয়ার পশ্চিম অংশে হাসার জেলায় আরেকটি দারবান্দের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা বুখারা হইতে ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, ৩৮ ডিগ্রী অক্ষাংশ ও ৬৭ ডিগ্রী দ্রাঘিমাংশে। ইউরোপীয় পরিব্রাজক মার্কো পোলো এই প্রাচীরের কথা তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে উল্লেখ করিয়াছেন (তাফসীরে মাজেদী, পৃ. ৬২০)।

চতুর্থ প্রাচীর রাশিয়ার দাগিস্থানে অবস্থিত। ইহাও দারবান্দ ও বাবুল আবওয়াব নামে খ্যাত। দারবান্দ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন দাগিস্তানের একটি শহরের নাম, যাহা কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহা তিন ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ হইতে ৪৩ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ১৫´´ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা হইতে ৪৮´´ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহাকে 'দারবান্দ নওশেরওয়াঁ' নামে অভিহিত করা হয়। তবে বাবুল আবওয়াব নামে ইহা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। প্রাচীন ইতিহাসবিদগণের মতে ইহার চার পার্শ্ব প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং ইহাকে 'আবওয়াবুল আলবানিয়া' ও 'বাবুল হাদীদ' বলা হইত। কারণ প্রাচীরে বড় বড় লৌহ ফটক রহিয়াছে (বুস্তানী, দাইরাতুল মা'আরিফ, ৭খ, পৃ. ৬৫১; ইয়াকূত হামাবী, মু'জামুল বুলদান, ৮খ, পৃ. ৯)।

পঞ্চম প্রাচীর বাবুল আবওয়াব হইতে পশ্চিম দিকে ককেশিয়ার সুউচ্চ মালভূমিতে অবস্থিত। সেইখানে দুই পাহাড়ের মধ্যস্থলে দারিয়াল নামে প্রসিদ্ধ একটি গিরিপথ রহিয়াছে। এই পঞ্চম প্রাচীরটি কাফ্কায অথবা জাবালে কোফা অথবা কাফ্ পর্বতমালার প্রাচীর নামে খ্যাত। বুস্তানী এই সম্পর্কে বলেন, বাবুল আবওয়াব প্রাচীরের সন্নিকটে আরও একটি প্রাচীর রহিয়াছে যাহা পশ্চিম দিকে আগাইয়া গিয়াছে। সম্ভবত পারস্যবাসীরা উত্তরাঞ্চলীয় বর্বরদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহা নির্মাণ করিয়াছিল। ইহার নির্মাতা সম্পর্কে সঠিক ও বিশুদ্ধ কোন বর্ণনা জানা যায় নাই । প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কেহ কেহ আলেকজান্ডার, কেহ কেহ সম্রাট নওশেরওয়াঁর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ইয়াকূত বলেন, গলিত তাম্র দ্বারা উহা নির্মিত (দাইরাতুল মা'আরিফ, ৭খ, পৃ. ৬৫২)।

হিফযুর রহমান সিউহারবী বলেন, এইসব প্রাচীর উত্তর দিকে অবস্থিত এবং প্রায় একই উদ্দেশ্যে নির্মিত। তাই এইগুলির মধ্যে যুলকারনায়নের প্রাচীর কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা কঠিন। শেষোক্ত দুইটি প্রাচীরের ব্যাপারে অধিক মতভিন্নতা দেখা দিয়াছে। কেননা উভয় স্থানের নাম দারবান্দ এবং উভয় স্থলে প্রাচীরও বিদ্যমান রহিয়াছে। উল্লিখিত পাঁচটি প্রাচীরের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রাচীন হইতেছে চীনের প্রাচীর। ইহা যুলকারনায়নের প্রাচীর নহে, এই বিষয়ে সবাই একমত। ইহা উত্তর দিকে নহে, দূর প্রাচ্যে অবস্থিত। কুরআন পাকের ইঙ্গিত দ্বারা বুঝা যায় যে, যুলকারনায়নের প্রাচীরটি উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত। এখন উত্তর ভূখণ্ডে অবস্থিত তিনটি প্রাচীর সম্পর্কিত পর্যালোচনা বাকী রহিয়া গেল। তন্মধ্যে মাসউদী, ইস্তাখ্রী, হামাবী প্রমুখ ইতিহাসবিদ সাধারণভাবে সেই প্রাচীরকে যুলকারনায়নের প্রাচীর বলিয়া অভিহিত করেন যাহা দাগিস্তানে অথবা ককেশাস এলাকা বাবুল আবওয়াবের দারবান্দ নামক স্থানে কাস্পিয়ান সাগরের তীরে অবস্থিত। বুখারা ও তিরমিযের

দারবান্দে অবস্থিত প্রাচীরকে যাহারা যুলকারনায়নের প্রাচীর বলিয়াছেন, তাঁহারা সম্ভবত দারবান্দ নামের কারণে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। এখন যুলকারনায়নের প্রাচীরের অবস্থান প্রায় নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ দুইটি প্রাচীরের মধ্যে যে কোন একটি হইতে পারে। (এক) দাগিস্তান ককেশাসের এলাকা বাবুল আবওয়াবের দারবান্দের প্রাচীর। (দুই) আরও উচ্চে কাফকায অথবা কাফ অথবা ককেশাস (Caucasus) পর্বতমালায় অবস্থিত প্রাচীর। উভয় স্থানে প্রাচীরের অস্তিত্ব ইতিহাসবিদদের নিকট প্রমাণিত সত্য। উভয় প্রাচীরের মধ্যে ককেশাস পর্বতমালায় অবস্থিত দারিয়ালের দুই সুউচ্চ পর্বতের গিরিপথে লৌহ ও তাম্র নির্মিত প্রাচীরকে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত যুলকারনায়নের প্রাচীর বলিয়া ওয়াহব ইবন মুনাব্বিহ, আবু হায়্যান আন্দালুসী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (কাসাসুল কুরআন, ৩খ, পৃ. ১৯৫-২০৭; মা'আরিফুল কুরআন, পৃ. ৮২৬-৭; Encyclopaedia Britannica, 11th ed, vol. xiii, P. 526; তরজমানুল কুরআন, ২খ, পৃ. ৪৬২-৪)।

যুলকারনায়নের পূর্ণ জীবনই ছিল আল্লাহ্‌র দীনের পথে মেহনত, মানব সেবা, ত্যাগ ও সংগ্রামে পরিপূর্ণ। জীবনপথের অনেক চড়াই-উৎরাই পার হইয়া পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করিবার পর যুলকারনায়ন ইন্তিকাল করেন। দুই পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত তাঁহার লৌহ-তাম্রের সংমিশ্রণে প্রস্তুতকৃত প্রাচীর অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহার স্মৃতির অম্লান স্মারক হইয়া থাকিবে। আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী এই প্রসঙ্গে বলেন ঃ

وهفاته عين الحياة وحظى بلما الخضر عليه السلام اغتم غما شديدا فأيقن الموت فمات بدومة الجندل وكان منزله هكذا روي عن على رض ·

"হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত। অমৃত-ঝর্ণা যখন যুলকারনায়নের হাতছাড়া হইয়া গেল এবং হযরত খিযির (আ) তাহা লাভ করিয়া ধন্য হইলেন, তখন তিনি ভীষণ দুঃখ পাইলেন। মৃত্যু সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হইয়া গেলেন। দাওমাতুল জান্দাল নামক জায়গায় তিনি ইন্তিকাল করেন। এইখানেই তাঁহার অন্তিম বিশ্রামস্থল" (উমদাতুল কারী, ১০খ, পৃ. ৩৩৩)।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ (১) ইবন জারীর তাবারী, জামিউল বায়ান, লেবানন, ৮খ, পৃ. ৭-১৪; ৩ খ., পৃ. ৬৪১-২; (২) ইবন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ২খ, পৃ. ১০২-৩, ১০৮-১১২, ১১৩, ১০৬; (৩) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল কুরআন, করাচী ১৯৮৩ খৃ., ৫খ, পৃ. ৬১৬-৭, ৬১৮, ৬২১, ৬৪১-২, মদীনা সংস্করণ, পৃ. ৮২৪; (৪) মাহমূদ আলূসী বাগদাদী, রূহুল মাআনী, কায়রো, ১৬খ, পৃ. ২৫, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৪৪; (৫) ইবন কাছীর, তাফসীরু ইবনে কাছীর, দিল্লী, ৩খ, পৃ. ৯, ৬, ৮, ১০, ১১; (৬) আল্লামা বদরুদ্দীন আয়নী, উমদাতুল কারী, কোয়েটা ১৪০৬ হি., ১০খ, পৃ. ৩৩৩; (৭) যামাখশারী, কাশশাফ, বৈরূত, ২খ, পৃ. ৪৯৭, ৪৯৬, ৪৯৮; (৮) মুহাম্মদ আল-কুরতুবী, আল-জামে লি-আহকামিল কুরআন, বৈরূত, ১১-১২খ, পৃ. ৪৫-৪৮, ৫৩, ৫৮; ৮খ, পৃ. ৬২; (৯) আহমাদ আলী সাহারানপূরী, হাশিয়া সাহীহ আল-বুখারী, ১খ, পৃ. ৪৭২; (১০) বুস্তানী, দাইরাতুল

মা'আরিফ, লাহোর, ৮খ, পৃ. ৪১১; ৭খ, পৃ. ৬৫১, ৬৫২; (১১) ইমাম বাগাবী, তাফসীরু বাগাবী, বৈরূত, ৩খ, পৃ. ১৭৮, ১৮২, ১৮০, ১৮২; (১২) ইবন হাজর আসকালানী, ফাতহুল বারী, বৈরূত, ৬খ, পৃ. ৩৮২, ২৯৪, ৩৮৩, ২৯৫; (১৩) তাফসীরে উছমানী, মদীনা ১৪০৯ হি., পৃ. ৪০৪, ৪৩৯; (১৪) মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, তারজমানুল কুরআন, লাহোর, ২খ, পৃ. ৪৫৩, ৪৬৩; (১৫) আবূ হায়্যান আন্দালুসী, বাহরুল মুহীত, লেবানন, ৬খ, পৃ. ১৫৭-১৬২, ১৬৩; (১৬) মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, তাফসীরে মাজেদী, করাচী, পৃ. ৬১৯, ৬২০-১; (১৭) কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, তাফসীর মাযহারী, করাচী, ৭খ, পৃ. ২৬৫, ২৬৬, ২৬২-৩, ২৬৪, ২৬৭-৮; (১৮) The Encyclopaedia Britannica, Uk, vol. i, P. 483-5; vol. vi, P. 752; vol. xiii, P. 526; (১৯) মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারবী, কাসাসুল কুরআন, করাচী, ৩খ, পৃ. ১৩৪, ১৮৪, ১৯০, ১৯৪-৬, ২০৭; (২০) মাওলানা সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী, তাফহীমুল কুরআন, লাহোর ১৯৮৪ খৃ, ৩খ, পৃ. ৪৪, ৪৭, ৪৬; (২১) সূরা কাহ্ফ, আয়াত ৮৫-৮৮, ৮৯-৯১, ৯২-৯৭, ৯৮; সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৯৬; (২২) Abdullah Yusuf Ali, The English Translation and Meanings of the Holy Quran, Modinah 1410 H., P. 845-6; (২৩) ইয়াকূত হামাবী মু'জামুল বুলদান, বাবুল আবওয়াব, অধ্যায় ৮খ., পৃ. ০৯; (২৪) সায়্যিদ মুহাম্মদ, আসরাতুস সারা, পৃ. ১৫৪; (২৫) আল্লামা ফাখরুদ্দীন রাযী, তাফসীর কাবীর, ৫খ, পৃ. ৫১৩; (২৬) ইবন খালদূন, মুকাদ্দিমা, পৃ. ৭৯; (২৭) আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, আকীদাতুল ইসলাম, পৃ. ১৯৮; (২৮) জালালুদ্দীন সুয়ূতী, তাফসীর জালালায়ন, পৃ. ২৫১-২; (২৯) ইবনুল আছীর, আল-কামিল ফিত-তারীখ, ১খ, পৃ. ৪৮; (৩০) অধ্যাপক কে আলী, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস, ঢাকা, ১৯৭৯, পৃ. ১০-৩২।

আ. ফ.ম. খালিদ হোসেন

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৯৬-২০০১ ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬ (উন্নয়ন) ৩২৫০